ব্যবসায় অর্থবিদ্যা
ও
ব্যবসায় গণিত

অধ্যাপক অলক ঘোষ

দি নিউ বুক স্টল
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

॥ সূচীপত্র ॥

প্রথম পত্র (First Paper)

বিষয় পৃষ্ঠা

মৌলিক ধারণাসমূহ ঃ

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পত্র (Second Paper)

[প্রথম অংশ]

ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কার্যক্রম :

দ্বিতীয় পত্র
(Second Paper)
[দ্বিতীয় অংশ]

ব্যবসায় গণিত
(Business Mathematics)

প্রথম পত্র

[মৌলিক অর্থনৈতিক ধারণা, ব্যবসায় অর্থবিদ্যার স্বরূপ, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কার্যক্রম]

অর্থবিদ্যা
বর্ণনামূলক অর্থবিদ্যা
অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ
ফলিত অর্থবিদ্যা বা
ব্যবসায় অর্থবিদ্যা

॥ মৌলিক ধারণাসমূহ ॥
(Fundamental Concepts)

"Econmics is an important subject. It is also an exciting subject."

PAUL A. SAMUELSON

"Business Economics is a study of the behaviour of firms in theory and practice."

JAMES BATES

and

J. R. PARKINSON

১

॥ কতকগুলি মৌলিক অর্থনৈতিক ধারণা ॥

(Some Fundamental Economic Concepts)

[অর্থবিদ্যা ও ব্যবসায় অর্থবিদ্যা—কতকগুলি মৌলিক অর্থনৈতিক ধারণা—উপযোগ—দ্রব্য-সামগ্রী—সম্পদ ও আয়—সম্পদ ও কল্যাণ—মূল্য ও দাম—ভোগ—ভোগ-প্রবণতা—অভাব—ইহার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ—জীবনযাত্রার মান]

অর্থবিদ্যা ও ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা (Economics and Business Economics) ঃ

ব্যবসায়-অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু ও স্বরূপ বুঝিতে হইলে, সর্বাগ্রে অর্থবিদ্যার কয়েকটি প্রচলিত সংজ্ঞা আলোচনা করিতে হয়। কারণ, ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা হইতেছে অর্থবিদ্যার একটি অন্যতম শাখা।

বিভিন্ন লেখক অর্থবিদ্যার বিভিন্ন রূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন। আধুনিক অর্থবিদ্যার জনক অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith)-এর মতে, অর্থবিদ্যা হইতেছে সম্পদ লইয়া আলোচনার একটি শাস্ত্র বা বিজ্ঞান (Economics is the Science of Wealth)। তাঁহার মতে, অর্থবিদ্যা সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টনের সমস্যাবলী লইয়া আলোচনা করে। কিভাবে কোন একটি দেশে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং উহা কিভাবে দেশের লোকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়—তাহাই হইতেছে অর্থবিদ্যার মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু ইহার নানারূপ সমালোচনা করা হয়।

ঐ সংজ্ঞাটির ত্রুটি প্রতিবিধানের জন্য পরবর্তীকালে অধ্যাপক মার্শাল (Marshall) অর্থবিদ্যার অন্যরূপ একটি সংজ্ঞা দেন। তাঁহার মতে, অর্থবিদ্যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যকলাপ লইয়া আলোচনা করে (a study of man's actions in the ordinary business of life)। সম্পদের উৎপাদন ও ব্যবহার-সংক্রান্ত বিষয় লইয়া মানুষের যে দৈনন্দিন আচরণ ও কার্যকলাপ দেখা যায়, তাহাই অর্থবিদ্যায় আলোচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, অর্থবিদ্যা একদিকে যেমন সম্পদ-আলোচনার শাস্ত্র, অন্যদিকে উহা তেমনি আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ মানুষের কার্যকলাপের আলোচনার শাস্ত্র।

কিন্তু মার্শালের এই সংজ্ঞাটি আধুনিক কালের লেখকরা আর গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। অধ্যাপক রবিন্স (Robbins) অর্থবিদ্যার আর একটি নূতন সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহার মতে, সীমাহীন উদ্দেশ্য (ends) এবং বিভিন্নভাবে ব্যবহার্য অপ্রচুর উপকরণগুলির মধ্যে মানুষের কার্যকলাপ যে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহারই পর্যালোচনাকারী শাস্ত্র হইতেছে অর্থবিদ্যা ("Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses"—*Robbins*)। এই সংজ্ঞাটিতে চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে ঃ (ক) অর্থবিদ্যা হইতেছে একটি বিজ্ঞান-শাস্ত্র,

(খ) মানুষের সীমাহীন অভাব, (গ) অভাব-পূরণের উপকরণ খুবই সীমাবদ্ধ এবং (গ) উপকরণ-সমূহের বিকল্প ব্যবহার আছে। সুতরাং, অর্থবিদ্যা হইতেছে সীমিত উপকরণ (যাহার আবার বিকল্প ব্যবহার আছে) দ্বারা মানুষ কিভাবে অসীম অভাব পূরণ করে, সেইসকল কার্যকলাপের পর্যালোচনা অর্থবিদ্যায় করা হয়। ইহার জন্য সীমিত উপকরণ যুক্তিযুক্তভাবে ব্যবহার করিতে হয়। কিভাবে উহা করা হয়, তাহাই অর্থবিদ্যার আলোচনা-ক্ষেত্র। আধুনিককালে এই সংজ্ঞাটিকেই অধিকাংশ লেখক মানিয়া লইয়াছেন।

আধুনিককালে অর্থবিদ্যাব বিষয়বস্তুর পরিধি বিশেষভাবে বিস্তীর্ণ হওয়ায় মোটামুটি ইহাকে তিনটি শাখায় ভাগ করা হয়ঃ (i) বর্ণনামূলক অর্থবিদ্যা (Descriptive Economics), (ii) অর্থনৈতিক তত্ত্ব বা অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (Economic Theory or Economic Analysis) এবং (iii) ফলিত অর্থবিদ্যা (Applied Economics)।

(i) বর্ণনামূলক অর্থবিদ্যায় কোন দেশের অর্থব্যবস্থার সকল ক্ষেত্র বা কোন বিশেষ ক্ষেত্র এবং উহার নানারূপ ঘটনা ও তথ্য লইয়া আলোচনা করা হয়; যেমন—ভারতীয় অর্থবিদ্যা বা ব্রিটিশ অর্থবিদ্যা।

(ii) অর্থনৈতিক তত্ত্বে অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন দিক এবং উহার কার্যকলাপ লইয়া তত্ত্বমূলক আলোচনা করা হয়। ইহা মুখ্যত অর্থবিদ্যার তত্ত্বমূলক পর্যালোচনা, যেমন—চাহিদা তত্ত্ব, যোগান তত্ত্ব, মূল্য তত্ত্ব ইত্যাদি।

(iii) ফলিত অর্থবিদ্যায় অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলির ব্যবহারিক বা প্রয়োগের দিক আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ, বর্ণনামূলক অর্থবিদ্যায় যে-সকল ঘটনা ও তথ্য পাওয়া যায়, অর্থনৈতিক তত্ত্ব দ্বারা সেইগুলির বিশ্লেষণ ফলিত অর্থবিদ্যায় করা হয়। যেমন—ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত কার্যকলাপ ও আচরণ প্রচলিত অর্থনৈতিক তত্ত্ব দ্বারা বিশ্লেষণ করা হইয়া থাকে। ফলিত অর্থবিদ্যাকে 'পরিচালন অর্থবিদ্যা' (Managerial Economics) বা 'ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা' (Business Economics) বলিয়াও আখ্যা দেওয়া হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা হইতেছে সাধারণ অর্থবিদ্যা-শাস্ত্রের একটি অন্যতম শাখা। ইহার সংজ্ঞাস্বরূপ বলা যায়, ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা হইতেছে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বগত ও বাস্তব আচরণের বিশ্লেষণ (Business Economics is a study of the behaviour of firms in theory and practice—*Bates* and *Parkinson*)। এ-সম্পর্কে ১১ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচন করা হইবে।

ব্যবসায়-অর্থবিদ্যার এই বিষয়বস্তু সম্যক্‌ভাবে বুঝিবার জন্য আলোচনার শুরুতেই এই শাস্ত্রে ব্যবহৃত কতকগুলি মৌলিক ধারণার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। এইগুলি মনে রাখিলে সমগ্র আলোচনা বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে। অর্থবিদ্যার মৌলিক ধারণার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ

(১) **উপযোগ (Utility) ঃ** মানুষের কোন অভাব পূরণ করার ক্ষমতাকেই অর্থবিদ্যায় 'উপযোগ' বলা হয় ; অর্থাৎ, উপযোগ হইতেছে মানুষের অভাবমোচন করার জন্য দ্রব্যের গুণ বা ক্ষমতা। এখানে মনে রাখিতে হইবে, যে—দ্রব্যটি অভাব পূরণ করে, উহাকেই উপযোগ বলা হইবে না। দ্রব্যটির যে ক্ষমতা অভাব-পূরণ করে, তাহাকেই উপযোগ বলা হইবে। হাত-ঘড়ি হইতে উপযোগ পাওয়া যায়, কিন্তু হাত-ঘড়িকেই উপযোগ বলা হইবে না। হাত-ঘড়ি সময় রাখার ব্যাপারে যে সাহায্য করে, সেই ক্ষমতাই হইতেছে উপযোগ।

অর্থবিদ্যায় 'উপযোগ' শব্দটি ব্যবহারের সময় দুইটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রথমত, উপযোগের সঙ্গে কোন নৈতিক প্রশ্ন জড়িত নাই। নীতির দিক হইতে কোন দ্রব্য ভালো হউক বা মন্দ হউক, ঐ দ্রব্যটির যদি অভাবপূরণ করার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে ধরিতে হইবে যে দ্রব্যটির উপযোগ আছে। চা-পানকারীর নিকট যেমন চা-এর উপযোগ আছে, মদ্যপানকারীর নিকট মদেরও সেইরূপ উপযোগ আছে। মদ্যপান ক্ষতিকারক হওয়া সত্ত্বেও ধরিতে হইবে, চা ও মদ—উভয়েরই উপযোগ আছে। দ্বিতীয়ত, উপযোগ ধারণাটি বহুলাংশে মানসিক বা মনোগত (subjective) ও আপেক্ষিক (relative)। কোন একটি দ্রব্য সকলের অভাব পূরণ নাও করিতে পারে ; যেমন—আহারের জন্য কেহ ভাত, আবার কেহ বা রুটি পছন্দ করে। অথবা, তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য একজনের শুধু জল হইলেই চলে, কিন্তু অন্য একজনের ঠান্ডা জল বা মিষ্টি-সহ জল চাই। সুতরাং দেখা যায়, একই দ্রব্য দুই ব্যক্তির অভাব বা আকাঙ্ক্ষা সমানভাবে পূরণ করিতে পারে না।

উপযোগের প্রকারভেদ ঃ মোটামুটিভাবে উপযোগ পাঁচ প্রকারের হইতে পারে ঃ

ক। প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক উপযোগ (Elementary Utility) ঃ প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যের যে-উপযোগ থাকে, উহাকে প্রাকৃতিক উপযোগ বলে, যেমন—আলো, হাওয়া, জল, গাছের অ-কাটা কাঠ ইত্যাদি হইতে প্রাকৃতিক উপযোগ পাওয়া যায়।

খ। স্থানান্তর উপযোগ (Place Utility) ঃ কোন কোন দ্রব্য আছে, যাহা অন্য স্থানে লইয়া গেলে নূতন উপযোগ সৃষ্টি হয়। ইহাকে স্থানান্তর উপযোগ বলে ; যেমন—সমুদ্রের ধারে বালির স্বাভাবিক উপযোগ থাকে। কিন্তু সমুদ্রের ধার হইতে শহরে বালি আনিলে উহার নূতন উপযোগ সৃষ্টি হয় ; ইহাই স্থানান্তর উপযোগ।

গ। সময়গত উপযোগ (Time Utility) ঃ কোন কোন দ্রব্য আছে, যাহা হইতে কোন বিশেষ সময়ে অধিক পরিমাণে উপযোগ পাওয়া যায়, সময়ের পরিবর্তনের ফলে ঐ দ্রব্যগুলির উপযোগ বৃদ্ধি পায় ; যেমন—শীতকালে পশমের পোশাকের উপযোগ বৃদ্ধি পায় বা গরমকালে আইসক্রীমের উপযোগ দেখা যায়।

ঘ। রূপান্তর উপযোগ (Form Utility) ঃ কোন দ্রব্যের রূপগত বা আকৃতি-

গত পরিবর্তন ঘটিলে যে-উপযোগ পাওয়া যায়, তাহাকে রূপান্তর উপযোগ বলা হয় ; যেমন—কাঠের মিস্ত্রী কাঠ দ্বারা ঘরের আসবাবপত্র তৈয়ারি করে এবং উহা হইতে আমরা উপযোগ পাই। এখানে কাঠের আকৃতিগত পরিবর্তনের ফলে নূতন উপযোগ দেখা দিয়াছে।

৬। **সেবাগত উপযোগ (Service Utility) :** মানুষের নানারূপ সেবামূলক কার্য হইতে এই উপযোগ পাওয়া যায়। চিকিৎসক, উকিল, কেরানী প্রভৃতির নিকট হইতে যে সেবামূলক কার্য পাওয়া যায়, তাহাই হইতেছে সেবাগত উপযোগ।

২. **দ্রব্যসামগ্রী (Goods) :** সাধারণ অর্থে যে-কোন বস্তু বা জিনিসকে দ্রব্য বলে। কিন্তু অর্থবিদ্যায় 'দ্রব্য'-শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহা মানুষের অভাব মিটাইতে পারে. শুধুমাত্র তাহাকেই দ্রব্য বলা হয়। অর্থবিদ্যায় দ্রব্য বস্তুগত (material) বা অ-বস্তুগত (non-material)—উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। খাদ্যদ্রব্য, কাপড়-চোপড়, জল, বাড়ি, জমি প্রভৃতি বস্তু আমাদের অভাব মিটাইতে পারে। সুতরাং, ঐগুলি বস্তুগত দ্রব্য। আলো, হাওয়া, ব্যবসায়ের সুনাম, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতির সেবামূলক কার্য ইত্যাদি অ-বস্তুগত জিনিসও দ্রব্য। কারণ, ঐগুলিও মানুষের অভাব পূরণ করিতে পারে।

দ্রব্য বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে :

ক। **অবাধলভ্য বা বিনামূল্যের দ্রব্য (Free Goods) ও অর্থনৈতিক দ্রব্য (Economic Goods) :** প্রকৃতিগত যে-সকল দ্রব্যের যোগান, চাহিদার তুলনায় প্রচুর এবং যাহার জন্য কোন দাম দিতে হয় না, উহাদিগকে অবাধলভ্য বা বিনামূল্যের দ্রব্য বলে ; যেমন—বাতাস, সূর্যের আলো, নদীর জল ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, অর্থনৈতিক দ্রব্যের যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ এবং উহাদের জন্য দাম দিতে হয়। খাদ্যদ্রব্য, কাপড়, তেল, পুস্তকাদি, বাড়িঘর ইত্যাদি অর্থনৈতিক দ্রব্য। অবশ্য একই দ্রব্য কোন স্থানে অবাধলভ্য এবং অন্যত্র অর্থনৈতিক দ্রব্য হইতে পারে ; যেমন—নদীর জল নদীতে অবাধলভ্য দ্রব্য, কিন্তু শহরে কলের জল অর্থনৈতিক দ্রব্য। কারণ, শহরে কলের জলের যোগান উহার চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ। সমুদ্রের ধারে বালি অবাধলভ্য দ্রব্য, কিন্তু শহরে আনীত বালি বা চন্দ্র হইতে আনীত প্রস্তরখণ্ড হইতেছে অর্থনৈতিক দ্রব্য।

খ। **ভোগ্যদ্রব্য (Consumer's Goods) ও মূলধন-দ্রব্য (Capital Goods) :** প্রত্যক্ষ ভোগকার্যের "চূড়ান্ত" অভাব ("final" wants) পূরণের জন্য যে-দ্রব্য ব্যবহার করা হয়, তাহাকে ভোগ্যদ্রব্য বলা হয় ; যেমন—চিনি, তেল, গম, চাল, কাপড় ইত্যাদি। কিন্তু যে-সকল দ্রব্য অন্য দ্রব্য উৎপাদনের কার্যে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইল মূলধন দ্রব্য ; যেমন—যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি। তবে একই দ্রব্য এক অবস্থায় ভোগ্যদ্রব্য এবং অন্য অবস্থায় মূলধন-দ্রব্য হইতে পারে। বাড়িতে রান্নার জন্য যখন কয়লা ব্যবহার করা হয়, উহা তখন ভোগ্যদ্রব্য। কিন্তু ঐ কয়লা

যখন কারখানায় দ্রব্য-উৎপাদনের জন্য চুল্লীতে ব্যবহার করা হয়, তখন উহা হয় মূলধন-দ্রব্য।

গ। বাহ্যিক (External) ও অভ্যন্তরীণ (Internal) দ্রব্য ঃ মানুষের অন্তর্নিহিত জিনিস নহে, এমন দ্রব্যকে বাহ্যিক দ্রব্য বলা হয়, যেমন—ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র ইত্যাদি। বাহ্যিক দ্রব্য এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর (transfer) করা যায়। কিন্তু, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারের দক্ষতা, লেখকের লেখার ক্ষমতা, গায়কের গান গাহিবার নিপুণতা ইত্যাদি মানুষের অন্তর্নিহিত গুণ—ইহা হস্তান্তরযোগ্য নহে (non-transferable)। এইগুলি অভ্যন্তরীণ দ্রব্য।

ঘ। পচনশীল (Perishable) ও স্থায়ী (Durable) দ্রব্য: মাছ, মাংস, ডিম, তরি-তরকারি ইত্যাদি পচনশীল দ্রব্য। কারণ, এইগুলি তাড়াতাড়ি ব্যবহার করা না হইলে নষ্ট হইয়া যায়। ভোগের জন্য এইগুলি শুধুমাত্র একবারই ব্যবহার করা যায়। কিন্তু যে-সকল দ্রব্য বহুদিন ধরিয়া ব্যবহার করা যায় এবং যাহার স্থায়িত্ব বেশী, উহাদিগকে স্থায়ী দ্রব্য বলা হয়; যেমন—রেডিও-সেট, টেলিভিশন-সেট, আসবাব-পত্র, কলম, পুস্তকাদি ইত্যাদি।

৩. অর্থনৈতিক দ্রব্য (Economic Goods) বা সম্পদ (Wealth) ঃ সাধারণ অর্থে ধন-সম্পত্তিকে 'সম্পদ' বলে। কিন্তু অর্থবিদ্যায় অর্থনৈতিক দ্রব্যকে সম্পদ বলা হয়। সুতরাং, যে-সকল দ্রব্য আমাদের অভাব পূরণ করিতে পারে এবং যাহার যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ, উহাদিগকে সম্পদ বলা হয়। অর্থবিদ্যায় 'সম্পদ'-এর চারটি বৈশিষ্ট্য আছে ঃ—

ক। উপযোগ (Utility) ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে মানুষের অভাব পূরণ করার ক্ষমতাকে উপযোগ বলা হয়। উপযোগ হইতেছে সম্পদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে-সকল দ্রব্য মানুষের অভাব-পূরণ করিতে পারে, সেইগুলিকে সম্পদের পর্যায়ে ফেলা হয়; যেমন—খাদ্যদ্রব্য, বাড়িঘর, আসবাবপত্র, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী ইত্যাদি। যাহার অভাব-মোচন করার ক্ষমতা নাই, সেইগুলিকে সম্পদ বলা হইবে না।

খ। অপ্রাচুর্য (Scarcity) ঃ শুধুমাত্র উপযোগ থাকিলেই সেই দ্রব্যকে সম্পদ বলা যায় না। সম্পদ হইতে হইলে সেই দ্রব্যটির যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ হইতে হইবে। দ্রব্য অপ্রচুর না হইলে কেহ উহার জন্য কোন দাম দিবে না; সুতরাং উহা সম্পদ হইবে না। নদীর জল সম্পদ নয়, কারণ নদীতে জলের যোগান অপ্রচুর নহে। কিন্তু শহরে পানীয় জল সম্পদ, কারণ শহরে ইহার যোগান সীমাবদ্ধ।

গ। হস্তান্তরযোগ্যতা (Transferability) ঃ সম্পদের আর-একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ইহা হস্তান্তর করা যায়। যে-সকল দ্রব্যের উপযোগ ও সীমিত যোগান থাকে এবং যাহা একজনের নিকট হইতে অন্যের নিকট দেওয়া যায়, সেইসকল

দ্রব্য সম্পদ হইবে। হস্তান্তরযোগ্যতার অর্থ হইতেছে বিক্রয়করণের যোগ্যতা, অর্থাৎ হস্তান্তর বলিতে মালিকানার হস্তান্তরই বুঝায়, স্থানান্তর বুঝায় না। যেমন—কোন বাড়ি বা জমি এক স্থান হইতে অন্যত্র সরানো যায় না। কিন্তু কেনা-বেচার মাধ্যমে উহার মালিকানার পরিবর্তন ঘটিতে পারে; সুতরাং, বাড়ি বা জমি সম্পদ হইবে। কিন্তু কোন একজনের পরীক্ষা-পাসের সার্টিফিকেট বা রেশন কার্ড হস্তান্তর-যোগ্য নহে; সুতরাং, উহা সম্পদ নহে।

ঘ। বাহ্যিকতা (External to Owner) ঃ দ্রব্য বাহ্যিক হইলেই উহা স্থানান্তর করা সম্ভব হয়। মানুষের যাহা অন্তর্নিহিত গুণ, যেমন—কবির প্রতিভা, শিল্পীর কলা-নিপুণতা ইত্যাদি হস্তান্তর করা যায় না; সুতরাং, ঐগুলি সম্পদ নয়। অতএব, দ্রব্যের বাহ্যিকতা হইতেছে সম্পদের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

সম্পদের উপরের বর্ণনা অনুসারে ধাতব মুদ্রা, ব্যবসায়ের সুনাম, সরকারী ঋণপত্র, বাসগৃহের অভ্যন্তরে কৃত্রিম শীতল হাওয়া, পড়ার পুস্তক ইত্যাদি দ্রব্যগুলিও সম্পদ। কারণ, উহাদের উপরের চারটি বৈশিষ্ট্যই আছে। কিন্তু কোন একজনের পরীক্ষা-পাশের সার্টিফিকেট বা গায়কের সুনাম বা নদীর ধারে বালি ইত্যাদি সম্পদ নহে। কারণ, সম্পদের সবগুলি বৈশিষ্ট্য উহাদের মধ্যে নাই।

সম্পদের শ্রেণীবিভাগ ঃ অর্থবিদ্যায় ব্যাপক অর্থে সম্পদকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ঃ

ক। ব্যক্তিগত সম্পদ (Individual Wealth) ঃ যে-সকল সম্পদ ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে থাকে, তাহাকে ব্যক্তিগত সম্পদ বলে; যেমন—ব্যক্তি-বিশেষের ধনসম্পত্তি, আসবাবপত্র, জমিজমা ইত্যাদি।

খ। সমষ্টিগত সম্পদ (Collective Wealth) ঃ যে-সকল সম্পদের উপর জনসাধারণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেগুলি হইতেছে সমষ্টিগত সম্পদ; যেমন—রাস্তাঘাট, পার্ক, সরকারী ঘরবাড়ি, জাতীয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি। ইহা ছাড়া, বর্তমানে রেলপথ, ডাকঘর, ব্যাংকিং-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সরকার নিজের হাতে তুলিয়া লইতেছে। এগুলিও সমষ্টিগত সম্পদ।

গ। জাতীয় সম্পদ (National Wealth) ঃ কোন দেশের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পদের সমষ্টিকে জাতীয় বা সামাজিক সম্পদ বলা হয়। জাতীয় সম্পদের মধ্যে শুধু ব্যক্তিগত সম্পদ ধরা হয় না, উহার মধ্যে প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও সমষ্টিগত সম্পদ ধরা হয়। জাতীয় সম্পদ হিসাবের সময় বিদেশের নিকট দেশের যে-পাওনা, উহা জাতীয় সম্পদে যোগ করিতে হয় এবং বিদেশের নিকট দেশের যে-ঋণ তাহা বাদ দিতে হয়।

৪. সম্পদ ও আয় (Wealth and Income) ঃ সম্পদ ও আয়—একই বস্তু নহে, উহাদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। সম্পদ হইতেছে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে যে-পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য কোন ব্যক্তির নিকটে থাকে, তাহারই সমষ্টি এবং

উহা তাহার অভাব পূরণ করে। কিন্তু সম্পদ হইতে উপযোগের যে-প্রবাহ আসিতেছে, উহা হইতেছে 'আয়'। সুতরাং, সম্পদ হইতেছে 'উপযোগের ভান্ডার' (store of utility), আর আয় হইল 'উপযোগের প্রবাহ' (flow of utility)। দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝানো যায়। মানুষের বসবাসের বাড়ী হইতেছে 'সম্পদ', কিন্তু ঐ বাড়িতে বসবাস করার ফলে যে উপযোগ পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে ঐ বাড়ী হইতে উদ্ভূত 'আয়'। আবার ঐ বাড়িতে নিজে না থাকিয়া অন্য কেহ বসবাস করিলে যে ভাড়া পাওয়া যায়, তাহাই হইবে বাড়ির আয়। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, শুধুমাত্র দ্রব্যসামগ্রীই আয়ের উৎস নহে। নানারূপ সেবামূলক কার্য হইতেও আয়ের সৃষ্টি হয়। শিক্ষক, উকিল, চিকিৎসক প্রভৃতি ব্যক্তিগণও আমাদের অভাব পূরণ করে; সুতরাং, তাহাদের সেবামূলক কার্যের উপযোগও আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

আয়কে যখন টাকাকড়ির অঙ্কে প্রকাশ করা হয়, তখন তাহা হয় 'আর্থিক আয়' (money income); যেমন—কোন একটি বাড়ি হইতে যদি মাসিক ২০০০ টাকা ভাড়া পাওয়া যায়, তাহা হইলে ২০০০ টাকা হইবে আর্থিক আয়। আবার চাকরিতে কোন ব্যক্তি ৮০০ টাকা মাসিক মাহিনা পাইলে ঐ ব্যক্তির আর্থিক আয় হইবে ৮০০ টাকা। আর্থিক আয়ের বিনিময়ে যে-সকল দ্রব্য ও সেবামূলক কার্য ক্রয় করা যায়, উহা হইতেছে 'প্রকৃত আয়' বা 'বাস্তব আয়' (real income)। প্রকৃত আয় একদিকে যেমন আর্থিক আয়ের উপর নির্ভর করে, অন্যদিকে তেমন উহা জিনিসপত্রের দামের উপরও নির্ভর করে। আমাদের আর্থিক আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে যদি জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পাইবে। কারণ, তখন আর্থিক আয়ের বিনিময়ে পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যাইবে। আবার, জিনিসপত্রের দাম যদি হ্রাস পায়, তাহা হইলে প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পাইবে। কারণ, তখন আর্থিক আয়ের বিনিময়ে পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যাইবে।

৫. সম্পদ ও কল্যাণ (Wealth and Welfare) ঃ সম্পদ ও কল্যাণ—এই ধারণা দুইটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। সম্পদ সৃষ্টি করা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রাথমিক উদ্দেশ্য (immediate object), কল্যাণ হইতেছে উহাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য (ultimate object)। মানুষ নানারূপ অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা দ্বারা সম্পদ সৃষ্টি করে অভাব-পূরণের জন্য ; অভাব পূরণের ফলে যে-পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়, তাহাই হইতেছে কল্যাণ। সুতরাং, কল্যাণ লাভ করা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের লক্ষ্য, সম্পদ হইতেছে ঐ লক্ষ্যে পৌঁছাইবার উপকরণ, উপলক্ষ্য মাত্র।

কিন্তু সম্পদ ও কল্যাণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। সম্পদ হইতেছে অভাব-পূরণের দ্রব্যসামগ্রীর সমষ্টি, ইহা বস্তুগত (concrete)। কিন্তু কল্যাণ হইতেছে একটি বিশেষ মানসিক অবস্থা, ইহা বস্তু-নিরপেক্ষ (abstract)। সম্পদ সম্পর্কে আমাদের একটি নির্দিষ্ট ধারণা আছে, কিন্তু কল্যাণ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট ধারণা থাকে না—ইহা ব্যক্তিভেদে, স্থানভেদে ও কালভেদে পরিবর্তিত হয়। ইহা

ছাড়া, আলো, হাওয়া, জলবায়ু ইত্যাদি কতকগুলি প্রাকৃতিক জিনিস এবং প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা প্রভৃতি কয়েকটি মনোগত বিষয় মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কিন্তু এইগুলি অর্থনৈতিক দ্রব্যসামগ্রী নয়, সম্পদ নয়।

এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে সম্পর্ক বেশ নিবিড়। কল্যাণ সম্পদ-বৃদ্ধির সহায়ক। কারণ ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণে যে-সমাজ যত উন্নত, সেই সমাজের সম্পদ-উৎপাদনের ক্ষমতাও তত বেশি; পক্ষান্তরে, তেমনি আবার সম্পদও কল্যাণ-বৃদ্ধির সহায়ক, কারণ ইহা কল্যাণের উপকরণ। সাধারণত সম্পদ বৃদ্ধি পাইলে কল্যাণও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সম্পদ বৃদ্ধি পাইলেই যে কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে, এমন কোন বাঁধাধরা সূত্র নাই; কারণ, উহা নির্ভর করে সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ধরনের উপর। যেমন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে সম্পদ উৎপাদন করা হইলে কল্যাণ হ্রাস পাইবে; জাতীয় সম্পদের বৃহদংশ শুধুমাত্র ধনীদের নিকট গেলে তাহাদের কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু গরীবদের কল্যাণ হ্রাস পাইবে। অনিষ্টকর দ্রব্যাদি (যেমন—মদ, গঞ্জিকা, অতি-বিলাস দ্রব্যাদি) ভোগের ফলে দেশের কল্যাণ হ্রাস পাইবে। সুতরাং দেখা যায়, সম্পদ বৃদ্ধি পাইলে কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে কিনা তাহা নির্ভর করে সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ধরনের উপর।

৬. মূল্য ও দাম (Value and Price)ঃ অর্থবিদ্যায় মূল্য (value) শব্দটি দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়—ব্যবহারিক মূল্য (value-in-use) ও বিনিময় মূল্য (exchange value)। কোন দ্রব্যের যে-উপযোগ আছে, তাহাই ঐ দ্রব্যটির ব্যবহারিক মূল্য। জল, চাল, লবণ, গাড়ি ইত্যাদির উপযোগে আছে এবং ঐ উপযোগই ঐ দ্রব্যগুলির ব্যবহারিক মূল্য। পক্ষান্তরে, কোন দ্রব্যের বিনিময় মূল্য হইতেছে, উহার ক্রয় করার ক্ষমতা। অর্থাৎ, একটি দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য যে-সকল দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাই ঐ দ্রব্যটির বিনিময় মূল্য; যেমন—১ কিলোগ্রাম চালের বিনিময়ে ২ কিলো গম বা ৫ কিলো লবণ বা ১ কিলো চিনি পাওয়া গেলে, ১ কিলো চালের বিনিময় মূল্য হইবে ২ কিলো গম বা ৫ কিলো লবণ বা ১ কিলো চিনি। সুতরাং, কোন দ্রব্যের বিনিময় মূল্য অন্য দ্রব্যের অঙ্কে প্রকাশ করা হয়। এখানে মনে রাখিতে হইবে, কোন কোন ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের খুব উচ্চ ব্যবহারিক মূল্য আছে, অথচ উহার বিনিময় মূল্য নাই বলিলেই চলে, যেমন—জল। আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে কোন একটি দ্রব্যের খুব উচ্চ বিনিময় মূল্য আছে, কিন্তু উহার ব্যবহারিক মূল্য তুলনায় খুবই কম; যেমন—সোনা। এই দুই প্রকার মূল্যের মধ্যে অর্থবিদ্যায় দ্রব্যের বিনিময় মূল্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় কোন দ্রব্যের মূল্য টাকাকড়ির অঙ্কে প্রকাশ করা হয়। কোন দ্রব্যের মূল্য যখন টাকাকড়ির অঙ্কে প্রকাশ করা হইবে, তখন উহাকে দাম (price) বলা হইবে। কোন দ্রব্যের মূল্য অন্য দ্রব্যের অঙ্কে প্রকাশ করা হইলে একই দ্রব্যের হাজার রকমের মূল্য থাকিতে পারে। কারণ, একটি দ্রব্যের বিনিময়ে

হাজার রকমের জিনিস পাওয়া যায়। এই অবস্থায় ১ কিলো চালের মূল্য ২ কিলো গম বা ৪ কিলো লবণ বা ২টি পুস্তক ইত্যাদি হইবে। এই কারণেই কোন দ্রব্যের মূল্যকে টাকাকড়ির অঙ্কে প্রকাশ করিতে হয়।

মূল্য ও দামের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে, কোন দ্রব্যের মূল্য অন্য দ্রব্যের অঙ্কে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু কোন দ্রব্যের দাম টাকাকড়ির অঙ্কে প্রকাশ করা হয়। আবার, একই সঙ্গে সকল দ্রব্যের মূল্য বাড়িতে বা কমিতে পারে না। কোন একটি দ্রব্যের মূল্য বাড়িলে অন্য দ্রব্যের মূল্য কমিবে; আবার, কোন একটি দ্রব্যের মূল্য কমিলে অন্য দ্রব্যের মূল্য বাড়িবে। যেমন—ধরা যাউক ১ কিলো চালের মূল্য ২ কিলো গম হইতে ৪ কিলো গমে দাঁড়াইল। ফলে, চালের মূল্য বাড়িল, কিন্তু গমের মূল্য কমিল। কারণ, পূর্বে ১ কিলো গমের বিনিময়ে ½ কিলো চাল পাওয়া যাইত, এখন পাওয়া যায় মাত্র ¼ কিলো চাউল। কিন্তু সকল দ্রব্যের দাম একই সঙ্গে বাড়িতে বা কমিতে পারে; যেমন—একই সঙ্গে চাল, ডাল, মাছ, তরি-তরকারি, আসবাবপত্র, কাঁচামাল প্রভৃতির দাম বাড়িতেও পারে বা কমিতেও পারে।

৭. **ভোগ (Consumption) ঃ** ভোগ বলিতে কোন দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকেই বুঝায়। কোন দ্রব্য-উৎপাদনের ফলে নূতন উপযোগ সৃষ্টি হয়। আবার ঐ দ্রব্যটি ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে আমাদের অভাব পরিতৃপ্ত হয় এবং উহার উপযোগ ক্রমশ নিঃশেষিত হয়। দ্রব্যটির উপযোগ নিঃশেষ করাকেই ভোগ বলা হয়; যেমন—কলম তৈয়ারির ফলে নূতন উপযোগ সৃষ্টি হইতেছে এবং কলম ব্যবহার করিয়া উহা হইতে উপযোগ পাওয়া যায়। কলমটি ব্যবহার করিতে করিতে একদিন উহা অকেজো হইয়া পড়িবে এবং উহা হইতে আর তখন উপযোগ পাওয়া যাইবে না। কলমটি ব্যবহারের ফলে উহার যে উপযোগ নিঃশেষ হইতেছে, ইহাকেই ভোগ বলিয়া গণ্য করা হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে দ্রব্যটি কেবলমাত্র একবার ব্যবহার করা হইলে, উহার উপযোগ নিঃশেষ হইয়া যায়; যেমন—আপেল বা কমলালেবু—উহা একবার আহার করিলেই শেষ হইয়া যায়। আবার কতগুলি ক্ষেত্রে দ্রব্যটি বহুবার ব্যবহার করা যায় এবং ঐসকল ক্ষেত্রে উপযোগের নিঃশেষ ধীরে ধীরে হইয়া থাকে; যেমন—ঘরের আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড়—এইগুলি বহুবার ব্যবহার করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়, উহাদের ক্ষেত্রে উপযোগের নিঃশেষ ধীরে ধীরে হইয়া থাকে। সুতরাং, যে প্রক্রিয়া দ্বারা দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের মধ্যে নিহিত উপযোগের বিনাশ ঘটে, তাহাই হইতেছে ভোগ। মেয়ার্সের (Meyers) ভাষায় বলা যায়, "ভোগ হইতেছে মানুষের অভাব পরিতৃপ্ত করার জন্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা-কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ ও চূড়ান্ত ব্যবহার ("Consumption is the direct and final use of goods or services in satisfying the wants".—*Meyers*)।

৮. **ভোগ-প্রবণতা (Propensity to Consume) ঃ** ভোগ-প্রবণতা বলিতে কোন ব্যক্তির বা কোন জন-সমাজের ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের ইচ্ছার তীব্রতাকে (keenness)

বুঝায়। আয় ও ভোগব্যয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক দেখা যায়। আধুনিককালের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কেইন্‌স (Keyns) দেখাইয়াছেন, ভোগব্যয় মূলত আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। আয় বাড়িলে ভোগ বাড়ে, অর্থাৎ আয়ের বিভিন্ন স্তরে ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণও বিভিন্ন রূপ হইবে, আয় ও ভোগ-ব্যয়ের এই সম্পর্ককে ভোগ-প্রবণতা এবং বিভিন্ন আয়ের স্তরে ভোগের পরিমাণ কি দাঁড়ায় তাহার তালিকা প্রস্তুত করা হইলে, তাহাকে বলা হয় ভোগ-প্রবণতা সূচী (propensity to consume schedule)। মোট ভোগ-ব্যয় ও ভোগ-প্রবণতার মধ্যে পার্থক্য হইতেছে, কোন একটি নির্দিষ্ট আয়ের যে-পরিমাণ ভোগের জন্য ব্যয় করা হয়, তাহাই মোট ভোগ-ব্যয় ; কিন্তু, ভোগ-প্রবণতা হইতেছে বিভিন্ন আয়ের স্তরে ভোগের বিভিন্ন পরিমাণ। কেইন্‌সের মতে, ভোগ-প্রবণতার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে, লোকের আয় অধিক হইলে ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যে-পরিমাণের আয়-বৃদ্ধি ঘটে, সে-পরিমাণে নহে।

অর্থবিদ্যায় ভোগ-প্রবণতা দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়—(ক) গড় ভোগ-প্রবণতা (average propensity to consume) এবং (খ) প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা (marginal propensity to consume)।

(ক) মোট আয়ের (Y) ও মোট ভোগ-ব্যয়ের (C) অনুপাতকে গড় ভোগ-প্রবণতা বলে। যেমন—১০০ কোটি টাকা আয় এবং ৮০ কোটি টাকা মোট ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ হইলে গড় ভোগ-প্রবণতা হইবে ০.৮ বা ৮০ শতাংশ। সুতরাং,

$$\text{গড় ভোগ-প্রবণতা} = \frac{\text{মোট ভোগ-ব্যয়}}{\text{মোট আয়}} = \frac{C}{Y}$$

(খ) পক্ষান্তরে, প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা হইতেছে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আয় ($\triangle Y$) ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভোগ-ব্যয়ের ($\triangle C$) অনুপাত। যেমন—১০ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি পাইল এবং উহার ফলে ৬ কোটি টাকার ভোগ-ব্যয় বৃদ্ধি পাইল, প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা হইবে ০.৬ বা ৬০ শতাংশ। সুতরাং,

$$\text{প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা} = \frac{\text{ভোগ-ব্যয় বৃদ্ধি}}{\text{আয়-বৃদ্ধি}} = \frac{\triangle C}{\triangle Y}$$

ভোগ-ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা সাধারণত ১-এর কম হয়।

৯. অভাব—ইহার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ : (Wants—their characteristics and classification) : পূর্বেই বলা হইয়াছে, মানুষের অভাববোধ হইতে ভোগের প্রয়োজন দেখা দেয়। এখন প্রশ্ন হইল, অভাব বলিতে কি বুঝায় ? সাধারণ অর্থে অভাব বলিতে অনটন বা অসচ্ছলতাকেই বুঝায়। অর্থবিদ্যায় অভাব বলিতে প্রয়োজনীয় বা আরামদায়ক কোন জিনিস পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকেই বুঝায়। এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকা বা স্বাচ্ছন্দ্যের বা বিলাসের জন্য কতকগুলি জিনিস প্রয়োজন, তাহা পাওয়ার আকাঙ্খাকেই অভাব (wants) বলা হইবে। মানুষের অভাবের কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :

ক। মানুষের অভাবের কোন শেষ সীমা নাই ; অভাবের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। অতীতে মানুষের অভাব ছিল সামান্য। কারণ, অতীতকালের লোকেরা খুব সাদাসিধা জীবনযাপন করিত। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অভাবের সংখ্যা ক্রমশ অধিকতর ও বৈচিত্র্যময় হইতে লাগিল।

খ। মানুষের অভাব অসীম বলিয়া সবগুলি অভাব একই সঙ্গে পূরণ করা যায় না, কিন্তু কোন একটি বিশেষ অভাব পূরণ করা সম্ভব হয়। যদি আমাদের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ থাকে, তাহা হইলে কোন একটি বিশেষ অভাব আমরা পূরণ করা যায় ; যেমন—কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির হাতে ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ থাকিলে, সে তাহার ক্ষুধা পরিপূর্ণভাবে নিবৃত্ত করিতে পারিবে। কিন্তু একই সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া বা বাড়ি-করা বা ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার প্রয়োজন মেটানো বা আমোদস্ফূর্তি করা সম্ভব হয় না। কারণ, আমাদের উপকরণ সীমিত, কিন্তু অভাব অসীম। ইহা ছাড়া, কতকগুলি অভাব, বিশেষত দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য অভাব পুনরাবর্তক (recurrent) বা স্থায়ী হইয়া পড়ে।

গ। কতকগুলি অভাব আছে, যেগুলি একটি অন্যটির পরিপূরক (complementary) ; যেমন—গাড়ির অভাব মিটাইতে গেলে গাড়িও দরকার, পেট্রোলও দরকার। এখানে গাড়ি ও পেট্রোলের অভাব একই সঙ্গে দেখা দেয় এবং একই সঙ্গে পূরণ করিতে হইবে। কলম ও কালির অভাব একই সঙ্গে পূরণ করিতে হয়।

ঘ। আবার, কতকগুলি অভাব আছে, যেগুলি একটি অপরটির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। মানুষের হাতে উপকরণের পরিমাণ খুবই সীমিত, তাছাড়া একই সঙ্গে অনেকগুলি অভাব পূরণ করিতে হয়। কিন্তু সবগুলি অভাব একই সঙ্গে পূরণ করা যায় না। উহাদের মধ্যে যেগুলি খুব জরুরী, সেইগুলি সর্বাগ্রে মিটাইতে হয়। অপরগুলি অভাবের তালিকা হইতে আপাতত বাদ দিতে হয় ; যেমন—একই সঙ্গে গাড়ি বা বাড়ি ক্রয়ের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। ব্যক্তির হাতে উপকরণ যথেষ্ট না থাকিলে উহাদের মধ্যে যেটির প্রয়োজন অধিক, সেইটিই আগে ক্রয় করিতে হয় এবং অন্য অভাবটি স্থগিত রাখিতে হয়।

ঙ। মানুষের অধিকাংশ অভাব পূরণ করার বিকল্প উপায় আছে। কোন একটি অভাব বিভিন্নভাবে পূরণ করা যায় ; যেমন—তৃষ্ণা পাইলে শুধু জল বা শরবত পান করিয়া উহা পূরণ করা যায়। আবার শীতকালে চা, কফি বা গরম দুধ দ্বারা শীতের জড়তা দূর করা যায়। উহাদের মধ্যে কোন্‌টি নির্বাচন করা হইবে, তাহা উহাদের দাম ও হাতের টাকাকড়ির উপর নির্ভর করে।

চ। কালভেদে ও স্থানভেদে অভাবের তারতম্য দেখা যায় ; যেমন—কিছুকাল পূর্বে আমাদের দেশে চা বা কফির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিত না। কিন্তু বর্তমানে ইহা একরূপ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। আবার স্থানভেদে অভাবের পরিবর্তন ঘটে। যেমন—শীতের দেশে গরম পোশাকের বিশেষ প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু গরমের দেশে উহার প্রয়োজন খুবই কম।

ছ। অভাব অনুকরণের (limiation) ফলে বিস্তারলাভ করে। কোন ব্যক্তির নূতন ধরনের পোশাক দেখিয়া আমাদের সেই ধরনের পোশাক পরিতে ইচ্ছা করে। উন্নত দেশগুলিতে টেলিভিশন, হেলিকপ্টার, ভিডিও-সেট ইত্যাদি বিলাসবহুল দ্রব্যের বিশেষ প্রচলন দেখিয়া অনুন্নত দেশের লোকেরা ঐ দ্রব্যগুলি ভোগের আকাঙ্ক্ষা করে। এইভাবে অনুকরণের মাধ্যমে অভাবগুলি এক মানুষ হইতে অন্য মানুষের নিকট ও এক দেশ হইতে উহা অন্য দেশে বিস্তার লাভ করে।

মানুষের অভাবের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করার পরে উহাদের শ্রেণীবিভাগ বিশ্লেষণ করিতে হয়। মোটামুটিভাবে মানুষের অভাবকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—প্রয়োজনীয় অভাব, আরামপ্রদ দ্রব্যাদি ও বিলাসদ্রব্যাদির অভাব।

ক। প্রয়োজনীয় অভাব (Necessaries): প্রয়োজনীয় অভাব বলিতে সেই সেই সকল অভাব বুঝায়, যেগুলি পূরণ করা না হইলে মানুষের জীবনধারণ সম্ভব নয়। খাদ্য, পরিধান ও বাসস্থান—এই তিনটি ছাড়া মানুষ বাঁচিতে পারি না। প্রয়োজনীয় অভাব আবার তিন প্রকারের: (ক) জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অভাব (necessaries for life)—খাদ্য, পরিধান ও বাসস্থান ছাড়া মানুষের জীবন ধারণ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং, এই তিনটি হইতেছে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ও স্থায়ী অভাব। (খ) কর্মদক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় অভাব (necessaries for efficiency)—কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য আছে, যেগুলি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নয়; কিন্তু সেগুলি ভোগ করা হইলে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শহরের কোন কর্মব্যস্ত ডাক্তারের কাছে মোটরগাড়ির প্রয়োজন আছে, কারণ মোটরগাড়ি তাহার কাজের দক্ষতা বাড়াইতে সাহায্য করে। (গ) অভ্যাসগত বা রীতিগত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (conventional necessaries)—কতকগুলি দ্রব্যাদির ভোগ মানুষের জীবনে অভ্যাসবশত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে; যেমন—ধূমপান, চা-পান ইত্যাদি। ইহা ছাড়া কতকগুলি দ্রব্য সমাজে মর্যাদা-বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে; যেমন—পাড়ায় সকলেরই একটি করিয়া মোটরগাড়ী থাকিলে আমাকেও একটি মোটরগাড়ি রাখিতে হইবে। এই ধরনের অভাবকে রীতিগত প্রয়োজনীয় অভাব বলা হয়।

খ। আরামপ্রদ দ্রব্যাদির অভাব (Comforts): কতকগুলি দ্রব্য মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় নয়; কিন্তু ইহারা তাহাদের জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এইগুলি হইতে কিছুটা আরাম বা সুখ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা দক্ষতা বিশেষ বৃদ্ধি করে না। চেয়ার ও টেবিল ছাত্রের নিকট প্রয়োজনীয়, কিন্তু গদীওয়ালা চেয়ার আরামপ্রদ বস্তু।

গ। বিলাসদ্রব্যাদির অভাব (Luxuries): এই অভাবগুলি হইতেছে নিষ্প্রয়োজনীয় বা অনাবশ্যক। সমাজে আড়ম্বর প্রদর্শনের জন্য এই সকল দ্রব্যাদির অভাব অনুভব করা হয়। এইগুলি না থাকিলেও মানুষ সুস্থ ও সবল জীবনযাপন করিতে পারে। দামী দামী আসবাবপত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ, বহুমূল্যের অলংকার দামী গাড়ি, গদীযুক্ত বিছানা ইত্যাদি হইতেছে বিলাসদ্রব্য।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, ব্যক্তিভেদে কোন একটি দ্রব্য এক জায়গায় প্রয়োজনীয়, অন্য জায়গায় আরামপ্রদ এবং অপর আর এক জায়গায় বিলাসদ্রব্য হইতে পারে; যেমন —কোন কর্মব্যস্ত ডাক্তারের নিকট একটি মোটরগাড়ি প্রয়োজনীয় সামগ্রী, কোন উচ্চ বেতনের চাকুরিয়ার নিকট ইহা আরামপ্রদ এবং কোন মধ্যবিত্তের নিকট ইহা বিলাসদ্রব্য।

১০. **জীবনযাত্রার মান (Standard of Living):** কোন ব্যক্তি বা কোন পরিবার বা কোন জন-সমাজ যে পরিমাণ প্রয়োজনীয়, আরামপ্রদ ও বিলাস দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য বর্তমানে ভোগ করিয়া থাকে, তাহাদের মোট পরিমাণকেই জীবনযাত্রার মান বলে, অর্থাৎ, জীবনযাত্রার মান বর্তমান ভোগ-কর্মের নির্দেশ দেয়। অন্যভাবে বলা যায়, অভাব-পূরণের ক্ষমতার মাত্রা দ্বারা কোন ব্যক্তি বা কোন পরিবার বা কোন জন-সমাজের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করা হয়। যে-ব্যক্তি আহার, পরিধান ও বাসস্থানের শুধুমাত্র ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইতে পারে, তাহার জীবনযাত্রার মান স্বভাবতই নিম্ন হইবে। পক্ষান্তরে, যে-ব্যক্তি ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ করিয়াও বিভিন্ন ধরনের আরামপ্রদ ও বিলাস-দ্রব্যাদি ভোগ করিতে পারে, তাহার জীবনযাত্রার মান স্বভাবতই উচ্চ হইবে। জীবনযাত্রার মানের মধ্যে শুধুমাত্র বর্তমান ভোগের পরিমাণগত দিক নয়, উহার গুণগত দিকও প্রতিফলিত হয়, অর্থাৎ, যে অবস্থার মধ্যে মানুষ বসবাস করিয়া সমৃদ্ধ হয়, সেইগুলিও ইহার মধ্যে আসে। সুতরাং বাঁচিবার ইচ্ছা, মাথাপিছু চিকিৎসক-প্রাপ্তি, কাজের পরিস্থিতি ইত্যাদি জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে যুক্ত হয়। উচ্চ মানের খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্র, আমোদ-প্রমোদ, শিক্ষা-দীক্ষা, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি উচ্চ জীবনযাত্রার মানের নির্দেশ দেয়। পক্ষান্তরে, ঐ সকল ভোগ্যদ্রব্য ও সেবাকার্য নিম্ন মানের হইলে জীবনযাত্রার মানও নিম্ন হইবে।

জীবনযাত্রার মান বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সামাজিক চিন্তাধারা ও প্রচলিত রীতিনীতি, সামাজিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি জীবনযাত্রার মানকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। ইহা ছাড়া, আয়-স্তর, দাম-স্তর, দেশের প্রগতির স্তর, বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যদ্রব্যের প্রাপ্তির সুযোগ ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিষয়গুলিও জীবনযাত্রার মানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আবার শিক্ষাপ্রসারের স্তর ও জীবনযাপন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীও জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করিয়া দেয়।

ইহা খুবই স্পষ্ট, জীবনযাত্রার মান অপরিবর্তিত থাকে না; সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সাধারণত ইহারও পরিবর্তন ঘটে। আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, জাপান প্রভৃতি উন্নত দেশে লোকদের জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু, কিন্তু ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশে অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রার মান খুবই নীচু। এই কারণে. এই সকল দেশে সরকারের অর্থনৈতিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। ভারতে উন্নয়ন-পরিকল্পনাসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

—০—

২

॥ উৎপাদন ও ইহার উপাদানসমূহ ॥

(Production and its Agents)

[উৎপাদন কথাটির অর্থ—উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ—উৎপাদনের উপাদান ও উহার শ্রেণীবিভাগ]

১. 'উৎপাদন' কথাটির অর্থ (Meaning of the term 'Productiion') ঃ

মানুষ ভোগের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নানারূপ অর্থনৈতিক কার্যকলাপ দ্বারা বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যাদি ও সেবামূলক কার্য উৎপাদন করে। প্রকৃতি হইতে বিনামূল্যে যে-সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায় (যেমন—আলো, বাতাস ইত্যাদি), সেইগুলি অভাব-মোচনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সেইজন্য প্রয়োজন পড়ে উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রীর। এখন দেখা যাউক, 'উৎপাদন' বলিতে কি বুঝায় ?

প্রাচীন লেখকদের মতে, বস্তুগত (material) দ্রব্যের সৃষ্টিকে উৎপাদন বলা হইবে। এই অর্থে চেয়ার তৈয়ারি বা জুতা তৈয়ারি বা বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি উৎপাদনের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক, কারণ মানুষ কোন পদার্থ (matter) তৈয়ারি করিতে পারে না। কোন কাঠের মিস্ত্রী যখন গাছের কাঠ দিয়া চেয়ার বা টেবিল তৈয়ারি করে, তখন সে কাঠ তৈয়ারী করে না, শুধু কাঠের রূপগত পরিবর্তন ঘটায়। উৎপাদনের এই সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রাচীন লেখকেরা উৎপাদনশীল (productive) ও অনুৎপাদনশীল (unproductive) শ্রমের মধ্যে যে পার্থক্য করিয়াছিলেন, তাহাও ভ্রান্তিমূলক। তাঁহাদের মতে, যে-সকল শ্রমিক কোন বস্তুগত দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহাদের শ্রমকে উৎপাদনশীল ধরা হইবে। কিন্তু যে-সকল শ্রমিক ঐরূপ বস্তুগত দ্রব্য উৎপাদন করে না, তাদের শ্রম হইবে অনুৎপাদন-শীল। এই ধারণা অনুযায়ী কারখানার শ্রমিক, কৃষক, দর্জি, কাঠের মিস্ত্রি, স্বর্ণকার মুচি ইত্যাদি ব্যক্তির শ্রম হইতেছে উৎপাদনশীল ; কারণ, তাহারা শ্রমের দ্বারা কোন-না-কোন বস্তুগত দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে। কিন্তু শিক্ষক, ডাক্তার, গায়ক, কর্মচারী ইত্যাদি ব্যক্তির শ্রম বা সেবাকার্য (services) হইতেছে অনুৎপাদনশীল ; কারণ, তাহারা শ্রমের দ্বারা কোন বস্তুগত দ্রব্য উৎপাদন করে না।

কিন্তু আধুনিক লেখকদের মতে, উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল শ্রমের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। তাঁহাদের মতে, যে-শ্রম কোন উপযোগ সৃষ্টি করে, তাহাই উৎপাদনশীল। এই অর্থে কৃষক বা শ্রমিকের শ্রম যেরূপ উৎপাদন-শীল। শিক্ষক বা কর্মচারীর শ্রমও সেইরূপ উৎপাদনশীল। কারণ, তাহাদের শ্রম মানুদের নিকট কোন-না-কোন উপযোগ সৃষ্টি করে। সুতরাং, যে-শ্রম কোন উপযোগ সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহাই অনুৎপাদনশীল।

ইহা হইতে দেখা যায়, অর্থবিদ্যায় উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে। উপযোগ-সৃষ্টি বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে ; যেমন—রূপান্তর উপযোগ বা স্থানগত উপযোগ বা কালান্তর উপযোগ বা আকারগত উপযোগ। দর্জি কাপড় হইতে পোশাক তৈয়ারি করে এবং ঐ পোশাক হইতে উপযোগ পাওয়া যায়। সুতরাং, দর্জির কাজকে উৎপাদনের পর্যায়ে ফেলা হয়। অনুরূপভাবে কৃষক জমিতে কৃষিপণ্য উৎপাদন করে, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান মানুষের অভাব পূরণের জন্য দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, আইনজীবী আমাদের আইন-সংক্রান্ত উপদেশ দিয়া উপযোগ সৃষ্টি করে—ইহা সকলই উৎপাদনের কাজ। কিন্তু সকল প্রকার উপযোগ-সৃষ্টিকেই উৎপাদনের পর্যায়ে ফেলা যায় না। কতকগুলি কার্য আছে, যেগুলির মূল্য পরিমাপ করা খুবই শক্ত বা যেগুলি সাধারণ লেনদেনের মধ্যে ধরা হয় না—সেইসকল কাজকে দেশের মোট উৎপাদন হইতে বাদ দেওয়া হয়। যেমন—বাড়িতে গৃহবধূর পারিবারিক কাজ বা নিজের বাগানে নিজের ভোগের জন্য তরি-তরকারি উৎপাদন। মোট উৎপাদন হইতে ঐগুলি বাদ দিলে সুবিধা হয়, কারণ উহাদের মোট পরিমাণ হিসাব করা শক্ত কাজ। সুতরাং, বিক্রয়ের জন্য দ্রব্যাদি সৃষ্টি বা পারিশ্রমিকযুক্ত কার্য ("the making of goods for sale or the rendering of paid services") সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলা হইবে।

উৎপাদন সম্পর্কে অধ্যাপক হিক্‌স (Hicks)-ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। তাঁহার মতে, বিনিময়ের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির অভাব-পূরণের জন্য যে কার্যকলাপ সংগঠিত হয়, তাহাই হইতেছে উৎপাদন ("any activity directed to the satisfaction of other people's wants through exchange.")। এই অর্থে তিন প্রকার কার্যকলাপ উৎপাদন হইতে বাদ পড়েঃ (ক) গৃহবধূর বা পরিবারের অন্য কোন ব্যক্তির গৃহস্থালী কার্যকলাপ, (খ) পরিবারের প্রত্যক্ষ ভোগের জন্য ফলমূল, তরিতরকারী ইত্যাদি উৎপাদন এবং (গ) সমাজের কোনরূপ স্বেচ্ছামূলক (voluntary) বা কর্তব্য প্রণোদিত কার্যকলাপ।

উৎপাদনের আর একটি দিক হইতেছে, ভোগকারীর নিকট যতক্ষণ পর্যন্ত দ্রব্যাদি না পেঁছায়, ততক্ষণ উৎপাদনের কাজ সম্পূর্ণ হয় না। যে লরিচালক কারখানা হইতে দোকানে দ্রব্যাদি বহন করিয়া লইয়া যায়, যে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী ক্রেতার নিকট দ্রব্যাদি পেঁছাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করে এবং যে বীমা-কোম্পানী দ্রব্যাদি পাঠানোর জন্য বীমার ব্যবস্থা করিয়া দেয়—তাহারা প্রত্যেকেই উৎপাদনের কাজ করে এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই কাজ উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অংশ।

এই অর্থে বাজারে বিক্রয়ের জন্য উৎপাদিত কৃষি-পণ্য (যেমন—ধান, চাল, গম, তৈলবীজ ইত্যাদি) ও শিল্প-পণ্য (যেমন—সাবান, ভোজ্য তৈল, রেডিও, যন্ত্রপাতি)

---

১. Cairncross—*Introduction to Economics*

২. Hicks—*Social Framework*

তৈয়ারীর কাজ, উৎপাদনের পর্যায়ে পড়ে। অনুরূপভাবে, ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষক, পরিবহন-কর্মী, কৃষি-শ্রমিক, দোকানদার, পেশাদারী খেলোয়াড়, চিত্রতারকা, অফিস-কর্মচারী, ঝাড়ুদার প্রভৃতির পারিশ্রমিক-যুক্ত সেবাকার্যও উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

উৎপাদন ও ভোগ-কর্ম ঃ উৎপাদন ও ভোগ-কর্মের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। ইহারা একে অপরকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। বলা হয়, ব্যবহারের দিক হইতে উৎপাদনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হইতেছে ভোগ-কর্ম, অর্থাৎ ভোগ-কর্ম সম্পন্ন করার জন্য নানারূপ দ্রব্যাদি ও সেবাকার্য উৎপাদন করা হয়; যেমন,—খাদ্যদ্রব্য ভোগের জন্য ধান, গম, বাজরা, জোয়ার ইত্যাদি কৃষিপণ্য উৎপাদন করা হয়, পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য তুলাবস্ত্র, পশমবস্ত্র ইত্যাদি তৈয়ারি করা হয়, চিকিৎসার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ডাক্তারের সেবাকার্য সৃষ্টি হয়, লেখার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কলম তৈয়ারি করা হয় ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, নূতন নূতন দ্রব্যাদি উৎপাদনের ফলে মানুষকে নূতন নূতন দ্রব্যের ভোগ-কর্মে প্রবৃত্তি করে। যেমন—টেপ-রেকর্ডার, টেলিভিশন, ভিডিও-সেট্ ইত্যাদি তৈয়ারী হওয়ার ফলে উহাদের ভোগের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। সুতরাং দেখা যায়, উৎপাদন ও ভোগকর্ম উভয়ই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

২. উৎপাদনের পরিমাণ-নির্ধারণকারী বিষয় (Factors determining the volume of Production) ঃ

উৎপাদনের পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে; অবশ্য এই বিষয়গুলি বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশে অথবা উন্নত ও অনুন্নত দেশে এই বিষয়গুলি একই রূপ হইতে পারে না, অবস্থার তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন অর্থব্যবস্থায় বা বিভিন্ন দেশে এই বিষয়গুলি বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে। বিষয়গুলির এইরূপ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি সাধারণ বিষয় আছে, যাহা সকল দেশে বা সকল অর্থব্যবস্থায় প্রযোজ্য। উৎপাদনের পরিমাণ-নির্ধারণকারী সাধারণ উপাদানগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল ঃ

ক। মানুষের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার বহির্ভূত উপাদান সমূহ ঃ উৎপাদনের মোট পরিমাণ এমন কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যাহার উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বিশেষ থাকে না। যেমন—অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প বা বন্যার ন্যায় প্রাকৃতিক বিপত্তির ফলে দেশের মোট উৎপাদন হ্রাস পাইয়া থাকে, অথবা অনুকূল আবহাওয়া দেশের উৎপাদন, বিশেষত কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ভারতেও কৃষি-উৎপাদনের উপর প্রকৃতির (Nature) এইরূপ প্রভাব বিশেষভাব লক্ষণীয়, ভারতে অনুকূল আবহাওয়ার জন্য কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য ঐ উৎপাদন হ্রাস পায়। ইহা ছাড়া, যুদ্ধ, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি কারণও উৎপাদন হ্রাস করে। অবশ্য শেষোক্ত উপাদানগুলির উপর মানুষের কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নাই এইরূপ বলিলে তাহা যথাযথ হইবে না।

খ। জনসমাজ ও পরিবেশ ঃ উৎপাদনের পরিমাণ দেশের জন-সমাজ এবং যে পরিবেশের মধ্যে তাহারা বসবাস করে, তাহার উপরও নির্ভর করে। দেশের লোকেরা পরিশ্রমী, উদ্যোগী ও কর্মকুশলী হইলে স্বভাবতই উৎপাদনের পরিমাণ অধিক হইবে। তাছাড়া, দেশের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ, ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু, মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদনশীলতা, পরিবহণের সুযোগ-সুবিধা ও শক্তির সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়গুলির উপরও দেশের উৎপাদন নির্ভর করে। এই বিষয়গুলি কোন দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলে এবং দেশের লোকেদের উৎপাদন-ক্ষমতা উচ্চ মানের হইলে স্বভাবতই উৎপাদনের পরিমাণ অধিক হইবে। তদুপরি অধিক উৎপাদনের জন্য যে সকল অন্তর্কাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা (infra-structural facilities) প্রয়োজন, যেমন—উন্নত পরিবহণ, মূলধন প্রাপ্তির সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক মূলধন-সম্পত্তির উচ্চ মানের দক্ষতা ইত্যাদি—এইগুলি দেশের অভ্যন্তরে অধিক পরিমাণে পাওয়া গেলে উৎপাদনের পরিমাণও অধিক হয়।

গ। অন্যান্য বিষয় ঃ উৎপাদনের পরিমাণ আরও কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন—জনসংখ্যার পরিমাণ, উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষায়ণের মাত্রা ও প্রয়োগ-কৌশলের ধরন, উৎপাদন-পদ্ধতি, ব্যবহারের ব্যাপকতা, বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা, সরকারী প্রশাসনিক দক্ষতা ইত্যাদি।

উৎপাদন-বৃদ্ধির উপাদানগুলি আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, জাপান, সোভিয়েত ইউনিয়ন ইত্যাদি উন্নত দেশে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া, ঐ সকল দেশে ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় মোট উৎপাদন বেশি হয়। অবশ্য অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতেও উৎপাদন-বৃদ্ধির সুযোগ-সুবিধা ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়। ফলে, এই সকল দেশেও কিছুকাল পরে উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

৩. উৎপাদনের উপাদানসমূহ এবং ইহার শ্রেণীবিভাগ (Factors of Production and its Classification) ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, কোন দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদনের জন্য কতকগুলি উপাদানের প্রয়োজন পড়ে। এখন দেখা যাউক, ঐ উপাদানগুলি কি? যে-সকল উপকরণ কোন দ্রব্য উৎপাদন বা কোন কাজ-সৃষ্টির ব্যাপারে সাহায্য করে, উহাদিগকে উৎপাদনের উপাদান (agents of production) বলে। অর্থাৎ যে-কোন উপকরণ দ্রব্য-উৎপাদনে সাহায্য করে, সেই-গুলিকে উৎপাদনের উপাদান বলা হইবে। প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদনের মধ্যে উপাদানগুলি প্রবেশ করে না, প্রবেশ করে উহাদের সেবাসমূহ। উপাদানগুলির যে-সেবাসমূহ উৎপাদনের মধ্যে প্রবেশ করে, উহাদিগকে উৎপাদনকারক বা ইনপুট্স (inputs) বলা হয়।

উৎপাদনের উপাদানগুলিকে মোটামুটি চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—জমি

বা ভূমি (land), শ্রম (labour), মূলধন বা পুঁজি (capital) ও সংগঠন (organization) ঃ
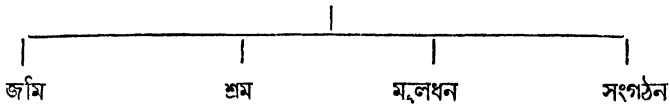
যে সকল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য বা উপাদান উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়, উহাদিগকে ‘জমি’ বলিয়া গণ্য করা হয়। এই অর্থে ভূখন্ড, খনি, বনভূমি, মৎস্য ধরার জলাশয়, গোচারণ ভূমি ইত্যাদি জমির অন্তর্গত। কিন্তু কতকগুলি প্রাকৃতিক উপাদান আছে, যেগুলি মানুষ ধরিয়া রাখিতে পারে না (যেমন—সূর্যের কিরণ, জলবায়ু ইত্যাদি), সেইগুলি জমি বলিয়া ধরা হয় না। ‘শ্রম’ বলিতে অর্থবিদ্যায় সকল প্রকার শ্রমকেই বুঝায়। শারীরিক বা মানসিক বা বুদ্ধিজাত বা দক্ষ বা অদক্ষ শ্রম উৎপাদনের কার্যে নিযুক্ত থাকিলে তাহা শ্রমের মধ্যে যুক্ত হইবে। সুতরাং, খনি-শ্রমিক বা রিক্সা-চালকের শারীরিক প্রচেষ্টা যেমন শ্রম হইবে, তেমনি ডাক্তার বা শিক্ষকের বুদ্ধিজাত প্রচেষ্টাও শ্রমরূপে গণ্য করা হইবে। ‘মূলধন’ বলিতে মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত বস্তুর যেগুলি পুনরায় উৎপাদনের কার্যে (produced means of production) ব্যবহৃত হয়, সেইগুলিকে বুঝায় ; যেমন—কাঁচামাল, ট্রাক্টর, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধন বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহা ছাড়া, ব্যবসায়ে নিয়োজিত টাকাকড়িও মূলধন রূপে ধরা হয় এবং উহাকে অর্থ-মূলধন (money capital) বলিয়া অভিহিত করা হয়। সংগঠন বলিতে জমি, শ্রম ও মূলধনের মধ্যে সমন্বয়-সাধন বা সংযোগ-স্থাপনের কাজকে বুঝায়। শুধু জমি, শ্রম ও মূলধন—কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে না ; ঐগুলিকে একত্র করিয়া উহাদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করিতে হয় এবং ঐ কাজকেই সংগঠন বলা হয়। সংগঠনের কাজ যে-ব্যক্তি সম্পন্ন করে, তাহাকে সংগঠনকারী বা বা উদ্যোক্তা (organizer or entrepreneur) বলে। যেমন—ছোট ছোট ব্যবসায়ের মালিক-পরিচালক, বড় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের শিল্পপতি ইত্যাদি।

পুরাতনকালের লেখকরা উৎপাদনের প্রথম তিনটি উপাদান উল্লেখ করিতেন। তাঁহাদের মতে, জমি, শ্রম ও মূলধন—এই তিনটিই হইতেছে উৎপাদনের উপাদান। কিন্তু মার্শাল প্রমুখ লেখকরা সংগঠনকে উৎপাদনের চতুর্থ উপাদান বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। পুরাতন লেখকরা সংগঠনকে শ্রমের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদের মতে, উপাদানগুলির মধ্যে সংযোগস্থাপন ও সমন্বয়সাধন করাই সংগঠনের মূল কাজ। কিন্তু শ্রমিককেও অন্য উপাদানের সঙ্গে সহযোগিতা ও সমন্বয়সাধন করিয়া কাজ করিতে হয়। আবার, সংগঠনকারী যেমন উৎপাদনের ঝুঁকি গ্রহণ করে, শ্রমিককেও সেইরূপ কারখানায় নানারূপ বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি লইয়া ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া কাজ করিতে হয়। সুতরাং, শ্রমিক ও সংগঠনকারী—এই দুইয়ের মধ্যে কোনরূপ মৌলিক পার্থক্য নাই।

উপরি-উক্ত যুক্তিগুলির সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না। যুক্তিগুলি গ্রহণ করিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বলা যায়, চূড়ান্তভাবে উৎপাদনের উপাদান হইতেছে দুই শ্রেণীর ঃ যেমন—'প্রকৃতি' (Nature) এবং 'মানুষ' (Man)। জমি 'প্রকৃতির' পর্যায়ে পড়ে এবং শ্রম 'মানুষ' উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। মূলধন হইতেছে মানুষের শ্রম দ্বারা প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের রূপান্তর। অর্থাৎ, শ্রমিকরা প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ব্যবহার করিয়া মূলধন উৎপাদন করে। সুতরাং, মূলধন 'প্রকৃতি' বা 'মানুষ'—যে-কোন শ্রেণীতেই পড়ে। সংগঠন—মানুষের এক ধরনের শ্রম ; সুতরাং ইহা 'মানুষ' উপাদানের মধ্যে পড়িবে। কৃষির ক্ষেত্রে মানবিক উপাদানগুলির (শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) তুলনায় প্রাকৃতিক উপাদানের (জমি) গুরুত্ব অধিক। পক্ষান্তরে, শিল্পের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপাদানের তুলনায় মানবিক উপাদান-সমূহের গুরুত্ব বেশী দেখা যায়। কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য উপাদানসমূহকে চার শ্রেণীতে ভাগ করিয়া বিশ্লেষণ করিতে হয়। এইরূপ শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনও আছে। কারণ প্রত্যেক উপাদানের পারিশ্রমিকের প্রকৃতি কিছুটা পৃথক হইয়া থাকে। সুতরাং, এই চারটি উপাদান সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে উহা আলোচনা করা হইবে।

বিকল্প শ্রেণীবিভাগ ঃ আধুনিককালের কোন কোন লেখক উৎপাদনের উপাদান-সমূহকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন ঃ (ক) সুনির্দিষ্ট উপাদানসমূহ (specific factors) ও (খ) অনির্দিষ্ট উপাদানসমূহ (non-specific factors)—
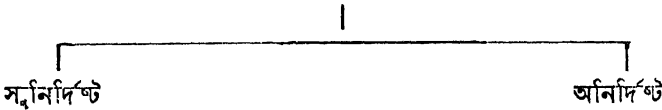
বিশেষীকৃত (specialized) উপাদানগুলিকে সুনির্দিষ্ট উপাদান বলা হয়। এই ধরনের উপাদান শুধুমাত্র কোন বিশেষ কাজেই ব্যবহার করা যায় ; যেমন—চক্ষু-বিশেষজ্ঞ, কারখানার চুল্লী, টাইপ্‌রাইটার যন্ত্র, চিকিৎসকের স্টেথোস্‌কোপ, জমির সার ইত্যাদি। এই সকল উপাদান সচল (mobile) হয় না। পক্ষান্তরে, যে-সকল উপাদান বিশেষীকৃত না হওয়ায় উৎপাদনের বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করা যায়, তাহাদিগকে অনির্দিষ্ট উপাদান বলে। যেমন—হাতুড়ি, অদক্ষ শ্রমিক, ইস্পাত, প্লাস্টিক্‌স ইত্যাদি এই উপাদানগুলি সচল হইয়া থাকে।

৩

॥ জমি ॥
(Land)

[জমি ও উহার গুরুত্ব—জমির বৈশিষ্ট্য—জমির উৎপাদিকা-শক্তি—প্রগাঢ় চাষ ও ব্যাপক চাষ—ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন বিধি]

১. জমি ও ইহার গুরুত্ব (Land and its importance) :

সাধারণ অর্থে 'জমি' বলিতে ভূত্বক বা মৃত্তিকাকেই বুঝায়। কিন্তু অর্থবিদ্যায় ইহা অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতির যে-সকল দান উৎপাদনের কার্যে ব্যবহার করা যায়, উহাদের সকলকে অর্থবিদ্যায় 'জমি' বলিয়া ধরা হয়। এই অর্থে চাষযোগ্য ভূমি, মাছ ধরার খাল-বিল, প্রাকৃতিক গ্যাস, অরণ্যের কাঠ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদিও জমি ; আবার আলো-বাতাস, বৃষ্টি ইত্যাদি প্রকৃতির দান উৎপাদনের কার্যে ব্যবহার করা হয় বলিয়া ঐগুলিকেও 'জমি' বলিয়া ধরা হইবে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মার্শালের ভাষায় বলা যায়, যে-সকল শক্তি ও সম্পদ প্রকৃতি মানুষের সাহায্যার্থে জল, স্থল, বায়ু, আলোক ও উত্তাপের মাধ্যমে মুক্তভাবেই দান করে, তাহাই হইতেছে জমি। সংকীর্ণ অর্থে জমি বলিতে শুধু ভূমিকেই ধরা হয়, মানুষের নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানায় নাই এইরূপ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, যেমন—সূর্যালোক, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি জমির মধ্যে ধরা হয় না।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপাদান হিসাবে জমির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, জমি ব্যতীত উৎপাদন-কার্য বিশেষত কৃষি ও খনিজ উৎপাদন সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তবে শিল্পপ্রধান দেশে জমির গুরুত্ব বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। শিল্পবিপ্লবের পূর্ববর্তী কালে ব্রিটেনে মোট শ্রমজীবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল থাকিত, কিন্তু বর্তমানে উহার পরিমাণ হইয়াছে মাত্র ২-৩ শতাংশ। কিন্তু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে জমির গুরুত্ব এখনও হ্রাস পায় নাই, কারণ ভারতে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৫-৭০ শতাংশ এখনও কৃষির উপর নির্ভরশীল। তবে শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে উৎপাদনের উপাদান হিসাবে জমির গুরুত্ব যে হ্রাস পাইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। কারণ, শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে জমি অপেক্ষা মূলধন বা শ্রমের প্রাধান্যই বেশী।

২. জমির বৈশিষ্ট্য (Characteristics or Peculiarities of Land) :

জমির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে এবং ঐ বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যই জমি অন্যান্য উপাদান হইতে স্বতন্ত্র। জমির বৈশিষ্ট্যগলি নিম্নরূপ :

ক। জমি হইতেছে প্রকৃতির দান (gift of nature) ; মানুষ জমি সৃষ্টি করে নাই। সুতরাং, জমি উৎপাদন করিতে আমাদের কোন ব্যয় হয় নাই। কিন্তু মূলধন মানুষ উৎপাদন করে, সুতরাং মূলধনের উৎপাদন-ব্যয় আছে। কিন্তু ইহা পুরাপুরি

ঠিক নহে। কারণ, কোন জমিকে চাষযোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য কিছু পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হয়। জমির উপর হইতে জংগল পরিষ্কারের জন্য বা শক্ত জমিকে নরম করিবার জন্য উহা ব্যয় হয়। অবশ্য জমির কতকগুলি দিকের উপর, যেমন—জলবায়ু বা অবস্থান—মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। এই অর্থে জমি অন্যান্য উপাদান হইতে স্বতন্ত্র।

খ। জমি প্রকৃতির দান বলিয়া কোন দেশে যে-পরিমাণ জমি থাকে উহা সীমাবদ্ধ অর্থাৎ জমির যোগান (supply) বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। মূলধনের যোগান বাড়ানো যায় ও শ্রমের যোগানও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু, জমির যোগান বৃদ্ধি পায় না। অবশ্য ইহা সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে। কারণ, অর্থবিদ্যায় জমি বলিতে ব্যবহারযোগ্য জমিকেই বুঝায়। কর্দমাক্ত জমি ভরাট করিয়া উহা ব্যবহার করা যায় বা অনুর্বর জমিতে সার প্রয়োগ করিয়া জমির উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় বা সমুদ্রের ধারে জলের উপর বাঁধ দিয়া ব্যবহারযোগ্য জমির আয়তন প্রসারিত করা যায়। সুতরাং দেখা যায়, জমির যোগান পুরোপুরি সীমাবদ্ধ নয়।

গ। জমি স্থানান্তর করা যায় না, অর্থাৎ, কোন একখণ্ড জমিকে এক জায়গা হইতে অন্যত্র স্থানান্তর করা সম্ভব হয় না। কিন্তু মূলধন বা শ্রম স্থানান্তর করা যায়।

ঘ। সকল জমির সমজাতীয় নহে। দুই খণ্ড জমি কদাচিৎ একই ধরনের হয়। বিভিন্ন জমি উৎপাদিকা-শক্তি ও অবস্থান বিভিন্ন রূপ। কিন্তু সমজাতীয় মূলধন-সামগ্রী অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা যায়।

ঙ। অর্থবিদ্যায় জমির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে, জমির উৎপাদনের ক্ষেত্রে 'ক্রম-হ্রাসমান উৎপন্ন-বিধি' (Law of Diminishing Returns) কার্যকর হয়। জমির যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়া জমি হইতে অধিক ফসল পাওয়ার জন্য কোন একটি নির্দিষ্ট জমিতে অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিতে হয়। কিন্তু কৃষকের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়, কোন জমিতে যে-হারে শ্রম ও মূলধন বাড়ানো হয়, তাহা অপেক্ষা কম হারে মোট ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইহাই ক্রম-হ্রাসমান উৎপন্ন-বিধি। এই বিধিটি পরে বিস্তারিত আলোচিত হইবে।

৩. জমির উৎপাদিকা-শক্তি (Productivity of Land) ঃ

জমির উৎপাদিকা-শক্তি বলিতে জমির উর্বরতাকেই বুঝায়। জমি প্রকৃতির দান বলিয়া বিভিন্ন জমির বিভিন্ন রূপ উৎপাদিকা-শক্তি দেখা যায়। কোন কোন জমি খুবই উর্বর এবং উহা হইতে স্বল্পব্যয়ে অধিক ফসল ফলানো সম্ভব হয়। কোন কোন জমির উৎপাদিকা-শক্তি বেশীও নয়, কমও নয়। আবার কোন কোন জমির উৎপাদিকা-শক্তি খুবই কম, নাই বলিলেই চলে। সাধারণত, মৃত্তিকার গুণগত মান, জমির অবস্থান, জলবায়ু ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর জমির উৎপাদিকা-শক্তি নির্ভর করে। প্রখ্যাত অর্থবিদ রিকার্ডো (Ricardo)-এর মত—জমির উৎপাদিকা-শক্তি মৌলিক ও

অবিনশ্বর (original and indestructible) এবং বিভিন্ন জমির উৎপাদিকা-শক্তি বিভিন্ন রূপ। এই কারণে নিম্ন মানের জমি অপেক্ষা উচ্চ মানের জমিতে আয় ও উৎপাদকের উদ্বৃত্ত (producer's surplus) বেশী হয়।

কিন্তু জমির উৎপাদিকা-শক্তি অবিনশ্বর, ইহা সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। কারণ, একই জমিতে বৎসরের পর বৎসর সার প্রয়োগ না করিয়া চাষবাসের ব্যবস্থা করা হইলে উহার উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাস পায়, এইরূপ দেখা যায়। অবশ্য উন্নত ধরনের চাষপদ্ধতি প্রয়োগ, বৈজ্ঞানিক সার ব্যবহার, জলসেচের সুযোগ-সুবিধা প্রসার ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপাদিকা-শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা যায়। ভারতেও এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৪. **প্রগাঢ় চাষ ও ব্যাপক চাষ (Intensive and Extensive Cultivation) :** জমি হইতে ফসলের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে, হয় কর্ষিত জমি আরও গভীরভাবে চাষ করিতে হয়, নতুবা নতুন জমি চাষ করিতে হয়। অধিক পরিশ্রমে অথবা বেশী সার দিয়া কর্ষিত জমি গভীরভাবে চাষ করাকে প্রগাঢ় চাষ (intensive cultivation) বলা হয়। এই প্রকার চাষ-ব্যবস্থায় জমি ভালোভাবে চাষ করিয়া ও তাহাতে ভালো সার মিশ্রিত করিয়া এবং জলসেচের সুব্যবস্থা করিয়া জমিটি আরও গভীরভাবে চাষ করা হয়। ইহাতে ফসল নিশ্চয় বাড়িবে। আবার, কর্ষিত জমি গভীরভাবে চাষ না করিয়া নতুন নতুন জমিতে চাষের ব্যবস্থা করা হইলে উহাকে ব্যাপক চাষ (extensive cultivation) বলা হইবে। যে—সকল দেশে জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ এবং লোকসংখ্যা অত্যধিক (যেমন—ভারতে), সেই সকল দেশে প্রগাঢ় চাষ অনুশীলন করা হয়। কিন্তু যে-সকল দেশে জনসংখ্যা কম, মাথাপিছু জমির পরিমাণ অনেক বেশী (যেমন—অস্ট্রেলিয়া বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), সেখানে নতুন নতুন জমিতে চাষ করিয়া ফসল-বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। উভয়প্রকার চাষের ক্ষেত্রেই ক্রম-হ্রাসমান উৎপন্ন-বিধিটি কার্যকর হয়।

৫. **ক্রম-হ্রাসমান উৎপন্ন-বিধি (Law of Diminishing Returns) :**

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, জমির উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রম-হ্রাসমান উৎপন্ন-বিধি কার্যকর হয়। এখন দেখা যাউক, এই বিধিটি কি ? অধ্যাপক মার্শাল এই বিধিটির একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়াছেন : জমিতে কৃষিকার্যের জন্য শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বৃদ্ধি করিলে, 'সাধারণত' উৎপাদন-বৃদ্ধির পরিমাণ সমানুপাত বৃদ্ধি অপেক্ষা কম হইবে—অবশ্য ইতিমধ্যে যদি-না কৃষির পদ্ধতিতে কোন উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। (An increase in the capital and labour applied in the cultivation of land causes, in general, a less than proportionate increase in the amount of produce raised, unless it happens to coincide with the improvement in the art of agriculture—*Marshall*)। বিধিটিতে বলা হয়, কোন জমিতে অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হইলে মোট

উৎপন্ন ফসল সমানুপাতিক হারে না বাড়িয়া উহা অপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধি পাইবে। এই বিষয়টি কৃষকরা তাহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছে। একটি উদাহরণের দ্বারা বিধিটি বুঝানো হইল ঃ

জমি	শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক বা অতিরিক্ত উৎপাদন
১ হেক্টর	১ একক	১০ কুইণ্টাল	—
,, ,,	২ ,,	২২ ,,	১২ কুইণ্টাল
,, ,,	৩ ,,	২৮ ,,	৬ ,,
,, ,,	৪ ,,	৩২ ,,	৪ ,,
,, ,,	৫ ,,	৩৪ ,,	২ ,,

উপরের উদাহরণে দেখা যায়, কোন একজন কৃষক এক একক মূলধন অর্থাৎ একটি লাঙল ও এক জোড়া বলদ দ্বারা ১ হেক্টর জমিতে ১০ কুইণ্টাল ধান উৎপাদন করিল; দ্বিতীয় বারে জমির পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া ২ একক শ্রম ও ২ একক মূলধন নিয়োগ করা হইলে মোট উৎপন্ন শস্য হইতেছে ২২ কুইণ্টাল অর্থাৎ উৎপাদন দ্বিগুণ অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদনের গোড়ার দিকে এইরূপ হইতে পারে, কারণ ১ একক শ্রম ও ১ একক মূলধন দিয়া জমিটি হয়ত সুষ্ঠুভাবে চাষ করা সম্ভব হয় নাই। তাই দ্বিতীয়বারে উৎপন্ন শস্য দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক হইল। কিন্তু তৃতীয় বারে ৩ একক শ্রম ও ৩ একক মূলধন নিয়োগ করিয়া জমিটি চাষ করা হইলে মোট উৎপন্ন শস্য হইতেছে মাত্র ২৮ কুইণ্টাল। সুতরাং, অতিরিক্ত ১ একক শ্রম ও ১ একক মূলধন নিয়োগের ফলে অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপন্ন শস্য হইতেছে মাত্র ৬ কুইণ্টাল। চতুর্থ বারে অতিরিক্ত উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হয় ৪ কুইণ্টাল এবং পঞ্চম বারে হয় ২ কুইণ্টাল। সুতরাং দেখা যায়, একই জমিতে অতিরিক্ত পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হইলে, অর্থাৎ, অর্থাৎ প্রগাঢ় চাষের (intensive cultivation) ব্যবস্থা করা হইলে অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপন্ন শস্য ক্রমশ হ্রাস পায়। ব্যাপক চাষের (extensive cultivation) ক্ষেত্রেও এই বিধিটির কার্যকারিতা দেখানো যায়। ব্যাপক চাষের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে নতুন জমি চাষ করিতে হয়, কিন্তু নূতন জমির উৎপাদিক-শক্তি পূর্বেকার জমির উৎপাদিকা-শক্তি অপেক্ষা কম হইলে নূতন জমি হইতে একই খরচে কম ফসল পাওয়া যাইবে। এই বিধিটি পরপৃষ্ঠায় একটি রেখাচিত্র দ্বারা দেখানো যাইতে পারে ঃ

পরপৃষ্ঠার রেখাচিত্রে কখ রেখাটি দ্বারা অতিরিক্ত উৎপন্ন শস্য ও কগ রেখাটি দ্বারা কোন নির্দিষ্ট জমিতে নিয়োজিত শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ দেখানো হইতেছে। কজ পরিমাণ পর্যন্ত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করাহইলে অতিরিক্ত উৎপন্ন শস্য বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে অতিরিক্ত উৎপন্ন শস্য হ্রাস পায়। কপচ রেখাটি দ্বারা ইহা দেখানো হইল। ঐ রেখাটি কপ পর্যন্ত উপরের দিকে যায়, কারণ কজ পরিমাণ শ্রম ও মূলধন পর্যন্ত অতিরিক্ত উৎপন্ন শস্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উহার পরে অতিরিক্ত উৎপন্ন শস্য হ্রাস পায়; ইয়া নিম্নগামী পচ দ্বারা দেখানো হয়।
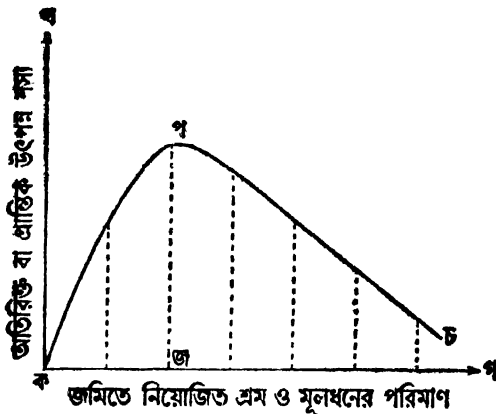
চিত্র-১

এই বিধিটির প্রমাণস্বরূপে দুইটি বিষয় উল্লেখ করা হয়। প্রথমত, এই বিধিটি কৃষকের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে আসিয়াছে। কৃষকেরা তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে দেখিতে পায়, অধিক ফসলের জন্য একই জমিতে অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পায়। দ্বিতীয়ত, এই বিধিটি কার্যকর না হইলে একই জমিতে অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে মোট উৎপন্ন শস্য সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাইত। ফলে একই জমিতে ক্রমাগত অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব হইত। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। স্মরণ রাখিতে হইবে, এই বিধিটি 'সাধারণত' কার্যকর অর্থাৎ কোন কোন অবস্থায় এই বিধিটির ব্যতিক্রম (limitations) দেখা যাইতে পারে। বিধিটির কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে ঃ

১. কোন এক নির্দিষ্ট জমিতেই অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে বিধিটি কার্যকর হইবে। কিন্তু জমির আয়তন বৃদ্ধি পাইলে, ইহা কার্যকর নাও হইতে পারে।

২. উৎপাদনের গোড়ার দিকে জমিটিতে যে-পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়, তাহা জমি-চাষের পক্ষে পর্যাপ্ত না হইলে এই 'বিধিটি কার্যকর হইবে না, পূর্ব-পৃষ্ঠার উদাহরণে ইহা দেখানো হইয়াছে।

৩. যখন জমিতে শ্রম ও মূলধন নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইতেছে, তখন কৃষির পদ্ধতিতে উন্নতি সাধন করা হইলে বিধিটি কার্যকর হইবে না, অর্থাৎ লাঙল ও বলদ দ্বারা চাষের পরিবর্তে ট্রাক্টর দ্বারা জমি চাষ করা হইলে, নিয়মটির ব্যতিক্রম দেখা দিবে। অবশ্য ট্রাক্টর দ্বারাও একই জমি ক্রমাগত চাষ করা হইলে অবশেষে এই বিধিটি কার্যকর হইবেই।

এই বিধিটি ক্রম-বর্ধমান ব্যয় বিধি (Law of Increasing Cost) নামেও পরিচিত। প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পায় বলিয়া কুইণ্টাল-প্রতি ধানের উৎপাদন-ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। পূর্বপৃষ্ঠার উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, সর্বপ্রথমে মোট ব্যয় হয় ২০০ টাকা এবং মোট উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ১০ কুইণ্টাল ধান ; সুতরাং, ১ কুইণ্টাল ধানের উৎপাদন-ব্যয় হয় (২০০ টাকা / ১০ =) ২০টাকা। দ্বিতীয় বারে মোট ব্যয় ৩০০ টাকা এবং উৎপাদন হয় ২২ কুইণ্টাল ধান , সুতরাং, গড় উৎপাদন-ব্যয় হইতেছে (৩০০ টাকা / ২২ =) ১৩ ৭/১১ টাকা। তৃতীয় বারে মোট ব্যয় হয় ৪০০ টাকা, মোট উৎপন্ন হয় ২৮ কুইণ্টাল ধান ; সুতরাং গড় উৎপাদন ব্যয় হয় (৪০০ টাকা / ২৮ =) ১৪ ২/৭ টাকা। চতুর্থ বারে মোট ব্যয় হয় ৫০০ টাকা এবং মোট উৎপন্ন হয় ৩২ কুইণ্টাল ধান ; সুতরাং, গড় ব্যয় হয় (৫০০ টাকা / ৩২ =) ১৫ ৫/৮ টাকা। ইহা হইতে দেখা যায়, দ্বিতীয় বারে গড় উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। কিন্তু, উহার পর হইতে গড় উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ বাড়িয়া যায়। এই কারণেই, ক্রম-হ্রাসমান বিধিটি ক্রম-বর্ধমান ব্যয় বিধি নামেও পরিচিত।

অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ : এই বিধিটি কৃষিকার্য ছাড়া খনির উৎপাদন বা মৎস্য-চাষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। কোন খনিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ খনিজ সম্পদ মজুত থাকে বলিয়া যতই খনির অভ্যন্তরে যাওয়া হয়, ততই ব্যয়ের তুলনায় খনিজ সম্পদ ক্রমশ কম পাওয়া যায়। আবার, কোন পুকুরে বা জলাশয়ে মাছের পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকে। এই কারণে, একই পুকুরে বা জলাশয়েজাল ও নৌকার সংখ্যা বাড়াইলেও ধৃত মাছের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় না। অতএব বলা যায়, যে-সকল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন একটি উপাদান স্থির থাকে, সেইখানেই সাধারণত এই বিধিটি কার্যকর হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে এই বিধিটির ক্রিয়াকলাপ রোধ করা যায়। কারণ, শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে সকল উপাদানই (যেমন—শ্রম বা মূলধন) পরিবর্তন করা যায় ; কিন্তু যদি ধরা হয়, শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন একটি উপাদান স্থির থাকে এবং অন্য উপাদানগুলি বৃদ্ধি পায়, তখন শিল্পের ক্ষেত্রেও এই বিধিটি কার্যকর হইবে। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে সাধারণত কৃষি-জমির ন্যায় কোন উপাদানই স্থির থাকে না, এই

কারণে শিল্পর ক্ষেত্রে এই বিধিটি কার্যকর না হইয়া সাধারণত ইহার বিপরীত বিধিটি অর্থাৎ ক্রম-বর্ধমান উৎপন্ন-বিধিটি (Law of Increasing Returns) কার্যকর হয়। অবশ্য আধুনিককালের লেখকরা উৎপাদনের প্রতিদান সম্পর্কে এই বিধিগুলির নূতন বিশ্লেষণ দিয়াছেন। উহা পরে ১৬ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

কৃষিজমির তুলনামূলক উৎপাদিকা-শক্তি[১]

চালের (ধান) হেক্টর প্রতি উৎপাদন		গমের হেক্টর প্রতি উৎপাদন	
জাপান	৫৬৩০ কি. গ্রা.	যুক্তরাষ্ট্র	২৩২০ কি গ্রা
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৫৪৬০ ,,	কানাডা	২০১০ ,,
ইন্দোনেশিয়া	৩৬৭০ ,,	চীন	১৯৫০ ,,
ভারত	২০৫০ ,,	ভারত	১৬৫০ ,,

৪

।। শ্রম ।।
(Labour)

[শ্রম ও ইহার বৈশিষ্ট্য—শ্রমের যোগান নির্ধারক—জনসংখ্যা সম্পর্কে তত্ত্বসমূহ—ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব—ভারতের ক্ষেত্রে তত্ত্ব-দুইটির প্রয়োগ—শ্রমবিভাগ—শিল্পের স্থানীয়করণ—উৎপাদনকার্যে যন্ত্রপাতির ব্যবহার ।]

জমির ন্যায় শ্রমও উৎপাদনের উপকরণগুলির মধ্যে একটি অন্যতম উপাদান। ইহার বৈশিষ্ট্য, যোগান, দক্ষতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

১. শ্রম ও ইহার বৈশিষ্ট্য (Labour and its peculiarities) :

শ্রম হইতেছে উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানবিক উপাদান। অর্থবিদ্যায় শ্রম বলিতে যে-শ্রম উৎপাদনের কার্যে ব্যবহৃত হয়, উহাকেই বুঝায়। ইহা শারীরিক বা বুদ্ধিগত শ্রম হইতে পারে; যেমন—কারখানার মজুররা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া উৎপাদনের কার্যে সাহায্য করে এবং ডাক্তার বা কর্মচারী ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করিয়া কাজ করে। আবার শ্রম—দক্ষ বা অদক্ষ, উভয়ই হইতে পারে।

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :

ক। মানবিক উপাদান : জমির সঙ্গে শ্রমের তুলনা করিলে দেখা যায়, শ্রম—মানবিক উপাদান, জমি—প্রাকৃতিক উপাদান। এই কারণে শ্রম-সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন বিবেচনা করিতে হইলে, কতকগুলি মানবিক নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়।

খ। মালিকানা অবিচ্ছিন্ন : শ্রমের মালিক হইতেছে শ্রমিক। কিন্তু শ্রমিক হইতে শ্রম বিচ্ছিন্ন করা যায় না। শ্রমিক শ্রমের যোগান দেয়, কিন্তু উহার মালিকানা নিজের নিকটই থাকে। মূলধন বা জমিকে উহাদের মালিক হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়, কিন্তু শ্রম শ্রমিকের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া শ্রমিক হইতে শ্রম বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

গ। শ্রমিকের উপস্থিতি : শ্রম-বিক্রয়ের সময়ে উৎপাদন-কেন্দ্রে শ্রমিকের উপস্থিতি প্রয়োজন। জমি বা মূলধন বিক্রয়ের সময় উহার মালিককে উৎপাদন-কেন্দ্রে সশরীরে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন পড়ে না। এই কারণে উৎপাদন-কেন্দ্রের পরিবেশ ও কাজের শর্ত শ্রমিকের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ। শ্রমের নশ্বরতা : শ্রম অবিনশ্বর নহে। শ্রমিকের শ্রম, সঞ্চয় বা মজুত করিয়া রাখা যায় না। শ্রমিক কোনদিন বেকার থাকিলে তাহার একদিনের শ্রম চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু জমি বা মূলধনের ক্ষেত্রে এই রূপ হয় না, কারণ উহা সঞ্চয় করিয়া রাখা যায়।

ঙ। শ্রমের সচলতা : জমি সচল (mobile) নহে, কিন্তু শ্রম সচল ; এমন-কি মূলধনের তুলনায় শ্রম অধিকতর সচল। কারণ, শ্রমিক কাজের জন্য সহজেই দেশের অভ্যন্তরে একস্থান হইতে অন্যত্র বা সামান্য চেষ্টায় এক কাজ হইতে অন্য কাজে যাইতে পারে। অবশ্য শ্রমের সচলতার পথেও ভাষাগত, ভৌগোলিক ইত্যাদি প্রতিবন্ধক থাকে।

চ। স্বল্প দর-কষাকষির ক্ষমতা : শ্রম নশ্বর বলিয়া এবং শ্রমিক তাহার শ্রমের যোগান বেশীকাল ধরিয়া রাখিতে পারে না বলিয়া শ্রমের ক্রেতার সঙ্গে তাহার দর-কষাকষির ক্ষমতা খুবই স্বল্পই হয়। ইহ ছাড়া, তাহার সঞ্চয় ও অর্থবল কম বলিয়া সে অনেক সময় স্বল্প মজুরিতেও কাজ করা লাভজনক বলিয়া মনে করে। তবে ইদানীংকালে শ্রমিক সংঘগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিকের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সচ্ছল ও সুরক্ষিত হইয়াছে।

ছ। শ্রমের যোগান পরিবর্তনের মন্থর গতি : শ্রমিকের যোগান ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা দীর্ঘদিনের প্রশিক্ষণের ফলে শ্রমিকের যোগান বাড়িতে পারে। আবার, শ্রমিকরা সহজেই কাজ ছাড়িয়া দিতে পারে না বলিয়া শ্রমের যোগান হ্রাস পাইতে সময় লাগে।

জ। উচ্চ মজুরি সত্ত্বেও শ্রমের যোগান হ্রাসের সম্ভাবনা : দাম বৃদ্ধি পাইলে সাধারণত দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মজুরি বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকগণ অধিক বিশ্রাম লাভের সুযোগ পায় এবং ইহার ফলে অনেক সময় শ্রমের যোগান হ্রাস পায়।

২. শ্রমের যোগান নির্ধারক : (Facrors determining the Supply of Labour) :

এখন দেখা যাউক, শ্রমের যোগান কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? শ্রমের যোগান বলিতে যে-পরিমাণ শ্রম দেশের উৎপাদন-কার্যে ব্যবহার করা হয়, তাহাকেই বুঝায়। শ্রমের যোগান নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে :

ক। দেশের মোট জনসংখ্যা : কোন দেশের মোট জনসংখ্যা অধিক হইলে শ্রমিকের যোগান অধিক হইবে এবং কম হইলে শ্রমিকের যোগানও কম হইবে। আমেরিকার তুলনায় ভারতে জনসংখ্যা অনেক বেশী। সুতরাং, আমেরিকা অপেক্ষা ভারতে শ্রমিকের যোগান অধিক। দেশের মোট জনসংখ্যা শ্রমিক যোগানের ঊর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণ করিয়া দেয়। কোন দেশের জনসংখ্যার আয়তন প্রধানত দুইটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়—(১) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং (২) স্থানান্তর-গমন (migration)। স্থানান্তর-গমন বলিতে বুঝায় এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমনাগমন। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অধিক হইলে স্বভাবতই সেই দেশে জনসংখ্যার পরিমাণ ও শ্রমিকের যোগান অধিক হইবে। আবার স্থানান্তর-গমনের ফলেও শ্রমিক যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

খ। কাজের বয়সের লোকসংখ্যা ঃ শ্রমের যোগান বাহির করিতে হইলে কর্মক্ষম ব্যক্তিদের সংখ্যা বাহির করিতে হয়। এইজন্য বৃদ্ধ ও শিশুদিগকে শ্রমের যোগান হইতে বাদ দেওয়া দরকার। ভারতে সাধারণত ১৫ বৎসর বয়স হইতে ৬০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদের কর্মক্ষম জনসংখ্যার মধ্যে ধরা হয়। দুইটি দেশের জনসংখ্যা একই পরিমাণ হইতে পারে ; কিন্তু বয়সের দিক হইতে জনসংখ্যার গঠন দুইটি দেশে বিভিন্ন রূপ হইতে পারে। যে-দেশে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক সেই দেশে শ্রমিকের যোগান কম হইবে ; আবার যে-দেশে যুবকদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক, সেই দেশে শ্রমিকের যোগান অধিক হইবে।

গ। দৈনিক কাজের সময়-মেয়াদ ঃ কাজের সময় বৃদ্ধি করিয়া শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি করা যায়। কাজের সময়ের তারতম্যের ফলে শ্রমিকের যোগানে তারতম্য ঘটিতে পারে। সাধারণভাবে বলা যায়, ২০ জন লোক ৪০ ঘণ্টা খাটিয়া যে-পরিমাণ শ্রমের যোগান দিবে, ৪০ জন লোক ২০ ঘণ্টা খাটিয়া সেই পরিমাণ শ্রমের যোগান দিতে পারে। কিন্তু আধুনিক কালে শ্রমকল্যাণ প্রসারের জন্য প্রত্যেক দেশেই মোটামুটি দৈনিক আট ঘণ্টা করিয়া কাজের সময়-মেয়াদ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঘ। শ্রমিকের দক্ষতা ঃ শ্রমিকের যোগান বাহির করিতে হইলে, শ্রমিকের দক্ষতা (efficiency of labour) নির্ধারণ করিতে হয় ; ইহা হইতেছে শ্রম-যোগানের গুণগত দিক। কোন একজন শ্রমিক কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে যতখানি দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে, তাহা দ্বারা ঐ শ্রমিকটির দক্ষতার পরিমাপ করা হয়। আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন, কানাডা ইত্যাদি উন্নত দেশগুলিতে শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের শ্রমিকদের দক্ষতা অপেক্ষা অনেক বেশী। এই বিষয়টি পরবর্তী অংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

৩. **শ্রমিকের দক্ষতা (Efficiency of Labour) ঃ** শ্রমিকের দক্ষতা বলিতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বা কার্য সম্পাদন করার ক্ষমতাকেই বুঝায়। সাধারণভাবে বলা হয়, গ্রেট ব্রিটেন, জাপান, জার্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশে সাধারণ শ্রমিকের মাথাপিছু উৎপাদন অনেক কম। শ্রমিকের দক্ষতা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, উহা নির্ভর করে, শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতা ও কাজ করার ইচ্ছার উপর। আবার ঐ বিষয়-দুইটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে ঃ—

১। জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও শ্রমিকদের শারীরিক যোগ্যতা ঃ বলা হয়, শ্রমিকদের শারীরিক যোগ্যতা জাতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। শ্রমিকেরা সুস্থ ও সবল হইলে উহারা কার্যক্ষম হয়। ফলে, উহাদের দক্ষতা বেশী হয়। খাদ্য, বাসস্থান, জলবায়ু, ভৌগোলিক পরিবেশ ইত্যাদির উপর শ্রমিকের শারীরিক যোগ্যতা নির্ভর করে।

২। শ্রমিকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ঃ শ্রমিকের কাজ করার দক্ষতা, তাহাদের

সাধারণ শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্রের মানের উপর নির্ভর করে। বর্তমান যুগে উৎপাদনের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে হইলে শ্রমিককে বিভিন্ন ধরনের কারিগরী প্রশিক্ষণ (technical training) লইতে হয়। এইজন্য আধুনিক কালে অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ইহা ছাড়া, শ্রমিকদের নৈতিক চরিত্রের মান উন্নয়ন করিতে হয়।

৩। **কাজের পরিবেশ :** কাজের পরিবেশ শ্রমিকদের কর্মদক্ষতাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। অন্ধকারময়, নিরানন্দ ও অস্বাস্থ্যকর কারখানার পরিবেশ শ্রমিককে কঠোর পরিশ্রমী হইতে কখনই উৎসাহিত করে না। কাজের দক্ষতা-বৃদ্ধির জন্য কারখানার ভিতরে আলো, বাতাস ও পানীয় জল এবং তাছাড়া শ্রমিকদের বিশ্রামের ব্যবস্থা, খেলাধুলার ব্যবস্থা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। আমাদের দেশে কারখানার পরিবেশ ইত্যাদি উন্নতির জন্য ১৯৪৮ সালের কারখানা আইনে (Factories Act) অনেকগুলি ব্যবস্থা আছে।

৪। **পরিচালন কর্তৃপক্ষের পরিচালন ক্ষমতা :** শ্রমিকদের দক্ষতা মালিকের সংগঠন-ক্ষমতার উপরও নির্ভর করে। মালিকের সংগঠন-ক্ষমতা উচ্চ মানের হইলে শ্রমিকদের কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উচ্চ শিক্ষা-প্রাপ্ত পরিচালকের অধীনে কাজ করিলে শ্রমিকরা অতি সহজেই সুদক্ষ হইয়া উঠিতে পারে।

৫। **যন্ত্রপাতির প্রকৃতি ও উৎপাদন-প্রণালী :** শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার বৃদ্ধি করার জন্য উহাদিগকে সর্বাধুনিক ধরনের যন্ত্রপাতি দিতে হয় এবং উৎপাদন-প্রণালীর নূতনত্ব থাকা চাই। ভারতে কারখানার শ্রমিকরা পুরাতন ধরনের অনুৎপাদনশীল যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম লইয়া কাজ করে। ফলে, তাহাদের উৎপাদনক্ষমতা খুবই কম হয়।

৬। **সহযোগী উপাদানগুলির উৎপাদনশীলতা :** শ্রমিকরা অন্যান্য যে-সকল উপাদানের সঙ্গে কাজ করে, উহাদের উৎপাদনশীলতা অনেকাংশে শ্রমিকের দক্ষতা নির্ধারণ করে। যদি প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা বেশী হয়, মূলধন পর্যাপ্ত হয় ও সংগঠনকারীর সংগঠন-ক্ষমতা যথোপযোগী হয়, তাহা হইলে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতাও বেশী হইবে।

৭। **শ্রম-কল্যাণমূলক ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহ :** শ্রমিকের কর্মক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য শ্রম-কল্যাণের ব্যবস্থা করিতে হয়। কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার জন্য শ্রমিকরা যাহাতে প্রয়োজনীয় অর্থ পায়, তাহারও ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। খেলাধুলার মাঠ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্বল্প পয়সায় আহারের ব্যবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা, শ্রমিকদের সন্তানগণের শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি শ্রমিকদের কাজ করার প্রেরণা যোগায়।

৮। **মজুরি ও কাজের অন্যান্য শর্ত :** শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বজায় রাখা ও যোগ্যতা উন্নত করার জন্য উহাদিগকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে মজুরি দিতে হয়। সাধারণত

অধিক মজুরি, শ্রমিকদের কাজের প্রেরণা বৃদ্ধি করে। ইহা ছাড়া, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা, পদোন্নতির সম্ভাবনা, বাড়তি আয়ের সুযোগ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মজুরি পাওয়ার নিশ্চয়তা, চাকরির নিশ্চয়তা, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক ইত্যাদি শ্রমিকদের কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি করে। ঐ অবস্থাগুলি থাকিলে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৯। **অন্যান্য বিষয়ঃ** ইহা ব্যতীত, শ্রমিকদের বুদ্ধিমত্তা ও মানসিক উৎকর্ষ, শ্রমিকদের উন্নত জীবনযাত্রার মান, মুনাফা-ভাগাভাগি ব্যবস্থা, নিয়মিত উৎপাদন-ভিত্তিক বোনাস প্রদান, শ্রমিকদের মানসিক অবস্থা ও আশা-হতাশা, শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলি শ্রমিকদের দক্ষতা নির্ধারণ করে। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়, এই সকল বিষয় শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করে।

উন্নত দেশের শ্রমিকদের তুলনায় ভারতীয় শ্রমিকদের দক্ষতা নিম্নমানের, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মজুরির নিম্নহার, অজ্ঞতা ও উদ্যমের অভাব, কাজের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পরিচালনা কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা, পুরাতন যন্ত্রপাতির ব্যবহার, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব, প্রতিকূল জলবায়ু ইত্যাদি কারণে ভারতীয় শ্রমিকদের দক্ষতা নিম্নমানের।

৪. **জনসংখ্যা সম্পর্কে তত্ত্বসমূহ (Theories of Population):** পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্রমিকদের যোগান দেশের মোট জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। এই কারণেই শ্রমিকদের যোগান প্রসঙ্গে জনসংখ্যা সম্পর্কে প্রচলিত তত্ত্বগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন। জনসংখ্যা সম্বন্ধে দুইটি উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব প্রচলিত আছে। ঐ দুইটি তত্ত্ব এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল:

ক। ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা-তত্ত্ব (Malthusian Theory of Population): ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস (Malthus) জনসংখ্যা-বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি তত্ত্ব ১৭৯৮ সালে প্রচার করেন। তিনি খাদ্যের যোগানের পটভূমিকায় জনসংখ্যার বৃদ্ধির সমস্যাটি আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রত্যেক দেশেই প্রতি ২৫ বৎসরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। স্বাভাবিক বা জৈবিক কারণে জনসংখ্যা খুব দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে ক্রম-হ্রাসমান উৎপন্ন-বিধি কার্যকর হয় বলিয়া খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্রুত বাড়িতে পারে না। ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, জনসংখ্যা 'জ্যামিতিক প্রগতি'তে (Geometrical Progression) অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২,… ইত্যাদি হারে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু খাদ্যশস্যের যোগান বৃদ্ধি পায় 'পাটীগণিতিক প্রগতি'তে (Arithemetical Progression) অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬,… ইত্যাদি হারে। এইরূপ ঘটিতে থাকিলে, কিছুকাল পরে খাদ্যশস্য-বৃদ্ধির হারের তুলনায় জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার অধিকতর হয়। ইহার ফলে, ক্রমে এমন এক সময় আসিবে, যখন দেশের খাদ্যের উৎপাদন, দেশের জনগণের প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত হইবে। ম্যালথাসের মতে, যতদিন দেশে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা

যায়, ততদিন পর্যন্ত জনসংখ্যার বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। খাদ্যের যোগান অপর্যাপ্ত হইলে দেশে অভাব, অনাহার, দুঃখ-দুর্দশা, মড়ক ইত্যাদি দেখা দিবে। ইহার ফলে, দেশে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইবে এবং জনসংখ্যা হ্রাস পাইবে। জনসংখ্যার এইরূপ নিয়ন্ত্রণকে ম্যালথাস 'প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণসমূহ' (positive checks) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। ইহা ছাড়া, জনসংখ্যা-বৃদ্ধি রোধ করার জন্য 'প্রতিরোধ-মূলক নিয়ন্ত্রণ-সমূহের' (preventive checks) ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে বিবাহের ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধি, বিলম্বে বিবাহ, নৈতিক সংযম, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রবর্তন করিতে হইবে। জনসংখ্যা-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হইলে দেশে আবার 'সুষম জনসংখ্যা' (balanced population) আসিবে। কিন্তু, আবার কিছুকাল পরে দেশে অতি-জনসংখ্যার সমস্যা (over-population) দেখা দিবে। পুনরায় প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণসমূহের মাধ্যমে দেশে সুষম জনসংখ্যা আসিবে। চক্রাকারে আবর্তিত এই ঘটনাগুলি নিম্নে দেখানো হইল ঃ
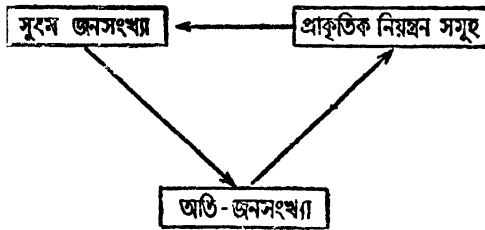
চিত্র—২

ম্যালথাসের তত্ত্বের ত্রুটিসমূহ ঃ ম্যালথাসের এই তত্ত্বটি আধুনিক কালে অধিকাংশ লেখকেরা আর গ্রহণ করেন না। বিভিন্নভাবে ইহা সমালোচিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি দেওয়া হইল ঃ

১. বিভিন্ন দেশের বিশেষত পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির জনসংখ্যার ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া আধুনিক লেখকরা দেখাইয়াছেন, উনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির পরিবর্তে উহার হ্রাস ঘটিয়াছিল। সুতরাং, ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

২. আরও বলা হয়, আধুনিক কালে নানারূপ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ফলে খাদ্যোৎপাদনের সম্ভাবনা যে বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা ম্যালথাস চিন্তাও করিতে পারেন নাই। এই সকল বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ফলে কৃষি সাজ-সরঞ্জামের

ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং উহার ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৩. আবার, স্বাভাবিক বা জৈবিক কারণে জনসংখ্যা সর্বদাই দ্রুত বৃদ্ধি পায়—ম্যালথাসের এই সিদ্ধান্তও ভ্রান্তিমূলক। কারণ, আধুনিক সমাজে শিক্ষিত ব্যক্তিরা উন্নত জীবনযাত্রার মান ভোগ করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে।

৪। পরিশেষে বলা যায়, ম্যালথাসের আলোচনার পটভূমিকা বিশেষ সংকীর্ণ। জনসংখ্যার ন্যায় একটি জাতীয় সমস্যা শুধুমাত্র দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনের পটভূমিকায় বিচার করিলে তাহা যুক্তিযুক্ত হইবে না। এই সমস্যাটি আরও বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় অর্থাৎ দেশের জাতীয় সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত হইবে। এই ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়া আধুনিক কালের লেখকেরা জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সমস্যাটি দেশের জাতীয় সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করিয়াছেন।

উপসংহার: ম্যালথাসের মতবাদের নানারূপ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ইহার আংশিক সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। এখনও অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন যাঁহারা মনে করেন, পৃথিবীর জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র বিশ্বে নিদারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। এই কারণে, উন্নত দেশে 'জনসংখ্যা-বৃদ্ধির শূন্য হার' (zero population growth)—এই লক্ষ্যটির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। তাহা ছাড়া, ভারতের মতে স্বল্পোন্নত ও জনবহুল দেশে ম্যালথাসের মতবাদটি যে আংশিকভাবে প্রয়োগ করা যায়, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কারণ, এই সকল দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য-যোগানের ব্যবস্থা একটি অন্যতম জটিল সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

খ। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব (Optimum Theory of Population): আধুনিক কালের লেখকেরা দেশের মোট জাতীয় সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার সমস্যাটি আলোচনা করেন। তাঁহাদের মতে, প্রত্যেক দেশের প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সম্পদের সদ্ব্যবহার করিয়া জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়। সুতরাং, জনসংখ্যা-বৃদ্ধি সকল অবস্থায় বিপজ্জনক হয় না। প্রত্যেক দেশেই জাতীয় সম্পদের অনুপাতে জনসংখ্যার এমন একটি পরিমাণ আছে, যাহা দেশের পক্ষে কাম্য বা সর্বোত্তম। কোন দেশে যে-পরিমাণ জনসংখ্যার ফলে মাথাপিছু আয় (per captia income) সর্বাপেক্ষা অধিক হয়, সেই পরিমাণ জনসংখ্যাকে 'কাম্য বা সর্বোত্তম জনসংখ্যা' (optimum population) বলা হইবে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে মাথাপিছু আয় হ্রাস পাইলে জনাধিক্যের (over-population) সমস্যা দেখা দেয়। আবার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, জনসংখ্যা তখন কাম্য সংখ্যায় পৌঁছায় না। ঐ অবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি

পাওয়া দেশের পক্ষে মোটেই অকল্যাণকর হইবে না, কারণ তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে।

এই তত্ত্বটি নিম্নের চিত্র দ্বারা দেখানো হইল ঃ
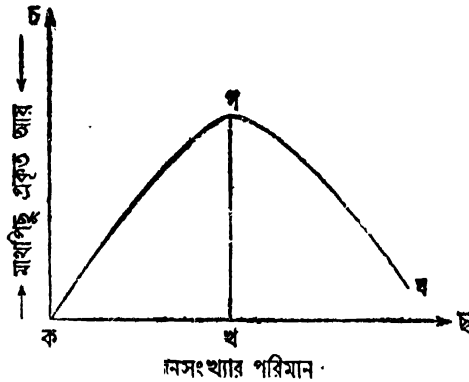
চিত্র-৩

উপরের চিত্রে **কচ** রেখাটি দ্বারা মাথাপিছু প্রকৃত আয় এবং **কছ** রেখাটি দ্বারা জনসংখ্যার পরিমাণ দেখানো হইতেছে। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের কিরূপ পরিবর্তন ঘটিতেছে, তাহা **কগঘ** রেখাটি দ্বারা দেখানো হইল। চিত্রে দেখা যায়, দেশের জনসংখ্যা **কখ** পরিমাণ হইলে জনগণের মাথাপিছু আয় **(খগ)** সর্বাধিক হইতেছে। সুতরাং **কখ** জনসংখ্যা হইতেছে কাম্য জনসংখ্যা। জনসংখ্যা **কখ** অপেক্ষা কম হইলে, উহা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম হইবে। আবার জনসংখ্যা **কখ** অপেক্ষা অধিক হইলে, মাথাপিছু আয় হ্রাস পায় বলিয়া অতি-জনসংখ্যার সমস্যা দেখা দিবে।

সমালোচনা ঃ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটির গুণাবলীর প্রসঙ্গে বলা হয়, তত্ত্বটিতে জনসংখ্যার সমস্যাটি দেশের মোট সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হওয়ায় ইহা ম্যালথাসের তত্ত্ব অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবায়িত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, কোন কোন সময়ে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইতে পারে, তাহারও বিশ্লেষণ ও কারণ এই তত্ত্বটিতে পাওয়া যায়। যেমন,—দেশের জনসংখ্যা 'কাম্য জনসংখ্যা' হইতে কম হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করিতে পারে বলিয়া জনসংখ্যা-বৃদ্ধি তখন দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়। কিন্তু তত্ত্বটি নানাভাবে সমালোচিত হয় ঃ

ক। কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্বে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির গতি সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হয় নাই। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনসংখ্যার সহিত সেই দেশের উৎপাদনশীল সম্পদের কি সম্পর্ক, শুধুমাত্র তাহাই ইহাতে আলোচনা করা হইয়াছে।

খ। কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্বটি হইল স্থিতিশীল (static)। উন্নয়নের কোন এক স্তরে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির কি পরিণতি হইতে পারে, ইহাতে কেবলমাত্র তাহাই আলোচিত হইয়াছে।

গ। কি পরিমাণ জনসংখ্যা দেশের পক্ষে কাম্য বা সর্বোত্তম তাহাও পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

তত্ত্বটিতে উৎপাদন-প্রণালী, উৎপাদনশীল সম্পদ, উৎপাদন-ব্যবস্থা ইত্যাদি অপরিবর্তিত ধরা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যুগে এইগুলি পরিবর্তনশীল।

উপসংহার ঃ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি আমাদিগকে ম্যালথুসীয় তত্ত্বের হতাশবাদী প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়াছে ; কিন্তু তত্ত্বটির বাস্তব মূল্য খুবই কম। কারণ, কাম্য জনসংখ্যা পরিমাপ করা যায় না। এই কারণে, আধুনিক কালের অধিকাংশ লেখকেরা অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ একরূপ পরিহার করিয়াছেন।

ভারতের ক্ষেত্রে তত্ত্ব-দুইটির প্রয়োগ ঃ ভারতের জনসমস্যার ক্ষেত্রে কোন কোন লেখক ম্যালথুসীয় তত্ত্বটি প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছেন, ভারতে জনাধিক্যের সমস্যা দেখা দিয়াছে। কারণ, ভারতে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু সেই তুলনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশানুরূপ হারে বৃদ্ধি পাইতেছে না।

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি		
বৎসর	মোট জনসংখ্যা	দশ-বাৎসরিক বৃদ্ধি
	(কোটি)	(শতাংশ)
১৯২১	২৫·২	—
১৯৩১	২৭·৯	+১১·০০
১৯৪১	৩১·৯	+১৪·২২
১৯৫১	৩৬·১	+১৩·৩১
১৯৬১	৪৩·৯	+২১·৫১

যেমন, ১৯৫১—'৬১ সালের মধ্যে ভারতে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি হার ছিল ২১·৫%, কিন্তু ১৯২৫—'৫১ সালে উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া হয় ২৪·৮%। ১৯২১ সালের জনগণনার চূড়ান্ত হিসাব হইতে জানা যায়, ১৯২১—'২৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার ছিল ২৫ শতাংশ এবং ঐ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের মোট জনসংখ্যা হয় ৬৮·৫১ কোটি। ১৯২১ সালে উহার সংখ্যা ছিল ৫৪·৮ কোটি। অবশ্য 'সবুজ বিপ্লবের' (Green Revolution) ফলে বিগত কয়েক বৎসরে ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং উহার ফলে আমদানি ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে।

যেমন, ১৯৫১-৬১ ও ১৯৫১—৬১ সালের মধ্যে ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১০৮'৫ মিলিয়ান টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৫১'৫ মিলিয়ান টন। পক্ষান্তরে, অনেকে ভারতে কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্বটি প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছেন, ভারতে এখনও জনাধিক্য ঘটে নাই। কারণ, ভারতে জনগণের মাথাপিছু আয় এখনও বৃদ্ধি পাইতেছে। যেমন, ১৯৬১—'৬২ সালের মধ্যে ভারতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় ২০ শতাংশ এবং ১৯৫১-৬১ সালেও ঐ বৃদ্ধির হার হয় ৫'২ শতাংশ।

এই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া অনায়াসে বলা যাইতে পারে, বর্তমান ভারতে জনসমস্যা একটি জটিল সমস্যা এবং এই সমস্যাটি ভারতে নানাভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির কাজকে ব্যাহত করিতেছে। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, একদিকে যেমন উন্নয়নের হারকে নিম্নে রাখিতেছে, অন্যদিকে তেমনি ইহা খাদ্যসমস্যা, বেকার সমস্যা, ভোগ্য-দ্রব্যের ঘাটতির সমস্যা, নানারূপ সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি সৃষ্টি করিতেছে। সুতরাং, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জনস্ফীতি (population explosion) প্রতিরোধ করা একান্ত প্রয়োজন।

৫. **শ্রমবিভাগ (Division of Labour):** আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শ্রম-প্রয়োগের ব্যাপারে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে শ্রমবিভাগ। কোন একটি সম্পূর্ণ কাজকে কতকগুলি অংশ বা প্রক্রিয়ায় ভাগ করিয়া প্রতিটি অংশ বা প্রক্রিয়ার জন্য পৃথকভাবে শ্রমিক নিযুক্ত করাকে শ্রমবিভাগ বলা হয়। শ্রমবিভাগের দ্বারা শ্রমিকের কাজকর্মের পরিধিকে সীমায়িত করা হইতেছে। কারণ, শ্রমবিভাগের ফলে কোন একজন শ্রমিক সকল প্রকার কাজ না করিয়া, কোন একটি নির্দিষ্ট কাজ বরাবর করিয়া যায়।

শ্রমবিভাগ সাধারণত চার প্রকারের দেখা যায়। প্রথমত, মানুষের পেশা বা বৃত্তিকে ভিত্তি করিয়া শ্রমবিভাগ করা হয়। যেমন—প্রাচীনকালে হিন্দুদের মধ্যে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন কাজ করার জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে চারটি বর্ণ বা শ্রেণী ছিল।

দ্বিতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগে দ্বারা কোন একটি কাজকে কতকগুলি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় ভাগ করা হয়; যেমন—কৃষক কাঁচা তুলা উৎপন্ন করে, চরকা-চালক সুতা কাটে, তাঁতী কাপড় বোনে এবং দর্জি পোশাক তৈয়ারী করে। এখানে প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ এবং প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার জন্য পৃথক পৃথক কর্মী রহিয়াছে।

তৃতীয়ত, আধুনিক কালে বড় বড় কারখানায় একদল শ্রমিক কোন একটি কাজের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করিতেছে না। প্রত্যেক শ্রমিকদল একটি কাজের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকে, কিন্তু ইহারা কোন প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ অংশ সম্পন্ন করে না। অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়াগুলি সমন্বয় করিয়া সম্পূর্ণ কাজ নির্বাহ বা দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। যেমন—কোন কারখানার হয়তো একদল শ্রমিক বরাবর কোন একটি যন্ত্রের শুধু স্ক্রু (screw) ঘুরাইতেছে এবং ইহারা কোন উৎপাদন-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করিতেছে না। আধুনিক জুতার কারখানায় জুতা তৈয়ারির জন্য প্রায় একশতটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া আছে, কোন একজন বা একদল শ্রমিক এক-একটির প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ অংশ সম্পন্ন করে না। সুতরাং দেখা যায়, আধুনিক শ্রমবিভাগ পূর্বের তুলনায় আরও সূক্ষ্ম হইয়াছে।

পরিশেষে বলা যাইতে পারে, ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরূপ শ্রমবিভাগ আছে বিভিন্ন অঞ্চলেও সেইরূপ শ্রমবিভাগ দেখা যায়। কোন একজন ব্যক্তি যেরূপ কোন একটি কাজে নিপুণতা লাভ করে, সেইরূপ কোন একটি অঞ্চল বা কোন একটি দেশ কোন একটি বিশেষ দ্রব্য-উৎপাদনে নিপুণতা লাভ করিতে পারে। যেমন—পশ্চিমবঙ্গে পাটশিল্প, মহারাষ্ট্রে তুলাবস্ত্র শিল্প, উত্তরপ্রদেশে চিনি শিল্প, সুইজারল্যাণ্ডে ঘড়ি-নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাকে 'শিল্পের স্থানীয়করণ' (localization of industries) বলা হয়।

শ্রমবিভাগের ফলাফল ঃ উৎপাদনকার্যে শ্রমবিভাগের সুফল ও কুফল—উভয়ই আছে। শ্রমবিভাগের সুফলগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল ঃ

ক। শ্রমবিভাগের ফলে কোন একটি কাজকে অনেকগুলি অংশে ভাগ করা হয়। ইহার ফলে, যে-শ্রমিক যে-কাজের জন্য উপযুক্ত এবং যে-কাজ সম্পর্কে তাহার মানসিক প্রবণতা অধিক থাকে, তাহাকে সেই কাজে নিয়োগ করা যায়। ফলে শ্রমিকের অন্তর্নিহিত গুণের সদ্ব্যবহার হয় এবং কার্যনিপুণতা বৃদ্ধি পায়। তাই আধুনিক অর্থবিদ্যার জনক অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) মন্তব্য করিয়াছেন, শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিকের নিপুণতা, কর্মদক্ষতা ও বিচারবুদ্ধি সকলই বৃদ্ধি পায়।

খ। শ্রমবিভাগের ফলে কোন একজন শ্রমিক সারাজীবন প্রায় একই কাজ করিয়া থাকে ইহাতে কাজটি সম্পর্কে তাহার পারদর্শিতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। যেমন—জুতার কারখানায় যে-শ্রমিকদল জুতার গোড়ালি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকে তাহারা সর্বদাই একই কাজ করিতেছে বলিয়া উহা তৈয়ারী করার ব্যাপারে তাহাদের পারদর্শিতা বৃদ্ধি পায়।

গ। শ্রমবিভাগ করা হইলে একই কাজ বহু প্রক্রিয়ায় ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির নিয়োগ করা যায় এবং দামী ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি শুধুমাত্র দক্ষ কর্মীদিগকে দেওয়া সম্ভব হয়। যেমন—দিয়াশলাই তৈয়ারীর জন্য কারখানায় ঐ কাজকে নানা প্রক্রিয়ায় ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য পৃথক পৃথক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম থাকে। ইহাতে উৎপাদনের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং বৃহদায়তনের উৎপাদন দেখা দেয়। তাই অ্যাডাম স্মিথ দেখাইয়াছেন, কোন একজন শ্রমিক খুব পরিশ্রম করিয়াও দৈনিক কুড়িটির বেশী আলপিন্ তৈয়ারী করিতে পারিবে না, কিন্তু শ্রমবিভাগ দ্বারা দশ জন শ্রমিক দৈনিক ৪৮ হাজারের বেশী নিখুঁত আলপিন তৈয়ারী করিতে পারে।

ঘ। শ্রমিকরা একই ধরনের কাজ বরাবর করে বলিয়া তাহারা কাজের প্রক্রিয়ায় উন্নতি ঘটাইতে পারে ও নূতন প্রক্রিয়া বাহির করিতে পারে এবং ইহাতে নূতন নূতন উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। এই কারণেই তুলাবস্ত্র শিল্পে বা ইস্পাত শিল্পে বা যন্ত্রপাতি শিল্পে কিছুকাল পর পর নূতন নূতন প্রক্রিয়াব উদ্ভাবন ঘটে।

ঙ। শ্রমিকরা বরাবর একই ধরনের কাজ করে বলিয়া তাহাদের কিছুদিন অন্তর নূতন কাজ শিখিতে হয় না। সুতরাং একবার কাজ শিখিলেই চলে, ইহাতে সময় ও কর্মক্ষমতার অপচয় হ্রাস পায়। আবার শ্রমিকরা এক জায়গায় একই ধরনের যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করে, ইহাতেও তাহাদের যন্ত্রপাতি কম লাগে ও সময়ও বাঁচে।

চ। শিল্প, বাণিজ্য ও জীবনযাত্রার মানে বর্তমানে যে উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহা যে বহুলাংশে শ্রমবিভাগেরই অবদান ইহা অস্বীকার করা যায় না।

ছ। আঞ্চলিক শ্রমবিভাগের ফলে শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটে এবং উহার ফলেও নানারূপ সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। এ-সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

শ্রমবিভাগের কুফলও দেখা যায় :

ক। শ্রমবিভাগের জন্য কোন একজন শ্রমিক বরাবর একই কাজ করে বলিয়া তাহার নিকট কাজটি নিরানন্দ ও একঘেয়ে হইয়া ওঠে। যে-শ্রমিক দিনের পর দিন কারখানায় শুধু স্ক্রু ঘুরায় বা শুধু জুতায় পেরেক মারে, তাহার নিকট কাজটি ক্রমশ একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হইয়া ওঠে।

খ। শ্রমবিভাগ হওয়ায় একজন শ্রমিক সম্পূর্ণ বস্তুটির একটি অংশ তৈয়ারী করে মাত্র। ফলে, কাজ সম্পূর্ণ করার যে-আনন্দ তাহা সে পায় না।

গ। শ্রমবিভাগের ফলে কোন একজন শ্রমিক শুধুমাত্র একটি কাজ শিখিয়া থাকে। সেই কাজের কোন চাহিদা না থাকিলে, সে বেকার হইয়া পড়িবে। সুতরাং শ্রমবিভাগে বেকারত্বের আশংকা থাকে।

ঘ। শ্রমবিভাগ কোন একজন শ্রমিককে একটিমাত্র কাজে নিপুণ করিয়া তোলে। সুতরাং সে ইচ্ছা করিলে এক কাজ হইতে অন্য কাজে যাইতে পারে না। ফলে, শ্রমিকের সচলতা নষ্ট হয়।

ঙ। শ্রমবিভাগের ফলে সমাজে কর্মচারী শ্রমিকদের মধ্যে অবাঞ্ছিত শ্রেণীপ্রথার (class system) উদ্ভব ঘটে। একটি কাজ সম্পন্ন করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিক-শ্রেণী থাকে এবং ঐ সকল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অন্তর্বিরোধ. দলাদলি, হিংসা ইত্যাদি দেখা দেয়।

উপসংহার : শ্রমবিভাগের কুফলগুলিকে অস্বীকার করা যায় না। ইহা সত্ত্বেও আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়া যাইতেছে। কিন্তু সর্বত্রই শ্রমবিভাগ পুরাপুরি প্রয়োগ করা যায় না। বলা হয়, বাজারের আয়তন শ্রমবিভাগের প্রয়োগকে সীমায়িত করে (Division of labour is limited by the extent of market—*Adam Smith*)। শ্রমবিভাগের ফলে কোন বস্তুর উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, দ্রব্যটি বিক্রয়ের জন্য বিরাট বাজারের প্রয়োজন পড়িবে। যেমন—জুতার কারখানায় শ্রমবিভাগের ফলে অধিক সংখ্যায় জুতা তৈয়ারী হইতেছে। কিন্তু, অধিক সংখ্যায় জুতা বিক্রয়ের সম্ভাবনা বা সুযোগ না থাকিলে শ্রমবিভাগ দ্বারা বৃহদায়তনে জুতা-উৎপাদন লাভজনক হইবে না।

সুতরাং শ্রম-বিভাগের সুফল সম্পূর্ণভাবে ভোগ করিতে হইলে উৎপাদিত দ্রব্যের বড় আয়তনের বাজার দরকার। ইহা ছাড়া, শ্রমবিভাগের সুফলগুলি পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিতে হইলে উৎপাদনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় সাধন করিতে হয়। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় না থাকিলে কাজটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা যায় না।

৬. **শিল্পের স্থানীয়করণ** (**Localization of Industries**) : শ্রমবিভাগের আর-একটি রূপ হইতেছে শিল্পের স্থানীয়করণ। কোন-একটি শিল্প দেশের কোন-একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে গড়িয়া উঠিলে তাহাকে 'শিল্পের স্থানীয়করণ' বা 'আঞ্চলিক বিশেষী-করণ' (regional specialization) বলা হইবে। যেমন—পশ্চিমবঙ্গে পাটশিল্প, মহারাষ্ট্রে তুলাবস্ত্র শিল্প ও উত্তরপ্রদেশে চিনি শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটিয়াছে। আন্তর্জাতিক স্তরে আঞ্চলিক বিশেষীকরণ ঘটিয়া থাকে। যেমন—ভারত পাট ও চা উৎপাদনে বা সুইজারল্যান্ড ঘড়ি বা জাপান ইলেকট্রনিক দ্রব্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ অর্জন করিয়াছে।

স্থানীয়করণের কারণ : শিল্পের স্থানীয়করণ কতকগুলি কারণে ঘটে :—

প্রথমত, প্রাকৃতিক কারণে, যেমন—কাঁচামালের উৎসের নৈকট্য, শক্তিসম্পদের নৈকট্য, অনুকূল জলবায়ু ইত্যাদি, কোন শিল্প দেশের সর্বত্র না ছড়াইয়া না থাকিয়া কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে গড়িয়া ওঠে। যেমন—পশ্চিমবঙ্গে কাঁচা পাট প্রচুর পরিমাণে জন্মে বলিয়া এখানে পাটশিল্পের স্থানীয়করণ হইয়াছে। বলা হয়, যে-সকল উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কাঁচামালের অনুপাত বেশী থাকে, সেইসকল ক্ষেত্রে পরিবহণের ব্যয় (transport cost) কম রাখার জন্য কাঁচামালের উৎসের নিকট শিল্পটির স্থানীয়করণ ঘটে। যেমন—যেখানে প্রচুর পরিমাণে কাঠ পাওয়া যায়, সেখানেই কাঠের মণ্ড (paper pulp) তৈয়ারীর কারখানা গড়িয়া উঠে। আবার সুইজারল্যান্ডের জলবায়ু ঘড়ি-শিল্পের অনুকূল বলিয়া ঐ দেশে ঘড়ি-শিল্পের বিশেষীকরণ ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, কোন কোন অঞ্চলে অন্য অঞ্চলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন—শ্রমিকের প্রচুর যোগান, পরিবহণের সুবিধা, ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা ইত্যাদি। এই সুবিধাগুলি থাকার জন্য শিল্পটি কোন-একটি বিশেষ অঞ্চলে গড়িয়া উঠে। পশ্চিমবঙ্গে পাটশিল্পের স্থানীয়করণের আর একটি অন্যতম কারণ হইল, পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি হইতে এই রাজ্যে নিয়মিত ও প্রচুর পরিমাণে সুলভ শ্রমিকের আগমন। যে-সকল শিল্পের তৈয়ারী পণ্য উহাদের কাঁচামাল অপেক্ষা আয়তনে অধিক ভারী হয়, সেই শিল্পগুলি সাধারণত বাজারের সন্নিকটে গড়িয়া ওঠে। যেমন—শহরের উপকণ্ঠে ইট-তৈয়ারীর কারখানা গড়িয়া ওঠে।

তৃতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে কোন অঞ্চলে কয়েকটি মাত্র প্রতিষ্ঠান কোন কারণে এমন-কি আকস্মিক কারণে গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই অঞ্চলে ধীরে ধীরে আরও সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে ঐ অঞ্চলে শিল্পের কেন্দ্রিকতা ঘটিয়া থাকে। ইহাকে

অধ্যাপক মার্শাল অগ্র-সূচনার গতিবেগ (momentum of the early start) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাছাড়া, কোন কারণে কোন অঞ্চলে কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে, পরে ঐ সুবিধাগুলি আরও অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া শিল্পের কেন্দ্রিকতা তীব্রতর হয়। ইহা ছাড়া শিল্পগত নিষ্ক্রিয়তা'র (industrial inertia) ফলে স্থানীয়করণ তীব্রতর হয়। স্থানীয়করণের প্রারম্ভিক কারণ লোপ পাওয়া সত্ত্বেও স্থানীয়করণ অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠান আরও ঘনীভূত হয়।

পরিশেষে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণী বা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার (patronage of the rulers) ফলে, কোন বিশেষ অঞ্চলে কোন একটি শিল্প গড়িয়া ওঠে। প্রাচীনকালে ঢাকার নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ঢাকায় বিশ্ববিখ্যাত মসলিন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক কালেও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষত অনগ্রসর অঞ্চলে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে শিল্পের কেন্দ্রীয়করণ ঘটিয়া থাকে।

শিল্পের স্থানীয়করণের সুবিধা ও অসুবিধা ঃ শিল্পের স্থানীয়করণের কতকগুলি সুবিধা ও অসুবিধা আছে। প্রথমে সুবিধাগুলি আলোচনা করা হইল ঃ

ক। যে-অঞ্চলে শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটে, সেই অঞ্চলের সুনাম ছড়াইয়া পড়িলে দ্রব্য বিক্রয় করিতে অসুবিধা হয় না। যেমন সুইজারল্যান্ডে তৈয়ারী এইরূপ ঘড়ি বিক্রয় করিতে বিশেষ অসুবিধা দেখা যায় না। সুতরাং উৎপাদিত দ্রব্যাদির বাজার ব্যাপক হয়।

খ। যে-অঞ্চলে শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটে, সেই অঞ্চলে দেশের চতুর্দিক হইতে দক্ষ শ্রমিকরা কাজের জন্য ভীড় করে। ফলে, ঐ অঞ্চলে দক্ষ শ্রমিকের অভাব হয় না এবং ইহাতে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। তাছাড়া ঐ অঞ্চলে কাঁচামাল নিয়মিত পাওয়া যায় বলিয়া শিল্পটির প্রসারের পথে বিশেষ বাধাবিঘ্ন থাকে না।

গ। শিল্পের স্থানীয়করণ অঞ্চলে মূল শিল্পের প্রসারের সঙ্গে আনুষঙ্গিক শিল্পেরও প্রসার ঘটে। যেমন—যেখানে তুলাবস্ত্র শিল্পের স্থানীয়করণ হয়, সেখানে ঐ শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি-নির্মাণের জন্য অন্যান্য শিল্প গড়িয়া উঠিবে। ইহা ছাড়া, অঞ্চলটির সার্বিক উন্নতিও ঘটে।

ঘ। শিল্পের স্থানীয়করণ অঞ্চলে একই ধরনের বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠার ফলে উহাদের মধ্যেও কাজের বিভাগ হইয়া থাকে এবং ইহাতে এক-একটি প্রতিষ্ঠান এক-এক বিষয়ে পারদর্শী হয়। তাহা ছাড়া, একই ধরনের বহু প্রতিষ্ঠান এক জায়গায় থাকার ফলে উহারা উৎপাদন ও বিক্রয়-বাজার সম্পর্কে নানারূপ প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করিতে পারে। তদুপরি, উৎপাদিত দ্রব্যটির গুণগত মান উন্নয়নের জন্য তাহারা একত্রে নানারূপ গবেষণামূলক কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায়, শিল্পের স্থানীয়করণের ফলে প্রতিষ্ঠানগুলি নানারূপ 'বহিরাগত ব্যয়-সংকোচ' (external economies) ভোগ করিতে পারে।[১]

---

১ এই ব্যয়সংকোচগুলি ৭ অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে।

৬। শিল্পের স্থানীয়করণের ফলে ঐ অঞ্চলে ব্যাঙ্কিং ও নানারূপ অর্থকরী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে। ইহার ফলে শিল্পটিরও নানারূপ সুবিধা হয়।

শিল্পের স্থানীয়করণের প্রথম অসুবিধা হইতেছে, ইহার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্বের আশংকা থাকে। ঐ অঞ্চলে একই ধরনের শিল্প থাকে এবং শ্রমিকরা শুধুমাত্র একই প্রকার কাজ জানে। সুতরাং ঐ শিল্পে কোনরকম মন্দা দেখা দিলে শ্রমিকরা বেকার হইয়া পড়িবে। তাহা ছাড়া, ঐ অঞ্চলে একই ধরনের কাজ পাওয়া যায় বলিয়া, যাহারা ঐ কাজের অনুপযুক্ত তাহারা কাজের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়।

দ্বিতীয় অসুবিধাটি হইতেছে, স্থানীয়করণের ফলে সমগ্র দেশকে কোন একটি দ্রব্যের জন্য কোন একটি অঞ্চলের উপর সকল সময় নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। যদি কোন কারণে ঐ অঞ্চলটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে সমগ্র দেশ বিপদের সম্মুখীন হয়।

তৃতীয় অসুবিধাটি হইতেছে, শিল্পের স্থানীয়করণের ফলে শ্রমিকরা ঐ অঞ্চলে কাজের জন্য ভীড় করে, ইহাতে শ্রমিকের যোগান বেশী হয় এবং শ্রমিকের মজুরির হার কম হয়।

পরিশেষে বলা যায়, আঞ্চলিক বিশেষীকরণ দেশের মধ্যে 'আঞ্চলিক বৈষম্য' (regional imbalance) সৃষ্টি করে, ইহা কাম্য নহে। আবার, যুদ্ধের সময়ে শত্রুপক্ষ স্থানীয়করণ অঞ্চলটি বিনষ্ট করিয়া দেশের ক্ষতি ঘটাইতে পারে।

এই সকল কারণে আধুনিক কালে সরকার শিল্পের স্থানীয়করণ প্রতিরোধ করার জন্য যতদূর সম্ভব দেশের সর্বত্র শিল্পটি ছড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করে। ভারতেও এইরূপ করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্প-স্থাপনের নানারূপ সুবিধা দেওয়া হয়।

৭. **উৎপাদন-কার্যে যন্ত্রপাতির ব্যবহার (Use of Machineries in Production)**ঃ বৃহদায়তন উৎপাদনের আর-একটি কারণ হইতেছে, উৎপাদন-কার্যে যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার। আজকাল প্রতিটি কারখানায় কোন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হইতেছে। যন্ত্রপাতি-ব্যবহারের কতকগুলি সুবিধা আছে :

প্রথমত, কারখানায় যন্ত্রপাতি দ্বারা উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইলে অতি দ্রুত অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি উৎপাদন করা যায়।

দ্বিতীয়ত, যন্ত্রপাতি দ্বারা ভারী ও কষ্টসাপেক্ষ কাজ অনায়াসে করা যায়। আজকাল বৈদ্যুতিক ক্রেণের সাহায্যে ভারী ভারী যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি অনায়াসে স্থানান্তর করা সম্ভব হইতেছে। ফলে, শ্রমিকের শারীরিক শ্রমের বিশেষ লাঘব হইতেছে।

তৃতীয়ত, শ্রমিকরা যন্ত্রপাতির দ্বারা অতি স্বল্প সময়ে অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা অধিক মজুরি পায়।

পরিশেষে বলা যায়, যন্ত্রপাতি দ্বারা উৎপাদন করা হইলে, একই মানের দ্রব্য এক সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা যায়। যেমন—যন্ত্রপাতি দ্বারা হাজার হাজার একই মানের ব্লেড বা কলম বা ঘড়ি বা মোটরগাড়ী বা টেলিভিশন-সেট তৈয়ারী করা সম্ভব হইতেছে।

কিন্তু উৎপাদন-কার্যে যন্ত্রপাতির ব্যবহারের কতকগুলি অসুবিধাও আছে :

প্রথমত, শ্রমিকরা যন্ত্রপাতি দ্বারা একই কাজ বার বার করে বলিয়া তাহাদের নিকট কাজটি খুবই একঘেয়ে ও নিরানন্দ হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়ত, যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদনকার্য চলে বলিয়া শ্রমিকরা কাজ হইতে কোন আনন্দ বা উৎসাহ পায় না। তাহারা ধীরে ধীরে যন্ত্রপাতির দাস হইয়া পড়ে।

তৃতীয়, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে কারখানায় অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে এবং উহাতে শ্রমিকদের ক্ষতি এমন-কি কোন সময়ে প্রাণহানিও ঘটে।

পরিশেষে বলা যায়, অধিকাংশ যন্ত্রপাতি শ্রমিকের বিকল্প হিসাবে কাজ করে, অর্থাৎ কোন একটি মেশিন সাধারণত বহুসংখ্যক শ্রমিকের কাজ করে। ফলে, যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করা হইলে শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। যেমন—শ্রমিকরা হাতের সাহায্যে বা যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিড়ি প্রস্তুত করিতে পারে। হাতের সাহায্যে উহা করা হইলে অধিক শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু যন্ত্রপাতির সাহায্যে উহা প্রস্তুত করা হইলে কম শ্রমিক লাগাইয়া অধিক পরিমাণে বিড়ি প্রস্তুত করা সম্ভব হয় বলিয়া বহুসংখ্যক শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে। সুতরাং দেখা যায়, উৎপাদন-কার্যে যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হইলে শ্রমিক-বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু এই আশংকা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ যন্ত্রপাতির প্রয়োগ স্বল্পমেয়াদী সময়ে বেকারের সংখ্যা বাড়াইলেও দীর্ঘমেয়াদী সময়ে উহা অধিক পরিমাণে কর্মনিয়োগ সৃষ্টি করিতে পারে। যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে দেশে অধিক যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিতে হয় এবং ঐ যন্ত্রপাতি নির্মাণ-কার্যে বহু শ্রমিক কাজ পাইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, যন্ত্রপাতির দ্বারা উৎপাদন-কার্য সম্পন্ন করা হইলে অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে অধিক পরিমাণ দ্রব্যাদি উৎপাদন করা সম্ভব হয় বলিয়া দ্রব্যাদির দামও হ্রাস পায়। দাম হ্রাস পাওয়ায় চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তখন অধিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতির সহিত অধিক শ্রমিকও নিয়োগ করিতে হয়। ইহার ফলেও কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেখা যায়, যন্ত্রপাতির প্রয়োগ ও ব্যবহার স্বল্পকালীন সময়ে বেকারত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেও দীর্ঘকালীন সময়ে কর্মনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করে। তবে ভারতের ন্যায় জনবহুল দেশে মূলধনের অনুপাতে শ্রমের যোগান বেশী বলিয়া যন্ত্রপাতির প্রয়োগ ধীরে ধীরে প্রবর্তন করা হইলে তাহা সমীচীন হইবে।

———

৫

।। মূলধন ।।
(Capital)

[মূলধন—ইহার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ—টাকাকড়ি কি মূলধন?—মূলধনের গুরুত্ব ও কার্যাবলী—মূলধন গঠন—মূলধন-গঠনের বিষয়সমূহ—ভারতে মূলধন গঠন]

১. মূলধন—ইহার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ (Capital—its characteristics and classification): সাধারণ কোন ব্যবসায়ীর নিকট ব্যবসায়ে যে-পরিমাণ অর্থ নিয়োজিত হয়, তাহাই হইতেছে 'মূলধন'। কিন্তু অর্থবিদ্যায় 'মূলধন' অন্য একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানুষ দ্বারা উৎপাদিত যে দ্রব্যসামগ্রী ভবিষ্যতে উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়, তাহাই হইতেছে মূলধন। অস্ট্রিয়ার অর্থনীতিবিদ বম বয়ার্ক-এর (Bohm Bawerk) ভাষায় বলা যায়, মূলধন হইতেছে 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ' (produced means of production)। যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কৃষকের লাঙল, মিস্ত্রীর হাতুড়ি ইত্যাদি মূলধন। সুতরাং অর্থবিদ্যায় মূলধনের দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে:—(১) মূলধন মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত বস্তু—ইহা প্রাকৃতিক দ্রব্য নহে। ইহা মানুষের অতীতের শ্রমের ফল। (২) মূলধন মানুষের ভোগের কাজে ব্যবহৃত হয় না; ইহা অধিকতর দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের কার্যে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং মূলধন হইতে প্রত্যক্ষ উপযোগ বা পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় না। মূলধন-দ্রব্য দ্বারা ভোগ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইলে শেষোক্ত দ্রব্য হইতে প্রত্যক্ষ উপযোগ পাওয়া যাইবে।

এখানে মনে রাখা দরকার, কোন একটি দ্রব্যের ব্যবহারের তারতম্যে সেই দ্রব্যটি এক জায়গায় মূলধন হয় এবং অন্য এক জায়গায় উহা মূলধন হয় না। যেমন—কয়লা। রান্নার ঘরে কয়লা, রান্না অর্থাৎ ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়; সুতরাং, উহা সেখানে মূলধন নয়। কিন্তু কারখানার চুল্লীতে যে-কয়লা ব্যবহৃত হয়, উহা তখন উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়; সুতরাং, উহা তখন মূলধন বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু এই সংজ্ঞাটি মূলধন সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের ধারণা উপেক্ষা করিয়াছে; ব্যবসায়ীরা মূলধন বলিতে ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থ-মূলধনকে (money capital) বুঝায়। তাহা ছাড়া, এই সংজ্ঞাটিতে মূলধন-দ্রব্য ও ভোগদ্রব্য—এই দুইয়ের মধ্যে যে-পার্থক্য করা হয়, তাহাও যথার্থ নয়। কারণ একই দ্রব্য (যেমন—ঘরবাড়ী, বিদ্যুৎশক্তি, গাড়ী ইত্যাদি) উৎপাদন বা ভোগকর্ম—উভয় কার্যের জন্যই ব্যবহার করা যায়, সুতরাং উহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করা সম্ভব হয় না। এই কারণে মূলধনের উপরের সংজ্ঞাটি যথার্থ নয়।

অধ্যাপক মার্শাল 'মূলধন' উপাদানটি ব্যক্তিবিশেষ ও সমাজ—উভয় দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি তাহার সম্পদের যে-অংশ অর্থকরী আয়-

সংগ্রহের নিমিত্ত কার্যে লাগায়, তাহাই হইতেছে বাণিজ্যিক মূলধন (trade capital)। ব্যক্তিবিশেষের কারখানা, কাঁচামাল, ব্যবসায়ের সুনাম ইত্যাদি এই প্রকার মূলধনের পর্যায়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, প্রকৃতির উপাদান ব্যতীত দেশের সম্পদের যে-অংশ আয়-সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত থাকে এবং যে-আয় সাধারণ মাপকাঠি দ্বারা পরিমাপ করা যায়, তাহাই হইতেছে সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে সামাজিক মূলধন (social capital)। এই অর্থে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি মূলধন। মূলধনের যথার্থ সংজ্ঞা সম্পর্কে যে-বিভ্রান্তি দেখা দেয়, তাহা নিরসনের জন্য কেয়ার্নক্রশ (Cairncross) মূলধনের তিনটি রূপের উল্লেখ করেন ঃ (ক) বস্তুগত মূলধন (উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি), (খ) অর্থকরী মূলধন (ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত অর্থ-মূলধন) ও (গ) ঋণ-মূলধন (শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি)।

মূলধনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ঃ

ক। অতীত শ্রমের ফল ঃ মূলধন মানুষের অতীত শ্রমের ফল। জমির মতো ইহা প্রাকৃতিক দান নহে।

খ। উৎপাদনশীলতা ঃ মূলধন উৎপাদনশীল; শ্রমিক এককভাবে যতটা উৎপাদন করিতে পারে, মূলধনের সাহায্যে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী উৎপাদন করিতে পারে।

গ। ভবিষ্যৎ আয়ের উৎস ঃ মূলধনের মালিক মূলধন বিনিয়োগ করিয়া ইহা হইতে ভবিষ্যতে আয় উপার্জন করিতে পারে।

ঘ। সঞ্চয়ের ফল ঃ মূলধন বৃদ্ধির জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন পড়ে (এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইতেছে)।

ঙ। উৎপাদনের উপাদান ঃ মূলধন উৎপাদনের কার্যে ব্যবহৃত হয়, সরাসরি ভোগের জন্য ইহা ব্যবহার করা হয় না।

চ। অস্থায়িত্ব ঃ মূলধন-দ্রব্যাদি চিরস্থায়ী নহে, ব্যবহারের ফলে ইহা ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে, ইহা মাঝে মাঝে পরিবর্তন করিতে হয় এবং পুনরায় উৎপাদন করিতে হয়।

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ ঃ অর্থবিদ্যায় মূলধনকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া আলোচনা করা হয় ঃ

ক। ব্যক্তিগত, সামগ্রিক ও জাতীয় মূলধন (Private, Collective and National Capital) ঃ ব্যক্তির মালিকানার অধীনে যে-মূলধন থাকে এবং ব্যক্তি যাহা হইতে আয় ভোগ করে, সেই মূলধনকে 'ব্যক্তিগত মূলধন' বলে। সমাজের বা সাধারণের মালিকানায় যে-মূলধন থাকে, তাহাকে 'সামগ্রিক মূলধন' বলে ; যেমন—রেলপথ ইত্যাদি। সমস্ত ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক মূলধনের সমষ্টি হইতেছে ...ধন।

খ। নিবন্ধ ও অনিবন্ধ মূলধন (Sunk or Specific and Floating or Non-specific Capital) : 'নিবন্ধ মূলধন' শুধুমাত্র উৎপাদনের কোন একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় এবং ইহা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। যেমন —কাঠের লাঙল, বৈদ্যুতিক ক্রেণ, রেল-ইঞ্জিন ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, 'অনিবন্ধ মূলধন' বিভিন্ন প্রকার উৎপাদন-কার্যে ব্যবহার করা যায় ; যেমন—কয়লা, কাঁচা মাল, অর্থ-মূলধন ইত্যাদি।

গ। স্থায়ী ও চলতি মূলধন (Fixed and Circulating Capital) : যে-মূলধন উৎপাদন-কার্যে একবার ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয় না এবং ঐ কার্যে বহুবার ব্যবহার করা যায় সেইগুলি হইতেছে 'স্থায়ী মূলধন'। যন্ত্রপাতি, রেলপথ, কারখানা ইত্যাদি স্থায়ী মূলধন। পক্ষান্তরে, 'চলতি মূলধন' উৎপাদন-কার্যে শুধুমাত্র একবারই ব্যবহার করা যায় এবং একবার ব্যবহারের ফলে উহার রূপগত পরিবর্তন ঘটে। 'ইহারা উৎপাদন-ক্রিয়ার মধ্যে বৃত্তের ন্যায় আবর্তিত হয় বলিয়া, ইহাদিগকে 'আবর্তিত মূলধন'ও বলা হয়। কাঁচামাল, মূর্তি-গড়ার উপকরণ, কাঁচা তুলা, কাঁচাপাট, অর্থ-মূলধন ইত্যাদি চলতি মূলধনের দৃষ্টান্ত। চলতি মূলধন বা আবর্তিত মূলধন উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় কিভাবে আবর্তিত হইয়াছে তাহা নিম্নের চিত্রে দেখানো হইল :
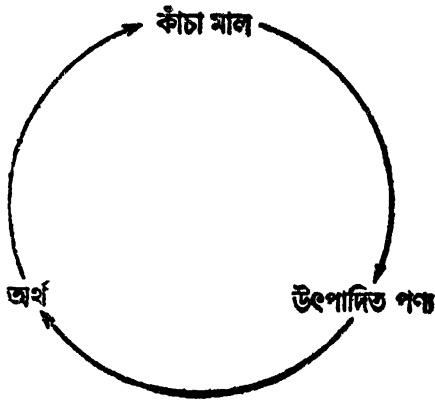
চিত্র—৪

উৎপাদনকারী তাহার অর্থ-মূলধন দ্বারা কাঁচামাল ক্রয় করিল এবং ঐ কাঁচামাল দ্বারা পণ্য উৎপাদন করিল। উহা বিক্রয় করিয়া পুনরায় অর্থ পাইল এবং আবার অর্থের দ্বারা নতুন করিয়া কাঁচামাল ক্রয় করিল। এইভাবে চলতি মূলধন উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে।

টাকাকড়ি কি মূলধন ? (Is Money Capital ?) : এই প্রসংগে স্বভাবত একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, টাকাকড়ি কি মূলধন ? ইহার উত্তরে বলা যায়, কোন

ব্যবসায়ী বা কোন ব্যক্তির নিকট লগ্নীকৃত টাকাকড়ি মূলধন বলিয়া মনে করা হইলেও সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে টাকাকড়িকে মূলধন হিসাবে গণ্য করা চলে না। কোন ব্যক্তি বা কোন ব্যবসায়ীর নিকট অর্থ হইতেছে মূলধন ; কারণ, সে উহা উৎপাদন-কার্যে বা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিয়া উহা হইতে নিয়মিত আয় অর্জন করিতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, অর্থের নিজস্ব কোন উৎপাদন-ক্ষমতা নাই, অর্থকে ব্যবহার করিতে হইলে উহা বস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী বা সেবাকার্যে রূপান্তরিত করিতে হয়। তবে অর্থ দ্বারা মূলধন-সামগ্রী ক্রয় করা যায় বলিয়া ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীর নিকট অর্থকে মূলধন ধরা হয়। কিন্তু বৃহত্তর সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে অর্থকে কোনমতেই মূলধন বলা চলে না। অর্থ যদি মূলধনই হইত, তাহা হইলে কোন দেশ শুধুমাত্র টাকাকড়ি অধিক পরিমাণে প্রচলন করিয়া দেশের মূলধন ঘাটতি সমস্যা রাতারাতি সমাধান করতে পারিত। এই কারণে অর্থকে মূলধন রূপে গণ্য না করিয়া উহার পরিবর্তে অর্থ-মূলধন (finance capital বা money capital) এই কথাটি ব্যবহার করা সমীচীন হইবে।

২. মূলধনের গুরুত্ব ও কার্যাবলী বা মূলধনের ভূমিকা (Importance and Functions of Capital or Role of Capital) : উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূলধনের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক কালে মূলধন-প্রধান (capital intensive) উৎপাদন-পদ্ধতি প্রসারের ফলে উৎপাদন-কার্যে মূলধন ব্যবহারের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা অনেক গুণ অধিক হইয়াছে। শিল্পের ক্ষেত্রে বাস্তব মূলধনের প্রাধান্য বরাবরই ছিল, কৃষিক্ষেত্রে ছিল জমির প্রাধান্য। কিন্তু আধুনিক কালে বিভিন্ন ধরনের কৃষি-যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বাস্তব মূলধনের ব্যবহার বিশেষভাবে প্রসারিত হইয়াছে। কৃষি বা শিল্প যে-কোন উৎপাদনের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন প্রকার মূলধনের গুরুত্ব বিভিন্ন ধরনের। উৎপাদন-কার্যে মূলধনের গুরুত্ব কতটুকু তাহা উহার কার্যাবলী হইতেই জানা যায়। মূলধনের কাজগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

১. শ্রমিকদের কাজের জন্য মূলধন শ্রমিকদিগকে বিভিন্ন ধরনের মূলধন-দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করে। শ্রমিকরা নানারূপ যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম লইয়া উৎপাদনের কাজ করে। ইহার ফলে তাহাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং অতি স্বল্প সময়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।

২. উৎপাদন-কাজ শেষ হইবার পূর্বেই মূলধন শ্রমিকদিগকে ভোগকর্মে সাহায্য করে। উৎপাদনকারী অর্থ-মূলধন হইতে শ্রমিকদিগকে মজুরি প্রদান করে এবং শ্রমিকরা ঐ মজুরির বিনিময়ে জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি ক্রয় করে। মজুরির জন্য শ্রমিকদিগকে উৎপাদন-কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। সুতরাং, উৎপাদন ও ভোগকর্মের মধ্যে মূলধন সমন্বয়-সাধন করে।

৩. ম‍ূলধন উৎপাদনের কার্যে বিভিন্ন প্রকার কাঁচামাল যোগান দিয়া দ্রব্য-উৎপাদন অব্যাহত রাখে। শ্রমিকরা কাঁচামালের সাহায্যে বিভিন্ন দ্রব্যাদি উৎপাদন করে।

৪. ম‍ূলধন উৎপাদন-ব্যবস্থাকে খ‍ুব জটিল ও আবর্তম‍ূলক (roundabout) করিয়া থাকে। ম‍ূলধন ব্যবহারের ফলে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সংখ্যা ব‍ৃদ্ধি পায়। উৎপাদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত লওয়া ও কার্যত উৎপাদন শ‍ুর‍ু করা—এই দ‍ুই-এর মধ্যে সময়ের বেশ ব্যবধান থাকে। আধ‍ুনিক জ‍ুতার কারখানায় বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও ম‍ূলধন-দ্রব্যাদি দিয়া উৎপাদনের কাজ করা হয় এবং ফলে জ‍ুতা-তৈয়ারির জন্য একশতটি বা তদোধিক প‍ৃথক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সমন্বয়ের মাধ্যমে জ‍ুতা তৈয়ারী হইতেছে। ইহার ফলে, উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয়-সাধন করা বিশেষ জটিল ব্যাপার হয়।

৫. ম‍ূলধন দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব‍ৃদ্ধি করে ; কিন্তু উৎপাদনের সময়কে দীর্ঘতর করিয়া তোলে। ম‍ূলধন-সমগ্রী দ্বারা উৎপাদনের কাজ নির্বাহ করিতে হইলে প্রথমেই ম‍ূলধন-দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে হয় এবং পরে ঐ দ্রব্যাদি দ্বারা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করা হয়। স‍ুতরাং, ম‍ূলধনের প্রয়োগে দ্রব্য-উৎপাদনের মেয়াদ দীর্ঘতব হয়।

৬. ম‍ূলধন-নিয়োগ দেশে কর্মসংস্থানের (employment) স‍ুযোগ ব‍ৃদ্ধি করে। ম‍ূলধনের সাহায্যে উৎপাদন-ব্যবস্থা গঠিত হয় বলিয়া আধ‍ুনিক য‍ুগে উৎপাদন-কার্যের জন্য বহ‍ু লোকের প্রয়োজন হয়। ফলে কাজের স‍ুযোগ ব‍ৃদ্ধি পায়। আধ‍ুনিক লেখকরা দেখাইয়াছেন, অধিক ম‍ূলধন-সামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব হইলে সেই দেশ দ্র‍ুত উন্নতি করিতে পারে। কারণ, অধিক ম‍ূলধন-দ্রব্যাদি দিয়া বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যাদি দ্র‍ুত উৎপাদনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

৩. **ম‍ূলধন গঠন বা ম‍ূলধন-ব‍ৃদ্ধি (Capital Formation or Growth of Capital)** : প‍ূর্বেই দেখা গিয়াছে, ম‍ূলধন-ব‍ৃদ্ধি কোন দেশের দ্র‍ুত আর্থিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন। এখন দেখা যাউক, 'ম‍ূলধন-গঠন' বা ম‍ূলধন-ব‍ৃদ্ধি বলিতে কি ব‍ুঝায় এবং কোন্ কোন্ উপাদানের উপর ইহা নির্ভর করে।

'ম‍ূলধন-গঠন' বলিতে অধিক পরিমাণে ম‍ূলধন-দ্রব্যাদির উৎপাদন করাকেই ব‍ুঝায় অর্থাৎ ম‍ূলধন-ব‍ৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোন দেশ ভোগের জন্য যে-সকল দ্রব্যাদির প্রয়োজন, তাহা অধিক উৎপাদন না করিয়া অধিক পরিমাণে ম‍ূলধন-দ্রব্যাদি উৎপাদন করিবে। যে-প্রক্রিয়ায় অধিক পরিমাণে ম‍ূলধন-সামগ্রী ব‍ৃদ্ধি পায়, তাহাই হইতেছে ম‍ূলধন-গঠন প্রক্রিয়া। অধ্যাপক র‍্যাগ‍্নার নার্ক্‌সে-এর (Ragnar Nurkse)[১] ভাষায় বলা যায়, কোন দেশ উহার বর্তমান উৎপাদনশীল ক্ষমতার সম্প‍ূর্ণ অংশ বর্তমান ভোগের প্রয়োজনে না মিটাইয়া ঐ ক্ষমতার একটি অংশ ম‍ূলধন-সামগ্রীর উৎপাদনের কাজে

১. The meaning of capital formation is that society does not apply the whole of current productive activity to the needs and desires of immediate consumption but devotes a part of it to the making of capital goods, tools and instruments, machines and transport facilities, plants and equipment.—*Nurkse*

নিয়োগ করিলে, উহাকে মূলধন-গঠন বলা হইবে। উৎপাদনের সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, পরিবহণ-সরঞ্জাম, কল-কারখানা, জলসেচ-বাঁধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-বৃদ্ধি হইতেছে মূলধন-গঠনের কাজ। ইহা ছাড়া, জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে মানবিক মূলধন গঠন হয়। দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের একটি অংশ মূলধন-দ্রব্যাদির উৎপাদন-কার্যে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। ইহার জন্য দেশে সঞ্চয়-বৃদ্ধি বা ভোগকর্ম হ্রাস করা প্রয়োজন।

সঞ্চয় হইতে মূলধন বৃদ্ধি পায় বা মূলধন-গঠন করা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, কয়েকজন জেলে একটি জাল ও একটি নৌকার সাহায্যে মাছ ধরে। মাছ বিক্রয় করিয়া তাহাদের যে-আয় হয়, উহা দ্বারা তাহাদের নিছক জীবনযাপন করা চলে। একটি জাল এবং একটি নৌকা হইতেছে উহাদের মূলধন। তাহারা আয়ের এক অংশ সঞ্চয় করিয়া, ঐ সঞ্চয় দ্বারা আরও নৌকা ও জাল কিনিতে পারে অথবা কয়েকজন জেলে মাছ ধরার কাজ হইতে বিরত থাকিয়া জাল ও নৌকা তৈয়ারি করিবে, অর্থাৎ মূলধন-বৃদ্ধির জন্য তাহাদের সঞ্চয়-বৃদ্ধি ও ভোগ-হ্রাস করিতে হইবে। কয়েকজন জেলের জীবনে যাহা প্রযোজ্য, তাহা কমবেশী সমগ্র দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কোন দেশের মূলধন বৃদ্ধি করিতে হইলে, অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করিতে হইবে। সুতরাং, মূলধন-গঠনের সূত্রটি হইল ঃ মূলধন = মোট উৎপাদন − মোট ভোগ।

মূলধন-গঠনের কাজে তিনটি সুস্পষ্ট ধাপ (stage) দেখা যায় ঃ (১) দেশে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি করা (creation of savings), (৩) সৃষ্ট সঞ্চয় একত্রে সমাবেশ করা (mobilization of savings) এবং (৩) মূলধন-দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের কাজে অর্থ-সঞ্চয় নিযুক্ত করা। ইহা সংক্ষেপে মনে রাখার জন্য নিম্নে একটি ছক দেওয়া হইল—
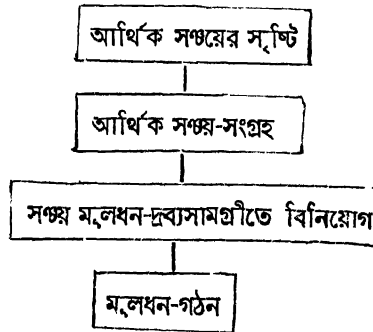
মূলধন-গঠনের এই তিনটি পৃথক পৃথক ধাপ বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। উহা ক্রমান্বয়ে নিম্নে আলোচনা করা হইল—

১. দেশে আর্থিক-সঞ্চয় সৃষ্টি ঃ কোন দেশে সঞ্চয়ের মোট পরিমাণ তিনটি ক্ষেত্র

হইতে পাওয়া যায়, যেমন—ব্যক্তিবিশেষের সঞ্চয়, যৌথ কারবারের ক্ষেত্রে সঞ্চয় ও সরকারী ক্ষেত্রে সঞ্চয়। ব্যক্তিবিশেষের সঞ্চয় নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর: (ক) মানুষের সঞ্চয় করার ক্ষমতা ও (খ) মানুষের সঞ্চয় করার ইচ্ছা।

ক। মানুষের সঞ্চয় করার ক্ষমতা তাহার আয় ও ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। আয়ের পরিমাণ অধিক ও ব্যয়ের পরিমাণ কম হইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশী হইবে। আবার আয়ের পরিমাণ কম ও ব্যয়ের পরিমাণ অধিক হইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হইবে।

খ। মানুষের সঞ্চয় করার ইচ্ছা কতকগুলি বিষয় দ্বারা প্রণোদিত হয়। প্রথমত, পরিবারের সদস্যদের প্রতি অনুরাগ থাকিলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা অধিক হয়। ছেলেমেয়ে বা ভাইবোন বা পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রীতি বা ভালবাসা গভীর হইলে, উহাদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সঞ্চয় করার ইচ্ছা প্রবল হয়।

দ্বিতীয়ত, সমাজে প্রতিপত্তি লাভের ইচ্ছা থাকিলে মানুষ সঞ্চয়ের দিকে অধিক আকৃষ্ট হয়। সঞ্চয় করিয়া বিরাট সম্পত্তির মালিক হইতে পারিলে সমাজে সম্মান পাওয়া যায় এবং প্রতিপত্তি বাড়ে।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত দূরদৃষ্টি হইতে সঞ্চয় করার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, বাড়ী-গাড়ী কেনা, পুত্রকন্যার লেখাপড়া, বিবাহাদির ব্যয়নির্বাহ ইত্যাদির জন্যও মানুষ সঞ্চয় করিয়া থাকে।

চতুর্থত, জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্যও সঞ্চয় করার ঝোঁক বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চমত, কৃপণেরা তাহাদের কৃপণস্বভাবশত সঞ্চয় করিয়া যায়।

ষষ্ঠত, দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা শান্তিপূর্ণ হইলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পায়। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা না থাকিলে মানুষ সঞ্চয় করিতে আগ্রহান্বিত হয় না। কারণ, ভবিষ্যৎ যখন অনিশ্চিত হয়, তখন সঞ্চয় করা নিরর্থক মনে হয়।

সপ্তমত, দেশে বিনিয়োগের উত্তম ব্যবস্থা না থাকিলে লোকেরা সঞ্চয়ের দিকে আকৃষ্ট হয় না। সুদৃঢ় ব্যাংকিং ব্যবস্থা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সুযোগ, জীবনবীমা করার সুযোগ ইত্যাদি থাকিলেই সঞ্চয় করার ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায়, সুদের হার অধিক হইলে সঞ্চয় করার ইচ্ছা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। কারণ, সুদ হইতেছে সঞ্চয়ের পুরস্কার। সুদের হার বেশী হইলে সঞ্চয় হইতে অধিক আয় হইবে, এই আশায় লোকেরা সাধারণত অধিক সঞ্চয় করে। কিন্তু আধুনিক কালের অনেক লেখকের মতে, সুদের হার অধিক হইলে ব্যবসায়ীদের অসুবিধা হয়। কারণ, ঋণের জন্য তাহাদের অধিক সুদ দিতে হয় এবং ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া যায়। অবশেষে দেশের লোকদের আয় যদি হ্রাস পায়, তাহা হইলে সঞ্চয় করার ক্ষমতা ও ইচ্ছা কমিয়া আসে।

আধুনিক কালে সঞ্চয়ের এক বৃহদংশ আসিতেছে, যৌথ মূলধনী কারবার বা কোম্পানীর ক্ষেত্র হইতে। ব্যবসায়ের পরিধি বিস্তীর্ণ করা ও আয়তন-প্রসারের জন্য ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান মূলত সঞ্চয় করিয়া থাকে। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক লাভ হইতে একটি অংশ নিয়মিতভাবে সঞ্চয়-তহবিল (reserve fund)-এ জমা রাখা হয়। ইহা ছাড়া, নূতন শেয়ার বা বণ্ড বিক্রয় করিয়াও ইহারা মূলধন সংগ্রহ করিয়া উহা মূলধন-সামগ্রী উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করে। আবার দেশের সরকারও মূলধন-গঠনের কাজে নিযুক্ত হয়। আধুনিক কালে দেশের সরকার নানাভাবে উহার সঞ্চয় বৃদ্ধি করিয়া দেশের মূলধন-গঠনের কাজে সাহায্য করে। কল-কারখানা, রাস্তাঘাট ও জলসেচের জন্য বাঁধ ও খাল নির্মাণ, মৃত্তিকা-সংরক্ষণ, পরিবহণ-সামগ্রী উৎপাদন ইত্যাদির ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া সরকার সামাজিক মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। ইহার জন্যও সরকারকে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। রাজস্বের উদ্বৃত্ত, সরকারী প্রতিষ্ঠানের লাভ, বৈদেশিক সাহায্য, অধিক টাকাকড়ির প্রচলন ইত্যাদি সূত্র হইতে সরকার এই অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে।

২. সৃষ্ট সঞ্চয় সংগ্রহ ও উৎপাদনশীল কার্যে বিনিয়োগ করা: মূলধন-গঠনের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশের সঞ্চয় একত্রে সমাবেশ করিয়া উহা উৎপাদনশীল কার্যে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহা মূলত নির্ভর করে দেশের অর্থবাজার, শেয়ার বাজার ও মূলধন বাজারের সঞ্চয় সংগ্রহের ক্ষমতার উপর। তাহা ছাড়া, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, বীমা ও বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা, সঞ্চয়-সংগ্রহের সরকারী ব্যবস্থা ইত্যাদি সঞ্চয়-সংগ্রহের কাজকে জোরদার করিয়া সৃষ্ট সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োগ করার পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে পারে।

৩. অর্থ-সঞ্চয় মূলধন-সামগ্রী উৎপাদনের কার্যে বিনিয়োগ করা: দেশের সংগৃহীত সঞ্চয় মূলধন-সামগ্রী উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত করা মূলত বিনিয়োগের কাজ। বিনিয়োগের পরিমাণ প্রধানত নির্ভর করে কারিগরী সুযোগ-সুবিধা, বিনিয়োগের মৌলিক সুযোগ-সুবিধা, উদ্যোক্তার কর্মকুশলতা, সরকারের নীতি, সুদের হার, বিনিয়োগ হইতে লাভের প্রত্যাশিত হার ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি বিনিয়োগের অনুকূল হইলে দেশের অর্থ-সঞ্চয় মূলধনী-সামগ্রী উৎপাদনের কার্যে নিযুক্ত করা সম্ভব হয় এবং মূলধন-গঠনের কাজকে জোরদার করা যায়।

ভারতের ন্যায় স্বল্প বিকাশিত দেশগুলিতে মূলধন-গঠন পর্যাপ্ত হয় না। উহার প্রধান কারণ হইতেছে, দেশের লোকদের স্বল্প আয় ও অপর্যাপ্ত সঞ্চয়। এই সকল দেশ-গুলিতে দ্রুত মূলধন বৃদ্ধির জন্য দেশের লোকদের আয় ও সঞ্চয় দ্রুত বাড়াইতে হইবে। এই কারণে, দেশের সঞ্চয় যাহাতে উৎপাদন-কার্যে বিনিয়োগ করা হয়, তাহার জন্য প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। তাহা ছাড়া, বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতা, ব্যাংকিং ব্যবস্থার অপর্যাপ্ত প্রসার ইত্যাদি এই কাজকে ব্যাহত করে। ভারতের মূলধন গঠনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে দেওয়া হইল।

মূলধন গঠন—ভারতের দৃষ্টান্ত ঃ ভারতে মূলধন-গঠন বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী—উভয় ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। বেসরকারী ক্ষেত্রে (private sector) মূলধন গঠন হয় বেসরকারী কোম্পানী (private corporate) ক্ষেত্রে এবং পারিবারিক (household) ক্ষেত্রে। ১৯৩৫-৪৯ সালের দ্রুত হিসাব অনুসারে ঐ বৎসর ভারতে মোট অভ্যন্তরীণ মূলধন-গঠনের (gross domestic capital formation) পরিমাণ (চলতি দামে) ছিল ৪০,৪৩৫ কোটি টাকা এবং উহার মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রের পরিমাণ হয় ১৯,৮৪৯ কোটি টাকা। সরকারী ক্ষেত্রে মূলধন-গঠনের বস্তুগুলি হইতেছে ঃ বাড়ীঘর (buildings) নির্মাণ, রাস্তা, সেতু ও অন্যান্য নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও পরিবহণের সাজ-সরঞ্জাম, বাস্তব সম্পদের (physical assets) নীট ক্রয়, মূলধন-সম্পদের মজুদ ইত্যাদি। বেসরকারী (বেসরকারী কোম্পানী ও পারিবারিক ক্ষেত্র) ক্ষেত্রে ঐ বিষয়গুলি হইতেছে—নির্মাণমূলক কাজ, যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম, মজুদ এবং বাস্তব সম্পদের ক্রয়। ভারতে মূলধন-গঠনের সূত্রগুলি নিম্নের ছকে দেওয়া হইল ঃ

মোট অভ্যন্তরীণ মূলধন-গঠন
(Gross Domestic Capital Formation by Industry of Use)

(কোটি টাকায়)

মূলধন-গঠনের ক্ষেত্র	১৯৩৫-৪৯
১। নির্মাণমূলক কার্যকলাপ	১৮,৪৯১
২। যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম	১৫,৪৫৮
৩। মজুদ বৃদ্ধি	৬,৪৮৬
মোট	৪০,৪৩৫

উপরের তালিকা হইতে ভারতের মূলধন-গঠনের বিভিন্ন বস্তুগুলি ও উহাদের আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতে মূলধন-গঠনের হার বিশেষ পর্যাপ্ত নহে। ১৯৩৫-৪৯ সালে উহা জাতীয় আয়ের মাত্র ১৩.০ শতাংশ ছিল এবং ১৯৩৫-৪৯ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া হয় জাতীয় আয়ের ১৮.০ শতাংশ। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইহার পরিমাণ অন্তত জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশ হইলে

১. *Statistical Outline of India*, 1984

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। ১৯৩৫-৪৬ সালে মোট অভ্যন্তরীণ মূলধন-গঠনে সরকারী ক্ষেত্রের অংশ ছিল ৪৬·৪ শতাংশ। ভারতে নানা কারণে মূলধন-গঠনের হার অপর্যাপ্ত হইতেছে, যেমন—সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, সঞ্চয়-সংগ্রহের কাজে নানারূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সঞ্চয়-সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত সংস্থার অভাব (বিশেষত পল্লী অঞ্চলে), মূলধন-সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উপযুক্ত সুযোগের অভাব ও স্বল্প আগ্রহ ইত্যাদি। অবশ্য, বর্তমান ভারতে পরিকল্পনার কার্যসূচীর সার্থক রূপায়ণের জন্য ও উত্তরোত্তর বৃহৎ পরিকল্পনা তৈয়ারী করার উদ্দেশ্যে মূলধন-গঠনের কাজ অধিকতর জোরদার করা হইয়ছে।

ভারতে সঞ্চয় ও মূলধন-গঠনের হার

↓

বৎসর	নীট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	বৈদেশিক মূলধনের নীট অনুপ্রবেশ	নীট অভ্যন্তরীণ মূলধন-গঠন
১৯৬২-৬২	৮·৪	২·৩	১০·৭

৬

॥ সংগঠন ও উদ্যোক্তা ॥

(Organisation and Entrepreneur)

[সংগঠন ও উদ্যোক্তা—উদ্যোক্তার কার্যাবলী ও ভূমিকা—উদ্যোক্তার কার্যাবলী হস্তান্তর]

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, উৎপাদন-কার্যের ক্ষেত্রে জমি, শ্রম ও মূলধনের মধ্যে সমন্বয়-সাধন করার কাজকে সংগঠন বলা হয়, শুধুমাত্র জমি, শ্রম ও মূলধন কোন কিছু উৎপাদন করিতে পারে না। উহাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটানোর জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লবের (industrial revolution) পূর্বে উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে সংযোগ-ঘটানোর কাজ খুবই সহজ ও সরল ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে ঐ কাজ বিশেষ জটিল হইয়াছে বলিয়া সংগঠনের কাজ করার জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন পড়ে। উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে-ব্যক্তি সংগঠনের কাজ করে, তাহাকে উদ্যোক্তা (entrepreneur) বলে। সংগঠনের কাজ জানিতে হইলে উদ্যোক্তা কি কি কাজ করে তাহাই জানিতে হয়। আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থা ও ব্যবসায় সংগঠনে উদ্যোক্তার কি ভূমিকা, তাহা নির্ণয়ের জন্য সে কি কাজ করে, তাহা আলোচনা করিতে হয়। উদ্যোক্তার কাজগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল:

১. উদ্যোক্তার কার্যাবলী ও ভূমিকা (Functions and Role of the Entrepreneur) :

(i) **উৎপাদনের নীতি-নির্ধারণ :** উদ্যোক্তা উৎপাদনের নীতি নির্ধারণ করে। কোন্ দ্রব্য উৎপাদন করা হইবে, কি পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করিবে, কি উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে, কোথায় উৎপাদন করা হইবে, কত দামে কি-পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করা হইবে ইত্যাদি বিষয়গুলি উদ্যোক্তা স্থির করে।

(ii) **পরিচালনা-সংক্রান্ত কার্যকলাপ :** উদ্যোক্তাকে উপাদান পরিচালনা-সংক্রান্ত কতকগুলি কাজ করিতে হয়। কি কি উপাদান নিয়োগ করা হইবে, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো ইত্যাদি পরিচালনা-সংক্রান্ত কিছু কিছু কাজ উদ্যোক্তাকে করিতে হয়। অবশ্য আধুনিক কালে পরিচালনার কাজ করার জন্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেতনভোগী কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। ফলে, উদ্যোক্তার এই কাজের গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে।

(iii) **উপাদানসমূহকে পারিশ্রমিক প্রদান :** উৎপাদন-কার্যে যে সকল উপাদান নিয়োগ করা হইয়াছে, সেইগুলিকে পারিশ্রমিক দেওয়ার কাজ উদ্যোক্তাকেই করিতে হয়। উদ্যোক্তা জমির মালিককে 'খাজনা', শ্রমিককে 'মজুরি', ঋণ-মূলধনের মালিককে 'সুদ' ইত্যাদি প্রদান করে।

(iv) ঝুঁকিগ্রহণ : উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে-ঝুঁকি (risk) দেখা দেয়, তাহা উদ্যোক্তা নিজেই বহন করে। আধুনিক কালে উৎপাদনের কাজে বিশেষ ঝুঁকি থাকে। উৎপাদনকারী তাহার দ্রব্যের কতখানি বিক্রয় করিতে পারিবে—ইহা তাহাকে অনুমান করিতে হয়। ঐ অনুমানের ভিত্তিতে উৎপাদন করিলে ভবিষ্যতে তাহার লাভও হইতে পারে বা ক্ষতিও হইতে পারে। সুতরাং, উৎপাদনের কার্যে লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি আছে এবং উদ্যোক্তা সেই ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া উৎপাদনের কাজ চালায়।

(v) উদ্ভাবনের কার্যকলাপ : পরিশেষে বলা যায়, উদ্যোক্তাকে উদ্যোগী হইয়া বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনের (innovation) কাজ করিতে হয়। সে অন্যান্য উদ্যোক্তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ফলে, তাহাকে নূতন নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি ও নূতন নূতন দ্রব্য, নূতন নূতন বাজার বাহির করিতে হয়। যে-সকল উদ্যোক্তা এইগুলি সর্বাগ্রে উদ্ভাবন করিবে, সে অন্যের তুলনায় বাজারে অধিক সুবিধা ভোগ করিবে এবং তাহার সফলতা বেশী হইবে।

উদ্যোক্তার উপরি-উক্ত কার্যকলাপ হইতে জানা যায়, আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় উদ্যোক্তার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় দাম-ব্যবস্থা (price system) হইতেছে অর্থনৈতিক কার্যকালাপের কেন্দ্রবিন্দু এবং ইহা হইতেছে স্বয়ংক্রিয় (automatic)। সর্বাধিক পরিতৃপ্তির জন্য ভোগকারীরা ক্রেতারূপে যে-সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে চাহে, সর্বাধিক মুনাফা-উপার্জনের উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তারা তাহা উৎপাদন করিয়া বাজারে যোগান দিতেছে। উৎপাদনের জন্য উদ্যোক্তারা আবার উপাদানের বাজারে ক্রেতারূপে উপাদানগুলির সেবাকার্য ক্রয় করিতেছে এবং ভোগকারীরা উহাদের মালিক হিসাবে উদ্যোক্তাগণের নিকট তাহা বিক্রয় করিতেছে। সর্বাধিক মুনফা উপার্জনের জন্য উদ্যোক্তারা সর্বদাই সর্বাধিক কম ব্যয়ে উৎপাদনের চেষ্টা করে এবং গবেষণা দ্বারা নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি ও নূতন পণ্য উদ্ভাবন করিতেছে। এই সমস্ত কাজের জন্য তাহারা বিরাট ঝুঁকি লইতেছে এবং এই ঝুঁকি তাহারা না লইলে 'ধনতান্ত্রিক' হউক বা 'মিশ্র ধনতান্ত্রিক' হউক অর্থব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িত। কিন্তু যৌথ মূলধনী কারবার ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রসারের ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তার গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। যৌথ মূলধনী কারবারে (joint-stock company) উদ্যোক্তা খুঁটিনাটি কার্যকলাপ নিজে সম্পাদন করে না, উহা তাহার অধস্তন বেতনভোগী কর্মচারীদিগকে সমর্পণ করিয়া উদ্যোক্তা ব্যবসায়ের সামগ্রিক পরিকল্পনা তত্ত্বাবধানের কাজে মনোনিবেশ করে। আবার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগাধীন কারবারে রাষ্ট্র বা সরকার উদ্যোক্তার কাজ করে।

২. উদ্যোক্তার কার্যাবলী হস্তান্তর (Delegation of functions of the Entrepreneur) : আধুনিক কালে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তন পূর্বাপেক্ষা বৃহদাকার ও উৎপাদন-ব্যবস্থা জটিলতর হওয়ায় উদ্যোক্তাকে তাহার সকল কার্য সম্পাদন করিতে হয় না। উদ্যোক্তা ছোটখাট কার্যের ভার অধস্তন কর্মচারীদের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিজে পরিকল্পনা ও সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে মনোনিবেশ করিয়া থাকে।

ক্ষুদ্র আয়তনের ব্যবসায়ে পরিচালন-সংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ উদ্যোক্তাকেই সম্পন্ন করিতে হয়। ব্যবসায়ের প্রতিটি বিভাগের উপর তাহার সতর্ক দৃষ্টি থাকে এবং তাহার অধস্তন কর্মচারীরা তাহার অধীনে পূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে উদ্যোক্তা নিজেই হইতেছে একাধারে শ্রমিক, পরিচালক, মুখ্যকর্মী (foreman), নিয়োগকর্তা, মূলধন-যোগানদার ইত্যাদি।

কিন্তু উদ্যোক্তাকে যোগ্যতম সংগঠনকারী হইতে হইলে ব্যবসায়ের আয়তন বড় করিতে হয়, কম ব্যয়ে উৎপাদন করিয়া ব্যবসায়ের মুনাফা বৃদ্ধি করিতে হয়। ব্যবসায়ের আয়তন ক্রমশ বড় হইলে উদ্যোক্তার পক্ষে সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। সকল খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি রাখা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়, বহুসংখ্যক অধস্তন কর্মচারীদের কার্যকলাপ ঠিকমতো তত্ত্বাবধান করাও তাহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। তাহা ছাড়া, উদ্যোক্তা যতই সুদক্ষ ও উদ্যোগী হউক না কেন, তাহার পক্ষে বৃহৎ ব্যবসায়ের জটিল কার্যকলাপ একা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এই কারণে, ব্যবসায়ের আয়তন বড় হইলে উদ্যোক্তা তাহার খুঁটিনাটি ও রুটিনমাফিক কার্যকলাপের কিছু অংশ অধস্তন, বেতনভোগী কর্মচারীদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া দেয়। যেমন—কাঁচামাল ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ, শ্রমিক নিয়োগ, ব্যবসায়ের বিভিন্ন বিভাগের দৈনন্দিন কার্যকলাপ, ভাড়া-করা উপাদানের মালিককে পারিশ্রমিক দেওয়া, কর্মচারীদের হাজিরা রাখা ইত্যাদি রুটিনমাফিক কার্যকলাপ উদ্যোক্তা তাহার অধীন কর্মচারীদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া দেয়।

উদ্যোক্তার কম গুরুত্বসম্পন্ন খুঁটিনাটি কাজ কর্মচারীদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া দিলে উদ্যোক্তা নিজে ব্যবসায়ের আরও অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন ও ঝুঁকিবহুল কার্য-কলাপের দিকে মনোনিবেশ করিতে পারে। যেমন—সে ব্যবসায়ের কঠিন সমস্যাবলী পরিপূর্ণভাবে বিচার করার সময় পাইবে, উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় কিরূপ পরিবর্তন ঘটিতেছে বা কি কি নূতন ধরনের উৎপাদন-প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হইতেছে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতে পারে, দেশীয় বা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যবসায়ের স্বার্থে নূতন নূতন ব্যবসা-সম্পর্ক (business contacts) স্থাপন করিতে পারে, উৎপাদনের নূতন নীতি ও নূতন কার্যক্রম নির্ধারণ করিতে পারিবে, উপযুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে দ্রব্য-বিক্রয়ের নূতন কার্যক্রম ও অভিযান শুরু করিতে পারিবে ইত্যাদি। অর্থাৎ, ছোটখাট কার্যের ভার অধস্তন কর্মচারীদের হস্তে সমর্পণ করা হইলে উদ্যোক্তা নিজেই ব্যবসায়ের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানের দিকে আরও অধিকতর সময় ও দৃষ্টি দিতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উদ্যোক্তার ছোটখাটো কার্যকলাপ অপরের নিকট হস্তান্তর করা একমাত্র বৃহৎ প্রতিষ্ঠানেই সম্ভব। কারণ; ব্যবসায়ের সামগ্রিক কার্যকলাপ বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগে বণ্টন করিয়া প্রতিটি বিভাগ ও উপবিভাগের জন্য পারদর্শী ও সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ একমাত্র বৃহৎ প্রতিষ্ঠানই করিতে পারে।

উদ্যোক্তার কর্তৃত্বের এইরূপ ভাগাভাগিতে নানারূপ অসুবিধা দেখা দেয়। কারণ

যে-সকল কর্মচারীর উপর পরিচালনার দায়দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহাদিগকে দায়িত্বশীল হইতে হইবে, নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষ সচেতন হইতে হইবে এবং উদ্যোক্তার প্রতি তাহাদের পূর্ণ আনুগত্য থাকিবে। অন্যথায় ব্যবসায়ের সাংগঠনিক কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, আধুনিক কালে বৃহদাকার যৌথ মূলধনী কারবার ও রাষ্ট্রীয় কারবারের প্রসারের ফলে উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত উদ্যম ও প্রচেষ্টার পরিধি বিশেষভাবে সংকুচিত হইয়াছে। কারণ, ঐ সকল ব্যবসা-পরিচালনার জন্য পরিচালকবর্গ (Board of Directors) গঠন করা হয় এবং ব্যবসায়ের সামগ্রিক নীতি ও কর্মপন্থা পরিচালকবর্গই স্থির করিয়া দেয় এবং ব্যবসায়ের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য বেতনভোগী বিশেষজ্ঞ-কর্মচারী থাকে এবং ব্যবসায়ের ঝুঁকি বস্তুত শেয়ারমালিকরাই গ্রহণ করিয়া থাকে।[১] এই সকল প্রতিষ্ঠানে উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও কর্মোদ্যমের সুযোগ একরূপ নাই বলিলেই চলে। এই কারণেই বলা হয়, আধুনিক কালে 'শিল্প অধিনায়কের যুগ' (days of the captains of the industry) প্রকৃতপক্ষে শেষ হইয়া গিয়াছে।

—

ভারতে কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী
১। টাটা
২। বিড়লা
৩। মফৎলাল
৪। জে. কে
৫। থাপার
৬। আই. সি. আই

১. Hanson—A Text-Book of Economics, Chap. 6

৭

। উৎপাদনের আয়তন ॥

(Scale of Production)

[উৎপাদনের আয়তন কথাটি অর্থ'—উপাদানের' অবিভাজ্যতা—বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা—অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত ব্যয়সংকোচ—উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের প্রসারের সীমা—কাম্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ধারণা—ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের সুবিধা ও অসুবিধা]

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে উৎপাদন ও ইহার বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে 'উৎপাদনের আয়তন' (scale of production) কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, উৎপাদনের আয়তন বলিতে কি বুঝায় ? তাছাড়া, আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় বৃহদায়তন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের যে প্রাধান্য দেখা যাইতেছে, তাহার কারণ কি ? বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার যুগেও যে-উৎপাদনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান টিঁকিয়া রহিয়াছে, তাহার বা কি কারণ ? এই বিষয়গুলি এই অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হইবে।

১. 'উৎপাদনের আয়তন' কথাটি অর্থ কি ? (What is meant by Scale of Production) ?ঃ 'উৎপাদনের আয়তন' বলিতে কোন প্রতিষ্ঠান যে-মাত্রায় উৎপাদন করে, তাহাকেই বুঝায়। আরও পরিষ্কারভাবে বলা যায়, উৎপাদনের আয়তন কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তনের পরিমাপ নির্দেশ করে। কোন প্রতিষ্ঠান বড় আয়তনে বা ছোট আয়তনে উৎপাদন করিতে পারে। অর্থাৎ, প্রচুর মূলধন, অধিক সংখ্যক উন্নত ধরনের সাজ-সরঞ্জাম লইয়াও উৎপাদন করা যায় ; অথবা স্বল্প মূলধন, স্বল্পসংখ্যক শ্রমিক ও ন্যূনতম সাজ-সরঞ্জাম লইয়াওউৎপাদন করা চলে। প্রথম প্রকার উৎপাদন কার্যকে বৃহদায়তনের উৎপাদন (large-scale production) এবং দ্বিতীয় প্রকার উৎপাদন-কার্যকে ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদন (small-scale production) বলা হয়।

কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের আয়তন কতকগুলি বিষয় দ্বারা পরিমাপ করা হয়। উহাদের মধ্যে মুখ্য বিষয়গুলি হইতেছে—(ক) উৎপাদন-কার্যে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ, (খ) শ্রমিক-নিয়োগের পরিমাণ, (গ) উৎপাদন-কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের প্রকৃতি, (ঘ) উৎপাদন-পদ্ধতি, (ঙ) উৎপাদিত পণ্যের মোট মূল্য ইত্যাদি। ভারতে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ধারণের জন্য ব্যবসায়ে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ বিচার করা হয়। ভারত সরকারের বর্তমান সংজ্ঞা
সালের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বিবৃতি অনুসারে) অনুযায়ী 'ক্ষুদ্রায়তন' বলিতে উৎপাদন-যন্ত্রপাতিতে (plant and machinery) ৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত

বিনিয়োগকারী সকল প্রতিষ্ঠানকেই বুঝায়। ইহা হইতে বুঝা যায়, বৃহদায়তন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে মূলধন পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী হইবে।

আধুনিক কালে উৎপাদন-ব্যবস্থা বৃহদায়তন হওয়ার দিকে বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। ইস্পাত-কারখানা, তুলাবস্ত্র মিল, কয়লা খনি, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প-প্রতিষ্ঠান এমন-কি কৃষির উৎপাদনক্ষেত্রেও বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি কারণে উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্রমশ বৃহদায়তনের হইতেছে। ঐ কারণগুলি হইতেছে: (১) উৎপাদন-কার্যে ব্যাপক ও প্রগাঢ় শ্রমবিভাগ ব্যবস্থার প্রয়োগ, (২) উৎপাদন-কার্যের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ (৩) উৎপাদন-কার্যে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার, (৪) উন্নত অভিনব উৎপাদন-পদ্ধতির উদ্ভাবন ও উৎপাদন-কার্যে আধুনিক প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রয়োগ, (৫) পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে বিক্রয়-বাজারের প্রসার (৬) ব্যাংকিং, বীমা, মূলধন-বাজার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি। উৎপাদন-ব্যবস্থা বৃহদায়তন হওয়ার ফলে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকে, উহাকে সংক্ষেপে 'আয়তন-জনিত ব্যয়সংকোচ' (economies of scale) বা বৃহদায়তনের সুযোগ-সুবিধা (advantages of large-scale production) বলা হয়। ইহা একটু পরেই আলোচনা করা হইবে।

২. **উপাদানের অবিভাজ্যতা (Indivisibility of Factors):** উৎপাদনের ক্ষেত্রে 'আয়তন-জনিত ব্যয়সংকোচের' (economies of scale) ধারণাটি অর্থবিদ্যার আর একটি ধারণার সঙ্গে যুক্ত, উহা হইতেছে 'উপাদান অবিভাজ্যতার' ধারণা (concept of indivisibility of factors)। উৎপাদন-কার্যের এমন কতকগুলি উপাদান আছে, যাহা ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা যায় না, যেমন—কোন কোন যন্ত্রপাতি বা মূলধন-সামগ্রী আছে, যাহা হইতে কোনরূপ প্রতিদান (returns) পাইতে হইলে বা যাহা ব্যবহার করিতে হইলে উহা একটি ন্যূনতম নির্দিষ্ট আয়তনের হইতেই হইবে, উহা বিভক্ত করিয়া ছোট ছোট অংশে ব্যবহার করা আদৌ সম্ভব নয় বা ন্যূনতম আয়তন অপেক্ষা কম আয়তনের উহা ব্যবহার করা হইলেই মোটেই তাহা লাভজনক হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, জল-বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য উৎপাদন-যন্ত্রপাতি (plant) বড় আয়তনের হইতেই হইবে, ব্লাস্ট ফারনেস্ বিভক্ত করা যায় না, রেল পরিবহণের জন্য শুরুতেই বড় আয়তনের বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন পড়ে, ব্যবসা-পরিচালনার জন্য অত্যন্ত কয়েকজন পরিচালকের দরকার পড়ে ইত্যাদি। এইসকল উপাদানগুলি অবিভাজ্য এবং ইহাদের আকৃতি একটি নির্দিষ্ট আয়তনের না হইলে উহাদের নিকট হইতে যথাযোগ্য প্রতিদান পাওয়া যায় না। বা উহা ব্যবহার করা আদৌ সম্ভব হয় না।

সুতরাং দেখা যায়, উৎপাদন-কার্যের জন্য কোন কোন উপাদানের প্রয়োজন পড়ে, যাহার আয়তন বেশ বড় ও অবিভাজ্য হয়। এইসকল ক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রারম্ভে অধিক পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করিতে হয়, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ কম হইলে অর্থাৎ

অবিভাজ্য উপাদানটির কাম্য ব্যবহার (optimum use) না হওয়া পর্যন্ত প্রতি একক উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ কমিতে থাকে এবং উহার ফলে 'আয়তন-জনিত ব্যয়সংকোচ' ভোগ করা যায়। কিন্তু যে-স্তরে অবিভাজ্য উপাদানটির কাম্য ব্যবহার হয়, সেই স্তরে একক প্রতি উৎপাদন-ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম হয় উহা অপেক্ষা আরও অধিক ব্যবহার করা হইলে প্রতি একক উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে থাকে।

উপরের বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝানো যাইতে পারে। ইহা খুবই স্পষ্ট, রেল-পরিবহণের জন্য প্রথমেই রেললাইন পাতা, রেলইঞ্জিন ও গাড়ী তৈয়ারী করা, স্টেশন নির্মাণ করা, সিগন্যালের ব্যবস্থা করা, ইঞ্জিনচালক ইত্যাদি কর্মী নিয়োগ করা প্রভৃতি একই সঙ্গে করিতে হয় এবং এই ক্ষেত্রে সাজ-সরঞ্জাম ছোট ছোট অংশে ভাগ করিয়া নিয়োগ বা ব্যবহার করা যায় না এবং এই সকল কাজের জন্য প্রথমেই প্রচুর পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করিতে হয়। নির্মাণকার্য সম্পন্নের পর প্রথমে একটি মাত্র ট্রেন চালানো হইলে ট্রেন-প্রতি পরিচালন-ব্যয় অধিক হইবে। কিন্তু, অধিক সংখ্যায় ট্রেন চালানো হইলে অবিভাজ্য উপাদানগুলির পরিমাণ স্থির থাকে বলিয়া ট্রেন-প্রতি পরিচালন-ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকে। অবশ্য অবিভাজ্য উপাদানগুলির পূর্ণ ব্যবহারের পর আরও অধিক সংখ্যায় ট্রেন চালাইলে ট্রেন-প্রতি পরিচালন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুতরাং দেখা যায়, 'আয়তন-জনিত ব্যয়-সংকোচ' ও 'উপাদানের অবিভাজ্যতা'—এই ধারণা দুইটি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

৩. বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধাসমূহ (Economies of Large-scale Production): পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্রমবিভাগ, যন্ত্রপাতির প্রয়োগ, বাজারের প্রসার, উপাদানের অবিভাজ্যতা, নূতন উৎপাদন-পদ্ধতির প্রবর্তন ইত্যাদির ফলে বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব হইতেছে। ইহা ছাড়া, সমন্বয়ের (combination) মাধ্যমে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জোট বাঁধিয়াও কোন প্রতিষ্ঠান বড় হইতে পারে। এখানে প্রতিষ্ঠানের আয়তন-বৃদ্ধি-জনিত যে-সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, সেইগুলিই আলোচনা করা হইবে। বৃহদায়তন উৎপাদনের কতকগুলি সুবিধা আছে। ঐ সুবিধাগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(ক) অভ্যন্তরীণ ব্যয়-সংকোচ (Internal Economies) ও (খ) বহিরাগত বা বাহ্যিক ব্যয়-সংকোচ (External Economies)।

ক। অভ্যন্তরীণ ব্যয়-সংকোচ: কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কোনরূপে সম্প্রসারণ ঘটার ফলে যে-সকল সুযোগ-সুবিধা দেখা দেয়, তাহা হইতেছে 'অভ্যন্তরীণ ব্যয়-সংকোচ'। কোন একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান যখন ক্রমাগত বড় হইতে থাকে—অর্থাৎ কোন প্রতিষ্ঠান যখন অধিক শ্রমিক ও অধিক মূলধন নিয়োগ করিয়া বৃহৎ আয়তনে উৎপাদন করে, তখন ঐ প্রতিষ্ঠানটি কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। যেমন—অর্থসংগ্রহের সুবিধা, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োগের সুবিধা, ইত্যাদি। এই সুবিধাগুলির জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানকে বাহিরের কোন উন্নতির উপর নির্ভর করিতে হয় না এবং ঐগুলি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানটি এককভাবে ভোগ করে।

খ। **বহিরাগত বা বাহ্যিক ব্যয়-সংকোচ ঃ** পক্ষান্তরে, কোন শিল্পের মধ্যে যখন কোন সম্প্রসারণ ঘটে, তখন ঐ শিল্পে অবস্থিত সকল প্রতিষ্ঠান, কতকগুলি বিশেষ ধরনের সুযোগ-সুবিধা পায়। এখানে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কোনরূপ প্রসার না ঘটিলেও চলে, প্রতিষ্ঠানের বাহিরে উন্নতি ঘটে। যেমন, কোন একটি শিল্পে প্রারম্ভে মাত্র ৫টি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ছিল, কিন্তু পরে উহার সংখ্যা হইল ৫০টি। ইহার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলি গবেষণা, শ্রমবিভাগ, সংবাদ আদান-প্রদান ইত্যাদি কতকগুলি ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবে। এইগুলিকে 'বহিরাগত বা বাহ্যিক ব্যয়-সংকোচ' বলা হয়। এইসকল সুযোগ-সুবিধার জন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে বাহিরের উন্নতির উপর নির্ভর করিতে হয় এবং এইগুলি সংশ্লিষ্ট শিল্পের অন্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠানই কম-বেশী ভোগ করিয়া থাকে।

এই দুইপ্রকার ব্যয়-সংকোচ সম্বন্ধে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত ব্যয়-সংকোচের পার্থক্যটি কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ (শিল্পের দৃষ্টিকোণ হইতে নয়) করা হয়। কারণ, কোন প্রতিষ্ঠানের যাহা বহিরাগত ব্যয়-সংকোচ, তাহা শিল্পের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ হইতে অভ্যন্তরীণ ব্যয়-সংকোচ হইয়া পড়ে। যেমন—কোন তুলাবস্ত্র মিলের যাহা বহিরাগত ব্যয়সংকোচ, তাহা তুলাবস্ত্র শিল্পের দৃষ্টিকোণ হইতে ঐ শিল্পটির অভ্যন্তরীণ ব্যয়-সংকোচ। দ্বিতীয়ত,. স্থিতিশীল (static) অর্থব্যবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন বা প্রসার মানিয়া লওয়া হয় না বলিয়া ঐরূপ অর্থব্যবস্থায় কোনরূপ বহিরাগত ব্যয়-সংকোচ হইতে পারে না। কারণ, এইপ্রকার ব্যয়-সংকোচ পারিপার্শ্বিক উন্নয়নের ফলেই হইয়া থাকে।

অভ্যন্তরীণ ব্যয়-সংকোচ বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে ঃ
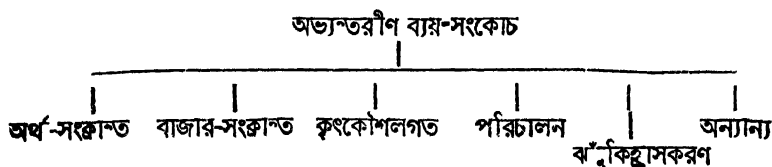
ক। অর্থ-সংক্রান্ত ব্যয়-সংকোচ ঃ বৃহৎ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ছোট প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আর্থিক ব্যাপারে কতকগুলি সুবিধা ভোগ করে। বড় বড় প্রতিষ্ঠান অনায়াসে বাজারে শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। আবার, ইহারা ইচ্ছা করিলে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অর্থ-প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে স্বল্প সুদের হারে বা সুবিধা শর্তে অধিক ঋণ লইতে পারে। কিন্তু, কোন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এই সুবিধাগুলি এত ভোগ করিতে পারে না।

খ। বাজার-সংক্রান্ত বা বাণিজ্যিক ব্যয়-সংকোচ: বৃহৎ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বাজার হইতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল, মূলধন সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি ক্রয় করে। সুতরাং ইহারা অপেক্ষাকৃত সুবিধা দরে ঐ জিনিসগুলি ক্রয় করিতে পারে। আবার, বৃহদায়তনের প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন, প্রচারকার্য ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের ও বিদেশের বাজারে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে। বাটা কোম্পানী বৃহৎ আয়তনে জুতা তৈয়ারী করে বলিয়া ঐ কোম্পানী নানারূপ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে।

গ। যান্ত্রিক বা কৃৎকৌশলগত ব্যয়-সংকোচ: বৃহদায়তনের প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপাদন-কার্যের জন্য অভিনব ও উন্নত ধরনের কৃৎকৌশল ও বৃহদাকারের আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিতে পারে। উৎপাদনের কার্যে শ্রমবিভাগ হয় বলিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ার জন্য পৃথক পৃথক যন্ত্রপাতি নিয়োগ করা সম্ভব হয়। বৃহদাকারের সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠান রোটারি মেশিন নিয়োগ করিতে পারে, কিন্তু ছোট প্রতিষ্ঠান উহা করিতে পারে না। ইহার ফলে, বৃহদাকারের প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন-ব্যয় ও দ্রব্যের দাম হ্রাস পায় এবং দ্রব্যের মান উন্নত হয়।

ঘ। পরিচালন-সংক্রান্ত ব্যয়-সংকোচ: বৃহদাকারের প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য সুদক্ষ উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ, যেমন,—চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে ইহা সম্ভব হয় না। আবার বৃহদাকারের প্রতিষ্ঠানে শ্রমবিভাগ দ্বারা প্রশাসনিক কার্যকলাপ বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় এবং প্রতিটি বিভাগ ও উপবিভাগের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। তদুপরি উদ্যোক্তা তাহার কার্যকলাপের খুঁটিনাটি, রুটিন-মাফিক কাজগুলি অধস্তন কর্মচারীদের নিকট অর্পণ করিয়া নিজে প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর পরিকল্পনার দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিতে পারে।

চ। ঝুঁকি হ্রাসকরণ ব্যয়-সংকোচ: বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া উৎপাদন-কার্যের ঝুঁকি হ্রাস করিতে পারে। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র একটি ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে। ঐ ব্যবসায়ের ক্ষতি হইলে প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক ক্ষতি হয়; কিন্তু, বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এক জায়গায় ক্ষতি হইলে অন্যত্র লাভ হয় বলিয়া প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ক্ষতি হয় না। ইহা ছাড়া, বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বাজার হইতে কাঁচামাল ক্রয় করে এবং বিভিন্ন বাজারে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করে, ইহার ফলেও ঝুঁকি হ্রাস পায়।

ছ। অন্যান্য সুবিধা: ইহা ছাড়া, বৃহৎ প্রতিষ্ঠান উপজাত দ্রব্যাদি (byproducts) তৈয়ারী করিতে পারে। যেমন,—বৃহদাকারের চিনির কারখানা পরিত্যক্ত নিংড়ানো ইক্ষু হইতে কাগজ ও কার্ডবোর্ড করিয়া উহা বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতি চিনির কারখানা উহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। আবার, বৃহদাকারের উৎপাদনের ফলে দেশে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। তদুপরি অবিভাজ্য

উপাদানের পূর্ণ ব্যবহার, নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ স্থাপন, শ্রমকল্যাণের জন্য অধিক অর্থব্যয় ইত্যাদিও বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানেই সম্ভব হয়।

পক্ষান্তরে, বহিরাগত ব্যয়-সংকোচগুলি নিম্নরূপ :
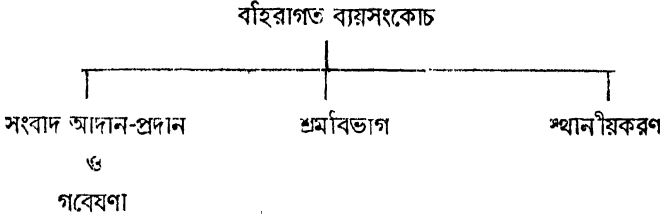
ক। সংবাদ আদান-প্রদান ও গবেষণা-সংক্রান্ত ব্যয়সংকোচ : একই শিল্পে বহু-সংখ্যক প্রতিষ্ঠান থাকিলে উহারা মিলিত হইয়া নিজেদের মধ্যে খবরাখবর আদান-প্রদান করিতে পারে। ইহা ছাড়া, উহারা দ্রব্যের মান উন্নত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন (research and development) বিভাগ খুলিতে পারে।

খ। শ্রমবিভাগ সংক্রান্ত ব্যয়সংকোচ : কোন শিল্পে বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান থাকিলে উহাদের মধ্যে কাজ ভাগাভাগি হইতে পারে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন কাজের দায়িত্ব লইয়া একযোগে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারে।

গ। স্থানীয়করণ-সংক্রান্ত ব্যয়সংকোচ : বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান যখন কোন একটি বিশেষ স্থানে গড়িয়া ওঠে, তখন উহারা শিল্পের স্থানীয়করণের সুবিধাগুলি ভোগ করিতে পারে, যেমন—নিয়মিত কাঁচামালের যোগান, সস্তায় শ্রমিকের যোগান, স্বল্প দামে মূলধন-দ্রব্যাদি ক্রয় ইত্যাদি।

বৃহদায়তন উৎপাদনের অসুবিধা : বৃহদায়তন উৎপাদনের উপরি-উক্ত সুবিধা-গুলি থাকা সত্ত্বেও কোন একটি প্রতিষ্ঠান ক্রমাগত বড় হইতে পারে না। কোন প্রতিষ্ঠান যতই বড় হইতে থাকে, ততই ইহার সুবিধাগুলি কিছু বাড়ে; কিন্তু কতক-গুলি অসুবিধা দেখা দেয়। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন বড় হইতে হইতে অবশেষে কাম্য বা সর্বোত্তম আয়তনে (optimum size) আসিয়া পৌঁছায়। কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান 'কাম্য-আয়তন'-এর হইলে ইহার সুযোগ-সুবিধা সর্বাপেক্ষা বেশী হয় এবং প্রতি একক উৎপাদন-ব্যয় বা গড় ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম হয়। ঐ আয়তন অতিক্রম করিয়া প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ঘটিলে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দেয় এবং ইহাই বৃহদায়তন উৎপাদনের অসুবিধা (diseconomies of large scale production)। ঐ অসুবিধাগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত, বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থায় পরিচালনার সমস্যা জটিল হইয়া পড়ে। উৎপাদন-ব্যবস্থার বহুসংখ্যক বিভাগ ও উপবিভাগ থাকার জন্য ইহাদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিয়া সুষ্ঠুভাবে উৎপাদনের কার্য পরিচালনা করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়। এই অসুবিধার জন্য অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রসার লাভজনক হওয়া

সত্ত্বেও মালিক উহা করিতে রাজী থাকে না। বহু ব্যবসায়ী স্বল্পলাভেই সন্তুষ্ট থাকে এবং তাহারা অধিক মুনাফার পরিবর্তে অধিকতর স্বাধীনতা ও বিশ্রাম-এর (freedom and leisure) উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। ইহার ফলে প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃহদাকার হইতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান যতই বৃহদাকার হয়, ততই উহার অধিক মূলধনের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু উহা অতিরিক্ত মূলধন যোগাড় করিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থকরী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করে বলিয়া উহার জন্য যে-সুদ দেয়, তাহার মোট পরিমাণ খুবই অধিক হয়।

তৃতীয়ত, বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে মালিক ও শ্রমিকের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। ইহার ফলে, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক প্রায়ই বিঘ্নিত হয় এবং শিল্প-বিরোধ দেখা দেয়।

চতুর্থত, বৃহদায়তন উৎপাদনের আর-একটি অসুবিধা হইতেছে দ্রব্য-বিক্রয়করণের। উৎপাদনের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই ব্যাপক বাজারের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ভৌগোলিক কারণে পরিবহণের অসুবিধার জন্য বাজারের আয়তন ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, তখন বৃহদায়তন উৎপাদন লাভজনক হয় না।

পরিশেষে বলা যায়, বৃহদায়তন উৎপাদনে অধিক পরিমাণে মূলধন নিয়োগ করা হয়। সুতরাং উৎপাদন-কার্য ব্যর্থ হইলে অধিক পরিমাণে মূলধন ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে।

বৃহদায়তন উৎপাদনের এই অসুবিধাগুলি কোন প্রতিষ্ঠানের সীমা নির্ধারণ করিয়া দেয়। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন বাড়াইবার একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকে। এই সীমা অতিক্রম করিয়া গেলেই উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে থাকে এবং নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

৪. উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের প্রসারের সীমা বা প্রতিবন্ধক (Limits to the expansion of firms) : পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, আয়তনজনিত বিবিধ ব্যয়সংকোচের সুবিধা সত্ত্বেও কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ক্রমাগতই বড় হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ইহার প্রসারের পথে কতকগুলি বাধা (obstacles to growth) দেখা দেয় এবং ঐ বাধাগুলি প্রতিষ্ঠানের প্রসার সীমায়িত করে। এই বাধাগুলি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল :

ক। পরিচালনাগত বাধা : পরিচালনার অসুবিধার জন্যই অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত হইতে পারে না। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে পরিচালনার ব্যবস্থা অতি জটিল হয় বলিয়া কোন বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সময় অযথা বিলম্ব ঘটে এবং নানারূপ অপচয় ঘটে। তদুপরি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন একটা বিশেষ সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে তাহা পরিচালনা করা দুষ্কর হইয়া পড়ে ; কারণ, সকল সময় যোগ্য পরিচালক পাওয়া যায় না। আবার, বড় প্রতিষ্ঠানে পরিচালক-

বর্গের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষও (clash of personalities) ব্যয়াধিক্যের সৃষ্টি করিয়া আয়তন প্রসারের পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে। পরিশেষে উল্লেখ করা যায়, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন বড় হইলে মালিক সকল বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে পারে না। সুতরাং, 'মালিকের সজাগ দৃষ্টি-জনিত ব্যয়সংকোচ' (economy of the master's eye) বড় প্রতিষ্ঠান ভোগ করিতে পারে না :

খ। বাজারজনিত বাধা : উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিতে অসুবিধা হয় বলিয়া কোন প্রতিষ্ঠান ক্রমাগত বড় হইতে পারে না। বাজার যদি স্বল্প পরিধির (যেমন,—দেহের কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-এর বাজার) হয়, তবে বৃহদায়তনে উৎপাদন করিয়া কোন লাভ নাই। ভৌগোলিক কারণে পরিবহণ-ব্যয়ের জন্য উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার সাধারণত সীমায়িত হইয়া পড়ে। কোন কোন শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সংগ্রহের সূত্র দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া থাকে। ফলে, বিভিন্ন স্থান হইতে অধিক পরিমাণে কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া উৎপাদন-কেন্দ্রে আনিতে ব্যয়ের পরিমাণ খুব বেশী হইয়া পড়ে। আবার, আসবাবপত্র নির্মাণের পতিষ্ঠান, পাঁউরুটির কারখানা (bakeries) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত দ্রব্যাদি দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় করিতে ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়। ইহার ফলে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রসারের পথে বাজার-জনিত বাধা দেখা দেয়। বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয়-সংকোচ হেতু উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইবে সত্য, কিন্তু উৎপন্ন মাল কিছু অবিক্রীত থাকিয়া যাইবে। সুতরাং, বাজার-জনিত বাধার ফলে কোন প্রতিষ্ঠান ক্রমাগত বড় হইতে পারে না।

গ। মূলধন-সংগ্রহজনিত বাধা : কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের মালিক যে-পরিমাণ মূলধন নিজস্ব পুঁজি হইতে যোগান দিতে পারে বা যে-পরিমাণ মূলধন সে ঋণ লইতে পারে, তাহার উপরই প্রতিষ্ঠানের প্রসারের সীমা নির্ভর করে। প্রতিষ্ঠানের আয়তন বড় হইলে ইহা সহজেই শেয়ার বা বণ্ড বিক্রয় করিয়া বা ব্যাংক হইতে ঋণ লইয়া মূলধন বাড়াইতে পারে সত্য, কিন্তু ইহার আয়তন ক্রমশ বড় হইলে মূলধন-সংক্রান্ত ব্যাপারে নানারূপ অসুবিধা দেখা দেয়। যেমন—মূলধন-ক্ষতির আশংকা, সুদের অত্যধিক বোঝা, ঋণ পরিশোধের অসুবিধা, ঋণ-মূলধনের সুষ্ঠু ব্যবহার ইত্যাদি সমস্যাগুলি প্রতিষ্ঠানের প্রসারের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

ঘ। অন্যান্য বাধা : ইহার মধ্যে আছে আয়তন-প্রসারজনিত ব্যয়াধিক্য, উৎপাদনের পদ্ধতি-সংক্রান্ত বাধা, প্রতিযোগিতা-শক্তি বৃদ্ধির ইচ্ছা ইত্যাদি। আয়তন প্রসারের সঙ্গে অন্যান্য নানাপ্রকার ব্যয়াধিক্য দেখা দেয় বলিয়া কোন কোন প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট সীমার পর সম্প্রসারিত হইতে পারে না।

কাম্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ধারণা : উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের প্রসারের পথে নানারূপ প্রতিবন্ধক থাকায় কোন প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট সীমার পর আর বড় হইতে চাহে না বা পারে না। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন বড় হইতে হইতে অবশেষে 'কাম্য-আয়তনে' (optimum) আসিয়া পৌঁছায়। কাম্য-আয়তন বলিতে কোন প্রতিষ্ঠানের

সর্বোত্তম আয়তন'কেই বুঝায়। অধ্যাপক হ্যান্‌সন-এর (Hanson) ভাষায় বলা যায়, "কোন শিল্পে সর্বাধিক সুদক্ষ প্রতিষ্ঠানই হইতেছে কাম্য প্রতিষ্ঠান এবং উহার গড় উৎপাদন-ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম হয়"। ("The optimum firm in any industry is the most efficient size of a firm possible, the one where the average cost of production per unit of output is at the minimum". —*Hanson.*)

আয়তন-বৃদ্ধির যে স্তরে কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক 'নীট ব্যয়-সংকোচ' (net economies) ভোগ করে, বা যে-স্তরে কোন প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক কম গড় ব্যয়ে, (least average cost) উৎপাদন করে, তাহাই হইতেছে প্রতিষ্ঠানের কাম্য আয়তন। এই ধারণাটি আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন যখন প্রসারিত হয়, তখন সকলপ্রকার ব্যয়-সংকোচ একই সংগে বা একই পরিমাণে ঘটে না। আবার একদিকে ব্যয়-সংকোচ এবং অপরদিকে ব্যয়াধিক্য (diseconomies) ঘটিতে পারে। যেমন—বৃহদায়তন যন্ত্রপাতির ব্যবহারজনিত ব্যয়-সংকোচের ফলে পরিচালনা কার্য জটিল হইয়া ওঠে বলিয়া পরিচালনাগত ব্যয়াধিক্য দেখা দিতে পারে। এই কারণে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন দিকের ব্যয়-সংকোচ ও ব্যয়াধিক্যের হিসাব করিয়াই আয়তন-প্রসারের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। ব্যয়-সংকোচের পরিমাণ যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যয়াধিক্যের বেশী থাকে—অর্থাৎ যতক্ষণে নীট ব্যয়-সংকোচ (net economies) ঘটিতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের প্রসার লাভজনক হইবে। যে-আয়তনে প্রতিষ্ঠানটি 'সর্বাধিক নীট ব্যয়সংকোচ' (maximum net economies) ভোগ করে অর্থাৎ যে-অবস্থায় উহা ন্যূনতম গড় ব্যয়ে উৎপাদন করে, তাহাই হইবে প্রতিষ্ঠানের কাম্য বা সর্বোত্তম আয়তন, কারণ ঐ আয়তনেই প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধিক দক্ষতা (maximum efficiency) ভোগ করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উৎপাদন-দক্ষতার দিক হইতে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রসারের আদর্শ বা সর্বোত্তম সীমা হইতেছে উহার কাম্য আয়তন।

৫. ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন—ইহার সুবিধা ও অসুবিধা (Small-scale Production—its advantages and disadvantages): বৃহদায়তন উৎপাদনের নানারূপ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আধুনিক যুগে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন টিঁকিয়া রহিয়াছে। শুধুমাত্র টিঁকিয়া কেন উৎপাদনের কতকগুলি ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এখনও প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। যেমন—আমাদের দেশে কুটিরশিল্প, দর্জির দোকান, অলংকার-নির্মাণের দোকান, ছোট ছোট কারখানা ইত্যাদি প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের কতকগুলি সুবিধা আছে:

সুবিধা: ক। ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের মালিক উৎপাদন-কার্যের বিভিন্ন দিকে

প্রতি একক উৎপাদন-ব্যয়কে গড় ব্যয় বলা হয়।

সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখিতে পারে। উৎপাদনের সব খুঁটিনাটি তাহার নখদর্পণে থাকে বলিয়া তাহার পক্ষে জরুরি অবস্থায়ও কোন বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হয় না। সুতরাং, ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানে মালিকের 'সজাগ-দৃষ্টি-জনিত ব্যয়-সংকোচ' (economy of the master's eye) ভোগ করা যায়।

খ। ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন-কার্য পরিচালনা করা সহজ হয়। মালিক নিজেই এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। সুতরাং, তাহার পক্ষে উৎপাদন-কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা অসুবিধা হয় না।

গ। কতকগুলি উৎপাদনের ক্ষেত্র আছে, যেখানে বৃহদায়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন অধিক সুবিধাজনক হয়। যে-সকল ক্ষেত্রে ক্রেতার ব্যক্তিগত অভিরুচি বা পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্যাদির যোগান দিতে হয়, সেখানে ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানই অধিকতর কাম্য। যেমন—বর্তমানে 'রেডিমেড' পোশাকের বহুল প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও ছোট ছোট বহু দর্জির দোকান সফলতার সহিত কাজ করিয়া যাইতেছে। আবার, যে-সকল ক্ষেত্রে কারিগরের ব্যক্তিগত নিপুণতার প্রয়োজন, সেখানেও ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠান টিঁকিয়া থাকিবে। যেমন, কাশ্মীরী শাল বা কৃষ্ণনগরের পুতুল ইত্যাদির নির্মাণ-কার্য ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতেই হয়। এই সকল ক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদন লাভজনক বা সম্ভবপর হয় না। আবার পচনশীল দ্রব্যাদি (যেমন—তরিতরকারী, পাঁউরুটি ইত্যাদি) দীর্ঘকাল মজুত করিয়া রাখা যায় না বলিয়া উহা ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদন করা একরূপ অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

ঘ। স্থানীয় বাজারের চাহিদা মিটাইবার জন্য উৎপাদন-কার্য ক্ষুদ্রায়তনে করিলে সুবিধা হয়। কোন দ্রব্যের বাজার যদি বিস্তীর্ণ না হয়, তাহা হইলে বৃহৎ আয়তনের উৎপাদন সুবিধা হইবে না। ইট বা কাঠের ভারী ভারী আসবাবপত্র চালান দেওয়ার অসুবিধার জন্য শুধুমাত্র স্থানীয় বাজারের চাহিদা মিটাইবার জন্য এইগুলি ক্ষুদ্রায়তনের ভিত্তিতে তৈয়ারী করা হয়। এখানে বৃহদায়তন উৎপাদন কাম্য হইবে না।

ঙ। উৎপাদনের আয়তন ক্ষুদ্র হইলে মালিক ও শ্রমিক-এর মধ্যে ব্যক্তিগত ও সৌহার্দমূলক সম্পর্ক রাখা সহজ হয়। ইহার ফলে মালিক-শ্রমিকের মধ্যে ভুল-বুঝাবুঝি বা বিরোধ অনেকাংশে এড়ানো সম্ভব হয়।

চ। ভারতের ন্যায় যে-সকল দেশে শ্রমিকের প্রাধান্য ও মূলধনের অপ্রাচুর্য থাকে সেই সকল দেশে উৎপাদনের কার্য ক্ষুদ্রায়তনে রাখা হইলে শ্রমিক-বেকার এবং মূলধন-স্বল্পতার সমস্যার প্রতিবিধান করা যায়। কারণ, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনে যন্ত্রপাতির প্রয়োগের সুযোগ কম এবং শ্রমিক-নিয়োগের সুযোগ বেশী।

ছ। ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনে উন্নত ধরনের কৃৎকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজন হয় না বলিয়া ইহা সহজেই গঠন করা যায়।

জ। ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে নানারূপ যন্ত্রাংশ ও

প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম যোগান দিয়া উহা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পরিপূরক হিসাবে কাজ করিতেও পারে।

ঝ। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভব হয়। কারণ, ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বল্প পুঁজি লইয়া স্থাপন করা যায়।

ভারতের দৃষ্টান্ত: ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের উপরি-উক্ত সুবিধাগুলির জন্য এখনও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৬৫ ভাগের মতো এবং জাপানে শতকরা ৮০ ভাগের মতো শিল্প-প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতেই গঠিত। ভারতে এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনেক বেশী।

অসুবিধা: কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের নানারূপ অসুবিধা রহিয়াছে। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান যে-সকল অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সুবিধাগুলি ভোগ করিয়া থাকে, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি তাহা ভোগ করিতে পারে না। ইহারা বাজার হইতে প্রয়োজনমতো অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে না। নূতন ধরনের ও উন্নত পর্যায়ের যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করা এই প্রতিষ্ঠানগুলির সাধ্যের বাহিরে। পরিচালনার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া, দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে পারে না। এই সকল অসুবিধার জন্য ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানে গড় উৎপাদন ব্যয় বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অধিক হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্রব্যাদি উন্নত মানের হয় না।

---

৮ ॥ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদ ॥
(Forms of Business Units)

[ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিভাগ—এক মালিকানা প্রতিষ্ঠান—যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান—হোল্ডিং কোম্পানী—সমবায় সংগঠন—রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও উহা পরিচালনার বিভিন্ন রূপ—উহার গুণ ও দোষ]

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, উহাদের ব্যবসা কি কি ভাবে সংগঠিত হয়? আধুনিককালে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের (business units) সংগঠন দেখা যায়। উহা মোটামুটি পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে: (১) এক-মালিকানা প্রতিষ্ঠান (Single-ownership বা Sole-proprietorship Firm), (২) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান (Partnership Firm) ও (৩) যৌথ-মূলধনী কোম্পানী (Joint Stock Company), (৪) সমবায় সমিতি (Co-operative Society) ও (৫) রাষ্ট্রীয় সংগঠন (State Undertaking)। ইহা ছাড়া, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের একটি বিশেষ রূপ দেখা যায়, যেমন—হোল্ডিং কোম্পানী (holding company)। ব্যবসায়-সংগঠনের এই সকল বিভিন্ন রূপ এই অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

১। এক-মালিকানা প্রতিষ্ঠান (Single-ownership or Individual Entrepreneurship): এক-মালিকানা প্রতিষ্ঠান হইতেছে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাচীনতম রূপ। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে মাত্র একজন মালিক থাকে। সে নিজেই ব্যবসায়-সংক্রান্ত ও উৎপাদন-কার্যের যাবতীয় মূলধন যোগান দেয় এবং ব্যবসায়ের সকল রকম ঝুঁকি বহন করে। ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা তাহার হাতেই থাকে এবং ইহার লাভ বা ক্ষতির জন্য সে দায়ী থাকে এবং তাহার দায়ও (liablity) অসীম। মালিক ভিন্ন এরূপ ব্যবসায়ের কোনরূপ পৃথক সত্তা আইনে স্বীকৃত হয় না। তাছাড়া ব্যবসায়ের দায়িত্ব মালিকের কর্মক্ষমতা বা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ছোট ছোট খুচরা বিক্রয়ের দোকান, মুদির দোকান, ছোট ছোট কৃষি-প্রতিষ্ঠান, দর্জির দোকান, তেলের কল, ছোট হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, বই-বিক্রয়ের দোকান, স্টেশনারী দোকান, গাড়ী বা যন্ত্রপাতি মেরামতের কারখানা ইত্যাদি হইতেছে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত।

এক-মালিকানা প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি সুবিধা আছে:

ক। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে যিনিই মালিক, তিনিই পরিচালক। ফলে, মালিক নিজেই উদ্যোগী হইয়া প্রতিষ্ঠানটি ভালোভাবে পরিচালনা করার প্রচেষ্টা করে এবং সকল দিকেই সজাগ ও তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিতে পারে।

খ। প্রতিষ্ঠানের মালিক একজন বলিয়া তাহাকে অন্য কাহারও সহিত পরিচালনার ব্যাপারে কোন আলোচনা করিতে হয় না। ইহার ফলে মালিক কোন বিশদ

সম্পর্কে অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সুদৃঢ় নীতি অনুসরণ করিতে পারে। তাছাড়া মালিক ব্যবসায়ে দ্রুত পরিবর্তনও ঘটাইতে পারে।

গ। মালিকের নিজের তত্ত্বাবধানে এইরূপ ব্যবসা পরিচালিত হয় বলিয়া ব্যবসায়ের কাজ সুশৃংখলার সহিত সম্পন্ন হয় এবং ক্ষতির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। মালিকের দায়-দায়িত্ব অসীম বলিয়া মালিক বিশেষ সতর্কতা ও মিতব্যয়িতার সহিত ব্যবসা পরিচালনা করিয়া থাকে।

ঘ। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান সাধারণত ছোট আয়তনের হয় বলিয়া মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে সদ্ভাব ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখা সম্ভব হয়। মালিক সহজেই ক্রেতাদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিতে পারে।

ঙ। এক-মালিকানা প্রতিষ্ঠান স্বল্প মূলধন লইয়া সহজেই গঠন করা যায়। সুতরাং স্বল্প-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকিলে তাহারা এই ধরনের ব্যবসা শুরু করিতে পারে।

চ। প্রতিষ্ঠানের আয়তন ছোট বলিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির রুচি বা পছন্দমতো দ্রব্য যোগান দেওয়া সম্ভব হয় এবং তাহাদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া যায়।

ছ। ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেরই প্রাপ্য বলিয়া উহা বৃদ্ধির জন্য মালিকের চেষ্টার ত্রুটি থাকে না।

কিন্তু এক-মালিকানা প্রতিষ্ঠানের নানারূপ অসুবিধাও আছে :

ক। কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে মূলধন যোগানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ফলে, এইপ্রকার ব্যবসায়ের মূলধন-নিয়োগের পরিমাণ খুব অল্পই হয় এবং মালিক ব্যবসায়ের আয়তন বড় করিতে পারে না। সুতরাং, এক-মালিকানা ব্যবসা বৃহৎ আয়তনের উৎপাদনের পরিপন্থী ; ফলে, বৃহৎ আয়তনের উৎপাদনে যে-সকল সুবিধা পাওয়া যায়, সেইগুলি এখানে পাওয়া যায় না।

খ। মালিকের সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষমতার উপর এইরূপ ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব (stability) নির্ভর করে। তাহার মৃত্যু ঘটিলে সুযোগ্য পরিচালকের অভাবে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান সাধারণত বন্ধ হইয়া যায়।

গ। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান দেনাগ্রস্ত হইলে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পদ, যেমন—বাড়ীঘর, আসবাবপত্র ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মালিককে ঐ দেনা মিটাইতে হয়।

ঘ। মালিক উৎপাদনের ঝুঁকি একাই বহন করে বলিয়া সে সবসময়ে ঝুঁকি নিতে চাহে না।

ঙ। ব্যবসা-পরিচালনার জন্য যে-বহুমুখী প্রতিভার প্রয়োজন তাহা এক ব্যক্তির মধ্যে সমাবেশ না হওয়াই স্বাভাবিক। এই কারণে, এই ধরনের ব্যবসায়ে বিশেষায়ণের ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ থাকে।

এইসকল কারণে আজকাল এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে।

তবে বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভারতের ন্যায় স্বল্প বিকশিত দেশেই নয়—ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি উন্নত দেশেও ইহার প্রাধান্য এখনও দেখা যায়।

২. **অংশীদারী প্রতিষ্ঠান (Partnership Firm)ঃ** একাধিক ব্যক্তি একত্রে মিলিত হইয়া লাভ-ক্ষতির অংশীদারের ভিত্তিতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠন করে। ভারতে এই ধরনের সাধারণ একটি প্রতিষ্ঠানে ২০ জনের অধিক অংশীদার থাকিতে পারে না। অংশীদাররা নিজেদের মধ্যে চুক্তি দ্বারা এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন করে এবং নিজেরাই প্রতিষ্ঠানটি চালায়। অংশীদাররা চুক্তিমতো ব্যবসায়ে মূলধনের যোগান দেয়। অবশ্য বিভিন্ন অংশীদার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ মূলধন যোগান দিতে পারে। সাধারণত, এক-একজন অংশীদার এক-একটি কাজে দক্ষ হয়। যেমন—কোন অংশীদার হয়তো কাঁচামাল ক্রয়ের ব্যাপারে দক্ষ হয় বা কেহ হয়তো দ্রব্য-বিক্রয়ে নিপুণ হয় ইত্যাদি। এই ধরনের ব্যবসায়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে অংশীদারদের অসীম দায় (unlimited liability) অর্থাৎ প্রত্যেক অংশীদার পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিষ্ঠানের ঋণের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকে। আধুনিক কালে ছোট ছোট বহু-সংখ্যক কারখানা বা দোকান বা অফিস অংশীদারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নামের শেষে '& Co.' কথাটি যুক্ত থাকে। আমাদের দেশে 'ভারতীয় অংশীদারী আইনে' (Indian Partnership Act) অনুসারে অংশীদারী ব্যবসা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উক্ত আইনে অংশীদারদের অধিকার ও দায় লিপিবদ্ধ করা আছে।

অংশীদারী ব্যবসায়ের কতকগুলি সুবিধা আছে ঃ

ক। অংশীদাররা প্রত্যেকেই এক-একটি কাজে সুদক্ষ হয় বলিয়া এই ধরনের প্রতিষ্ঠান সুপরিচালিত হয় এবং পরিচালনার ব্যাপারে বিশেষায়ণের সুযোগ থাকে।

খ। অংশীদাররা প্রত্যেকেই কিছু পরিমাণ মূলধন যোগান দেয়। সুতরাং এক-মালিকানা প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে অধিক অর্থ বিনিয়োগ করা যায়। ফলে, ইহা অপেক্ষাকৃত বড় ব্যবসায়ের ঝুঁকি লইতে পারে, বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে পারে এবং বৃহৎ ব্যবসায়ের মতো ব্যয়-সংকোচ করিতে পারে।

গ। অংশীদারদের অধিকার ও দায় আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উহাদের দায় অসীম বলিয়া প্রত্যেক অংশীদার সাফল্যের জন্য ব্যবসা সতর্কতার সহিত পরিচালনা করিয়া প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা করে।

ঘ। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে নূতন অংশীদার যে-কোন সময় গ্রহণ করা যায়। ফলে, ব্যবসায়ের মধ্যে নূতনত্ব আনা সম্ভব হয় এবং ব্যবসায়ের প্রসার ও বৈচিত্র্যকরণ সহজ হয়।

ঙ। অংশীদারদের সম্মতিক্রমে এইরূপ ব্যবসায়ে পরিবর্তন, প্রসার, সংকোচন, বিচ্ছেদ—সমস্তই অনায়াসে করা যায়।

---

১. Thomas-*Elements of Economics* Chap 10.

কিন্তু ইহার কতকগুলি অসুবিধাও আছে ঃ

ক। অংশীদারদের মধ্যে মতবিরোধের ফলে কোন জরুরী বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত ও উপযুক্ত পন্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন অংশীদারের নির্বুদ্ধিতার জন্য অপর অংশীদারগণকেও দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয়।

খ। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বে কোনরূপ ধারাবাহিকতা (continuity) ও স্থায়িত্ব থাকে না। কারণ সাধারণত কোন একজন অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে প্রতিষ্ঠানটিরও অবসান ঘটে। তাছাড়া, কোন-একজন অংশীদারের অসাধুতা, মতানৈক্য, মস্তিষ্ক-বিকৃতি (lunacy), দেউলিয়া (bankruptcy) ও অবসর-গ্রহণের (retirement) ফলে ইহার পতন ঘটিতে পারে।

গ। আধুনিককালে উৎপাদন-কার্যের জন্য যে-বিপুল পরিমাণে মূলধনের প্রয়োজন পড়ে তাহা মাত্র কয়েকজন অংশীদাররা যোগান দিতে পারে না। সুতরাং, এই ধরনের ব্যবসা বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পরিপন্থী।

ঘ। অংশীদারদের দায় অসীম বলিয়া বহু ব্যক্তি এই ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট হয় না এবং অংশীদাররাও ঝুঁকিবহুল উৎপাদন-কার্যে অগ্রসর হইতে ভয় পায়।

ঙ। অংশীদারদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ও মনোমালিন্যের জন্য ব্যবসা খারাপের দিকে যাইতে পারে এবং পরিণামে অকালপতনও ঘটে।

চ। অংশীদারী ব্যবসায়ের জন্য যে সততা, বিশ্বস্ততা ও মিত্রতা প্রয়োজন, তাহা বর্তমান যুগে খুবই বিরল। এই কারণে ইহার গুরুত্বও হ্রাস পাইতেছে।

বর্তমান যুগে অংশীদারী ব্যবসায়ের গুরুত্ব হ্রাস পাইতেছে এবং উহার পরিবর্তে ধীরে ধীরে কোম্পানী ব্যবসা বা যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠানের প্রসার লাভ ঘটিতেছে।

৩. **যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠান (Joint Stock Company) ঃ** বর্তমানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে-রূপটি বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, উহা হইতেছে যৌথ-মূলধনী কোম্পানী। বহুসংখ্যক ব্যক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট ব্যবসা বা উৎপাদন-কার্য পরিচালনার জন্য যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে।

বৈশিষ্ট্য ঃ যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে ঃ

প্রথমত, বহুসংখ্যক ব্যক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট ব্যবসা গঠনের জন্য কোম্পানী স্থাপন করিয়া ব্যবসায়ে মূলধন যোগান দেয় এবং তাহারাই ব্যবসায়ের মালিক। ইহাদের অংশীদার (shareholders) বলা হয়। সুতরাং, ইহারাই প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ভোগ করে এবং ক্ষতি বহন করে।

দ্বিতীয়ত, অংশীদারদের দায় সীমাবদ্ধ (limited) থাকে। প্রত্যেকেই তাহার শেয়ার-মালিকানার অনুপাতেই কোম্পানীর ক্ষতি বহন করে। যেমন—কোন কোম্পানী ১০ টাকা মূল্যের এক লক্ষ 'শেয়ার' বিক্রয় করিল। কোন এক ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠান ২৫ হাজার শেয়ার কিনিয়া কোম্পানীর এক-চতুর্থাংশের মালিক হইল। ব্যক্তিগতভাবে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানীর মুনাফার ২৫ শতাংশ পাইবে এবং ক্রীত শেয়ার-মূল্যের (paid-up value of shares) পর্যন্ত (অর্থাৎ ২.৫ লক্ষ টাকা)

কোম্পানীর দায়ের জন্য দায়ী থাকিবে অর্থাৎ কোম্পানীর ঋণের জন্য তাহাকে বা প্রতিষ্ঠানকে ক্রীত শেয়ার-মূল্যের অধিক পরিমাণের জন্য দায়ী করা যাইবে না। এই কারণে যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠানের নামের শেষে লিমিটেড (Ltd.) কথাটি যুক্ত থাকে।

তৃতীয়ত, কোম্পানীর কাজ ধারাবাহিকতা (continuity) থাকে। কারণ, দুর্ভাগ্য-বশত কোন কোম্পানীর সমুদয় অংশীদারগণও যদি একদিনে মারা যায়, তাহা হইলেও কোম্পানী বন্ধ হইয়া যাইবে না। কারণ, আইনত কোম্পানীর একটি পৃথক সত্তা থাকে।

চতুর্থত, কোম্পানী শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া বাজার হইতে মূলধন সংগ্রহ করে। শেয়ার হইতেছে কোন ব্যবসায়ে অংশ-ভোগের অধিকারপত্র। শেয়ারের মালিকগণ কোম্পানীর মালিক। ভারতে কোম্পানীর শেয়ার বা অংশ দুই প্রকারের দেখা যায়—(ক) সাধারণ অংশ (Ordinary or Equity Share): সাধারণ অংশের মালিকরা কোম্পানী হইতে যে-লভ্যাংশ (dividend) পায়, তাহার পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে না। তাহারা কোন বৎসর বেশী আবার কোন বৎসরে কম লভ্যাংশ পাইয়া থাকে।

(খ) সর্বাগ্রগণ্য অংশ (Preference Share): এইপ্রকার অংশে মালিক-গণ একটি নির্দিষ্ট হারে কোম্পানী হইতে লভ্যাংশ পায়। ইহা ছাড়া, কোম্পানী সর্বাগ্রে ইহাদের নির্দিষ্ট লভ্যাংশ দেয় এবং পরে সাধারণ অংশের মালিকদের লভ্যাংশ দেয়। আবার, কোম্পানী উঠিয়া গেলে কোম্পানীর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রথমেই সর্বাগ্রগণ্য অংশের মালিকের দাবি মিটানো হয়। শেয়ার ছাড়া কোম্পানী ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়াও মূলধন সংগ্রহ করে। কোম্পানীর সম্পত্তি জামিনে ডিবেঞ্চার বিক্রয় করা হয়। ডিবেঞ্চার-মালিকগণ কোম্পানীর মালিক নয়, পাওনাদার মাত্র। সুতরাং কোম্পানীর লাভই হউক বা ক্ষতিই হউক, কোম্পানী হইতে তাহারা নির্দিষ্ট হারে সুদ পাইয়া থাকে।

পরিশেষে বলে যায়, কোম্পানীর কাজ পরিচালনা করার জন্য অংশীদারগণ মিলিত হইয়া একটি পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors) গঠন করে। অংশী-দারদের সংখ্যা বহু হয় বলিয়া তাহারা সকলে কোম্পানী-পরিচালনার কাজ অংশ গ্রহণ করে না। পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানীর কার্যনীতি নির্ধারিত করে এবং দৈনন্দিন পরিচালনা-কার্য চালায়।

ভারতের দৃষ্টান্ত: টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানী লিমিটেড্, ত্রিবেণী টিস্যু লিমিটেড্, দি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড্, অশোকা সিমেণ্ট লিমিটেড্ ইত্যাদি নামে আমাদের দেশে বহু যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠান ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের (Companies Act) দ্বারা গঠিত হইয়াছে। তাছাড়া সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রেও এই ধরনের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় বিভিন্ন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইহার প্রাধান্য বিশেষ লক্ষণীয়। সিমেণ্ট, ইস্পাত, তুলাবস্ত্র, চিনি, পাট, চা, পরিবহণ, ব্যাংক ও বীমা-ব্যবসায়, কাগজ প্রভৃতি শিল্পের

ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক যৌথ-মূলধনী সংগঠন বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন ও ব্যবসা-সক্রান্ত কার্যকলাপ সম্পন্ন করিতেছে। সালের মার্চ মাসের শেষে ভারতীয় কোম্পানী আইনে রেজেস্ট্রীকৃত যৌথ শেয়ার-মূলধনী কোম্পানীর (প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী সমেত) সংখ্যা ছিল ৮২,৯০৩টি এবং উহাদের আদায়ীকৃত মূলধনের (paid-up capital) পরিমাণ ছিল ১৯,৯০৯ কোটি টাকা।[১]

যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর গুণ ও দোষ ঃ যৌথ-মূলধনী কোম্পানীর বহু গুণ দেখা যায় ঃ

ক। এই ধরনের ব্যবসায়ে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্ভব হয়। আধুনিককালে কতকগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য দেখা যায়, যেখানে অধিক পরিমাণে মূলধনের প্রয়োজন পড়ে। যেমন—ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ, খনিজ দ্রব্য উত্তোলন, ব্যাংক ব্যবসা, বীমা ব্যবসা ইত্যাদি। বর্তমানে যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া ঐ ব্যবসাগুলির বড় আয়তনের করা সম্ভব হইতেছে এবং ইহারা বাজারে 'শেয়ার' ও 'ডিবেঞ্চার' বিক্রয় করিয়া প্রয়োজনমতো মূলধন সংগ্রহ করিয়া থাকে।

খ। এই প্রকার উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান থাকার ফলে দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন ধরনের শেয়ার বিক্রয় করে। ফলে, জনসাধারণ ঐ সকল শেয়ার ক্রয় করিয়া দেশে বিনিয়োগ বাড়াইতে সাহায্য করে। যাহারা ঝুঁকি লইতে ইচ্ছুক, তাহারা সাধারণ শেয়ার কিনিতে পারে, এবং যাহারা বিনিয়োগ হইতে নিয়মিত আয় প্রত্যাশা করে, তাহারা কোম্পানীর সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার ও ডিবেঞ্চার কিনিতে পারে। ইহা ছাড়া, যে-সকল লোকের বিনিয়োগযোগ্য টাকাকড়ি আছে, কিন্তু ব্যবসাবুদ্ধি নাই, তাহারাও শেয়ার বা ডিবেঞ্চারে উহা বিনিয়োগ করিতে পারে।

গ। কোম্পানীর শেয়ার সহজেই হস্তান্তর করা যায় বলিয়া সমাজের বহু ব্যক্তি শেয়ার-ক্রয়ের দিকে আকৃষ্ট হয়।

ঘ। যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠানে শেয়ার-মালিকদের দায় সীমাবদ্ধ থাকার ফলে কোম্পানীর পরিচালকরা ঝুঁকিবহুল উৎপাদন-কার্যে বা ব্যবসায়ের নিযুক্ত হইতে সাহস পায়। এক্ষেত্রে কোম্পানীর ক্ষতি হইলে শেয়ার-মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরে টান পড়ে না।

ঙ। কোন কোম্পানীতে শেয়ার-মালিকদের সংখ্যা সাধারণত বহু হইয়া থাকে। ইহার ফলে কোম্পানীর ক্ষতি হইলেও ঐ ক্ষতি বহুসংখ্যক শেয়ার-মালিকদের মধ্যে বণ্টিত হইয়া যায়। সুতরাং ক্ষতির ভার বহন করা সহজ হয়।

চ। এই ধরনের ব্যবসায়ের মধ্যে ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্ব রহিয়াছে। কোম্পানীর একটি পৃথক আইনগত সত্তা (legal entity) ও চিরন্তন অস্তিত্ব (perpetual existence) থাকে। ফলে, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নিরন্তর উত্তরাধিকার (perpetual

succession) থাকে এবং ক্ষতি না হইলে উহা বন্ধ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা খুবই কম।

ছ। আধুনিক সমাজে যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে বহুসংখ্যক কাজ সৃষ্টি করিতেছে। ব্যবসায়ের আয়তন খুব বড় হয় বলিয়া বহু ব্যক্তি কাজ পাইয়া থাকে। সুতরাং নিয়োগের সংস্থা হিসাবে ইহার বিশেষ গুরুত্ব আছে।

যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের ত্রুটিও দেখা যায়ঃ

ক। এক-মালিকানা বা অংশীদারী ব্যবসায়ে মালিক যেরূপ স্বীয় উদ্যোগে ও দায়িত্বে (initiative and responsibility) ব্যবসা পরিচালনা করে, সেইরূপ যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে সম্ভব নয়। কারণ, এই ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করে বেতনভোগী কর্মচারীরা। তাহারা মালিকদের ন্যায় উদ্যোগী ও দায়িত্বশীল হইতে পারে না। ফলে যৌথ-মূলধনী ব্যবসা গতানুগতিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়।

খ। যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের অংশীদারগণ সংখ্যায় অনেক বেশী হয় বলিয়া কোম্পানী-পরিচালনার সহিত তাহাদের কোন যোগাযোগ থাকে না। অংশীদারগণ কোম্পানী হইতে নিয়মিত লভ্যাংশ পাইলে সন্তুষ্ট থাকে। ইহার ফলে পরিচালকরা নানারূপ অসদুপায়েও অংশীদারদের সন্তুষ্ট রাখিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিবার সুযোগ পায়।

গ। কোম্পানীর শেয়ারগুলি সহজেই হস্তান্তরিত করা যায় বলিয়া পরিচালকরা অনেক সময় অসদুদ্দেশ্যে শেয়ারগুলি নিজেদের নামে ও নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। ইহার জন্য পরিচালকরা বাজারে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে নানারূপে মিথ্যা রটনা করিতে দ্বিধাবোধ করে না। এইভাবে পরিচালকরা অংশীদারদের সঙ্গে প্রতারণা করিয়া নিজেদের মুনাফা বাড়াইবার চেষ্টা করে। শেয়ার-মালিকানা সহজে হস্তান্তর করা যায় বলিয়া এই ধরনের কোম্পানীর মালিকানা ও পরিচলন-ভার অসৎ লোকের হাতে চলিয়া যাওয়ার আশংকা থাকে।

ঘ। যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে অংশীদারদের সংখ্যা অনেক হয় বলিয়া কেহ কাহাকে ভালভাবে চেনে না বা জানে না। ফলে, তাহাদের মধ্যে একত্রে কাজ করার উৎসাহ ও ও দলগত স্পৃহা (team spirit) দেখা যায় না। অংশীদারী ব্যবসায়ে ঐ উৎসাহ ও স্পৃহা অংশীদারদের মধ্যে দেখা যায়।

ঙ। এই ধরনের ব্যবসায়ে মালিক ও শ্রমিকদের বা ক্রেতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ থাকে না। ফলে, কার্য-পরিচালনায় অনেক সময়ে অসুবিধা হয়।

চ। যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে বহুসংখ্যক অংশীদারদের লভ্যাংশ দিতে হয় বলিয়া পরিচালকরা অনেক ক্ষেত্রে ঝুঁকিবহুল উৎপাদন-কার্যে নিযুক্ত হইতে বিরত থাকে।

ছ। পরিশেষে বলা যায়, যদিও যৌথ-মূলধনী কোম্পানী হইতেছে একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন

ব্যক্তির হাতেই পরিচালন-ভার থাকিয়া যায় এবং তাহাদের স্বার্থের নিকট সাধারণ শেয়ার-মালিকদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।

উপসংহার: যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের এই সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আধুনিক কালে এই ধরনের ব্যবসায়ে বিশেষ প্রসারলাভ ঘটিয়াছে। কারণ, ইহার ত্রুটিগুলি অপেক্ষা গুণগুলির গুরুত্ব অনেক বেশী। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ভারতে বর্তমানে ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুসারে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক যৌথ-মূলধনী কোম্পানী গঠিত হইয়াছে।

৪. **হোল্ডিং কোম্পানী (Holding Company):** হোল্ডিং কোম্পানী হইতেছে একটি বিশেষ ধরনের ব্যবসায়-জোট (business combination) এবং ইহা যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের নীতিতেই গঠিত হয়। যে-কোম্পানী অন্য একাধিক কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ারের মালিক অথবা তাহাদের পরিচালকমণ্ডলীতে অধিকাংশ পদ দখল করিয়া লয়, সেই কোম্পানীকে (অর্থাৎ, ক্রয়কারী কোম্পানী) অধিকারী ব হোল্ডিং কোম্পানী বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য: যে কোম্পানীগুলির অধিকাংশ বা সমুদয় শেয়ার ক্রয় করা হইল বা যাহার বা যাহাদের পরিচালকমণ্ডলীতে অধিকাংশ বা সকল পদ দখল করা হইল, তাহাদিগকে হোল্ডিং কোম্পানীর অধিকৃত কোম্পানী বা সাবসিডিয়ারী কোম্পানী (subsidiaries) বলা হয়। হোল্ডিং কোম্পানীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ইহাকে অন্য কোম্পানীর অন্তত ৫১ শতাংশ শেয়ারের মালিক হইতে হইবে কিংবা অন্য কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী গঠন-প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ইহার থাকিবে। শেয়ারের সহিত অন্তত ৫১ শতাংশ ভোটাধিকারও থাকা প্রয়োজন। ইহার অধীন কোম্পানীগুলির পৃথক সত্তা বা অস্তিত্ব থাকিলেও কার্যত উহারা হোল্ডিং কোম্পানীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে।

হোল্ডিং কোম্পানী হইতে শেয়ার-মালিকানার পিরামিড (pyramid) সৃষ্টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে অনেকগুলি কোম্পানীর পৃথক পৃথক সত্তা থাকিলেও পশ্চাতে দেখা যাইবে, কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতেছে। পিরামিডের নিচের তলায় অনেকখানি আয়তন থাকিলেও সবদিক হইতে সঙ্কুচিত হইয়া ইহার শীর্ষদেশ যেমন একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, তেমনি নিচে বহুসংখ্যক কোম্পানী থাকিলেও তাহার শীর্ষে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী প্রভুত্ব করে। গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি দেশে এই ধরনের হোল্ডিং কোম্পানী দেখা যায়। ভারতে বেসরকারী ক্ষেত্রে বহু যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠানের (যেমন—টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল লিমিটেড) সাবসিডিয়ারী কোম্পানী আছে। সরকারী ক্ষেত্রে স্টীল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড হইতেছে হোল্ডিং কোম্পানীর একটি দৃষ্টান্ত; সরকারী উদ্যোগের অধীন ইস্পাত, কোক কয়লা, আকরিক লৌহ, আকরিক ম্যাংগানিজ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সমুদয় শেয়ার ইহার হাতে আছে।[১]

---

১. *India* 1934

হোল্ডিং কোম্পানীর সুবিধা ও অসুবিধা : হোল্ডিং কোম্পানী ব্যবস্থার সুবিধাগুলি নিম্নরূপ :

ক। হোল্ডিং কোম্পানী সহজেই গঠন করা যায়। কারণ, কয়েকটি কোম্পানীর অধিকার শেয়ার (বা ভোটাধিকার) ক্রয় করিয়া ইহা সমৃদ্ধশালী কোম্পানীর মালিক হইতে পারে।

খ। হোল্ডিং কোম্পানী ব্যবসা-জোট হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা যৌথ-মূলধনী কোম্পানী। সুতরাং, ইহার পক্ষে ঐ ধরনের ব্যবসায়ের যাবতীয় সুবিধা ভোগ করা সম্ভব হয়।

গ। অনেকগুলি কোম্পানীর পরিচালনা, অর্থসংস্থান, দ্রব্যাদি-বিক্রয় ইত্যাদি ব্যাপারে কর্তৃত্ব করিতে পারে বলিয়া ইহা বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুবিধাগুলি ভোগ করিতে পারে এবং ফলে ব্যয়-সংকোচও ঘটে।

ঘ। সাবসিডিয়ারী কোম্পানীগুলি তাহাদের নিজ নিজ পৃথক সত্তা হারায় না। ফলে তাহারা নিজ নিজ সুনাম বজায় রাখিতে পারে।

ঙ। এইপ্রকার ব্যবসায়ের ফলে হোল্ডিং কোম্পানীর অধীনে অনেকগুলি কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আসে বলিয়া সাবসিডিয়ারী কোম্পানীগুলি একক পরিচালনা ও ব্যবসায়-জোটের যাবতীয় সুবিধাগুলি ভোগ করিতে পারে এবং অধীন কোম্পানীগুলির কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়।

চ। অর্থ-বিনিয়োগের তুলনায় ইহা বিশাল ব্যবসায়-সম্পদের উপর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারে।

ছ। হোল্ডিং কোম্পানীর সাহায্যে ও সহযোগিতায় অধীন কোম্পানীগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হয়।

জ। পরিশেষে বলা যায়, প্রয়োজনবোধে হোল্ডিং কোম্পানী দুর্বল বা ক্ষতি-জনক সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করিয়া উহা হইতে মুক্ত হইতে পারে।

হোল্ডিং কোম্পানী ব্যবস্থার নানারূপ ত্রুটিও দেখা যায় :

ক। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, এই ব্যবস্থার ফলে কোনও গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত কম মূলধন বিনিয়োগ করিয়া অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে। ফলে, হোল্ডিং কোম্পানীর ব্যবসায়ের প্রকৃত আয়তন জন-সাধারণের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না।

খ। এই ব্যবস্থার ফলে শেয়ার-মালিকানার 'পিরামিড' সৃষ্টি হয়। ফলে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত কম মূলধন বিনিয়োগ করিয়া বহুসংখ্যক প্রতি-ষ্ঠানের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কুক্ষিগত করার সুযোগ পায়; মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের হাতে প্রভূত সম্পদ পুঞ্জীভূত হয় এবং দেশে অবাঞ্ছিত অর্থনৈতিক কেন্দ্রিকতার উদ্ভব ঘটে। কালক্রমে ইহা সমাজবিরোধী হইয়া ওঠে।

গ। হোল্ডিং কোম্পানী বিভিন্ন সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর লেনদেনের মাধ্যমে

হিসাবের কারচুপি করার সুযোগ পায় এবং তাহার ফলে সাধারণভাবে শেয়ার-মালিকরা বিশেষত সংখ্যালঘু শেয়ার-মালিকরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ঘ। এইপ্রকার ব্যবসায়ের অধীন কোম্পানীর সংখ্যালঘু শেয়ার-মালিকদের স্বার্থ বা বক্তব্য উপেক্ষিত হয়। তাহাদের ভোটাধিকারের বিশেষ কোন তাৎপর্যই থাকে না।

ঙ। সমৃদ্ধ সাবসিডিয়ারী হইতে দুর্বল সাবসিডিয়ারীতে মূলধন স্থানান্তর, ভুয়া লেনদেন, নানারূপ দুর্নীতিমূলক ব্যবসা-পদ্ধতি, অসাধুতা ইত্যাদির মাধ্যমে হোল্ডিং কোম্পানী ইহার অধীন কোম্পানীগুলিকে শোষণ করিয়া থাকে।

উপসংহার : অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও হোল্ডিং কোম্পানী গঠনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। তবে ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে হোল্ডিং কোম্পানীর বার্ষিক হিসাবে তাহাদের অধীন কোম্পানীগুলি সম্পর্কে নানাবিধ বিষয়ের পরিচয় দিতে হয়। সরকারী ক্ষেত্রে একক পরিচালনার জন্য এবং একক নিয়ন্ত্রণের জন্য এই ব্যবস্থার প্রসার ঘটিতেছে।

৫। **সমবায় সংগঠন (Co-operative Organisation) :** উপরে যে সকল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া দেওয়া হইয়াছে, উহাদের কাজের আসল উদ্দেশ্য হইতেছে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। ইহার ফলে সামাজিক জীবনে নানারূপ সমস্যা দেখা যায়, যেমন—ধনী-গরীবের সমস্যা, মালিক-শ্রমিকের সংঘর্ষের সমস্যা ইত্যাদি। ঐসকল ত্রুটি অপসারণের জন্য আমাদের সমাজে ধীরে ধীরে একপ্রকার উৎপাদন-সংগঠন প্রসার পাইতেছে, উহা হইতেছে সমবায় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। এখন দেখা যাউক, সমবায় বলিতে কি বুঝায় ? কয়েকজন ব্যক্তি যখন পরস্পরের সঙ্গে স্বেচ্ছায় ও সাম্যের ভিত্তিতে মিলিত হইয়া কোন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে তাহাকেই 'সমবায় সমিতি (co-operative society) বলা হয়। যাহারা সমবায় সমিতি গঠন করে, তাহারা সাধারণত পরস্পরের সহিত পরিচিত হয় এবং কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস বা কাজ করে। যেমন—গ্রামে বা শহরে বা কোন অফিসের লোকেরা মিলিত হইয়া সমবায় সমিতি গঠন করে। ভারতে ১৯০৪ ও ১৯১২ সালের সমবায় সংক্রান্ত দুইটি আইনের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। ভারতে সমবায়ের প্রসার বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই, কারণ সুদীর্ঘকাল পরেও ভারতের মাত্র ১২ কোটি লোক ইহার সংস্পর্শে আসিয়াছে এবং মোট গ্রামবাসীদের মাত্র ৪৫ শতাংশ প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতির অধীনে আসিয়াছে।

সমবায় সংগঠনের নীতি : সমবায় সমিতিকে কতকগুলি নীতি মানিয়া চলিতে হয় এবং ঐগুলি সমবায়ের নীতি (principles of co-operation) নামে পরিচিত :

প্রথমত, সমবায়ের একটি মূল নীতি হইতেছে সভ্যদের মধ্যে 'একতা' প্রতিষ্ঠা করা। দুর্বল ও স্বল্পবিত্তের লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অনেক কাজ করিতে সক্ষম হয় না। তাহারা একত্রে মিলিত হইয়া নিজেদের আর্থিক অবস্থা উন্নত ও শক্তিশালী করিতে পারে। ইহার জন্য দরকার হয় সমিতির সদস্যদের মধ্যে একতা।

দ্বিতীয়ত, সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক হইল সাম্যের সম্পর্ক অর্থাৎ

সমিতির কার্য পরিচালনায় ব্যাপারে প্রত্যেক সদস্য সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে।

তৃতীয়ত, সমবায় সমিতির কার্য পরিচালনা গণতান্ত্রিক নীতিতে সম্পন্ন হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সদস্যদের ভোটের দ্বারা স্থির করা হয় এবং প্রত্যেক সদস্যেরই সমান ভোটাধিকার থাকে।

চতুর্থত, সমবায় সমিতিতে সদস্যরা স্বেচ্ছায় যোগদান করে এবং ইচ্ছামতো উহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে পারে।

পঞ্চমত, সমবায় সমিতির সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত থাকিবে এবং তাহারা যতদূর সম্ভব পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকিবে।

পরিশেষে বলা যায়, সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য হইতেছে সদস্যদের কোন একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক স্বার্থের সংরক্ষণ ও প্রসার। সুতরাং, সমিতিগুলি সদস্যদের স্বার্থ ছাড়া এবং উহাদের কোন একটি বিশেষ অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দিবে না।

বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতিসমূহ : সমবায় সমিতিগুলি বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে। জার্মানিতে রাইফিজেন (Raiffeisen) ও সুল্জ ডেলিৎস্ (Schultz-Delitsch) নামক দুইজন নেতা সমবায়ের বিশেষ প্রসার ঘটান। আজ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই 'রাইফিজেন'-এর আদর্শে গ্রামাঞ্চলে গ্রামবাসীদের জন্য সমবায় সমিতি গঠিত হইতেছে এবং শহরাঞ্চলে 'সুল্জ ডেলিৎস'-এর আদর্শে সমবায় সমিতি গঠন করা হইতেছে। আমাদের সমাজে যে সকল সমবায় সমিতি দেখা যায়, উহাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে :

ক। **ঋণ-সংগ্রহ ও ঋণ-দান সমিতি (Credit Socicties) :** প্রধানত গ্রামাঞ্চলে এই সমিতিগুলি বেশী দেখা যায়। সমিতিগুলি সদস্যদিগকে স্বল্প সুদের হারে উৎপাদনশীল কার্যের জন্য ঋণ দেয়। ইহা ছাড়া, এই সমিতিগুলি সদস্যদের নিকট হইতে সঞ্চয় গচ্ছিত রাখে। ভারতে এই ধরনের বহুসংখ্যক সমবায় সমিতি গ্রামে ও শহরে দেখা যায়। প্রাথমিক স্তরে যে সকল ঋণ-দান সমিতি আছে, উহাদিগকে অর্থসাহায্য দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমবায় ঋণ-দান প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক থাকে।

খ। **উৎপাদনকারীদের সমিতি (Producers' Co-operatives) :** কয়েকজন উৎপাদক মিলিত হইয়া কৃষি বা শিল্প দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য এই ধরনের সমিতি গঠন করে। এখানে সমিতির সদস্যরা একই সংগে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিক হয়। শ্রমিকেরা ব্যবসায়ের মালিক বলিয়া উৎপাদান-কার্যে যে মুনাফা হয়, তাহা তাহাদের মধ্যেই ভাগ্যভাগি হয়। উৎপাদনকার্য সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের জন্য সদস্যরা তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে পরিচালক হিসাবে নির্বাচন করে এবং ঐ পরিচালকরা ব্যবসা পরিচালনা করে। ভারতে ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক, হস্তশিল্পী, তাঁতী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই ধরনের সমিতি দেখা যায়। কৃষকেরা তাহাদের

জমি যৌথভাবে চাষবাস করার জন্য এই ধরনের সমিতি গঠন করে। কিন্তু অপর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে এই সমিতিগুলি বড় আয়তনে উৎপাদন করিতে পারে না। ইহাকে 'উৎপাদন-কার্যের সমবায়'ও (productive co-operative) বলা হয়।

গ। ভোগকারীদের সমবায় (Consumers' Co-operatives) : কিছুসংখ্যক ভোগকারী উদ্যোগী হইয়া তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যুক্তিসংগত দামে ক্রয়ের জন্য 'ভোগকারীদের সমবায় সমিতি' গঠন করে। সমিতির সদস্যরা সমিতির নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করে। সমিতি পাইকারী ব্যবসায়ী বা উৎপাদনকারীদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি সরাসরি ক্রয় করিয়া সদস্যদের বা জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করে। ইহা সাধারণত মুনাফা-উপার্জনের চেষ্টা করে না। সকলপ্রকার ব্যয় নির্বাহ করিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা সমিতির সদস্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। আজকাল চড়া মূল্যের দিনে এই ধরনের সমিতি গঠন করিয়া ভোগকারীরা যুক্তিসংগত দামে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারে। আমাদের দেশে শহরাঞ্চলে ইহার দ্রুত প্রসার ঘটিতেছে। ইহাকে 'বণ্টনের সমবায়'ও (distributive co-operative) বলা হয়।

ঘ। বিক্রয়-সমিতি (Marketing Societies) : কৃষক ও কুটিরশিল্পে নিযুক্ত উৎপাদকরা আজকাল বিক্রয়-সমিতি গঠন করিতেছে। ইহারা এই সমিতির মাধ্যমে বাজারে ভোগকারী-ক্রেতার নিকট দ্রব্যাদি সরাসরি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। ফলে; তাহারা দ্রব্যাদির ন্যায্য দাম পায়।

ঙ। গৃহ-নির্মাণ সমিতি (Housing Co-operatives) : আজকাল স্বল্প-বিত্ত ব্যক্তিরা মিলিত হইয়া গৃহ-নির্মাণ বা আবাসন সমিতি গঠন করিতেছে। এই সমিতি সদস্যদের জন্য সাধারণত শহরে গৃহ-নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। ফলে, স্বল্প-আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ বা ফ্ল্যাট ক্রয়ের সুযোগ পাইতেছে। বোম্বাই ও কলিকাতা শহরে এই ধরনের গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি (যেমন—উত্তর কলিকাতার সিটি কমার্স সমবায় আবাসন সমিতি) ক্রমশ প্রসার লাভ করিতেছে।

চ। অন্যান্য সমবায় সমিতি (Other Co-operative Societies) : ইহা ছাড়া, বীমা কার্য, পরিবহণ কার্য, জলসেচের কাজ, যন্ত্রপাতি ও সারবণ্টন ইত্যাদি কার্য নির্বাহের জন্য নানারূপ সমবায় সমিতি গঠন করা হইতেছে। আবার, সেবা সমবায়ও (service co-operatives) দেখা যায়। সেবাসমিতিগুলি পল্লীবাসীদের কতকগুলি সাধারণ প্রয়োজন পূরণ ও কৃষির উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের (যেমন—বীজ, সার, লাঙল, কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি) যোগান দেওয়া জন্য গঠিত হয়। সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে কতকগুলি শুধু একটি নির্দিষ্ট কাজ করিয়া থাকে। উহাদিগকে 'এক উদ্দেশ্যসাধক' (single purpose) সমবায় সমিতি বলে। আবার কতকগুলি আছে, যেগুলি একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কাজ করিয়া থাকে। ঐগুলিকে 'বহু উদ্দেশ্য-সাধক' (multipurpose) সমবায় সমিতি বলে। যেমন—সমবায় সমিতি একই সঙ্গে ঋণ-দান, বিক্রয়-ব্যবস্থা, ভোগ্যদ্রব্যের যোগান, উৎপাদন

বুদ্ধি ইত্যাদি কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে। ভারতে এক উদ্দেশ্যসাধক ও বহু উদ্দেশ্যসাধক—উভয় প্রকারের সমবায় দেখা যায়।

সমবায়ের সুবিধা ও অসুবিধা : উৎপাদন-কার্য ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের একক হিসাবে সমবায়ের কতকগুলি সুবিধা দেখা দেয়। প্রথমত, স্বল্পবিত্ত লোক, কৃষক ও শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া তাহাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এই ধরনের উৎপাদন-কার্যে দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য বিশেষ বিজ্ঞাপন বা প্রচারকার্য চালানোর প্রয়োজন পড়ে না। সুতরাং, ঐ উদ্দেশ্যে সাধারণত যে-অপচয় হয়, তাহা এখানে বন্ধ করা যায়।

তৃতীয়ত, শ্রমিকরা উৎপাদন-সমিতি গঠন করিয়া উৎপাদন-কার্য পরিচালনা করিয়া তাহাদের আয় বাড়াইতে পারে।

চতুর্থত, কৃষকরা সমবায় পদ্ধতিতে উন্নত সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা জমি চাষ করিয়া অধিক ফসল উৎপাদন করিতে পারে।

পঞ্চমত, কৃষক ও উৎপাদনকারীরা সমবায় সমিতির মাধ্যমে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া দ্রব্যের ন্যায্য দাম (fair price) ভোগ করিতে পারে।

ষষ্ঠত, স্বল্পবিত্তের লোকেরা স্বল্প সুদের হারে সমিতির নিকট হইতে ধার লইতে পারে।

সপ্তমত, প্রত্যেক সদস্য একত্রে কাজ করে বলিয়া সমবায় ব্যবসা সুপরিচালিত হওয়ায় সম্ভাবনা থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, এই ধরনের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও মালিকের কোন বিরোধ থাকে না। কারণ শ্রমিকরাই এখানে মালিক হইয়া থাকে।

কিন্তু সমবায়ের বহু অসুবিধাও আছে। প্রথমত, সমবায়ের কার্যের পরিধি খুবই সংকীর্ণ। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় সফল হয়, কিন্তু বৃহৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইহার সফলতার সম্ভাবনা খুবই কম।

দ্বিতীয়ত, সমবায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সুদক্ষ লোকের অভাব হয়। সমবায় সমিতির অধিকাংশ সদস্যদের ব্যবসা-পরিচালনা সম্পর্কে বিশেষ কোন ব্যবসা-বুদ্ধি থাকে না। ইহার ফলে, সমিতিগুলি সুপরিচালিত হয় না।

তৃতীয়ত, সমিতির সদস্যগণ সমবায়ের উচ্চ আদর্শ নীতির কথা মানিয়া চলে না। 'প্রত্যেকে সকলের জন্য এবং সকলে প্রত্যেকের জন্য'—সমবায়ের এই আদর্শ সদস্যরা বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে না। ফলে ইহার জন্য অনেক ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সমবায় সমিতি সার্থক করার জন্য প্রয়োজন হয় উৎসাহী কর্মীবৃন্দ ও সুযোগ্য নেতৃত্বের। কিন্তু সমবায়ের সদস্যরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়

থাকে এবং তাহাদের নেতৃত্বের যোগ্যতা দেখা যায় না। ইহার পরিবর্তে দেখা যায়, সদস্যদের অসাধুতা ও নির্লিপ্ততা। ফলে সমবায় সমিতি সফল হইতে পারে না। ভারতেও এই কারণের জন্য এখনও পর্যন্ত সমবায় আন্দোলন সফল হয় নাই।

ভারতের দৃষ্টান্ত : ভারতেও প্রধানত পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সালের শেষে ভারতে প্রাথমিক কৃষি ঋণ-দান সমিতির সংখ্যা ছিল ৯৪,০০০টি এবং উহাদের সভ্যের সংখ্যা ছিল ৬৩৩·১২ লক্ষ। ইহা ছাড়া, বহুসংখ্যক যৌথ চাষ সমিতিও (joint farming societies) ছিল।[১] শিল্পক্ষেত্রে হস্তচালিত তাঁতশিল্প সমবায়, চিনি সমবায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পরিবহণ সমবায়, ব্যাংক সমবায় প্রভৃতিও দেখা যায়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিনে শহরে ভোগকারীদের সমবায় ও আবাসন-সমবায়ের (housing co-operatives) গুরুত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ভারতে সমবায়ের প্রসার বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই।

৬. **রাষ্ট্রীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রীয় সংগঠন (State Enterprises or State Undertakings) :** রাষ্ট্রীয় সংগঠন আধুনিককালে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের একটি অন্যতম রূপ। দেশের সরকার বা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এই প্রকার সংগঠনের মালিক ও পরিচালক হয় এবং জনসাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধি করাই ইহাদের কাজের অন্যতম লক্ষ্য। আমাদের দেশে সরকার রেল-পরিবহণ, বৃহৎ ব্যাংক, বীমা ব্যবসায়, ডাক ও তার বিভাগ ইত্যাদি পরিচালনা করে। ইহা ছাড়া, ভারত সরকার হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড নামক কোম্পানীর মাধ্যমে ভারতে ইস্পাত নির্মাণ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছে। ব্যাংকিং, খাদ্য-ব্যবসা, দ্রব্য আমদানী-রপ্তানি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সরকার ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে। ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসের শেষে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ২১৪টি[২] সরকারী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ছিল এবং ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৫,৪১১ কোটি টাকা। ইহাদের অধিকাংশই কোম্পানী ব্যবসায়ের নীতিতে গঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যায় রাজ্য সরকারের অধীনে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান দেখা যায় (যেমন—কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ করপোরেশন, দুর্গাপুর প্রকল্প লিমিটেড ইত্যাদি)। ভারতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলি হইতেছে—হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড, ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন লিমিটেড, হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, ভারত ইলেক্ট্রনিকস্ লিমিটেড ইত্যাদি।

রাষ্ট্রীয় সংগঠন পরিচালনার বিভিন্ন রূপ : রাষ্ট্রীয় সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধানত তিন রকম ব্যবস্থা দেখা যায় :

ক। বিভাগীয় সংগঠন (Departmental Organisation)ঃ কোন কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান সরকারের কোন প্রশাসনিক বিভাগ বা দপ্তর বা সরকারের কোন দপ্তরের অধীন বোর্ড দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন—ভারতে রেল-পরিবহণ, ডাক ও তার ব্যবস্থা,অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন কারখানা, অল ইন্ডিয়া রেডিও, চিত্তরঞ্জন রেল-ইঞ্জিন কারখানা ইত্যাদি। এরূপ সংগঠন-ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকলাপের উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ সংগঠনের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ খুবই ব্যাপক ও প্রত্যক্ষ বলিয়া কার্য-সম্পাদনে অযথা বিলম্ব ঘটে।

খ। বিধিবদ্ধ বা সরকারী করপোরেশন (Statutory or Public Corporation)ঃ অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সংগঠন সরকার কর্তৃক সরাসরি পরিচালিত না হইয়া বিধিবদ্ধ বা সরকারী করপোরেশন মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ইহার মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে করপোরেশনগুলির পৃথক আইনগত সত্তা থাকে এবং ইহারা পরিচালনা ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে। কিন্তু ইহারা প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকে। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ করপোরেশন, জীবনবীমা করপোরেশন প্রভৃতি সরকারী করপোরেশনের দৃষ্টান্ত।

গ। সরকারী কোম্পানী (Government Company)ঃ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হইতেছে সরকারী মালিকানা ও পরিচালনায় যৌথ মূলধনী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান। ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে, এইরূপ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের মতো সংগঠিত হয় এবং সরকার নিজেই সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করে। হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড, হেভি ইলেক্ট্রিক্যাল্স লিমিটেড প্রভৃতি এইরূপ রাষ্ট্রীয় সংগঠন।

রাষ্ট্রীয় সংগঠনের সুবিধা ও অসুবিধাঃ রাষ্ট্রীয় সংগঠনের কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমত, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উৎপাদনের কার্য জনগণের কল্যাণের জন্য পরিচালনা করা হয়। ইহাতে ব্যক্তিগত মুনাফার (individual profit) পরিবর্তে সামাজিক কল্যাণ (social welfare) বৃদ্ধি পায় ও সমাজ লাভবান হয়।

দ্বিতীয়ত, বেসরকারী উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সম্পদের অপচয়, শ্রমিকের বেকারত্ব, ব্যবসায়ের অত্যধিক মুনাফা ইত্যাদি কুফল থাকে। রাষ্ট্রীয় সংগঠনে এই অসুবিধাগুলি বিশেষ থাকে না।

তৃতীয়ত, শ্রমিকেরা সরকারের অধীনে কাজ করে বলিয়া তাহারা সরকারের নিকট হইতে ন্যায্য মজুরি পায় এবং তাহাদের কাজের শর্ত সুবিধাজনক হয়।

চতুর্থত, ভারতের ন্যায় শিল্পে অনগ্রসর দেশে রাষ্ট্রীয় সংগঠন একরূপ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। এইসকল দেশে শিল্প-মালিকরা ভারী মূলধন শিল্পে প্রয়োজন মতো অর্থ বিনিয়োগ করে না। সরকারকেই সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। ইহার ফলে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক সুবিধাগুলি (infra-structural facilities) প্রসারিত হয়।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের প্রসারের দ্বারা দেশের শিল্পক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবসান ঘটাইয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা (socialistic pattern of society) গঠন করা যায়।

ষষ্ঠত, রেল-পরিবহণ, ডাক ও তার, বিদ্যুৎ-যোগান, পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি (public utilities) রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গঠন করা একরূপ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কারণ, এই প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় সেবাকার্য (essential services) যোগান দিয়া থাকে। এই সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে মুনাফার পরিবর্তে জনসেবাই বিবেচ্য বিষয় বলিয়া গণ্য করা হয়।

সপ্তমত, রাষ্ট্রীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে লাভ হইলে সরকারের রাজস্বও বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে বলা যাইতে পারে, সরকার অপেক্ষাকৃত কম দামে অর্থাৎ 'না-লাভ না-ক্ষতি'র (no profit, no loss) ভিত্তিতে বাজারে দ্রব্য বিক্রয় করে বলিয়া জনসাধারণের লাভ হয়।

কিন্তু এইপ্রকার সংগঠনের নানারূপ অসুবিধাও আছে। প্রথমত, রাষ্ট্রীয় সংগঠন যাহারা পরিচালনা করে, তাহাদের মধ্যে উদ্যমের বিশেষ অভাব থাকে। ফলে, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের দ্রুত প্রসার ঘটে না।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় সংগঠনে কোন বিষয় সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্তে আসা যায় না। ইহার ফলে, রাষ্ট্রীয় সংগঠনে লক্ষ্য অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের সাধারণত মুনাফার দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকে না। ফলে, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বড় হওয়া বিশেষ ঝোঁক থাকে না।

চতুর্থত, অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, বিনিয়োগাধিক্য (over-capitalization), প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও দুর্বলতা, শীর্ষভারী প্রশাসন, পরিচালন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দুর্নীতি, উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের অভাব, সম্পদের অপচয় ইত্যাদি কারণে অধিকাংশই রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলিতে বিপুল ক্ষতি হয়। যেমন—বর্তমানে স্টীল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, ফার্টিলাইজার করপোরেশন, হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কতকগুলি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে বিপুল পরিমাণে ক্ষতি হইতেছে।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলি অভিজ্ঞ পরিচালকের অভাবে ঠিকমতো পরিচালিত হয় না। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে অভিজ্ঞ পরিচালকের অভাবে রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহা ছাড়া, সরকারী সংস্থায় পরিচালকবর্গের 'আমলাতান্ত্রিক মনোভাব' (bureaucratic attitude) থাকার জন্য ইহাদের সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব হয় না।

পরিশেষে বলা যায়, রাষ্ট্রীয় সংগঠনে স্বজনপ্রীতি, প্রশাসনিক আমলাতন্ত্র, লালফিতার দৌরাত্ম্য (red tapism), অব্যবহৃত উৎপাদন-ক্ষমতা (unused or excess capacity), দীর্ঘসূত্রতা, পরিচালকদের অসাধুতা ইত্যাদি দোষগুলি দেখা যায়।

ভারতের দৃষ্টান্ত ঃ পরিকল্পনাধীনকালে ভারতে নানাকরণে সরকারী সংস্থার সংখ্যা ও ঐ সংস্থায় বিনিয়োগের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। যেমন—১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকারের অধীন সংস্থগুলির সংখ্যা ছিল মাত্র ৫টি এবং উহাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৯ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে ঐ সংখ্যা হয় ২১৪টি এবং বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৫,৪১১ কোটি টাকা। ভারতের উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি হইতেছে—হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড, হিন্দুস্থান মেশিন টুল্‌স, অয়েল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ভারত ইলেক্‌ট্রনিক্‌স লিমিটেড ইত্যাদি। সালের শেষে সরকারী ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের ১৭·১৪ শতাংশ ছিল ইস্পাত-শিল্পে, ১২·৭১ শতাংশ ছিল রসায়ন-সামগ্রী ও ঔষধপত্র প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ইত্যাদি। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন রাজ্য সরকারেরও বহুসংখ্যক শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে। যেমন—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে দুর্গাপুর প্রোজেক্টস্‌ লিমিটেড, কল্যাণী সুতাকল, কলিকাতা দুগ্ধ-সরবরাহ ইত্যাদি।

উপসংহার ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের নানারূপ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ইহার প্রসার ঘটিতেছে। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, উৎপাদন প্রভৃতি কার্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কম-বেশী দেখা যায়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্য পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। আবার ভারতের ন্যায় 'মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা'য় (mixed economy) সরকারের শিল্পনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে দেশে দ্রুত শিল্পের উন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়া আর্থিক সম্পদের সুষম বন্টনের পথ প্রশস্ত করা। এই ধরনের অর্থব্যবস্থায় যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠানগুলি যে উহার কার্যকলাপে উন্নতি ঘটাইতে পারে, তাহা বিগত কয়েক বৎসরে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের উন্নত কার্যকলাপ হইতে অনুধাবন করা যায়।

———

।। ব্যবসায়-অর্থবিদ্যার স্বরূপ ।।
(Nature of Business Economics)

Business Economics supplies "*an analytical tool aimed at providing the executive staff of a business with elements which can serve as bases for business decisions.*"

Business Economics *"studies the process of planning and decision-making and attempts to furnish aid which will improve upon the decisions made."*

—LOWES & SPARKES

১

।। অর্থব্যবস্থার মৌলিক একক ও সর্বাধিক-করণের লক্ষ্য ।।

(Basic units of the Economic System and the Optimisation Goal)

(অর্থব্যবস্থার স্বরূপ ও কার্যাবলী—বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়—ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও মিশ্র অর্থব্যবস্থা—অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন একক—পরিবার, উপাদানের মালিক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সরকার ও অন্যান্য এককসমূহ—অর্থনৈতিক কার্যকলাপের লক্ষ্য—বিভিন্ন এককের সর্বাধিককরণের লক্ষ্যসমূহ)

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, আধুনিককালের লেখকরা অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিতে গিয়া অর্থবিদ্যার আলোচনাকে মোটামুটি তিনটি অংশে ভাগ করেন[১] :

ক। **বর্ণনামূলক অর্থবিদ্যা (Descriptive Economics)** : অর্থব্যবস্থার কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা বিশদভাবে আলোচনা করাই এই অংশের আলোচ্য বস্তু। যেমন—ভারতের কৃষিব্যবস্থা বা গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পব্যবস্থার তথ্যমূলক আলোচনা।

খ। **অর্থনৈতিক বা অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ (Economic Theory or Economic Analysis)** : অর্থব্যবস্থার কার্যধারা এবং উহার মৌল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই অংশের অন্তর্ভুক্ত। ইহা মূলত অর্থবিদ্যার তত্ত্বমূলক আলোচনা।

গ। **ব্যবহারিক বা ফলিত অর্থবিদ্যা (Applied Economics)** : বর্ণনামূলক অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুগুলি কিভাবে অর্থনৈতিক তত্ত্ব দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয় তাহাই এই অংশের আলোচ্য বস্তু। অর্থনৈতিক তত্ত্ব দ্বারা ভোগকারী ও উৎপাদকের আচরণ, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও কার্যক্রম ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুগুলির যে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহা ফলিত অর্থবিদ্যায় আলোচনা করা হয়। ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা (Business Eonomics) এই অংশেরই অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা হইতেছে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের আচরণ ও কার্যকলাপের (operations) তত্ত্বমূলক ও ব্যবহারিক বিশ্লেষণ এবং ইহা মূলত প্রয়োগধর্মী হয়।

ব্যবসায়-অর্থবিদ্যার স্বরূপ সম্বন্ধেই পুস্তকের এই অংশে আলোচনা করা হইবে। ঐ আলোচনার পূর্বে অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা, স্বরূপ, মৌলিক একক ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে অলোচনা করা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে ঐ বিষয়গুলিই আলোচিত হইবে।

১. **অর্থব্যবস্থার স্বরূপ ও কার্যাবলী (Nature and Functions of the Economic System)** : অর্থব্যবস্থার স্বরূপ ও কার্যাবলী আলোচনার পূর্বে প্রশ্ন উঠে, অর্থব্যবস্থা বলিতে কি বুঝায়? মানুষ যে-সকল প্রতিষ্ঠানগত ও আইনগত

---

১. পৃঃ ৬ দ্রষ্টব্য

কাঠামোর মধ্যে থাকিয়া তাহার অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পন্ন করে, তাহাকেই সংক্ষেপে অর্থব্যবস্থা বলা হয়। দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় এবং বণ্টন-সংক্রান্ত মানুষের কাজকর্মকে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বলা হয়। এই সকল কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ ও সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেক সমাজে আইনগত ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও রীতিনীতি থাকে। যেমন— প্রত্যেক সমাজে উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা, শ্রমনিয়োগ, শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক, জমিদার ও কৃষকের সম্পর্ক, বিনিময়ের পদ্ধতি, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের আচরণবিধি ও ক্রিয়াকলাপ, আয় ও সম্পদ বণ্টনের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আইনগত ও সামাজিক রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থা থাকে। ঐ সকল রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং সংক্ষেপে ঐগুলিকে প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো বলা হয়। অর্থনৈতিক কার্যকলাপের এই প্রতিষ্ঠানগত কাঠামোকেই অর্থব্যবস্থা বলা হয়। সুতরাং সমাজের নানারূপ প্রতিষ্ঠান ও যে ধরনের আচরণ দ্বারা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পন্ন হয়, তাহাদের সমষ্টি হইতেছে অর্থব্যবস্থা (*Economic system is the sum total of institutions and patterns of behaviour that organise economic activity in society*— Due & Clower)[১]।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরনের অর্থব্যবস্থা চালু থাকিলেও বর্তমানে মোটামুটি তিন ধরনের অর্থব্যবস্থা রহিয়াছে—ধনতন্ত্র (capitalism), সমাজতন্ত্র (socialism) ও মিশ্র অর্থব্যবস্থা (mixed economy)। সম্প্রতিককালে 'অবাধ ধনতন্ত্র' ও সমাজ-তন্ত্রের' দোষগুলি বর্জন করিয়া ও গুণগুলি একত্র করিয়া এক নতুন ধরনের অর্থব্যবস্থা দেখা যাইতেছে, যাহাকে এককথায় 'মিশ্র অর্থব্যবস্থা' বলা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত কমিউনিস্ট দেশগুলি বাদ দিলে বিংশশতাব্দীর এই সময়ে প্রায় সমস্ত শিল্পোন্নত দেশেই এই মিশ্র অর্থব্যবস্থা চালু রহিয়াছে। এই প্রকার অর্থব্যবস্থায় দেশের অর্থ-নৈতিক কার্যকলাপে সরকারী ও বেসরকারী নিয়ন্ত্রণ মানিয়া লওয়া হয়। ভারতের অর্থব্যবস্থা খুবই পশ্চাৎপদ বলিয়া উহার দ্রুত প্রসারের জন্য এখানেও মিশ্র অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে।

বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াই অতি সহজেই বলা চলে, বিভিন্ন অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভিন্ন ধরনের এবং অর্থনৈতিক কার্য-কলাপ নিয়ন্ত্রণ ও সম্পন্নের জন্য যে-সকল রীতিনীতি ও আইনগত বিধিব্যবস্থা থাকে, তাহাও বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। যেমন—ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উদ্যোগের অবাধ অধিকার মানিয়া লওয়া হয়, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উহা স্বীকার করা হয় না। বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার মধ্যে নানারূপ পার্থক্য থাকিলেও সজীব-প্রাণীর দেহের মতোই সজীব অর্থব্যবস্থার উদ্ভব, বিকাশ ও লয় আছে। কালের পরিবর্তনের সহিত অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলিরও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ

---

১. Due and Clower—*Intermediate Economic Analysis*

২. Samuelon—*Economics* (11th Edition)

সময়ের পরিবর্তনের সহিত ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রে সকল প্রকার অর্থব্যবস্থারই কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। সুতরাং কালের পরিবর্তনের সহিত কোন দেশে যেরূপ অর্থব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে, সেইরূপ কোন একটি অর্থব্যবস্থার বিধিব্যবস্থাগুলিও পরিবর্তিত হয়।

অর্থব্যবস্থার প্রকারভেদ থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক অর্থব্যবস্থায় কার্যকলাপ হইতেছে ইহার মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধানের ব্যবস্থা করা। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক স্যামুয়েলসন (Samuelson) দেখাইয়াছেন, প্রত্যেক অর্থব্যবস্থার মৌলিক সমস্যা মোটামুটি তিনটি এবং অর্থব্যবস্থাকে উহার প্রত্যেকটিকে সমাধান করিতে হয়। সুতরাং প্রত্যেক অর্থব্যবস্থার কার্যাবলী মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

ক। প্রত্যেক অর্থব্যবস্থায় জনসমাজকে প্রথমেই স্থির করিতে হয়, কি কি দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য (goods and services) উৎপাদন করা হইবে এবং কি কি পরিমাণে ? খাদ্যদ্রব্য না সামরিক দ্রব্যসম্ভার ? রাসায়নিক সার না পরিধেয়ের বস্ত্র ? চিনি না কৃষি-যন্ত্রপাতি ? তদুপরি কি কি দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপাদন করা হইবে তাহাও প্রতিটি জনসমাজকে স্থির ও তাহা সমাধানের ব্যবস্থা করিতে হয়।

খ। অর্থব্যবস্থার দ্বিতীয় সমস্যা ও কাজটি হইল, নির্বাচিত দ্রব্য-সামগ্রী কি ভাবে উৎপাদন করা হইবে ? অর্থাৎ উৎপাদন-কার্যে কি কি উপকরণ নিযুক্ত হইবে এবং কোন্ উৎপাদন-পদ্ধতি গ্রহণ করা হইবে ?

গ। তৃতীয় সমস্যা ও কাজটি হইতেছে, কাহার জন্য উৎপাদন করা হইবে। অর্থাৎ, উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য কাহার ভোগে লাগিবে ? আরও সহজভাবে বলা যায়, মোট উৎপাদন কি ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টন করা হইবে ? ইহা হইল মূলত বণ্টন-ব্যবস্থার সমস্যা।

প্রত্যেক অর্থব্যবস্থাকে এই তিনটি মৌল সমস্যার—কি, কেমন করিয়া ও কাহার জন্য (What, How and For Whom) সমাধানের ব্যবস্থা করিতে হয় এবং উহাই হইতেছে অর্থব্যবস্থার কার্যকলাপ।

এই কার্যকলাপগুলি বাস্তবক্ষেত্রে নিম্নরূপ হইয়া থাকে ঃ

(i) দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের যোগান ও কার্যকর চাহিদার মধ্যে যতদূর সম্ভব সুষ্ঠুভাবে সমতা প্রতিষ্ঠা করা ;

(ii) কি কি দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য উপাদান করা হইবে এবং কি পরিমাণে তাহা নির্ধারণ করা ;

(iii) যে-সকল শিল্প দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য উৎপাদন করে তাহাদের মধ্যে উৎপাদনের অপ্রচুর উপকরণগুলি (scarce resources) যথাযথ বণ্টনের ব্যবস্থা করা ,

(iv) দেশের ব্যবহারযোগ্য সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উৎপাদন-পদ্ধতি নির্বাচন করা ; এবং

(v) কৃষি ও শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রী দেশের লোকদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা।

অবশ্য এই কার্যকলাপের ধরন ও মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধানের উপায় প্রত্যেক অর্থব্যবস্থায় একই রূপ নহে। অবাধ উদ্যোগাধীন অর্থব্যবস্থায় (free enterprise economy)—অর্থাৎ যে-অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ও উদ্যোগের স্বাধীনতা মানিয়া লওয়া হয়—এই সমস্যাগুলির সমাধান স্বয়ংক্রিয় দাম-প্রক্রিয়ার (automatic price mechanism) মাধ্যমেই হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সরকারই প্রধানত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সমস্যাগুলির সমাধানের ব্যবস্থা করে। এই বিষয় সম্পর্কে এখানে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নাই বলিয়া উহা করা সম্ভব হইল না।

২. বিভিন্ন বিকল্প অর্থব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় (A brief description of the different alternative economic systems)ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও মিশ্র অর্থব্যবস্থা—এই তিনটি হইতেছে আধুনিক যুগে প্রধান অর্থব্যবস্থা। এখন এইগুলির মৌল বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

ক। ধনতন্ত্র (Capitalism)

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মৌল বৈশিষ্ট্যসমূহ (Essential Features of a Capitalist Economy)**ঃ** ইংল্যান্ডে ১৭৬০—১৮২০ সালের মধ্যে যে শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution) ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে ইংল্যান্ডে ও পৃথিবীর অন্যত্র যে-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই 'ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা' (capitalist economy) নামে পরিচিত। এই অর্থব্যবস্থার মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল ঃ

(ক) **ব্যক্তিগত সম্পত্তি ঃ** ব্যক্তিগত সম্পত্তি (private property) বলিতে জমি-জমা, খনি, বন, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা প্রভৃতি উৎপাদনের উপকরণ এবং তৎসহ ঘরবাড়ী ইত্যাদি যাবতীয় ভোগ্যদ্রব্য অর্থাৎ সম্পদ প্রভৃতির ব্যক্তিগত মালিকানাকে বুঝায়। এইসকল সম্পত্তির অবাধ ভোগ-দখল, হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারের অধিকার সকল কিছুই দেশের আইন দ্বারা স্বীকৃত হয়।

ধনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আইনগত অধিকার অর্থাৎ সম্পত্তি ও উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা ব্যক্তির হাতে থাকিবে, সমাজ বা রাষ্ট্রের হাতে উহা থাকিবে না। প্রকৃতপক্ষে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা বলিতে বিশেষ কিছু থাকে না বলিলেই চলে। ধনতন্ত্রবাদের সমর্থকদের মতে, সম্পত্তির মালিকানাবোধ মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রেরণা যোগায় বলিয়া ইহার বৃদ্ধি খুবই আবশ্যক। ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক দর্শন-তত্ত্ব অনুসারে ধন-সম্পদ করায়ত্ত করা ও আয়-বৃদ্ধি করার আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে অধিক পরিশ্রম করার

প্রেরণা যোগায়। ব্যক্তির এই অভিপ্রায়ের দরুন কেবলমাত্র ব্যক্তিই নয়, সমগ্র সমাজই লাভবান হয়। স্বার্থপর মানুষের সম্পত্তি করায়ত্ত করার অভিপ্রায়ের দরুন সকল ব্যক্তিই বা উৎপাদকই সর্বাধিক উৎপাদন করার প্রয়াস করে। ইহার ফলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই লাভবান হয়। এই ধারণাটি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যস্থার মূল ভিত্তি।

(খ) **সর্বাধিক মুনাফার অভিপ্রায়ঃ** ব্যক্তিগত সম্পত্তি করায়ত্ত করার অভিপ্রায় হইতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎপাদকের সর্বাধিক মুনাফার অভিপ্রায়ের উদ্ভব ঘটে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎপাদক মুনাফার অভিপ্রায় দ্বারা পরিচালিত হইয়া দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজিপতির মুনাফা সর্বাধিক হয়, পুঁজিপতি সেই সকল দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে। পুঁজিপতি উৎপাদনের উপকরণের (নিজস্ব বা ক্রীত উপকরণ) মালিক, কিন্তু উৎপাদনের কার্য প্রকৃতপক্ষে অন্য একদল ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ শ্রমিক সম্পন্ন করে। পুঁজিপতি তাহার নিজস্ব অর্থ মূলধন (M) দ্বারা বাজার হইতে দ্রব্যসামগ্রী অর্থাৎ শ্রমশক্তি ও উৎপাদনের উপকরণ ক্রয় করিয়া উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রী (C) উৎপাদন করে। পুঁজিপতি উহা বিক্রয় করিয়া পুনরায় অর্থ (M') পায়। সুতরাং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎপাদন-অপেক্ষক (production function)[১] হইতেছে ($M—C—M'$), অর্থ—দ্রব্যসামগ্রী—অর্থ। স্বভাবতই M অপেক্ষা M' অধিক না হইলে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার কোনরূপ সার্থকতা বা যৌক্তিকতা থাকে না। ইহা হইতে দেখা যায়, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় পুঁজিপতি সর্বাধিক মুনাফার অভিপ্রায় দ্বারা পরিচালিত হইয়া উৎপাদনের কার্য সম্পন্ন করে।

(গ) উদ্যোগের অবাধ স্বাধীনতা: ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অপর আর একটি উপাদান হইতেছে উদ্যোগের স্বাধীনতা (freedom of enterprise)। উদ্যোগের স্বাধীনতা বলিতে ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা প্রভৃতি নির্বাচনের স্বাধীনতা এবং শ্রম ও মূলধনের অবাধ গতিশীলতাকে বুঝায়। এই ধরনের সমাজব্যবস্থায় সরকার ব্যক্তির স্বাধীন অর্থনৈতিক কাজ-কারবারে (যেমন—শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি) হস্তক্ষেপ করে না। ইহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ (individualism) বা 'ছাড়িয়া দেওয়া' (*laissez faire*) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতি ভিত্তি করিয়া অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) প্রমুখ ক্লাসিক্যাল লেখকরা প্রচার করেন, অর্থনৈতিক কার্যকলাপে মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ক্ষুণ্ণ হয়, এইরূপ কোন ব্যবস্থাই রাষ্ট্র বা সরকার অবলম্বন করিবে না। সুতরাং উদ্যোগের ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা থাকিবে। কি ও কতখানি উৎপাদন করা হইবে, কখন উৎপাদন করা হইবে এবং কীভাবে উহা উৎপাদন করা হইবে—এই সকল সিদ্ধান্ত উদ্যোক্তা নিজেই গ্রহণ করিবে। ইহার ফলে যে উদ্যোগে লাভের সম্ভাবনা বেশী, উদ্যোক্তা সেই উদ্যোগেই নিযুক্ত থাকে। উদ্যোগের অবাধ স্বাধীনতা থাকার ফলে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদকের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিরাজ করে এবং

১ উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে যে ক্রিয়াগত সম্পর্ক দেখা যায় তাহাকে উৎপাদন-অপেক্ষক বলে।

ইহার ফলে শুধুমাত্র সুদক্ষ উৎপাদকই বাজারে টিঁকিয়া থাকিতে পারে। উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকার জন্য ধনতন্ত্রকে 'অবাধ উদ্যোগাধীন অর্থব্যবস্থা' (free enterprise economy) বলিয়াও অভিহিত করা হয়।

(ঘ) **ক্রেতার সার্বভৌমত্ব :** ক্রেতার সার্বভৌমত্ব (consumer sovereignty) বলিতে ভোগকারীর ইচ্ছামতো দ্রব্যসামগ্রী নির্বাচন ও ক্রয় করার স্বাধীনতাকে বুঝায়। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ক্রেতা নিজের ইচ্ছামতো ব্যয় বা সঞ্চয় করিতে পারে এবং দেশের সরকার ক্রেতার এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। প্রত্যেক ক্রেতাই তাহার নিজের স্বার্থ ভালো করিয়া বুঝে বলিয়া ক্রেতারা স্বাধীনভাবে দ্রব্যসামগ্রী নির্বাচন করিতে পারিলে, তাহার পরিতৃপ্তি (satisfaction) সর্বাধিক হইবে। ক্রেতার এই সার্বভৌমত্ব থাকার ফলে ধনতন্ত্রে ক্রেতাই এক অর্থে উৎপাদনের নিয়ামক হয়। কারণ, ক্রেতারা যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে চাহে, উৎপাদক সেই সকল দ্রব্যসামগ্রীই উৎপাদন করে।

(ঙ) **দাম-মুনাফা প্রক্রিয়া :** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা দাম-মুনাফা প্রক্রিয়া (price profit mechanism) দ্বারা পরিচালিত হয়। এইপ্রকার অর্থব্যবস্থায় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের দামের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। দাম বাড়িলে, মুনাফা সাধারণত বৃদ্ধি পায় বলিয়া উৎপাদকরা অধিক পরিমাণে উৎপাদন করে এবং ফলে উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, দাম হ্রাস পাইলে সাধারণত মুনাফা কমিয়া যায় বলিয়া উৎপাদকরা উৎপাদন হ্রাস করে এবং ইহার ফলে উৎপাদন ও জাতীয় আয় হ্রাস পায়। দাম-মুনাফা প্রক্রিয়ায় এই 'অদৃশ্য হস্তের' (the invisible hand) দ্বারা সমগ্র অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয় এবং ইহার ফলে ক্রেতার চাহিদা এবং উৎপাদকের যোগানের মধ্যে একটি সমতা সৃষ্টি হয়।

(চ) **কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অভাব :** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা অসংখ্য ব্যক্তির স্বাধীন ও পারস্পরিক নির্ভরশীল কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা পরিচালিত হয়। ঐ অসংখ্য কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে সংযোগসাধনের জন্য কোনরূপ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা থাকে না এবং উহা স্বাধীন বাজারের স্বয়ংক্রিয় শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে।

(ছ) **অন্যান্য বৈশিষ্ট্য :** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যাইতে পারে, যেমন—পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগের ফলে প্রতিনিয়ত শ্রেণীসংঘর্ষ, আয় ও সম্পদ বণ্টনের অসমতা ও ধনী-গরীবের শ্রেণীবিভাগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ফলে অবাধ প্রতিযোগিতা (free competition) ইত্যাদি।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দাম-ব্যবস্থার ভূমিকা (Role of Prices in the Capitalistic Economy) : পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এক 'অদৃশ্য হস্তের' (the invisible hand) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

১. Halm—Economic Systems, P. 36

হইতেছে। ঐ অদৃশ্য হস্তই হইতেছে দাম-ব্যবস্থা। এখন দেখা যাউক, এই ধরনের অর্থব্যবস্থায় দাম-ব্যবস্থা কি কি কার্য সম্পাদন করে :

(ক) প্রাকৃতিক সম্পদের বিলিবণ্টন : ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দামের মাধ্যমে সমাজের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারগত বিলিবণ্টন হইয়া থাকে। ভোগকারীরা বিভিন্ন দ্রব্যাদির জন্য যে দাম দিয়া থাকে, তাহা দ্বারাই ঐ সম্পদ বিভিন্ন বস্তু উৎপাদনের মধ্যে বণ্টিত হইয়া থাকে। দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত অধিক দামের বস্তুর ক্ষেত্রে অধিক প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়োজিত হয় এবং কম দামের বস্তু-উৎপাদনের ক্ষেত্রে কম সম্পদ নিয়োজিত হয়।

(খ) ন্যূনতম ব্যয়ের উৎপাদন-পদ্ধতি নির্বাচন : বিভিন্ন উপাদানের (শ্রমিক ও মূলধন) আপেক্ষিক দাম বিবেচনা করিয়া দাম-ব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যূনতম ব্যয়ের সর্বোৎকৃষ্ট উৎপাদন-পদ্ধতি (least-cost best production techniques) নির্বাচন করা সম্ভব হয়। উৎপাদন-পদ্ধতি শ্রম-প্রধান (labour intensive) না মূলধন-প্রধান (capital intensive) হইবে, তাহা শ্রমের ও মূলধনের আপেক্ষিক দাম বিবেচনা করিয়া নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

(গ) মোট উৎপাদনের বণ্টন : সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে দেশের মোট উৎপাদনে কিভাবে বণ্টন করা হইবে, তাহাও দাম-ব্যবস্থা স্থির করিয়া দেয়। যে-শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের দ্রব্য-সামগ্রী বা সেবাকার্যের জন্য উচ্চ হারে দাম বা পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে, তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা অধিক হয় বলিয়া তাহারা দেশের উৎপাদনের অধিক অংশও ভোগ করিতে পারে। পক্ষান্তরে, যাহাদের সেবাকর্যের দাম অপেক্ষাকৃত স্বল্প, মোট উৎপাদনে তাহাদের অংশও স্বল্পই হইয়া থাকে।

(ঘ) চাহিদা-যোগানের সমতা : ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবা-কার্যের দাম উহাদের পারস্পরিক চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করে। ইহা দ্বারা অসংখ্য ক্রেতা ও অসংখ্য বিক্রেতার কার্যকলাপের মধ্যে একটি শৃঙ্খলা ও সমতা আনা সম্ভব হয়।

সুতরাং দাম ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পরিকল্পনার এজেন্ট হিসাবে কাজ করিয়া সমাজের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত করিয়া থাকে।

খ। সমাজতন্ত্র (Socialism)

সমাজতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ (Essential Features of Socialism) : ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়। সমাজতন্ত্রবাদ একধারে রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব এবং অন্যদিকে ইহা অন্যতম অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও অর্থব্যবস্থা। সমাজতন্ত্রের সর্বসম্মত কোন সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, সমাজ-তন্ত্র এমন একটি অর্থব্যবস্থা, যেখানে সমাজের বা দেশের যাবতীয় উৎপাদনের উপকরণের (অর্থাৎ, জমি, পুঁজি, অরণ্য, খনি ও জলসম্পদ ইত্যাদি) উপর সমাজ বা রাষ্ট্রের মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়

উৎপাদনের মালিকানা রাষ্ট্রের অধীনে আনিয়া রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা পরিচালিত হইয়া থাকে। এই কারণে ইহাকে অনেকেই "আদেশমূলক অর্থব্যবস্থা" (command economy) বলিয়া অভিহিত করেন।

অর্থব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচিত হইল :

ক। উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ : সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটাইয়া রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং দেশের যাবতীয় জমি, পুঁজি, অরণ্য ও জলসম্পদ ইত্যাদি উপকরণগুলির মালিক হয় রাষ্ট্র এবং ঐগুলি রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে দেশের সামগ্রিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানা বলিতে জনসাধারণের মালিকানাকে বুঝায়; উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির মালিক হইতেছে প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণ। শুধুমাত্র ভোগ্যবস্তুর (যেমন—আসবাবপত্র, বাসগৃহ ইত্যাদি) ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হয়।

খ। অর্থব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশের রাষ্ট্রীয়করণ : সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দেশের অর্থব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ রাষ্ট্রের মালিকানায় ও তত্ত্বাবধানে আনা হয়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, বীমা প্রভৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটাইয়া রাষ্ট্রীয় বা জনসাধারণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

গ। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পুঁজিপতির অবসান : সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ (private enterprise) এবং পুঁজিপতিদের অবসান ঘটানো হয়। সরকার নিজেই উদ্যোগী হইয়া কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি স্থাপন করিয়া উহা উন্নয়নের ব্যবস্থা করে বলিয়া ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পুঁজিপতির অবসান ঘটে।

ঘ। দাম-ব্যবস্থার অবসান : সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সরকারী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দাম-ব্যবস্থার অবসান ঘটে বা উহা পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। সরকারই বা পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষ দেশের সম্পদ-ব্যবহার ও বিভিন্নক্ষেত্রে বন্টনের ব্যবস্থা করিয়া দেয়।

ঙ। ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে সামাজিক কল্যাণ : সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য উৎপাদনের দায়িত্ব রাষ্ট্র নিজের হাতে তুলিয়া লয়। উৎপাদন ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে সামাজিক কল্যাণ দ্বারা নির্ধারিত হয় অর্থাৎ রাষ্ট্র দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনের ব্যাপারে ব্যক্তিগত মুনাফা দ্বারা চালিত না হইয়া সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা ব্যক্তিগত মুনাফা দ্বারা চালিত হয়; কি উৎপাদন করা হইবে, কি পরিমাণে ও কোথায় উহা উৎপাদিত হইবে, এই সকল প্রশ্ন মুনাফার মাপকাঠিতে বিচার করিয়া উৎপাদক নিজেই উহার সমাধান করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্র ঐ সকল প্রশ্নের সমাধান করে বলিয়া সামাজিক কল্যাণের ভিত্তিতে উৎপাদন সংগঠিত হয়। ঔষধের তুলনায় মদ-প্রস্তুত করা অধিক লাভজনক হইলে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা

ঔষধের পরিবর্তে মদই প্রস্তুত করিবে। কিন্তু মদের পরিবর্তে ঔষধ প্রস্তুত করা সমাজের পক্ষে অধিক কল্যাণজনক বিবেচিত হইলে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের পক্ষে কল্যাণকর এইরূপ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হইবে। ইহার ফলে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের যে বিলিবণ্টন (allocation) হয়, তাহা সমাজের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয়।

চ। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ঃ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় তথাকথিত স্বয়ংক্রিয় দাম-ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল থাকে না, রাষ্ট্র বা সরকার দেশের দাম-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যাপারে যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে। মৌলিক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিয়া উহা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত হয় এবং উহা নির্দিষ্ট কালের জন্য উপযুক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করে। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের উৎপাদন করা হয় এবং তদনুযায়ী বিবিধ উৎপাদনকার্যে উপকরণসমূহের বিলিবণ্টন ঘটে। পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা দ্বারা সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হয় বলিয়া ইহাকে 'পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা' (planned economy) বলিয়াও অভিহিত করা হয়।

ছ। জাতীয় আয় ও জাতীয় সম্পদের সমবণ্টন ঃ সমাজতন্ত্রের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে অর্থনৈতিক সাম্য (economic equality) প্রতিষ্ঠা করা। অর্থনৈতিক সাম্য বলিতে দেশের জাতীয় আয় ও সম্পদের সমবণ্টনের ব্যবস্থা করাকে বুঝায়। সমাজতন্ত্রে শ্রেণীভেদ লোপ করার উদ্দেশ্যে দেশের অধিবাসীদের মধ্যে আয় ও সম্পদের সমবণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সমাজতন্ত্রে কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক প্রদানের প্রথা প্রবর্তিত হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি (অর্থাৎ জমি, পুঁজি, কলকারখানা, ক্ষেতখামার প্রভৃতি) বিশেষ থাকে না বলিয়া সমাজতন্ত্রে কাজ না করিলে কোন আয় উপার্জনের পন্থা থাকে না। "প্রত্যেকে নিজ ক্ষমতানুযায়ী পরিশ্রম করিবে এবং প্রত্যেকে তাহার পরিশ্রম অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাইবে" (from each according to his ability, to each according to his work)—ইহাই সমাজতন্ত্রে বণ্টনের নীতি। সুতরাং সমাজতন্ত্রে ধনী-গরীব, মালিক-শ্রমিক ইত্যাদি শ্রেণীভেদ থাকিতে পারে না।

জ। প্রত্যেকের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা ঃ সমাজতন্ত্রে আয় ও সম্পদের সমবণ্টন থাকার ফলে দেশের প্রত্যেক অধিবাসী কর্মনিয়োগ, শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে।

সমাজতন্ত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি বাস্তবে কতদূর রূপায়িত করা যায় তাহা বলা কঠিন কাজ, তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে এই উপাদানগুলি বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা হয়। সম্প্রতি ভারতেও সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সমাজতন্ত্র' কথাটি যুক্ত হইয়াছে।

গ। মিশ্র অর্থব্যবস্থা (Mixed Economy)

মিশ্র অর্থব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Mixed Economy and its Characteristics) : 'মিশ্র অর্থব্যবস্থা' বা 'মিশ্র ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা' (mixed capitalistic enterprise system) হইতেছে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংমিশ্রণ। অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের ভাষায় বলা যায়, মিশ্র অর্থব্যবস্থা এমন একটি অর্থনৈতিক কাঠামো যেখানে উৎপাদন ও ভোগকর্ম সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার সহিত সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটিয়া থাকে ("a mixed economy in which elements of government control are inter-mingled with market elements in organizing production and con-sumption")। অর্থাৎ, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সম্পন্ন করিয়া থাকে ("both public and private institutions exercise economic control')। এইরূপ অর্থব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও বেসরকারী মালিকানা পাশাপাশি অবস্থান করে।[1] বস্তুত ইহা ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র—উভয় অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ ও সুবিধাগুলি একত্র করার চেষ্টা করে।

মাত্রার পরিমাপ : মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারী ক্ষেত্রে ও বেসরকারী ক্ষেত্রের মিশ্রণের মাত্রাভেদ লক্ষ্য করা যায় এবং উহা পরিমাপও করা যায়। উহা পরিমাপের একটি পদ্ধতিহইতেছে, 'সরকারী ক্ষেত্রে উৎপন্নের মোট পরিমাণ (Y_a) ও নীট জাতীয় উৎপাদন (Y)—এই দুইয়ের মধ্যেকার অনুপাত। ঐ অনুপাতটি অর্থাৎ Y_a/Y-এর মান শূন্য হইতে এক-এর মধ্যে থাকে। উহার মান শূন্য হওয়ার অর্থ হইতেছে 'পূর্ণ ছাড়িয়া দেওয়া' (complete *laissez faire*) অবস্থা এবং এক হওয়ার অর্থ হইতেছে 'পূর্ণ সমাজতন্ত্র' (complete socialism)। সুতরাং উহার মান যত বেশী এক এর নিকটবর্তী হইবে তত বেশী সরকারী উদ্যোগের প্রাধান্য থাকিবে।[2]

মিশ্র অর্থব্যবস্থার সমর্থকরা বিশ্বাস করে, ধনতন্ত্রের কতকগুলি সুবিধা আছে, যেমন—ইহা উৎপাদন বৃদ্ধি করে, শ্রমিকের কার্যদক্ষতা বাড়াইয়া দেয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রগতি ও প্রয়োগের পথ প্রশস্ত করে। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়, 'অবিমিশ্র ধনতন্ত্রে' নানারূপ ত্রুতি-বিচ্যুতির উদ্ভব ঘটে—যেমন, ইহা শ্রমিক ও ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুন্ন করিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ করিয়া দেয়, একচেটিয়া অবস্থার উদ্ভব, অর্থব্যবস্থায় অত্যুৎপাদন ও সংকট, ব্যাপক বেকারত্ব প্রভৃতি সৃষ্টি করে ইত্যাদি। ধনতন্ত্রের এই ত্রুটিগুলি অপসারণের জন্য কতকগুলি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। ঐগুলি

1. Grossman—*Economic Systems, p. 23* "The term "mixed economy" is often applied to an economy in which there are substanial elements of both private and public ownership side by side."

2 Dr B. Dutta--*Social Justice in a Mixed Economy. p. 23*

হইতেছে—ইস্পাত, কয়লাখনি প্রভৃতি মূল শিল্প ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের (যেমন—ব্যাংকিং, বীমা, পরিবহণ প্রভৃতি) রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, প্রগতিশীল কর, সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাসকরণ, সম্পত্তির মালিকানার উপর বাধা-নিষেধ আরোপ, জনসাধারণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া, উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণ প্রভৃতি।

বৈশিষ্ট্য ঃ ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংমিশ্রণের ফলে মিশ্র অর্থব্যবস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছে। উহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

ক। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার মিশ্র অর্থব্যবস্থায় স্বীকার হয়। তবে বিশেষ বিশেষ সম্পত্তির (যেমন—কৃষি-জমি, শহুরে জমি ইত্যাদি) ক্ষেত্রে মালিকানার ঊর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়।

খ। ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা-নির্বাচন ইত্যাদির স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। তবে সরকারের বিধিব্যবস্থা দ্বারা ইহা আংশিক সীমায়িত, বিশেষত একচেটিয়া ব্যবসায়ের উপর বিশেষ বাধানিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ জারী করা হয়।

গ। দাম-ব্যবস্থা কার্যকর থাকে, কিন্তু ইহার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া, অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়।

ঘ। ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বেসরকারী মালিকানার উপকরণ প্রভৃতি থাকিলেও ইহাদের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দেশের সরকার শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করে।

ঙ। অর্থব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের সহ-অবস্থান থাকে। উভয় ক্ষেত্রই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের চেষ্টা করে এবং ইহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে পরিপূরকের সম্পর্ক থাকে।

চ। মুনাফা-ব্যবস্থা লোপ করা হয় না, বেসরকারী উদ্যোগে মুনাফার ভিত্তিতে কাজকর্ম সম্পাদিত হয়। তবে সরকার দেশের জনকল্যাণের নিমিত্ত দাম ও মুনাফা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

ছ। দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সরকার সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকার কৃষি, শিল্প প্রভৃতি উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়িত করে। জাতীয় পরিকল্পনার মধ্যে বেসরকারী উদ্যোগের পরিকল্পিত কার্যক্রমও যুক্ত হয়।

জ। মিশ্র অর্থব্যবস্থার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে, বেসরকারী অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (social control) প্রতিষ্ঠা করা। প্রয়োজনবোধে অর্থব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। কিন্তু যে-সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র রাষ্ট্রায়ত্ত করা সম্ভব হয় না, সেইসকল ক্ষেত্রে সরকারী বাধানিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ জারী করা হয়।

৩. **অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন একক এবং সর্বাধিককরণের লক্ষ্য (Units of the economic system and the optimisation goal) ঃ** অর্থব্যবস্থার কার্যকলাপ যে-সকল সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়, তাহাকে অর্থব্যবস্থার একক বলা হয় ঃ অর্থব্যবস্থার মৌল এককগুলি (basic units) মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা—(ক) পরিবার (household), (খ) উপাদানের মালিক (factor-owner), (গ) উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম (firm), (ঘ) সরকার (government) এবং (ঙ) অন্যান্য একক। এই সকল মৌল এককগুলি উহাদের নানারূপ কার্যকলাপের মাধ্যমে সর্বাধিক-করণের লক্ষ্যে (optimisation goal) পৌঁছাইবার চেষ্টা করে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক এককগুলির কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে উহাদের 'সর্বাধিক-করণের লক্ষ্য' আলোচনা করা হইল ঃ

ক। **পরিবার বা ভোগকারী ঃ** পরিবার (household) হইতেছে অর্থব্যবস্থার ভোগকর্মের একক। মানুষের অভাব পূরণ করার জন্য ভোগকর্মের প্রয়োজন হয়। আমাদের সমাজে পরিবারই ভোগকর্ম-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করিয়া থাকে। পরিবারের সদস্য একজন বা দুইজন বা আরো অধিক ব্যক্তি হইতে পারে। পরিবারের সদস্যরা তাহাদের শ্রম বিক্রয় করিয়া অর্থাৎ অন্যত্র কাজ করিয়া অর্থোপার্জন করে। পরিবারের নিজস্ব জমি থাকিতে পারে এবং ঐ জমি ভাড়া দিয়া খাজনা (rent) পাইতে পারে। এইভাবে পরিবার বিভিন্ন উপকরণ বিক্রয় করিয়া যে-পরিমাণ অর্থ পায়, উহা হইতেছে পরিবারের আয় (household income)। পরিবারের যিনি কর্তা, তিনি অন্য সদস্যদের হইয়া ঐ আয়ের এক অংশ ভোগকর্মের (consumption) জন্য ব্যয় (spending) করিয়া থাকেন এবং অন্য অংশ সঞ্চয় (saving) হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, ঐ সঞ্চয় অন্য কোন দ্রব্য উৎপাদনের কাজে বিনিয়োজিত (investment) হইতে পারে। যেমন—কোন পরিবারের মাসিক আয় হইল ১০০০ টাকা। উহার মধ্যে ৭০০ টাকা ভোগকর্মের জন্য ব্যয় হইল, ২০০ টাকা সঞ্চয় করা হইল এবং ১০০ টাকা কোন দ্রব্য উৎপাদনের (production) কাজে বিনিয়োগ করা হইল। এই অর্থোপার্জন, অর্থব্যয়, ভোগকর্ম, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হইতেছে কোন পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ। এইসকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মূলে রহিয়াছে অভাববোধ এবং উহা পূরণ করার তাগিদ। পরিবার ঐ সকল কার্যকলাপের দ্বারা 'সর্বাধিক পরিতৃপ্তি' (maximum satisfaction বা optimisation of consumer's satisfaction) পাওয়ার প্রয়াস করে।

খ। **উপাদানের মালিক ঃ** অর্থব্যবস্থার দ্বিতীয় গোষ্ঠীর একক হইতেছে উৎপাদনের উপাদানের মালিকসমূহ। প্রত্যেকটি পরিবারে এক বা একাধিক উপাদানের মালিক থাকে এবং ইহারা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে উপাদান যোগান দিয়া থাকে। যেমন—শ্রমিক শ্রমের যোগান দেয়, মূলধন-মালিক অর্থ-মূলধন যোগান দেয় ইত্যাদি! উপাদানের মালিকরা উহাদের উপাদানের বিক্রয়মূল্য হিসাবে পারিশ্রমিক বা উপাদান-আয় অর্জন করিয়া থাকে। উপাদানের বিক্রেতা হিসাব উহাদের লক্ষ্য হইতেছে

'সর্বাধিক আয়' (maximum income বা optimisation of factor income) উপার্জন করা। সুতরাং দেখা যায়, ভোগকারী হিসাবে পরিবারে সর্বাধিক-করণের লক্ষ্য হইতেছে 'পরিতৃপ্তি সর্বাধিক করা' এবং উপকরণগুলির বিক্রেতা হিসাবে ইহার লক্ষ্য হইতেছে আয় সর্বাধিক করা। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচিত হইবে।

গ। **ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম:** ভোগকর্মের জন্য প্রয়োজন পড়ে নানারূপ দ্রব্যাদি ও সেবামূলক কার্যের। ঐ সকল দ্রব্যাদি ও সেবাকার্যাদি উৎপাদন করিয়া মানুষের অভাব পূরণ করা হয়, যেমন—কৃষক চাষ করিয়া খাদ্যশস্য উৎপাদন করে, কাপড়ের মিলের শ্রমিকরা কাপড় তৈয়ারী করে, চা-বাগানের শ্রমিকেরা চা-পাতা সংগ্রহ করে, চিনির মিলের শ্রমিকরা চিনি উৎপাদন করে ইত্যাদি। উৎপাদন (production) কার্য নির্বাহ করার জন্য যে অর্থনৈতিক একক আছে, উহাকে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান (firm) বলা হয়। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মালিক এক ব্যক্তি বা কয়েক জন ব্যক্তি বা বহু ব্যক্তি হইতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভোগের জন্য যে-সকল দ্রব্যাদির প্রয়োজন পড়ে, সেইসকল ভোগ্যদ্রব্যাদি উৎপাদন করে এবং দ্রব্যগুলি ভোগকারীর নিকট পেঁীছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে। উৎপাদনের কাজ সম্পাদন করিবার জন্য প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন প্রকার উপকরণ কাজে নিযুক্ত করিতে হয়, যেমন—জমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠানটিকে ঐ সকল উপকরণের মালিকদিগকে পারিশ্রমিক (remuneration) দেওয়ার জন্য উহাদের মধ্যে আয় বন্টন (distribution) করিয়া দিতে হয়। ইহা ছাড়া, যিনি উৎপাদনকারী, তিনি আবার অন্যভাবে ভোগকারী। কৃষক যে-শস্য উৎপাদন করে, তাহার সম্পূর্ণ অংশ সে নিজে ভোগ করে না, তাহার উৎপাদিত পণ্যের এক অংশের বিনিময়ে বাজার (market) হইতে সে অন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে। সুতরাং উৎপাদনকারীদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতা রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নির্ভর করে উৎপাদন-কারীদের সহযোগিতা এবং ভোগকারীদের অভাব অনুযায়ী দ্রব্য-উৎপাদনের প্রচেষ্টার উপর। পরিবারের যেরূপ ভোগকর্মের লক্ষ্য হইতেছে 'সর্বাধিক পরিতৃপ্তি' ভোগ করা আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেইরূপ উৎপাদন-কার্যের মূল লক্ষ্য হইতেছে 'সর্বাধিক ব্যবসা-মুনাফা' (optimisation of business profits) অর্জন করা। এ সম্পর্কেও পরে বিস্তারিত আলোচনা হইবে।

ঘ। **সরকার:** পরিবার বা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ন্যায় আধুনিক যুগে দেশের সরকারকেও বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে নিযুক্ত থাকিতে হয়। পরিবারের আয়ের ন্যায় সরকারেরও আয় হয় এবং উহা সরকার অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ছাড়াও অন্যান্য কার্যের জন্য ব্যয় করে। সরকার দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করিয়া উৎপাদন-কার্য অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সাহায্য করে। ইহা ছাড়া, সরকার উৎপাদকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া নানারূপ দ্রব্যাদি উৎপাদন করে এবং দেশের

গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলক কার্য-ব্যবস্থা পরিচালনা করে যেমন—রেল ও ডাকবিভাগ পরিচালনা করা ইত্যাদি। পরিবারের ন্যায় সরকারকে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বাজার হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হয়। আধুনিক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে (welfare state) সরকারের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মূল লক্ষ্য হইতেছে 'জনকল্যাণ সর্বাধিক' (maximisation of the people's welfare) করা।

৬। **অন্যান্য এককসমূহ :** ইহা ছাড়া, আজকাল প্রত্যক অর্থব্যবস্থায় আরও কতকগুলি বিশেষ ধরনের একক দেখা যায় এবং উহারা উহাদের নিজস্ব কার্যকলাপ সম্পাদন করে। ঐ এককগুলি হইতেছে—সমবায় সংগঠন, শ্রমিক সংঘ ইত্যাদি। ইহারাও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পন্ন করে, কিন্তু ইহাদিগকে যথাযথভাবে প্রথম তিনটি শ্রেণীর কোনটিতেই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

প্রসংগত উল্লেখ করা যাইতে পারে, পরিবার বা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান হইতেছে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষুদ্র অংশ। কোন একটি ভোগকারী-পরিবার কোন কোন দ্রব্য কতখানি ভোগ করিবে বা কোন একটি ফার্ম কোন্ কোন্ দ্রব্য কতখানি উৎপাদন করিবে, সেই বিশ্লেষণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষুদ্রত্বের দিক হইতে করা হয় এবং এই বিশ্লেষণ হইতেছে অর্থবিদ্যার ব্যষ্টিগত (micro-economic) আলোচনা। ইহা ছাড়া, সমাজের বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ হইতেও মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিশ্লেষণ করা হইয়া থাকে। ঐ বিশ্লেষণে জাতীয় আয়, জাতীয় ভোগ, জাতীয় সঞ্চয়, জাতীয় বিনিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সরকারী ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রসারের ফলে বর্তমানে এই ধরনের সমষ্টিগত (macro economic) বিশ্লেষণ করা সম্ভব হইতেছে।

৪. **ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং ইহার কার্যাবলী (The business firm and its functions) :** ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ, কর্মপদ্ধতি, উদ্দেশ্য, কারবার-সিদ্ধান্ত (business decision) ইত্যাদি সম্পর্কে যাবতীয় বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে হয়। সেই কারণে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের অর্থ ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাই এখন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের তাৎপর্য ও উহার কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হইল।

ব্যবসা ও উৎপাদনের কার্য নির্বাহ করার জন্য আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের বহুসংখ্যক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান আছে। এখন দেখা যাউক, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বলিতে কি বুঝায়? অর্থব্যবস্থায় দ্রব্যাদি ও সেবামূলক কার্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের অর্থনৈতিক একক (economic unit) হইতেছে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। বিশ্লেষণ করিয়া বলা যাইতে পারে, কোন দ্রব্য বা সেবামূলক কার্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য যে-কারখানা বা প্রতিষ্ঠান দেখা যায়, উহাকে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বলা হইবে। কোন এক ক্ষুদ্র কৃষক যিনি নিজেই চাষ করেন বা কোন তাঁতী যিনি নিজের ঘরে বসিয়া চরকা চালায়, তিনি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের মালিক হইতে পারে। আবার ইহা শিল্পগত, ব্যবসাগত,

অর্থগত বা কৃষিগত বড় প্রতিষ্ঠান হইতে পারে। ইহার মালিক কোন একজন ব্যক্তি বা কয়েক জন ব্যক্তি বা বহুসংখ্যক ব্যক্তি হইতে পারে। অথবা, ইহাদের মালিক সরকার বা করপোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটিও হইতে পারে। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত হইতেছে জামসেদপুরের ইস্পাতের কারখানা বা বাটার জুতার কারখানা বা কোন খনিজ প্রতিষ্ঠান বা রেল ও ট্রাম কোম্পানী বা কোন ক্ষুদ্র প্ল্যাস্টিকের কারখানা ইত্যাদি। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিল্পের (industry) পার্থক্য আছে। কতকগুলি একই ধরনের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান লইয়া হয় একটি শিল্প; যেমন—ভারতে বহু কাপড়ের মিল আছে। এক একটি কাপড়ের মিল হইতেছে এক-একটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সমগ্র মিলগুলি লইয়া হইতেছে ভারতের তুলাবস্ত্র শিল্প।

কার্যাবলী: ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের আয়তন ছোটই হউক বা বড়ই হউক, একজন মালিক থাকুক বা বহু মালিক থাকুক, উহাদের অন্যতম কাজ হইতেছে উৎপাদন ও ব্যবসায়ের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়:

প্রথমত, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানটি কোন্ কোন্ দ্রব্য এবং কোন্ মানের বা গ্রেডের দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিবে, তাহা প্রথমেই স্থির করিতে হয়। যেমন—কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ঠিক করিল, ইহা ব্লেড্ (blade) তৈয়ারী করিবে; কোন্ মানের কোন্ ধরনের ব্লেড্ তৈয়ারী করা হইবে তাহা ইহাকে স্থির করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, নির্ধারিত দ্রব্যসামগ্রী বা সেবাকার্য উৎপাদনের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে নানারূপ উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয় এবং উহাদের মালিকানা অধিগ্রহণ করিতে হয়। কাঁচমাল, মূলধন, শ্রমকার্য ইত্যাদির মালিকানা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে গ্রহণ করিতে হয়।

তৃতীয়ত, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ঐ দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করার চেষ্টা করিবে। ইহার জন্য প্রতিষ্ঠানটি কত দাম আদায় করিবে তাহাও ইহাকে নির্ধারণ করিতে হইবে।

চতুর্থত, দ্রব্যটির উৎপাদনের পরিমাণ কতখানি হইবে সেই সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। উৎপাদনের পরিমাণ বেশী বা কম হইতে পারে।

পঞ্চমত, দ্রব্য-উৎপাদনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি কোন্ উৎপাদন-পদ্ধতি অনুসরণ করিবে তাহাও ঠিক করিতে হইবে। উৎপাদনের কাজ চালাইবার জন্য প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন প্রকার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয়; যেমন—জমি, শ্রম, মূলধন, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠানকে ঐ উপকরণগুলি কোন্‌টির কতখানি নিয়োগ করিয়া কোন্ উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে তাহা স্থির করিতে হইবে।

ষষ্ঠত, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে উহার ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি বিচার করিয়া উপযুক্ত কর্ম-পন্থা তৈয়ারী করিতে হয়। স্থিতিশীল অর্থব্যবস্থায় এই কাজটি কষ্টসাপেক্ষ হয় না, কিন্তু গতিশীল অর্থব্যবস্থায় অনিশ্চিত অবস্থার জন্য এই কাজটি কষ্টসাধ্য হইয়াপড়ে।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে দুইটি পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে হয়। প্রথমটি হইতেছে ইহার ক্রয়-পরিকল্পনা (purchase plan) অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানকে কোন দ্রব্য-উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও মালমসলা ক্রয় করিতে হয়। যেমন—কৃষিজাত কোন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কোন কৃষক বা কৃষি-প্রতিষ্ঠানকে জমি, বীজ, সার, শ্রম, চাষের জন্য গরু, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে হয়। ঐ উপকরণগুলির কোন্‌টি কতখানি ইহাকে সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহা স্থির করিতে হয়। ঐ উপকরণগুলির দাম ও কি পরিমাণে উহাদের কাজে লাগানো হইবে তাহা ঠিক করা হইলে উপকরণগুলি ক্রয়ের জন্য কত ব্যয় হইবে তাহা জানা যাইবে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানটির ক্রয়-পরিকল্পনার জন্য মোট অর্থ-ব্যয় হইবে ঃ জমির পরিমাণ × জমি ব্যবহারের দাম + বীজের পরিমাণ × বীজের দাম + সারের পরিমাণ × সারের দাম + অন্যান্য উপকরণের পরিমাণ × উহাদের দাম ইত্যাদি।

ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি হইতেছে দ্রব্যের বিক্রয়-পরিকল্পনা (sales plan)। প্রতিষ্ঠানটি যে-সকল দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, ইহাকে সেইগুলি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। মনে করা যাউক, কোন প্রতিষ্ঠান পেন্সিল, কলম ও কালি—এই তিনটি দ্রব্য উৎপাদন করে। ঐ তিনটি দ্রব্যের কোন্‌টি কতখানি উৎপাদন করিবে তাহা প্রতিষ্ঠানটিকে ঠিক করিতে হয়। ধরা যাউক, কোন সময়ে ইহা ঠিক করিল দশ হাজার পেন্সিল, পাঁচ হাজার কলম ও এক হাজার লিটার কালি উৎপাদন করিবে। উহাদের দাম জানা থাকিলে উহা বিক্রয় করিয়া মোট কত টাকাকাড়ি পাইবে তাহা জানা যাইবে। সুতরাং, উৎপন্ন-দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতে ইহার মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ (sale proceeds) পাওয়া যাইবে ঃ

দশ হাজার পেন্সিল × পেন্সিলের দাম + পাঁচ হাজার কলম × কলমের দাম + এক হাজার লিটার কালি × কালির দাম।

সুতরাং দেখা গেল, কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে উহার নিজস্ব ক্রয়-পরিকল্পনা ও বিক্রয়-পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পাদন করিতে হয়। এই সকল কার্যকলাপ সম্পন্ন করার জন্য প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ইহাকে সুসংগঠিত পরিচালনা-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হয়। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-ব্যবস্থা অর্থাৎ অফিসের মাধ্যমেই ইহার যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদিত হয়। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-ব্যবস্থার কার্যাবলীর বিভিন্ন বিভাগ (যেমন—হিসাব-বিভাগ, বিক্রয়-বিভাগ, মজুদ-বিভাগ ইত্যাদি) গঠন করা, সংবাদ আদান-প্রদান, প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করা, হিসাব-প্রণয়ন, তথ্য-সংগ্রহ, গবেষণা ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত কার্যাবলী ইত্যাদি। ইহা বলা বাহুল্য, প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-ব্যবস্থার কার্যাবলী সন্তোষজনক ও দ্রুত সম্পাদনের উপর ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক দক্ষতা বিশেষভাবে নির্ভর করে। এই কারণেই আধুনিক কালে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-ব্যবস্থার কার্যাবলীর গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৪. **অর্থনৈতিক কার্যকলাপের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও অর্থনৈতিক এককসমূহের সর্বাধিক-করণ লক্ষ্য : (Goals of the economic activity and optimisation) goals of economic units) :** পূর্বেকার আলোচনায় দেখা গিয়াছে, অর্থব্যবস্থায় কয়েকটি মৌল একক(যেমন—পরিবার, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও সরকার) বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পাদন করে। এখন প্রশ্ন উঠে, ঐ সকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মৌল বা চূড়ান্ত লক্ষ্য কি ? অর্থনীতিবিদগণ এই লক্ষ্যগুলিকে এক কথায় 'সর্বাধিক-করণের লক্ষ্য' বা 'সর্বোত্তমকরণের লক্ষ্য' (optimisation goal) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ঐ লক্ষ্যগুলি আলোচনার পূর্বে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'সর্বাধিক-করণের' ধারণাটি-ও (concept of optimality) গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। অধ্যাপক বমোল্ এর (Baumol) মতে, সর্বাধিক-করণের ধারণাটি দ্বারা অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন এককের বাস্তব অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়াকলাপ (actual economic decisions and acrivities) সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ভোগকারী ও অন্যান্য অর্থনৈতিক এককগুলি বাস্তবে যে আচরণ দেখায় ও ক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকে, তাহা কতটুকু যুক্তিসংগত বা যথাযথ তাহা 'সর্বাধিক-করণের' মাপকাঠিতে বিচার করিয়া তাহার যথার্থ উত্তর দেওয়া যায়। যেমন—ভোগকারীর সর্বাধিক-করণের লক্ষ্য হইতেছে পরিতৃপ্তি সর্বাধিক করা। সুতরাং বাস্তবে তাহারা ঐ লক্ষ্যে পেঁছাইবার চেষ্টা করিবে। প্রকৃতপক্ষে তাহা সম্ভব হইতেছে কিনা তাহার বিশ্লেষণের জন্য ভোগকারীর সর্বাধিক-করণের এই লক্ষ্যটি আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যায়, তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক—উভয় প্রকার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী, ভোগকারী ও অর্থব্যবস্থার অন্যান্য এককের কার্যকলাপ বুঝিবার ও সুষ্ঠুভাবে বিশ্লেষণের জন্য সর্বাধিক-করণের ধারণাটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। ইহা ছাড়া, সরকারের নীতি-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী (public policy problems) বিচার-বিবেচনার জন্য সর্বাধিক-করণের ধারণাটির আবশ্যক হইয়া পড়ে। অর্থনীতি-বিদগণ সরকারের কোন নীতি ও ব্যবস্থা যথার্থ হইতেছে কিনা তাহা সর্বাধিক-করণের মাপকাঠিতে বিচার করিয়া বলিয়া দিতে পারে। এই কারণগুলির জন্য আধুনিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদরা সর্বাধিক-করণের ধারণাগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেছেন।

অর্থব্যবস্থায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক এককগুলি যে সকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ করিয়া থাকে, উহার কয়েকটি চূড়ান্ত লক্ষ্য দেখা যায়। এই লক্ষ্যগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে : (ক) ভোগকারীর পরিতৃপ্তি সর্বাধিক-করণ, (খ) উপাদানের আয়ের সর্বাধিক-করণ এবং (গ) ব্যবসা-মুনাফার সর্বাধিক-করণ। এখান এই তিনটি লক্ষ্য সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে :

ক। ভোগকারীর পরিতৃপ্তি সর্বাধিক-করণ : অর্থব্যবস্থায় ভোগকর্মের একক হইতেছে ভোগকারী বা পরিবার, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ভোগকর্ম

হইতেছে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্যকলাপ। পরিবারই বিভিন্ন রূপ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য ক্রয় করিয়া ভোগকর্ম সম্পন্ন করে। এই ভোগকর্মের অভিপ্রায় হইতেছে অভাব মোচনের তাগিদ এবং ইহার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে পরিতৃপ্তি সর্বাধিক-করণ (optimisation or maximisation of satisfaction)। সর্বাধিক পরিতৃপ্তি লাভের উদ্দেশ্যে ভোগকারী বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য ক্রয় করে। কিন্তু উহাদের জন্য ভোগকারীকে দাম দিতে হয়। ভোগকারীর উপকরণ সীমিত অথচ অভাব অসীম, তাই তাহাকে অতি বিচক্ষণতার সহিত বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে হয়।

ভোগকারী যখন কোন দ্রব্য ক্রয় করে, তাহাকে দুইটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রথমত, দ্রব্যটির জন্য তাহাকে যে দাম দিতে হয়, তাহা বিবেচনা করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যটি হইতে সে কি পরিমাণ উপযোগ পায়, তাহাও তাহাকে দেখিতে হয়। দামের তুলনায় উপযোগ অধিক হইলে সে দ্রব্যটির ক্রয় বাড়াইয়া পরিতৃপ্তির পরিমাণ বাড়াইতে পারে। কিন্তু যখন দেখা যায়, দ্রব্যটির দাম উহার উপযোগ অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়, তখন সে উহার ক্রয় বন্ধ করে। কিন্তু ভোগকারী শুধুমাত্র একটি দ্রব্য ক্রয় করে না, একই সঙ্গে তাহাকে অনেক দ্রব্য ক্রয় করিতে হয়। এই কারণে তাহাকে দ্রব্যাদি ক্রয়ের সময় বিভিন্ন দ্রব্যের উপযোগ তুলনা করিতে হয়। যদি দেখা যায়, কোন একটি দ্রব্য হইতে বেশী উপযোগ এবং অন্য একটি দ্রব্য হইতে কম উপযোগ পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভোগকারী দ্বিতীয় দ্রব্যটির পরিবর্তে প্রথম দ্রব্যটি ক্রয় করিবে। এইরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিশেষে সে এমন একটি পর্যায়ে আসিবে যেখানে উভয় দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর সমান হয়, তখনই ভোগকারীর পরিতৃপ্তি হয় সর্বাধিক।

ভোগকারীর পরিতৃপ্তির সর্বাধিক-করণের বিষয়টি বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং উহা যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে। এখানে শুধু স্মরণ রাখা প্রয়োজন, পরিতৃপ্তির সর্বাধিক-করণের ধারণাটি ভোগকারীর যুক্তিসংগত আচরণের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ ভোগকারী যুক্তিবাদী ও বিচক্ষণ হইলেই সে পরিতৃপ্তি সর্বাধিক-করণের প্রয়াস করিবে।

খ। উপাদানের আয় সর্বাধিক-করণ ঃ পরিবার একদিকে যেমন দ্রব্যাদি ও সেবাকার্যের ক্রেতা, অন্য দিকে ইহা উৎপাদনের উপকরণের বিক্রেতা। পরিবারের নিজস্ব জমি থাকিতে পারে এবং উহা ভাড়া দিয়া পরিবার আয় অর্থাৎ খাজনা উপার্জন করিতে পারে, অথবা পরিবারের সদস্যরা অন্যত্র কাজে নিযুক্ত হইয়া বিনিময়ে মজুরি পাইতে পারে, অথবা পরিবার উহার নিজস্ব মূলধন অন্যত্র বিনিয়োগ করিয়া সুদ উপার্জন করিতে পারে। খাজনা, মজুরি, সুদ ইত্যাদি হইতেছে উৎপাদনের উপাদানের আয়। ভোগকারী যেমন পরিতৃপ্তি সর্বাধিক-করণের চেষ্টা করে,

১ কোন দ্রব্যের এক একক ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে যে অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায়, তাহাকেই প্রান্তিক উপযোগ বলা হয়।

উপাদানের মালিকও উপার্জিত আয় সর্বাধিক-করণের (optimisation of factor income) প্রয়াস করে। জমির মালিক জমি ভাড়া দিয়া সর্বাধিক খাজনা, শ্রমিক নিজের শ্রম অন্যত্র নিয়োগ করিয়া সর্বাধিক মজুরি এবং মূলধনের মালিক মূলধন ধার দিয়া সর্বাধিক সুদ উপার্জনের চেষ্টা করে।

উপাদানের আয় সর্বাধিক-করণের জন্য উপাদানের মালিক ইহা যোগান দিয়া থাকে এবং যে দামে উপাদানের মালিক উপাদান যোগান দেয়, তাহাকে 'উপাদানের যোগান দাম' (supply price of the factor) বলে। উপাদান যোগান দেওয়ার সময় উপাদানের মালিককে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করিতে হয়, যেমন—শ্রম উপাদানের মালিক অর্থাৎ শ্রমিককে দেখিতে হয়, শ্রম যোগান দিয়া সে যে পরিমাণ মজুরি পাইবে তাহা দ্বারা সংসার যাপনের ন্যূনতম ব্যয় মিটানো সম্ভব হইবে কি না, অথবা শ্রম যোগানের জন্য তাহাকে কতখানি বিশ্রাম (leisure) পরিত্যাগ করিতে হইতেছে, অথবা অন্যত্র সে কত মজুরি পাইতে পারে ইত্যাদি। বস্তুত, আর্থিক আয় হইতে অতিরিক্ত উপযোগ ও কাজ হইতে অতিরিক্ত অনুপযোগ (additional utility from money income and additional disutility from work)—এই দুই-এর মধ্যে শ্রমিকরা সামঞ্জস্য করিয়া থাকে। অনুরূপভাবে জমির মালিক বা অর্থ-মূলধনের মালিককেও এইরূপ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করিতে হয়।

উপাদানের যে-রূপ যোগানের দিক আছে, সেইরূপ উহার চাহিদার দিকও রহিয়াছে। উৎপাদক বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এই সকল উপাদান-দ্রব্য বা সেবাকার্য উৎপাদনের জন্য চাহিদা করিয়া থাকে। উপাদানের জন্য উৎপাদক যে পরিমাণ দাম দিতে প্রস্তুত থাকে, তাহাকে 'উপাদানের চাহিদা-দাম' (demand price of the factor) বলা হয়। উপাদানের চাহিদা-দাম স্থির করার জন্য উৎপাদককে উপাদানের উৎপাদনশীলতা, প্রত্যাশিত মুনাফার হার, উৎপাদিত দ্রব্যাদির দাম ইত্যাদি বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হয়।

ভোগকারীর মতো উপাদান-মালিকও সর্বাধিক উপাদান-আয় উপার্জনের লক্ষ্য স্থির করে। উপাদান-আয়ের সর্বাধিক বা সর্বোত্তম অবস্থা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট উপাদানের চাহিদা ও যোগানের উপর। উৎপাদন কার্যে যে পরিমাণ মূলধন বা শ্রম চাহিদা হয়, ঠিক সেই সেই পরিমাণ মূলধন বা শ্রম যোগান থাকিলে উপাদান আয় চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে। উপাদানের যোগান-দাম (supply price) যখন উহার চাহিদা-দামের (demand price) সমান হইবে, তখন উপাদান আয় সর্বোত্তম পর্যায়ে নির্ধারিত হয়। সুতরাং উপাদানের মালিককে উপাদানের যোগান-দাম ও চাহিদা-দাম উভয়ই বিবেচনা করিয়া উপাদান আয় সর্বাধিক করার প্রচেষ্টা করিতে হয়। ইহার জন্য উপাদানের মালিককে কাজের নিমিত্ত কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিতে হইতেছে বা বিকল্প কাজে উপাদানের আয় কত হইতে পারে তাহাও বিবেচনা করিতে হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমিকরা আর্থিক আয় সর্বাধিক করণের প্রচেষ্টা করে না, তাহার কাজ ও বিশ্রাম হইতে যে 'নীট সুবিধাসমূহ' (net gains) পাইয়া থাকে, তাহাই সর্বাধিক-করণের প্রয়াস করে। ইহার জন্য কোন শ্রমিক শুধুমাত্র তাহার আর্থিক মজুরি বিচার করে না উহার সঙ্গে তাহাকে কাজের অন্যান্য সুবিধা-সুযোগ-সমূহ (যেমন – কাজের নিশ্চয়তা, কাজের পরিবেশ, উন্নতির সম্ভাবনা, অতিরিক্ত প্রাপ্তি ইত্যাদি) বিচার বিবেচনা করিতে হয়। বস্তুত, যে-প্রতিষ্ঠান শ্রমিককে সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা বা পুরস্কার (highest reward) প্রদান করে, শ্রমিক সেই-স্থানেই তাহার সেবাকার্য যোগান দিয়া থাকে। অনুরূপভাবে, অর্থ-মূলধনের মালিকও অর্থ-মূলধন বিনিয়োগ করিয়া নীট প্রাপ্তি সর্বাধিক-করণের প্রচেষ্টা করে।

গ। **ব্যবসা-মুনাফা সর্বাধিক-করণ:** ভোগকারী এবং উপাদানের মালিকের ন্যায় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকেও উহার অর্থনৈতিক লক্ষ্য স্থির করিতে হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হইতেছে ব্যবসার মুনাফা সর্বাধিক করা। মুনাফা সর্বাধিক করা হইলে, একদিকে যেমন ব্যবসায়ীর আয় সর্বাধিক হয়, অন্যদিকে তেমন ফার্মের খ্যাতি ও সুনাম বৃদ্ধি পায় এবং ফার্মটি ভবিষ্যতে উহার কাজের পরিধি আরও বিস্তীর্ণ করার সুযোগ পায়। ইহা ছাড়া, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানে মালিকানা ও পরিচালনা পৃথক থাকে বলিয়া ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-বর্গ শেয়ার মালিকদিগকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য সর্বাধিক মুনাফার প্রয়াস করে।

ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান উহার মুনাফা (P) সর্বাধিক করার জন্য উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ (totel sale-recipts বা TR) এবং উহার জন্য মোট ব্যয় (total
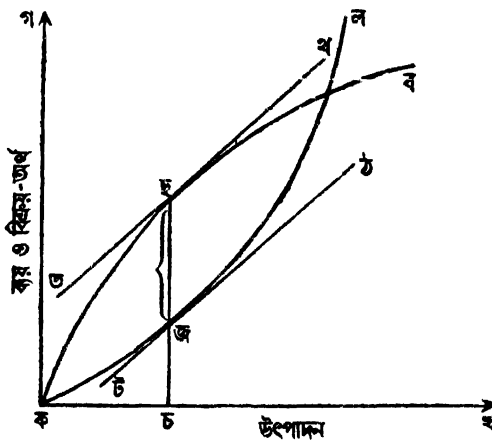
চিত্র—৫

cost বা TC) এই দুই এর মধ্যে ব্যবধান বা অন্তরফল দীর্ঘতর করার চেষ্টা করে। যে পরিমাণ উৎপাদন বা বিক্রয়ে—এই দুই এর ব্যবধান ($P = TR - TC$) সর্বাপেক্ষা

অধিক হয়, সেই পরিমাণ উৎপাদনে বা বিক্রয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক হয়। এই বিষয়টি একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝানো যাইতে পারে:

পূর্বের পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে **কল** রেখা দ্বারা মোট বিক্রয়লব্ধ আয় এবং **কব** রেখা দ্বারা মোট ব্যয় দেখনো হইতেছে। এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যবধান বা অন্তরফল দেখা যায়, তাহাই হইতেছে মুনাফা এবং যে-পরিমাণ উৎপাদনে এই দুইটি রেখার উল্লম্ব দূরত্ব (vertical distance) সর্বাপেক্ষা অধিক হয়, সেই পরিমাণ উৎপাদনে মুনাফা সর্বাধিক হইবে। ইহা **কব** ও **কল** রেখার স্পর্শক (tangent) দ্বারা দেখানো হয়। যে-অবস্থায় এই রেখা-দুইটির স্পর্শক পরস্পর সমান্তরাল হয়, সেই অবস্থায় এই দুইটি রেখার মধ্যে উল্লম্ব দূরত্ব সর্বাধিক হইবে। চিত্রে দেখা যায়, **কচ** পরিমাণ উৎপাদনে **কব** রেখার স্পর্শক **তথ** এবং **কল** রেখায় স্পর্শক **টঠ** পরস্পর সমান্তরাল হইতেছে। সুতরাং **কচ** পরিমাণ উৎপাদনে মুনাফা সর্বাধিক হইবে। ঐ উৎপাদনের মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইতেছে **চছ** এবং মোট ব্যয় হইতেছে **চজ**। সুতরাং, **ছজ** হইতেছে মুনাফা এবং উহাই হইতেছে সর্বাধিক।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের অন্যতম লক্ষ্য মুনাফা সর্বাধিক-করণ করা হইলেও সকল ক্ষেত্রে এই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হয় না। কারণ, ইহাকে আজকাল অনেক সময় মুনাফা সর্বাধিক-করণ ছাড়া আরও অন্যান্য বিষয়ের অর্থাৎ, অর্থ-বহির্ভূত লক্ষ্যের (non-pecuniary aims) যেমন—জনসেবা, প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি, বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হয়।

---

১০ ॥ ব্যবসা-মুনাফার বিভিন্ন দিক ॥

(Different aspects of Profits)

[মুনাফার স্বরূপ ও নির্ধারণকারী বিষয়—ব্যালেন্স-শীটের দৃষ্টিকোণ হইতে মুনাফা—আয় ও ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে মুনাফা—ঐতিহাসিক মুনাফা বনাম প্রত্যাশিত মুনাফা—প্রত্যাশিত মুনাফার পরিমাপ]

প্রত্যেক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের একটি অন্যতম লক্ষ্য হইতেছে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা, ইহা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহার সাফল্য বা ব্যর্থতা, অগ্রগতি বা অবনতি মুনাফার মাপকাঠি দ্বারা বিচার করা হয়।

কিন্তু 'মুনাফা' কথাটির অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের নিকট বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। ব্যবসায়ী, হিসাবরক্ষক, কর-সংগ্রাহক, শ্রমিক, অর্থনীতিবিদ—বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন অর্থে 'মুনাফা' কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকে। এখানে আমাদের দেখিতে হইবে, 'মুনাফা' কথাটি অর্থবিদ্যায় বিশেষত ব্যবসায়-অর্থবিদ্যায় কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. মুনাফার স্বরূপ ও নির্ধারণকারী বিষয়: (Nature and determinants of Profits): সাধারণ অর্থে উৎপাদন-ব্যয়ের তুলনায় মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ যতখানি বেশি হয় (excess of sale-receipts over the expenses for production বা $P = TR - TC$)[১] তাহাকে 'মুনাফা' বলা হয়। যেমন, ১০০টি পেন্সিল তৈয়ারী করিতে ব্যয় হইল ২০০ টাকা, উহা বিক্রয় করিয়া পাওয়া গেল ২৫০ টাকা। এই ক্ষেত্রে মোট মুনাফা হইতেছে ৫০ টাকা। অর্থবিদ্যায় মুনাফা কথাটির একটি অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। ব্যবসায়ী তাহার নিজের পরিশ্রমের মজুরি এবং নিয়োজিত মূলধনের উপর প্রাপ্য সুদ—এই দুইয়ের তুলনায় যাহা অধিক পাইবে, তাহাই হইবে 'প্রকৃত মুনাফা'। একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তাহার নিজস্ব ব্যবসায়ে নিজের মূলধন ও পরিশ্রম খাটাইয়া মাসে ব্যবসা হইতে ১০০০ টাকা আয় করে এবং ঐ আয় দ্বারা মোটামুটি ভালোভাবেই সংসার নির্বাহ করে। এইক্ষেত্রে প্রকৃত মুনাফা বাহির করিতে হইলে আর একটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। সেইটি হইল, অন্যত্র কাজ করিলে সে কত মজুরি পাইত এবং অন্যত্র তাহার মূলধন বিনিয়োগ করা হইলে সে কত সুদ পাইত। ধরা যাউক, অন্যত্র কাজ করিলে সে মাসিক ৫০০ টাকা বেতন পাইত এবং মূলধন অন্যত্র ধার দিলে সে মাসিক ২০০ টাকা সুদ পাইত। এইক্ষেত্রে প্রকৃত মুনাফা বাহির করিতে হইলে ১০০০ টাকা মোট আয় হইতে ঐ ৫০০ টাকা এবং ২০০ টাকা অর্থাৎ মোট ৭০০ টাকা বাদ দিতে হইবে। কারণ উহা মজুরি ও সুদের যোগফল মাত্র। সুতরাং এইক্ষেত্রে প্রকৃত মুনাফা হইতেছে (১০০০ টাকা—৭০০ টাকা) ৩০০ টাকা

১. পৃঃ ১১০ দ্রষ্টব্য

অন্যভাবে বলা যায়, কোন ব্যবসায়ী ঝুঁকি লইয়া ব্যবসায়ের মূলধন বিনিয়োগ করিলে নিরাপদ বিনিয়োগ (safe investment) অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু প্রত্যাশা করিবে। সুতরাং উক্ত বিনিয়োগ হইতে অতিরিক্ত কিছু পাওয়া গেলে তাহাই হইবে প্রকৃত মুনাফা। পক্ষান্তরে, ব্যবসায়ে বিনিয়োজিত মূলধনের প্রতিদান (return on capital invested in business) যদি নিরাপদ বিনিয়োগের আয়ের তুলনায় কম হয়, তাহা হইলে মুনাফা নেতিবাচক অর্থাৎ ক্ষতি হইবে। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, মুনাফা উদ্ভবের কারণ কি ?

মুনাফা উদ্ভবের কারণ : মুনাফার স্বরূপ ও উদ্ভব সম্পর্কে অর্থবিদ্যায় কতকগুলি তত্ত্ব প্রচলিত আছে এবং ঐগুলির মধ্যে তিনটি হইতেছে প্রধান। প্রথমত, হ্যালে (Hawley), নাইট (Knight) প্রমুখ অর্থবিজ্ঞানীগণ মুনাফাকে ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা (risk and uncertainty) বহনের পুরস্কার রূপে গণ্য করেন। তাঁহাদের মতে, ব্যবসা ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার প্রাধান্য থাকার জন্য ব্যবসায়ীরা মুনাফা প্রত্যাশা করে। সুতরাং ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার পরিমাণ অধিক হইলে মুনাফার পরিমাণও অধিক হইবে। অবশ্য যে-সকল ঝুঁকি (যেমন—অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি, মালমশলা চুরি হওয়ার ফলে ক্ষতি ইত্যাদি) পরিমাপ করিয়া উহার জন্য উপযুক্ত বীমা গ্রহণ করা যায়, তাহার জন্য কোন মুনাফার উদ্ভব ঘটে না। যে-সকল ঝুঁকি (যেমন—ক্রেতার চাহিদা ও রুচি পরিবর্তনের ঝুঁকি, নতুন পরিবর্ত দ্রব্য উদ্ভাবনের ঝুঁকি ইত্যাদি) পরিমাপ করা যায় না, কেবলমাত্র সেই সকল ঝুঁকির (অর্থাৎ অনিশ্চয়তা) জন্য মুনাফার উদ্ভব ঘটে।

দ্বিতীয়ত, কোন কোন লেখকের মতে, মুনাফার উদ্ভব ঘটে বাজারের অপূর্ণাঙ্গতার (imperfections of the market) জন্য। যেমন—যুদ্ধ বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সময় সাধু বা অসাধু সকল প্রকার ব্যবসায়ীরা উহাদের স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অনেক অধিক মুনাফা অর্থাৎ 'অস্বাভাবিক মুনাফা' (abnormal profits) ভোগ করিয়া থাকে। এই সকল লেখকদের মতে, স্বাভাবিক মুনাফা হইতেছে একপ্রকার বিশেষীকৃত শ্রমের পরিচালন-মজুরি (a sort of managerial wages paid to a specialised form of labour)। ঐ স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা যে-পরিমাণ অতিরিক্ত মুনাফা পাওয়া যায়, তাহাই হইতেছে প্রকৃতপক্ষে মুনাফা এবং ইহার উদ্ভব ঘটে বাজারের অপূর্ণাঙ্গতার জন্য। এই কারণে একচেটিয়া ব্যবসায়ী দীর্ঘকালীন সময়েও স্থায়িভাবে এই ধরনের মুনাফা অর্জন করিতে পারে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে চাহিদা বা উৎপাদন ব্যয়ের পরিবর্তনের ফলে যে-সকল ব্যবসায়ীরা পরিবর্তনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারে তাহারাও পরিচালন-মজুরি অপেক্ষা অধিক মুনাফা ভোগ করিতে পারে।

---

১ Bates and Parkinson—*Business Economics*

পরিশেষে উল্লেখ করা যায়, কোন কোন লেখকদের মতে, মুনাফার উদ্ভব ঘটে অর্থব্যবস্থার গতিশীল পরিবর্তন (dynamic changes of the economy) বা নানারূপ উদ্ভাবন কার্যের ফলে, অর্থাৎ মুনাফা হইতেছে উদ্ভাবন-কার্য বা গতিশীল পরিবর্তনের পুরস্কার। নূতন দ্রব্য বা নূতন উৎপাদন কৃৎকৌশল বা নূতন বাজার উদ্ভাবনের ফলে উদ্ভাবনকারী উদ্যোক্তা পুরস্কারস্বরূপ মুনাফা ভোগ করিয়া থাকে।

কিন্তু এই তত্ত্বগুলির কোনটিই মুনাফার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ দেয় না। প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা, ব্যবসায়ীর উচ্চমানের দক্ষতা, নূতন নূতন উদ্ভাবন কার্য, অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া বাজারের প্রভাব, বাজার-কাঠামোর পরিবর্তন, ব্যবসায়ীর সংগঠন নৈপুণ্য ইত্যাদি কারণে মুনাফার সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং এইগুলিই হইতেছে মুনাফা-নির্ধারণকারী বিষয়। দেখা যাউক, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ হইতে মুনাফা বলিতে কি বুঝায়? ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান সাধারণত দুইটি পৃথক দৃষ্টিকোণ হইতে মুনাফার হিসাব করিয়া থাকে: ব্যালান্স শীটের দৃষ্টিকোণ হইতে এবং আয়-ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে। এখন ইহা নিম্নে দুটি পৃথক অংশে আলোচনা করা হইল।

২. **ব্যালান্স-শীটের দৃষ্টিকোণ হইতে মুনাফা** (Balance Sheet view of Profit): ব্যবসায়ের মুনাফার (বা ক্ষতির) হিসাব পাওয়ার একটি অন্যতম সূত্র হইতেছে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের ব্যালান্স-শীট বা উদ্বৃত্ত পত্র। ব্যালান্স-শীট হইতেছে কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের একটি সামগ্রিক আর্থিক অবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণী। ব্যালান্স-শীটে কোনও নির্দিষ্ট দিনে (অর্থাৎ, হিসাব বৎসরের শেষ দিনে) ব্যবসায়ের প্রকৃত ও সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা জানিবার জন্য উহার সম্পত্তি ও দায়গুলি (assets and liabilities) শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইয়া দেখানো হয়। ইহা হইতে উক্ত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি (বা অবনতি), মূলধনের পরিমাণ, লাভ বা ক্ষতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে তথ্য জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে ব্যালান্স শীট দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণ করে। প্রথমত, ইহা ব্যবসায়ের 'নীট মূল্যে'র (net worth) সন্ধান দেয়। 'নীট মূল্য' বলিতে মালিকের মালিকানা বা শেয়ার হোল্ডারদের ইকুইটি (shareholders' equity) বুঝায়। এই সম্পর্কে একটু পরেই বিশদ আলোচনা করা হইতেছে। দ্বিতীয়ত, ব্যালান্স-শীট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার সচ্ছলতা বা অসচ্ছলতার পরিচয় দেয়। ব্যালান্স-শীটের একটি নমুনা ছক পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল:

১. Chamberlin—*The Firm*

দেনা বা দায় (liabilities)	টাকা	পাওনা বা সম্পত্তি (assets)	টাকা
১। শেয়ার মূলধন—	৫,০০,০০০	১। স্থায়ী সম্পদ—	২,০০,০০০
২। রিজার্ভ ও উদ্বৃত্ত—	৮০,০০০	২। বিনিয়োগ—	২,০০,০০০
৩। গৃহীত ঋণ—	৩০,০০০	৩। চলতি সম্পদ (নগদ টাকা ইত্যাদি—	১,৫০,০০০
৪। চলতি দেনা—	৪০,০০০	৪। প্রদত্ত ঋণ ইত্যাদি—	১,০০,০০০
মোট দায়—	৬,৫০,০০০	**মোট সম্পত্তি—**	৬,৫০,০০০

ব্যালান্স-শীট হইতে ব্যবসায়ের মুনাফার পরিচয় কিভাবে জানা যায়, তাহা বুঝিতে হইলে ব্যালান্স-শীটের বিষয়গুলি সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ব্যালান্স-শীট-এ কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের দায় বা দেনা এবং সম্পত্তি বা পাওনা শ্রেণীবদ্ধভাবে দুইদিকে সাজাইয়া দেখানো হয়। ব্যবসায়ের সম্পত্তি বা পাওনা সাধারণত দুইভাবে দেখানো হইয়া থাকে—স্থায়ী সম্পত্তি (fixed assets), যেমন—প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমি, বাড়ী, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি এবং চলতি সম্পত্তি (current assets), যেমন—হাতে নগদ টাকার পরিমাণ, ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ, বিলের দরুণ পাওনা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, ব্যবসায়ের দায় বা দেনা মুখ্যত দুই শ্রেণীর—(ক) মালিকের নিকট দেনা অর্থাৎ ব্যবসায়ে নিয়োজিত মালিকের মূলধন এবং (খ) অপরের নিকট দেনা (যেমন—ব্যাংক হইতে গৃহীত ঋণ, বিলের জন্য প্রদেয় অর্থ, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ ইত্যাদি)। ইহা ছাড়া, দেনা খাতে রিজার্ভ তহবিল ও উদ্বৃত্ত দেখানো হয়। বালান্স-শীট-এ প্রতিক্ষেত্রে ব্যবসায়ের মোট দায় বা দেনা উহার মোট সম্পত্তি বা দায়ের সমান করিয়া দেখানো হয়।

ব্যালান্স-শীট-এ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির যে-হিসাব দেওয়া হয়, তাহার মোট মূল্যের পশ্চাতে সমপরিমাণ দাবি বা মালিকানা (total claims or ownership) থাকিবে। যেমন, কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের ৬০ হাজার টাকার মূল্যের কোন বাড়ী থাকিলে উহার উপর এক বা একাধিক ব্যক্তিবর্গের সমপরিমাণ মূল্যের মালিকানা থাকিবে। বাড়ীটি যদি ৩০ হাজার টাকায় বন্ধক দেওয়া হয়, তবে বন্ধক-গ্রহীতার দাবি হইবে ৩০ হাজার টাকার এবং মূল মালিকের দাবি হইবে অবশিষ্ট ৩০ হাজার টাকার। সম্পত্তি ও দায়ের সমতাটিকে ব্যালান্স-শীটে এইভাবে দেখানো হয়:

মোট সম্পত্তির মূল্য = মোট দাবি বা মালিকানার মূল্য = অপরের নিকট দেনা বা দায় + মালিকের মালিকানা (value of assets = value of total claims or

ownership = value of liabilities owed + value of proprietorship owned)।[১]

ব্যবসায়ের মালিকানার এই মূল্যকে 'নীট মূল্য' (net worth) বলা হয়। সুতরাং, মোট সম্পত্তি = মোট দেনা বা প্রদেয় অর্থ + নীট মূল্য (Assets = Liabilities + Net Worth)। অতএব, নীট মূল্য (বা মালিকের ইক্যুইটি) = মোট সম্পদ − মোট দেনা বা প্রদেয় অর্থ। এই নীট মূল্যের বৃদ্ধি (বা হ্রাস) হইতে ব্যালান্স-শীট-এর দৃষ্টিকোণ হইতে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বা ক্ষতি) নিরীক্ষণ করা যায়। ইহা নিম্নে ব্যালান্স-শীটের আর একটি নমুনা ছকে দেখানো যাইতে পারে :

	ডিসেম্বরের শেষের হিসাব	ডিসেম্বরের শেষের হিসাব
১। স্থায়ী সম্পত্তি (কারখানা, অফিস-বাড়ী, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি)	৫৫,০০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা
২। চলতি সম্পত্তি (নগদ টাকা, মজুত পণ্য ইত্যাদি)	২৫,০০০ ,,	৩৫,০০০ ,,
ক। মোট সম্পত্তি	৮০,০০০ ,,	৮৫,০০০ ,,
বাদ : অপরের নিকট দায়:		
১। চলতি দায়	২০,০০০ ,,	১৫,০০০ ,,
২। দীর্ঘকালীন দায়	৩০,০০০ ,,	৩০,০০০ ,,
খ। অপরের নিকট মোট দায়	৫০,০০০ ,,	৪৫,০০০ ,,
ব্যবসায়ের নীট মূল্য (net worth) (শেয়ার মূলধন, রিজার্ভ ইত্যাদি)	৩০,০০০ **টাকা**	৪০,০০০ **টাকা**

উপরের ব্যালান্স-শীট হইতে দেখা যায়, সালের ডিসেম্বরের শেষে ব্যবসায়ের নীট মূল্য পূর্বের বৎসরের তুলনায় ১০,০০০ টাকা (অর্থাৎ ৪০,০০০ − ৩০,০০০ = ১০,০০০ টাকা) বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধির জন্য দায়ী উক্ত বৎসরের ব্যবসায়ের

মুনাফা (ধরা হইয়াছে, উক্ত বৎসরে কোন নূতন শেয়ার-মূলধন গ্রহণ করা হয় না)। উহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে সারা বৎসরের লেনদেনের বিষয়গুলির পরিবর্তনের মধ্যে। পূর্ব পৃষ্ঠার ছকটি হইতে দেখা যায়, সালে সম্পত্তির অংশে স্থায়ী সম্পত্তি ৫০০০ টাকা হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু চলতি সম্পত্তির পরিমাণ ১০,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার, 'অপরের নিকট দায়'-এর অংশে চলতি দায় ৫০০০ টাকা হ্রাস পায়, কিন্তু দীর্ঘকালীন দায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। ব্যবসায়ের দেনাপাওনার এইরূপ পরিবর্তনের ফলে ব্যবসায়ের নীট মূল্যের বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এই নীট মূল্যের মধ্যে শেয়ার মূলধন, ব্যবসায়ে রক্ষিত আয় ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্যবসায়ের নীট মূল্যের এইরূপ পরিবর্তন বিচার করিয়া ব্যালান্স-শীটের দৃষ্টিকোণ হইতে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা (বা ক্ষতি) অনুসন্ধান করা হয়।

৩. **আয় ও ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে মুনাফা (Income and Expense view of Profit)**ঃ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মুনাফা জানিবার দ্বিতীয় উপায়টি হইতেছে উহার বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী বা লাভ-ক্ষতির হিসাব (Profit and Loss Account)। এই বিবরণীটি ব্যালান্স-শীটের অংগ হিসাবে তৈয়ারী করা হয়। এই বিবরণী হইতে কোন এক বৎসরে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কি পরিমাণ লাভ বা ক্ষতি হইয়াছে এবং উহা কোন্ কোন্ বিষয়ের জন্য হইয়াছে তাহার বিশদ তথ্য জানা যায়। ইহা ছাড়া, ক্রয়-বিক্রয়, উৎপাদন ব্যয়, বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয়, মালিকদের মধ্যে বণ্টিত লভ্যাংশ, ব্যবসায়ে রক্ষিত আয় (retained earnings in the business) ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে একটি বাৎসরিক হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু এই হিসাব হইতে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না, উহা পাওয়া যায় ব্যালান্স-শীট হইতে। প্রকৃতপক্ষে ব্যালান্স-শীট হইতেছে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের জীবন-কাহিনীর একটি সংক্ষিপ্তসার। পক্ষান্তরে, আয়-ব্যয়ের হিসাব হইতেছে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক কার্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী। এখন দেখা যাউক, আয়-ব্যয়ের হিসাব হইতে কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মুনাফা (বা ক্ষতি) কি ভাবে জানা যায়।

ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাবে মোটামুটি তিনটি বিষয়ের বিবরণ থাকেঃ (১) কোন বৎসরে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ, (২) বিক্রীত দ্রব্যাদির মোট উৎপাদন ব্যয় ও আনুষঙ্গিক খরচ এবং (৩) মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে মোট ব্যয় বাদ দিয়া লাভের (বা ক্ষতির) হিসাব। সুতরাং আয়-ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মোট মুনাফা = মোট বিক্রয়লব্ধ আয় — মোট ব্যয়। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের (যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের) মুনাফার এইরূপ একটি নমুনা হিসাব পরপৃষ্ঠার ছকে দেওয়া হইল ঃ

১. Chamberlin—*The Firm*

৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত		
নীট বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও অন্যান্য আয় (বাট্টা, রিবেট ইত্যাদি বাদ দিয়া)	..	৫০,০০০ টাকা
বাদ : মোট উৎপাদন ব্যয় (কাঁচামাল, মজুরি, অবচয় ইত্যাদির জন্য ব্যয়)	...	২৫,০০০ ,,
মোট মুনাফা (gross profit)	...	২৫,০০০ টাকা
বাদ : বিক্রয়-ব্যয় ও পরিচালন-ব্যয়		২,০০০ টাকা
বাদ : স্থায়ী ঋণের উপর দেয় সুদ		১,০০০ ,,
বাদ : কর বাবদ দেয় অর্থ		৩,০০০ ,,
কর-প্রদানের পর নীট আয় বা নীট মুনাফা (net profit)	...	১৯,০০০ টাকা
বাদ : মালিকদের মধ্যে বন্টিত লভ্যাংশ (dividends paid)	...	৪,০০০ ,,
ব্যবসায়ে রক্ষিত আয়ের পরিমাণ বা রিজার্ভ তহবিলে স্থানান্তরিত অর্থ	...	১৫,০০০ টাকা

উপরের ছকটি হইতে দেখা যায়, সালে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানটির নীট বিক্রয়-লব্ধ অর্থ ও অন্যান্য আয় হইতেছে ৫০,০০০ টাকা। বিক্রয়লব্ধ অর্থ বলিতে উৎপাদিত দ্রব্যাদি ও সেবাকার্য বিক্রয়লব্ধ করিয়া যে মোট টাকাকড়ি পাওয়া যায়, তাহাকেই বুঝায়। ঐ অর্থের পরিমাণ হইতে মোট উৎপাদন ব্যয় (অর্থাৎ, ২৫,০০০ টাকা বাদ দিলে মোট মুনাফা (অর্থাৎ ২৫,০০০ টাকা) পাওয়া যাইবে। উৎপাদন ব্যয় বলিতে বিক্রীত দ্রব্যাদি ও সেবাকার্য উৎপাদন করিতে যে-পরিমাণ অর্থ খরচ হইয়াছে, তাহাকেই বুঝায়। উৎপাদন-ব্যয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইতেছে কাঁচামাল, মজুরি, যন্ত্রপাতির অবচয় বা অবক্ষয় (depreciation) ইত্যাদি। মোট মুনাফা হইতে বিক্রয়-ব্যয়, পরিচালন-ব্যয়, স্থায়ী ঋণের উপর দেয় সুদ, কর ইত্যাদি বাদ দিলে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের নীট আয় বা নীট মুনাফা পাওয়া যায়। ইহাই হইতেছে আয়-ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মুনাফা। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানে এই নীট আয়ের একটি অংশ শেয়ার-মালিকদের মধ্যে বন্টন করা হয় এবং অবশিষ্ট অংশ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের রিজার্ভ তহবিলে স্থানান্তরিত করা হয় অর্থাৎ উহা পুনরায় প্রতিষ্ঠানের মূলধনের সংগে যোগ করা হয়।

৪. **ঐতিহাসিক বা অতীত মুনাফা বনাম প্রত্যাশিত মুনাফা (Historical Profits vs. Anticipated Profits) :** ব্যবসায়-অর্থবিদ্যায় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের

মুনাফা ব্যালান্স-শীট ও আয়-ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্লেষণ করা হইলে অর্থবিদগণ মুনাফার একটি অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা মুনাফার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ঐতিহাসিক বা রেকর্ডভুক্ত বা অতীত মুনাফা এবং প্রত্যাশিত মুনাফা—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখান।

ঐতিহাসিক মুনাফা (historical profit) বলিতে কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বিগত কয়েক বৎসরে প্রকৃতপক্ষে যে পরিমাণ 'নীট আয়' উপার্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাকেই বুঝায়। পক্ষান্তরে, প্রত্যাশিত মুনাফা (anticipated profit) হইল, যে পরিমাণ নীট আয় কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বর্তমান বৎসরে বা অদূর ভবিষ্যতে উপার্জনের প্রত্যাশা করে। সুতরাং ঐতিহাসিক মুনাফা হইতেছে অতীতের বাস্তব বা রেকর্ডভুক্ত ঘটনা, কিন্তু প্রত্যাশিত মুনাফা হইতেছে ভবিষ্যতের সম্ভাবিত প্রত্যাশা। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যাইতে পারে, অতীত মুনাফা হইতেছে বিগত বৎসরের উপার্জিত ও বাস্তব নীট আয় এবং প্রত্যাশিত মুনাফা হইতেছে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বৎসরের জন্য প্রত্যাশিত নীট আয়।

এই দুই প্রকার মুনাফার মধ্যে পার্থক্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে বলা হয়, কখনও উহারা একই রূপ হয়, আবার কখনও উহাদের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। ইহার কারণ হইতেছে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-বিক্রয় ও নানারূপ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উহাদের রূপায়ণের মধ্যে অসঙ্গতি। প্রত্যেক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে মুনাফা সর্বাধিক-করণের জন্য নানারূপ ক্রয়-বিক্রয় পরিকল্পনা (purchase and sales plans) প্রণয়ন করিয়া উহা রূপায়ণের ব্যবস্থা করিতে হয়। ঐ সকল পরিকল্পনা যে-সকল প্রত্যাশা ও অনুমানের উপর ভিত্তিশীল তাহা ঠিক ঠিক পূরণ হইলে নির্দিষ্ট সময়-মেয়াদের পর লব্ধ মুনাফা বা অতীত মুনাফা ও প্রত্যাশিত মুনাফা একই হইবে। কিন্তু ঐ সকল পরিকল্পনার মধ্যে বা উহা রূপায়ণের পথে কোনরূপ ভুলত্রুটি ঘটিয়া থাকে। আবার, ক্রয়-বিক্রয় পরিকল্পনা ও উহা রূপায়ণে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি না থাকিলে যাহাই প্রত্যাশিত মুনাফা, তাহাই অতীত মুনাফায় পরিণত হইবে। অবশ্য অতীত মুনাফা এবং আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক বিষয়কে ভিত্তি করিয়া আগত বৎসরগুলির জন্য প্রত্যাশিত মুনাফা স্থির করা হয়।

৫. **প্রত্যাশিত মুনাফার পরিমাপ (Estimation of Anticipated Profit) :** পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান নানারূপ ক্রয়-বিক্রয় পরিকল্পনার মাধ্যমে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা স্থির করে এবং ইহার জন্য ইহাকে অতীতের কার্যকলাপ ও উপার্জিত বা রেকর্ডভুক্ত মুনাফার ভিত্তিতে প্রত্যাশিত মুনাফার হিসাব করে। প্রত্যাশিত মুনাফা পরিমাপের জন্য কোন চলতি প্রতিষ্ঠানকে (running concerns) উহার উৎপাদিত পণ্য ও সেবাকার্য বিক্রয় করিয়া কি পরিমাণ মোট আয় (total revenue) পাওয়া যাইতে পারে তাহার একটি হিসাব করিতে হয়। ইহার পর উৎপাদনের

১ Ryan—*Price Theory*

জন্য যে-সকল উপকরণ কাজে নিয়োগ করা হইয়াছে তাহার জন্য কি ব্যয় হইতে পারে তাহার হিসাব করিতে হইবে। উপাদানগুলির সেবাকার্যের জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব অবশ্য 'চলতি বাজার দামে' (current market price) করিতে হইবে।[১] অর্থাৎ শ্রমিকের মজুরি, মূলধনের জন্য দেয় সুদ, জমি বা বাড়ীর জন্য দেয় খাজনা ও ভাড়া, স্থায়ী কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি বর্তমানে যে-হারে দেওয়া হয়, সেই হারে আগত বৎসরে দেওয়া হইবে—ইহার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ বৎসরের সম্ভাব্য উৎপাদন-ব্যয় বাহির করতে হইবে। সম্ভাব্য আয় ও সম্ভাব্য ব্যয় এইভাবে বাহির করিয়া সম্ভাব্য আয় হইতে সম্ভাব্য ব্যয় বাদ দিলে প্রত্যাশিত মুনাফার হিসাব পাওয়া যাইবে।

নূতন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই প্রত্যাশিত মুনাফার হিসাব করা বিশেষ কষ্টসাপেক্ষ ব্যাপার হয়। কারণ ইহার কোন অতীত কার্যকলাপ বা অভিজ্ঞতা থাকে না যাহার ভিত্তিতে এই হিসাব করা হইবে। কিন্তু নূতন প্রতিষ্ঠানগুলিও পুরাতন প্রতিষ্ঠানের পথ অনুসরণ করিয়া প্রত্যাশিত মুনাফা পরিমাপ করিতে পারে। তবে ইহার জন্য ইহাদিগকে দুইটি শর্ত পূরণ করিতে হইবে: (ক) পুরাতন প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের যে-সকল প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনুসরণ করে নূতন প্রতিষ্ঠানও তাহা অবলম্বন করিবে। (খ) পুরাতন প্রতিষ্ঠান যে-সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে নূতন প্রতিষ্ঠানগুলি তাহা ভোগ করিতে পারে। এই শর্ত-দুইটি পূরণ হইলে নূতন প্রতিষ্ঠান ও পুরাতন প্রতিষ্ঠানের মতো সম্ভাব্য আয় ও 'বর্তমান বাজার দরে নির্ধারিত সম্ভাব্য মোট ব্যয়' বাহির করিয়া প্রত্যাশিত মুনাফা পরিমাপ করিতে পারিবে।[২]

ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান নূতনই হউক বা পুরাতনই হউক—উভয়ের পক্ষেই এই প্রত্যাশিত মুনাফা সঠিক ভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কারণ ভবিষ্যতের বাজার-দাম, উৎপাদন ও পরিচালন ব্যয়, চাহিদা ও যোগান, সরকারের কর-নীতি ইত্যাদি বিষয়গুলির পরিবর্তন ঘটিয়া প্রত্যাশিত মুনাফা ও বাস্তব মুনাফার মধ্যে ব্যবধান ঘটাইতে পারে। এইরূপ পরিবর্তন গতিশীল অর্থব্যবস্থায় প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই কারণে প্রত্যাশিত মুনাফা পরিমাপের জন্য পরিসংখ্যান শাস্ত্রের 'সম্ভাব্যতার সূত্র (Law of Probability) কিছুটা প্রয়োগ করিতে হয়।

---

১. Rnan—*Price Theory*
২. Ryan—*Price Theory*

॥ ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা ও ইহার স্বরূপ ॥
(Business Economics and its Nature)

(ব্যবসায় অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা—ব্যবসায় অর্থবিদ্যা ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব—ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা মূলত পরিমাণবাচক—ব্যবসায়-অর্থবিদ্যায় গণিতের ব্যবহার)

১. ব্যবসায় অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা (Definition of Business Economics) ঃ অর্থব্যবস্থার স্বরূপ ও কার্যকলাপ আলোচনার পর ব্যবসায় অর্থবিদ্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। অর্থবিদ্যার আলোচনা প্রধানত দুই প্রকারের—তত্ত্বগত (theoretical) এবং প্রয়োগমূলক (applied)। অর্থবিদ্যার তাত্ত্বিক দিক যেমন ভোগকারীর চাহিদা-বিশ্লেষণ, যোগান, দামতত্ত্ব, টাকাকড়ির তত্ত্ব ইত্যাদি তত্ত্বগত অর্থবিদ্যায় বিশ্লেষণ করা হয়। আবার অর্থবিদ্যার তত্ত্বগুলি যখন ব্যবহারিক জীবনে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আচরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখন ইহাকে ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা বলিয়া অভিহিত করা হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, জেম্‌স বেট্‌স ও জে. আর. পারকিন্‌সন্‌-এর (James Bates and J. R. Parkinson) মতে, ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা হইতেছে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বগত ও বাস্তব আচরণের বিশ্লেষণ (Business economics is a study of the behaviour of firms in theory and practice)।[১]

বিশ্লেষণ করিয়া বলা যাইতে পারে, কাঁচামাল ক্রয়, উৎপাদন, বিক্রয়, মুনাফা, উৎপাদন ব্যয়, পরিচালনা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান যে-সকল কার্যকলাপ ও আচরণ প্রকাশ করে তাহাই ব্যবসায় অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। সুতরাং ব্যবসায় অর্থবিদ্যা হইতেছে একটি বিশ্লেষণকারী পদ্ধতি, যাহা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালন বিভাগের কর্মকর্তাগণকে এমন কতকগুলি উপাদান বা হাতিয়ার সরবরাহ করে, যাহার ভিত্তিতে তাঁহারা নিজেদের ব্যবসা-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারে (an analytical method aimed at providing the executive staff of a business with elements which can serve as bases for business decisions)। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের যাঁহারা কর্মকর্তা বা উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী তাঁহাদিগকে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নানারূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। যেমন—কি, কতখানি ও কেমন করিয়া উৎপাদন করা হইবে, উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণগুলি কি অনুপাতে ও কি পরিমাণে নিয়োগ করা হইবে, উৎপাদনের ব্যয় কি পরিমাণ হইবে এবং উহা কিভাবে সর্বনিম্ন করা যায়, উৎপাদিত পণ্য কিভাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে, উহার জন্য কত দাম আদায় করা হইবে, বিজ্ঞাপনের ধরন ও বিজ্ঞাপন ব্যয়ের পরিমাণ কি হইবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তাহাদের উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়।

---

১ পৃঃ ৬ দ্রষ্টব্য

ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপরি-উক্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের আচরণ বিশ্লেষণের জন্য অর্থবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ব্যবসায় অর্থবিদ্যা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের আচরণ তত্ত্বগত ও বাস্তবগতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া কর্মকর্তাদিগকে ঐ জ্ঞান ও পরিচালনা কলা-কৌশল সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহার ফলে তাঁহারা ব্যবসায়ের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে উপযুক্ত ও কাম্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সাধারণ অর্থবিদ্যা সামগ্রিক সমাজ অর্থনৈতিক কর্যকলাপ কিভাবে সম্পন্ন করে, তাহার তত্ত্বগত বিশ্লেষণ করে। কিন্তু ব্যবসায় অর্থবিদ্যার পরিধি এত ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ নহে। যে-সকল বিষয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে শুধুমাত্র সেই সকল বিষয় ব্যবসায় অর্থবিদ্যায় বিশ্লেষণ করা হয়। ইহার ফলে আয় ও নিয়োগের তত্ত্ব, জাতীয় আয় নির্ধারণ, বেকার সমস্যা, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ইত্যাদি অর্থবিদ্যার বিষয়গুলি ব্যবসায় অর্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয় না। তবে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান সামগ্রিক অর্থব্যবস্থার অংশ বলিয়া ঐ সকল সমষ্টিগত কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ও ব্যবসায় অর্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুতরাং দেখা যায়, ব্যবসায় অর্থবিদ্যা প্রয়োগ অর্থবিদ্যা অংশ এবং ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, সেই সম্পর্কে যাবতীয় প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও পদ্ধতি ব্যবসায় অর্থবিদ্যা পরিচালকদিগকে সরবরাহ করে।

২. ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব (Business Economics and Economic Theory) : ব্যবসায়-অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে, ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা হইতেছে অর্থবিদ্যার প্রয়োগমূলক (applied) শাখা। সুতরাং, ব্যবসায়-অর্থবিদ্যার পরিধি সাধারণ অর্থবিদ্যার তুলনায় অনেকটা সংকীর্ণ। অর্থবিদ্যা হইতেছে সামাজিক অপ্রচুর সম্পদ কিভাবে সীমাহীন অভাব পূরণের জন্য নানা বিকল্প ব্যবহারের মধ্যে বন্টন করা হয় তাহারই বিশ্লেষণ। আবার ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা হইতেছে কোন ব্যবসা-প্রষ্ঠিানের নিকট যে-সকল সম্পদ বা উপকরণ তাহা থাকে, কিভাবে উহার বিভিন্ন প্রয়োজনের মধ্যে বণ্টন করিয়া নানারূপ আর্থিক ও অর্থ-বহির্ভূত লক্ষ্য পূরণ করা যায়, তাহারই বাস্তব বিশ্লেষণ।

ব্যবসায়-অর্থবিদ্যায় অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলির বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের আচরণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ের পরিচালককে ব্যবসা-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে যে-সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় এবং ভবিষ্যতে কর্মপন্থা স্থির করিতে হয় তাহার জন্য প্রয়োজন পড়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ও হাতিয়ার (concepts and tools)। অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি সেই সকল গুরুত্বপূর্ণ ও ধারণা ও বিশ্লেষণের হাতিয়ার পরিচালককে সরবরাহ করিয়া থাকে। যেমন—

কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে উহার উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা সম্যক্‌ভাবে জানিতে গেলে পরিচালককে চাহিদার সূত্র, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ইত্যাদি অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আবার, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কি পরিমাণে এবং কি অনুপাতে বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগ করিয়া কতটা উৎপাদন করিবে বা বিক্রয় করার জন্য কি কর্মসূচী গ্রহণ করিবে ইত্যাদি বিষয়গুলি জানিতে হইলে তাহাকে উৎপাদন-ব্যয়, দাম-নির্ধারণ, বাজার-সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে যে-সকল অর্থনৈতিক তত্ত্ব আছে, সেইগুলি আয়ত্ত করিতে হয়।

কিন্তু সকল প্রকার অর্থনৈতিক তত্ত্বই ব্যবসায়-অর্থবিদ্যায় প্রয়োজন পড়ে না। এই প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক তত্ত্বের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত (micro and macro economic aspects) দিক উল্লেখ করিতে হয়। ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি কোন ব্যক্তি-বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া উহার সম্পর্কে আলোচনা করে। যেমন—ভোগকারী বা উৎপাদনকারীর কার্যকলাপ আলোচনা। পক্ষান্তরে, অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক দিক হইতে সমষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়। ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা মূলত ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করিয়া উহা প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং ভোগকারীর চাহিদা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-বিক্রয় পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে যে-সকল ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্ব আছে, কেবলমাত্র তাহাই ব্যবসায়-অর্থবিদ্যায় প্রয়োগমূলক বিশ্লেষণ করা হয়। পক্ষান্তরে, আয় ও নিয়োগ তত্ত্ব, জাতীয় আয়-নির্ধারণ, টাকাকড়ির তত্ত্ব ইত্যাদি সমষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি ব্যবসায়-অর্থবিদ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। তবে ব্যবসা সামগ্রিক অর্থব্যবস্থার অংশ বলিয়া সমষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি ব্যবসায়-অর্থবিদ্যায় কিছু কিছু আলোচনা করিতে হয়।

ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা মূলত পরিমাণবাচক বিশ্লেষণ : বলা হয়, ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা মূলত পরিমাণবাচক (quantitative) বিশ্লেষণ। পরিমাণবাচক বিশ্লেষণ বলিতে দুইটি পরিবর্তনীয় বিষয়ের (variables) সংগে পরিমাণগত সম্পর্কের আলোচনাকে বুঝায়। যেমন—দামের ১০ শতাংশ হ্রাসের ফলে চাহিদার ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইল, এখানে দাম ও চাহিদা উভয়ই পরিবর্তনশীল এবং এই দুইয়ের মধ্যে যে-সম্পর্ক দেখানো হইল তাহা পরিমাণবাচক। ব্যবসায়-অর্থবিদ্যায় ব্যবসায়ী বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে নানা বিষয় সম্পর্কে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া মুনাফা সর্বাধিক-করণের প্রচেষ্টা করে। ইহার জন্য তাহাকে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পরিমাণগত সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। যেমন—বিজ্ঞাপন-প্রচার ও মুনাফার পরিমাণ উভয়ই পরিবর্তনশীল বিষয়। কারণ, বিজ্ঞাপনের জন্য কত ব্যয় করা হইবে তাহা যেমন পরিবর্তনশীল, মুনাফার পরিমাণ কত হইবে তাহাও সেইরূপ পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞাপন খাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ-ব্যয় বৃদ্ধির ফলে বিক্রয় বা মুনাফার পরিমাণ কিরূপ পরিবর্তন ঘটিল তাহা পরিমাপ করা যায়। সুতরাং এখানে বিজ্ঞাপন ব্যয় ও মুনাফা বৃদ্ধি—এই দুইয়ের মধ্যে পরিমাণগত সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

ব্যবসায়-অর্থবিদ্যায় এই পরিমাণবাচক বিশ্লেষণের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। কারণ ব্যবসায় অর্থবিদ্যায় সর্বাধিক-করণের ধারণাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারণাটির বাস্তব প্রয়োগের জন্য ব্যবসা-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে পরিমাণবাচক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিতে হয়। যেমন—মোট বিজ্ঞাপন ব্যয়কে ৫০ হাজার টাকা লইয়া গেলে মুনাফা যদি সর্বাধিক হয়, তাহা হইতে প্রতিষ্ঠানটি ঐ পরিমাণ বিজ্ঞাপন ব্যয়কে লক্ষ্য বলিয়া ধরিবে।

ব্যবসায়-অর্থবিদ্যার এই রূপ পরিমাণবাচক স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পরিমাণগত সম্পর্ক দেখাইবার জন্য নানারূপ অনুপাত বিশ্লেষণের (ratio analysis) অবতারণা করা হয়। যেমন—ব্যবসায়ের পরিচালকরা প্রায়ই প্রতিষ্ঠানের প্রসার সম্ভাবনা ও বলিষ্ঠতা বিচারের জন্য চলতি সম্পত্তি ও চলতি দায়ের অনুপাত অর্থাৎ চলতি অনুপাত (current ratio), ব্যবসায়ের নীট মূল্য এবং চলতি দায়ের অনুপাত, নীট মূল্য ও মোট দায়ের অনুপাত মজুদ ও চলতি মূলধনের অনুপাত ইত্যাদি বিচার করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও বিনিয়োজিত মূলধন ও বিক্রয়ের অনুপাত, মুনাফা ও মোট সম্পদের অনুপাত ইত্যাদিও ব্যবসায়-অর্থবিদ্যায় ব্যবহার করা হয়। এই কারণে আধুনিক পরিমাণবাচক অর্থবিদ্যার (Quantitative Economics) নানাদিক ব্যবসায় অর্থবিদ্যায় বিশদভাবে আলোচিত হয়। যেমন—Input-Output Analysis, Activity Analysis, Game Theory, Decision Theory, Linear Programming ইত্যাদি। এই পরিমাণবাচক বিশ্লেষণের জন্য ব্যবসায়-অর্থবিদ্যায় গণিতের সাহায্য লওয়া হয়। ইহার ফলে অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলির বাস্তব প্রয়োগ সহজসাধ্য হইয়াছে এবং ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা মূলত পরিমাণবাচক বিশ্লেষণ (quantitative analysis) হইয়া পড়িয়াছে।

৩. **ব্যবসায়-অর্থবিদ্যায় গণিতের ব্যবহার (Use of Mathematics in Business Eeonomics)** ঃ ব্যবসায় অর্থবিদ্যায় গণিতের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় এবং ব্যবসায় অর্থবিদ্যায় পরিমাণবাচক বিশ্লেষণের প্রাধান্য থাকায় এই ব্যবহার অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিককালে ব্যবসায় অর্থবিদ্যা আলোচনা-প্রধান না থাকিয়া অনুসন্ধান-প্রধান বা বিশ্লেষণ-প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোন বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত আকারে এবং সুস্পষ্টভাবে বলিতে হইলে গণিতের সাহায্য লইতে হয়, কারণ এই ব্যাপারে গণিতের কোন বিকল্প নাই। প্রকৃতপক্ষে অর্থবিদ্যায় গণিতের প্রয়োগ অর্থনীতিবিদদের আলোচনা হাতিয়ার আরও বৃহৎ করে এবং প্রারম্ভিক অনুমানসমূহ হইতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তাহা আরও বিস্তীর্ণ করিয়া থাকে।

১. Chamberlin—*The Firm*

ব্যবসাজগতে ব্যবসায়ীকে সর্বদাই বিকল্প ব্যবহারোপযোগী সীমিত উপকরণের যেমন—টাকাকড়ি, কাঁচামাল, লোকবল, যন্ত্রপাতি, সময়, স্থান—বিলিবণ্টনের সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। ব্যবসায়ে এইগুলি এমনভাবে বণ্টন করিতে হইবে যাহাতে মুনাফা সর্বাধিক হয় বা ব্যয় সর্বনিম্ন হয়। এইরূপ জটিল ও পরস্পর নির্ভরশীল কার্যধারায় সর্বোত্তম সমাধানের জন্য আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদরা যে কৌশল প্রয়োগ করেন, তাহার নাম 'গাণিতিক কর্মপরিকল্পনা' (mathematical programming)। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এই কর্ম-পরিকল্পনা ব্যাপক প্রয়োগ করিতে হয়। আবার, ব্যবসায়ে আর এক একক উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইবে কি না, আরও একটি একক উপাদান ব্যবহার করা হইবে কি না, আরও একটি বিজ্ঞাপন করা হইবে কিনা—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। অর্থবিদ্যাবিদগণ প্রান্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে (mc, mr, mu) এই সব জটিল প্রশ্নের সম্ভাব্য সমাধান পূর্বেই জানিতে পারে। উপরের দুইটি উদাহরণে যে সকল গাণিতিক কৌশল প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার মধ্যে বীজগণিত, সম্ভাবনার সূত্র সরল ও জটিল সমীকরণ, স্থানাংক জ্যামিতি, অন্তরকলন (differential calculus) ইত্যাদি প্রধান। সুতরাং দেখা যায়, বীজগণিত, জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে অর্থনৈতিক তত্ত্বের নিখুঁত বিশ্লেষণ ও বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব নয়।

ব্যবসায় অর্থবিদ্যা প্রয়োগমূলক বলিয়া আধুনিককালে অর্থবিদ্যাবিদগণ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের আচরণের সঠিক বিশ্লেষণের জন্য গণিতের বিভিন্ন বিষয় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিতেছেন। ইহার ফলে অর্থবিদ্যাবিদগণের বিশ্লেষণের কলাকৌশল আরও সূক্ষ্ম ও নিখুঁত হইয়াছে এবং নানারূপ অনুমানের ভিত্তিতে উপযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় কাজ আরও সহজ হইয়াছে। এই কারণে ব্যবসায় অর্থবিদ্যায় Equation, Identity, Function, Differentials, Derivative, Probablity Sets, Permutations and Combinations ইত্যাদি গাণিতিক বিষয়গুলি ব্যবহৃত হইতেছে।

—

১২ ।। বাজার-সম্পর্কের বিশ্লেষণ ।।
(Analysis of Market Relationship)

[বাজার-এর অর্থ-বাজারের আয়তন বিস্তীর্ণ বাজারের উপাদান-বাজারের প্রকারভেদ-পরিধি অনুসারে, দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে, সময়-মেয়াদ অনুসারে ও প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের শ্রেণীবিভাগ, পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজার-অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা বাজারে প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রবেশ]

ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইতেছে বাজার। ইহা বাজার হইতে দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (input) ক্রয় করে এবং পরে ইহা উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। আবার এই বাজারে ক্রেতাগণ দ্রব্যাদি ক্রয় করে এবং বিক্রেতা দ্রব্যাদি বিক্রয় করে। ইহার ফলে বাজারের মাধ্যমে বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ঐ সম্পর্ককে অর্থবিদ্যায় বাজার-সম্পর্ক (market relationship) বলা হয়। আবার বাজার বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে এবং ইহার ফলে বিভিন্ন বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কের রূপটিও বিভিন্নরূপ হইয়া পড়ে। বাজারের এই বিভিন্ন বিষয়গুলি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে।

১. বাজার-এর অর্থ (Meaning of the Market) ঃ সাধারণ অর্থে বাজার বলিতে যে-স্থানে ক্রেতারা ও বিক্রেতারা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য মিলিত হয়, সেই স্থানকেই বুঝায়। এই অর্থে শ্যামবাজারের বাজার, কলেজ স্ট্রীটের বাজার, গড়িয়াহাটের বাজার ইত্যাদি স্থানগুলিকে বাজার বলা হয়। কিন্তু অর্থবিদ্যায় 'বাজার' কথাটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থবিদ্যায় 'বাজার' বলিতে কোন স্থানকে বুঝায় না, কোন দ্রব্যের বা উপাদানের বাজারকে বুঝায়। কোন দ্রব্যের বা কোন উপাদানের (যেমন—শ্রম, মূলধন ইত্যাদি) ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে লেনদেনের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহাকেই অর্থবিদ্যায় 'বাজার' বলিয়া অভিহিত করা হয়। দ্রব্যসামগ্রীর বাজারকে বলা হয় 'দ্রব্যের বাজার' (commodity market) যেমন—চালের বাজার, কাপড়ের বাজার, সোনার বাজার ইত্যাদি। আবার উৎপাদনের উপকরণের বাজারকে বলা হয় উপাদানের বাজার (factor market), যেমন—শ্রমের বাজার, মূলধনের বাজার প্রভৃতি।

বাজারের উপাদান ঃ উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায়, অর্থবিদ্যায় 'বাজার'-এর কয়েকটি উপাদান বা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে পৃথক পৃথক দ্রব্যের পৃথক পৃথক বাজারকে বুঝায়। সুতরাং প্রতিটি বাজারের জন্য একটি করিয়া পৃথক দ্রব্য থাকিবে ; যেমন—চালের বাজার, পাটের বাজার, যন্ত্রপাতির বাজার ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, ঐ দ্রব্যগুলির ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকা চাই। ক্রেতারা দ্রব্যটি ক্রয় করে এবং বিক্রেতারা দ্রব্যটি বিক্রয় করে। ক্রেতাদের মধ্যে ক্রয়ের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা থাকে।

তৃতীয়ত, দ্রব্যটির একটি নির্দিষ্ট দাম (price) থাকিবে। ঐ দাম অনুসারে ক্রেতারা ক্রয় করে এবং বিক্রেতারা বিক্রয় করে। অবশ্য দ্রব্যটির দাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ হইতে পারে।

চতুর্থত, বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটি সহজ সম্পর্ক থাকিবে এবং উহা হইতেছে লেনদেনের বা বিনিময়ের সম্পর্ক।

২. **বাজারের আয়তন** (Extent of the Market): বাজারের আয়তন ক্ষুদ্র বা বড় হইতে পারে। মাছ বা দুধের বাজার ক্ষুদ্র, কারণ ঐ দ্রব্যগুলির ক্রয়বিক্রয় দেশের কোন একটি অঞ্চলের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু, গম, সোনা, কাপড় ইত্যাদি দ্রব্যগুলির বাজারের আয়তন খুব বড় হয়। কারণ, উহাদের ক্রয়-বিক্রয় সমগ্র দেশব্যাপী ছড়াইয়া থাকে। আধুনিক যুগে পরিবহণ ও যোগাযোগ, ব্যাংক ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রসারের ফলে কোন কোন দ্রব্যের বাজার পৃথিবীব্যাপী হইয়া থাকে, যেমন—ঘড়ি বা ইলেকট্রনিক দ্রব্য বা বিলাসদ্রব্যের বাজার সারা পৃথিবীব্যাপী ছড়াইয়া আছে। পূর্বে ঐ দ্রব্যগুলির বাজারের আয়তন এত বড় ছিল না। প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যের বাজারের আয়তন কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

বিস্তীর্ণ বাজারের উপাদানসমূহ: নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকিলে কোন দ্রব্যের বাজার বিস্তীর্ণ (wide market) হইবে:

ক। ব্যাপক চাহিদা ও যোগান: যে-সকল দ্রব্যের বাজারে বহু ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে, সাধারণত সেই সকল দ্রব্যের বাজার খুব ব্যাপক বা বিস্তীর্ণ হয়। পশমের বাজার অপেক্ষা গমের বাজারের আয়তন বড় হয়। কারণ, পশমের চাহিদা অপেক্ষা গমের চাহিদা অনেক বেশী। আবার, শিল্পকলা দ্রব্যের (works of art) বাজারের আয়তন ছোট। কারণ, উহাদের যোগান সীমিত।

খ। দ্রব্যের স্থায়িত্ব: পচনশীল দ্রব্যের (perishable goods), যেমন—মাছ, মাংস, তরিতরকারী ইত্যাদি—বাজারের আয়তন বড় হইতে পারে না। কারণ ঐ দ্রব্যগুলি এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় প্রেরণের পথে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যে দ্রব্যগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহা সহজেই স্থানান্তর করা যায়। সুতরাং দীর্ঘস্থায়ী দ্রব্যগুলির বাজার সাধারণত বড় হইবে। এই কারণেই দুধ বা ডিমের তুলনায় সুতীবস্ত্রের বাজার বড় হয়।

গ। স্থানান্তরে প্রেরণের সুবিধা: যে-সকল দ্রব্য সহজেই এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় পাঠানো যায় সেই সকল দ্রব্যের বাজারের আয়তন বড় হয়। সোনা, রূপা, সিল্ক, ঘড়ি ইত্যাদি দ্রব্যগুলি কম ব্যয়ে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় পাঠানো যায়। এই কারণেই ঐ দ্রব্যগুলির বাজার দেশব্যাপী বা পৃথিবীব্যাপী হয়। কিন্তু

ইট, চুন, বালি ইত্যাদি দ্রব্যগুলি এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় প্রেরণ করিতে উহাদের দামের তুলনায় খরচ বেশী পড়ে। সেই কারণে উহাদের ক্রয়-বিক্রয় দেশের নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

ঘ। সহজে চেনার যোগ্যতাঃ যে-সকল দ্রব্যের গুণাগুণ অনুসারে সহজেই নামের স্তর পৃথক করা যায় এবং বুঝিয়া লওয়া যায় তাহাদের বাজার বিস্তীর্ণ হয়। মূল্যবান ধাতু বা কোম্পানীর কাগজপত্রের গুণাগুণ সহজেই চেনা যায়। ক্রেতারা এই সকল দ্রব্যের ক্রমানুপাত (grade) উল্লেখ করিয়া এক জায়গা হইতে অন্যত্র মাল-যোগানের আদেশ (order) পেশ করিতে পারে। এই কারণেই উহাদের বাজার খুব বড় হয়।

ঙ। গুণের তারতম্য অনুসারে শ্রেণীবিভাগ ও নমুনা দেখিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধাঃ যে-সকল দ্রব্য গুণের তারতম্য অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা যায় এবং যে-সকল ক্ষেত্রে নমুনার ভিত্তিতে দ্রব্য কেনা-বেচা সম্ভব হয়, সেই সকল দ্রব্যই সহজে স্থানান্তর করা যায় এবং উহাদের বাজার ব্যাপক হইবে। তুলা, চা, গম, পাট ইত্যাদি দ্রব্যগুলি গুণানুসারে শ্রেণীবিভাগ করা যায় এবং নমুনার ভিত্তিতে উহাদের কেনা-বেচা সম্ভব হয়। এই কারণেই উহাদের বাজার দেশব্যাপী বা পৃথিবীব্যাপী পাইয়া থাকে।

চ। অন্যান্য উপাদানঃ ইহা ছাড়া, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা, ব্যবসায়ের অবস্থা, সরকারের রাজস্বনীতি ইত্যাদিও বাজারের আয়তনকে প্রভাবান্বিত করে। যেমন—বিলাস-দ্রব্যের ব্যাপারে আমদানি বা করের সুবিধা দিলে উহাদের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজার বড় হয়।

৩. **বাজারের প্রকারভেদ** (Forms or Morphology of Markets)ঃ বাজারের শ্রেণীবিভাগ বিভিন্নভাবে করা যাইতে পারেঃ

ক. **পরিধি অনুসারে শ্রেণীবিভাগঃ** আয়তন বা পরিধি অনুসারে বাজার স্থানীয় (local), জাতীয় (national) ও আন্তর্জাতিক (internationl) হইয়া থাকে। যে-সকল দ্রব্যের বাজার দেশের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইসকল দ্রব্যের বাজারকে 'স্থানীয় বাজার' বলা হইবে। পচনশীল দ্রব্যের বাজার 'স্থানীয়'। কারণ উহাদের ক্রয়-বিক্রয় দেশের কোন নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। তরিতরকারি, মাছ, ডিম, দুধ ইত্যাদি দ্রব্যগুলির বাজার 'স্থানীয়'। আবার কতকগুলি দ্রব্য আছে যেগুলি সারা দেশব্যাপী কম-বেশী প্রায় একই দামে ক্রয়-বিক্রয় হয় অথচ বিদেশে বিশেষ চালান করা যায় না, উহাদের বাজার 'জাতীয় বাজার'। জাতীয় বাজার কোন দেশের সকল অঞ্চলের লোকেরা দ্রব্যটি ক্রয়-বিক্রয় করে; যেমন—বোম্বাইয়ের মিলের কাপড় বা কাশ্মীরের ফল বা ভোজ্য তৈল বা শিশুদের দুগ্ধজাত দ্রব্য বা ভোগ্যপণ্য ভারতের সর্বত্রই বিক্রয় হয়। বর্তমানে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারের ফলে কোন কোন দ্রব্য (সোনা, চা, পাটজাত-দ্রব্য ইত্যাদি) পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ক্রয়-বিক্রয় চলে; যেমন—

ভারতের পাটজাত দ্রব্য বা চা বা আকরিক লোহ, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জাপান প্রভৃতি দেশে বিক্রয় চলে; এই ধরনের দ্রব্যের বাজারকে 'আন্তর্জাতিক বাজার' বলে।

খ. **দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণীবিভাগ:** বাজারে যে-সকল দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়, উহাদের প্রকৃতিকে ভিত্তি করিয়া বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। চাল, পাট, কাঁচা তুলা, খনিজ ধাতু (যেমন—সোনা, রূপা) ইত্যাদি প্রধান প্রধান পণ্যের বাজারকে 'পণ্যের বাজার' (produce market or produce exchange) বলা হয়; যেমন—কলিকাতার পাটের বাজার বা বোম্বাইয়ের তুলার বাজার। আবার দেশের প্রধান প্রধান স্থানে বড় বড় যৌথ মূলধনী কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়, উহাকে 'শেয়ার বাজার', (share market or stock exchange) বলা হয়; যেমন কলিকাতার শেয়ার বাজার বা বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজার।

গ. **সময়-মেয়াদ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ:** অধ্যাপক মার্শাল সময়-মেয়াদের তারতম্যকে ভিত্তি করিয়া বাজারকে চার শ্রেণীতে ভাগ করিয়া আলোচনা করেন:

১। অতি স্বল্পমেয়াদী বাজার (Very Short period Market): যে-ধরনের বাজারে কোন দ্রব্যের যোগান সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত বা সম্পূর্ণ স্থির থাকে তাহাকে 'অতি স্বল্পমেয়াদী বাজার' বলে। এই ধরনের বাজারে দ্রব্য যোগানের প্রকৃতি এমন থাকে যে বিক্রেতা তাহার দ্রব্যের যোগান পরিবর্তন করার কোন সুযোগ পায় না। সুতরাং এই বাজারে দ্রব্যের যোগান সম্পূর্ণ স্থির থাকে। চাহিদার ওঠা-নামার ফলে অতি স্বল্পমেয়াদী বাজারের দামের ওঠা-নামা ঘটে। একটি উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন একদিন দুধের বাজারে হঠাৎ দুধের চাহিদা হ্রাস পাইল, ফলে দুধের দাম হ্রাস পাইল। কারণ দুধ পচনশীল দ্রব্য বলিয়া দুধ বিক্রেতারা ঐদিন দুধ বিক্রয় বন্ধ করিতে পারে না। আবার, কোন একদিনের বাজারে—যেমন, কোন উৎসবের দিনে দুধের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে দুধের দামও বৃদ্ধি পাইবে। কারণ ঐ দিনের বাজারে দুধের যোগান হঠাৎ বাড়ানো যায় না। সংক্ষেপে বলা যায়, দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, তরিতরকারী ইত্যাদি পচনশীল দ্রব্যের (perishable goods) বাজার অতি স্বল্পমেয়াদী বাজার। সাধারণভাবে একদিনের বা কয়েকদিনের বাজারকে অতি স্বল্পমেয়াদী বাজার বলা যাইতে পারে।

২। স্বল্পমেয়াদী বাজার (Short-peroid Market): স্বল্পমেয়াদী বাজারে ফার্মগুলি উহাদের বর্তমান যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম (existing machineries and equipment) পরিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া দ্রব্যের যোগান যতখানি পরিবর্তন করিতে পারে যোগান ততখানি পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। উহারা নূতন নূতন যন্ত্রপাতি লইয়া সর্বাধিক বৃহদাকারে উৎপাদন করার সুযোগ পায় না অর্থাৎ উৎপাদনের আয়তন (production scale) অপরিবর্তিত থাকে। ইহা ছাড়া, শিল্পে নূতন ফার্ম প্রবেশ করিয়া উৎপাদন শুরু করিবার অবকাশ পায় না।

সুতরাং এই ধরনের বাজারেও চাহিদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া দ্রব্যের যোগান বাড়ানো সম্ভব হয় না।

৩। দীর্ঘমেয়াদী বাজার (Long-period Market) ঃ দীর্ঘমেয়াদী বাজারে সময়-মেয়াদ এত দীর্ঘ হয় যে দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া দ্রব্যের যোগান পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। দীর্ঘমেয়াদী অবস্থায় কোন ফার্ম নূতন ধরনের যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল প্রয়োগ করিয়া পূর্বাপেক্ষা বৃহদাকারের উৎপাদন করার সুযোগ পায়। ইহা ছাড়া, কোন শিল্পে নূতন ফার্ম প্রবেশ করিয়া উৎপাদন বাড়াইবার সময় পায়। সুতরাং দীর্ঘমেয়াদী অবস্থায় উপরি-উক্ত দুইটি কারণে দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পায়। ফলে দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় বলিয়া দ্রব্যাদির দাম বিশেষ বৃদ্ধি পায় না।

৪। অতি দীর্ঘমেয়াদী বাজার (Very Long-period Market) ঃ এইরূপ বাজারের সময়-মেয়াদ এত দীর্ঘ হয় যে সাধারণদীর্ঘমেয়াদী বাজারে যে-সকল পরিবর্তন ঘটে উহা অপেক্ষা আরও সুদূরপ্রয়াসী পরিবর্তন ঘটে ; যেমন—একযুগ হইতে অন্য যুগে মানুষের রুচি ও অভ্যাসের পরিবর্তন, মূলধন যোগানের পরিবর্তন, জনসংখ্যা এবং ইহা যে-সকল বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে উহাদের পরিবর্তন, নূতন নূতন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন, নূতন দেশের আবিষ্কার ইত্যাদি বিষয়গুলি ঘটিতে পারে। এইসকল প্রভাবের ফলে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন ঘটে এবং ইহার ফলে দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তন ঘটে। এই ধরনের বাজার প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে।

ঘ. প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ ঃ প্রত্যেক দ্রব্যের বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা—এই দুইটি পক্ষ থাকে। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের চাহিদা ও যোগানের প্রভাবের ফলে বাজারে দাম নির্ধারিত হয়, কিন্তু বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সংখ্যা ও প্রতিযোগিতার তারতম্য হইতে পারে। এই তারতম্যের জন্য বাজারের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। এই বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ, বিভিন্নরূপ বাজারে দাম-নির্ধারণের সূত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। যেমন—পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে দাম-নির্ধারণের ক্ষেত্রে এক ধরনের শক্তি কাজ করে, কিন্তু একচেটিয়া বাজারে আবার অন্য ধরনের শক্তি কাজ করে। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের বিভিন্ন রূপগুলি এখন আলোচনা করা হইল ঃ

১। **পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা (Perfect Competition) ঃ** পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে পূর্ণাঙ্গ বাজারের (perfe t market) বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

ক. বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা ঃ পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বহুসংখ্যক বিক্রেতা থাকে, অর্থাৎ এই ধরনের দ্রব্যের বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা দ্রব্যটি ক্রয় করে এবং বহু সংখ্যক বিক্রেতা দ্রব্যটি বিক্রয় করে। ক্রেতারা বহুসংখ্যক বলিয়া কোন একজন ক্রেতা বাজার যোগানের এক সামান্যতম অংশ ক্রয় করে।

আবার বিক্রেতার সংখ্যা বহু হয় বলিয়া কোন একজন বিক্রেতা বাজার-যোগানের অতি সামান্যতম অংশ বিক্রয় করে। ইহার ফলে ক্রেতা বা বিক্রেতা কেহই এককভাবে বাজার যোগান নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না।

খ. সমজাতীয় দ্রব্য ঃ প্রত্যেক বিক্রেতাই একই ধরনের সমগুণবিশিষ্ট (homogeneous) একই দ্রব্য বিক্রয় করে। বিক্রেতাদের দ্রব্যের মধ্যে কোনরূপ কাল্পনিক বা বাস্তব পার্থক্য নাই। ইহার ফলে বিক্রেতাদের দ্রব্যগুলি একটি অপরটির পূর্ণ পরিবর্তক দ্রব্য (perfectly substitute) হিসাবে গণ্য হয়।

গ. ক্রেতার পক্ষপাতিত্বের অভাব ঃ প্রত্যেক বিক্রেতা একই ধরনের একটি দ্রব্য বিক্রয় করে বলিয়া ক্রেতারা যে-কোন বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারে। দ্রব্য ক্রয় করার ব্যাপারে কোন বিক্রেতার দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের কোন পক্ষপাতিত্ব থাকে না ; অর্থাৎ ক্রেতারা যে-কোন বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারে। অনুরূপভাবে, বিক্রেতারাও প্রত্যেক ক্রেতার নিকট একই বাজার দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকিবে।

ঘ. এককভাবে বাজার-যোগান ও বাজার-দামের উপর বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণের অভাব ঃ এই ধরনের বাজারে বহুসংখ্যক ফার্ম একই দ্রব্য উৎপাদন করে বলিয়া কোন একজন বিক্রেতা বাজার-যোগানের অতি সামান্যতম অংশ যোগান দিয়া থাকে। দ্রব্যটির মোট যোগানের উপর এককভাবে তাহার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ইহার ফলে প্রত্যেক বিক্রেতাকেই বাজারে দ্রব্যটির যে দাম নির্ধারিত হয়, সেই দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে হয় ; অর্থাৎ, কোন একজন বিক্রেতা কমই বা বেশী যোগান দিক না কেন তাহাকে দ্রব্যটির সমুদয় অংশ একই দামে বিক্রয় করিতে হয়। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন একজন বিক্রেতা নিজে দ্রব্যটির দাম পরিবর্তন করিতে পারে না ; সে শুধু বাজার হইতে দাম জানিয়া বাজার-দামে দ্রব্যটি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার অবস্থায় কোন একটি ফার্ম শুধুমাত্র দাম-গ্রহণকারী (price taker) প্রতিষ্ঠান, দাম সৃষ্টিকর্তা (price maker) নহে।

ঙ, অবাধে আগমন বা বহির্গমন ঃ পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার অবস্থায় দীর্ঘকালীন সময়ে কোন নতুন ফার্ম বিনা বাধায় উৎপাদন শুরু করিয়া সংশ্লিষ্ট শিল্পে অবাধে প্রবেশ (free entry) করিতে পারে। এই সুযোগ থাকে বলিয়া প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে ফার্ম-এর সংখ্যা বেশী হইয়া থাকে। আবার ইচ্ছা করিলে কোন পুরাতন ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট শিল্প হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে। অবশ্য ইহা একমাত্র দীর্ঘমেয়াদী অবস্থায় হওয়া সম্ভব।

চ ক্রেতা ও বিক্রেতার পূর্ণ জ্ঞান ঃ এই ধরনের প্রতিযোগিতার অবস্থায় বাজারের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে প্রত্যেক ক্রেতার ও বিক্রেতার পরিপূর্ণ জ্ঞান

থাকে ; অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রেতা ও বিক্রেতা দ্রব্যটির দাম সঠিক ভাবে জানে। ইহার ফলে বাজারে দ্রব্যটির শুধুমাত্র একটিই দাম থাকে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়।

ছ উপাদানের পূর্ণ সচলতা ঃ উৎপাদনের উপাদানসমূহের পূর্ণাঙ্গ সচলতা (perfect mobility of the factors of production) হইতেছে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য। জমি, শ্রম ও মূলধনের সচলতা থাকিবে ; অর্থাৎ ঐ উপাদানগুলি বিনা বাধায় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারিবে। কোন দ্রব্যের চাহিদার সঙ্গে উহার যোগানের সঙ্গতি রাখার জন্য এইরূপ সচলতার প্রয়োজন পড়ে। দ্রব্যটির চাহিদা যখন ইহার যোগান অপেক্ষা বেশী হইবে তখন ফার্মগুলি নূতন উপাদানসমূহ নিয়োগ করিয়া উৎপাদন বাড়াইবে এবং যখন দ্রব্যটির যোগান ইহার চাহিদা অপেক্ষা বেশী হইবে তখন কর্মরত উপাদানগুলি ঐ শিল্প হইতে অন্য শিল্পে চলিয়া যাইবে। সুতরাং প্রতিযোগিতার অবস্থা বজায় রাখার জন্য উপাদানগুলির সচলতা প্রয়োজন।

জ. পরিবহণ-ব্যয়ের অনুপস্থিতি ঃ পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে দ্রব্যটি স্থানান্তরের জন্য কোনরূপ পরিবহণ ব্যয় (transport cost) পড়িবে না, অথবা পরিবহণ ব্যয় থাকিলেও উহার পরিমাণ এত সামান্য হইবে যে, বিক্রেতারা উহা উপেক্ষা করিতে পারিবে। পরিবহণ ব্যয় থাকিলে বাজারের বিভিন্ন অংশে দ্রব্যটির ভিন্ন ভিন্ন দাম হইবে।

উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বাস্তব জগতে কোন দ্রব্যের বাজারে খুবই কম দেখা যায়। মোটামুটিভাবে কৃষিপণ্যের (যেমন—চাল, গম, পাট, চা, তুলা ইত্যাদি) বাজারে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি কম-বেশী দেখা যায়। উপরি-উক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচটি পূরণ হইলে বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা (pure competition) দেখা দিবে। নিখুঁত প্রতিযোগিতার সঙ্গে অন্য কয়টি শর্ত যোগ দিলে পাওয়া যাইবে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা। তবে ফার্ম-এর ভারসাম্য দাম ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই দুই প্রকার প্রতিযোগিতার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। তাই অর্থবিদ্যাবিদগণ ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখেন না। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা সম্পর্কে ১৮ অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

২। **একচেটিয়া বাজার** (Monopoly Market) ঃ একচেটিয়া বাজারে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় ঃ

ক. **একটিমাত্র ফার্ম** ঃ একচেটিয়া বাজারে শুধুমাত্র একজন বিক্রেতা থাকে এবং একচেটিয়া অবস্থায় একটি শিল্পে একটি মাত্র ফার্ম দ্রব্যটি বাজারে যোগান দেয় বা ঐ একটি মাত্র ফার্ম দ্রব্যটি উৎপাদন করে। ইহার ফলে দ্রব্যের যোগানের উপর একচেটিয়া ব্যবসায়ীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা থাকে।

খ. **যোগানের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ :** বিক্রেতাটি যে-দ্রব্য বিক্রয় করে, তাহা অন্য কোন বিক্রেতা বিক্রয় করে না বা একচেটিয়া উৎপাদনকারী যে-দ্রব্যটি উৎপাদন করে, তাহা অন্য কোন উৎপাদনকারী উৎপাদন করে না। একচেটিয়া ব্যবসায়ীর দ্রব্যটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং ইহার কোন বিকল্প দ্রব্য (substitute) থাকিতে পারে না।

গ. **দাম সৃষ্টিকর্তা :** একচেটিয়া অবস্থায় দ্রব্যের যোগান একচেটিয়া বিক্রেতা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এই কারণে দ্রব্যের যোগানের উপর তাহার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। সে দ্রব্যের যোগান বাড়াইলে বাজারে দ্রব্যটির যোগান বৃদ্ধি পায়, ফলে দ্রব্যটির দাম হ্রাস পায়। আবার সে দ্রব্যের যোগান হ্রাস করিলে বাজারে দ্রব্যটির যোগান হ্রাস পায়, ফলে দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেখা যায়, একচেটিয়া বিক্রেতা হইতেছে দাম সৃষ্টিকর্তা (price maker)।

ঘ. **শিল্পে প্রবেশের বাধা :** একচেটিয়া অবস্থায় নূতন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে না। দ্রব্যটি উৎপাদনের পক্ষে অপরিহার্য কাঁচা মালের উৎস একচেটিয়া ব্যবসায়ীর সম্পূর্ণ করায়ত্তে থাকার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাহার স্বার্থ সুরক্ষিত হওয়ায় নূতন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করিয়া উৎপাদন শুরু করিতে পারে না।

উপরে যে-বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করা হইল তাহা নিখুঁত একচেটিয়া বাজারের (pure monopoly market) বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে, বাস্তব জগতে 'নিখুঁত একচেটিয়া বাজার' একরূপ দেখা যায় না বলিলেই চলে। একচেটিয়া ব্যবসায়ীর দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্যও থাকে এবং ইহাকে অন্যান্য ব্যবসায়ীর সহিত প্রতিযোগিতাও করিতে হয়। যেমন, 'দি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন' কলিকাতা মহানগরীতে বিদ্যুৎ সবরাহের ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। কিন্তু বিদ্যুতেরও বিকল্প দ্রব্য আছে, যেমন—গ্যাস, মোমবাতি তেলের বাতি ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে একচেটিয়া অবস্থায় একটি মাত্র ফার্ম দ্রব্যটি যোগান দেয় এবং তাহার দ্রব্যের কোন 'ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্য' (close substitutes) থাকে না। একচেটিয়া বাজার সম্পর্কে ১৯ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

৩. **দ্বি-বিক্রেতার বাজার বা ডুয়োপলি (Duopoly) :** যখন মাত্র দুই জন বিক্রেতা কোন দ্রব্যের যোগান দিয়া থাকে, তখন ঐ বাজারকে 'দ্বি-বিক্রেতার বাজার', বা ডুয়োপলি (Duopoly) বলা হইবে। যেমন ১৯৬৫ সালের মনোপলি অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্ট হইতে জানা যায়, ভারতে দুইটি মাত্র ফার্ম সেলাই-এর কলে ব্যবহৃত সূচ (sewing needles) তৈয়ারী করিত।

৪. **মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিক্রেতার বাজার বা অলিগোপলি (Oligopoly) :** 'অলিগোপলি' বাজারে কয়েকজন মাত্র বিক্রেতা কোন একটি দ্রব্য যোগান দিয়া থাকে। যেমন—আমাদের দেশে কয়েকটি মাত্র ফার্ম মোটরগাড়ী

নির্মাণ করে। অলিগোপলি আবার দুই প্রকারের : (ক) নিখুঁত অলিগোপলি : যখন মাত্র কয়েকজন উৎপাদক একই দ্রব্য উৎপাদন করে এবং উহাদের দ্রব্যের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য থাকে না তখন উহা 'নিখুঁত অলিগোপলি' (pure oligopoly) বলিয়া গণ্য হয়; যেমন—ভারতে পূর্বে কয়েকটিমাত্র ফার্ম পেট্রোল যোগান দিত। (২) পৃথকীকৃত অলিগোপলি : এই ধরনের অলিগোপলি বাজারে কয়েকটি মাত্র উৎপাদক দ্রব্য উৎপাদন করে, কিন্তু উহাদের দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য থাকে বা পার্থক্য করা হয়। যেমন, আমাদের দেশে কয়েকটি মাত্র ফার্ম মোটরগাড়ী নির্মাণ করে। কিন্তু উহাদের দ্রব্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে। এই ধরনের বাজারে সাধারণত উৎপাদকের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারা দাম স্থির করা হয়।

৫। **একচেটিয়া-ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা (Monpolistic Competition)** : এই ধরনের বাজারে বহু উৎপাদক বা বিক্রেতা থাকে, কিন্তু তাহাদের দ্রব্যের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। বিভিন্ন উৎপাদক ভিন্ন ভিন্ন ট্রেড মার্ক বা পেটেন্ট-এর সাহায্যে একই দ্রব্য বিভিন্ন নামে উৎপাদন করে। যেমন, স্নানের সাবান বিভিন্ন ফার্ম বিভিন্ন নামে তৈয়ারী করিয়া বাজারে বিক্রয় করে—মার্গো সাবান, লাক্স সাবান, সিন্থল, হামাম, রেক্সোনা ইত্যাদি। এই ধরনের বাজারে একচেটিয়া ও প্রতিযোগিতার অবস্থা একই সঙ্গে থাকে; যেমন—যে-কোম্পানী 'লাক্স' (LUX) মার্কাযুক্ত সাবান তৈয়ারী করে, শুধুমাত্র সেই কোম্পানী 'লাক্স' নামযুক্ত সাবান বাহির করিতে পারিবে। সুতরাং এখানে উৎপাদনের ব্যাপারে উৎপাদনকারীর একচেটিয়া অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু বাজারে আরও অন্য অনেক সাবান-প্রস্তুতকারী ফার্ম থাকার ফলে উহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। এই কারণেই এই ধরনের বাজারকে 'একচেটিয়া-ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা' বলে। বাস্তবজগতে টুথপেস্ট, সাবান, ব্লেড, কলম ইত্যাদি উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের বাজার দেখা যায়। কারণ, এই সকল দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে উৎপাদকের সংখ্যা বহু থাকে এবং উহারা স্বতন্ত্র পেটেন্ট-নামে উহা উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করে।

৬। **অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা (Imperfect Competition)** : পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে যে-সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাহার কোন একটির অভাব ঘটিলে বাজার অপূর্ণাঙ্গ হয়। অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতিষ্ঠানের বা বিক্রেতার সংখ্যা খুব অল্প থাকে এবং উহাদের দ্রব্যের মধ্যে গুণগত বা অন্যরূপ পার্থক্য থাকে। 'পৃথকীকৃত দ্রব্য' (differentiated product) অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। 'পৃথকীকৃত দ্রব্যের' অর্থ হইল, বিক্রেতাদের দ্রব্যের মধ্যে কোন-না-কোন পার্থক্য থাকে। যেমন—লেখার কালি বিভিন্ন নামে বাজারে প্রচলিত আছে—সুলেখা কালি, কুইংক কালি, চালপার কালি ইত্যাদি। উৎপাদকরা ভিন্ন ভিন্ন মার্কা-যুক্ত দ্রব্য বিক্রয় করে। এই কারণেই প্রত্যেক বিক্রেতাই তাহার দ্রব্যটি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (advertisement) দেয় এবং বিজ্ঞাপনের জন্য অর্থ ব্যয় করে। 'অলিগোপলি'

ও 'একচেটিয়া-ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা' হইতেছে অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত।

৭। **একচেটিয়া ক্রেতা বা মনোপ্‌সনি** (Monopsony): যখন কোন দ্রব্যের বাজারে মাত্র একজন ক্রেতা থাকে, তখন ঐ ধরনের বাজার 'একচেটিয়া ক্রেতার বাজার' (monopsony) নামে অভিহিত হয়। এই ধরনের বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা থাকায় দাম-নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিক্রেতা অপেক্ষা ক্রেতার প্রাধান্য বেশী পরিলক্ষিত হয়। ভারতে রেল-কর্তৃপক্ষ একচেটিয়া ক্রেতার একটি দৃষ্টান্ত। রেলওয়ে-ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ বহু উৎপাদক যোগান দেয়, কিন্তু উহা ক্রয় করে কেবলমাত্র ভারতীয় রেল-কর্তৃপক্ষ।

৮। **দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার** (Bi-lateral Monopoly): একই বাজারে একচেটিয়া বিক্রেতা এবং একচেটিয়া ক্রেতা থাকিলে উহা দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার হইবে, অর্থাৎ যখন কোন একটি দ্রব্য মাত্র একজন ক্রেতা ক্রয় করে ও মাত্র একজন বিক্রেতা বিক্রয় করে, তখন ঐ বাজারে দ্বি-পাক্ষিক একচেটিয়া বাজার হইবে। যেমন,—ভারতে টেলিফোনের তার তৈয়ার করে একমাত্র হিন্দুস্থান কেবল্ কারখানা এবং উহা ক্রয় করে কেবলমাত্র ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ।

দ্রব্যানুযায়ী দৃষ্টান্ত: কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের বাজার (ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে) কিরূপ হইয়া থাকে, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে:

(1) বনস্পতি—ইহার বাজার হইতেছে পৃথকীকৃত অলিগোপলি। কারণ এই দ্রব্যটি কয়েকটি মাত্র ফার্ম উৎপাদন করে এবং উহাদের দ্রব্যের মধ্যে নানারূপ পার্থক্য দেখা যায়।

(2) পেট্রোল—ভারতে বর্তমানে শুধুমাত্র একটি সরকারী সংস্থা যোগান দেয়। সুতরাং ইহা সরকারী একচেটিয়া সংস্থার দৃষ্টান্ত।

(3) বিদ্যুৎ-যোগান—কলিকাতা শহরে শুধুমাত্র কলিকাতা বিদ্যুৎ-যোগান সংস্থা বিদ্যুৎ যোগান দেয়, সুতরাং ইহা একচেটিয়া কারবারের দৃষ্টান্ত। শহরতলীতেও ইহা শুধুমাত্র 'রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ' যোগান দিয়া থাকে।

(4) কলিকাতায় ক্ষৌরকারের সেবাকার্য—কলিকাতা শহরে বহুসংখ্যক ক্ষৌরকার দেখা যায় এবং উহাদের সেবাকার্য প্রায় এক ধরনের। সুতরাং এক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতি-যোগিতা দেখা যায়।

(5) টুথপেস্ট—ইহার ক্ষেত্রে একচেটিয়া-ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা দেখা যায়। কারণ এই দ্রব্যটি আমাদের দেশে বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করে এবং উহাদের দ্রব্যাদির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়, যেমন—ফরহ্যান্স, কলগেট, বিনাকা, নিম ইত্যাদি নামের ভিন্ন ভিন্ন মার্কাযুক্ত টুথপেস্ট।

(6) চাল—পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা, কারণ বহুসংখ্যক কৃষক একই মানের চাল উৎপাদন করিয়া থাকে।

(7) তামাক—পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা, কারণ বহুসংখ্যক তামাক-উৎপাদনকারী একই মানের তামাক উৎপাদন করিয়া থাকে।

(8) সিগারেট—পৃথকীকৃত অলিগোপলি; কারণ কয়েকটি মাত্র ফার্ম ভিন্ন ভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেট প্রস্তুত করিয়া থাকে।

(9) গাড়ীর টায়ার—পৃথকীকৃত অলিগোপলি; কারণ কয়েকটি মাত্র ফার্ম ভিন্ন ভিন্ন নামে গাড়ীর টায়ার প্রস্তুত করে, যেমন—গুডইয়ার টায়ার, ডানলপ টায়ার, সিয়েট্ টায়ার ইত্যাদি।

(10) শীতল পানীয়—পৃথকীকৃত অলিগোপলি, কারণ কয়েকটি মাত্র ফার্ম কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন নামে ইহা তৈয়ারী করে, যেমন—থামস্ আপ্, লিম্কা, গোল্ডস্পট, ইত্যাদি।

(11) কলিকাতায় টেলিফোনের সেবাকার্য—সরকারী একচেটিয়া কারবার।

(12) ডিম—পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা।

(13) বেকারীর দ্রব্যাদি—একচেটিয়া-ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা।

(14) দূরদর্শন সেট্—পৃথকীকৃত অলিগোপলি।

(15) টাইপ-করার যন্ত্র নির্মাণ—পৃথকীকৃত অলিগোপলি।

(16) কৃষি-যন্ত্রপাতি—পৃথকীকৃত অলিগোপলি।

(17) ক্ষৌরকার্যের ব্লেড—একচেটিয়া-ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা।

(18) মহিলাদের পোশাক—একচেটিয়া-ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা।

(19) ঔষধ-নির্মাণ—বিশেষ বিশেষ ঔষধের ক্ষেত্রে একচেটিয়া পরিস্থিতি দেখা গেলেও সাধারণভাবে পৃথকীকৃত অলিগোপলি।

(20) চিকিৎসা-সেবাকার্য—একচেটিয়া-ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা।

(21) কলিকাতায় দুগ্ধ-যোগান—বর্তমানে দুইটি প্রধান সংস্থা কলিকাতা মহানগরীতে দুধের যোগান দেয়। সুতরাং ইহা ডুয়োপলির দৃষ্টান্ত।

(22) (ভারতে) বিমান-পরিবহণ—সরকারী একচেটিয়া কারবার।

(23) গম—পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা।

(24) ইক্ষু—পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা।

(25) (ভারতে) বীমা-ব্যবসা—সরকারী একচেটিয়া।

8. বাজারে প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রবেশ (Entry of firms into the market) ঃ কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের নিকট বাজার হইতেছে একটি অন্যতম প্রধান কর্মস্থল। ইহাকে ক্রয় ও বিক্রয়—উভয় প্রকার কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য বাজারে প্রবেশ করিতে হয়। উপাদানের বাজারে (factor market) ইহারা প্রবেশ করে উৎপাদনের উপকরণ অর্থাৎ কাঁচামাল, মূলধন, শ্রম ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য। আবার, দ্রব্যের বাজারে (commodity market) আসিতে হয় উৎপাদিত পণ্য-বিক্রয়ের জন্য।

নূতন ফার্ম-এর পক্ষে বাজারে অনুপ্রবেশ সব সময় সম্ভব নয়। স্বল্পমেয়াদী অবস্থায় সময়-মেয়াদ এত কম যে কোন নূতন ফার্ম উৎপাদনের বাজারে অর্থাৎ

শিল্পে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় একমাত্র দীর্ঘকালীন সময়ে কোন নূতন ফার্ম কখনও কখনও ব্যবসা বা উৎপাদন শুরু করার উৎসাহ পায়। বলা হয়, পুরাতন ফার্মগুলি পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় অস্বাভাবিক মুনাফা (excess profit অর্থাৎ স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত) উপার্জন করিলে স্বভাবত নূতন ফার্মগুলি ব্যবসা শুরু করিয়া উক্ত দ্রব্যের বাজারে অনুপ্রবেশ করিতে আকৃষ্ট হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় দীর্ঘকালীন সময়ে নূতন ফার্ম একরূপ অবাধে উৎপাদন বা ব্যবসা ক্ষেত্রে অর্থাৎ বাজারে অনুপ্রবেশের সুযোগ পায়।

কিন্তু বর্তমানকালে একমাত্র ক্ষুদ্র বা খুচরা ব্যবসায়ী ছাড়া বিনাবাধায় ব্যবসা শুরু করিতে পারে না। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসা শুরু করার জন্য নূতন ফার্মকে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হয়। ইহা ছাড়া, মূলধনের স্বল্পতা বা কাঁচামালের ঘাটতি ইত্যাদি কারণেও ব্যবসা শুরু করার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ঐরূপ অনুপ্রবেশ সম্ভব হয় না।

আবার, একচেটিয়া ব্যবসায়ে নূতন ফার্ম-এর অনুপ্রবেশের পথ একরূপ রুদ্ধ থাকে; কারণ অনেকক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসা আইন দ্বারা সংরক্ষিত হয়। যেমন, 'দি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই (ইণ্ডিয়া) করপোরেশন' কলিকাতা মহানগরীতে বিদ্যুৎ সরবরাহের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এইরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিদ্যুৎ-যোগানের জন্য নূতন ব্যবসা শুরু করা সম্ভব নয়। কারণ উক্ত সংস্থাটি আইন দ্বারা সংরক্ষিত। ইহা ছাড়া, নূতন ফার্ম গঠিত হইলে সামাজিক অপচয় ঘটিয়া থাকে, ইহার ফলে দ্বিতীয় কোন ফার্মকে উক্ত ব্যবসায়ের লাইসেন্স দেওয়া হয় না। সরকারের বাধানিষেধ থাকার জন্যও কোন নূতন ফার্ম-এর পক্ষে ইচ্ছামতো যে-কোন ব্যবসা শুরু করা সম্ভব হয় না। আজকাল মিশ্র অর্থব্যবস্থার (mixed economy) যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ চালু থাকে। ইহার ফলে, নূতন কোন ফার্ম দ্রব্যের বাজারে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করিলে উহাকে নানারূপে বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়।

॥ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কার্যক্রম ॥
[Economic Plan of the Business Firm]

Economic plan of a firm has two aspects—
purchase plan and sales plan.

—RYAN

১৩

॥ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়পরিকল্পনা —ভোগকারীর চাহিদা বিশ্লেষণ (১) ॥

[Sales Plan of the Firm—an analysis of Consumer's Demand (1)]

[ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় পরিকল্পনা—চাহিদা বলিতে কি বুঝায় ?—চাহিদা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ—চাহিদাসূচী ও চাহিদা রেখা—চাহিদা সূত্র বা চাহিদা-অপেক্ষক—চাহিদার সূত্রটির কারণ ও ব্যতিক্রম—চাহিদা রেখার ঢাল—চাহিদার পরিবর্তন ও উহার কারণসমূহ—চাহিদাসূচীর স্বরূপ— ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি—মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ—টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ—প্রান্তিক উপযোগ ও দাম—ভোগকারীর আয়ের বিলিবন্টন বা সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধি]

ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা কার্যক্রম (economic plan of the firm) দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লইয়া গঠিত—বিক্রয়-পরিকল্পনা (sales plan) এবং ক্রয়-পরিকল্পনা (purchase plan)। বিক্রয়-পরিকল্পনা বলিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উহার উৎপাদিত পণ্য বা সেবাকার্য বাজারে বিক্রয়ের জন্য যে কর্মসূচী বা কার্যক্রম প্রণয়ণ করে তাহাকেই বুঝায়। আবার ক্রয়-পরিকল্পনা (purchase plan) বলিতে উৎপাদনের জন্য উপাদানের বাজার হইতে উপকরণ (inputs) ক্রয়ের জন্য যে কার্যক্রম তৈয়ার করে তাহাকেই বুঝায়। এই দুই প্রকার কাজ স্বতন্ত্র হইলেও উহারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই সম্পর্কে পূর্বেই কিছু আলোচনা করা হইয়াছে (১০৬ পৃঃ)। এখন এই দুইটি বিষয় অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত (sales and purchase decisions) পৃথকভাবে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়-সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। বিক্রয়-সিদ্ধান্ত-এর গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক (determinant) হইতেছে ক্রেতার চাহিদা। এই কারণে ক্রেতার চাহিদা (consumer's demand) প্রথমে আলোচনা করা হইল।

১ চাহিদা বলিতে কি বুঝায় ? (What is meant by Demand ?) ঃ মানুষের অভাববোধ ও দ্রব্যের উপযোগ হইতে চাহিদার উদ্ভব ঘটে। সাধারণ অর্থে 'চাহিদা' বলিতে কোন দ্রব্য বা সেবাকার্য পাইবার আকাঙ্ক্ষাকেই বুঝায়। কিন্তু অর্থবিদ্যায় নিছক আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলে না, চাহিদা বলিতে কার্যকর চাহিদাকে (effective demand) বুঝায়। যে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা আছে তাহাই হইতেছে কার্যকর চাহিদা—যেমন, কোন ব্যক্তির একটি মোটর গাড়ীর আকাঙ্ক্ষা আছে। ঐ আকাঙ্ক্ষা 'চাহিদা' বলিয়া গণ্য হইতে হইলে দেখিতে হইবে, ব্যক্তিটির গাড়ী ক্রয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা আছে কি-না—অর্থাৎ, তাহার মোটরগাড়ী ক্রয়ের ইচ্ছা এবং মোটরগাড়ী ক্রয়ের মতো টাকাকড়ি থাকিলেই ঐ আকাঙ্ক্ষা কার্যকর হইবে।

সুতরাং আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলিয়া গণ্য করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের উপস্থিতি প্রয়োজন ঃ (১) ক্রেতার ক্রয় করার ইচ্ছা ও (২) ক্রেতার ক্রয় করার ক্ষমতা।

অর্থবিদ্যায় চাহিদার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে, কোন দ্রব্যের দাম জানা না থাকিলে উহার চাহিদা জানা যাইবে না। প্রকৃতপক্ষে, চাহিদা বলিতে কোন একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যের চাহিদাকে বুঝায়। যেমন, চা-এর চাহিদা বলিতে চা-এর একটি নির্দিষ্ট দামে ক্রেতারা কি পরিমাণ চা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহাকে বুঝায়। সুতরাং কোন একটি দ্রব্যের নির্দিষ্ট দামে এবং নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতারা ঐ দ্রব্যটি যে-পরিমাণ ক্রয় করিতে চাহে, তাহাই হইবে চাহিদা ; যেমন—মনে করা যাউক, ৪০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম চা-এর দাম হইলে ক্রেতারা ১০ কিলোগ্রাম চা কিনিতে রাজী থাকে। সুতরাং ৪০ টাকা দামে চা-এর চাহিদা হইতেছে ১০ কিলোগ্রাম। ক্রেতা যে-দামে দ্রব্য কিনিতে ইচ্ছুক হয়, সেই দামকে চাহিদা-দাম (demand price) বলা হয়।

২. চাহিদা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ? (On which factors does Demand depend ?) ঃ কোন দ্রব্যের চাহিদা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে এবং ঐ বিষয়গুলির যে-কোন একটির পরিবর্তন ঘটিলে দ্রব্যটির চাহিদার পরিবর্তন ঘটিবে। ঐ বিষয়গুলি হইতেছে ঃ

ক। দ্রব্যটির দাম ঃ কোন দ্রব্যের চাহিদা প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ ভাবে উহার দামের উপর নির্ভর করে। দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার বিপরীতদিকে পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ দাম বাড়িলে চাহিদা কমে এবং দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে। এ-সম্পর্কটি 'চাহিদার সূত্রে' (Law of Demand) বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

খ। ক্রেতার আর্থিক আয় ঃ ক্রেতার আর্থিক আয় (money income) বৃদ্ধি পাইলে তাহার দ্রব্য-ক্রয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। আবার ক্রেতার আর্থিক আয় হ্রাস পাইলে তাহার দ্রব্য-ক্রয়ের ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে দ্রবের চাহিদাও হ্রাস পায়।

গ। ক্রেতার অভ্যাস ও রুচি ঃ কোন দ্রব্যের জন্য ক্রেতার পছন্দ ও রুচির পরিবর্তন হইলে ঐ দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন ঘটিবে। ইহা ছাড়া, ক্রেতার ভোগকর্ম সম্পর্কে অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটিলে দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন ঘটিবে। যেমন, ভারতে কিছুকাল পূর্বে চা-পানের বিশেষ চাহিদা ছিল না, কিন্তু বর্তমানে রুচি ও অভ্যাসের পরিবর্তনের ফলে আজ প্রায় দেশের প্রত্যেকেই চা পান করিতেছেন। ইহার ফলে চা-এর চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ঘ। সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির দাম ঃ কোন দ্রব্যের চাহিদা শুধু উহার দামের উপর নির্ভর করে না, উহার সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির দামের উপরও তাহা নির্ভর করে। যেমন—কোন দ্রব্যের চাহিদা উহার বিকল্প দ্রব্যের দামের উপর নির্ভর করে। চা ও কফি ইহারা পরস্পরে

বিকল্প দ্রব্য। চা-এর চাহিদা শুধু চা-এর দামের উপর নির্ভর করে না, ইহা কফির দামেরও উপর নির্ভর করে। কফির দাম হ্রাস পাইলে এবং চা-এর দাম স্থির থাকিলে চা-এর চাহিদা হ্রাস পাইবে। কারণ, তখন ভোগকারীরা চা-এর পরিবর্তে কফি পান করিতে শুরু করিবে। আবার, যে দ্রব্যগুলি একই সঙ্গে ব্যবহার করিতে হয় সেক্ষেত্রে একটির দাম বাড়িলে অন্যটির চাহিদা হ্রাস পাইবে। যেমন, মোটরগাড়ী ও পেট্রোল একই সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। মোটরগাড়ীর দাম বৃদ্ধি পাইলে মোটরগাড়ীর চাহিদা হ্রাস পাইবে এবং ফলে পেট্রোলের চাহিদা কমিয়া যাইবে।

৬। ক্রেতার সংখ্যা ঃ ক্রেতা বা ভোগকারীর সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির ঘটিলে দ্রব্যের চাহিদার সামগ্রিকভাবে দেশে হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেশে লোকসংখ্যা বাড়িলে দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে এবং লোকসংখ্যা কমিলে চাহিদা কমে।

উপরি-উক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোন দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হইতেছে উহার দামের পরিবর্তন। দ্রব্যের দাম ও ইহার চাহিদার মধ্যে যে সম্পর্ক দেখা যায় তাহা চাহিদা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আলাদা করিয়া আলোচনা করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে কোন দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে উহার চাহিদার পরিমাণে কিরূপ পরিবর্তন (changes in the quantity demanded) এবং দ্রব্যের দাম ছাড়া অন্যান্য বিষয় গুলির (ক্রেতার আয়, রুচি, পছন্দ ইত্যাদি) পরিবর্তনের ফলে চাহিদার কিরূপ পরিবর্তন (changes in demand) ঘটে তাহা আলাদা করিয়া বিশ্লেষণ করিতে হয়। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

৩. **চাহিদাসূচী ও চাহিদা রেখা (Demand Schedule and Demand Curve)** ঃ কোন দ্রব্যের দাম ও উহার চাহিদার পরিমাণে কিরূপ পরিবর্তন ঘটে তাহা দেখাইবার জন্য চাহিদা সূচী (demand schedule) তৈয়ার এবং চাহিদা রেখা (demand curve) অংকন করিতে হয়। সাধারণভাবে বলা হয়, ভোগকারীর অর্থাৎ পরিবারের আয়, পছন্দ, রুচি ইত্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির দাম কোনরূপে পরিবর্তন না ঘটিলে কোন দ্রব্যের দামের পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদার পরিমাণে বিপরীতদিকে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইলে উহার চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায় এবং দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইহা ব্যক্তিগত চাহিদা সূচী (individual demand schedule) এবং বাজার চাহিদা-সূচীতে (market demand schedule) দেখানো যাইতে পারে।

ব্যক্তিগত চাহিদা-সূচীতে কোন একজন ভোগকারী একটি দ্রব্য উহার বিভিন্ন দামে কি কি পরিমাণ চাহিদা করিবে তাহা দেখানো হয়। পরপৃষ্ঠায় একটি ব্যক্তিগত চাহিদা-সূচী দেওয়া হইল ঃ

ব্যক্তিগত চাহিদা-সূচী (Individual Demand Schedule)

চা-এর প্রতি কিলোগ্রাম দাম	চা-এর ব্যক্তিগত চাহিদার পরিমাণ (প্রতি মাসে)
৪০ টাকা	১০ কিলোগ্রাম
৩৫ ,,	১৫ ,,
৩০ ,,	২০ ,,

উপরে কাল্পনিক ব্যক্তিগত চাহিদা সূচী হইতে দেখা যায়, চা-এর দাম ৪০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম হইলে কোন একজন ভোগকারী মাসে ১০ কিলোগ্রাম চা ক্রয় করিতে চাহে, দাম ৩৫ টাকা হইলে চাহিদার পরিমাণ হয় ১৫ কিলোগ্রাম এবং ৩০ টাকা হইলে উহা হয় ২০ কিলোগ্রাম। সুতরাং দেখা যায়, চা-এব বিভিন্ন দামে একজন ক্রেতা কি কি পরিমাণ চা ক্রয় করিতে চাহে, তাহা চাহিদা সূচীতে দেখানো হয়। এই চাহিদা সূচী হইতে আরও দেখা যাইতেছে, দাম কম হইলে চাহিদার পরিমাণ বেশী হয় এবং দাম বেশী হইলে চাহিদার পরিমাণ কম হয়।

এই ব্যক্তিগত চাহিদা-সূচী হইতে 'বাজার চাহিদা সূচী' (market demand schedule) তৈয়ার করা হয়। বাজার চাহিদা-সূচীতে বাজারের সকল ক্রেতারা কোন একটি দ্রব্য উহাদের বিভিন্ন দামে কি কি পরিমাণ চাহিদা করে তাহা দেখানো হয়। সাধারণ ভাবে বলা যায়, সকল ক্রেতার আচরণ একই রূপ হইলে ক্রেতাদের ব্যক্তিগত চাহিদা-সূচীগুলি যোগ করিয়া বাজার চাহিদা-সূচী তৈয়ার করা যায়। ধরা যাউক, বাজারে ২০ জন ক্রেতা আছে, তাহা হইলে বাজার চাহিদা-সূচীটি নিম্নরূপ হইবে ঃ

বাজার চাহিদা-সূচী (Market Demand Schedule)

চা-এর প্রতি কিলোগ্রাম দাম	চা-এর বাজার-চাহিদার পরিমাণ (প্রতি মাসে)
৪০ টাকা	২০০ কিলোগ্রাম
৩৫ ,,	৩০০ ,,
৩০ ,,	৪০০ ,,

পূর্ব পৃষ্ঠার বাজার চাহিদা-সূচী হইতে দেখা যায়, বাজারের সকল ক্রেতা অর্থাৎ বিশজন ক্রেতা ৪০ টাকা দরে ২০০ কিলোগ্রাম চা চাহিদা করে, ৩৫ টাকা দরে বাজারে চাহিদা হয় ৩০০ কিলোগ্রাম এবং ৩০ টাকা দরে ৪০০ কিলোগ্রাম। ইহা হইতে দেখা যায়, কোন দ্রব্যের দাম বেশী হইলে উহার বাজার-চাহিদার পরিমাণ কম হয় এবং দাম কম হইলে বাজার-চাহিদার পরিমাণ বেশী হইবে।

চাহিদার পরিমাণ ও দাম-এর সঙ্গে এই সম্পর্কটি একটি রেখাচিত্রে দেখানো হয়ঃ
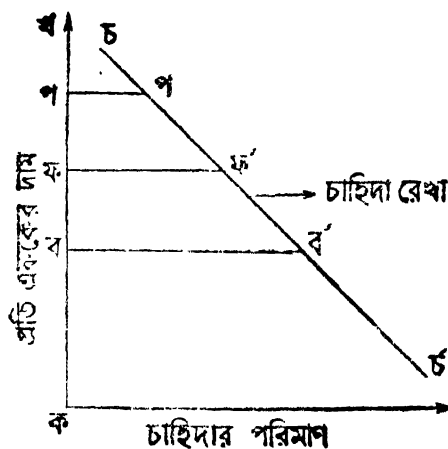
চিত্র ৬

উপরের রেখাচিত্রে **কখ** দ্বারা কোন একটি দ্রব্যের প্রতি এককের দাম এবং **কগ** দ্বারা উহার চাহিদার পরিমাণ দেখানো হইতেছে। বাজারের চাহিদা-সূচীর বিষয়গুলি এই রেখাচিত্রের উপর স্থাপন করিয়া বাজার চাহিদা-রেখা (market demand curve) অংকন করা যায়। চিত্রে দেখা যায়, দাম **কপ** হইলে চাহিদা হয় **পপ'**; দাম **কফ** হইলে চাহিদা হয় **ফফ'**, দাম **কব** হইলে চাহিদা হয় **বব'**। এখন **প'**, **ফ'** এবং **ব'** যোগ করিলে **চচ'** রেখাটি পাওয়া যায়; উহাই হইতেছে বাজার চাহিদা রেখা। সুতরাং দেখা যায়, বাজার চাহিদা রেখা অংকনের জন্য প্রথমে বাজার চাহিদা-সূচী প্রস্তুত করিতে হইবে এবং পরে ঐ সূচীর বিষয়গুলি দুই কক্ষ-বিশিষ্ট একটি রেখাচিত্রের উপর স্থাপন করিতে হয়। বিভিন্ন দামে দ্রব্যটির কি পরিমাণ চাহিদা হয় তাহা চিত্রে দেখাইয়া পরে উহা সংযোগ করিতে হয় এবং সংযোজিত রেখাটি হইবে বাজার চাহিদা-রেখা। চিত্রে দেখা যায়, চাহিদা রেখাটি বাম দিক হইতে ক্রমশ ডান দিক দিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে। ইহার দ্বারা বুঝানো হয়, দাম হ্রাস পাইলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। চাহিদা রেখাটি এইরূপ হওয়ার কারণগুলি

পরে 'চাহিদার সূত্র' অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে এবং চাহিদা রেখার আরও দুই-একটি বৈশিষ্ট্য পরে আলোচনা করা হইবে।

৪. **চাহিদার সূত্র বা চাহিদা অপেক্ষক (Law of Demand or Demand Function) ঃ** অধ্যাপক মার্শাল চাহিদার সূত্রটি বিশ্লেষণ করেন। চাহিদার সূত্রে বলা হয়, ক্রেতার রুচি ও পছন্দ, অভ্যাস, আর্থিক আয়, সময়-মেয়াদ, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির দাম ইত্যাদি বিষয়গুলির কোনরূপ পরিবর্তন না হইলে কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইলে উহার চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং দাম হ্রাস পাইলে উহার চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। এই সূত্রে কয়েকটি অনুমান (assumptions) ধরা হয় ঃ (ক) দামের পরিবর্তনের সঙ্গে ক্রেতার রুচি, পছন্দ, অভ্যাস ইত্যাদির কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। (খ) ক্রেতার আর্থিক আয় অপরিবর্তিত থাকিবে। (গ) দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের সঙ্গে উহার সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাটির (চা ও কফি, মোটর গাড়ী ও পেট্রোল ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির দৃষ্টান্ত) দামের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিবে না। উপরের অনুমানগুলি ধরিয়া লওয়া হইলে দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার চাহিদার বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটিবে। বাজার চাহিদাসূচী দ্বারা ইহা বুঝানো হইল ঃ

বাজার চাহিদা-সূচী (Market Demand-Schedule)

চা-এর প্রতি কিলোগ্রাম দাম	চা-এর মোট চাহিদা
৪০ টাকা	২০০ কুইন্টাল
৩৫ ,,	৩০০ ,,
৩০ ,,	৪০০ ,,

উপরের চা-এর বাজার চাহিদা-সূচী হইতে বলা যায়, চা-এর দাম ৪০ টাকা কিলোগ্রাম হইলে চা-এর মোট চাহিদা হয় ২০০ কুইন্টাল, ৩৫ টাকা দাম হইলে চাহিদা হয় ৩০০ কুইন্টাল এবং ৩০ টাকা দাম হইলে চাহিদা হয় ৪০০ কুইন্টাল। সুতরাং দেখা যায়, চা-এর প্রতি কিলোগ্রামের দাম হ্রাস পাইলে চা-এর চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। বিপরীত দিকে, চা-এর দাম বৃদ্ধি পাইলে চা-এর চাহিদা হ্রাস পায়। দ্রব্যের দাম ও উহার চাহিদার পরিমাণের মধ্যে ক্রিয়াগত সম্পর্কটি এইভাবে দেখানো যায় $D=f(P)$ অর্থাৎ চাহিদা হইতেছে দামের অপেক্ষক (function)।

গাণিতিক ভাষায় বিশ্লেষণ ঃ চাহিদার সূত্রটি গাণিতিক ভাষায় দেখানো হয়। উহা হইতেছে ঃ

$Qd_x=f(P_x, M, P_o, T)$

এখানে $Qd_x=x$-এর চাহিদার পরিমাণ

$P_x=x$-এর প্রতি একক দাম

M = ক্রেতার আর্থিক আয়

P_o = অন্যান্য বিষয়ের দাম

T = ক্রেতার রুচি

f = (*a function of*) ক্রিয়াগত সম্পর্ক বা নির্ভর করে।

M, P_o ও T এর উপর বার্ (*bar*) চিহ্ন দেওয়ার অর্থ হইতেছে, ওইগুলি অপরিবর্তিত থাকে।

সুতরাং উপরের সমীকরণটির অর্থ হইতেছে ক্রেতার আয়, অন্যান্য বিষয়ের দাম ও রুচি (অর্থাৎ M, P_o ও T) অপরিবর্তিত থাকিলে X-এর চাহিদার পরিমাণ ও উহার দামের সঙ্গে ক্রিয়াগত সম্পর্ক থাকিবে অর্থাৎ X-এর চাহিদার পরিমাণ উহার দামের উপর নির্ভর করিবে।[১]

চাহিদার সূত্রটি পূর্ব পৃষ্ঠার (১৪৩ পৃঃ) রেখাচিত্র দ্বারা দেখানো যাইতে পারে। ঐ রেখাচিত্রে **কখ** দ্বারা কোন একটি দ্রব্যের প্রতি এককের দাম এবং **কগ** দ্বারা উহার চাহিদা দেখানো হইতেছে। চিত্রে দেখা যায়, দাম **কপ** হইলে চাহিদা হয় **পপ´**, দাম **কফ** হইলে চাহিদা হয় **ফফ´** এবং দাম **কব** হইলে চাহিদা হয় **বব´**। এখন **প´, ফ´ ও ব´** যোগ করিলে **চচ´** রেখাটি পাওয়া যায়। উহাই হইবে বাজার-চাহিদা রেখা। চিত্রে দেখা যায়, চাহিদা রেখাটি বাম দিক হইতে ক্রমশ ডান দিকে নীচে নামিয়া আসিতেছে। ইহার দ্বারা বুঝানো হয়, দাম হ্রাস পাইলে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে।

চাহিদা সূত্রটির কারণসমূহঃ চাহিদা রেখাটি নিম্নগামী হওয়ার কারণ অর্থাৎ চাহিদার সূত্রটি কার্যকর হওয়ার কারণগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. **ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রয়োগ ঃ** চাহিদার সূত্রটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility)[২] হইতে আসিয়াছে। ঐ বিধিটি হইতে জানা যায়, কোন দ্রব্য বেশী পরিমাণে ভোগ করা হইলে উহার প্রান্তিক উপযোগ (marginal utility) কম হয় এবং দ্রব্যটির দাম উহার প্রান্তিক উপযোগের সমান হয় (প্রান্তিক উপযোগ বলিতে অতিরিক্ত এক একক ভোগ করা হইলে যে-অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায়, তাহাকেই বুঝায়। এ-সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইতেছে)। সুতরাং দাম কম না হইলে চাহিদা বেশী হইবে না, অর্থাৎ দাম কম হইলেই চাহিদা বেশী হইবে। আবার, দাম বেশী না হইলে চাহিদা কম হইবে না, অর্থাৎ দাম বেশী হইলে চাহিদা কম হইবে। ইহাকে "ভারসাম্যের প্রভাব" (equilibrium effect) বলা হয়।

২. **আয়-প্রভাব ঃ** কোন দ্রব্যের দামের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিলে আর্থিক আয় (money income) স্থির থাকে বলিয়া প্রকৃত আয়ের (real income) পরিবর্তন

১. Salvatore—*Microeconomic Thoery*, Chap. 2

২. এই বিধিটি পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

ঘটে। দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইলে আয় দ্বারা পূর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে দ্রব্যটি ক্রয় করা যায়। ইহার ফলে দাম হ্রাস পাইলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দাম বৃদ্ধি পাইলে আয় দ্বারা পূর্বাপেক্ষা কম ক্রয় করা যায়। ইহার ফলে দাম বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা হ্রাস পায়। এই প্রভাবকে 'আয়-প্রভাব' (income-effect) বলা হয়। সুতরাং দেখা যায়, আয়-প্রভাবের ফলে চাহিদার সূত্রটি কার্যকর হইতেছে।

৩. **পরিবর্তন-প্রভাব ঃ** চাহিদার সূত্রটির আর একটি কারণ হইতেছে 'পরিবর্তন-প্রভাব' (substitution effect)। কোন দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইলে ক্রেতারা অপেক্ষাকৃত অধিক দামের বিকল্প দ্রব্যের পরিবর্তে ঐ দ্রব্যটি অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে থাকে ; আবার কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইলে ঐ দ্রব্যের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম দামের বিকল্প দ্রব্য অধিক পরিমাণে ক্রয় করে। যেমন—কফির তুলনায় চা-এর দাম হ্রাস হইলে লোকেরা কফির পরিবর্তে চা অধিক পরিমাণে ক্রয় করিবে। ফলে, চা-এর চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। আবার, কফির তুলনায় চা-এর দাম বৃদ্ধি পাইলে লোকেরা চা-এর ভোগ কমাইয়া দিয়া অধিক পরিমাণে কফি কিনিবে। ফলে, চা-এর চাহিদা হ্রাস পাইবে। ইহাকে পরিবর্তন-প্রভাব বলে।

আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাবের সম্মিলিত প্রভাবকে দাম-প্রভাব (price effect) বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে চাহিদার সূত্রের মূলে রহিয়াছে দাম-প্রভাব।

৪. **ক্রেতার সংখ্যার পরিবর্তন ঃ** কোন জিনিসের দাম যখন হ্রাস পায় তখন যে-সকল লোকেরা দ্রব্যটি পূর্বে কিনিতে পারিত না তাহারা কিনিতে শুরু করিবে। ইহার ফলে দ্রব্যটির মোট চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। পক্ষান্তরে, জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাইলে কোন কোন ক্রেতারা আর জিনিসটি কিনিতে পারিবে না। সুতরাং দ্রব্যটির মোট চাহিদা হ্রাস পাইবে। এই সকল ক্রেতাকে প্রান্তিক ক্রেতা (marginal buyers) বলিয়া গণ্য করা হয়। কলিকাতায় টেলিভিশন নূতন চালু হওয়ার পর উহার দাম অত্যধিক থাকায় খুব কমসংখ্যক ক্রেতা উহা ক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু পরে উহার দাম হ্রাস পাওয়ায় ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতে দেখা যায়, কোন জিনিসের দামের পরিবর্তন ঘটিলে ক্রেতার সংখ্যা পরিবর্তন ঘটে এবং উহার ফলে মোট চাহিদার পরিবর্তন ঘটে।

৫. **দ্রব্যের ব্যবহারের পরিবর্তন ঃ** কোন দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে উহার ব্যবহারের পরিবর্তন হয় বলিয়া চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন ঘটে। যেমন—বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহারের দাম হ্রাস পাইলে উহা কম প্রয়োজনীয় কাজে (যেমন,—হিটার বা ইস্ত্রির জন্য ব্যবহার) কম ব্যবহার করা হইবে এবং উহার ফলে উহার চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পাইবে। পক্ষান্তরে, উহার দাম হ্রাস পাইলে সকল প্রকার কাজের জন্য উহা ব্যবহার করা হইবে এবং ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে।

চাহিদার সূত্রটি ব্যতিক্রম ঃ কতকগুলি ক্ষেত্রে চাহিদার সূত্রটি কার্যকর হয় না এবং ঐ সকল ক্ষেত্রে চাহিদা রেখাটি বাম দিক হইতে ক্রমশ ডান দিক দিয়া উপরে উঠিয়া যায়। ব্যতিক্রমের (exceptions) ঐ ক্ষেত্রগুলি নিম্নরূপ ঃ

ক। উচ্চমর্যাদাযুক্ত বা জাঁকজমকের দ্রব্য ঃ কতকগুলি দ্রব্য আছে যেগুলি নিছক ভোগের জন্য কেনা হয় না ; মর্যাদা বৃদ্ধি, জাঁকজমক বা আড়ম্বর দেখাইবার জন্য ঐগুলি ক্রয় করা হয়। ঐ শৌখিন দ্রব্যগুলির দাম বৃদ্ধি পাইলে উহাদের মর্যাদা-মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ফলে উহাদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। দামী পাথর, উচ্চ মূল্যের অলংকার, দামী কারুকার্যখচিত আসবাবপত্র, সর্বাধুনিক ইলেক্ট্রনিক ভোগ্যপণ্য ইত্যাদি অতিবিলাস দ্রব্যগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। এই দ্রব্যগুলিকে অধ্যাপক ভেব্লেন (Veblen) "জাঁকজমকের ভোগ্যপণ্য" (conspicuous consumption good) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে সূত্রটি সাধারণত কার্যকর হয় না।

খ। শেয়ার ও দ্রব্যের ফটকা বাজারে লেনদেন ঃ শেয়ার বাজারে লেনদেনের ক্ষেত্রে চাহিদা সূত্রটি প্রয়োগ করা যায় না। শেয়ার বাজারে দেখা যায়, কোন কোম্পানীর শেয়ারের দাম হ্রাস পাইতে থাকিলে উহা আরও হ্রাস পাইবে এই আশংকায় ঐ শেয়ারের চাহিদা হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে, শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উহা আরও বৃদ্ধি পাইবে এই আশায় লোকেরা ইহা অধিক সংখ্যায় ক্রয় করে। সুতরাং, শেয়ার বাজারে লেনদেনের ক্ষেত্রে চাহিদার সূত্রটির ব্যতিক্রম দেখা যায়। শেয়ার বাজারের ন্যায় অন্য দ্রব্যের বাজারেও দামের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে চাহিদার সূত্রটি কার্যকর হয় না।

গ। নিকৃষ্ট মানের দ্রব্য বা গিফেন্ প্রতিক্রিয়া ঃ নিকৃষ্ট মানের দ্রব্যের (inferior goods) ক্ষেত্রে চাহিদার সূত্রটি কার্যকর হয় না। মিঃ গিফেন (Giffen) দেখাইয়াছেন. কতকগুলি দ্রব্যের দাম কমিলে উহা কম কেনা হয়, আবার দাম বেশী হইলে উহা বেশী কেনা হয়। ঐসকল দ্রব্যকে নিকৃষ্ট মানের দ্রব্য বলা হয়। মিঃ গিফেন একটি উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইয়াছেন। ঐ উদাহরণটি এখানে দেওয়া হইল। আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা গরীব বলিয়া তাহারা আলু ও মাংস খাইয়া জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু আলুর দাম যখন বাড়ে, তখন তাহাদের প্রকৃত আয় (real income) এত বেশী কমিয়া যায় যে, তাহারা উচ্চ দামের মাংস আর ক্রয় করিতে পারে না। ফলে তাহারা মাংসের ভোগ কমাইয়া আলুর ভোগের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়। আবার আলুর দাম কমিলে তাহারা আলুর ভোগ কমাইয়া অপেক্ষাকৃত অধিক দামের মাংসের ভোগ বাড়াইয়া দেয়। সুতরাং আলুর চাহিদার ক্ষেত্রে চাহিদার সূত্রটি কার্যকর হইতেছে না ; এখানে আলু হইতেছে নিকৃষ্ট মানের দ্রব্য। এই অসাধারণ প্রভাবকে 'গিফেন প্রতিক্রিয়া' (Giffen effect) বলা হয়। এই প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায়, প্রধান আহার্য দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইলে ভোগকারীরা বাধ্য হইয়া অন্য সকল সামান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদির ক্রয় একরূপ বন্ধ করিয়া আর্থিক আয়ের প্রায় সবটা দ্বারাই চড়া দামের দ্রব্যটি বেশী পরিমাণে ক্রয় করে।

ঘ। নিছক দামের ভিত্তিতে দ্রব্য ক্রয় ঃ অধ্যাপক বামল (Prof. Baumol)

চাহিদার সূত্রের আর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করিয়াছেন।[১] কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, ক্রেতারা সরাসরি কোন দ্রব্যের মান বিচার করিতে পারে না এবং সেই সকল ক্ষেত্রে তাহারা দ্রব্যটির নিছক দাম-এর ভিত্তিতে উহার গুণাগুণ বিচার করে। এই সকল ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম অধিক হইলে ক্রেতার নিকট উহা উচ্চমানের বলিয়া গণ্য হয় এবং উহার জন্য উচ্চ দামে চাহিদা বেশী হয়। পক্ষান্তরে, দাম কম হইলে দ্রব্যটি নিম্নমানের বলিয়া গণ্য হয় এবং ফলে নিম্নদামে দ্রব্যটির চাহিদা কম হয়। এইক্ষেত্রেও চাহিদার সূত্রটি কার্যকর হয় না।

৫। **চাহিদা রেখার ঢাল (Slope of the Demand Curve)**ঃ কোন রেখার ঢাল বলিতে কতখানি খাড়াখাড়ি বা বক্রভাবে উহা নীচে নামে বা উপরে ওঠে (The slope of a line is a measure of steepness—*Baumol*) তাহাকেই বুঝায়। পূর্বেই দেখানো হইয়াছে, চাহিদা রেখা সাধারণত বামদিক হইতে আসিয়া ডানদিকে নীচে নামিয়া যায়। চাহিদা রেখার ঢাল (slope) সর্বদাই ঋণাত্মক (negative) হয়। কারণ দাম হ্রাস পাইলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। চাহিদা রেখার ঢাল পরিমাপের সূত্রটি হইতেছে ঃ

$$\text{চাহিদা রেখার ঢাল}^{২} = \frac{\text{দাম পরিবর্তনের পরিমাণ}}{\text{চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ}}$$
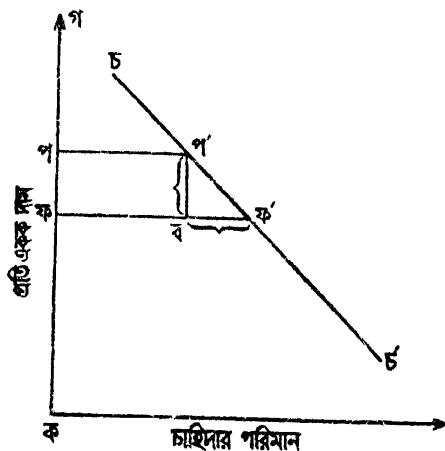
চিত্র ৭

এই সূত্রটি প্রয়োগ করিয়া বলা যায়, কোন দ্রব্যের দাম ১ টাকা হ্রাস (−১)

১. Baumol—*Economic Theory and Operations Analysis*
২. Stigler—*The Theory of Price.*

পাওয়ায় উহার চাহিদা ১০০ একক বৃদ্ধি (+ ১০০) পাইলে চাহিদা রেখার উক্ত অংশে ঢালের পরিমাপ হইবে $-\frac{১০০}{১০০}$। ইহা পূর্ব পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে (চিত্র ৭) দেখানো হইল :

পূর্বপৃষ্ঠার রেখাচিত্রে **কপ** দামে চাহিদা **পর্প** এবং **কফ** দামে চাহিদা **ফর্ফ** অর্থাৎ দাম **পর্ব** হ্রাস পাইলে চাহিদা বৃদ্ধির পরিমাণ হইবে **বর্ফ**।

সুতরাং, চাহিদা রেখার ঐ অংশে উহার ঢাল হইতেছে $= \frac{-\text{পর্ব}}{+\text{বর্ফ}}$। চিত্রে দেখা যায়, পর্ব এবং বর্ফ পরস্পর সমান। সুতরাং ঢালের পরিমাপ হইতেছে—১। চাহিদা রেখাটি যদি সরলরেখা হিসাবে অঙ্কিত হয় তাহা হইলে উহার সকল বিন্দুতেই ঢাল একই ঋণাত্মক হইবে। কিন্তু চাহিদা রেখাটি যদি সরলরেখা না হয়, তাহা হইলে উহার বিভিন্ন বিন্দুতে ঢাল বিভিন্নরূপ হইবে। অবশ্য প্রতিক্ষেত্রেই উহা ঋণাত্মক হইবে। যে-সকল ক্ষেত্রে চাহিদার সূত্রটি কার্যকর হয় না, সেই সকল ক্ষেত্রে চাহিদা রেখাটি বামদিক হইতে উঠিয়া ডান দিকে যায় এবং সেই সকল ক্ষেত্রে চাহিদা রেখার ঢাল ধনাত্মক (positive) হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া চাহিদা রেখার ঢাল (slope of the demand curve) এবং চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of the demand curve) একই বিষয় নহে তবে এই দুইয়ের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক আছে।

৬. **চাহিদার পরিবর্তন (Changes in Demand)**ঃ চাহিদার পরিবর্তন বলিতে দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণে (quantity demanded) যে পরিবর্তন হয়, তাহাকে বুঝায় না। দাম ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের, যেমন—ক্রেতার আয়, রুচি ইত্যাদির পরিবর্তনের ফলেও চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। এইরূপ হইলে ক্রেতারা পূর্বেকার দামেই কোন দ্রব্য কম বা বেশী ক্রয় করিবে। চাহিদার পরিবর্তন (changes in demand) আলোচনার সময় দাম অপরিবর্তিত ধরা হয় : অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদার যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, তাহাকেই চাহিদার পরিবর্তন ধরা হইবে। এখন দেখা যাউক, কি কি কারণে চাহিদার এইরূপ পরিবর্তন হয় ?

চাহিদা পরিবর্তনের কারণঃ নিম্নলিখিত কারণে (দাম ব্যতীত) চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে ঃ

১. রুচি, স্বভাব ও ফ্যাশানের পরিবর্তন ঃ ক্রেতার রুচি, পছন্দ, স্বভাব বা ফ্যাশানের পরিবর্তন ঘটিলে জিনিসের চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে। যেমন—টেলিভিশনের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইলে রেডিও-এর চাহিদা হ্রাস পাইবে, চা-এর পরিবর্তে কফি পান করার অভ্যাস হইলে চা-এর চাহিদা হ্রাস পাইয়া কফির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে।

২. আর্থিক আয়ের পরিবর্তন ঃ ক্রেতাদের আর্থিক আয় বাড়িয়া বা কমিয়া গেলে চাহিদা বাড়িয়া বা কমিয়া যাইবে, কারণ আয়ের বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলে তাহাদের ব্যয় করার ক্ষমতা বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়।

৩. জনসংখ্যার পরিবর্তন ঃ জনসংখ্যা পরিবর্তনের ফলেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে (যেমন—আমাদের দেশে) নিত্যব্যবহার্য

দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে, জনসংখ্যা হ্রাস পাইলে অধিকাংশ দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পায়।

৪. আয়-বণ্টনের পরিবর্তন ঃ জাতীয় আয় বণ্টন-কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদার পরিবর্তন হয়। যেমন—ধনীর তুলনায় গরীবদের আয় বৃদ্ধি পাইলে গরীবদের ভোগ্যদ্রব্যের (যেমন—খাদ্যদ্রব্য, জামা-কাপড়, চিনি ইত্যাদি) বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ধনীদের ভোগ্যদ্রব্যের (যেমন,—মোটরগাড়ী, শৌখিন দ্রব্যাদি, দামী পোশাক ইত্যাদি) চাহিদা হ্রাস পায়।

৫. পরস্পর-সম্পর্কিত দ্রব্যাদির দামের পরিবর্তন ঃ বিকল্পদ্রব্য ও অনুপূরক দ্রব্যের দাম (যেমন—চা ও কফি, গাড়ী ও পেট্রোল ইত্যাদি) চাহিদাকে প্রভাবান্বিত করে। যেমন—চালের দাম বৃদ্ধি পাইলে গমের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি পাইলে মোটরগাড়ীর চাহিদা হ্রাস পায় ইত্যাদি।

৬. টাকাকড়ির যোগানের পরিবর্তন ঃ টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পাইলে সাধারণত লোকেদের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে অধিকাংশ দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, টাকাকড়ি যোগান হ্রাস পাইলে সাধারণত লোকদের ক্রয়শক্তি হ্রাস পায় বলিয়া অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদাও হ্রাস পায়।

৭ অন্যান্য কারণসমূহ ঃ ইহা ছাড়া, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, নূতন দ্রব্যের উদ্ভাবন, আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন, সরকারের করনীতি ইত্যাদি চাহিদাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে।

চাহিদা পরিবর্তনের ফলে চাহিদা রেখা বামদিকে বা ডানদিকে সরিয়া যায়। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা রেখা ডানদিকে এবং হ্রাস পাইলে উহা বামদিকে সরিয়া যায়। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহা দেখানো হইল ঃ
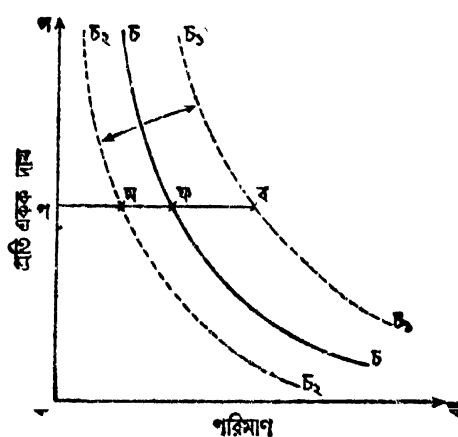
চিত্র ৮

উপরের রেখাচিত্রে চচ রেখাটি মূল চাহিদা রেখা এবং কপ দামে পফ চাহিদা।

চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে **কপ** দামে **পব** চাহিদা হয়। সুতরাং চাহিদা রেখাটি ডানদিকে সরিয়া **চ১চ১** নূতন চাহিদা রেখা হইল। আবার, চাহিদা হ্রাস পাইলে চাহিদা রেখাটি বামদিকে সরিয়া গিয়া নূতন রেখা **চ২ চ২** হয়। চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় **কপ** দামে চাহিদা কমিয়া হয় **পম**।

৭. **চাহিদা সূচীর স্বরূপ—প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্বের বিশ্লেষণ (Nature of Demand Schedule—Marginal Utility Approach)**ঃ উপরের অংশগুলিতে ক্রেতার চাহিদার যে-বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। বেনথাম (Bentham), গোসেন (Gossen), মার্শাল (Marshall) প্রমুখ প্রখ্যাত লেখকরা প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্বের বিশ্লেষণ দিয়াছিলেন। ঐ তত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু হইতেছে, ক্রেতার চাহিদার মূলে রহিয়াছে দ্রব্যসামগ্রীর উপযোগ (utility)। উপযোগ বলিতে অভাব পূরণ করার ক্ষমতাকে বুঝায়। আবার এই উপযোগ সংখ্যাগতভাবে পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ, ক্রেতা কোন দ্রব্য হইতে যে উপযোগ পায়, তাহা সংখ্যায় প্রকাশ করা যায়, যেমন—এক একক উপযোগ বা দশ একক উপযোগ বা একশত একক উপযোগ ইত্যাদি। সুতরাং চাহিদা-সূচী তৈয়ারী-এর সময় ক্রেতা বিভিন্ন দামে একটি বস্তুর যে বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করে, তাহা সম্ভব হয় উপযোগ পরিমাপের দ্বারা। এই প্রসঙ্গে মার্শাল প্রান্তিক উপযোগ (marginal utility) ধারণাটি ব্যবহার করেন।

প্রান্তিক উপযোগ বলিতে কোন একটি দ্রব্যের এক একক ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে যে-পরিমাণ অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায় তাহাকেই বুঝায়। যেমন—ধরা যাউক, কোন একজন ভোগকারী ৪টি কমলালেবু হইতে ৩০ একক উপযোগ পাইল। আবার ৫টি কমলালেবু ভোগ করিলে মোট উপযোগের (total utility) পরিমাণ হয় ৩৫ একক। সুতরাং একটি কমলালেবু বেশী ভোগ করার ফলে অতিরিক্ত উপযোগ হইতেছে ৫ একক। এই ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ হইতেছে ৫ একক। মার্শালের মতে, কোন জিনিস ক্রয়ের সময় ক্রেতা যে-দাম দেয়, তাহা ঐ জিনিসের প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। অর্থাৎ দাম প্রকৃতপক্ষে প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। সুতরাং ক্রেতা কোন একটি জিনিস ক্রয়ের সময় উহার দাম ও প্রান্তিক উপযোগ বিচার করে। ইহা হইতে বুঝা যায়, চাহিদা বা চাহিদাসূচী বিশ্লেষণের মূলে রহিয়াছে প্রান্তিক উপযোগের ধারণাটি। আবার এই প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্বটি অনুধাবন করিতে হইলে মার্শাল প্রদত্ত উপযোগ সম্পর্কিত দুইটি বিধি বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। ঐ বিধি-দুইটি হইতেছে—ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility) এবং সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Equi-marginal Utility)। এই বিধি দুইটি এবং প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্বের আরও কয়েকটি বিষয় নীচের কয়েকটি অংশে বিশ্লেষণ করা হইল।

৮. **ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Marginal**

Utility) ঃ বেন্থাম (Bentham), গোসেন (Gossen) এবং মার্শাল (Marshall) প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিশ্লেষণ করেন। এই বিধিটিতে বলা হয়, কোন একটি দ্রব্য ক্রমাগত অধিক পরিমাণে ভোগ করা হইলে দ্রব্যটি হইতে যে পরিমাণ অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উপযোগ (marginal utility) পাওয়া যায় তাহা ক্রমশ হ্রাস পায়। যেমন—কোন একজন ব্যক্তির দুইটি কাপড় আছে। সে আর একটি একই রকম কাপড় ক্রয় করিল। তৃতীয় কাপড়টি হইতে সে প্রথম বা দ্বিতীয়টির তুলনায় আরও কম উপযোগ পাইবে। এইভাবে সে যদি একই মানের কাপড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি বা ভোগ করিতে থাকে, তাহা হইলে চতুর্থ বা পঞ্চম বা পরবর্তী কাপড় হইতে ক্রমশ অপেক্ষাকৃত কম উপযোগ পাইবে। ইহার কারণস্বরূপ বলা হয়, যতই কোন একটি দ্রব্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, ততই দ্রব্যটির জন্য আকাঙ্খার তীব্রতা (intensity of desire) কমিয়া আসে এবং দ্রব্যটির অতিরিক্ত একক হইতে যে-অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায়, তাহা হ্রাস পায়। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মার্শাল বিধিটি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কোন একজন ব্যক্তির নিকট কোন একটি দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ঐ দ্রব্যটির বৃদ্ধি হইতে যে-পরিমাণ অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায়, তাহা ক্রমাগত হ্রাস পায় (The additional benefit which a person derives from a given increase of his stock diminishes with every increase in the stock that he already has—*Marshall*)

বিধিটির অনুমানসমূহ ঃ এই বিধিটিতে কতকগুলি অনুমান (assumptions) ধরা হইয়াছে ঃ

ক. ভোগকারী কোন দ্রব্য হইতে যে পরিমাণ উপযোগ পাইয়া থাকে, তাহা পরিমাপ করা যায় অর্থাৎ কোন দ্রব্য হইতে যে পরিমাণ উপযোগ পাওয়া যায়, তাহা পরিমাপ করিয়া সংখ্যায় (যেমন- ১ একক বা ৫ একক বা ১০ একক ইত্যাদি) প্রকাশ করা যায়। ভোগকারী দ্রব্যটির জন্য যে-দাম দিতে প্রস্তুত থাকে, তাহাই দ্রব্যটির উপযোগ পরিমাপ করে।

খ. ভোগকালীন অবস্থায় ভোগকারীর পছন্দ বা অভিরুচি এবং আর্থিক আয়ের (money income) কোন পরিবর্তন ঘটিবে না অর্থাৎ উহা অপরিবর্তিত থাকিবে।

গ. যে-দ্রব্যটি ভোগ করা যাইতেছে উহার বা উহার বিকল্প দ্রব্য (যেমন চা ও কফি) বা পরিপূরক দ্রব্যের (যেমন—গাড়ী ও পেট্রোল) দামের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না।

ঘ. ভোগকারী দ্রব্যটির প্রত্যেকটির এককের ভোগ একই সঙ্গে সম্পন্ন করিবে।

বিধিটির দৃষ্টান্ত ঃ উপরি-উক্ত অনুমানগুলির ভিত্তিতে একটি উদাহরণ দ্বারা বিধিটি বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, ১ পয়সা হইতে ১ একক উপযোগ পাওয়া যায়। কোন একজন ভোগকারী বাজারে কমলালেবু কিনিতে গিয়া প্রথমটির জন্য ২৫ পয়সা, দ্বিতীয়টির জন্য ২০ পয়সা, তৃতীয়টির জন্য ১৫ পয়সা এবং চতুর্থটির জন্য ১০ পয়সা দিতে রাজী হইল। ইহা পরপৃষ্ঠার তালিকায় দেখানো হইল ঃ

কমলালেবুর সংখ্যা	ভোগকারী যে-দাম দিতে ইচ্ছুক	অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উপযোগ
১ম	২৫ পয়সা	২৫ একক
২য়	২০ ,,	২০ ,,
৩য়	১৫ ,,	১৫ ,,
৪র্থ	১০ ,,	১০ ,,

উপরের উদাহরণে দেখা যায়, ১ম কমলালেবু হইতে অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উপযোগ হয় ২৫ একক, ২য়টি হইতে ২০ একক, ৩য়টি হইতে ১৫ একক এবং ৪র্থটি হইতে ১০ একক (অতিরিক্ত উপযোগকে প্রান্তিক উপযোগ বলা হইতেছে ; এই সম্পর্কে পূর্বে কিছু বলা হইয়াছে এবং পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইতেছে)। সুতরাং কমলালেবু হইতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে।

এই বিধিটি নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝানো যায় ঃ
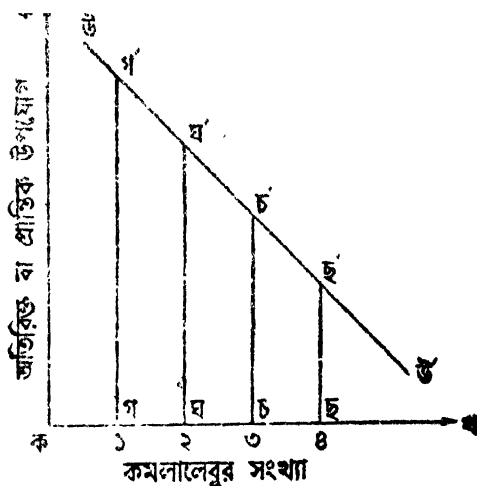
চিত্র ৯

উপরের চিত্রে **কর্ক** রেখাটি দ্বারা অতিরিক্ত উপযোগ এবং **কখ** রেখাটি দ্বারা কমলালেবুর-সংখ্যা দেখানো হইলে। ১ম কমলালেবু হইতে উপযোগের পরিমাণ **গগ'** ২য়টি হইতে **ঘঘ'**, ৩য়টি হইতে **চচ'**, এবং ৪র্থটি হইতে **ছছ'** উপযোগ পাওয়া যায়।

সুতরাং দেখা যায়, কমলালেবুর ভোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে অতিরিক্ত উপযোগের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পায়। উউ' রেখাটি অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উপযোগ রেখা। ইহা ক্রমশ নিম্নগামী এবং ইহা হইতে বুঝা যায় যে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পায়।

বিধিটির কারণসমূহ: বিধিটির দুইটি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে:

ক. বিশেষ একটি অভাবের পরিতৃপ্তি: মানুষের অভাব অসীম বলিয়া সকল অভাব পূরণ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু কোন একটি বিশেষ অভাব (যেমন—খাদ্য বা বাসস্থান বা বস্ত্রের অভাব) পূরণ করা সম্ভব হয়। কারণ কোন একটি জিনিস অধিক পরিমাণে পাইতে থাকিলে বা ভোগ করা হইলে ঐ অভাবের তীব্রতা ক্রমশ হ্রাস পায়। এই কারণে কোন একটি জিনিসের ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উহার প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পায়।

খ. ক্রেতার অন্তর্দৃষ্টি: পূর্বেকার লেখকরা এই বিধিটির কারণস্বরূপ ক্রেতার নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টির (introspection) কথা উল্লেখ করিতেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়, কোন একটি জিনিস অধিক পরিমাণে গ্রহণ বা ভোগ করিলে ইহা পাওয়ার বা ভোগ করার আকাঙ্খা ক্রমশ কমিয়া আসে। পরবর্তীকালে ক্রেতার এই অন্তর্দৃষ্টি গবেষণাগারে সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

বিধিটির ব্যতিক্রম: ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি সর্বত্র কার্যকর হয় না। যে-সকল ক্ষেত্রে বিধিটি কার্যকর হয় না, সেই সকল ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিধিটির ব্যতিক্রম (limitations) দেখা যায়:

১. ভোগকালীন অবস্থায় ভোগকারীর অভিরুচি বা পছন্দের পরিবর্তন ঘটিলে দ্রব্যটির ভোগবৃদ্ধির সঙ্গে যে-অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায় উহা বৃদ্ধি পাইবে, যেমন—যে-ব্যক্তির বই পড়ার কোন আগ্রহ নাই, সেই ব্যক্তি কয়েকটি বই পড়ার পর বইয়ের দিকে আগ্রহান্বিত হইল। ফলে সেই ব্যক্তি আরও অধিক বই পড়িতে চাহিবে এবং তাহার নিকট বই পড়া হইতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত উপযোগ বৃদ্ধি পাইবে।

২. কোন দ্রব্যের ভোগের গোড়ার দিকে খুব কম পরিমাণে ভোগ করা হইলে পরবর্তী এককগুলি হইতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পাইবে। কোন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে খুব ছোট গ্লাসে জল দিলে তাহার তৃষ্ণা কিছুই মিটিবে না। ফলে দ্বিতীয় গ্লাস জল পান করিলে উহা হইতে তাহার উপযোগ আরও বেশী হইবে।

৩. কৃপণ ব্যক্তিদের নিকট টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ (mraginal utility of money) বৃদ্ধি পায়। কৃপণ ব্যক্তিরা যত বেশী অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে টাকাকড়ি হইতে তাহাদের উপযোগ তত বেশী হয়।

৪. ভোগকারী কোন একটি দ্রব্য একই সঙ্গে বা একই সময় ভোগ না করিয়া উহার বিভিন্ন একক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভোগ করিলে দ্রব্যটি হইতে প্রাপ্ত উপযোগ হ্রাস নাও পাইতে পারে; যেমন—কোন ব্যক্তি সকালে প্রথম কাপ দুধ, বিকালে দ্বিতীয় কাপ দুধ এবং রাত্রে তৃতীয় কাপ দুধ পান করিলে দুধ হইতে তাহার প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাইবে না; কিন্তু একসঙ্গে পর পর তিন কাপ দুধ পান করিলে তাহার নিকট দুধের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ কমিয়া যাইবে।

এই বিধিটির কতকগুলি ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধি। এই বিধিটি হইতেই অন্যতম চাহিদার সূত্রটি (Law of Demand) উদ্ভব হইয়াছে। ইহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে (পৃঃ ১৪৪-৪৫)।

৯. **মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ (Total Utility and Marginal Utility) ঃ** ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি আলোচনা প্রসঙ্গে 'মোট উপযোগ' ও 'প্রান্তিক উপযোগ' ধারণা দুইটি আসিয়া যায়। কোন দ্রব্যের কতকগুলি একক ভোগ করা হইলে উহা হইতে সর্বসাকুল্যে যে-পরিমাণ উপযোগ পাওয়া যায়, তাহাই মোট উপযোগ (total utility)। যেমন—১ম কমলালেবু হইতে ২৫ একক, ২য়টি হইতে ২০ একক, ৩য়টি হইতে ১৫ একক এবং ৪র্থটি হইতে ১০ একক উপযোগ পাওয়া গেলে, ৪টি কমলালেবু হইতে মোট উপযোগ হইবে (২৫+২০+১৫+১০)=৭০ একক।

পক্ষান্তরে, প্রান্তিক উপযোগ (marginal utility) বলিতে কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত ১ একক ভোগ করা হইলে যে-পরিমাণ অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায় তাহাকেই বুঝায়, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে (১৪৫ পৃঃ)। যেমন—১টি কমলালেবুর উপযোগ ২৫ একক এবং ২টির উপযোগ ৪৫ একক। সুতরাং প্রান্তিক উপযোগ হইবে ২০ একক। আবার ৩টি কমলালেবুর মোট উপযোগ ৬০ একক হইলে প্রান্তিক উপযোগ হইবে ১৫ একক। প্রান্তিক উপযোগের আরও একটি অর্থ আছে। বলা হয় যে, কোন ভোগকারী কোন একটি দ্রব্য একটি নির্দিষ্ট দামে ক্রয় করিতে করিতে যে এককে উহা ক্রয় বন্ধ করে, সেই এককের উপযোগকে প্রান্তিক উপযোগ বলা হইবে। যেমন—উপরের উদাহরণে প্রতিটি কমলালেবুর দাম ১০ পয়সা হইলে কমলালেবু কিনিতে কিনিতে চারটিতে আসিয়া কেনা বন্ধ হইলে চতুর্থ কমলালেবুর যে-উপযোগ উহাকে প্রান্তিক উপযোগ বলা হইবে। অর্থাৎ মোট ক্রয়ের যে-একক হইতে সর্বাপেক্ষা কম উপযোগ পাওয়া যায়, সেই এককের উপযোগকে প্রান্তিক উপযোগ বলা হইবে; উদাহরণ অনুযায়ী ৪টি কমলালেবু ক্রয় করা হইলে ৪র্থ কমলালেবু হইতে সর্বাপেক্ষা কম উপযোগ পাওয়া যাইবে। সুতরাং ৪র্থ কমলালেবুর উপযোগই হইতেছে প্রান্তিক উপযোগ।

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক আছে। ঐ সম্পর্কটি পরপৃষ্ঠার তালিকায় দেখানো হইল ঃ

মোট ভোগের পরিমাণ	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
০	০	০
১	২৫ একক	২৫ একক
২	৪৫ ,,	২০ ,,
৩	৬০ ,,	১৫ ,,
৪	৭০ ,,	১০ ,,
৫	৭০ ,,	০ ,,

উপরের উদাহরণে দেখা যায়, ভোগের পরিমান শূন্য হইলে মোট উপযোগ বা প্রান্তিক উপযোগ স্বভাবতই শূন্য হইবে। ভোগের পরিমাণ শূন্য হইতে ১ এককে আসিলে মোট উপযোগ হয় ২৫ একক। এখানে ১ একক ভোগ হওয়ার ফলে মোট উপযোগ ২৫ একক হইল। সুতরাং সংজ্ঞানুযায়ী ২৫একক হইতেছে প্রান্তিক উপযোগ। পরবর্তী এককগুলিতে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ৫ একক দ্রব্যে গিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক এবং ঐ স্থানে উহা স্থির (constant) রহিল। প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ কমিতে কমিতে ৫ একক দ্রব্যে আসিয়া শূন্যে পরিণত হইল। ইহা অপেক্ষা অধিক ভোগ করা হইলে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক (negative) হইবে এবং ফলে মোট উপযোগ হ্রাস পাইবে। অর্থাৎ ৫ এককের পরে দ্রব্যটি ভোগ করা হইলে দ্রব্যটি হইতে অপরিতৃপ্তি বা অনুপযোগ (disutility) পাওয়া যাইবে। সুতরাং, মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে দুইটি সম্পর্ক দেখা যায়ঃ (১) কোন দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়, কিন্তু মোট উপযোগ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য মোট উপযোগের বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমিয়া আসে। (২) দ্রব্যটি ভোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে মোট উপযোগ সর্বাধিক হয় এবং স্থির থাকে। সেই অবস্থায় প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। ভোগের পরিমাণ ঐ সীমা অতিক্রম করিলে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হইবে এবং মোট উপাযোগ হ্রাস পাইবে।

১০. **টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility of Money)ঃ** ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ' (marginal utility of money) কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ বলিতে কি বুঝায় ?

দ্রব্যসামগ্রী বা সেবাকার্যের যেরূপ উপযোগ আছে টাকাকড়ির সেইরূপ উপযোগ আছে। কিন্তু দ্রব্যের উপযোগ ও টাকাকড়ির উপযোগের মধ্যে পার্থক্য আছে। কোন দ্রব্য হইতে সরাসরি উপযোগ পাওয়া যায়, অর্থাৎ কোন দ্রব্য মানুষের অভাব সরাসরি পূরণ করে, এই কারণে দ্রব্যের ক্ষেত্রে উপযোগ হইতেছে প্রত্যক্ষ (direct)। কিন্তু টাকাকড়ি হইতে সরাসরি উপযোগ পাওয়া যায় না, টাকাকড়ির বিনিময়ে যে-সকল দ্রব্যসামগ্রী বা সেবাকার্য পাওয়া যায়, তাহাই হইতেছে টাকাকড়ির উপযোগ। এই কারণে টাকাকড়ির উপযোগ হইতেছে পরোক্ষ (indirect)।

টাকাকড়ির ক্ষেত্রে উপযোগের বৈশিষ্ট্য হইতেছে, দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের ন্যায় টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ উহার পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে হ্রাস পায়। টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ বলিতে অতিরিক্ত টাকাকড়ি হইতে যে-অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায় তাহাকেই বুঝায়। ধনীর নিকট প্রচুর টাকাকড়ি থাকে বলিয়া উহাদের নিকট টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ কম, কিন্তু গরীবের নিকট টাকাকড়ির পরিমাণ কম থাকে বলিয়া উহাদের নিকট টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ বেশি হয়। ইহা সহজেই অনুধাবন করা হয়। যেমন—একজন লক্ষপতির নিকট ১ টাকা বা ১০ টাকা বা ১০০ টাকার বিশেষ কোন মূল্য নাই। কিন্তু যাহার আয় মাত্র ১ শত টাকা তাহার নিকট ১ টাকা বা ১০ টাকা বা ১০০ টাকার মূল্য বা গুরুত্ব অনেক বেশী। সুতরাং বলা যায়, দ্রব্যসামগ্রীর মতো টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উহার প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পাইবে। অবশ্য যাহারা টাকাকড়ি মজুদ (hoarding) করিয়া তৃপ্তি পায় (যেমন—কৃপণ ব্যক্তি) তাহাদের নিকট টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে; কারণ টাকাকড়ি অধিক মজুদ হইতে তাহাদের তৃপ্তিও অধিক হয়।

ক্রেতার আচরণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ ধারণাটির তাৎপর্য আছে। ক্রেতার চাহিদা বিশ্লেষণের সময় মার্শাল প্রমুখ লেখকেরা ধরিয়া লইয়াছেন, কোন জিনিস ক্রয়ের সময় ক্রেতার নিকট টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ অপরিবর্তিত বা স্থির থাকে। অর্থাৎ, কোন একজন ক্রেতা একটি জিনিস যতই অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে থাকে তাহার টাকাকড়ির পরিমাণ হ্রাস পায়। ইহা সত্ত্বেও তাহার নিকট টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ অপরিবর্তিত থাকিবে। কিন্তু মার্শালের এই অনুমান সকলক্ষেত্রে সঠিক বলিয়া ধরা যায় না। কারণ যখন ক্রেতা তাহার আয়ের এক বিরাট অংশ কোন একটি দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ব্যয় করে, তখন টাকার প্রান্তিক উপযোগ সমান বা স্থির থাকে না। ঐ অবস্থায় টাকাকড়ির পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পায় বলিয়া উহার প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ক্রেতা যদি তাহার আয়ের খুব সামান্য অংশ কোন দ্রব্যের জন্য ব্যয় করে, তবে তাহার নিকট টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ বিশেষ পরিবর্তিত হয় না অর্থাৎ প্রায় সমান বা স্থির থাকে।

১১, **প্রান্তিক উপযোগ ও দাম (Marginal Utility and Price) :** ক্রেতার চাহিদা বিশ্লেষণে দেখিতে হয়, একজন ক্রেতা কোন একটি জিনিস কতখানি ক্রয় করিবে। অর্থনীতিবিদগণ দেখাইয়াছেন, যে-পরিমাণ ক্রয়ে ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ ও দ্রব্যের দাম সমান হয়, কোন একজন ক্রেতা সেই পরিমাণে দ্রব্যটি ক্রয় করে। এই বিষয়টি আরও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

কোন ক্রেতা যখন কোন জিনিস ক্রয় করে তাহার জন্য সে দাম (price) দিয়া থাকে। দাম দিতে গেলে তাহাকে টাকা প্রদান করিতে হয় এবং ইহার ফলে তাহাকে টাকার প্রান্তিক উপযোগ ত্যাগ (sacrifice) করিতে হয়। কিন্তু দ্রব্যটি ক্রয়ের পর উহা হইতে ক্রেতা উপযোগ অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ ভোগ করে এবং উহার ফলে তাহার লাভ হয়। সুতরাং কোন বিচক্ষণ ক্রেতা দ্রব্য-ক্রয়ের সময় এই ত্যাগ ও লাভের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করিয়া দ্রব্যটি ক্রয় করিবে। ক্রেতা যদি দেখে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা উহার দাম কম হইতেছে তাহা হইলে উপযোগ-প্রাপ্তি অপেক্ষা উপযোগ-ত্যাগের পরিমাণ কম হইতেছে এবং উহার ফলে ক্রেতা লাভবান হয়। সুতরাং উপযোগ-বৃদ্ধির আশায় সে দ্রব্যটি আরও অধিক ক্রয়ের চেষ্টা করিবে। পক্ষান্তরে, প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা দাম অধিক লইলে ক্রেতার উপযোগ-ত্যাগ তাহার উপযোগ-প্রাপ্তি অপেক্ষা অধিক হইতেছে এবং ইহার ফলে ক্রেতার ক্ষতি হইতেছে। সুতরাং প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা দাম অধিক হইলে ক্রেতা আরও কম পরিমাণে দ্রব্যটি ক্রয় করিবে। কিন্তু যখন দ্রব্যের দাম উহার প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়, তখন ক্রেতার উপযোগ-প্রাপ্তি ও উপযোগ-ত্যাগ উভয়ই পরস্পর সমান হয় এবং ক্রেতা এই অবস্থায় সর্বাধিক মোট উপযোগ ভোগ করে। সুতরাং দেখা যায়, উপযোগ সর্বাধিক করার জন্য যে-পরিমাণ দ্রব্যে দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়, ক্রেতা সেই পরিমাণে দ্রব্যটি ক্রয় করিবে। এই কারণে বলা হয়, ক্রেতার দিক হইতে দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর সমান হইবে।

দাম ও প্রান্তিক উপযোগের এই সমতা একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, একটি কমলালেবুর বাজার দাম ১০ পয়সা। ১৫৩ পৃষ্ঠার তালিকায় দেখা যায়, কমলালেবুর বাজার দাম ১০ পয়সা হইলে ক্রেতা ৪টি কমলালেবু ক্রয় করিবে। কারণ ঐ পরিমাণ কমলালেবু ক্রয় করিলে দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হইবে। প্রথম তিনটি কমলাবুর ক্ষেত্রে দাম অপেক্ষা প্রান্তিক উপযোগ অধিক হয় বলিয়া সে ক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া মোট উপযোগ বৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু বাজার দাম ১৫ পয়সা হইলে সে ৪টির পরিবর্তে ৩টি ক্রয় করিবে। কারণ তখন

৩টি ক্রয় করা হইলে দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়। এই বিষয়টি নিম্নের রেখাচিত্রে দেখানো হইল :
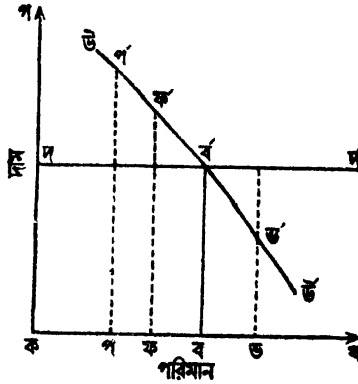
চিত্র ১০

উপরের রেখাচিত্রে কখ দ্বারা কমলালেবুর পরিমাণ এবং কগ দ্বারা উহার দাম বুঝানো হইতেছে। উউ´ রেখা কমলালেবুর প্রান্তিক উপযোগ রেখা। ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি অনুসারে ক্রয়বৃদ্ধির সঙ্গে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায় বলিয়া উক্ত রেখাটি নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে। দদ´ রেখাটি দাম-রেখা। বাজার দাম স্থির থাকে এইরূপ ধরা হইয়াছে বলিয়া উক্ত রেখাটি সমান্তরাল রেখা হইয়াছে। চিত্রে দেখা যায়, কপ বা কফ পরিমাণ কমলালেবুর ক্রয় করা হইলে উহার প্রান্তিক উপযোগ (পপ´ বা ফফ´) দাম (কদ) অপেক্ষা বেশী হইতেছে। সুতরাং ক্রেতা ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। আবার কভ পরিমাণ ক্রয় করা হইলে দাম অপেক্ষা প্রান্তিক উপযোগ (ভভ´) কম হয়। সুতরাং ঐ অবস্থায় ক্রয় হ্রাস করা হইবে। কিন্তু কব ক্রয় করা হইলে দাম ও প্রান্তিক উপযোগ (বব´) পরস্পর সমান হইবে। সতরাং কদ দামে ক্রেতা কব পরিমাণ কমলামেবু ক্রয় করিবে এবং উহার পর উপযোগ বৃদ্ধির আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। ইহা হইতে বুঝা যায়, ভারসাম্য অবস্থায় চাহিদার দিক হইতে কোন দ্রব্যের দাম উহার প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়।

১২. **ভোগকারীর আয়ের বিলিবণ্টন বা সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি (Allocation of Consumer's Income or Law of Equi-marginal Utility) :** প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্বের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে ভোগকারীর আয়ের বিলিবণ্টন (allocation of consumer's income) সম্পর্কে বিশ্লেষণ। ভোগকারীর আর্থিক আয় সীমিত (limited), কিন্তু তাহাকে একাধিক জিনিস ক্রয় করিতে হয়। এই সীমিত আয় বিভিন্ন জিনিস ক্রয়ের মধ্যে কিভাবে বণ্টিত হয়, সেই সম্পর্কে মার্শাল একটি বিধির বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ঐ বিধিটি সম-প্রান্তিক

উপযোগ বিধি (Law of Equi-marginal Utility) বা পরিবর্তনের নীতি (Principle of Substitution) নামে পরিচিত। এই বিধিটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি হইতে জানা যায়, কোন ভোগকারীর কোন একটি দ্রব্য সেই পর্যন্ত ক্রয় করে, যেখানে দ্রব্যটির দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়; যেমন—১টি কমলালেবুর দাম ১০ পয়সা। একজন ভোগকারী ৪টি কমলালেবু কিনিলে যদি ৪র্থ কমলালেবু হইতে তাহার ১০ পয়সার সমান উপযোগ হয়, তবে সে ৪টি কমলালেবু কিনিবে। ৪টির কম কেনা হইলে তাহার মোট উপযোগ সর্বাধিক হইবে না। আবার ৪টির বেশী কিনিলে মোট উপযোগ হ্রাস পাইবে। সুতরাং যেখানে কমলালেবুর প্রান্তিক উপযোগ ও দাম সমান হইবে, একজন ভোগকারী সেই পর্যন্ত ক্রয় করিবে; ইহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে।

ভোগকারী প্রত্যেকটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে একই রূপ আচরণ করে, অর্থাৎ প্রত্যেকটি দ্রব্য সেই পরিমাণে ক্রয় করিবে, যেখানে দ্রব্যটির দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর সমান থাকে। ভারসাম্য (equilibrium) অবস্থায় ভোগকারী তাহার নির্দিষ্ট আয় এমনভাবে ব্যয় করিবে, বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ যেন পরস্পর সমান হয়। অধ্যাপক মার্শাল-এর ভাষায় বলা যায়, কোন ব্যক্তি যদি কোন জিনিস (অর্থাৎ নির্দিষ্ট আয়) বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে বণ্টন করিতে হয়, তাহা হইলে সে এমনভাবে তাহা বণ্টন করিবে যে প্রত্যেকটি ব্যবহার হইতে সমান পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ পাইবে।[১]

কোন একটি দ্রব্য হইতে যদি বেশী প্রান্তিক উপযোগ এবং অন্য একটি দ্রব্য হইতে কম প্রান্তিক উপযোগ পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভোগকারী দ্বিতীয় দ্রব্যটির পরিবর্তে প্রথম দ্রব্যটি ক্রয় করিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রথম দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ বেশী এবং দ্বিতীয় দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ কম থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথমটির ক্রয় বাড়াইয়া দ্বিতীয়টির ক্রয় কমাইলে মোট উপযোগ বা পরিতৃপ্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রথমটির ক্রয় বাড়াইলে উহার প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায় এবং দ্বিতীয়টির ক্রয় কমাইলে উহার প্রান্তিক উপযোগ বাড়িয়া যায়। এইভাবে এক সময় যখন উভয়ের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর সমান হয়, তখন ভোগকারীর পরিতৃপ্তি হয় সর্বাধিক। এইরূপ পরিবর্তন বা নির্দিষ্ট এইরূপ বিনিময়ের মাধ্যমে সর্বাধিক পরিতৃপ্তি লাভ করা হয় বলিয়া সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধিকে 'সর্বাধিক পরিতৃপ্তির তত্ত্ব' (doctrine of maximum satisfaction) বলা হয়। সুতরাং ভোগকারীর নিকট যতক্ষণ পর্যন্ত তরিতরকারী অপেক্ষা মাছের প্রান্তিক উপযোগ অধিক হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তরিতরকারির পরিবর্তে মাছ কিনিবে অর্থাৎ তরিতরকারির জন্য ব্যয় হ্রাস করিয়া মাছের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি করিবে। কিন্তু দ্রব্য দুইটি এমনভাবে ক্রয় করা হইবে যে, মাছ ও তরিতরকারি হইতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ যেন পরস্পরের সঙ্গে সমান হয়। সুতরাং ভোগকারী

১. If a person has a thing which he can put to several uses, he will distribute it between these in such a way that it has the same marginal utility in all.

তাহার সীমিত আয় সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বণ্টন করিয়া সর্বাধিক পরিতৃপ্তি পাওয়ার প্রয়াস করে।

উপরি-উক্ত বিধিটি সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। সুতরাং প্রত্যেকটি দ্রব্য সেই পরিমাণে ক্রয় করা হইবে, যেখানে উহার দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হইবে; ঐরূপ করা হইলে ভারসাম্য অবস্থায় বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ উহাদের দামের সমানুপাতিক (proportional to prices) হইবে। প্রত্যেক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমান বলিয়া ঐ দুইয়ের মধ্যে অনুপাত সর্বক্ষেত্রেই এক-এর (one) সমান হয়। সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই ভারসাম্য অবস্থায় দাম ও প্রান্তিক উপযোগের অনুপাত এক-এর সমান হয় বলিয়া বিভিন্ন অনুপাতও পরস্পরের মধ্যে সমান হয়, যেমন—

$$\frac{\text{ক-দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{ক-দ্রব্যটির দাম}} = \frac{\text{খ-দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{খ-দ্রব্যটির দাম}}$$

$$= \frac{\text{গ-দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{গ-দ্রব্যটির দাম}}$$

এই বিধিটি শুধু ভোগকর্মের ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনীতির আরও অন্যান্য ক্ষেত্রেও কার্যকর হয়; যেমন—উৎপাদন, সঞ্চয়, বিনিময়, বণ্টন ইত্যাদি। উৎপাদনকারী যখন বিভিন্ন উপকরণ কাজে লাগাইয়া কোন দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহাকে বিভিন্ন উপকরণগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা (productivity) বিচার করিতে হয়। যে-উপকরণের উৎপাদন-ক্ষমতা বেশী, অন্য উপকরণের তুলনায় সেই উপকরণ অধিক পরিমাণে নিয়োগ করা হইবে। আবার সঞ্চয় বা ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন্‌টির উপযোগ বেশী হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সঞ্চয় বা ব্যয়ের পরিমাণ স্থির করিতে হয়।

বিধিটির ব্যতিক্রম: সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধিটির কয়েকটি ব্যতিক্রম (limitations) দেখা যায়:

১. ভোগকারী বাস্তব জীবনে অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্যগুলির প্রান্তিক উপযোগ তুলনা না করিয়া আবেগবশত বা সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে অনেক দ্রব্যাদি ক্রয় করে। এইরূপ ক্ষেত্রে ভোগকারী বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা বা তুলনা করার অবকাশ পায় না। এইসকল ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিধিটি প্রয়োগ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই বিধিটিতে ক্রেতার যে যুক্তিবাদী আচরণ (rationalistic behaviour) অনুমান করা হইয়াছে, বাস্তবক্ষেত্রে তাহা বিশেষ দেখা যায় না।

২. বিধিটিতে ধরা হয়, বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ পরিমাপ করা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উপযোগ হইতেছে মানসিক অনুভূতি এবং উহা পরিমাপ করিয়া সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় না।

৩. আরও বলা হয়, সকল দ্রব্যের একক প্রয়োজনমতো বিভাজ্য নয় (যেমন—মোটরগাড়ী, টেলিভিশন সেট্‌ প্রভৃতি) বলিয়া সকল ক্ষেত্রেই বিধিটি অনুযায়ী দ্রব্যাদি পরিবর্তন বা বদল করা সম্ভব হয় না। যেমন—১০ কিলোগ্রাম মাছ ও ১ খানি মোটরগাড়ীর মধ্যে বদল করা সম্ভব হয় না। কারণ একটি মোটরগাড়ী ছোট ছোট খণ্ডে ক্রয় করা যায় না।

৪. পরিশেষে বলা হয়, 'উপযোগ' ও 'পরিতৃপ্তি' একই বিষয় নহে। সুতরাং বিধিটি অনুসারে প্রান্তিক উপযোগের সমতা দ্বারা মোট উপযোগের সর্বাধিককরণ করা হইলেই যে পরিতৃপ্তির সর্বাধিককরণ হইবে এইরূপ বলা যায় না।

বিধিটির এই সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মোটামুটি বলা যায়, কোন বিচক্ষণ ক্রেতা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এই বিধিটি অনুযায়ী তাহার নির্দিষ্ট আয় বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ব্যয় করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে চ্যাপম্যান (Chapman) মন্তব্য করিয়াছেন, "আকাশের দিকে পাথর নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন মাটিতে পড়িতে বাধ্য, আমরা সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধি অনুসারে নিখুঁতভাবে আমাদের আয় বণ্টন করিতে সেইরূপ বাধ্য নই ... ... কিন্তু আমরা যুক্তিবাদী বলিয়া বাস্তবক্ষেত্রে কম-বেশী ঐরূপ আচরণ করিয়া থাকি।"[১]

---

১. 'We are not of course, compelled to distribute our income according to the law of equi-marginal expenditure as a stone thrown into the air is compelled, in a sense, to fall back on the earth; but as a matter of fact we do in certain rough fashion because we are reasonable."—*Chapman*.

১৪ ॥ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়-পরিকল্পনা—ভোগকারীর চাহিদা-বিশ্লেষণ—২ ॥

(Sales Plan of the Firm—an analysis of Consumer's Demand—2)

[চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—দামগত স্থিতিস্থাপকতা, আয়গত স্থিতিস্থাপকতা ও পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা—দামগত স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ—চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ—চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ—চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ধারণাটির প্রয়োগ—চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও প্রান্তিক উপযোগ—ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ধারণা—চাহিদা-সূচীর স্তর]

পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়-পরিকল্পনার একটি অন্যতম বিষয় হইতেছে ভোগকারীর চাহিদা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা। ভোগকারীর চাহিদার কয়েকটি দিক ঐ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে ঐ চাহিদার আরও কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হইল।

১. **চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand):** চাহিদার সূত্রে (১৪৪ পৃঃ) দেখা গিয়াছে, কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইলে উহার চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায় এবং দাম হ্রাস পাইলে উহার চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দাম পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণে যে পরিবর্তন ঘটে, তাহা সকল প্রকার দ্রব্যের ক্ষেত্রে একইরূপ হয় না। কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে উহার দাম পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন খুব বেশী হয় এবং কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন খুব সামান্যই হয়। দাম পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণে যে পরিবর্তন ঘটে, উহার হারকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of demand) বলে অর্থাৎ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা দ্বারা কোন দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে উহার চাহিদার পরিমাণে যে পরিবর্তন ঘটে, তাহার হার পরিমাপ করা হয়।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার বিষয়টি অর্থবিদ্যায় প্রধানত তিনটি দিক হইতে বিবেচনা করা হয়ঃ

(ক) চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতাঃ কোন দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে উহার চাহিদার পরিমাণে যে পরিবর্তন ঘটে, তাহাকে দামগত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (price-elasticity of demand) বলে। কোন দ্রব্যের দামের যখন পরিবর্তন ঘটে চাহিদার সূত্র অনুসারে সেই দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণে বিপরীতদিকে 'পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু দাম পরিবর্তনের (অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত ধরিয়া লইতে হইবে) ফলে চাহিদার পরিমাণে যে পরিবর্তন ঘটে, তাহার হার সকল প্রকার দ্রব্যের ক্ষেত্রে একইরূপ বা একই পরিমাণ হয় না। দেখা যায়, চাল, গম, লবণ, কাপড়, ভোজ্য তৈল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে চাহিদার পরিবর্তনের মাত্রা খুব

সামান্যই হয়। পক্ষান্তরে, দামী আসবাবপত্র, টেলিভিশন সেট্ ইত্যাদি বিলাস দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে দাম পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা দ্বারা দাম পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণে যে-পরিবর্তন ঘটে তাহার হার বা মাত্রা পরিমাপ করা হয়। ইহা নিম্নলিখিতভাবে দেখানো হইয়া থাকে ঃ

$$\text{চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তনের শতাংশ}}{\text{দাম পরিবর্তনের শতাংশ}}$$

প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতে হয়, চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা সাধারণত নেতিবাচক (negative) হয়। কারণ দাম হ্রাস পাইলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় অথবা দাম বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা হ্রাস পায়। সুতরাং উহাদের পরিবর্তন বিপরীতধর্মী। এ-সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা করা হইবে।

খ. **চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা ঃ** পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, (১৪০ পৃঃ) ক্রেতার আয়ের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। ক্রেতার আর্থিক আয় পরিবর্তনের ফলে (দাম অপরিবর্তিত ধরিয়া লইতে হইবে) চাহিদার যে পরিবর্তন দেখা যায়, তাহার হারকে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা (income elasticity of demand) বলে। আয় কম থাকার জন্য যে-ব্যক্তি বস্তিতে বসবাস করিত, নিম্নমানের চাল খাইত, নিম্নশ্রেণীর ট্রেনে ভ্রমণ করিত—আয় বাড়িলে সে পাকা বাড়ীতে থাকিবে, উচ্চমানের চাল খাইবে, ট্রেনে উচ্চশ্রেণীতে ভ্রমণ করিবে। আয় পরিবর্তনের ফলে চাহিদার এইরূপ পরিবর্তনকে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা বলা হইবে। ইহা এইভাবে দেখানো হয় ঃ

$$\text{চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার পরিবর্তনের শতাংশ}}{\text{আয় পরিবর্তনের শতাংশ}}$$

ক্রেতার আর্থিক আয় পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনের হার বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পাইলে চাল, ভোজ্য তৈল, লবণ, কাপড় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদার পরিবর্তন বিশেষ হয় না, সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যের চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত কম। পক্ষান্তরে, দামী অলংকার, টেলিভিশন সেট, মোটরগাড়ী, মূল্যবান আসবাবপত্র প্রভৃতি বিলাস-দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি পাইলে চাহিদার বিরাট পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা সাধারণ ক্ষেত্রে ধনাত্মক (positive) হয়। কারণ আয় ও চাহিদা উভয়ের পরিবর্তন একই দিকে হইয়া থাকে অর্থাৎ আয় বাড়িলে চাহিদা বাড়ে এবং আয় কমিলে চাহিদা কমে। কিন্তু যে-সকল ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি পাইলে কোন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাস পায় (যেমন—নিম্ন মানের দ্রব্যাদি)

এবং আয় হ্রাস পাইলে উহাদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, সেইসকল ক্ষেত্রে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক (negative) হয়।

গ। **চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা ঃ** পরস্পর-সম্পর্কিত দ্রব্যগুলির (যেমন—চা ও কফি, মোটরগাড়ী ও পেট্রোল ইত্যাদি) ক্ষেত্রে কোন একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে অপর দ্রব্যটির চাহিদার পরিবর্তনের হার 'চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা' (cross-elasticity of demand) দ্বারা পরিমাপ করা হয়। চা-এর দামে পরিবর্তনের ফলে কফির চাহিদার পরিমাণ কিরূপ পরিবর্তন হয় অথবা পেট্রোলের দাম পরিবর্তনের ফলে মোটরগাড়ীর চাহিদা কিরূপ পরিবর্তন হয় ইত্যাদি পরস্পর-সম্পর্কিত দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা ধারণাটি ব্যবহার করা হয়। বলা বাহুল্য, যে-সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির সঙ্গে অপর কোন দ্রব্যের কোন সম্পর্ক নাই, সেই সকল ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা শূন্য হইবে। ইহা এইভাবে দেখানো হয় ঃ

চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা

$$= \frac{\text{'ক' দ্রব্যের চাহিদা-পরিবর্তনের শতাংশ}}{\text{'খ' দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের শতাংশ}}$$

চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটির দাম বাড়িলে অপর দ্রব্যটির চাহিদা বাড়ে এবং একটির দাম কমিলে অপরটির চাহিদা কমে। বিকল্প দ্রব্যাদির (substitutes) ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। যেমন—চা-এর দাম বৃদ্ধি পাইলে ইহার বিকল্প কফির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এই ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক (positive) হইবে। পক্ষান্তরে, পরিপূরক দ্রব্যাদির (complements) ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত দেখা যায়। যেমন—পেট্রোলের দাম বাড়িলে ইহার সহ-ভোগ্যদ্রব্যের অর্থাৎ মোটরগাড়ীর চাহিদা হ্রাস পায়। এ ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক (negative) হইয়া থাকে।

২. **স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে চাহিদা-সূচীর অংশবিশেষ বা দামগত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ (Classification of segments of Demand Schedule on the basis of Elasticity, or Different cases of Price Elasticity of Demand) ঃ** চাহিদা-সূচীর সকল স্থানে স্থিতিস্থাপকতা একইরূপ হয় না, বিভিন্ন স্থানে উহা বিভিন্ন রূপ হইতে পারে। ইহা দামগত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ হইতে অনুধাবন করা হয়। এই প্রকারভেদ সাধারণত পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে ঃ

(ক) **অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদা ঃ** যে-সকল চাহিদার ক্ষেত্রে দামের সামান্য (অথবা শূন্য পরিবর্তন) ঘটিলে চাহিদার অসীম বা অপরিমাপযোগ্য পরিবর্তন ঘটে, তাহাকে অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদা (perfectly elastic demand) বলা হয়।

এই সকল ক্ষেত্রে দামের সামান্য বৃদ্ধি ঘটিলে ক্রেতাগণ সম্পূর্ণরূপে ক্রয় বন্ধ করিবে। ইহা দামগত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার একটি চরম সীমা। এইক্ষেত্রে চাহিদা-রেখাটি একটি সমান্তরাল বা অনুভূমিক (horizontal) রেখা হয়।

(খ) **অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক চাহিদা**ঃ কোন বস্তুর দামের সামান্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদার বিরাট পরিবর্তন ঘটিলে উহার চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক (relatively elastic demand) হইবে। এইসকল ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তনের হার অধিক হয় এবং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এক-এর অধিক হয়। মোটরগাড়ী, রেফ্রিজারেটর, দামী আসবাবপত্র ইত্যাদি বিলাস-দ্রব্যের চাহিদা সাধারণত অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে চাহিদা রেখাটি অপেক্ষাকৃত চ্যাপ্টা (flatter) হয়।

(গ) **চাহিদার একক স্থিতিস্থাপকতা**ঃ যে-সকল চাহিদার ক্ষেত্রে দাম পরিবর্তনের হার ও চাহিদা পরিবর্তনের হার পরস্পর সমান হয়, সেইসকল ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একক (unit elasticity of demand) হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে চাহিদা স্থিতিস্থাপকও নয়, অস্থিতিস্থাপকও নয়। চাহিদা উহাদের মধ্যবর্তী পর্যায়ে থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এক-এর সমান হয় এবং চাহিদা-রেখাটি চ্যাপ্টাও নয়, খাড়াও (steeper) নয়।

(ঘ) **অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক চাহিদা**ঃ চাল, লবণ, ভোজ্য তেল, কাপড় ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, দাম পরিবর্তনেরহার অপেক্ষা চাহিদা পরিবর্তনের হার কম হয়। এইপ্রকার চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক (relatively inelastic demand) বলিয়া গণ্য করা হয়। এই ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এক-এর কম হয় এবং চাহিদা-রেখাটি অপেক্ষাকৃত খাড়া (steeper) হয়।

(ঙ) **অসীম অস্থিতিস্থাপক চাহিদা**ঃ যে-সকল ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না অর্থাৎ দাম বেশী বা কমই হউক চাহিদার মোট পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে, সেইসকল ক্ষেত্রে চাহিদা হয় অসীম অস্থিতিস্থাপক (perfectly inelastic demand)। এইরূপ ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা শূন্য (zero)। ইহাও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার আর একটি চরম সীমা এবং এইক্ষেত্রে চাহিদা-রেখাটি উল্লম্ব (vertical) রেখা হয়।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার এই পাঁচটি প্রকারভেদ পরের পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রে দেখানো হইল ঃ

উক্ত রেখাচিত্রে **চচ**$_১$ হইতেছে অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদা-রেখা **চচ**$_২$ অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক চাহিদা-রেখা, **চচ**$_৩$ চাহিদার একক স্থিতিস্থাপক রেখা,

চচ৪ অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক চাহিদা-রেখা এবং চচ৫ হইতেছে অসীম অস্থিতিস্থাপক চাহিদা-রেখা। এই পাঁচটি রেখার গতি ও বক্রতা বিভিন্ন রূপ এবং উহা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন প্রকারভেদের নির্দেশ দিতেছে। অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদা-রেখাটি (চচ১) সমান্তরাল বা অনুভূমিক (horizontal) রেখা, অপেক্ষাকৃত
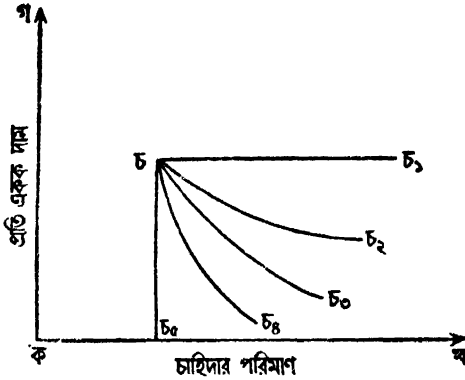
চিত্র ১১

স্থিতিস্থাপক চাহিদা-রেখাটি (চচ২) অপেক্ষাকৃত চ্যাপ্টা, একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা-রেখাটি (চচ৩) চ্যাপ্টাও নয় বা খাড়াও নয়, অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক চাহিদা-রেখা (চচ৪) অপেক্ষাকৃত খাড়া (steep) এবং অসীম অস্থিতিস্থাপক চাহিদা-রেখাটি (চচ৫) উল্লম্ব (vertical) রেখা হয়।

৩. **চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ** (Measurement of Elasticity of Demand) **:** চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের জন্য কতকগুলি পদ্ধতি আছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি এখানে আলোচনা করা হইল :

(ক) ভোগ-ব্যয় পদ্ধতি : চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করার প্রথম পদ্ধতিটি হইতেছে অধ্যাপক মার্শালের (Marshall) 'ভোগ-ব্যয় পদ্ধতি' (consumption-outlay method)। কোন দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইলে যদি উহার জন্য ভোগকারী পূর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় করে এবং দাম বৃদ্ধি পাইলে উহার জন্য পূর্বাপেক্ষা কম ব্যয় রে, তাহা হইলে চাহিদা হইবে স্থিতিস্থাপক। আবার, কোন দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইলে r উহার জন্য ভোগকারী পূর্বাপেক্ষা কম ব্যয় করে এবং দাম বৃদ্ধি পাইলে উহার ,; পূর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় করে, তাহা হইলে চাহিদা হইবে অস্থিতিস্থাপক।

দুইটি উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝানো যাইতে পারে :

স্থিতিস্থাপক চাহিদা (Elastic Demand)

প্রতি কিলোগ্রাম চা-এর দাম	মোট চাহিদা	মোট ভোগ ব্যয়
৪০ টাকা	৫০ কিলোগ্রাম	২০০০ টাকা
৩০ ,,	৮০ ,,	২৪০০ টাকা
২০ ,,	১৫০ ,,	৩০০০ টাকা

উপরের উদাহরণে দেখা যায়, চা-এর দাম প্রতি কিলোগ্রাম ৪০ টাকা হইলে ইহার জন্য মোট চাহিদা হয় ৫০ কিলোগ্রাম এবং মোট ব্যয় হয় ২০০০ টাকা। কিন্তু দাম হ্রাস পাইয়া প্রতি কিলোগ্রাম ৩০ টাকা হইলে চাহিদা বাড়িয়া হয় ৮০ কিলোগ্রাম এবং উহার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া হয় ২৪০০ টাকা। প্রতি কিলোগ্রাম দাম আরও হ্রাস পাইয়া ২০ টাকা হইলে চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০ কিলোগ্রাম হয়। ফলে চা-এর জন্য মোট ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাইয়া হয় ৩০০০ টাকা। এখানে চা-এর দাম হ্রাস পাওয়ার ফলে ইহার মোট চাহিদা এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে ভোগব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বিপরীতদিকে দাম বৃদ্ধি পাইলে মোট চাহিদা এত হ্রাস পায় যে ইহার জন্য মোট ভোগ ব্যয় হ্রাস পায়। এই ক্ষেত্রে চা-এর চাহিদা হইবে স্থিতিস্থাপক।

অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (Inelastic Demand)

লবণের প্রতি কুইন্টালের দাম	মোট চাহিদা	মোট ভোগ ব্যয়
২০ টাকা	১০০ কুইন্টাল	২,০০০ টাকা
১৫ ,,	১২০ ,,	১,৮০০ ,,
১০ ,,	১৫০ ,,	১,৫০০ ,,

উপরের উদাহরণে দেখা যায়, লবণের দাম প্রতি কুইন্টাল ২০ টাকা হইলে মোট চাহিদা হয় ১০০ কুইন্টাল এবং লবণের জন্য মোট ব্যয় হয় ২,০০০ টাকা। লবণের

দাম হ্রাস পাইয়া ১৫ টাকা কুইন্টাল হইলে উহার চাহিদা সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ১২০ কুইন্টাল হয়। কিন্তু লবণের জন্য মোট ব্যয় হ্রাস পাইয়া ১,৮০০ টাকা হয়। লবণের দাম আরও হ্রাস পাইলে চাহিদা সামান্য বাড়ে, কিন্তু মোট ব্যয় হ্রাস পায়। বিপরীত দিকে, লবণের দাম বাড়িলে মোট চাহিদা সামান্য কমে বলিয়া উহার জন্য অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং, লবণের চাহিদা হইবে অস্থিতিস্থাপক।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে চাহিদা স্থিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক কোন কিছুই না হইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে 'একের সমান' (equal to unity or one) বলা হয়। এইসকল ক্ষেত্রে দাম যতই হউক না কেন, দ্রব্যটির জন্য মোট ভোগ-ব্যয় সর্বদাই অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়। ধরা যাউক, সরিষার তেলের দাম প্রতি কিলোগ্রাম ২০ টাকা হইলে মোট চাহিদা হয় ১০০ কিলোগ্রাম ; সুতরাং উহার জন্য ব্যয় হইবে ২০০০ টাকা। আবার, উহার দাম হ্রাস পাইয়া প্রতি কিলোগ্রাম ১৬ টাকা হইলে মোট চাহিদা বাড়িয়া হয় ১২৫ কিলোগ্রাম। দাম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তেলের জন্য ব্যয় হইতেছে ২,০০০ টাকা। সুতরাং, এখানে সরিষার তেল-এর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে একের সমান বলা হইবে।

(খ) **আধুনিক পদ্ধতি বা আনুপাতিক পদ্ধতি ঃ** চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করার দ্বিতীয় পদ্ধতিটি আধুনিক কালের লেখকরা প্রয়োগ করেন। তাঁহাদের মতে,

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{দ্রব্যের চাহিদা-পরিবর্তনের শতাংশ}}{\text{দ্রব্যটির দাম-পরিবর্তনের শতাংশ}}$$

কোন দ্রব্যের দাম ১০ শতাংশ হ্রাস পাইলে যদি উহার চাহিদা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইবে (২০ ÷ ১০ = ২) ২-এর সমান অর্থাৎ একের অধিক ; এই ক্ষেত্রে দ্রব্যটির চাহিদা হইবে স্থিতিস্থাপক। কিন্তু যদি কোন দ্রব্যের দাম ১০ শতাংশ হ্রাস পাইলে উহার চাহিদা মাত্র ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইবে (৫ ÷ ১০ = ½) ½-সমান অর্থাৎ, একের কম ; এই ক্ষেত্রে দ্রব্যটির চাহিদা হইবে অস্থিতিস্থাপক। আবার দ্রব্যটির দাম ১০ শতাংশ হ্রাস পাইলে যদি চাহিদা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে চাহিদার স্থিতিস্থাপক হইবে (১০ ÷ ১০ = ১) ১ এর সমান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সাধারণত সকলক্ষেত্রে নেতিবাচক (negative) হইয়া থাকে। কারণ, দামের পরিবর্তন ঘটিলে উহার চাহিদার পরিবর্তন বিপরীত দিকে ঘটিয়া থাকে। গাণিতিক চিহ্ন দ্বারা উহা দেখানো হইলে একটির পরিবর্তন যোগচিহ্ন (plus) হইলে অন্যটির পরিবর্তন বিয়োগ চিহ্ন (minus) হইবে। সুতরাং দাম-স্থিতিস্থাপক নেতিবাচক হইবে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের সূত্রটি গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা হয় :

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\frac{\Delta q}{q}}{\frac{-\Delta p}{p}} = \frac{\Delta q}{-\Delta p} \times \frac{p}{q}$$

(Δp-এর পূর্বে বিয়োগ-চিহ্ন দ্বারা দামের হ্রাস বুঝানো হইতেছে।

উপরের সূত্রে, q হইতেছে চাহিদার পরিমাণ

p ,, প্রারম্ভিক দাম

Δq ,, চাহিদা পরিবর্তনের পরিমাণ

Δp ,, দাম পরিবর্তনের পরিমাণ)

(গ) **জ্যামিতিক পদ্ধতি ঃ** চাহিদা-রেখার উপর কোন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা (point elasticity of demand) পরিমাপের জন্য জ্যামিতিক পদ্ধতি (geometrical method) প্রয়োগ করা হয়। নিম্নে ইহা দেখানো হইল ঃ
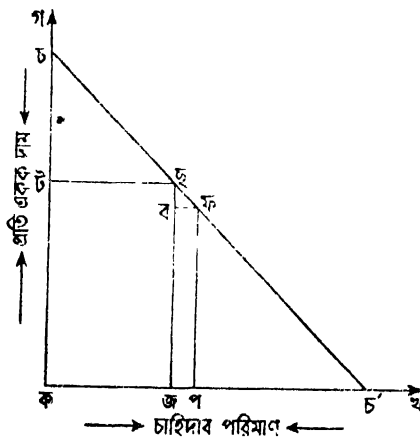
চিত্র ১২

উপরের চিত্রে **কখ** দ্বারা চাহিদার পরিমাণ এবং **কগ** দ্বারা প্রতি একক দাম দেখানো হইতেছে। **চচ´** হইতেছে একটি সরল চাহিদা-রেখা (a straight line demand curve)। এই রেখাটির কোন একটি বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করিতে হইবে। ধরা যাউক, **ছ** বিন্দুতে উহা পরিমাপ করা হইবে। ইহা করিতে হইলে

ছ বিন্দুর খুবই সন্নিকটে আরএকটি বিন্দু **ব** লইতে হইবে। চাহিদা রেখার **ছ** বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা হইবে :

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদা পরিবর্তনের অনুপাত}}{\text{দাম পরিবর্তনের অনুপাত}}$$

$$= \frac{\text{জপ}}{\text{কজ}} \div \frac{\text{ছপ}}{\text{ছজ}} = \frac{\text{জপ}}{\text{ছব}} \times \frac{\text{ছজ}}{\text{কজ}} = \frac{\text{বফ}}{\text{ছব}} \times \frac{\text{ছজ}}{\text{কজ}} \text{ (যেহেতু জপ = বফ)}$$

$$= \frac{\text{জচ'}}{\text{ছজ}} \times \frac{\text{ছজ}}{\text{কজ}} \text{ (যেহেতু ছবফ এবং ছজচ' ত্রিভুজটি সদৃশ)}$$

$$= \frac{\text{জচ'}}{\text{কজ}}$$

সুতরাং **চচ'** চাহিদা-রেখার **ছ** বিন্দুতে চাহিদা-স্থিতিস্থাপকতা হইতেছে $\frac{\text{জচ'}}{\text{কজ}}$ এর অনুপাতের সমান। আবার, **ছজচ'**, **চকচ'** ও **চটছ** এই তিনটি ত্রিভুজ সদৃশ বলিয়া $\frac{\text{জচ'}}{\text{কজ}} = \frac{\text{ছচ'}}{\text{ছচ}} = \frac{\text{টক}}{\text{টচ}}$। ইহা বলা যায়, চাহিদা-রেখার কোন একটি বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা এই তিনটি অনুপাতের যে কোন একটির সমান হইবে। চাহিদা-রেখাটি সরলরেখা না হইয়া বক্র রেখা হইলে উহার কোন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করিতে হইলে সেই বিন্দু দিয়া একটি স্পর্শক অঙ্কন করিয়া উহা দাম ও চাহিদা অক্ষ-দুইটির সঙ্গে সংযোজন করিতে হইবে। স্পর্শকের নীচের অংশটুকুকে উহার উপরের অংশ দ্বারা ভাগ করিলে স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ বাহির করা যাইবে। সুতরাং

$$\text{বিন্দু-স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{স্পর্শকের নীচের অংশ}}{\text{স্পর্শকের উপরের অংশ}}$$

ইহা নিম্নের রেখাচিত্রে দেখানো হইল :
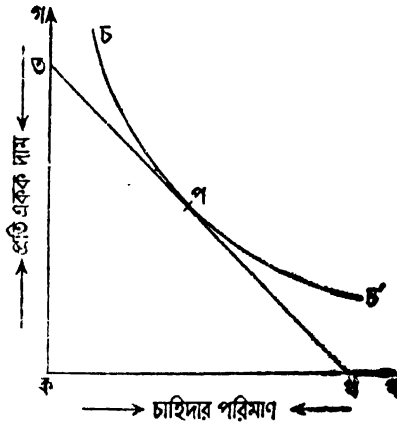
চিত্র ১৩

উপরে চিত্রে **চচ'** হইতেছে একটি বক্রাকৃতির চাহিদা-রেখা। উহার **প** বিন্দুতে

স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের জন্য **তথ** একটি স্পর্শক অঙ্কন করা হইল। সুতরাং, সূত্র অনুসারে ঐ বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা $\frac{\text{পথ}}{\text{পত}}$ এর সমান।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, চাহিদা-রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন রূপ হইতে পারে। ইহা নিম্নের রেখাচিত্রে দেখানো হইল। উক্ত রেখাচিত্রে **চচ´** একটি **সরল** চাহিদা-রেখা (a straight line demand curve)। ঐ রেখার **প** বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা ইতেছে $\frac{\text{পচ´}}{\text{চপ}}$ অর্থাৎ ১-এর বেশী ; কারণ **চপ** অপেক্ষা **পচ´** বৃহত্তর। উক্ত রেখার **ফ** বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা হইতেছে $\frac{\text{ফচ´}}{\text{ফচ}}$ অর্থাৎ ১-এর সমান, কারণ **ফচ´** ও **ফচ** পরস্পর সমান। আবার, উক্ত রেখার **ব** বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা হইতেছে, $\frac{\text{বচ´}}{\text{বচ}}$ অর্থাৎ ১-এর কম, কারণ **বচ** অপেক্ষা **বচ´** ক্ষুদ্রতর। ইহা হইতে দেখা যায়, চাহিদা-রেখার ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। চাহিদা রেখা সরল বা বক্রই হউক না কেন উহার ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ হইয়া থাকে।
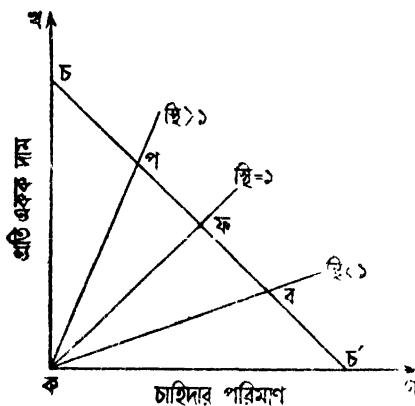
চিত্র ১৪

চাপ স্থিতিস্থাপকতা : বিন্দুস্থ স্থিতিস্থাপকতার বিকল্প হিসাবে চাহিদা-রেখার চাপ-স্থিতিস্থাপকতা (are elasticity of demand) পরিমাপ করা হয়। চাহিদা-রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ বিভিন্ন হয় বলিয়া যে-সকল ক্ষেত্রে দাম ও চাহিদার অপেক্ষাকৃত অধিক পরিবর্তন ঘটে, সেই সকল ক্ষেত্রে বিন্দুস্থ স্থিতি-স্থাপকতার প্রয়োগে অসুবিধা দেখা দেয়। চাহিদা-রেখার চাপের একটি অংশের মধ্যে যে স্থিতিস্থাপকতা দেখা যায়, তাহাকেই চাপ স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। চাহিদা-রেখার

দুইটি দূরস্থ বিন্দুর মধ্যে যোগ করিয়া যে চাপ পাওয়া যায়, তাহার সাহায্যে চাপ স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, পুরাতন দাম ও নূতন দাম এবং পুরাতন চাহিদা ও নূতন চাহিদার গড় বাহির করা হয় এবং ঐ গড়-দুইটির ভিত্তিতে ঐ চাহিদা-রেখার নির্দিষ্ট কোন চাপে স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা হয়।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ (Determinants of Elasticity of Demand)ঃ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয় এখানে আলোচনা করা হইল ঃ

(ক) দ্রব্যের প্রকৃতি ও আবশ্যকতা ঃ যে-সকল দ্রব্যের আবশ্যকতা বা প্রয়োজনীয়তা যত বেশী হইবে, সেই সকল দ্রব্যের চাহিদা ততই অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক (inelastic) হইবে। এই কারণে চাল, লবণ, জামা-কাপড়, ভোজ্য তৈল ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়। কারণ ইহাদের দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। পক্ষান্তরে, রেডিও, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন সেট, দামী অলংকার, সৌখিন আসবাবপত্র প্রভৃতি বিলাস দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক (relatively elastic) হয়। ইহাদের দামের সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে চাহিদার পরিমাণে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। অবশ্য ক্রেতার নিকট কোন্ দ্রব্যটি প্রয়োজনীয় এবং কোন্‌টি বিলাস-যোগ্য তাহা মূলত তাহার আয়, রুচি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

(খ) **বিকল্প দ্রব্যের অস্তিত্ব ঃ** যে-সকল দ্রব্যের বিকল্প (substitutes) আছে, তাহাদের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক (relatively elastic) হইবে। চা ও কফি পরস্পর বিকল্প দ্রব্য ; চা-এর দাম বৃদ্ধি পাইলে, উহার পরিবর্তে লোকেরা অধিক পরিমাণে কফি পান করিবে, ফলে চা-এর চাহিদা বিশেষ হ্রাস পাইবে। সুতরাং চা-এর চাহিদা এই ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপক হইবে। কিন্তু যে দ্রব্যের কোন বিকল্প নাই উহার চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়।

(গ) **ব্যবহারের বৈচিত্র্য ঃ** যেসকল দ্রব্য একাধিক কাজের জন্য ব্যবহার করা যায়, সেই সকল দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হয়। যেমন—বিদ্যুৎ বা ইস্পাতের ব্যবহারের বৈচিত্র্য (variety of uses) আছে। বিদ্যুৎ-শক্তি আমাদের বহু কাজে লাগে, যেমন—বাতি জ্বালানো, পাখা চালানো, ইস্ত্রি করা, রান্না করা, যন্ত্রপাতি চালানো ইত্যাদি কাজে ইহা ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যয় হ্রাস পাইলে ইহা শুধু বাতির কাজেই ব্যবহার করা হইবে না, ইহা তখন অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা হইবে। ফলে উহার চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে। আবার, বিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য উহা ব্যবহার করা হইবে না। সুতরাং উহার চাহিদা বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে। এই কারণে বিদ্যুৎ-শক্তির চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হইবে।

(ঘ) দ্রব্যের স্থায়িত্ব ঃ যে-সকল দ্রব্যের স্থায়িত্ব খুব বেশী, সেইসকল দ্রব্যের

চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়। কারণ ঐ সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তন কিছুকালের জন্য উপেক্ষা করা যায়, যেমন—ঘরের আসবাবপত্রের চাহিদা। দাম হ্রাস পাইলেই সঙ্গে সঙ্গে উহা অধিক সংখ্যায় ক্রয় করা হয় না। আবার উহাদের দাম বৃদ্ধি পাইলেও প্রয়োজন পড়িলে ঐগুলি ক্রয় করিতেই হয়। ঐগুলি বহুদিন স্থায়ী থাকে বলিয়া দাম বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ক্রেতা উহা ক্রয় করিয়া থাকে।

(ঙ) **ভোগ-বিরতির সম্ভাবনা ঃ** যে-সকল দ্রব্যের ভোগ সাময়িককালের জন্য স্থগিত রাখা হয়, তাহাদের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হয়। খাদ্যদ্রব্যের ভোগ স্থগিত রাখা সম্ভব নয়, সেই কারণে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়। কিন্তু গরমের দেশে শীতের পোশাকের দাম বৃদ্ধি পাইলে উহার চাহিদা বিশেষভাবে হ্রাস পায়। কারণ উহার ভোগ স্থগিত রাখা যায়। সুতরাং গরমের দেশে শীতের পোশাকের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক।

(চ) **দামের স্তর ঃ** কোন জিনিসের দাম যখন খুব বেশী হয়, তখন উহার চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হয়। কারণ, দাম আরও বৃদ্ধি পাইলে উহার চাহিদা বিশেষ হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে, কোন জিনিসের দাম যখন খুব কম হইয়া পড়ে তখন উহার চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়। কারণ দাম এত কম হয় যে দাম আরও কমিলে চাহিদা বিশেষ বাড়ে না। সুতরাং দামের উচ্চস্তরে চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক, কিন্তু দামের নিম্নস্তরে চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়।

(ছ) **অভ্যাসগত চাহিদা ঃ** অভ্যাস বা নেশাবশত যে-সকল দ্রব্যের ভোগ করা হয় সেইগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে বলিয়া উহাদের চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়। পান, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি দ্রব্যগুলি মানুষ অভ্যাসবশত ভোগ করে, উহাদের দাম বৃদ্ধি পাইলেও চাহিদা বিশেষ হ্রাস পায় না।

(জ) **প্রান্তিক উপযোগ হ্রাসের মাত্রা ঃ** যে-সকল দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে প্রান্তিক উপযোগ দ্রুত হারে হ্রাস পায়, সেই সকল ক্ষেত্রে চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়। দ্রব্যের বিশেষ বিকল্প ব্যবহার না থাকিলে ভোগবৃদ্ধির সংগে উহার প্রান্তিক উপযোগ দ্রুত হারে হ্রাস পায়। সুতরাং উহার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। কিন্তু যে-সকল দ্রব্যের বহু বিকল্প ব্যবহার থাকে, ভোগ-বৃদ্ধির সংগে উহাদের প্রান্তিক উপযোগ ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। উহাদের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হইবে।

(ঝ) **দ্রব্যের জন্য ব্যয় ও ভোগকারীর আয়ের অনুপাত ঃ** কোন দ্রব্যের জন্য যে ব্যয় করা হয়, তাহা আয়ের এক বিরাট অংশ হইলে উহার চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হয়। কারণ দ্রব্যটির দাম তখন বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা বিশেষভাবে হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে, আয়ের এক সামান্য অংশ যখন কোন দ্রব্যের জন্য ব্যয় করা হয়, তখন উহার চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়। ধনী ব্যক্তিরা তাহাদের আয়ের সামান্য অংশ গাড়ীর জন্য ব্যয় করে। ফলে, ধনী ব্যক্তিদের নিকট উহার চাহিদাও অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়।

(ঞ) **ভোগকারীর আয়স্তর ঃ** চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা লোকদের আয়স্তরের উপর নির্ভর করে। দাম পরিবর্তনের ফলে উচ্চ আয়-বিশিষ্ট লোকদের ভোগকর্মে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না, কিন্তু নিম্ন আয়-বিশিষ্ট লোকদের ভোগকর্মে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়। মাছের দাম বৃদ্ধি পাইলেও ধনী ব্যক্তিরা প্রায় পূর্বের ন্যায় মাছ ক্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু গরীব লোকেরা উহার ভোগ হ্রাস করে। সুতরাং উচ্চ-আয়ের লোকেদের নিকট মাছের চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক, কিন্তু নিম্ন-আয়ের লোকেদের নিকট উহার চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক।

(ট) **সময়মেয়াদ ঃ** অধ্যাপক স্টিগ্‌লোর এর (Stigler) মতে, দামের পরিবর্তন দীর্ঘকাল বজায় থাকিলে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের (যেমন—সরিষার তেল) দাম বৃদ্ধি বহুদিন বজায় থাকিলে উহার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়। কারণ স্বল্পকালীন সময়ে উহার ভোগ হ্রাস করা যায় না, কিন্তু দাম বৃদ্ধি বেশ কিছুদিন চলিতে থাকিলে লোকেরা তখন উহার বিকল্প দ্রব্যাদির [যেমন—সরিষার তেলের বিকল্প বাদাম তেল, রেপসীড (rapeseed) তেল] দিকে ক্রেতারা আকৃষ্ট হয় এবং ফলে উহার চাহিদা আরও অধিক স্থিতিস্থাপক হয়।

৫. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ধারণাটির প্রয়োগ ও গুরুত্ব ঃ (Application and Importance of the concept of Elasticity of Demand) ঃ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ধারণাটির নানারূপ তত্ত্বগত ও বাস্তব গুরুত্ব দেখা যায়। কয়েকটি প্রধান গুরুত্ব এখানে উল্লেখ করা হইল ঃ

(ক) **চাহিদার উপর দাম-পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ ঃ** দাম পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যের চাহিদার উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে, তাহা স্থিতিস্থাপকতা ধারণাটি প্রয়োগ করিয়া অনুধাবন করা যায়। কোন দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হইলে দামের সামান্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদার বিরাট পরিবর্তন ঘটে। পক্ষান্তরে, অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তন চাহিদার খুবই সামান্যই পরিবর্তন ঘটায়। সুতরাং, ব্যবসায়ের দাম ও মুনাফা সম্পর্কে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সম্যক্‌ভাবে বিচার করিতে হয়।

(খ) **মূল্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ঃ** মূল্যতত্ত্বের (theory of price) ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা ধারণাটির বিশেষ গুরুত্ব দেখা যায়। কোন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনে গড় আয় ও প্রান্তিকআয়ের (average revenue and marginal revenue) সম্পর্ক বাহির করিতে হইলে এই ধারণাটির প্রয়োজন পড়ে। দাম-নির্ধারণের জন্য স্থিতিস্থাপকতার সাহায্যে এই দুইয়ের সম্পর্কে বিচার করিতে হয়। এই সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

(গ) **একচেটিয়া কারবারীর নিকট গুরুত্ব ঃ** একচেটিয়া কারবারী এই ধারণাটি প্রয়োগ করিয়া তাহার দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে। একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের

চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হইলে সে ইহার জন্য কম দাম আদায় করিবে, কারণ বেশী দামে সে ইহা বিক্রয় করিতে পারিবে না। কিন্তু অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে সে উচ্চ দাম আদায় করিবে। কারণ উচ্চ দামেও উহা বিক্রয় হইবে। ইহা ছাড়া, দাম-পৃথকীকরণের (price discrimination) ক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োজন পড়ে। যে-বাজারে একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যটির চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হয়, সেই বাজারে সে কম দামে উহা বিক্রয় করিবে। কিন্তু যে-বাজারে উহার চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক, সেখানে সে অধিক দামে বিক্রয়ের চেষ্টা করিবে; কারণ দাম অধিক হইলেও তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইবে না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন বাজারে একই দ্রব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাম আদায়ের জন্য একচেটিয়া কারবারীকে ভিন্ন ভিন্ন বাজারে তাহার দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিচার করিতে হয়।

(ঘ) **যুক্ত-যোগানের দ্রব্যের দাম-নির্ধারণে প্রয়োগ :** তুলা ও তুলাবীজ, পশম ও মাংস, গ্যাস ও কোক-কয়লা প্রভৃতি হইতেছে যুক্ত যোগানের (joint supply) দ্রব্য। কারণ, উহাদের যে কোন একটির যোগান বৃদ্ধি পাইলে অপরটির যোগান বৃদ্ধি পায়। ইহা ছাড়া, ঐ দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় পৃথক করা যায় না, উহাদের দাম-নির্ধারণের জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপক ধারণাটি প্রয়োগ করিতে হয়। যেমন—তুলা ও তুলাবীজ একত্রে উৎপাদিত হয় বলিয়া উহাদের পৃথক উৎপাদন ব্যয় বাহির করা যায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে তুলা ও তুলাবীজের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়া উহাদের পৃথক দাম নির্ধারণ করিতে হয়। তুলাবীজের তুলনায় তুলার চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হইলে তুলার জন্য অধিক দাম এবং তুলাবীজের জন্য অপেক্ষাকৃত কম দাম ধার্য করিতে হয়।

(ঙ) **শ্রমিক সংঘ কর্তৃক মজুরি বৃদ্ধি ও চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা :** শ্রমিকসংঘের মজুরি বৃদ্ধি করার ক্ষমতা বিচার করার জন্য শ্রমিকের শ্রমকার্যের চাহিদার স্থিতি-স্থাপকতা বিচার করিতে হয়। মালিকের নিকট যে-সকল শ্রমিকের শ্রমকার্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক অর্থাৎ খুবই প্রয়োজনীয় হইলে মালিক শ্রমিকের পরিবর্তে অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করিতে পারে না। এমতাবস্থায় শ্রমিক সংঘ চাপ দিয়া ঐ সকল শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে। ইহা ছাড়া, শ্রমিকরা যে-সকল দ্রব্য তৈয়ারী করে, উহাদের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে মালিক দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করিয়া শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবী পূরণ করিতে পারে; এইক্ষেত্রেও শ্রমিক সংঘ চাপ দিয়া মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারে। পক্ষান্তরে, শ্রমিকের শ্রমকার্য বা উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা স্থিতি-স্থাপক হইলে শ্রমিক সংঘ চাপ দিয়া মজুরি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয় না।

(চ) **করস্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব :** করস্থাপনের ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপক ধারণাটির বাস্তব উপযোগ (practical utility) দেখা যায়। কোন দ্রব্যের উপর কর-স্থাপনের জন্য অর্থমন্ত্রীকে উহার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিচার করিতে হয়। চিনি,

সুতীবস্ত্র, কেরোসিন, সাবান, ভোজ্যতৈল ইত্যাদি অস্থিতিস্থাপক চাহিদার দ্রব্যের উপর কর ধার্য করিয়া অর্থমন্ত্রী অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করিতে পারিবে। কারণ এই সকল দ্রব্যের উপর কর ধার্যের ফলে দাম বৃদ্ধি পাইলেও উহাদের চাহিদা বা বিক্রয় বিশেষ হ্রাস পায় না। কিন্তু মোটরগাড়ী, সৌখিন আসবাবপত্র, টেলিভিশন, দামী অলংকার ইত্যাদির উপর কর ধার্য করা হইলে দাম বৃদ্ধির ফলে উহাদের চাহিদা বা বিক্রয় বিশেষভাবে হ্রাস পায়। সুতরাং উহাদের উপর কর ধার্য করিয়া রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইতে পারে। অনুরূপভাবে সরকার কর্তৃক ভরতুকী (subsidies) প্রদানের ক্ষেত্রেও এই ধারণাটি প্রয়োগ করিয়া উহার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করা যায়।

(ছ) কর-চালানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ঃ কর-চালানের (shifting of tax) ক্ষেত্রে এই ধারণাটির গুরুত্ব দেখা যায়। কোন দ্রব্যের উপর কর ধার্য করা হইলে বিক্রেতা উহার দাম বৃদ্ধি করিয়া করের বোঝা (the burden of tax) ক্রেতার উপর চালান দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ইহা সম্ভব হয় না। অস্থিতিস্থাপক চাহিদার দ্রব্যের উপর কর ধার্য করা হইলে বিক্রেতা উহার দাম বৃদ্ধি করিয়া ক্রেতার উপর করের বোঝা চালান দিতে পারিবে। কারণ অস্থিতিস্থাপক দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইলেও ক্রেতারা উহা ক্রয় করিতে একরূপ বাধ্য থাকে। পক্ষান্তরে, স্থিতিস্থাপক চাহিদার দ্রব্যের উপর কর-স্থাপন করা হইলে বিক্রেতা করের বোঝা ক্রেতার উপর সহজে চালান দিতে পারে না। কারণ, স্থিতিস্থাপক দ্রব্যের দাম-বৃদ্ধির ফলে উহার চাহিদা বা বিক্রয় বিশেষ ভাবে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিক্রেতা কর চালনা করিতে কতখানি সমর্থ হইবে তাহা অবশ্য দ্রব্যটির যোগানের স্থিতিস্থাপকতার (elasticity of supply) উপরও নির্ভর করে।

৬. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Elasticity of Demand and Marginal Utility) ঃ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে যে বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায়, ইহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে (১৭৪ পৃঃ)। কোন দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে উহার প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে একই হারে হ্রাস পায় না। যে-সকল দ্রব্যের বিকল্প ব্যবহার আছে (যেমন—বিদ্যুৎ-শক্তি বা ইস্পাত) সেই সকল ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। কারণ দাম হ্রাস পাইলে উহা বিভিন্ন বিকল্প কাজে ব্যবহার করা হইবে এবং উহার প্রান্তিক উপযোগ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হইবে এবং দামের সামান্য হ্রাসের ফলে চাহিদার বিশেষ বৃদ্ধি ঘটিবে। যেমন,—গ্রীষ্মকালে যখন আম প্রচুর পাওয়া যায় তখন আমের দাম সামান্য হ্রাস পাইলে উহার চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। কারণ তখন আম সস্তা হওয়ায় উহা নানারূপে কাজে ব্যবহার করা হয় (যেমন—

আমের চাটনি, আমসত্ত্ব, আমের রস ইত্যাদি)। এইক্ষেত্রে আমের ভোগ-বৃদ্ধির সঙ্গে উহার প্রান্তিক উপযোগ ধীরে গতিতে হ্রাস পাইতে থাকে।

পক্ষান্তরে, যে-সকল দ্রব্যের বিশেষ কোন বিকল্প ব্যবহার (যেমন,—চিনি, লবণ ইত্যাদি) নাই, তাহাদের ক্ষেত্রে ভোগবৃদ্ধির সঙ্গে প্রান্তিক উপযোগ অধিক হারে হ্রাস পায়। বিকল্প ব্যবহার না থাকায় ইহাদের ভোগের সুযোগ কম থাকে। ফলে একই উদ্দেশ্যে ইহার ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইলে প্রান্তিক উপযোগ অধিক হারে হ্রাস পাইতে থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়। কারণ দামের সামান্য হ্রাসের ফলে বিকল্প ব্যবহার না থাকার জন্য ইহার চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না।

সুতরাং দেখা যায়, প্রান্তিক উপযোগ যত কম হারে হ্রাস পায় চাহিদা ততই অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক এবং প্রান্তিক উপযোগ যত অধিক হারে হ্রাস পায় চাহিদা ততই অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়।

৭. **ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ধারণা (Concept of Consumer's Surplus) :** অধ্যাপক মার্শাল (Marshall) 'ভোগকারীর উদ্বৃত্ত' ধারণাটি বিশ্লেষণ করেন। তিনি ইহার একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন : কোন ব্যক্তি যখন কোন দ্রব্যের জন্য বেশী দাম দিতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত স্বল্পদামে উহা ক্রয় করিতে সমর্থ হয় তখন সে যে-সুবিধা (বা, উদ্বৃত্ত উপযোগ) ভোগ করে তাহা ঐ ভোগকারীর উদ্বৃত্ত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে (The benefit which a person derives from purchasing at a low price things for which he would rather pay a high price than go without, may be called his consumer's surplus—*Marshall*)। এই ধারণাটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। দেখা যায়, কোন দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে উহার প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাইতে পাইতে অবশেষে দামের সমান হয়। দাম কিন্তু দ্রব্যটির সকল এককের জন্য একই দিতে হয়। সুতরাং যে-এককে ক্রেতা দ্রব্যটি ক্রয় বন্ধ করে উহার পূর্ববর্তী এককগুলিতে প্রান্তিক উপযোগ দামের তুলনায় বেশী হয়। ঐ এককগুলি হইতে 'উদ্বৃত্ত উপযোগ (surplus satisfaction) হইতেছে। ধারণাটি আরও পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

কোন একজন ক্রেতা কোন দ্রব্যের জন্য যে দাম দিতে ইচ্ছুক উহা তাহার 'ব্যক্তিগত চাহিদা দাম' (individual demand price) এবং দ্রব্যটির জন্য প্রকৃতপক্ষে সে যে দাম দিয়া থাকে, তাহা হইতেছে 'বাজার দাম' (market price)। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়, দ্রব্যটির ব্যক্তিগত চাহিদা-দাম উহার বাজার দাম বেশী হইতেছে অর্থাৎ ক্রেতা যে দামে ক্রয় করিতে চাহে তাহা অপেক্ষা কম দামে বাস্তব উপায়ে ক্রয় করিতে সক্ষম হইতেছে। ব্যক্তিগত চাহিদা দাম ও বাজার দামের মধ্যে জন্য অর্থম

যে ইতিবাচক অন্তরফল (positive difference) দেখা যায়, তাহাই হইতেছে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত। অন্যভাবে বলা যায়, কোন দ্রব্যের বাস্তব দাম অপেক্ষা সম্ভাব্য দাম যতখানি বেশী (excess of the potential price over the actual price) হয়, তাহাই হইতেছে ভোগকারী উদ্বৃত্ত। ধরা যাউক, কোন একজন ক্রেতা কোন একটি হাতঘড়ির জন্য ৫০০ টাকা দিতে রাজী আছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চাহিদা-দাম হইতেছে ৫০০ টাকা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাতঘড়িটির দাম ৪৫০ টাকা, অর্থাৎ বাজার দাম ৪৫০ টাকা। এখানে সে হাতঘড়ির জন্য ৪৫০ টাকা দিয়া ৫০০ টাকার সমান উপযোগ পাইল। সুতরাং ভোগোদ্বৃত্ত হইল (৫০০ টাকা – ৪৫০ টাকা) ৫০ টাকার সমান। ইহা আর একটি উদাহরণের দ্বারা বুঝানো হইল ঃ

কমলালেবুর সংখ্যা	ব্যক্তিগত চাহিদা-দাম	বাজার দাম	ভোগাকারীর উদ্বৃত্ত
১ম	২৫ পয়সা	১০ ,,	১৫ পয়সা
২য়	২০ ,,	১০ ,,	১০ ,,
৩য়	১৫ ,,	১০ ,,	৫ ,,
৪র্থ	১০ ,,	১০ ,,	০ ,,

সুতরাং ভোগকারীর মোট ভোগোদ্বৃত্ত হইবে ... ... ৩০ পয়সা

ইহা অন্যভাবেও বুঝানো যায়। যেমন—

ভোগকারীর উদ্বৃত্ত = মোট উপযোগ – (মোট ক্রয়ের পরিমাণ × প্রান্তিক উপযোগ বা দাম)।

উপরের উদাহরণে মোট উপযোগ হইতেছে (২৫+২০+১৫+১০) ৭০ পয়সা। মোট ক্রয়ের পরিমাণ ৪ একক এবং প্রান্তিক উপযোগ বা দাম হইতেছে ১০ পয়সা। অতএব ভোগকারীর উদ্বৃত্ত হইতেছে = ৭০ – (৪ × ১০ পয়সা)

= ৭০ পয়সা – ৪০ পয়সা = ৩০ পয়সা

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, কোন দ্রব্যের মোট উপযোগ এবং ইহার জন্য যে মোট ব্যয় করা হয়, উহাদের ব্যবধানকে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত বলা হইবে।

ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ধারণাটি নিম্নের রেখাচিত্রে দেখানো হইল ঃ
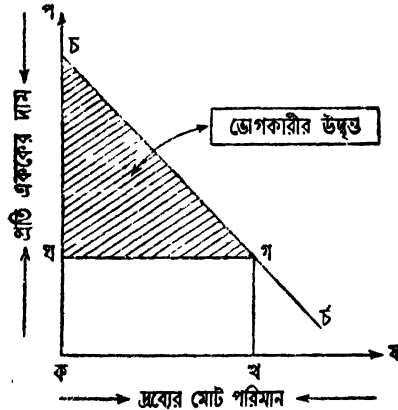
চিত্র ১৫

উপরের রেখাচিত্রে **কপ** প্রতি এককের দাম এবং কফ দ্রব্যের মোট পরিমাণ নির্দেশ দেয়। **চচ'** চাহিদা বা উপযোগ রেখা। **কখ** পরিমাণ দ্রব্যটি হইতে মোট উপযোগ পাওয়া যায় **কখগচ**। **কখ** পরিমাণ ক্রয় করা হইলে প্রতি এককের দাম হয় **খগ**। সুতরাং **কখ**-এর জন্য মোট দাম দিতে হইতেছে **কখগঘ** (= **কখ** × **খগ**)। মোট উপযোগ **(কখগচ)** হইতে মোট দেয় দাম (কখগঘ) বাদ দিলে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত পাওয়া যাইবে এবং উহা হইতেছে **চঘগ**। সুতরাং চিত্রে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত হইতেছে **চঘগ**। ব্যক্তিগত চাহিদা-দামের কোনরূপ পরিবর্তন না ঘটিলে বাজার-দাম হ্রাস পাইলে এই উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায় এবং বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইলে উহা হ্রাস পায়।

হিক্স-এর বিকল্প বিশ্লেষণ ঃ অধ্যাপক হিক্স (Hicks) ভোগকারীর উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে একটি বিকল্প ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে, কোন জিনিসের দাম হ্রাস পাইলে ভোগকারী তখন উহা কম দামে ক্রয় করিতে পারে এবং উহার ফলে তাহার আর্থিক আয়ে কিছুটা সাশ্রয় বা লাভ (gain in money income) হয়। আয়ের ঐ লাভকেই হিক্স (Hicks) ভোগকারীর উদ্বৃত্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ধরা যাউক, কোন একটি জিনিসের প্রতি একক দাম ৫ টাকা এবং ভোগকারী তখন উহা এক একক ক্রয় করে। কিন্তু উহার দাম হ্রাস পাইয়া ৪ টাকা ৫০ পয়সা হইল। সুতরাং ভোগকারী উহা এখন কম দাম দামে কিনিয়া ৫০ পয়সা বাঁচাইতে পারে। ঐ ৫০ পয়সা হইতেছে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত। কারণ দাম কম হওয়ার ফলে ঐ ৫০ পয়সা দিয়া সে হয়তো ঐ জিনিস আরও একটু বেশী ক্রয় করিবে বা উহা দ্বারা অন্য কোন একটি জিনিস ক্রয় করিবে। সুতরাং দেখা যায়, দাম হ্রাস পাওয়ায় ক্রেতার আর্থিক আয়ে কিছুটা সাশ্রয় হওয়ায় সে কিছুটা উদ্বৃত্ত পরিতৃপ্তি (surplus satisfaction) ভোগ করিতে পারিতেছে।

'ভোগকারীর উদ্বৃত্ত' ধারণাটির অসুবিধা : ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ধারণাটির কতকগুলি অসুবিধা দেখা যায় :

(ক) টাকার স্থির প্রান্তিক উপযোগ : এই ধারণাটি বিশ্লেষণের সময় মার্শাল (Marshall) ক্রেতার নিকট টাকার প্রান্তিক উপযোগ স্থির (constant) থাকে এইরূপ ধরিয়া লইয়াছেন। হিক্‌স (Hicks) প্রমুখ লেখকরা দেখাইয়াছেন, টাকার প্রান্তিক উপযোগ স্থির ধরা হইলে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত পরিমাপ করিতে বিরাট অসুবিধা দেখা যায়। কারণ ক্রেতা কোন একটি জিনিস যখন ক্রমান্বয়ে ক্রয় করিতে থাকে তাহার টাকার পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পায় এবং ইহার ফলে টাকার প্রান্তিক উপযোগ তাহার নিকট বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তখন তাহাকে পূর্ববর্তী এককের উদ্বৃত্ত-উপযোগ পুনর্মূল্যায়ন (revaluation) করিতে হয়। অবশ্য কোন ক্রেতা যখন কোন জিনিসের জন্য অল্প পরিমাণ টাকাকড়ি ব্যয় করে তখন টাকার প্রান্তিক উপযোগ একরূপ স্থির থাকিতে পারে। কিন্তু উহার জন্য বিরাট পরিমাণ টাকাকড়ি ব্যয় করিলে টাকার প্রান্তিক উপযোগ বাড়িয়া যাইবে। এইরূপ অবস্থায় উদ্বৃত্ত-উপযোগ পরিমাপ-করিতে অসুবিধা দেখা দেয়।

(খ) কাল্পনিক ব্যক্তিগত চাহিদা-দাম : অধ্যাপক নিকল্‌সন (Nicholson) এই ধারণাটি নিছক কাল্পনিক ও অবাস্তব (hypothetical and unreal) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কারণ পূর্বেকার এককগুলির জন্য ক্রেতা কি পরিমাণ দাম দিতে ইচ্ছুক তাহা জানিবার কোন উপায় নাই, উহা নিছক কাল্পনিক মাত্র। ইহার ফলে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত-উপযোগ সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয় না।

(গ) সমষ্টিগত উদ্বৃত্ত-উপযোগ পরিমাপে অসুবিধা : বিভিন্ন ব্যক্তির স্বতন্ত্র উদ্বৃত্ত-উপযোগ যোগ করিয়া কোন গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের মোট উদ্বৃত্ত উপযোগ বাহির করিতে অসুবিধা দেখা দেয়। কারণ আয়, রুচি, পছন্দ ইত্যাদির তারতম্যের ফলে গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-দাম বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে।

(ঘ) প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে অসীম উদ্বৃত্ত-উপযোগ : জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের ব্যক্তিগত চাহিদা-দাম কোন কোন ক্ষেত্রে অসীম (infinite) হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহাদের জন্য ক্রেতা যে-কোন দাম দিতে রাজী থাকে। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত উপযোগ অসীম হয় এবং উহা পরিমাপ করা সম্ভব হয় না।

(ঙ) পরিবর্ত ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে অসুবিধা : পরিবর্ত (যেমন,—(চা ও কফি) এবং আনুষঙ্গিক (যেমন,—মোটরগাড়ী ও পেট্রোল) দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত-উপযোগ পরিমাপ করিতে অসুবিধা দেখা দেয়, কারণ ঐ সকল বস্তুর উপযোগ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই অসুবিধা প্রতিকারের জন্য অধ্যাপক মার্শাল পরিবর্ত দ্রব্যগুলিকে একত্রে একটি দ্রব্য গণ্য করার উপদেশ দিয়াছেন। অনুরূপভাবে আনুষঙ্গিক দ্রব্যগুলিকেও একটি দ্রব্য ধরিয়া উহাদের উদ্বৃত্ত-উপযোগ পরিমাপ করিতে হইবে।

(চ) **অতিবিলাস ও জাঁকজমক দ্রব্যের ক্ষেত্রে অসুবিধা :** অধ্যাপক টাউজিগ (Taussig) দেখাইয়াছেন, অতি-বিলাস ও আড়ম্বরপূর্ণ (যেমন,—দামী অলংকার, সৌখিন চিত্রকলা, আধুনিক আসবাবপত্র ইত্যাদি) দ্রব্যগুলির মোট উপযোগ পরিমাপ করা যায় না। সুতরাং ইহাদের ক্ষেত্রেও উদ্বৃত্ত উপযোগ পরিমাপ করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সকল দ্রব্যের জন্য কোন কোন সময় ক্রেতা যে-কোন দাম দিতে রাজী হয় বলিয়া উহাদের 'ব্যক্তিগত চাহিদা-দাম' অসীম হইয়া থাকে।

(ছ) **অবাস্তব ধারণা :** অধ্যাপক নিকলসন (Nicholson) তত্ত্বটির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ১০০ পাউন্ড ব্যয় করিয়া কিভাবে ১০০০ পাউন্ডের উপযোগ পাওয়া যায় তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইহার উত্তরে মার্শাল দেখাইয়াছেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্যের জন্য লন্ডনে ১০০ পাউন্ড ব্যয় করিয়া যে-উপযোগ পাওয়া যায়, মধ্য আফ্রিকার কোন স্থানে ১০০০ পাউন্ড ব্যয় করিয়া সেই পরিমাণ উপযোগ পাওয়া যাইতে পারে। কারণ মধ্য আফ্রিকার তুলনায় লন্ডনে আধুনিক জীবনযাত্রার সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, ভোগকারীর ক্ষেত্রেও কোন কোন সময় ১০০ পাউন্ড ব্যয় করিয়া ১০০০ পাউন্ডের উপযোগ অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-উপযোগ ভোগ করা সম্ভব হয়।

ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ধারণাটির তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক গুরুত্ব (Theoretical and Practical Importance of Consumer's Surplus) **:** ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ধারণাটির কতকগুলি তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক গুরুত্ব দেখা যায় :

(ক) **ব্যবহারিক মূল্য ও বিনিময় মূল্যের মধ্যে পার্থক্য :** ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ধারণাটি দ্বারা কোন বস্তুর ব্যবহারিক মূল্য (value-in-use) এবং বিনিময় মূল্য, (exchange value)—এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য থাকিতে পারে তাহা দেখানো যায়। ব্যক্তিগত চাহিদা-দামকে বস্তুটির ব্যবহারিক মূল্য এবং বাজার দামকে বিনিময় মূল্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সুতরাং ভোগোদ্বৃত্ত থাকিলেই বুঝা যায় বস্তুটির ব্যবহারিক মূল্য উহার বিনিময় মূল্যে অপেক্ষা বেশী হইবে।

(খ) **কল্যাণধর্মী অর্থবিদ্যায় গুরুত্ব :** আধুনিক কল্যাণধর্মী অর্থবিদ্যায় (welfare economics) এই ধারণাটি ব্যবহার করা হয়। কোন ব্যক্তি বা কোন গোষ্ঠীর কল্যাণ উহাদের ভোগোদ্বৃত্ত দ্বারা পরিমাপ করা যায়। ক্রেতার ভোগোদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাইলে তাহার কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ ধরা হয়। আবার বিভিন্ন ব্যক্তির ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ তুলনা করিয়া তাহাদের কল্যাণের তারতম্য বাহির করা যায়। অবশ্য ভোগোদ্বৃত্তকে কল্যাণের মাপকাঠি (measure of welfare) হিসাবে ব্যবহার করিতে নানারূপ অসুবিধা দেখা দেয়।

(গ) **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভের পরিমাপ :** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে কোন দেশের কতখানি লাভ হয় তাহা ভোগোদ্বৃত্ত দ্বারা পরিমাপ করা যায়।

বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে যে-দেশের অধিবাসীদের ভোগোদ্বৃত্ত বেশী হয় সেই দেশের লাভের পরিমাণও বেশী হয়। ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ কম হইলে বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণও কম হইবে।

(ঘ) একচেটিয়া কারবারীর নিকট গুরুত্ব: একচেটিয়া কারবারীর নিকট এই তত্ত্বটির বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। একচেটিয়া কারবারী যখন দাম-পৃথকীকরণ (price discrimination) নীতি অনুসরণ করে তখন সে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট ভিন্ন ভিন্ন দাম আদায় করিয়া থাকে। এই পৃথকীকরণ নীতি সে এমনভাবে প্রয়োগ করিতে পারে যাহার ফলে কোন ক্রেতারই কোনরূপ ভোগোদ্বৃত্ত থাকিবে না অর্থাৎ বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত চাহিদা-দাম অনুসারে বস্তুটির দাম আদায় করিবে।

(ঙ) পরিবেশগত সুযোগ-সুবিধার পরিমাপ: এই ধারণাটি দ্বারা বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের মধ্যে তুলনা করা সম্ভব হয়। যে-পরিবেশে ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ বেশী হয় সেই পরিবেশে বসবাস করিয়া অধিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা যায়। অধ্যাপক স্যামুয়েলসন (Samuelson) দেখাইয়াছেন, আধুনিক সমাজ পূর্বের তুলনায় কতখানি উন্নত হইয়াছে তাহা এই ধারণাটি দ্বারা দেখানো যায়। কারণ বর্তমান যুগে অপেক্ষাকৃত অনেক কম দামে বিভিন্ন ধরনের বস্তু পাওয়া যায় যাহার জন্য ক্রেতা আরও অধিক দাম দিতে প্রস্তুত থাকে। পোস্টকার্ড, সংবাদপত্র প্রভৃতি আধুনিক দ্রব্যসামগ্রীর জন্য অনেক কম দাম দিয়া অনেক বেশী উপযোগ ভোগ করা যায়।

(চ) সরকারী আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক গুরুত্ব: কর-স্থাপন বা ভরতুকী (subsisidies) প্রদানের ক্ষেত্রে এই ধারণাটির ব্যবহারিক গুরুত্ব দেখা যায়। কোন বস্তুর উপর কর-ধার্যের ফলে দাম বৃদ্ধি পায় বলিয়া দেশের জনসাধারণের ভোগোদ্বৃত্ত কিছুটা হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে, কর হইতে সরকারের কিছু পরিমাণ রাজস্ব পাওয়া যায়। অর্থাৎ কর-ধার্যের ফলে একদিকে যেমন রাজস্ব বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে তেমন দেশের জনসাধারণের ভোগোদ্বৃত্ত কিছুটা হ্রাস পায়। যে-সকল করের ক্ষেত্রে ভোগোদ্বৃত্ত-হ্রাসের পরিমাণ অপেক্ষা আদায়ীকৃত কর-রাজস্বের পরিমাণ বেশী হয় সেই সকল করই যুক্তিসংগত হইবে, অন্যথায় উহা সমাজ-কল্যাণের পরিপন্থী হইবে। অনুরূপভাবে, সরকারী ভরতুকী প্রদানের ফলে ভোগোদ্বৃত্ত কতখানি বৃদ্ধি পায় এবং উহার জন্য সরকারের কত ব্যয় হইল তাহাও বিবেচনা করিতে হয়। সুতরাং দেখা যায়, দেশের অর্থমন্ত্রীর নিকট ইহার বিশেষ ব্যবহারিক উপযোগিতা রহিয়াছে।

উপসংহার: ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ধারণাটির নানারূপ গুরুত্ব থাকার জন্য রবার্টসন (Robertson) ইহাকে 'জ্ঞানের দিক হইতে শ্রদ্ধার যোগ্য এবং ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের এক পরিচালক' (intellectually respectable and useful as a uide to practical action) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু স্যামুয়েলসন amuelson), লিট্‌ল (Little) প্রমুখ আধুনিককালের লেখকরা ইহার প্রয়োজনীয়তা

সম্পর্কে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের মতে, এই ধারণাটির তত্ত্বগত ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার বিশেষ বাস্তব উপযোগিতা নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহা হইতেছে "নিছক মূল্যহীন তত্ত্বগত খেলনামাত্র" ("a totally useless theoretical toy")। এই কারণে অনেকেই এই ধারণাটি অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু হইতে বাদ দেওয়ার উপদেশ দিয়াছেন।

৮. **চাহিদা-সূচীর স্তর (Levels of Demand Schedule) :** চাহিদা-সূচীর স্তর বলিতে দাম অপরিবর্তিত থাকিলে অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে তাহাকেই বুঝায়। 'অন্যান্য বিষয়গুলি' (other factors) বলিতে ক্রেতার পছন্দ-অপছন্দ, আয়, অন্যান্য বিষয়ের দাম, বস্তুটির ভবিষ্যৎ দাম ইত্যাদি বুঝাইতেছে। এই সকল বিষয়ের যে-কোন একটির পরিবর্তন ঘটিলে একই দামে কোন বস্তুর চাহিদা বেশী বা কম হইতে পারে। ইহা নিম্নের তালিকায় দেখানো হইল :

চাহিদা সূচীর স্তর

	১	২	
প্রতি একক দাম	চাহিদা (হ্রাসপ্রাপ্ত)	চাহিদা ←(মূল)→	চাহিদা (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত)
৫ টাকা	৮,০০০ একক	১০,০০০ একক	১,২০০০ একক
৪ ,,	১২,০০০ ,,	১৫,০০০ ,,	১,৮০০০ ,,
৩ ,,	১৫,০০০ ,,	২০,০০০ ,,	২৫,০০০ ,,

উপরের চিত্রে ২নং সারিতে মূল চাহিদা-সূচী দেখানো হইয়াছে। দেখা যায়, ৫ টাকা দামে মোট চাহিদা ১০,০০০ একক, ৪ টাকা দামে ১৫,০০০ একক এবং ৩ টাকা দামে ২০,০০০ একক। উপরি-উক্ত যে-কোন একটি বিষয়ের পরিবর্তন হইলে চাহিদা একই দামে হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহা ১নং এবং ৩নং সারিতে দেখানো হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ৫ টাকা দামে মোট চাহিদা (মূল) হইতেছে ১০,০০০ একক। কিন্তু ক্রেতার আর্থিক আয় হ্রাস পাওয়ার ফলে ৫ টাকা দামে চাহিদা হ্রাস পাইয়া হয় ৮,০০০ একক এবং আর্থিক আয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ঐ দামে চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১২,০০০ একক।

চাহিদা-সূচীর স্তর নির্ধারণকারী বিষয় : চাহিদা-সূচীর স্তর কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এ সম্পর্কে পূর্বেই (১৪০ পৃঃ) কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এখন উহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে। বিষয়গুলি হইতেছে :

ক. **ভোগকারীর পক্ষপাত :** ভোগকারীর পক্ষপাত (consumer's preference) বা পছন্দ বলিতে বিভিন্ন দ্রব্য পাওয়ার আপেক্ষিক তীব্রতাকে বুঝায়।

অর্থাৎ কোন একটি বস্তু অপেক্ষা অপর একটি অধিক পছন্দ করাকেই বুঝায়। অবশ্য ক্রেতার এই পক্ষপাত বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

ক্রেতার বিভিন্ন জিনিসের জন্য পক্ষপাতের পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদা-সূচীর স্তরে পরিবর্তন ঘটে। যেমন,—টেলিভিশন চালু হওয়ার পূর্বে রেডিও-এর উপর ক্রেতার আকর্ষণ অধিক থাকিত। কিন্তু ইহা ব্যবহারের ফলে রেডিও-এর প্রতি আকর্ষণ হ্রাস এবং টেলিভিশন-এর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতে পারে; আবার, কোন এক ধরনের জ্বালানি (যেমন—কয়লা) ব্যবহার করিতে করিতে ক্রেতারা একঘেয়ে বা বিরক্ত বোধ করিলে উহার বিকল্প জ্বালানি (যেমন,—গ্যাস) ব্যবহারের দিকে আকৃষ্ট হইবে। ইহার ফলে একই অপরিবর্তিত দামে কয়লার চাহিদা হ্রাস এবং গ্যাস-এর চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

হিকস্ (Hicks), অ্যালেন (Allen) প্রমুখ আধুনিককালের লেখকরা ক্রেতার এই পক্ষপাত বা পছন্দের ভিত্তিতে ভোগকারীর চাহিদার বিশ্লেষণ দিয়াছেন। ঐ বিশ্লেষণ অনুযায়ী দুই বা ততোধিক দ্রব্যের একটি পছন্দ-তালিকা (scale of preference) প্রস্তুত করিয়া 'নিরপেক্ষ রেখা'র (indifference curve) মাধ্যমে ভোগকারীর চাহিদা বিশ্লেষণ করিতে হয়।[১]

খ. **ক্রেতার আয়ঃ** ক্রেতার আর্থিক আয়ের (money income) পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদা-সূচীর স্তরের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে দ্রব্যটির পূর্বেকার দামেই চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। আবার আর্থিক আয় হ্রাস পাইলে কোন জিনিস হয়তো পরিবারের ভোগ-তালিকা হইতে বাদ পড়িবে; এইরূপ ক্ষেত্রে একই দামে উক্ত জিনিসটির চাহিদা হ্রাস পাইবে।

দাম অপরিবর্তিত ধরিয়া ক্রেতার আয় এবং চাহিদার মধ্যে যে-সম্পর্ক দেখা যায় তাহা 'চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা'র (income elasticity of demand) দেখানো হয়। বিভিন্ন সমীক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে, ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পাইলে আরামপ্রদ ও বিলাসদ্রব্যের (যেমন,—মোটরগাড়ী, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন ইত্যাদি) চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য ক্রেতার আয় খুব নিম্নস্তর হইতে বৃদ্ধি পাইলে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির (যেমন,—চাল, ডাল, ভোজ্য তৈল ইত্যাদি) চাহিদা সামান্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সম্পর্কে পূর্বেই কিছু আলোচনা করা হইয়াছে।

গ. **অন্যান্য দ্রব্যের দামঃ** চাহিদার স্তর নির্ধারণকারী তৃতীয় বিষয়টি হইতেছে অন্যান্য দ্রব্যের দাম (prices of other commodities)। অন্যান্য দ্রব্য বলিতে বিকল্প ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যগুলিকে বুঝায়। যেমন—চা-এর বিকল্প কফি, কয়লার বিকল্প জ্বালানি-গ্যাস, মোটরগাড়ীর পরিপূরক (complementary) পেট্রোল, মাছ-মাংসের পরিপূরক ভোজ্য তৈল ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে

---

১. নিরপেক্ষ-রেখার বিশ্লেষণ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এখানে উহার আলোচনার কোন অবকাশ নাই।

চাহিদা কেবলমাত্র উহার দামের উপর নির্ভর করে না, উহা বিকল্প বা পরিপূরক দ্রব্যের দামের উপরও বিশেষভাবে নির্ভর করে। যেমন—চা-এর দাম বৃদ্ধি পাইলে উহার চাহিদা হ্রাস পাওয়া ছাড়াও কফির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় উহার চাহিদা হ্রাস পাওয়া ছাড়াও মোটরগাড়ীর চাহিদা হ্রাস পায়। সুতরাং কোন দ্রব্যের চাহিদা-স্তরের পরিবর্তন অন্যান্য পরস্পর-সম্পর্কিত দ্রব্যগুলির দামের উপর নির্ভরশীল। এই বিষয়টি 'চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা' (cross elasticity of demand) আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে (১৬৫ পৃঃ)।

ঘ. **ভবিষ্যৎ দাম সম্পর্কে প্রত্যাশা :** কোন দ্রব্যের চাহিদা উহার 'ভবিষ্যৎ দাম সম্পর্কে প্রত্যাশা' (expectation about future prices) দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয়। কোন দ্রব্যের (যেমন—সরিষার তৈল) দাম ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ প্রত্যাশা করা হইল। ক্রেতারা বর্তমানে উহা অধিক পরিমাণে অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করে। ইহার ফলে বর্তমানে চাহিদার পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে। চাল, ডাল, সরিষার তৈল প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে এইরূপ বৃদ্ধির পরিমাণ খুব অধিক হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, দ্রব্যের দাম ভবিষ্যতে হ্রাস পাইবে এইরূপ প্রত্যাশা করা হইলে ক্রেতারা বর্তমানে উহা কম পরিমাণে চাহিদা করিবে। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণে হ্রাস পায়। যেমন—টেলিভিশন যখন নূতন বাজারে আসিল তখন স্বল্পসংখ্যক পরিবার উহা ক্রয় করিল। কারণ সেই সময় প্রত্যাশা ছিল, ভবিষ্যতে উহার দাম হ্রাস পাইবে। সুতরাং দেখা যায়, কোন দ্রব্যের চাহিদা উহার ভবিষ্যতের সম্ভাব্য দামের উপর নির্ভরশীল থাকে।

ঙ. **সম্ভাব্য ভোগকারীর সংখ্যা :** কোন দ্রব্যের বর্তমান চাহিদা উহার সম্ভাব্য ভোগকারীর (number of potential consumers) সংখ্যার উপরও নির্ভর করে। বর্তমানে কোন দ্রব্যের ভোগকারীদের সংখ্যা হয়তো খুবই কম, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহা বৃদ্ধি পাইতে পারে। এইরূপ সম্ভাবনা থাকিলে বর্তমানে একই দামে কোন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে পারে। পক্ষান্তরে, ভবিষ্যতে ভোগকারীর সংখ্যা হ্রাস পাইতে পারে এইরূপ অনুমান করা হইলে চাহিদাও হ্রাস পায়। বলা বাহুল্য, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে সাধারণত কোন দ্রব্যের সম্ভাব্য ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং লোকসংখ্যা হ্রাস পাইলে সম্ভাব্য ক্রেতার সংখ্যা হ্রাস পায়। কোন নূতন নগরীতে হয়তো অধিকসংখ্যক পরিবার বসবাসের জন্য আসিতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা থাকে বলিয়া ঐস্থানে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, যে-স্থান হইতে লোকেরা অন্যত্র চলিয়া যায় সেইস্থানে লোকসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় জমির ক্রেতার সংখ্যা কমিয়া যায় বলিয়া ঐস্থানে উহার চাহিদাও হ্রাস পায়।

———

১৫

॥ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়-পরিকল্পনা, —প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের চাহিদা-বিশ্লেষণ ॥

[Sales Plan of the Business Firm—an analysis of Demand for the Product of a Firm]

[ফার্ম-এর দ্রব্যের চাহিদা—বিভিন্ন বাজারে চাহিদার তালিকার স্বরূপ ও স্থিতিস্থাপকতা—বিক্রয়লব্ধ আয়ের তালিকা-মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়—বিভিন্ন প্রকার বাজার অবস্থায় আয়ের তালিকা]

পূর্ববর্তী দুইটি অধ্যায়ে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়-পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে ভোগকারীর চাহিদা বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। কিন্তু চাহিদার ঐ বিশ্লেষণ ভোগকারীর দৃষ্টিকোণ হইতে করা হইয়াছে। বিক্রয়-পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে অনুধাবনের জন্য ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে উহার উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদাও বিশ্লেষণ করিতে হয়। বর্তমান অধ্যায়ে প্রতিষ্ঠান-বিশেষের দ্রব্যের চাহিদা (demand for the product of an individual firm) এবং উহার আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচনা করা হইল।

১. প্রতিষ্ঠান-বিশেষের বা ফার্ম-এর দ্রব্যের চাহিদা (Demand for the product of an Individual Firm) ঃ কোন একটি ফার্ম-এর দ্রব্যের বা উৎপাদনের চাহিদা বলিতে বিভিন্ন দামে উহার বিক্রয়ের পরিমাণকে বুঝায়। অর্থাৎ কোন একজন উৎপাদক তাহার উৎপাদিত দ্রব্য বিভিন্ন দামে ক্রেতার নিকট কিরূপ বিক্রয় করিতে পারিবে তাহাকেই প্রতিষ্ঠান-বিশেষের দ্রব্যের চাহিদা বলে। এই চাহিদা বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা বা বিক্রয় রেখা (the demand curve or sales curve of an individual firm) হইতে জানা যায়। বিক্রেতার দ্রব্যের ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা বলিতে দাম পরিবর্তন করিয়া একজন বিক্রেতা তাহার নিজস্ব বিক্রয়ের পরিমাণ কতটা পরিবর্তন করিতে পারে তাহাকেই বুঝায়। ফার্ম-এর দ্রব্যের চাহিদা-রেখা বা বিক্রয়-রেখা কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে বাজারের প্রকৃতির উপর। বাজারের তারতম্যের ফলে ঐ চাহিদা-রেখা বা বিক্রয়-রেখা বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে, ইহাই নীচের অংশে আলোচনা করা হইল।

২. বিভিন্ন বাজারে প্রতিষ্ঠান-বিশেষের বা ফার্ম-এর দ্রব্যের চাহিদা তালিকার স্বরূপ ও স্থিতিস্থাপকতা (Nature and Elasticity of Demand Schedules for the product of a firm under different market forms) ঃ কোন ফার্ম-এর বা বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা-তালিকার স্বরূপ ও স্থিতিস্থাপকতার বিষয়টি বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। এই কারণে এই বিষয়টি বিভিন্ন বাজারের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথকভাবে আলোচনা করা হইল ঃ

ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা ঃ পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় বহুসংখ্যক ফার্ম বা বিক্রেতা একই দ্রব্য বিক্রয় করে, ইহা পূর্বেই দেখানো

হইয়াছে।[১] এই ধরনের বাজারে কোন একজন বিক্রেতা বাজারের মোট যোগানের অতি সামান্য অংশ (a negligible fraction of the total supply) যোগান দিয়া থাকে। ইহার ফলে তাহার নিজস্ব যোগান সামান্য পরিবর্তন করিয়া বাজার-যোগানের বিশেষ পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। সুতরাং সে বাজার-যোগান ও বাজার-দাম নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় কোন ফার্মকে উহার দ্রব্যের চাহিদা-রেখা বা বিক্রয় রেখা একটি সমান্তরাল রেখা এবং ফার্ম-এর দ্রব্যের চাহিদা-রেখাটি প্রচলিত বাজার-দামে অসীম স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic) হইবে। ফার্ম-এর দ্রব্যের চাহিদা রেখাটি কিভাবে বাজার-দাম হইতে পাওয়া যায় তাহা নিম্নের পাশাপাশি দুইটি চিত্রে দেখানো হইল:
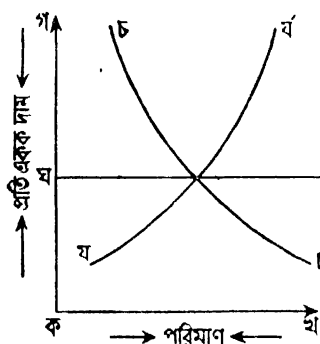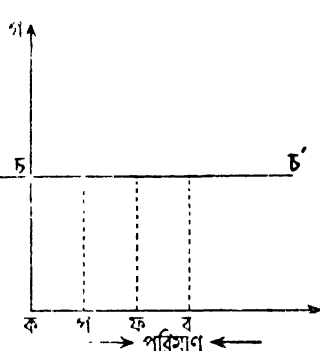
চিত্র—১৬ (ক) চিত্র—১৬ (খ)

উপরের বামদিকের চিত্রে **চচ'** ও **যয'** যথাক্রমে বাজার চাহিদা-রেখা ও বাজার যোগান রেখা। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় যেখানে চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয়, সেই স্থানে ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয়। চিত্রে দেখা যায়, **কঘ** দামে চাহিদা-রেখা ও যোগান-রেখা পরস্পর ছেদ করে অর্থাৎ চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয়। সুতরাং **কঘ** হইতেছে ভারসাম্য বাজার দাম। এখন এই **কঘ** দামে কোন ফার্মকে দ্রব্যাদির সমুদয় অংশ বিক্রয় করিতে হইবে। সুতরাং, **কঘ** এর সমান করিয়া ডানদিকের চিত্রে **কচ** দাম দেখানো হইল।

উপরের ডানদিকের চিত্রে **চচ'** রেখাটি পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় ফার্ম-এর দ্রব্যের চাহিদা-রেখা বা বিক্রয়-রেখা। রেখাটি **কখ** অক্ষের সমান্তরাল। উহার যোগানের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, উহাকে তাহা একই বাজার-দামে (ডানদিকের চিত্রে **কচ** এবং বামদিকের চিত্রে **কঘ**) বিক্রয় করিতে হয়। উহার যোগানের পরিমাণ **কপ** বা **কফ** বা **কব** হউক না কেন, উহাকে **কচ** প্রতি একক বাজার দামে

১. পৃঃ ১৩০ দ্রষ্টব্য

তাহা বিক্রয় করিতে হয়। সুতরাং, ফার্মটি হইতেছে দাম-গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান, দাম-সৃষ্টিকারী নহে (price-maker, not a price-taker)। উক্ত রেখাটির স্থিতিস্থাপকতা হইতেছে অসীম এবং রেখাটি সুনির্দিষ্ট ও স্থিতিশীল (definite and stable)।

খ. একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা : একচেটিয়া (monopoly) বাজারে শিল্পে একটিমাত্র ফার্ম থাকে। সুতরাং বিক্রেতার সংখ্যা মাত্র একজন—ইহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে (১৩২ পৃঃ)। এই ধরনের বাজার বিক্রেতার নিজস্ব যোগান হইতেছে বাজার যোগান, এবং বাজার যোগানও বাজার দামের উপর তাহার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। বিক্রেতা যোগান বৃদ্ধি করিলে দাম হ্রাস পাইবে এবং যোগান হ্রাস করিলে দাম বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং একচেটিয়া বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা রেখাটি হইতেছে নিম্নগামী অর্থাৎ উহা বাম দিক হইতে ক্রমশ ডান দিকে নামিয়া যাইবে এবং ইহার স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত স্বল্প হয়। ইহা নিম্নের রেখাচিত্রে দেখানো হইল :
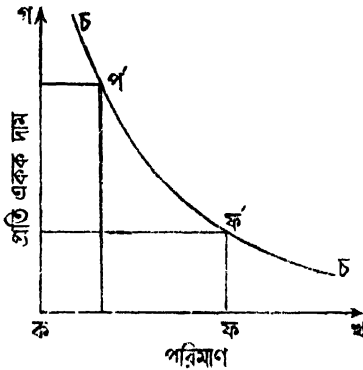
চিত্র ১৭

উপরের রেখাচিত্রে **চচ'** হইতেছে একচেটিয়া বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা রেখা বা উহার বিক্রয় রেখা। বিক্রেতা **কপ** পরিমাণ যোগান দিলে দ্রব্যের দাম হইবে **পপ'** এবং **কফ** পরিমাণ যোগান দিলে দাম হইবে **ফফ'** অর্থাৎ যোগান বৃদ্ধি করিলে প্রতি একক দাম হ্রাস পায়। সুতরাং রেখাটি বামদিক হইতে আসিয়া ডানদিক দিয়া নীচে নামিয়া যাইতেছে। রেখাচিত্র হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এইক্ষেত্রে চাহিদা রেখাটিও অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক বা স্বল্প স্থিতিস্থাপক (relatively elastic)। এই রেখাটিও সুনির্দিষ্ট ও স্থিতিশীল (definite and stable)।

গ. একচেটিয়াভাবাপন্ন বাজারে বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা : একচেটিয়াভাবাপন্ন বাজারে (monopolistic competitive market) হইতেছে অপূর্ণাঙ্গ বাজারের একটি

অন্যতম রূপ, অপর প্রধান রূপটি হইতেছে অলিগোপোলির (oligopoly) বাজার। অলিগোপোলির বাজারে কয়েকজন মাত্র বিক্রেতা বা উৎপাদক থাকে এবং ঐ বাজারে কোন বিক্রেতার সুনির্দিষ্ট ও স্থিতিশীল বিক্রয়-রেখা থাকে না। কিন্তু একচেটিয়া-ভাবাপন্ন বাজারে বহুসংখ্যক বিক্রেতা পৃথকীকৃত তথচ ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্য বিক্রয় করে, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে (১৩৪ পৃঃ)। এই ধরনের বাজারে কোন বিক্রেতা তাহার দ্রব্যের দাম কিছুটা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিয়া নিজস্ব বিক্রয়ের পরিমাণকে বিশেষভাবে পরিবর্তন করিতে পারে। একচেটিয়াভাবাপন্ন বাজারে একজন বিক্রেতা তাহার দ্রব্যের দাম সামান্য হ্রাস করিলে এবং অন্যান্য বিক্রেতারা তাহাদের দ্রব্যের দাম হ্রাস না করিলে প্রথম বিক্রেতার বিক্রয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, একজন বিক্রেতা তাহার দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করিলে এবং অন্যান্য বিক্রেতারা তাহাদের দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি না করিলে প্রথম বিক্রেতার বিক্রয়ের পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে। সুতরাং এই ধরনের বাজারে বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদারেখাটি নিম্নগামী হইবে এবং চাহিদা-রেখাটি অপেক্ষাকৃত অধিক স্থিতিস্থাপক (অসীম স্থিতিস্থাপক নয়) হইবে। ইহা নিম্নের চিত্রে দেখানো হইল :
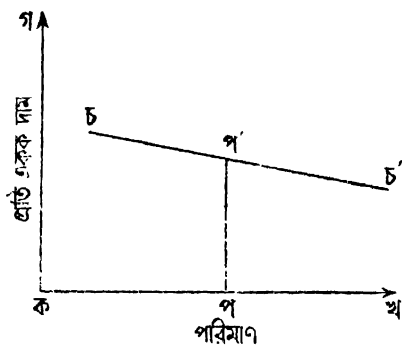
চিত্র-১৮

উপরের রেখাচিত্রে চচ' হইতেছে একচেটিয়াভাবাপন্ন বাজারে বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা রেখা। যোগান কপ হইলে দাম হইবে পপ'। রেখাচিত্রে আরও দেখা যাইতেছে, দাম পপ' হইতে সামান্য বৃদ্ধি পাইলে বিক্রয়ের পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে এবং আবার দাম সামান্য হ্রাস করা হইলে বিক্রয়ের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে। উক্ত রেখাটি নিম্নগামী, উহার ঢাল বা বক্রতা (slope) খুবই সামান্য এবং স্থিতিস্থাপকতা খুবই অধিক (reletively high elastic), কিন্তু সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক নয়।

৩. বিক্রয়-লব্ধ আয়ের তালিকা—মোট আয়, গড় আয় এবং প্রান্তিক আয় (Revenue Schedule—Total Revenue, Average Revenue and Marginal Revenue) : কোন ফার্ম-এর বিক্রয়-লব্ধ আয়ের তালিকা (revenue schedule of a firm) তিনটি বিষয় থাকে, যথা—মোট আয়, গড় আয় এবং প্রান্তিক আয়। ইহা নিম্নে আলোচনা করা হইল।

মোট আয় : কোন ফার্ম উহার মোট যোগান বিক্রয় করিয়া যে পরিমাণ অর্থ পায়, উহাকে মোট আয় (total revenue) বা মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ (total sale-proceeds) বলা হয়। যেমন—১০ টাকা প্রতি একক দামে ৫০ একক বিক্রয় করা হইলে মোট বিক্রয়-লব্ধ আয় হইবে ৫০০ টাকা। সুতরাং মোট আয় হইতেছে :

মোট আয় = বিক্রয়ের পরিমাণ × দ্রব্যের প্রতি একক দাম

মোট আয়ের বৈশিষ্ট্য হইতেছে, যোগান-বৃদ্ধির সঙ্গে দাম অপরিবর্তিত থাকিলে (যেমন—পূর্ণ প্রতিযোগিতায় অপরিবর্তিত থাকে) মোট আয়ও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু যোগান বৃদ্ধির সঙ্গে দাম ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকিলে (যেমন—একচেটিয়া বা অপূর্ণাঙ্গ বাজারে ঘটে) মোট আয় একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, পরে উহা স্থির থাকে এবং অবশেষে উহা হ্রাস পাইতে থাকে। বিভিন্ন দামে স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন রূপে হইলে মোট আয়ের এইরূপ গতিপ্রকৃতি হইয়া থাকে। ইহা পরে একটি তালিকায় দেখানো হইবে।

গড় আয় : ফার্ম-এর গড় আয় (average revenue) হইতেছে প্রতি একক গড় বিক্রয়লব্ধ অর্থ। যেমন—৫০ একক দ্রব্যের মোট আয় ৫০০ টাকা হইলে গড় আয় হইবে ১০ টাকা।

$$\text{গড় আয়} = \frac{\text{মোট আয়}}{\text{মোট বিক্রয়ের পরিমাণ}}$$

প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র (যেমন—একচেটিয়া কারবারী যখন একই জিনিসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নিকট ভিন্ন ভিন্ন দাম আদায় করে) ছাড়া গড় আয়ই হইতেছে দ্রব্যের প্রতি একক দাম (price per unit)।

প্রান্তিক আয় : কোন ফার্ম-এর প্রান্তিক আয় (marginal revenue) হইতেছে, অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয়, অর্থাৎ অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন বিক্রয় করা হইলে যে-পরিমাণ অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায় তাহাই হইতেছে প্রান্তিক আয়। অন্যভাবে বলা যায়, অতিরিক্ত এক একক উৎপন্নসামগ্রী বিক্রয় হইলে মোট আয় যে-পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাহাকে প্রান্তিক আয় বলিয়া গণ্য করা হয়। গণিতের ভাষায় বলা চলে, যখন n একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন, তখন $n+1$ বিক্রয়ের ফলে মোট আয় যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহাকেই প্রান্তিক আয় ধরা হইবে। একটি উদাহরণের দ্বারা প্রান্তিক আয় বুঝানো যাইতে পারে। যেমন ১০

একক উৎপাদন বিক্রয় করিয়া পাওয়া গেল ৪০ টাকা এবং ১১ একক বিক্রয় করিয়া পওয়া গেল ৪৪ টাকা। এইক্ষেত্রে প্রান্তিক আয় হইতেছে ৪ টাকা।[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কোন ফার্ম-এর উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও যখন বাজার-দাম স্থির (constant) থাকে, তখন দাম ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হয় ইহা নিম্নের তালিকা দেখানো যাইতে পারে ঃ

বিক্রয়ের পরিমাণ	প্রতি একক দাম বা গড় আয়	মোট আয়	প্রান্তিক আয়
১০ একক	— ২ টাকা —	২০ টাকা —	—
১১ ,,	— ,, ,, —	২২ ,, —	২ টাকা
১২ ,,	— ,, ,, —	২৪ ,, —	২ ,,
১৩ ,,	— ,, ,, —	২৬ ,, —	২ ,,

উপরের তালিকায় দেখা যায়, দাম ২ টাকায় স্থির রহিয়াছে বলিয়া দাম ও প্রান্তিক আয় সর্বত্রই সমান হইতেছে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এইরূপ সমতা দেখা যায়।

কিন্তু যোগান বৃদ্ধির সঙ্গে প্রতি একক দাম হ্রাস পাইলে দামের তুলনায় প্রান্তিক আয় কম হইবে, ইহা নিম্নের তালিকায় দেখানো হইল ঃ

বিক্রয়ের পরিমাণ	প্রতি একক দাম বা গড় আয়	মোট আয়	প্রান্তিক আয়
১০ একক	২ টাকা	২০ টাকা	—
১১ ,,	১·৯০ টাকা	২০·৯০ টাকা	০·৯০ টাকা
১২ ,,	১·৮০ ,,	২১·৬০ ,,	0.৭০ ,,
১৩ ,,	১·৭০ ,,	২২·১০ ,,	০·৫০ ,,

উপরের উদাহরণে দেখা যায়, যোগান-বৃদ্ধি সঙ্গে প্রতি একক দাম হ্রাস পাইতেছে এবং ইহার ফলে দামের তুলনায় প্রান্তিক আয় কম হইতেছে। ইহা একচেটিয়া এবং অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দেখা যায়

১ অতিরিক্ত এক একক বিক্রয় হ্রাসের ফলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় যে-পরিমাণ হ্রাস পায়, তাহাকেও প্রান্তিক আয় বলা যেতে পারে।

মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় নিম্নের তালিকায় একত্রে দেখানো হইল ঃ

পরিমাণ		প্রতি একক দাম বা গড় আয়	মোট আয়	প্রান্তিক আয়
১ একক		১০ টাকা	১০ টাকা	—
২ „	স্থি > ১	৮ „	১৬ „	৬ টাকা
৩ „		৬ „	১৮ „	২ „
৪ „	স্থি = ১	৫ „	২০ „	২ „
৫ „		৪ „	২০ „	০ টাকা
৬ „	স্থি < ১	৩ „	১৮ „	(—) ২ „
৭ „		২ „	১৪ „	(—) ৪ „
৮ „		১ „	৮ „	(—) ৬ „

যোগান বা বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দাম হ্রাস পায়—উপরের উদাহরণে তাহা ধরা হইয়াছে (অপূর্ণাঙ্গ বা একচেটিয়া বাজারের দৃষ্টান্ত) এইরূপ অবস্থায় ৪ একক পর্যন্ত মোট আয় বৃদ্ধি পাইতেছে। কারণ দামের এই সীমার মধ্যে (৮ টাকা হইতে ৫ টাকা) বিক্রেতার উৎপাদনের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক। কিন্তু দাম যখন ৫ টাকা এবং ৪ টাকা এই সীমার মধ্যে থাকে তখন চাহিদা একক-স্থিতিস্থাপক (unit elasticity) হওয়ায় মোট আয় স্থির রহিয়াছে এবং তখন প্রান্তিক আয় শূন্য হইয়া পড়িয়াছে (৫ একক উৎপাদনে)। কিন্তু দাম যখন ৩ টাকা হইতে ১ টাকা এই সীমার মধ্যে তখন বিক্রয়-বৃদ্ধির সঙ্গে মোট আয় হ্রাস পাইতেছে এবং প্রান্তিক আয় নেতিবাচক (negative) হইতেছে। দামের উক্ত সীমার মধ্যে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক (relatively inelastic) হইয়াছে।

৪. **বিভিন্ন প্রকার বাজার-অবস্থায় আয়ের তালিকা** (Revenue Schedules under different market forms) ঃ কোন ফার্ম-এর আয় তালিকা (revenue schedule) বিভিন্ন প্রকার বাজার-অবস্থায় বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। এখানে কেবলমাত্র পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং অপূর্ণাঙ্গ ও একচেটিয়া অবস্থায় বিক্রেতার আয়ের তালিকা পৃথকভাবে আলোচনা করা হইবে।

ক. **পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় আয় তালিকা ঃ** পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় শিল্পে বহুসংখ্যক ফার্ম বা বিক্রেতা থাকে এবং উহাদের উৎপাদিত দ্রব্যে কোনরূপ পার্থক্য থাকে না, ইহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় বহুসংখ্যক বিক্রেতা দ্রব্যটি বাজারে বিক্রয় করে। ইহার ফলে কোন একজন বিক্রেতা

১. ১৬৭ পৃঃ মার্শালের ভোগ-ব্যয় পদ্ধতি দ্রষ্টব্য। বিক্রেতার নিকট যাহা মোট আয় ভোগকারীর নিকট তাহা মোট ভোগ-ব্যয়। সুতরাং মার্শালের ভোগ-ব্যয় পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া এখানে স্থিতিস্থাপকতা বাহির করা যায়।

বাজার যোগানের খুব সামান্য অংশ যোগান দেয় এবং সে তাহার নিজস্ব যোগান সামান্য হ্রাস বা বৃদ্ধি করিয়া বাজারের মোট যোগানে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। ইহার ফলে তাহাকে একই বাজার দামে তাহার উৎপাদনের সমুদয় অংশ বিক্রয় করিতে হয়। ফলে তাহার দ্রব্যের প্রতি একক দাম বা গড় আয় এবং প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হইয়া পড়ে। ইহা নিম্নের তালিকায় দেখানো হইল ঃ

আয়-তালিকা (পূর্ণ প্রতিযোগিতায়)

পরিমাণ	প্রতি একক দাম বা গড় আয়	মোট আয়	প্রান্তিক আয়
১ একক	৫ টাকা	৫ টাকা	—
২ ,,	,, ,,	১০ ,,	৫ টাকা
৩ ,,	,, ,,	১৫ ,,	,, ,,
৪ ,,	,, ,,	২০ ,,	,, ,,
৫ ,'	,, ,,	২৫ ,,	,, ,,
৬ ,,	,, ,,	৩০ ,,	,, ,,

উপরের তালিকায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোন ফার্ম-এর আয়-তালিকা (revenue schedule) দেখানো হইতেছে। তালিকায় দেখা যায়, বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও প্রতি একক দাম বা গড় আয় সকল অবস্থায় অপরিবর্তিত (অর্থাৎ, ৫ টাকা) থাকে। প্রান্তিক আয়ও সকল স্তরে ৫ টাকা রহিয়াছে। মোট আয় বৃদ্ধি পাইতেছে এবং উহা সমহারে বাড়িতেছে। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় কোন ফার্ম-এর গড় আয় ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হইতেছে। ইহা একটি রেখাচিত্রের সাহায্যেও দেখানো হইল ঃ
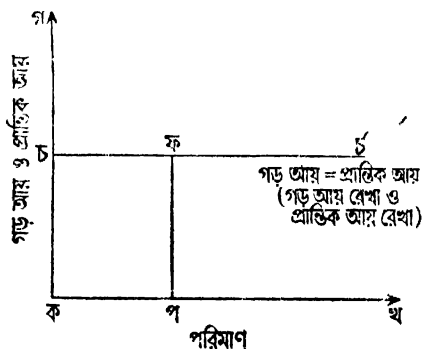
চিত্র—১৯

উপরের রেখাচিত্রে চর্চ হইতেছে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোন ফার্ম-এর গড়

আয় রেখা। এই রেখাটি **কখ** অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখা হইতেছে। একই দামে ফার্মটি বা বিক্রেতা যোগানের সমুদয় অংশ বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া গড় আয় রেখাটি এইরূপ হইতেছে। আবার এই অবস্থায় গড় আয় ও প্রান্তিক আয় সমান বলিয়া প্রান্তিক আয় রেখাটি গড় আয় রেখার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; অর্থাৎ, **চচ´** একই রেখা হইতেছে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় বিক্রেতার গড় আয় রেখা ও প্রান্তিক আয় রেখা। যেমন—**কপ** পরিমাণ বিক্রয়ে গড় আয় **পফ** এবং প্রান্তিক আয়ও **পফ**। এই অবস্থায় সকল ক্ষেত্রেই গড় আয় ও প্রান্তিক আয় একই পরিমাণ হইবে।

খ. **অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারে আয়-তালিকা:** অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা (imperfect competition) ও একচেটিয়া বাজারের (monopoly market) মধ্যে পার্থক্য থাকিলে উভয় বাজারে বিক্রেতার আয়-জালিকা প্রায় একই রূপ হইয়া থাকে। এই কারণে ইহা একই সঙ্গে আলোচনা করা হইল।

অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতার বাজার-যোগানের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে। ইহার ফলে বিক্রেতা উহার নিজস্ব যোগান বৃদ্ধি করিলে প্রতি একক দাম বা গড় আয় হ্রাস পায়। অর্থাৎ, এই ধরনের বাজারে দাম হ্রাস না করা হইলে বিক্রেতা অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিতে পারিবে না। যোগান-বৃদ্ধির সঙ্গে গড় আয় হ্রাস পায় বলিয়া গড় আয়ের তুলনায় প্রান্তিক আয় কম হয়। ইহা ১৯৩ পৃঃ তালিকায় দেখানো হইয়াছে। এখন ইহা নিম্নের রেখাচিত্রে দেখানো হইল:

চিত্র—২০

পার্শ্বের রেখাচিত্রে **চচ´** এবং **চপ** অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতার যথাক্রমে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা। বিক্রয়-বৃদ্ধির সঙ্গে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় হ্রাস পায় বলিয়া উভয় রেখা দুইটি নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে। গড় আয় অপেক্ষা প্রান্তিক আয় কম হয় বলিয়া প্রান্তিক আয় রেখাটি গড় আয় রেখার নীচে রহিয়াছে। যেমন, **কত** পরিমাণ বিক্রয়ে গড় আয় হইতেছে **তদ**, কিন্তু প্রান্তিক আয় হইতেছে **তথ**। **কল** পরিমাণ বিক্রয়ে প্রান্তিক আয় রেখাটি **কখ** অক্ষ ছেদ করে—অর্থাৎ ঐ পরিমাণ প্রান্তিক আয় শূন্য হইতেছে। ফার্ম-টির বিক্রয়ের পরিমাণ **কল** অপেক্ষা অধিক হইলে প্রান্তিক আয় নেতিবাচক হয়, এই কারণে প্রান্তিক আয় রেখাটি **কখ** অক্ষের নীচে চলিয়া গিয়াছে।
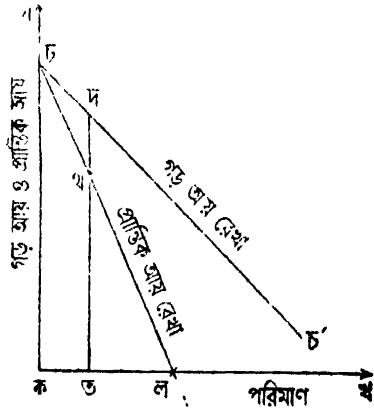
॥ উৎপাদন ॥
(Production)

"Produciton means transformation of inputs ......into outputs......The production function is the name for the relation between the physical inputs and the physical outputs of a firm......"

—WATSON

১৬

।। উপাদান ও উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক ।।

(Input and Output Relationship)

[কারকসমষ্টি ও উৎপন্ন-সামগ্রীর মধ্যে সম্পর্ক—উপাদানের সমন্বয় ও বিলিবণ্টন—প্রতিদানের বিধিসমূহ—পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি—আয়তনজনিত প্রতিদানের বিধি—ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি—ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধি—সম-উৎপাদন প্রতিদানের বিধি—উপাদানের সচলতা]

ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়-পরিকল্পনা সম্পর্কে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উহাকে যেমন ভোগকারীর চাহিদা, আয়-তালিকা ইত্যাদি বিষয়গুলি বিচার-বিবেচনা করিতে হয়, তেমনি দ্রব্য-উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে হয়। ইহা ছাড়া, উৎপাদনের জন্য কি-পরিমাণ ব্যয় করিতে হয়, তাহাও বিচার-বিবেচনা করিতে হয়। বর্তমান ও পরবর্তী অধ্যায়ে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে কিভাবে সমন্বয়-সাধন করে এবং উৎপাদন করিতে ব্যয়ের পরিমাণ কিরূপ হয়, তাহা আলোচনা করা হইবে।

১. **কারক-সমষ্টি ও উৎপন্ন-সামগ্রীর মধ্যে সম্পর্ক** (Relationship between Input and Output) ঃ কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ বা উপাদান প্রয়োজন পড়ে। যেমন—জমি, শ্রম; কাঁচামাল, মূলধন-সামগ্রী ইত্যাদি। এইগুলিকে সংক্ষেপে উৎপাদনের উপাদান (factors of production) বা উৎপাদনের কারক (inputs) বলা হয়। উপাদানের পরিমাণ ও উৎপন্ন-দ্রব্যের (output) পরিমাণ—এই দুইয়ের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায়। ইহাকে সংক্ষেপে 'উৎপাদন-অপেক্ষক' (production function) বলা হয়। বিশ্লেষণ করিয়া বলা যাইতে পারে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কি পরিমাণ দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে, তাহা দুইটি অন্যতম বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(ক) উৎপাদনের পদ্ধতি বা কলাকৌশল এবং (খ) ব্যবহৃত উপাদান বা কারকের পরিমাণ। উৎপাদন-পদ্ধতি অপরিবর্তিত ধরা হইলে দেখা যায়, উপাদানের পরিমাণে পরিবর্তনের সঙ্গে উৎপন্ন-দ্রব্যাদির পরিমাণে পরিবর্তন ঘটে। উপাদানের পরিমাণে পরিবর্তন ও উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তনের মধ্যে যে-ক্রিয়াগত সম্পর্ক (functional relationship) দেখা যায় তাহাই উৎপাদনের অপেক্ষক-এ দেখানো হয়। অধ্যাপক লিয়নটিয়েফ (Leontief)-এর ভাষায় বলা যায়, কোন একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন-প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কি পরিমাণ কারক বা উপাদান ব্যবহার করিয়া কি পরিমাণ দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে পারিবে তাহাই হইতেছে উৎপাদন-অপেক্ষক। উপাদান এবং উৎপন্ন-দ্রব্যাদির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিতে গিয়া অধ্যাপক ওয়াটসন (Watson) মন্তব্য করিয়াছেন, উপাদান-সমূহকে দ্রব্যাদিতে বা সেবাকার্যে রূপান্তর করাই হইতেছে উৎপাদন (a transfor-

mation of inputs......into output)। অর্থাৎ উপাদানসমূহ ও উৎপন্নদ্রব্যের মধ্যে যে-সম্পর্ক দেখা যায়, তাহাই হইতেছে উৎপাদন-অপেক্ষক। একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝানো যাইতে পারে। কোন একটি ছোট কারখানা দৈনিক ১০০টি কাঠের চেয়ার নির্মাণ করিতে পারে। এক্ষেত্রে ১০০টি চেয়ার তৈয়ারির জন্য যে-ন্যূনতম পরিমাণ কাঠ, বার্নিশ, শ্রম-সময়, যন্ত্রপাতি, আঠা, বিদ্যুৎ-শক্তি ইত্যাদি প্রয়োজন পড়িবে তাহাই হইবে উৎপাদন-অপেক্ষক।

উপাদান ও উৎপন্ন-দ্রব্যের মধ্যে এই সম্পর্ক অর্থাৎ উৎপাদন-অপেক্ষক বিষয়টি গণিতের ভাষায় দেখানো হয়, যেমন $x=f(a, b, \ldots\ldots n)$। ইহার অর্থ হইল, কোন প্রতিষ্ঠান $a, b, \ldots n$ বিভিন্ন উপকরণ বিভিন্ন পরিমাণে ব্যবহার করিয়া কোন একটি দ্রব্য 'x' পরিমাণ উৎপাদন করে। সুতরাং 'x' পরিমাণ উৎপাদন $a, b, \ldots\ldots n$ উপাদানসমূহের ব্যবহৃত পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে। এই উপাদানগুলির পরিমাণ একই সঙ্গে পরিবর্তন করিয়া বা উহারা যে অনুপাতে ব্যবহৃত হয়, তাহা পরিবর্তন করিয়া মোট উৎপাদন পরিরবর্তন করা যায়। উপাদানগুলির পরিমাণে আনুপাতিক পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন-দ্রব্যের পরিমাণে আনুপাতিক পরিবর্তন ঘটিলে অর্থাৎ সকল উপাদান দ্বিগুণ করার ফলে উৎপন্ন-দ্রব্যের পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে উৎপাদন-অপেক্ষক "রৈখিক সমগুণসম্পন্ন" (linearly homogeneous) হইবে।

ইহা ছাড়া, এই সম্পর্কটি অর্থবিদ্যায় প্রতিষ্ঠনের বিধিসমূহতে (Laws of Returns) বিশ্লেষণ করা হয়। ঐ বিধিগুলি এই অধ্যায়ের শেষের দিকে আলোচনা করা হইবে।

২. উপাদনের সমন্বয় ও বিলিবণ্টন (Combination and Allocation of Factors)ঃ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে কোন কিছু উৎপাদন করিতে হইলে বিভিন্ন প্রকার উপাদান বিভিন্ন অনুপাতে নিয়োগ করিতে হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন পরিমাণের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয়-সাধন করিয়া উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে দ্রব্যসামগ্রী বা সেবাকার্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হয়। বিশ্লেষণ করিয়া বলা যায়, কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে গেলে কি পরিমাণ শ্রম, কি পরিমাণ মূলধন এবং কি পরিমাণ জমি নিয়োগ করিতে হয়, তাহা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে স্থির করিতে হয়। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উপাদান এমনভাবে নিয়োগ করিবে, যাহাতে প্রতি একক উৎপাদন-ব্যয়ের পরিমাণ যেন সর্বাপেক্ষা কম (lowest cost) হয়। ইহাকে 'ন্যূনতম ব্যয়ের উপাদান-সমন্বয়' (least-cost factor combination) বলা হয়।

কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম ব্যয়ে উৎপাদনের জন্য সর্বদাই একটি উপাদানের সঙ্গে অন্যান্য উপাদানের পরিবর্তন-সাধন বা বদল (substitution) করিয়া থাকে। যন্ত্রপাতি বাড়াইয়া এবং শ্রমিক কমাইয়া বা শ্রমিক বাড়াইয়া এবং যন্ত্রপাতি কমাইয়া উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান উপাদানের কাম্য অনুপাত ঠিক করিয়া থাকে। এই কাম্য

অনুপাতের স্তরে বিভিন্ন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন পরস্পর সমান হয় এবং তখনই সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে উৎপাদন সম্ভব হয়।

বিশ্লেষণ করিয়া বলা যায়, বিভিন্ন উপাদান নিয়োগের সময় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান উপাদানগুলির 'প্রান্তিক উৎপাদন-শক্তি' (marginal prodctivity) এবং উহাদের মূল্যের অনুপাত দ্বারা পরিচালিত হয়। মার্শাল (Marshall) প্রমুখ লেখকরা দেখাইয়াছেন, ইহা বিভিন্ন উপাদান সেই পর্যন্ত নিয়োগ করিবে যেখানে উপাদানের প্রান্তিক-উৎপাদনশক্তি এবং উপাদানের মূল্য পরস্পর সমান হইবে। সুতরাং, উপাদান বিলিবণ্টনের ব্যাপারে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান নিম্নের সূত্রটি দ্বারা পরিচালিত হয় ঃ

$$\frac{\text{শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন-শক্তি}}{\text{শ্রমের মূল্য}} = \frac{\text{মূলধনেব প্রান্তিক উৎপাদন-শক্তি}}{\text{মূলধনের মূল্য}}$$

ইহাই 'সম-প্রান্তিক উৎপন্ন বিধি' (Law of Equi-marginal Returns) নামে পরিচিত। ইহার সমতুল্য 'সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধি' পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে (১৬০ পৃঃ)।

উপাদান-সমন্বয়ের আধুনিক বিশ্লেষণ—সম-উৎপন্নরেখা ঃ উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলি কিরূপ সমন্বয়ে উৎপাদক ন্যূনতম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারিবে, তাহা আধুনিক লেখকরা 'সম-উৎপন্নরেখার' (equal product curve) মাধ্যমে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী দুইটি উপাদানের বিভিন্ন সমন্বয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা যায় তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। ধরা যাউক 'চ' উপাদান ও 'ছ' উপাদানের বিভিন্ন সমন্বয়ে ২০ একক দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। ঐ দুটি উপাদানের যে-সকল সমন্বয়ে ২০ একক দ্রব্য উৎপাদন করা যায়, তাহা একটি রেখাচিত্রে দেখানো হইলে 'সম-উৎপন্নরেখা' (iso-quant) পাওয়া যায়। নিম্নে ইহা দেখানো হইল ঃ
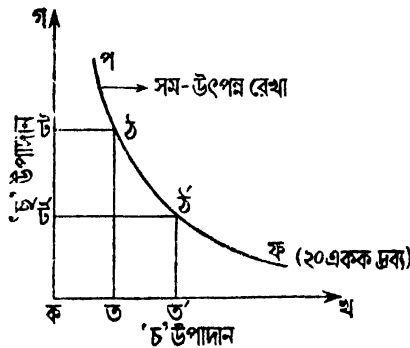
সম-উৎপন্নরেখা ও সম-উৎপন্নের মানচিত্র ঃ উপরের রেখাচিত্রে কগ অক্ষটি দ্বারা

উপাদান **'ছ'** এবং **কখ** অক্ষটি দ্বারা উপাদান **'চ'** দেখানো হইতেছে। চিত্রে দেখা যায়, **কট** পরিমাণ **'ছ'** উপাদান এবং **টঠ** পরিমাণ **'চ'** উপাদান নিয়োগ করিয়া ২০ একক উৎপাদন সম্ভব হয়। অনুরূপভাবে **কট´** পরিমাণ **'ছ'** উপাদান এবং **ট´ঠ´** পরিমাণ **'চ'** উপাদান নিয়োগ করা হইলে উৎপাদন ২০ এককই হইবে। সুতরাং **পক্ষ** রেখাটি একটি সম-উৎপন্ন-রেখা। এই রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন পরিমাণ **চ** ও **ছ** উপাদানের কতকগুলি সমন্বয় দেখানো হইতেছে এবং প্রত্যেকটি সমন্বয়ের ফলে সমান পরিমাণ উৎপাদন অর্থাৎ ২০ একক উৎপাদন সম্ভব হয়। অনুরূপভাবে **চ** ও **ছ** উপাদানের আরও কতকগুলি সমন্বয়ের ফলে আরও বেশী উৎপাদন (যেমন—৪০ একক বা ৬০ একক) করা যায় এবং উহাও পর-পর আরও কতকগুলি সম-উৎপন্নরেখা দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে দেখানো যায়। ইহা নিম্নের সমউৎপন্ন মানচিত্রে (equal product or iso-quant map) দেখানো যাইতে পারে ঃ
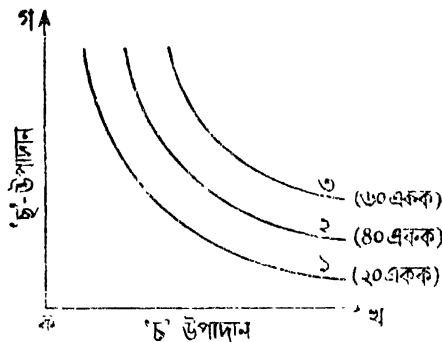
চিত্র-২২

উপরের রেখাচিত্রে বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন দেখাইবার জন্য তিনটি (১নং, ২নং, ৩নং) সম-উৎপন্ন রেখা দেখানো হইল। ১নং রেখাটিতে **'চ'** ও **'ছ'** উপাদানের বিভিন্ন সমন্বয়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ২০ একক উৎপাদন করা হয়তাহা দেখানো হইতেছে। ২নং রেখাটি দ্বারা **'চ'** ও **'ছ'** উপাদানের আরও কতকগুলি সমন্বয় দ্বারা প্রতিটি ক্ষেত্রে ৪০ একক উৎপাদন করা যায় তাহা দেখানো হয়। ৩নং রেখাটি দ্বারা **'চ'**ও **'ছ'** উৎপাদানের বিভিন্ন সমন্বয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে ৬০ একক উৎপাদন করা যায়, তাহা দেখানো হয়। সুতরাং উপরের রেখাগুলি দ্বারা আরও অধিক পরিমাণ দ্রব্য-উৎপাদন দেখানো হইতেছে।

সমব্যয় রেখা ঃ এখন প্রশ্ন হইতেছে, **'চ'** ও **'ছ'** উপাদানের কোন্ সমন্বয় অনুযায়ী উৎপাদক দ্রব্য উৎপাদন করিবে ? এই ক্ষেত্রে ক্রেতার মতো উৎপাদকেরও একটি নির্দিষ্ট বাজেট বা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ থাকে এবং সেই বাজেট নিরূপণ করার জন্য তাহাকে উপাদান-দুইটির দামের কথা বিবেচনা করিতে হয়। ইহা পরপৃষ্ঠায় রেখাচিত্রে সম-ব্যয় (iso-cost) রেখার দ্বারা দেখানো হইল ঃ

ধরা হইল, উৎপাদক 'চ' ও 'ছ' উপাদানের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ
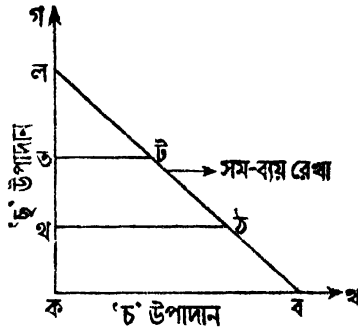
চিত্র—২৩

(যেমন—৮০ টাকা) ব্যয় করিবে। এই ৮০ টাকা হয় শুধুমাত্র 'চ' উপাদান বা শুধুমাত্র 'ছ' উপাদান বা উহা 'চ' ও 'ছ' উপাদানের মধ্যে ভাগাভাগি করা হইবে। ইহা লব রেখাটি দ্বারা দেখানো হইল। উক্ত রেখাটিকে সম-ব্যয়ের (iso-cost) রেখা বলা হয়। সম-ব্যয়রেখাটির 'ট' বিন্দু দ্বারা দেখানো হইতেছে, একজন উৎপাদক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কত পরিমাণ 'ছ' উপাদান এবং তট পরিমাণ 'চ' উপাদানের জন্য ব্যয় করিবে। উক্ত রেখাটির সকল বিন্দু দ্বারা 'চ' ও 'ছ' উপাদানের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় তাহা দেখানো হয়।

ন্যূনতম ব্যয়ের ভারসাম্য ঃ উৎপাদকের বা ফার্ম-এর সম-উৎপন্ন রেখা এবং সম-ব্যয় (iso-cost) বা বাজেট রেখাটি একত্রে দেখানো হইলে উৎপাদকের ভারসাম্য অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে উৎপাদক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের (ধরা যাউক, ৪০ একক) জন্য কতখানি 'চ' উপাদান এবং কতখানি 'ছ' উপাদান নিয়োগ করিলে তাহার উৎপাদন-ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম হইবে তাহা দেখানো যাইতে পারে। ইহা নিম্নের রেখাচিত্রে দেখানো হইল ঃ
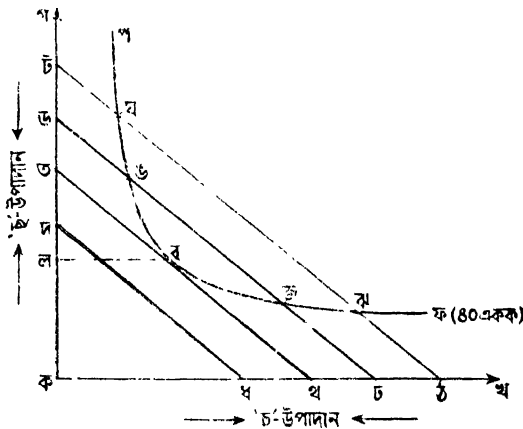
চিত্র—২৪

পূর্বপৃষ্ঠার রেখাচিত্রে **পফ** হইতেছে একটি সম-উৎপন্ন রেখা (৪০ **একক উৎপাদন**) এবং **টঠ, ডঢ, তথ** ও **দধ** রেখা চারটি পৃথক পৃথক সম-ব্যয়রেখা। এই বিশ্লেষণে বলা হয়, সম-উৎপন্নরেখাটি যেখানে সম-ব্যয় রেখার সহিত স্পর্শক (tangent) হইবে, সেই-খানে উৎপাদকের ভারসাম্য (producer's equilibrium) আসিবে। চিত্রে দেখা যায়, **পফ** সম-উৎপন্নরেখাটি '**ব**' বিন্দুতে **তথ** সম-ব্যয়রেখার সহিত স্পর্শক হইয়াছে। সুতরাং উৎপাদক **কল** পরিমাণ '**ছ**' উপাদান এবং **লব** পরিমাণ 'চ' উপাদান নিয়োগ করিয়া ৪০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিবে এবং উহা করা হইলে উৎপাদকের প্রতি একক উৎপাদন ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম হইবে। **ঘ**,ঙ,জ, বা **ঝ** বিন্দুতে উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হইতে পারে না; কারণ উহাদের প্রত্যেকটিই উপরের সমব্যয় রেখার উপর অবস্থিত। ঐ সকল ক্ষেত্রে উক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের জন্য ব্যয় ব বিন্দুর তুলনায় অধিক হইবে। আবার উৎপাদকের পক্ষে **দধ** সম-ব্যয় রেখাটি পাওয়া সম্ভব নয়; কারণ ঐ পরিমাণ ব্যয়ের দ্বারা উক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ '**চ**' ও '**ছ**' উপাদান নিয়োগ করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের জন্য (যেমন ৪০—একক) উৎপাদক **কল** পরিমাণ '**ছ**' উপাদান এবং **লব** পরিমাণ 'চ' উপাদান নিয়োগ করিবে, তাহা হইলে উপাদানের আদর্শ সমন্বয় বা 'ন্যূনতম ব্যয়ের সমন্বয়' (least-cost combination) হইবে।

৩. **প্রতিদানের বিধিসমূহ (Laws of Returns) ঃ** উপাদান-সমষ্টি ও উৎপন্ন-সামগ্রীর মধ্যে যে-সম্পর্ক আছে, তাহা বিশ্লেষণ করার জন্য অর্থবিদ্যায় কতকগুলি প্রতিদানের বিধি আলোচিত হয়। ঐ সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই বিধি-গুলিতে বিশ্লেষণ করা হয়। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে উপাদানের পরিমাণ অধিক সংখ্যায় নিয়োগ করিতে হয়। কিন্তু যে-হারে উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, ঠিক সেই হারে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেও পারে বা না-ও পাইতে পারে। এক বা একাধিক উপাদানের (যেমন—জমি বা শ্রম বা মূলধন) পরিবর্তনের ফলে মোট উৎপন্ন-সামগ্রীর (যেমন—গম, সুতীবস্ত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) কিরূপ পরিবর্তন ঘটিতে পারে, তাহাই প্রতিদানের বিধিগুলিতে বিশ্লেষণ করা হয়।

উৎপাদন-তত্ত্বের অঙ্গ হিসাবে অর্থবিদ্যায় দুই ধরনের প্রতিদানের বিধি আলোচিত হয় ঃ

ক. **পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি ঃ** উপাদানগুলির অনুপাত ও পরিমাণ পরিবর্তন করা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ কিরূপ বৃদ্ধি পায়, তাহা এই বিধিটিতে আলোচিত হয় অর্থাৎ কেবলমাত্র একটি উপাদান বৃদ্ধি করিয়া এবং অন্যান্য উপাদান স্থির রাখিলে উৎপাদনের পরিমাণ কিরূপ বৃদ্ধি পায় তাহাই বিধিটির আলোচ্য বিষয়বস্তু।

খ. **আয়তনজনিত বা মাত্রাজনিত প্রতিদানের বিধি :** উৎপাদনের আয়তন (যেমন—কারখানার আয়তন, শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ প্রভৃতি) বৃদ্ধি করা হইলে উৎপাদন-বৃদ্ধির গতি কিরূপ হইবে তাহাই 'আয়তনজনিত প্রতিদানের বিধি'-তে (laws of returns to scale) আলোচনা করা হয়। ইহার অন্তর্ভুক্ত তিনটি পৃথক বিধি আছে, যেমন—ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন-বিধি (Law of Diminishing Returns), ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন-বিধি (Law of Increa ing Returns) এবং সম-উৎপন্ন বিধি (Law of Constant Returns)।

এই দুই শ্রেণীর প্রতিদানের বিধিগুলি পরবর্তী অংশগুলিতে বিশদভাবে আলোচনা করা হইল।

৪. **পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি (Law of Variable Proportions) :** পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি মূলত একটি প্রযুক্তিগত (essentially technological one) বিধি। যে-সকল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত স্থির থাকে (যেমন—একটি লাঙলের জন্য একজন চাষী, একটি বাস-ইঞ্জিনের একজন বাস-চালক ইত্যাদি) সেই সকল ক্ষেত্রে শ্রম বা মূলধন বা জমির অনুপাত পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু উৎপাদনের নানাক্ষেত্রে উপাদানগুলির অনুপাত পরিবর্তন করা যায়; অর্থাৎ, একটি বা কয়েকটি উপাদান স্থির রাখিয়া অপর একটি উপাদান বৃদ্ধি করা যায়। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রেই পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধিটি প্রযোজ্য।

এই বিধিটি উপাদান (যেমন, শ্রম বা মূলধন) এবং উৎপন্ন-সামগ্রীর (যেমন, কয়েক টন কয়লা বা কয়েক কুইন্টাল গম প্রভৃতি) মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। অধ্যাপক বেনহামের (Benham) ভাষায় বলা যায়, কতকগুলি উপাদানের সমন্বয়ে কোন একটি উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইলে একটি নির্দিষ্ট সীমার পর প্রথমে পরিবর্তনীয় উপাদানটির প্রান্তিক ও পরে উহার গড় উৎপাদন হ্রাস পায় (As the proportion of one factor in a combination of factors is increased, after a certain point at first the marginal product and then the average product of that factor will diminish—*Benham*)। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যাইতে পারে, একটি উপাদান (যেমন—মূলধন) স্থির রাখিয়া অপর উপাদানটি (যেমন—শ্রম) বৃদ্ধি করা হইলে কোন একটি নির্দিষ্ট সীমার পর প্রথমে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন এবং পরে উহার গড় উৎপাদন উভয়ই ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে।

১. Benham—*Economics*

একটি উদাহরণ দ্বারা এই বিধিটি বুঝানো যাইতে পারে ঃ

কোন একটি নির্দিষ্ট মূলধন-যন্ত্রপাতিতে শ্রমনিয়োগের পরিমাণ	মোট উৎপাদন	গড় উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ একক	৫ একক	৫ একক	৫ একক
২ ,,	১৬ ,,	৮ ,,	১১ ,,
৩ ,,	৩৬ ,,	১২ ,,	২০ ,,
৪ ,,	৪৮ ,,	১২ ,,	১২ ,,
৫ ,,	৫৫ ,,	১১ ,,	৭ ,,
৬ ,,	৬০ একক	১০ ,,	৫ ,,
৭ ,,	৬০ ,,	৮ ৪/৭ ,,	০ ,,
৮ ,,	৫৬ ,,	৭ ,,	(—)৪ ,,

উপরের তালিকায় তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায় (distinct stages) দেখা যাইতেছে ঃ

ক। **প্রথম পর্যায়** ঃ তালিকায় দেখা যায়, ৩ একক শ্রম পর্যন্ত মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ৩ একক ও ৪ এককের পর্যায়ে মোট উৎপাদনে স্থির হারে বৃদ্ধি পায়। ৪ একক শ্রমে গড় উৎপাদনের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায় এবং উহা তখন সর্বোচ্চ হইতেছে এবং এইস্থানে গড় উৎপাদন এবং প্রান্তিক উৎপাদন পরস্পর সমান হইতেছে। ইহার পূর্বেকার এককগুলিতে (১ একক ছাড়া) গড় উৎপাদনের তুলনায় প্রান্তিক উৎপাদন বেশী হইতেছে।

খ। **দ্বিতীয় পর্যায়** ঃ তালিকার দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায়, ৫ একক ও ৭ একক শ্রমের মধ্যে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। এই পর্যায়ে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন উভয়ই হ্রাস পায়, কিন্তু গড় উৎপাদনের তুলনায় প্রান্তিক উৎপাদন কম হইতেছে। ৭ একক শ্রমে প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হইতেছে এবং মোট উৎপাদন সর্বাধিক পরিমাণ (অর্থাৎ, ৬০ একক) হইয়াছে।

গ। **তৃতীয় পর্যায়** ঃ ৭ একক শ্রমের পর (অর্থাৎ, ৮ একক শ্রমে) মোট উৎপাদন হ্রাস পায় এবং প্রান্তিক উৎপাদন নেতিবাচক (negative) হইয়াছে।

অধ্যাপক নাইট (Knight) এই বিধিটি নিম্নের রেখাচিত্র দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়াছেন ঃ
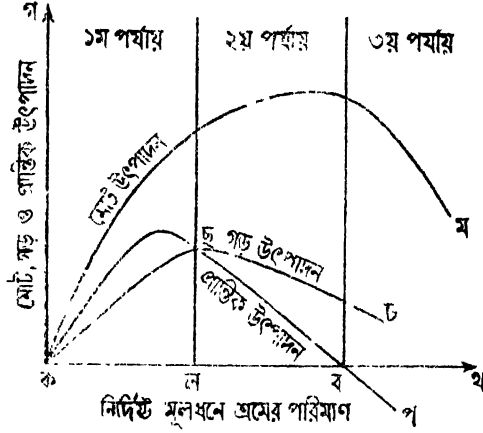
চিত্র-২৫

উপরের রেখাচিত্রে **কখ** দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধনে শ্রম-নিয়োগের পরিমাণ এবং **কগ** দ্বারা মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন দেখানো হইতেছে। **কম** রেখাটি মোট উৎপাদানের গতি, **কচ** দ্বারা গড় উৎপাদনের গতি এবং কপ দ্বারা প্রান্তিক উৎপাদনের গতি বুঝানো হইতেছে। উপরের রেখাচিত্র **কল** পরিমাণ শ্রম দ্বারা প্রথম পর্যায়, **লব** দ্বারা দ্বিতীয় পর্যায় এবং **লব** এর অতিরিক্ত শ্রম দ্বারা তৃতীয় পর্যায় দেখানো হইতেছে।

কারণসমূহ ঃ পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধিটি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সর্বজন গৃহীত একটি অন্যতম হাতিয়ার। বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিধিটির সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ইহার কারণ অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়। উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে অপর্যাপ্ত শ্রমের জন্য স্থির উপাদানটির (অর্থাৎ, মূলধন-যন্ত্রপাতি) পরিপূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় নাই এবং উহার ফলে শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করার মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যখন শ্রম ও মূলধন-যন্ত্রপাতির কাম্য সমন্বয় বা আদর্শ সমন্বয় ঘটে (অর্থাৎ, রেখাচিত্র **কল** পরিমাণ শ্রমে), গড় উৎপাদন তখন সর্বাধিক হয় অর্থাৎ গড় উৎপাদন ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম হয়। কিন্তু ইহার পররতী পর্যায়ে যন্ত্রপাতির তুলনায় শ্রমের পরিমাণ বিশেষ অধিক হওয়ায় গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন উভয়ই হ্রাস পায়।

সীমাবদ্ধতা ঃ বিধিটির কয়েকটি সীমাবদ্ধতা (limitations) দেখা যায় ঃ

ক। যে-উৎপাদন ব্যবস্থায় কেবল একটি উপাদান পরিবর্তনীয় রাখা হয় এবং অন্যান্য উৎপাদনগুলি স্থির রাখিতে হয়, সেই সকল ক্ষেত্র ছাড়া ইহা অন্যত্র প্রযোজ্য হইবে না।

খ। যেখানে উপাদানের অনুপাত পরিবর্তন করা যায়, কেবলমাত্র সেই স্থানে এই বিধিটি কার্যকর হয়। কিন্তু যেখানে উপাদানের অনুপাত সর্বক্ষণ স্থির থাকে, সেই সকল ক্ষেত্রে বিধিটি কার্যকর হয় না।

গ। উৎপাদনের যে-সকল স্থানে উৎপাদন-পদ্ধতি উন্নত করা হয় না অর্থাৎ স্থির থাকে, সেই সকল স্থানে বিধিটি কার্যকর হয়।

৫. **ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপন্ন বা প্রতিদান বিধি : (Law of Diminishing Marginal Returns) ঃ** অধ্যাপক স্যামুয়েলসন (Samuelson) মন্তব্য করিয়াছেন, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি অর্থবিদ্যা ও প্রযুক্তির (economics and technology) একটি অন্যতম বিধি। এই বিধিটি দুইটি অংশে আলোচনা করা যাইতে পারে ঃ (ক) কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বিধি, এবং (খ) সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বিধি।

(ক) কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বিধি[১] ঃ অধ্যাপক মার্শাল কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপন্ন বিধিটির একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ কোন একটি নির্দিষ্ট জমিতে কৃষিকার্যের জন্য শ্রম ও মূলধন নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইলে সাধারণত উৎপাদন-বৃদ্ধির পরিমাণ সমানুপাতিক হার অপেক্ষা কম হইবে, অবশ্য ইতিমধ্যে যদি-না কৃষির পদ্ধতিতে কোন উন্নতি ঘটিয়া থাকে (An increase in the capital and labour applied in the cultivation of land causes, in general, a less than proportionate increase in the amount of produce raised, unless it happens to coincide with the improvement in the art of agriculture—*Marshall*)। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায়, কোন একটি নির্দিষ্ট জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হইলে মোট উৎপন্ন-ফসল সমানুপাতিক হারে না বাড়িয়া উহা অপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধি পাইবে। একটি উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝানো যাইতে পারে ঃ

জমি	শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ হেক্টর	১ একক	১০ কুইন্টাল	——
,, ,,	২ ,,	২২ ,,	১২ কুইন্টাল
,, ,,	৩ ,,	২৮ ,,	৬ ,,
,, ,,	৪ ,,	৩২ ,,	৪ ,,
,, ,,	৫ ,,	৩৪ ,,	২ ,,

উপরের উদাহরণে দেখা যায়, কোন একজন কৃষক এক একক মূলধন (অর্থাৎ

১. এই বিধিটি ২৬ পৃঃ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে উহা পুনরায় উল্লেখ করা হইল।

একটি লাঙল ও এক জোড়া বলদ) দ্বারা ১ হেক্টর জমিতে ১০ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করিল। দ্বিতীয়বারে জমির পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া ২ একক শ্রম ও ২ একক মূলধন নিয়োগ করা হইলে মোট উৎপন্ন-ফসল হইতেছে ২২ কুইন্টাল অর্থাৎ উৎপাদন দ্বিগুণ অপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদনের গোড়ার দিকে এইরূপ হওয়া সম্ভব, কারণ ১ একক শ্রম ও ১ একক মূলধন দিয়া জমিটি হয়তো সুষ্ঠুভাবে চাষ করা সম্ভব হয় নাই। তাই উৎপন্ন-ফসল দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক হইল। কিন্তু তৃতীয় বারে ৩ একক শ্রম ও ৩ একক মূলধন নিয়োগ করিয়া জমিটি চাষ করা হইলে মোট উৎপন্ন-ফসল হইতেছে মাত্র ২৮ কুইন্টাল। সুতরাং অতিরিক্ত ১ একক শ্রম ও ১ একক মূলধন নিয়োগের ফলে অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপন্ন-ফসল হইতেছে মাত্র ৬ কুইন্টাল। চতুর্থবারে অতিরিক্ত উৎপন্ন-ফসলের পরিমাণ হয় ৪ কুইন্টাল এবং পঞ্চমবারে ২ কুইন্টাল। সুতরাং দেখা যায়, একই জমিতে অতিরিক্ত পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হইলে অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপন্ন ফসল ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। বলা বাহুল্য, একই জমিতে অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয় বলিয়া এইরূপ ঘটিয়া থাকে, কারণ কোন জমিতে ইচ্ছামত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে তাহা লাভজনক হয় না।

(খ) **সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বিধি :** আধুনিককালের লেখকদের মতে, উৎপাদনের যে-সকল ক্ষেত্রে কতকগুলি উপাদানকে স্থির করিয়া অন্য একটি উপাদান বৃদ্ধি করা যায়, সেই সকল ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপন্ন বিধিটি কার্যকর হয়। অধ্যাপক বোল্ডিং (Boulding) ইহার একটি সংজ্ঞা দিয়াছেন : কতকগুলি স্থির উৎপাদনের সঙ্গে অপর কোন এক উপাদানের ক্রমশ বৃদ্ধি করিলে চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিবর্তনীয় উপাদানটির প্রান্তিক ও গড় উৎপাদান উভয়ই হ্রাস পাইবেই (As we increase the quantity of one input which is combined with a fixed quantity of other inputs, the marginal physical productivity (and average physical productivity) of the variable input must eventually decline—*Boulding*)।[১] বিশ্লেষণ করিয়া বলা যায়, উৎপাদনের কতকগুলি উপাদান স্থির করিয়া কোন একটি উপাদান (যেমন—শ্রম বা মূলধন) ক্রমাগত বৃদ্ধি করিতে থাকিলে কোন একটা নির্দিষ্ট সীমার পর গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন উভয়ই হ্রাস পাইবে। ২০৪ পৃষ্ঠার তালিকায় দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪ একক শ্রমের পর উহা বৃদ্ধি করা হইলে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন উভয়ই হ্রাস পাইতেছে। আবার ২০৪ পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন দেখা যাইতেছে। ঐ রেখাচিত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন উভয় রেখাটি ক্রমশ নীচের দিকে যাইতেছে।

কারণ : ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন বিধি কতকগুলি কারণে কার্যকর হইয়া থাকে :

---

১. Boulding—*Economic Analysis*

ক. উপাদানের স্থিতিস্থাপক যোগান : কোন উপাদানের যোগান অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক (relatively inelastic) হইলে (অর্থাৎ যোগান একরূপ স্থির থাকিলে), উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য তখন উহার যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। ইহার ফলে ঐ উপাদানটি একরূপ স্থির রাখিয়া অন্য উপাদানগুলি বৃদ্ধি করিতে হয় এবং ফলে ক্রম-হ্রাসমান বিধিটি কার্যকর হইয়া পড়ে। কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই বিধিটি পুরাপুরি কার্যকর হয়। কারণ কৃষি-জমির যোগান প্রাকৃতিক কারণে একরূপ স্থির থাকে।

খ. পরিবর্তনীয় অনুপাতের ফলাফল : কোন একটি স্থির উৎপাদনের সঙ্গে অপর একটি পরিবর্তনশীল উপাদানের সমন্বয়-সাধন করা হইলে উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর পরিবর্তনশীল উপাদানটির গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পায়। কারণ তখন পরিবর্তনশীল উপাদানের তুলনায় স্থির উপাদানটির পরিমাণ খুব কম হইয়া পড়ে এবং উপাদানের সমন্বয় আর কাম্য অনুপাতের (optimum proportion) হয় না।

গ. উপাদানগুলির পরিবর্তনে সীমিত পরিধি : উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে একটি সীমার পর আর ইচ্ছামতো পরিবর্তন (substitution) করা সম্ভব হয় না। এই কারণে মিসেস রবিনসন (Mrs Robinson) মন্তব্য করিয়াছেন, একটি উপাদানের পরিবর্তে অপর একটি উপাদান নিয়োগ করার সুযোগ ও পরিধি খুবই সীমিত। ইহার ফলে একটি উপাদান স্থির রাখিয়া অপর উপাদানটি একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লাভজনক ভাবে বৃদ্ধি করা যায় ; উক্ত সীমার পর উহাদের পরিবর্তন লাভজনক হয় না বলিয়া প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন হ্রাস পায়।

ঘ. স্থির উপাদানটির পরিপূর্ণ ব্যবহার : উপাদানটির সার্থক বা পরিপূর্ণ ব্যবহারের পরবর্তী পর্যায়ে এই বিধিটি কার্যকর হইয়া থাকে। কোন জমির পরিপূর্ণ ব্যবহারের পর উহাতে শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধি করা হইলে মোট উৎপাদন আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় না।

ঙ. উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতির অভাব : উৎপাদন-পদ্ধতিতে কোনরূপ উন্নতি না ঘটিলে অথবা পরিবর্তনীয় উপাদানটির পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন-সংগঠনে কোনরূপ উন্নতি না হইলে এই বিধিটি কার্যকর হয়।

চ. বৃহদায়তন উৎপাদনের অসুবিধা : আয়তনবৃদ্ধিজনিত সুযোগসুবিধার (economies of scale)[১] জন্য উৎপাদনের প্রারম্ভিক পর্বে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের আয়তন ক্রমাগত বড় হইতে হইতে কাম্য আয়তন অতিক্রম করিয়া গেলে নানারূপ অসুবিধা দেখা দেয় এবং গড় উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে ক্রমহ্রাসমান বিধিটি কার্যকর হয়।

উৎপাদনের এই ক্রমহ্রাসমান বিধিটি কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্রও

১, ৬৩-৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কার্যকর হয়। শিল্প-উৎপাদন, মৎস্যচাষ, খনি-উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই বিধিটি কার্যকর হইতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবর্তনীয় উপাদানটির গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন উভয়ই হ্রাস পায় বলিয়া প্রতি একক উৎপাদন ব্যয় অর্থাৎ গড় উৎপাদন-ব্যয় (average cost of production) ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই কারণে এই বিধিটিকে 'ক্রমবর্ধমান ব্যয় বিধি' (Law of Increasing Cost) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

৬. **ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বা প্রতিদান বিধি (Law of Increasing Returns)** : ক্রমবর্ধমান উৎপাদান বা প্রতিদান বিধিটি অর্থবিদ্যায় দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয় : (ক) উপাদানজনিত ক্রমবর্ধমান প্রতিদান (increasing returns to a factor), এবং (খ) আয়তনজনিত ক্রমবর্ধমান প্রতিদান (increasing returns to the scale)। এই দুইটি পৃথকভাবে আলোচনার পর বিধিটির কারণগুলি একত্রে আলোচনা করা হইবে :

ক. উপাদানজনিত ক্রমবর্ধমান প্রতিদান : উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন একটি উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং অন্যান্য উপাদানগুলির পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিলে পরিবর্তনশীল উপাদানটির (অর্থাৎ যে-উপাদানটির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইল) প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইতে পারে, ইহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে (পৃঃ ২০৫)। ক্রমবর্ধমান প্রতিদান বিধিটিতে বলা হয়, অন্যান্য উপাদান (যেমন,—মূলধন, জমি প্রভৃতি) স্থির রাখিয়া অপর একটি উপাদান (যেমন—শ্রম) বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনের সংগঠন-ব্যবস্থায় এমন উন্নতি ঘটিতে পারে যে যাহার ফলে পরিবর্তনীয় উপাদানটির (অর্থাৎ, শ্রমের) প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে অর্থাৎ প্রতি একক উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ হ্রাস পাইবে। যেমন—এক একক শ্রম ও এক একক মূলধন নিয়োগের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ হইল ১০ একক, আবার দুই একক শ্রম এবং এক একক মূলধনের ফলে মোট উৎপাদন হইল ২৫ একক (শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন এখানে হইতেছে ১৫ একক), আবার তিন একক শ্রম ও এক একক মূলধনের ফলে মোট উৎপাদন হইতেছে ৪৫ একক (শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন এই ক্ষেত্রে হইতেছে ২০ একক) ইত্যাদি। এইরূপ ক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণ স্থির রাখিয়া শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। ২০৬ পৃষ্ঠার তালিকাটিতে দেখা যায় তিনি একক শ্রম পর্যন্ত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে; উহাই হইতেছে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের পর্যায়। আবার ২০৭ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে প্রথম পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান প্রতিদান দেখানো হইয়াছে।

খ. আয়তনজনিত ক্রমবর্ধমান প্রতিদান : অর্থবিদ্যায় এই বিধিটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আয়তনজনিত ক্রমবর্ধমান প্রতিদানকেই বুঝায়। বিধিটির এই অর্থে বলা হয়, উৎপাদনের সকল উপাদান একই সঙ্গে এবং একই পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইলে মোট উৎপন্ন-সমগ্রী বা উৎপাদনের পরিমাণ আনুপাতিক হার অপেক্ষা অধিক হারে

বৃদ্ধি পায়। অন্যভাবে বলা যায়, উৎপাদনের সকল উপাদান দ্বিগুণ করিলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং দেখা যায়, এই ক্ষেত্রে উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে মোট উৎপাদন অনুপাতিক হার অপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত "বহুল-উৎপাদনের সুবিধাসমূহের' (economies of mass production) জন্য কোন ফার্ম-এর গড় ব্যয় ক্রমশ হ্রাস পায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কেবলমাত্র দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদনের আয়তন পরিবর্তন (এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধি) করা সম্ভব হয় বলিয়া এই বিধিটি দ্বারা কোন ফার্ম-এর কেবলমাত্র দীর্ঘ-কালীন ব্যয় (long-term cost) বিশ্লেষণ করা যায়।

কারণসমূহ ঃ এই উভয় প্রকার ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের বিধিটির কারণগুলি একত্রে আলোচনা করা হইল ঃ

(ক) বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা ঃ ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের অন্যতম কারণ হইতেছে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা।[১] লৌহ ও ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, যন্ত্রপাতি-নির্মাণ প্রভৃতি মূলধন-ভারী শিল্পে উৎপাদনের আয়তন প্রসারিত হওয়ার ফলে কোন ফার্ম বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ সুযোগ-সুবিধা (internal econmies) ভোগ করিয়া থাকে। ইহার ফলে কাম্য-আয়তনের সীমা (optimum limit) পর্যন্ত ফার্মটি ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় অনুসারে উৎপাদন করিতে পারে। তাই ক্রেয়ানক্রশ (Cairncross) মন্তব্য করিয়াছেন, কোন একটি নির্দিষ্ট কৃৎকৌশলের মধ্যে উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে আয়তন-বৃদ্ধিজনিত সুযোগ-সুবিধার জন্যই গড় উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ হ্রাস পায়।[২]

(খ) স্থির উপাদানের অপূর্ণ ব্যবহার ঃ স্বল্পকালীন অবস্থায় কোন স্থির উপাদানটির পরিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ পর্যাপ্ত না হইলে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের বিধিটি ক্রিয়াশীল হইবে। কারণ ঐরূপ ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় উপাদানটির পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে স্থির উপাদানটি আরও উত্তমরূপে ব্যবহার করা সম্ভব হয় বলিয়া পরিবর্তনীয় উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে। ২০৬ পৃষ্ঠার তালিকায় দেখা যায়, ১ একক বা ২ একক শ্রমের দ্বারা নির্দিষ্ট মূলধন-যন্ত্রটি সম্যকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হইতেছে না, তাই ঐ পর্যায়ে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু স্থির উপাদানটির সার্থক ব্যবহারের পর প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পাইবে।

(গ) উৎপাদন-সংগঠনে উন্নতি ঃ যে-সকল অবস্থায় পরিবর্তনীয় উপাদানটির পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে সমগ্র উৎপাদন-সংগঠনে উন্নতি ঘটে, সেই সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে গড় ব্যয় হ্রাস পায় এবং এই বিধিটি কার্যকর হয়।

১. **এই সুযোগ সুবিধাগুলি পৃঃ ৬৩ আলোচিত হইয়াছে।**

২. Cairncross—*Introduction to Economics*

(ঘ) উপাদানের সহজলভ্যতা : উপাদানের সহজলভ্যতার ফলেও ক্রমবর্ধমান প্রতিদান দেখা দিতে পারে। সকল প্রয়োজনীয় উপাদান সহজেই সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে কাম্য অনুপাতে বৃদ্ধি করা সম্ভব হইলে মোট উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সমানুপাতিক হার অপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পাইবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে গড় ব্যয় হ্রাস পাইবে।

(ঙ) উন্নত ধরনের উৎপাদন-পদ্ধতি প্রয়োগ : অভিনব ও উন্নত ধরনের উৎপাদন-প্রণালী উদ্ভাবিত হওয়ার পর উহা উৎপাদনের কার্যে প্রয়োগ করা হইলে উন্নত কৃৎকৌশল প্রয়োগের ফলে কৃষির বা শিল্পের উৎপাদন সমানুপাতিক হার অপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

(চ) উপাদানের অবিভাজ্যতা : ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের অন্যতম কারণ হইতেছে উপাদানের অবিভাজ্যতা (indivisibility of factors)।[1] উৎপাদন-কার্যের এমন কতকগুলি উপাদান আছে যাহা ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, জলজ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্য উৎপাদন যন্ত্রপাতি বড় আয়তনের হইতেই হইবে, ব্লাস্ট ফারনেস (blast furnace) বিভক্ত করা যায় না, রেল-পরিবহণের জন্য শুরুতেই বড় আয়তনের বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন পড়ে ইত্যাদি। এই সকল ক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে অধিক পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করিতে হয়। অবিভাজ্য উপাদানটির কাম্য ব্যবহার না হওয়া পর্যন্ত প্রতি একক উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। এই কারণেই রেল-পরিবহণ প্রভৃতি ভাবী এবং অবিভাজ্য উপাদান নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক পর্বে ক্রমবর্ধমান প্রতিদান বিধিটি ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই বিধিটি অনুসারে উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে গড় উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় বলিয়া ক্রমবর্ধমান প্রতিদান বিধিটিকে 'ক্রমহ্রাসমান ব্যয় বিধি' (Law of Decreasing Cost) বলিয়াও অভিহিত করা হয়। কৃষিকার্য অপেক্ষা শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইহার অধিকতর প্রাধান্য দেখা যায়।

৬. সম-উৎপন্ন প্রতিদানের বিধি (Law of Constant Returns) : সম-উৎপন্ন প্রতিদানের বিধিটিতে বলা হয়, উৎপাদনের সকল উপাদান যখন কোন একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, মোট উৎপাদনও ঠিক সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে। অন্যভাবে বলা যায়, উৎপাদনকার্যে সকল উপাদানের পরিমাণ দ্বিগুণ বা তিনগুণ বৃদ্ধি পাইলে মোট উৎপাদনও দ্বিগুণ বা তিনগুণ বৃদ্ধি পাইবে। এই ক্ষেত্রে উৎপাদনের সকল স্তরে গড় ব্যয় একইরূপ বা অপরিবর্তিত থাকে। সাধারণত ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের পরবর্তী পর্যায়ে উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সম-উৎপন্ন প্রতিদান বিধিটি ক্রিয়া করে।

---

১. ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য

কারণসমূহ ঃ সম-উৎপন্ন প্রতিদানের কতকগুলি কারণ দেখা যায় ঃ

(ক) **মিশ্র উৎপাদন ক্ষেত্র ঃ** অধ্যাপক মার্শাল-এর মতে, যে-সকল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষিকার্য ও শিল্প-কার্যের সমন্বয় বা সহ-উপস্থিতি বা সমান গুরুত্ব দেখা যায়, সেই সকল ক্ষেত্রে সম উৎপন্ন প্রতিদানের বিধিটি কার্যকর হয় অর্থাৎ যে-সকল ক্ষেত্রে কৃষিপণ্য ও শিল্পদ্রব্য একই সঙ্গে উৎপন্ন হয়, (যেমন—ইক্ষু ও চিনি উৎপাদন, পশম ও পশম-বস্ত্র উৎপাদন প্রভৃতি) সেই সকল ক্ষেত্রে এই বিধিটি ক্রিয়া করে। উৎপাদনের কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান এবং শিল্পদ্রব্যের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের মধ্যে সামঞ্জস্য (balance) ঘটার ফলে এইরূপ হইয়া থাকে। এই কারণেই মার্শাল মন্তব্য করিয়াছেন, ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান বিধি দুইটির ক্রিয়ায় যেখানে সামঞ্জস্য ঘটে সেখানেই সম-উৎপন্ন প্রতিদান দেখা যায় (When the actions of the law of increasing and diminishing returns are balanced, we have the law of constant returns—*Marshall*)।

(খ) **উপাদানের স্থির দাম ঃ** উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও যেখানে উপাদানগুলির দাম স্থির থাকে, সেখানে সম-উৎপন্নের বিধি ক্রিয়া করে। অর্থাৎ, উপাদানের নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও উপাদানগুলি একটি নির্দিষ্ট স্থির দামে নিয়োগ করা সম্ভব হইলে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে গড় ব্যয় স্থির থাকিবে। অবশ্য যে-সকল ক্ষেত্রে মোট যোগানের তুলনায় উপাদানগুলিই খুবই সামান্য পরিমাণে নিযুক্ত হয়, সেইখানেই দাম অপরিবর্তিত থাকা সম্ভব হয়।

(গ) স্থির ও অবিভাজ্য উপাদানের অনুপস্থিতি ঃ উৎপাদনকার্যে কোনরূপ স্থির ও অবিভাজ্য উৎপাদন না থাকিলে এই বিধিটি কার্যকর হইবে। যদি কোন উপাদানই স্থির না থাকে এবং সমগ্র উপাদানই প্রয়োজনীয় পরিমাণে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে গড় উৎপাদন-ব্যয় অপরিবর্তিত রাখিয়া মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

(ঘ) **নীট সুবিধা বা অসুবিধার অনুপস্থিতি ঃ** উৎপাদন-কার্যের যে-সকল ক্ষেত্রে আয়তন-বৃদ্ধির ফলে কোনরূপ নীট সুবিধা (net economies) বা নীট অসুবিধা (net diseconomies) দেখা দেয় না, সেই সকল ক্ষেত্রে আয়তন-বৃদ্ধি সত্ত্বেও উৎপাদনের সকল স্তরে গড় ব্যয় অপরিবর্তিত রাখা সম্ভব হয়।

উপসংহার ঃ সম-উৎপন্ন প্রতিদানের যে-সকল কারণ বা অনুমান উপরে বর্ণনা করা হইল, তাহা বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই কারণে সম-উৎপন্ন প্রতিদানের কোন শিল্প বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় না, এইরূপ বলা যায়।

৭. **উপাদানের সচলতা (Mobility of Factors) ঃ** উপাদান-উৎপাদনের সম্পর্কের আর একটি বিষয় হইতেছে উপাদানের সচলতা। এক উপাদানকে এক কাজ হইতে অন্য কাজে বা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে কতখানি স্বচ্ছন্দে বা সহজে সরনো যায়, তাহাকেই উপাদানের সচলতা বলা হয়। যে-সকল ক্ষেত্রে উপাদান সহজেই

কার্যান্তর বা স্থানান্তর করা সম্ভব হয় সেই সকল ক্ষেত্রে উপাদানের সচলতার মাত্রা বেশী হয়। পক্ষান্তরে, যে সকল ক্ষেত্রে এইরূপ করা সম্ভব হয় না, সেই সকল ক্ষেত্রে উপাদানের অ-সচলতা (immobility of factors) ঘটে। যেমন—সাধারণ একজন অবিশেষীকৃত (non-specialised) শ্রমিক অতি সহজে এক কাজ হইতে অন্য কাজে যাইতে পারে, কিন্তু কোন বিশেষীকৃত বা সুদক্ষ শ্রমিকের পক্ষে তাহা বিশেষ সম্ভব হয় না। সুতরাং বিশেষীকৃত শ্রমিকের তুলনায় অবিশেষীকৃত শ্রমিকের সচলতা অনেক বেশী।

উপাদানের 'পেশাগত সচলতা'র (occupational mobility) জন্য কিছুটা 'ভৌগোলিক সচলতার' (geographical mobility) প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কারণ পেশা বা কার্য পরিবর্তনের জন্য উপাদানের স্থান পরিবর্তনেরও প্রয়োজন পড়িতে পারে। সুতরাং উপাদানের সচলতার মধ্যে পেশাগত ও ভৌগোলিক—উভয় প্রকার সচলতা বিবেচনা করিতে হয়।

গুরুত্ব ঃ উপাদানের সচলতার বিশেষ অর্থনৈতিক গুরুত্ব দেখা যায় ঃ

প্রথমত, বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা রক্ষার জন্য উপাদানের সচলতা আবশ্যক হইয়া পড়ে। যে-সকল দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়, সেই সকল দ্রব্যের উৎপাদন হইতে উপাদান সরাইয়া আনিয়া যোগান হ্রাসের মাধ্যমে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা রক্ষা করা যায়। পক্ষান্তরে, যে-সকল দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, সেই সকল দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে উপাদান নিয়োগ করিয়া যোগানবৃদ্ধির প্রয়োজন পড়ে।

দ্বিতীয়ত, শ্রমের নিখুঁত সচলতা (perfect mobility) থাকিলে আধুনিক অর্থব্যবস্থায় যে কাঠামোগত বা প্রযুক্তিগত বেকারত্ব (structural or technological unemployment) প্রায়ই দেখা যায়, তাহা প্রতিকার করা সহজ হয়।

তৃতীয়ত, অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উপাদানের ভৌগোলিক সচলতা প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায়, উপাদানের সচলতা থাকিলে বিভিন্ন শিল্পে বা স্থানে উহাদের উপার্জনের হার প্রায়ই একইরূপ বা অভিন্ন (uniform) হইতে পারে। যে-সকল শিল্পে বা অঞ্চলে উপাদানের আয় অপেক্ষাকৃত কম সেই সকল শিল্প বা স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক উপার্জনের শিল্পে বা স্থানে উপাদানসমূহ চলিয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু আধুনিক জটিল উৎপাদন-ব্যবস্থা অতিমাত্রায় বিশেষীকরণ হওয়ার ফলে শ্রমিকের সচলতা বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হইতেছে। বিভিন্ন উপাদানের ক্ষেত্রে সচলতার অবস্থাটি পৃথকভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে ঃ

ক. **জমির সচলতা ঃ** জমি স্থানান্তর করা সম্ভব হয় না বলিয়া ইহার কোন ভৌগোলিক সচলতা থাকিতে পারে না। আবার কোন কোন জমির ব্যবহার খুবই সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ উহা কেবলমাত্র একটি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে; এইক্ষেত্রে

জমির বিকল্প ব্যবহার (alternative uses) সুযোগ না থাকায় উহার কোনরূপ শিল্পগত বা পেশাগত সচলতা থাকিতে পারে না। কিন্তু কোন কোন জমির নানারূপ বিকল্প ব্যবহার থাকিতে পারে—যেমন, ধানের জমিতে গম বা পাট, গমের জমিতে তৈলবীজ উৎপন্ন করা সম্ভব হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে জমির ব্যবহারগত সচলতা দেখা যায়। আবার কোন জমিতে কিছু পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিয়া উহার ব্যবহার পরিবর্তন করা সম্ভব হয় ঐরূপ ক্ষেত্রে জমির সচলতা সৃষ্টি হয়। যেমন—কর্দমাক্ত অকেজো জমি ভরাট করিয়া উহা বসতবাড়ীর উপযোগী করিয়া তোলা সম্ভব হয় (যেমন—কলিকাতার লবণ-হ্রদ অঞ্চল)।

খ. **শ্রমের সচলতা ঃ** শ্রম-উপাদানের ক্ষেত্রে পেশাগত ও ভৌগোলিক সচলতা উভয়ই সম্ভব হয়। কিন্তু যে-সকল শ্রমিক বিশেষ কোন কার্যে সম্পূর্ণ বিশেষীকরণ অর্জন করে, তাহার পক্ষে নির্দিষ্ট পেশা ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া সম্ভব নয়। যেমন—ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তারের পক্ষে নির্দিষ্ট পেশা ছাড়িয়া সাধারণত অন্যত্র যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অদক্ষ শ্রমিকেরা সহজেই এক পেশা হইতে অন্য পেশায় যাইতে পারে। আবার, শ্রমিকদের পক্ষে ভৌগোলিক সচলতা সম্ভব হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে উহার পথে নানারূপ অন্তরায় দেখা দেয়। ভাষা ও জীবন-যাত্রার ধরনে পার্থক্য, স্থানান্তর-গমনের উপর সরকারী বাধানিষেধ আরোপ, শ্রমিকদের অজ্ঞতা ও শিক্ষার অভাব, বাসস্থান-পরিবর্তনের অসুবিধা ইত্যাদি কারণে শ্রমের সচলতা নষ্ট হয়।

গ. **মূলধনের সচলতা ঃ** কোন দেশের মূলধনের এক বিরাট অংশ হইতেছে কারখানা, ভারী ভারী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা স্থানান্তর করা ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া ইহাদের সচলতা খুবই কম। আবার কোন কোন যন্ত্রপাতি কেবল একটি মাত্র উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন—সংবাদপত্রের যন্ত্রপাতি কেবলমাত্র সংবাদপত্র ছাপানোর কাজেই ব্যবহৃত হয়, উহা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সম্ভব নয় বলিয়া এই ক্ষেত্রে মূলধনের সচলতা কম হইয়া পড়ে। আবার কোন কোন যন্ত্রপাতি দ্বারা বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করা যায় অর্থাৎ উহাদের বিকল্প ব্যবহার আছে, সেইরূপ ক্ষেত্রে মূলধনের সচলতা অধিক হয়। বলা হয়, কৃষি যন্ত্রপাতি বা মোটরগাড়ী নির্মাণের যন্ত্রপাতি দ্বারা সামরিক বা প্রতিরক্ষার সামগ্রী উৎপাদন করা যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত মূলধন-সামগ্রীর সচলতা দেখা দেয়।

উপসংহার ঃ সুতরাং দেখা যায়, বৃহদায়তনের উৎপাদন, কাঠামোগত বেকারত্ব হ্রাস, দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা রক্ষা প্রভৃতির জন্য উপাদানের সচলতার বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে বাস্তবক্ষেত্রে নানা কারণে উহা নষ্ট হয়। এই কারণে উপাদানের সচলতার পথে যে-সকল প্রতিবন্ধক হয় তাহা অপসারণের জন্য দেশের সরকার কর্তৃক উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন হয়।

১৭

॥ উৎপাদন-ব্যয় বিশ্লেষণ ॥

(Analysis of Cost of Production)

[উৎপাদন ব্যয়ের স্বরূপ—আর্থিক উৎপাদন ব্যয়—প্রকৃত বা বাস্তব উৎপাদন ব্যয়—সুযোগ ব্যয়—উৎপাদন পরিবর্তন ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য—স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়—ব্যয় তালিকা-ব্যয় নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ—স্বল্পকালীন ব্যয় তালিকার স্বরূপ—স্বল্পকালীন ব্যয়—ও উহার অনুমানসমূহ—গড় ব্যয়, গড় স্থির ব্যয়, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়—স্বল্পকালীন ব্যয়ের সংক্ষিপ্তসার—স্বল্পকালীন ব্যয়ের প্রয়োগযোগ্যতা—দীর্ঘকালীন ব্যয় ও উহার অনুমান-সমূহ—দীর্ঘকালীন ব্যয়-তালিকার স্বরূপ—দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়—দীর্ঘকালীন অবস্থার অনুমানসমূহের তাৎপর্য—শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যয়ের অবস্থা—ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের শিল্প, সমব্যয়ের শিল্প ও ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের শিল্প]

ফার্মকে বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন পরিমাণে নিয়োগ করিয়া দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করিতে হয় এবং ঐ সকল উপকরণের জন্য উহাকে ব্যয় করিতে হয় অর্থাৎ উহাকে উৎপাদন-ব্যয় (cost of production) বহন করিতে হয়। এই উৎপাদন-ব্যয়ের স্বরূপ, স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ব্যয় প্রভৃতি বর্তমান অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হইল।

১. **উৎপাদন-ব্যয়ের স্বরূপ** (**Nature of Cost of Production**) ঃ উৎপাদন-ব্যয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া অর্থবিদ্যাবিদগণ মোটামুটি ইহাকে তিনটি দিক হইতে বিশ্লেষণ করিয়াছে ঃ (ক) আর্থিক উৎপাদন-ব্যয় (money cost of production), (খ) প্রকৃত বা বাস্তব উৎপাদন-ব্যয় (real cost of production) এবং (গ) সুযোগ-ব্যয় (opportunity cost); এইগুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হইল ঃ

ক। আর্থিক উৎপাদন-ব্যয় ঃ কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বা সেবাকার্য উৎপাদনের জন্য কোন ফার্মকে যে-পরিমাণ টাকাকড়ি ব্যয় করিতে হয়, তাহাকেই 'আর্থিক উৎপাদন-ব্যয়' (money cost of production) বলা হয়। কোন দ্রব্যসামগ্রী বা সেবাকার্য উৎপাদনের জন্য উৎপাদককে কতকগুলি উপকরণ নিয়োগ করিতে হয়, যেমন—শ্রমশক্তি, কাঁচামাল, বিদ্যুৎশক্তি, জমি বা কারখানা, উদ্যোক্তার পরিশ্রম ইত্যাদি। উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত ঐ সকল উপকরণের জন্য উৎপাদক যে-পরিমাণ অর্থব্যয় করে, তাহাই হইতেছে আর্থিক উৎপাদন-ব্যয় ; যেমন, জমির জন্য দেয় খাজনা, অফিস-বাড়ীর জন্য ভাড়া শ্রমিকদের মজুরি, কাঁচা-মালের দাম, ঋণ-মূলধনের জন্য দেয় সুদ, জ্বালানী-ব্যয় প্রভৃতি। অর্থবিদ্যায় উদ্যোক্তার স্বাভাবিক মুনাফা (normal profits)[১] উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে ধরিতে হয়।

১. যে-পরিমাণ মুনাফা পাইলে উৎপাদক দীর্ঘকালীন অবস্থায় ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকে তাহাকে স্বাভাবিক মুনাফা বলা হয়।

কারণ অন্যান্য উপকরণের সেবাকার্যের ন্যায় কোন কিছু উৎপাদন করিতে হইলে উদ্যোক্তার পরিশ্রম প্রয়োজন পড়ে। সুতরাং অন্যান্য উপকরণগুলির পারিশ্রমিকের ন্যায় উদ্যোক্তার স্বাভাবিক পারিশ্রমিক বা স্বাভাবিক মুনাফাও উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে যোগ করিতে হয়।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, উৎপাদকের কিছু নিজস্ব উপকরণ (self-owned factors) উৎপাদন-কার্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উহাদের জন্য উৎপাদককে প্রকৃতপক্ষে কোন কিছু ব্যয় করিতে হয় না। যেমন—উৎপাদকের নিজস্ব জমি বা কারখানা উৎপাদনের কার্যে ব্যবহৃত হইলে উহার জন্য তাহাকে খাজনা দিতে হয় না, অথচ অপরের জমি বা কারখানা ভাড়া করা হইলে খাজনা দিতে হয় এবং তাহা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। উৎপাদন-ব্যয়ের হিসাবের সময়, উৎপাদকের নিজস্ব এই উপকরণগুলির জন্য অনুমিত ব্যয় (estimated cost) নিরূপণ করিয়া তাহা উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। সুতরাং উৎপাদন-কার্যে নিযুক্ত ভাড়া-করা উপকরণগুলির জন্য 'সুস্পষ্ট ব্যয়' (explicit cost) এবং উৎপাদকের নিজস্ব উপকরণগুলির জন্য 'অন্তর্নিহিত ব্যয়' (implicit cost)—উভয় প্রকার ব্যয়ের সমষ্টি হইতেছে আর্থিক উৎপাদন-ব্যয়। অর্থবিদ্যায় সাধারণ অর্থে উৎপাদন-ব্যয় বলিতে এই আর্থিক উৎপাদন-ব্যয়কেই বুঝায়।

খ। প্রকৃত বা বাস্তব উৎপাদন ব্যয়ঃ আর্থিক উৎপাদন-ব্যয়ের হিসাব কোন ব্যক্তি-বিশেষের দৃষ্টিকোণ হইতে করা হয়। কিন্তু বৃহত্তর সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে ঐ ব্যয়ের বিশেষ গুরুত্ব থাকে না। এই কারণে অর্থনীতিবিদগণ প্রকৃত বা বাস্তব ব্যয়ের ধারণাটি (the concept of real cost) প্রচার করেন। প্রকৃত ব্যয় হইতেছে উৎপাদন-ব্যয়ের 'দর্শনাত্মক ধারণার' দিক (the philosopical concept of cost)।

বৃহত্তর সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে প্রকৃত ব্যয়ের ধারণাটি মার্শাল প্রমুখ লেখকরা বিশ্লেষণ করেন। এই ধারণা অনুযায়ী উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উপকরণকে যে 'দুঃখ-কষ্ট' (pain) বা 'অনুপযোগ' (disutilities), বা 'প্রকৃত মানবিক ত্যাগ' (real human sacrifice) ইত্যাদি স্বীকার করিতে হয়, তাহাই হইতেছে প্রকৃত বা বাস্তব ব্যয়। আর্থিক উৎপাদন-ব্যয়ের পশ্চাতে এই ব্যয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। উৎপাদকের দৃষ্টিকোণ হইতে উৎপাদনের যেমন টাকাকড়ি ব্যয় করিতে হয়, উপকরণগুলির দৃষ্টিকোণ হইতে উহাদিগকে তেমন 'ত্যাগ' বা 'দুঃখ-কষ্ট' স্বীকার করিতে হয়। যেমন—কোন শ্রমিক যখন কাজ করে, তাহাকে 'বিশ্রাম' (leisure or rest) ত্যাগ করিতে হয়, সুতরাং বিশ্রাম-ত্যাগের জন্য যে-কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তাহাই হইতেছে সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে প্রকৃত ব্যয়। আবার মূলধন-মালিক যখন মূলধন নিয়োগ করে তাহাকে তখন বর্তমান ভোগ হইতে বিরত (abstinence from the present consumption) থাকিতে হয়। সুতরাং এই ভোগ-বিরতি হইতেছে প্রকৃত-ব্যয়।

এই অর্থে 'জমি'র কোন প্রকৃত ব্যয় থাকে না, কারণ জমি প্রকৃতির দান বলিয়া উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত হইলে উহার কোন কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না।

কিন্তু আধুনিককালের লেখকরা প্রকৃত ব্যয়ের ধারণাটি গ্রহণ করেন না। কারণ 'ত্যাগ' বা 'কষ্ট' বা 'ভোগবিরতি' হইতেছে মানসিক ধারণা এবং উহা পরিমাপ করা বা অর্থমূল্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই কারণে বর্তমানে প্রকৃত ব্যয়ের ধারণাটি একরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

গ. **সুযোগ ব্যয়**[১] : অস্ট্রিয়ার অর্থনীতিবিদরা 'সুযোগ ব্যয়ে'র (opportunity cost) ধারণাটি প্রবর্তন করেন। এই ধারণা অনুসারে, কোন বস্তুর উৎপাদন-ব্যয় হইতেছে উহার 'বিকল্প দ্রব্য ত্যাগের ব্যয়' (cost of relinquishing alternatives) বিশ্লেষণ করিয়া বলা যায়, কোন বস্তু উৎপাদন করিতে কিছু পরিমাণ সম্পদ প্রয়োজন পড়ে এবং ঐ সকল সম্পদের বিকল্প ব্যবহার থাকে। কোন বস্তু উৎপাদন করিতে গেলে তাহার জন্য যে-বিকল্প বস্তুর উৎপাদন ত্যাগ করিতে হয়, তাহাই হইবে বস্তুটির উৎপাদন-ব্যয় বা সুযোগ-ব্যয়। পূর্ণ নিয়োগ (full employment) অবস্থায় বিকল্প বস্তুর উৎপাদন পরিহার করিয়া কোন একটি বস্তু উৎপাদন করিতে হয়। ইহা একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝানো হইল।

ধরা যাউক, কোন একটি জমিতে পাট বা ধান—উভয়ই উৎপাদন করা যায়। জমিটি হইতে ১০ কুইণ্টাল পাট বা ১৫ কুইণ্টাল ধান উৎপন্ন করা যায়। কিন্তু জমিটি যদি পাট উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়, উহা ধান-উৎপাদনের জন্য পাওয়া যাইবে না। এই ক্ষেত্রে ১০ কুইণ্ট্যাল পাটের সুযোগ-ব্যয় হইবে ১৫ কুইণ্ট্যাল ধান। বেনহামের-এর (Benham) মতে, কোন জিনিসের সুযোগ ব্যয় হইতেছে উহার বিকল্প দ্রব্যের উৎপাদন পরিহারের ব্যয় অর্থাৎ একই পরিমাণ টাকাকড়ি ব্যয় করিয়া যে-সকল বিকল্প দ্রব্যাদি উৎপাদন করা যায়, তাহাই হইতেছে পরস্পরের সুযোগ-ব্যয়[২]।

সুযোগ ব্যয়ের ধারণাটি টাকাকড়ির অঙ্কে প্রকাশ করা যায়। ধরা যাউক, কোন একজন শ্রমিক 'x' কাজে ৫০০ টাকা পায়। তাহার নিকট পরবর্তী উৎকৃষ্ট কাজ (next-best alternative) হইতেছে 'y' কাজ এবং ঐ কাজ হইতে সে ৪৫০ টাকা উপার্জন করিবে, অন্যথায় সে বিকল্প কাজে যোগদান করিবে। এই ৪৫০ টাকা হইতেছে 'x'কাজের সুযোগ ব্যয়। এইক্ষেত্রে ৪৫০ টাকা হইতেছে সুযোগ ব্যয় বা স্থানান্তর ব্যয়।

সুযোগ ব্যয়ের ধারণাটি অর্থবিদ্যায় বিশেষ গুরুত্ব দেখা যায়। বেনহামের মতে, পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় কোন বস্তুর দাম সুযোগ-ব্যয়ের সমান হওয়ার প্রবণতা থাকে। কিন্তু যে-সকল উপাদানের কোনরূপ বিকল্প ব্যবহার নাই, সেই সকল ক্ষেত্রে ধারণাটি মূল্যহীন।

১. ইহাকে বিকল্প-ব্যয় বা স্থানান্তর ব্যয়ও (transfer cost) বলা হয়।

২. Opportunity cost is *"the next-best alternative that could be produced by the same factors or by an equivalent group of factors, costing the same amount of money."* (Benham)

২. **উৎপাদন-পরিবর্তন ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য (Adjustability of Cost to changes in Output)**ঃ উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে মোট উৎপাদন-ব্যয়ের সাধারণত হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। কোন ফার্ম যখন অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে থাকে, তখন উহার মোট উৎপাদন-ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই কারণে ফার্মকে ঐ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া উহার ব্যয়ের বিষয়গুলির কিছুটা পরিবর্তন করিতে হয় অর্থাৎ উৎপাদনের জন্য যে-সকল উপাদান নিয়োগ করা হয়, উহাদের পরিমাণে কিছুটা রদবদল করিতে হয়। এই পরিবর্তন করার ক্ষমতা অবশ্য সময়-মেয়াদের উপর নির্ভর করে।

স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদনের কতকগুলি উপাদান, যেমন—কারখানার আয়তন, যন্ত্রপাতির পরিমাণ, স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ইত্যাদি পরিবর্তন সম্ভব হয় না। সুতরাং উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে ঐ সকল উৎপাদনের জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা রদবদল করা স্বল্পকালীন অবস্থায় সম্ভব হয় না। আবার ব্যয়ের কতকগুলি উপাদান আছে, যেমন—শ্রমিকের মজুরি, কাঁচামালের জন্য ব্যয়, বিদ্যুৎ ব্যয়, পরিবহণ ব্যয় প্রভৃতি—যাহা উৎপাদনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের সঙ্গে কোন ফার্ম ইহাদের ব্যয়ে সামান্য রদবদল করিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে উৎপাদককে উপাদানগুলির সমন্বয়ের (combination of factors) মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন করিতে হয়।

কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদনের সকল উপাদানই পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। সুতরাং দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদক উৎপাদনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া বিভিন্ন উপাদানগুলির জন্য যে ব্যয় করে, তাহা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। অবশ্য উপাদানগুলি অতিমাত্রায় বিশেষীকৃত ও ব্যয়সাপেক্ষ (যেমন—প্লাণ্ট ফারনেস, উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত পদস্থ কর্মচারী ইত্যাদি) হইলে তাহা সহজে পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না বলিয়া উৎপাদন পরিবর্তনের সঙ্গে উহাদের ব্যয়ের বিশেষ রদবদল করা যায় না।

কোন ফার্ম উৎপাদন ও ব্যয়ের মধ্যে কতখানি সামঞ্জস্য করিতে পারিবে, তাহা উপাদানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে উপাদানগুলির স্থিরতা ও পরিবর্তনশীলতা আলোচনা করিতে হয় অর্থাৎ উপাদান ব্যয়ের মধ্যে স্থির ব্যয় ও পরিবর্তশীল ব্যয়ের যে দুইটি অংশ আছে, তাহা আলোচনা করিতে পরবর্তী অংশে ঐ আলোচনা করা হইল।

৩. **স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় (Fixed Cost and Variable Cost)**ঃ স্বল্পকালীন অবস্থার দৃষ্টিকোণ হইতে কোন ফার্ম-এর উৎপাদন ব্যয়কে স্থির ব্যয় (fixed cost) ও পরিবর্তনশীল ব্যয় (variable cost)—এই দুইটি অংশে ভাগ করা হয়। উৎপাদনের কার্যে যে-সকল উপকরণ নিয়োগ করা হয়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি উপকরণ অপরিবর্তিত থাকে, এবং উহাদের জন্য যে ব্যয় করা হয়, তাহাও সর্বদা স্থির থাকে। ঐ সকল ব্যয়ের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলা হয়। যেমন—

কারখানার জন্য দেয় ভাড়া, অবচয় ব্যয়, স্থায়ী মূলধনের জন্য সুদ, বন্ড বা ডিবেঞ্চারের উপর দেয় সুদ, পরিচালকবর্গ ও স্থায়ী কর্মচারীদের (যেমন—দ্বাররক্ষী, ইলেক্‌ট্রিসিয়ান, প্লাম্বার ইত্যাদি) বেতন খাতে ব্যয়, সম্পত্তির উপর দেয় কর (property tax), মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় ইত্যাদি। উৎপাদনের পরিমাণ যতই হউক না কেন, ঐ ব্যয়গুলি মূলত চুক্তিবদ্ধ (contrac ual) থাকে বলিয়া উহাদের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ইহাদের মোট পরিমাণ স্থির থাকে। অর্থবিদ্যার ভাষায় বলা যায়, উৎপাদন শূন্যে (zero) আসিলেও ফার্মকে এই ব্যয় বহন করিতে হয়। স্থির ব্যয়কে পরিপূরক বা উপরিস্থ ব্যয়ও (supplementary cost or overhead cost) বলা হয়।

পক্ষান্তরে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে যে-সকল ব্যয়ের বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হ্রাস পাইলে যে-সকল ব্যয়ের হ্রাস ঘটে, সেই সকল ব্যয়কে 'পরিবর্তনশীল ব্যয়' বলা হয়। উৎপাদন শুরু হইলে এই ব্যয় দেখা দেয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ শূন্য হইলে এই ব্যয়ের কোন অস্তিত্ব থাকে না। যেমন—কাঁচা মালের জন্য ব্যয়, ঠিকা বা অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি, চলতি মূলধনের জন্য দেয় সুদ, বিদ্যুৎ-শক্তি, ও জ্বালানির জন্য ব্যয়, বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয়, সরকারকে দেয় উৎপাদন-শুল্ক (excise duties) ও বিক্রয় কর (sales tax), মালের জন্য ব্যয় বীমা (insurance) ও প্যাকিং এর জন্য ব্যয়কে প্রাথমিক ব্যয়ও (prime cost) বলা হয়।

আবার কোন কোন পরিবর্তনশীল উপাদান আছে, যাহা একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত স্থির থাকে—উপাদানগুলি অবিভাজ্যতার (indivisibilities) জন্য ঐরূপ হইয়া থাকে। উহার জন্য ব্যয় মূলত পরিবর্তনশীল হইলেও কিছুকালের জন্য উহা স্থির থাকে। ইহাকে আধা-পরিবর্তনশীল (semi-variable) ব্যয় বলা হয়, যেমন—সুপারভাইজারের বেতন ইত্যাদি।

এই দুই প্রকার ব্যয়ের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

মোট উৎপাদন	মোট স্থির ব্যয়	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়	মোট ব্যয়
০	১০ টাকা	০	১০ টাকা
১	১০ ,,	১০ টাকা	২০ ,,
২	১০ ,,	১৬ ,,	২৬ ,,
৩	১০ ,,	৪০ ,,	৫০ ,,
৪	১০ ,,	৭০ ,,	৮০ ,,

উপরের তালিকায় দেখা যায়, উৎপাদনের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, মোট স্থির

ব্যয় সর্বদাই অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু উৎপাদন শূন্য হইলে কোনরূপ পরিবর্তনশীল ব্যয় থাকে না। উৎপাদন শুরু হইলে পরিবর্তনশীল ব্যয় দেখা দেয় এবং উৎপাদন বাড়িতে থাকিলে ইহার পরিমাণও বাড়িতে থাকে।

এই দুইপ্রকার ব্যয় নিম্নে একটি রেখাচিত্রে দেখানো হইল ঃ
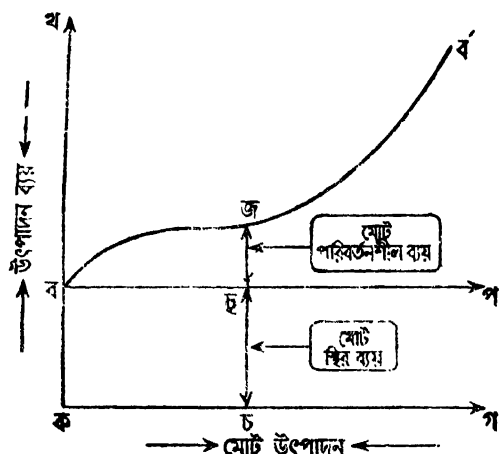
চিত্র ২৬

উপরের রেখাচিত্রে **কখ** উৎপাদন-ব্যয় ও কগ মোট উৎপাদনের নির্দেশ দেয়। **বব'** রেখাটি মোট ব্যয়রেখা ও **বপ** রেখাটি মোট স্থির ব্যয়রেখা। **বব'** রেখা ও **বপ** রেখার মধ্যস্থ উল্লম্ব দূরত্ব (vertical distance) মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় পরিমাপ করে। যেমন—**কচ** উৎপাদন হইলে মোট ব্যয় হইবে **চজ**—উহার মধ্যে **চছ** হইতেছে মোট স্থির ব্যয় এবং **ছজ** হইতেছে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়। চিত্রে দেখা যাইতেছে, উৎপাদন শূন্য হইলে মোট স্থির ব্যয় হইতেছে **কব**, কিন্তু কোন পরিবর্তনশীল ব্যয় নাই। উৎপাদন শুরু এবং তৎপরে উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মোট স্থির ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু পরিবর্তনশীল ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পায় (অর্থাৎ উৎপাদন বৃধি পাওয়ার সঙ্গে **বব'** রেখা ও **বপ** রেখার মধ্যে দূরত্ব দীর্ঘতর হয়) এবং ঐ বৃদ্ধির হারে তারতম্য হয় বলিয়া **বব'** রেখাটি বক্রাকৃতিভাবে ঊর্ধমুখী হইতেছে।

পার্থক্যের সীমাবদ্ধতা ঃ কিন্তু এই দুই প্রকার ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদী উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। স্বল্পমেয়াদী অবস্থায় কোন ফার্ম যন্ত্রপাতি, কারখানার আয়তন ইত্যাদি পরিবর্তন না করিয়া অধিক কাঁচা মাল ও শ্রমিক নিয়োগ করিয়া উৎপাদনের কার্য চালায়। ইহার ফলে স্বল্পমেয়াদী অবস্থায় কতকগুলি বিষয়ের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ স্থির থাকে এবং কতকগুলি বিষয়ের জন্য ব্যয়ের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী অবস্থায় ফার্ম উৎপাদনের আয়তন পরিবর্তন করার সুযোগ পায়; অর্থাৎ কারখানার আয়তন, যন্ত্রপাতি

ইত্যাদি বিষয়গুলি পরিবর্তন করা যায়। এই কারণে দীর্ঘমেয়াদী অবস্থায় সকল উৎপাদন ব্যয়ই পরিবর্তনশীল হইয়া পড়ে। আরও বলা হয়, এই দুই প্রকার ব্যয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়। কারণ একই ব্যয়ের বিষয় কোন স্থানে স্থির ব্যয়, কিন্তু অন্যত্র উহা পরিবর্তনশীল ব্যয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যেমন—শ্রমিকের মজুরি, শ্রমিককে নিছক কাজের ভিত্তিতে অস্থায়ীভাবে (যেমন—ঠিক শ্রমিক) নিয়োগ করা হইলে, শ্রমিকের মজুরি পরিবর্তনশীল ব্যয়ের বিষয় হয়, কিন্তু শ্রমিককে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হইলে তখন মজুার স্থির ব্যয়ের বিষয় হয়। সুতরাং পার্থক্যটি সুস্পষ্ট নয়।

পার্থক্যের গুরুত্ব : এই দুই প্রকার ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও উহার বিশেষ গুরুত্ব আছে। দাম-নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। বলা হয়, স্বল্পকালীন অবস্থায় দাম-নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন ফার্ম শুধুমাত্র পরিবর্তনশীল ব্যয় উশুল করিতে পারিলে উৎপাদন চালাইয়া যাইবে। অর্থাৎ স্বল্প-কালীন অবস্থায় দাম গড় ব্যয়ের কম হইলেও ফার্মটি উৎপাদন চালাইয়া যাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত ফার্মটি পরিবর্তনশীল ব্যয় উশুল করিতে পারে। সুতরাং স্বল্পকালীন দাম-নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন ফার্ম স্থির ব্যয় উপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় উহাকে সকল ব্যয়ই উশুল করিতে হয়। এই কারণে বলা হয়, স্বল্পকালীন অবস্থায় স্থির ব্যয় যথার্থ ব্যয় (true cost) হয় না, কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় ইহা যথার্থ ব্যয় হইয়া থাকে।

৪. **ব্যয় তালিকা (Cost Schedule) :** কোন ফার্ম-এর উৎপাদন-ব্যয় কতকগুলি বিষয়ের (যেমন—উৎপাদন প্রণালী, উপাদান নিয়োগের পরিমাণ ও সমন্বয়, উপাদান-গুলির দাম প্রভৃতি) উপর নির্ভর করে। এই বিষয়গুলি অপরিবর্তিত ধরিয়া বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনের জন্য যে বিভিন্ন পরিমাণে ব্যয় (যেমন—১০ টাকা ব্যয়ে ১০ একক, ১১·২৫ টাকা ব্যয়ে ১১ একক, ১২·৭৫ টাকা ব্যয়ে ১২ একক প্রভৃতি) করা হয়, তাহাই ব্যয় তালিকায় দেখানো হয়। অর্থাৎ, উৎপাদন-ব্যয় নির্ধারণকারী বিষয়গুলি অপরিবর্তিত থাকিলে বিভিন্ন পরিমাণ ব্যয়ে যে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্যাদি উৎপাদন করা যায়, তাহাদের হিসাব ব্যয়-তালিকায় দেখানো হয় (The alternative cost of production at which various alternative outputs can be produced—*Bain*)।[১] এই বিষয়গুলি রেখাচিত্রে স্থাপন করিলে ব্যয়-রেখা (cost curve) পাওয়া যায়।

এই ব্যয়-তালিকা স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন—উভয় অবস্থার জন্য পৃথকভাবে প্রস্তুত করা হয়। উভয়ক্ষেত্রেই ব্যয়-তালিকা উৎপাদনের পরিমাণ ও ব্যয়ের পরিমাণে

১ Bain—*Price Theory*.

মধ্যে একটি সম্পর্কের নির্দেশ দেয়। ঐ সম্পর্কটি হইতেছে, কেবলমাত্র উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন হওয়ার ফলে প্রত্যক্ষভাবে ব্যয়ের পরিমাণে যে-পরিবর্তন ঘটে, শুধু তাহাই ব্যয়-তালিকায় দেখানো হয়। উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিলে ব্যয়ের যেরূপ পরিবর্তন ঘটে, ব্যয়-নির্ধারণকারী বিষয়গুলির পরিবর্তন ঘটিলেও ব্যয়ের সেইরূপ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ব্যয়-তালিকায় কেবলমাত্র প্রথম প্রকার পরিবর্তনই দেখানো হয়। দ্বিতীয় প্রকার পরিবর্তনের ফলে ব্যয়-তালিকার পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ আলাদা আলাদা পরিবর্তনের জন্য আলাদা আলাদা ব্যয়-তালিকা প্রস্তুত করিতে হয় এবং ফলে ব্যয়-রেখাটির স্থান-পরিবর্তন (shifting) ঘটে। কিন্তু কেবলমাত্র উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তনের ফলে ব্যয়ের যে পরিবর্তন ঘটে তাহা একই ব্যয়-রেখাই দেখানো হয়। নিম্নে একটি ব্যয়-তালিকা দেওয়া হইল :

ব্যয়-তালিকা

উৎপাদনের পরিমাণ	মোট উৎপাদন ব্যয়
১ একক	২৪ টাকা
২ ,,	৩৫ ,,
৩ ,,	৪৫ ,,
৪ ,,	৫৪ ,,
৫ ,,	৬২ ,,

উপরের ব্যয়-তালিকায় বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনের জন্য যে-বিভিন্ন পরিমাণ ব্যয় হইতেছে তাহাই দেখানো হইতেছে। অর্থাৎ বিভিন্ন পরিমাণ ব্যয়ে কোন ফার্ম যে-বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন করিতে পারে, তাহার হিসাব এই তালিকায় প্রকাশ পাইতেছে। যেমন—২৪ টাকা ব্যয়ে ১ একক, ৩৫ টাকা ২ একক, ৪৫ টাকা ব্যয়ে ৩ একক ইত্যাদি। এখানে উৎপাদন-ব্যয়ে যে-বৃদ্ধি ঘটিতেছে, তাহা কেবলমাত্র অধিক উৎপাদনের জন্যই হইতেছে ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে অর্থাৎ উৎপাদন-বৃদ্ধি ছাড়া অন্যান্য কারণেও যে ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটিতে পারে, তাহা বিবেচনা করা হইতেছে না।

৫. **ব্যয়নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ : (Determinants of Cost of Production) : পূর্ববর্তী অংশে উল্লেখ করা হইয়াছে, উৎপাদন ব্যয় কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এখন দেখা যাউক, ব্যয় নির্ধারণকারী বিষয়গুলি কি ?**

উৎপাদন-ব্যয় (আর্থিক) প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দ্বারা নির্ধারিত হয় :

ক. উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত উপাদানের সমষ্টি ও অনুপাত : কোন দ্রব্য বা সেবাকার্য উৎপাদনের জন্য যে-পরিমাণ উপাদান বা উপকরণ ব্যবহৃত হয়, তাহার উপর উৎপাদন-ব্যয় নির্ভর করে। যেমন—১ টন ইস্পাত উৎপাদনের জন্য যে-পরিমাণ আকরিক লৌহ, চুনাপাথর, কয়লা, ব্লাস্ট-ফারনেস প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, উৎপাদন-ব্যয় তাহার উপর নির্ভর করিবে। সাধারণভাবে বলা হয়, অধিক উৎপাদনের জন্য এই উপকরণগুলি অধিক পরিমাণে নিয়োগ করিতে হয় বলিয়া উৎপাদনের-ব্যয়ের পরিমাণও অধিক হয়। স্বল্প-পরিমাণে উৎপাদন করা হইলে এই উপকরণ কম পরিমাণে নিয়োগ করিতে হয় বলিয়া উৎপাদন-ব্যয়ও কম হয়। আবার এই উপাদানগুলি কাম্য অনুপাতে নিয়োগ করা হইলে ব্যয়ের পরিমাণ কম হইবে।

খ. উপাদানসমূহের দক্ষতা : উপাদান-কার্যে ব্যবহৃত উপাদানগুলির উৎপাদন-শীলতা বা দক্ষতা অধিক হইলে স্বল্প-পরিমাণে ঐগুলি নিয়োগ করিয়া অধিক উৎপাদন করা যায় বলিয়া গড় উৎপাদন-ব্যয়ও কম হয়। এই কারণে শ্রমিকের উচ্চমানের দক্ষতা, পরিচালকবর্গের কর্মক্ষমতা, কাঁচামালের উৎকর্ষ প্রভৃতি উৎপাদন-ব্যয়ের পরিমাণকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প রাখিতে সাহায্য করে। উহাদের দক্ষতা কম হইলে গড় উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে।

গ. উপাদানগুলির দাম : উপাদানগুলির জন্য যে-দাম দিতে হয়, তাহা ব্যয়কে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। উপাদানগুলি অপেক্ষাকৃত কম দামে পাওয়া গেলে ব্যয়ের পরিমাণ কম হয়। কিন্তু উহাদের জন্য অধিক দাম দিতে হইলে ব্যয়ের পরিমাণও অধিক হয়। আবার ঐ দামের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলে ব্যয়েরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এই কারণে শ্রমিকের মজুরি-বৃদ্ধি, বিদ্যুৎশক্তির দাম বৃদ্ধি বা কর্মচারীদের বেতন-বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন-ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়

ঘ. উৎপাদন-পদ্ধতি : উৎপাদন-পদ্ধতি উন্নত ও অভিনব হইলে উৎপাদক অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে পারিবে। কিন্তু উৎপাদন-পদ্ধতি প্রাচীন হইলে সম-পরিমাণ দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে অধিক ব্যয় পড়িবে। কোন ফার্মকে যদি মুনাফা সর্বাধিক করিতে হয়, তাহা হইলে উৎপাদনের যে-কলাকৌশল অবলম্বন

করা হইলে মনুনাফা সর্বাধিক হয় সেই কলাকৌশল প্রয়োগ করিতে হয়। স্বল্পকালীন অবস্থায় স্থির উপাদানগুলির পরিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে ফার্মকে কাম্য উৎপাদন-প্রণালী অনুসরণ করিতে হয়। কিন্তু সকল উপাদান প্রয়োজনীয় পরিমাণে পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না বলিয়া স্বল্পকালীন অবস্থায় গৃহীত উৎপাদনের-পদ্ধতি সর্বোত্তম পদ্ধতি না-ও হইতে পারে। দীর্ঘকালীন অবস্থায় কোন ফার্ম সকল উপকরণ পরিবর্তন করিতে পারে বলিয়া উহার পক্ষে সর্বোত্তম উৎপাদন-প্রণালী বাছিয়া লওয়া সম্ভব নয়। এই কারণে দীর্ঘকালীন অবস্থায় কোন ফার্ম ন্যূনতম-ব্যয়ে উৎপাদন করার সুযোগ পায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে, উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিলে উৎপাদন-ব্যয়ের পরিবর্তন ঘটে এবং উহার ফলে ব্যয়-তালিকারও পরিবর্তন ঘটে। অবশ্য কোন ফার্ম কি উৎপাদন-পদ্ধতি অনুসরণ করিবে তাহা প্রচলিত প্রযুক্তিজ্ঞান, উপাদানের দাম ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

৬. **অন্যান্য বিষয়ঃ** ইহা ছাড়া, সরকারের নীতি, উৎপাদন-শুল্ক, উপাদানের সহজ বা কঠিন লভ্যতা প্রভৃতির উপরও ব্যয় নির্ভর করে।

ব্যয়-নির্ধারণকারী এই বিষয়গুলির কোন একটির পরিবর্তন ঘটিলে ব্যয়-তালিকার পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ পুরাতন ব্যয়-তালিকার পরিবর্তে ফার্মকে নূতন ব্যয়-তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়।

৬. **স্বল্পকালীন ব্যয়-তালিকার স্বরূপ : (Nature of Short-run Cost Schedule)** : কোন ফার্ম-এর ব্যয়-তালিকা বিভিন্ন সময়-মেয়াদে বা বিভিন্ন কালপর্বে বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। এই অংশে স্বল্পকালীন ব্যয়-তালিকার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হইল এবং পরে এই অধ্যায়ের যথাস্থানে দীর্ঘকালীন ব্যয়-তালিকার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হইবে।

স্বল্পকালীন ব্যয়-তালিকার স্বরূপে বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রথমেই 'স্বল্পকালীন কালপর্ব' (a short period) বলিতে কি বুঝায় তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্বল্প-কালীন অবস্থা বলিতে এমন এক কালপর্বকে বুঝায়, যাহার মধ্যে উৎপাদনের কতকগুলি উপাদান স্থির থাকে এবং অপর কতকগুলি উপাদান পরিবর্তনযোগ্য হয়। স্বল্পকালীন অবস্থায় কারখানা-বাড়ী, ভারী যন্ত্রপাতি, স্থায়ী পদস্থ কর্মচারী প্রভৃতি স্থির থাকে এবং শ্রম, কাঁচামাল প্রভৃতি পরিবর্তনশীল হয়। অর্থাৎ, স্বল্পকালীন সময়ে কোন ফার্মকে উহার আয়তন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি স্থির উপাদানগুলি পূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হয়। এই স্বল্পকালীন অবস্থায় ফার্ম-এর ব্যয়-তালিকা কিরূপ হইয়া থাকে তাহা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল ঃ

স্বল্পকালীন ব্যয়-তালিকা

উৎপাদন		মোট ব্যয়
০ একক	—	৫০ টাকা
১ ,,	—	৫৮ ,,
২ ,,	—	৬৫ ,,
৩ ,,	—	৭১ ,,
৪ ,,	—	৭৬ ,,
৫ ,,	—	৮১ ,,
৬ ,,	—	১০২ ,,
৭ ,,	—	১২৬ ,,
৮ ,,	—	১৫২ ,,

উপরের তালিকা হইতে স্বল্পকালীন ব্যয়-তালিকার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ঃ

প্রথমত, তালিকায় দেখা যায়, উৎপাদনের পরিমাণ শূন্য হইলেও কিছু পরিমাণ মোট ব্যয় হইতেছে। স্বল্পকালীন অবস্থায় ফার্মকে কিছুটা স্থির ব্যয় বহন করিতে হয় বলিয়া এরূপ হইতেছে।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে। তালিকায় দেখা যায়, উৎপাদনের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইতেছে মোট ব্যয়ের পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। অর্থাৎ, অধিক উৎপাদনের জন্য ফার্মকে অধিক ব্যয় করিতে হয়।

পরিশেষে দেখা যায়, উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যয়-বৃদ্ধির হার বিভিন্ন রূপ হইতেছে। আরও স্পষ্ট করিয়া বলা যায়, উৎপাদন যতই বৃদ্ধি পায় প্রথম দিকে মোট ব্যয় হ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পরে উহা বর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। উক্ত তালিকায় দেখা যায়, ৪ একক উৎপাদন পর্যন্ত ব্যয়বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু ৩ একক ও ৫ একক উৎপাদনের মধ্যে ব্যয়বৃদ্ধির হার স্থির থাকিতেছে। কিন্তু ৫ একক উৎপাদনের পরবর্তী পর্যায়ে উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যয়-বৃদ্ধির হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে তৃতীয় বৈশিষ্ট্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহা হইতে বুঝা যায়, উৎপাদনের কোন একটি বিশেষ সীমার মধ্যে প্রতি একক উৎপাদন-ব্যয় স্থির থাকে এবং উহা সর্বাপেক্ষা কম হয়। তালিকায় দেখা যায়, ৫ একক উৎপাদনে প্রতি একক উৎপাদন-ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম হয়। ইহার পূর্ববর্তী এককগুলিতে উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে প্রতি একক উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে উহা বৃদ্ধি পায়। ইহা বলা বাহুল্য, স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদনের কতকগুলি উপাদান স্থির এবং কতকগুলি পরিবর্তনশীল হয় বলিযা ব্যয়-তালিকার এইরূপ স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

৭. **স্বল্পকালীন ব্যয় এবং ইহার অনুমানসমূহ (The Short-run Cost and its Assumptions :** স্বল্পকালীন অবস্থা বলিতে কি বুঝায়, তাহা পূর্বের অংশে আলোচনা করা হইয়াছে। কোন ফার্ম-এর স্বল্পকালীন ব্যয় বিশ্লেষণের জন্য কতকগুলি অনুমান ধরিয়া লওয়া হয়। ঐ অনুমানগুলি নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল :

(ক) কোন ফার্ম উৎপাদনের জন্য যে-সকল উপাদান ব্যবহার করে স্বল্পকালীন অবস্থায় উহাদের মধ্যে কতকগুলি স্থির থাকে এবং কতকগুলি পরিবর্তন করা যায়। যেমন, কারখানার আয়তন, ভারী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম, উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রভৃতি স্বল্পকালীন অবস্থায় পরিবর্তন সম্ভব হয় না বলিয়া স্থির থাকে। সুতরাং এই বিষয়গুলির জন্য যে-ব্যয় হয়, তাহাও স্থির থাকিবে। পক্ষান্তরে, কাঁচামাল, শ্রম, পরিবহণ, জ্বালানি, বিদ্যুৎ-শক্তি প্রভৃতি উপাদানগুলি উৎপাদনের সঙ্গে পরিবর্তন করা যায় ; সুতরাং এই বিষয়গুলির জন্য যে-ব্যয় হয়, তাহা পরিবর্তশীল হইয়া পড়ে।

(খ) উৎপাদন-কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং স্থির উপাদানগুলির সম্যক ব্যবহারের জন্য ন্যূনতম একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির প্রয়োজন পড়ে। অন্যভাবে বলা যায়, স্বল্পকালীন অবস্থায় স্থির উপাদানগুলির সার্থক ব্যবহারের দ্বারা ফার্ম উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করে। ইহার জন্য যে-পরিমাণ পরিবর্তনশীল উপাদানগুলি না হইলেই নয়, তাহা ফার্ম নিয়োগ করে।

(গ) কতকগুলি পরিবর্তনশীল উপাদান আছে, যাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করিয়া সংগ্রহ করা যায় না। যেমন—শ্রমিকদের কখনও কখনও একদিন অপেক্ষা কম সময়ের জন্য নিয়োগ করা যায় না। উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে এই ধরনের অবিভাজনযোগ্য (indivisible) পরিবর্তনশীল উপাদানগুলি অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় ;

(ঘ) উৎপাদনের কলাকৌশলের এবং প্রযুক্তিগত অবস্থা স্থির ধরিয়া লওয়া হয়। ইহা ছাড়া, উপাদানগুলির যে-দাম (অর্থাৎ প্রতি একক দাম) দেওয়া হয়, তাহা অপরিবর্তিত থাকে এইরূপ ধরা হয়।

(ঙ) পরিবর্তনশীল উপাদানের সকল এককের সমান দক্ষতা থাকে এইরূপ ধরা হয়। যেমন—শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হইলে পরের শ্রমিকগুলির দক্ষতা পূর্বেকার শ্রমিকগুলির দক্ষতার সমান হইবে, এইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়।

এই অনুমানগুলির ভিত্তিতে কোন ফার্ম-এর গড় উৎপাদন ব্যয় বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রারম্ভিক পর্যায়ে গড় ব্যয় হ্রাস পায় এবং অবশেষে উহা বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখাটিই ইংরাজী U-অক্ষরের মতো হইবে। এই বিষয়টি এবং স্বল্পকালীন ব্যয়ের আর একটি বিষয়, যেমন—প্রান্তিক ব্যয়, পরের অংশে বিশদ আলোচনা করা হইল।

৮. **গড় ব্যয়, গড় স্থির ব্যয়, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় (Average Cost, Average Fixed Cost, Average Variable Cost and Marginal Cost) :** উৎপাদন ব্যয়কে (স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন) দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়া আলোচনা করা হয় : গড় ব্যয় (average cost) এবং প্রান্তিক ব্যয় (marginal cost)। এই দুই প্রকার ব্যয় নিম্নে বিশদভাবে আলোচনা করা হইল :

ক. **গড় ব্যয় :** গড় ব্যয় হইতেছে প্রতি একক উৎপাদন ব্যয় অর্থাৎ উৎপাদনের মোট ব্যয়কে উৎপাদন দ্বারা ভাগ করিলে গড় ব্যয় পাওয়া যায়। সুতরাং

$$\text{গড় ব্যয়} = \frac{\text{মোট ব্যয়}}{\text{মোট উৎপাদন}}$$

যেমন—মোট উৎপাদন ব্যয় ১০০ টাকা এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১০ একক হইলে গড় ব্যয় হইবে (১০০ টাকা ÷ ১০ একক) ১০ টাকা। আবার, মোট ১৫ একক উৎপাদনের মোট উৎপাদন ব্যয় ১২০ টাকা হইলে গড় ব্যয় হইবে ৮ টাকা। স্বল্পকালীন অবস্থায় গড় ব্যয়ের দুইটি অংশ থাকে—গড় স্থির ব্যয় (average fixed cost) এবং গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (average variable cost)। এই দুইটি অংশ আলোচনার পর স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হইবে।

(১) **গড় স্থির ব্যয় :** মোট স্থির ব্যয়কে মোট উৎপাদন দ্বারা ভাগ করিলে 'গড় স্থির ব্যয়' (average fixed cost) পাওয়া যায়। যেমন—১০ একক উৎপাদনের জন্য মোট স্থির ব্যয় (average cost) ৫০ টাকা হইলে গড় স্থির ব্যয় হইবে ৫ টাকা। উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে মোট স্থির ব্যয় অধিক সংখ্যক উৎপাদনের মধ্যে বণ্টিত হইয়া যায় বলিয়া গড় স্থির ব্যয় ক্রমশ হ্রাস পায়। ইহা সহজেই অনুমেয়, গড় স্থির ব্যয় কখনই শূন্য (zero) বা ঋণাত্মক (negative) হয় না, কারণ দুইটি ইতিবাচক (positive) সংখ্যার ভাগফল সকল ক্ষেত্রেই ইতিবাচক হইবে। উপরের উদাহরণে মোট উৎপাদন ২০ একক হইল 'গড় স্থির ব্যয়' হ্রাস পাইয়া হইবে ২·৫০ টাকা, উৎপাদন ২৫ একক হইলে গড় স্থির ব্যয় হয় ২ টাকা, ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যায়, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে 'গড় স্থির ব্যয়' ক্রমশ হ্রাস পাইবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য,

দীর্ঘকালীন সময়ে সকল ব্যয়ই পরিবর্তনশীল বলিয়া ঐ সময়ে 'গড় স্থির ব্যয়' বলিয়া কোন কিছু থাকে না। গড় স্থির ব্যয়কে এইভাবে দেখানো যায় :

$$\text{গড় স্থির ব্যয়} = \frac{\text{মোট স্থির ব্যয়}}{\text{মোট উৎপাদন}}$$

(২) **গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় :** স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের দ্বিতীয় অংশটি হইতেছে 'গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়' (average variable cost)। মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়কে মোট উৎপাদন দ্বারা ভাগ করিলে 'গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়' পাওয়া যায়। যেমন—১০ একক উৎপাদনের জন্য মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (total variable cost) ১০০ টাকা হইলে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় হইবে ১০ টাকা, আবার ১৫ একক উৎপাদনের জন্য মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় ১২০ টাকা হইলে 'গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়' হইবে ৮ টাকা ইত্যাদি। উৎপাদনের গোড়ার দিকে 'ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধি' (Law of Increasing Returns) কার্যকর হয় বলিয়া গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় প্রথমে ক্রমশ হ্রাস পায়। কিন্তু পরে 'ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি' (Law of Diminishing Returns) কার্যকর হওয়ায় অবশেষে গড় পরিবর্তশীল ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখাটি ইংরেজী U-অক্ষরের মতো হইয়া থাকে। গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়-এর সূত্রটি হইতেছে :

$$\text{গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়} = \frac{\text{মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়}}{\text{মোট উৎপাদন}}$$

স্বল্পকালীন 'গড় স্থির ব্যয়' এবং 'গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়' নিম্নের দুইটি রেখা-চিত্রে দেখানো হইল :

চিত্র-২৭ চিত্র-২৮
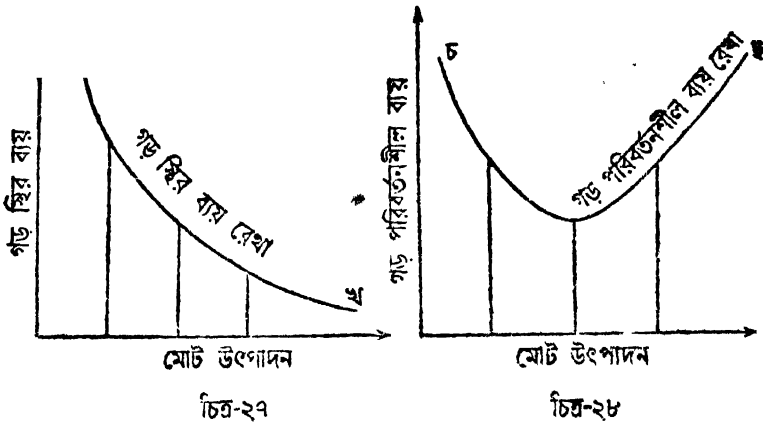
উপরের বাম দিকের রেখাচিত্রে গড় স্থির ব্যয় এবং ডান দিকের রেখাচিত্রে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় দেখানো হইতেছে। বাম দিকের রেখাচিত্রে **কখ** রেখাটি গড় স্থির

ব্যয় রেখা এবং এই রেখাটি নিম্নগামী হইয়াছে। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে গড় স্থির ব্যয় হ্রাস পায় বলিয়া এই রেখাটি নিম্নগামী হইতেছে, কিন্তু ইহা মোট উৎপাদনের অক্ষকে স্পর্শ বা ছেদ করিবে না। কারণ গড় স্থির ব্যয় কখনই শূন্য বা নেতিবাচক হয় না। ডান দিকের চিত্রে চছ রেখাটি দ্বারা গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় দেখানো হইতেছে। এই রেখাটির আকৃতি ইংরেজী U-অক্ষরের মতো। গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় প্রথমে হ্রাস পায় এবং পরে বৃদ্ধি পায় বলিয়া চছ রেখাটি প্রথমে নিম্নগামী এং পরে উর্ধ্বগামী হইতেছে।

স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদনের গড় ব্যয় হইতেছে গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমষ্টি। ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধির জন্য উৎপাদনের গোড়ার দিকে গড় ব্যয় হ্রাস পায়। কিন্তু উৎপাদনের শেষের দিকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির জন্য গড় ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং গড় ব্যয় রেখাটির আকৃতিও ইংরাজী U-অক্ষরের মতো। ইহার কারণ আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। উৎপাদনের গোড়ার দিকে গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় উভয়ই হ্রাস পায় বলিয়া গড় ব্যয়ও হ্রাস পায়। উৎপাদনের শেষের দিকে গড় স্থির ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকিলেও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় অবশেষে বৃদ্ধি পায়। কিছু পরিমাণ উৎপাদনের পর দেখা যায়, গড় স্থির ব্যয়ের হ্রাসের মাত্রা অপেক্ষা গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের বৃদ্ধির মাত্রা অধিক হইতেছে। এই দুইয়ের সম্মিলিত প্রভাবের ফলে উৎপাদনের নির্দিষ্ট সীমার পর গড় ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই কারণেই স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখাটির আকৃতিও ইংরাজী U-অক্ষরের মতো হয়।

খ. প্রান্তিক ব্যয়ঃ অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন করিলে যে-অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাহাই হইতেছে প্রান্তিক ব্যয় (marginal cost)। মোট উৎপাদন এক একক বৃদ্ধি পাইলে বা হ্রাস পাইলে মোট উৎপাদন ব্যয় যে-পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তাহাকে প্রান্তিক ব্যয় বলা হয়। যেমন—ধরা যাউক, ১০ একক উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয় হইল ৯০ টাকা এবং ১১ একক উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয় হইল ১০২ টাকা, সুতরাং প্রান্তিক ব্যয় হইবে ১২ টাকা। আবার উৎপাদন আর এক একক বৃদ্ধি পাইলে মোট ব্যয় হয় ১১৬ টাকা। সুতরাং এখন প্রান্তিক ব্যয় হইবে ১৪ টাকা।

অন্যভাবে প্রকাশ করিলে বলা যায় n যদি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা হয়, তাহা হইলে $n+1$ একক উৎপাদনের মোট ব্যয় হইতে n পরিমাণ উৎপাদনের মোট ব্যয় বাদ দিলে প্রান্তিক ব্যয় পাওয়া যাইবে। স্বল্পমেয়াদী অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সংগে শুধু মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অতএব এক একক উৎপাদন বাড়ানো হইলে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, তাহাই হইবে প্রান্তিক ব্যয়। এই কারণে প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে শুধু পরিরর্তনশীল ব্যয়ের অংশ থাকে, স্থির ব্যয়ের কোন অংশ থাকে না। গড় ব্যয়ের ন্যায় প্রান্তিক ব্যয় প্রথমে হ্রাস পায় এবং পরে উহা

বৃদ্ধি পায়। সুতরাং প্রান্তিক ব্যয় রেখাটিও U-আকৃতির মতো হইবে। প্রান্তিক ব্যয়ের সূত্রটি হইতেছে নিম্নরূপ ঃ—

$$\text{প্রান্তিক ব্যয়} = \frac{\text{মোট ব্যয় বৃদ্ধি}}{\text{মোট উৎপাদন বৃদ্ধি}}$$

নিম্নের রেখাচিত্র দ্বারা এই দুই প্রকার ব্যয় দেখানো হইল ঃ
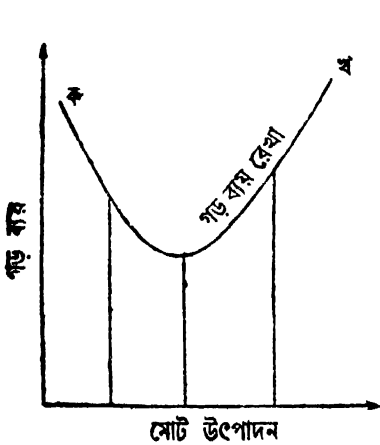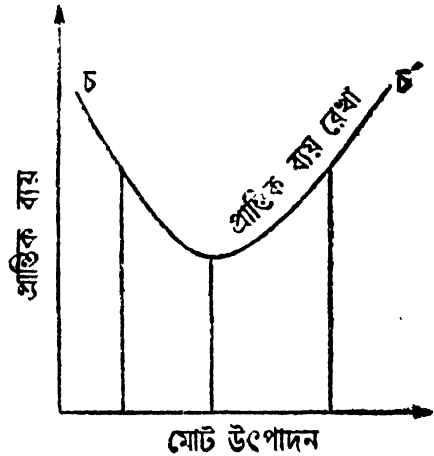
চিত্র ২৯ চিত্র ৩০

উপরের বাম দিকের রেখাচিত্রে (চিত্র ২৯) **কখ** স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা। গড় ব্যয় প্রথমে হ্রাস পায় বলিয়া গড় ব্যয় রেখাটি প্রথমে নিম্নগামী এবং পরে গড় বৃদ্ধি পায় বলিয়া উহা ঊর্ধ্বগামী হইতেছে। সুতরাং গড় ব্যয় রেখাটি U-অক্ষরের মতো হইতেছে।

ডান দিকের রেখাচিত্রে (চিত্র ৩০) **চচ´** রেখাটি স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় রেখা। ইহাতে দেখা যায়, উৎপাদনের গোড়ার দিকে প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পাইতেছে এবং পরের দিকে প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে। এই কারণে **চচ´** রেখাটি প্রথমে নীচের দিকে নামে এবং পরে উহা উপরের দিকে উঠে।

গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Average Cost and Marginal Cost) ঃ গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্কটি নিম্নরূপ ঃ

ক. গড় ব্যয় যখন হ্রাস পায়, প্রান্তিক ব্যয় তখন গড় ব্যয় অপেক্ষা কম থাকে।

খ. গড় ব্যয় যখন স্থির থাকে ও সর্বাপেক্ষা কম হয়, তখন গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয়। আরও দেখা যায়, গড় ব্যয়ের তুলনায় প্রান্তিক ব্যয় পূর্বেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

গ. গড় ব্যয় যখন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, প্রান্তিক ব্যয় তখন গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশী হয়।

নিম্নের উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝানো হইল ঃ

মোট উৎপাদন	মোট ব্যয়	গড় ব্যয়	প্রান্তিক ব্যয়
১ একক	১০ টাকা	১০ টাকা	—
২ ,,	১৮ ,,	৯ ,,	৮ টাকা
৩ ,,	২১ ,,	৭ ,,	৩ ,,
৪ ,,	২৮ ,,	৭ ,,	৭ ,,
৫ ,,	৪০ ,,	৮ ,,	১২ ,,
৬ ,,	৫৪ ,,	৯ ,,	১৪ ,,

উপরের তালিকায় দেখা যায় ৩ একক উৎপাদন পর্যন্ত গড় ব্যয় হ্রাস পায় এবং প্রান্তিক ব্যয় তখন গড় ব্যয় অপেক্ষা কম হইতেছে। ৪ একক উৎপাদনে গড় ব্যয় স্থির থাকে এবং উহা ন্যূনতম (minimum) হয়। ঐস্থানে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হইতেছে। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৫ বা ৬ একক হইলে গড় ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং প্রান্তিক ব্যয় তখন গড় ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইতেছে।

এই সম্পর্কটি পার্শ্বের রেখাচিত্রে দেখানো হইল ঃ

চিত্র-৩১

রেখাচিত্রে **কক'** রেখাটি গড় ব্যয় রেখা এবং **খখ'** রেখাটি প্রান্তিক ব্যয় রেখা। **চ** বিন্দু পর্যন্ত গড় ব্যয় রেখা নিম্নগামী হইতেছে এবং তখন প্রান্তিক ব্যয় রেখাটি গড় ব্যয় রেখার নীচে রহিয়াছে অর্থাৎ, এই স্তরে গড় ব্যয় অপেক্ষা প্রান্তিক ব্যয় কম হইতেছে। **চ** বিন্দুতে অর্থাৎ গড় ব্যয় রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে (the lowest point of the average cost curve) রেখা দুইটি পরস্পরকে ছেদ করে। সুতরাং ঐ অবস্থায় গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হইতেছে।
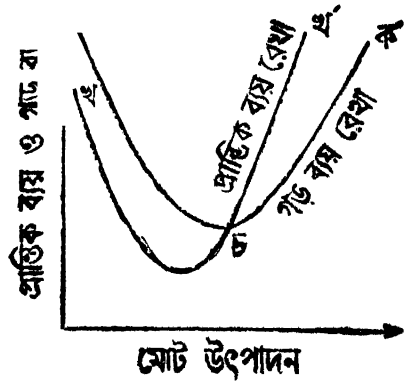
উহার পরে গড় ব্যয় রেখাটি উপরের দিকে যাইতেছে এবং তখন প্রান্তিক ব্যয় রেখাটি, গড় ব্যয় রেখার উপরে চলিয়া যায়, অর্থাৎ, এই স্তরে গড় ব্যয় অপেক্ষা প্রান্তিক ব্যয় অধিক হইতেছে।

৯. **স্বল্পকালীন ব্যয়ের সংক্ষিপ্তসার (A Summary of Short-run Costs) :** পূর্ববর্তী অংশগুলিতে কোন ফার্ম-এর স্বল্পকালীন ব্যয়ের যে-বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে, তাহার একটি সংক্ষিপ্তসার এখানে দেওয়া হইল ঃ

(ক) মোট ব্যয় = মোট স্থির ব্যয় ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমষ্টি।

(খ) মোট স্থির ব্যয় = স্থির উপাদানের মোট পরিমাণ × স্থির উপাদানের দাম।

(গ) মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় = পরিবর্তনশীল উপাদানের মোট পরিমাণ × পরিবর্তনশীল উপাদানের দাম।

(ঘ) গড় ব্যয় = মোট ব্যয় ÷ মোট উৎপাদন, বা গড় স্থির ব্যয় + গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়।

(ঙ) গড় স্থির ব্যয় = মোট স্থির ব্যয় ÷ মোট উৎপাদন।

(চ) গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় = মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় ÷ মোট উৎপাদন।

(ছ) প্রান্তিক ব্যয় = মোট ব্যয়ের বৃদ্ধি ÷ মোট উৎপাদনের বৃদ্ধি, অথবা অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের ফলে মোট বৃদ্ধির পরিমাণ।

স্বল্পকালীন এই ব্যয়গুলি নিম্নের তালিকায় দেওয়া হইলঃ

স্বল্পকালীন-ব্যয় তালিকা[১]

উৎপাদন	মোট স্থির ব্যয়	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়	মোট ব্যয়	গড় ব্যয়	গড় স্থির ব্যয়	গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়	প্রান্তিক ব্যয়
০ একক	১০ টাকা	০ টাকা	১০ টাকা	—	—	—	—
১ ,,	,, ,,	১০ ,,	২০ ,,	২০ টাকা	১০ টাকা	১০ টাকা	১০ টাকা
২ ,,	,, ,,	১৮ ,,	২৮ ,,	১৪ ,,	৫ ,,	৯ ,,	৮ ,,
৩ ,,	,, ,,	২৩ ,,	৩৩ ,,	১১ ,,	৩⅓ ,,	৭⅔ ,,	৫ ,,
৪ ,,	,, ,,	৩৪ ,,	৪৪ ,,	১১ ,,	২½ ,,	৮½ ,,	১১ ,,
৫ ,,	,, ,,	৫৫ ,,	৬৫ ,,	১৩ ,,	২ ,,	১১ ,,	২১ ,,
৬ ,,	,, ,,	৮০ ,,	৯০ ,,	১৫ ,,	১⅔ ,,	১৩⅓ ,,	২৫ ,,

১, ইহার পূর্বে ২২৫ পৃষ্ঠার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

পূর্বপৃষ্ঠার স্বল্পকালীন ব্যয়-তালিকায় উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের বিভিন্ন পরিমাণ দেখানো হইয়াছে। উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে ঐ ব্যয়গুলির কিরূপ পরিবর্তন (স্থির ব্যয় ছাড়া) ঘটে তাহাও দেখা যাইতেছে। ৪ একক উৎপাদনে গড় ব্যয় সর্বনিম্নে এবং স্থির রহিয়াছে। ঐ উৎপাদনে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হইতেছে।

ফার্ম-এর স্বল্পকালীন ব্যয়ের কয়েকটি বিষয় নিম্নের রেখাচিত্রে দেখানো হইল :
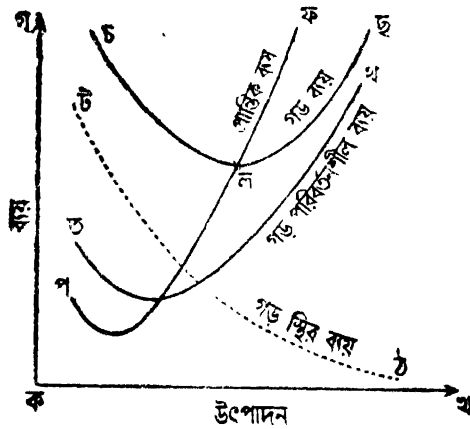
চিত্র-৩২

উপরের রেখাচিত্রে চছ স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা। এই রেখাটির আকৃতি ইংরাজী U-অক্ষরের মতো। কারণ উৎপাদনের শুরুতে 'ল' পর্যন্ত গড় ব্যয় হ্রাস পায় এবং উহার পরে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে গড় ব্যয় বৃদ্ধি পায়। টঠ রেখাটি গড় স্থির ব্যয় রেখা ; গড় স্থির ব্যয় উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে হ্রাস পায় বলিয়া এই রেখাটি ক্রমশ নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে। তথ রেখাটি গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা। উৎপাদনের পরিবর্তনের সঙ্গে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে, তাহা এই রেখাটি দ্বারা দেখানো হইয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় প্রথমে হ্রাস এবং পরে বৃদ্ধি পায় বলিয়া এই রেখাটির আকৃতিও ইংরাজী U-অক্ষরের মতো। রেখাচিত্রে দেখা যায়, উৎপাদনের যে কোন পরিমাণে গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় যোগ করিলে গড় ব্যয় পাওয়া যায়। পফ রেখাটি প্রান্তিক ব্যয় রেখা। এই রেখাটিও U-অক্ষরের মতো, কারণ প্রান্তিক ব্যয় প্রথমে হ্রাস পায় এবং পরে বৃদ্ধি পায়। এই রেখাটি গড় ব্যয় রেখাটির নীচের দিক হইতে আসিয়া ঐ রেখাটির সর্বনিম্ন 'ল' বিন্দুতে ছেদ করিয়া গড় ব্যয় রেখাটির উপরে চলিয়া যাইতেছে। কারণ গড় ব্যয় হ্রাস পাইলে প্রান্তিক ব্যয়ের তুলনায় কম হয়, গড় ব্যয় যখন সর্বনিম্ন ও স্থির

হয়, প্রান্তিক ব্যয় তখন গড় ব্যয়ের সমান হয় এবং গড় ব্যয় যখন বাড়িতে থাকে প্রান্তিক ব্যয় তখন গড় ব্যয়ের তুলনায় বেশী হয়।

১০. স্বল্পকালীন অনুমানগুলির প্রয়োগযোগ্যতা (Applicability of Short-run Assumptions)ঃ স্বল্পকালীন ব্যয় বিশ্লেষণের জন্য যে-সকল অনুমান (২২৬ পৃষ্ঠা) করা হইয়াছে সেইগুলি কতদূর বাস্তবে প্রয়োগ করা যায়, তাহা বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন।

স্বল্পকালীন অবস্থার প্রথম অনুমানটিতে বলা হইয়াছে, উৎপাদনের কতকগুলি উপাদান স্থির থাকে। বাস্তবক্ষেত্রে যে-সকল বৃহৎ ফার্ম-এ ভারী ভারী ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম লইয়া উৎপাদন করিতে হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে এই অনুমানটির সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। ঐ সকল স্থানে যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী সহজেই সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এই কারণে ফার্মকে কতকগুলি উৎপাদন স্থির রাখিয়া উহা পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হয়। অবশ্য শ্রমপ্রধান ক্ষুদ্র ফার্ম-এ উপাদানগুলি পরিবর্তন করা বিশেষ কষ্টসাপেক্ষ ব্যাপার হয় না।

স্বল্পকালীন অবস্থার দ্বিতীয় অনুমানটি হইতেছে, স্থির উপাদানগুলির সম্যক ব্যবহারের জন্য ন্যূনতম পরিবর্তনশীল উপাদানগুলি নিয়োগ করিতে হয়। এই অনুমানটির বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায়। কারণ স্থির উৎপাদনগুলির জন্য যে-পরিমাণ ন্যূনতম পরিবর্তনশীল উপাদান প্রয়োজন, তাহা নিয়োগ করা না হইলে স্থির উপাদানটির পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হইবে না এবং উহার ফলে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে। যেমন—কোন একটি যন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ৪ জন শ্রমিক প্রয়োজন পড়িলে প্রতিষ্ঠানটিকে অন্তত ৪ জন শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইবে। কারণ উহা না করা হইলে যন্ত্রটির কাম্য ব্যবহার সম্ভব হইবে না এবং উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইবে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যাদির চাহিদা কম হইলে স্থির উপাদানটির পরিপূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব না-ও হইতে পারে।

স্বল্পকালীন অবস্থার তৃতীয় অনুমানটিতে বলা হয়, কতকগুলি পরিবর্তনশীল উপাদান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করা যায় না। ইহার বিশেষ বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিককে সমস্ত দিনের একটি অংশের জন্য নিয়োগ করা যায় না। ইহার ফলে শ্রমশক্তির পূর্ণ-ব্যবহার না হওয়া পর্যন্ত পরিবর্তনশীল উপাদানটির সমানুপাতিক বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় না এবং গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় এই কারণে গোড়ার দিকে হ্রাস পায়।

স্বল্পকালীন অবস্থার চতুর্থ অনুমানটির বাস্তব প্রয়োগ বিশেষ সম্ভব নয়। এই অনুমানটিতে ধরা হয়, উপাদানের সকল এককের দাম অপরিবর্তিত থাকে। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান যখন কোন উপাদানের মোট যোগানের খুব সামান্য অংশ ক্রয় করে, কেবলমাত্র তখনই কোন সংশ্লিষ্ট উপাদানের একক-প্রতি দাম অপরিবর্তিত থাকিতে পারে।

কিন্তু ফার্ম যখন সংশ্লিষ্ট উপাদানের (যেমন—কাঁচামাল বা শ্রমশক্তি) মোট যোগানের এক বিরাট অংশ ক্রয় করে তখন উপাদানের নিয়োগবৃদ্ধির সঙ্গে উহার দাম-বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ইহা ছাড়া, কোন উপাদান অধিক পরিমাণে নিয়োগ করিতে হইলে ক্রমশ উহার যোগান হ্রাস পায়। ইহার ফলে অন্য ক্ষেত্র হইতে উহা আকৃষ্ট করিতে হইলে অধিক দাম দিতে হয়।

পরিশেষে, স্বল্পকালীন অবস্থার শেষ অনুমানটির বাস্তব প্রয়োগ বিশেষ কম দেখা যায়। ঐ অনুমানটিতে ধরা হইয়াছে, কোন উপাদানের সকল এককের সমান দক্ষতা থাকিবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ইহা বিশেষ দেখা যায় না। কারণ যতই কোন একটি উপাদান নিয়োগ করা হয়, ততই পরবর্তী এককগুলির দক্ষতা ও উৎপাদন-শক্তি কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শ্রমিক অধিক পরিমাণ নিয়োগ করা হইলে পরবর্তী শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা সাধারণত পূর্বেকার শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা অপেক্ষা কম হয়। সুতরাং এই অনুমানটিও বাস্তবে বিশেষ রূপায়িত করা সম্ভব হয় না।

১১. দীর্ঘকালীন ব্যয় ও উহার অনুমানসমূহ (Long-run Cost and its Assumptions)ঃ দীর্ঘকালীন ব্যয় বিশ্লেষণের প্রথমে 'দীর্ঘকাল' বলিতে কি বুঝায় তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। অর্থবিদ্যায় স্বল্পকাল বা দীর্ঘকাল বলিতে কোন নির্দিষ্ট কালপর্বকে (যেমন—তিনমাস বা ছয়মাস বা তিন বৎসর) বুঝায় না, দীর্ঘকাল বলিতে উৎপাদনের এমন একটা অবস্থা বুঝায়, যাহার মধ্যে ফার্ম উহার আয়তন ও সংগঠন পরিবর্তন করিয়া পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সংগতি রাখিয়া চলিতে পারে। স্বল্পকালীন অবস্থায় কোন ফার্ম-এর উৎপাদনকার্যে কতকগুলি উপাদান স্থির থাকে এবং কতকগুলি পরিবর্তনশীল হয়, ইহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে। ঐ অবস্থায় কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি করা হয়, কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় ফার্ম উহার আয়তন, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, ঘরবাড়ী ইত্যাদি ইচ্ছামতো পরিবর্তন করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে। যেমন—দীর্ঘকালীন অবস্থায় কোন ফার্ম অপ্রয়োজনীয় বাড়ী বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে পারে, পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সংগতি রাখিয়া বীমার (insurance) পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি করা যায়, পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নূতন ও অভিনব যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করা যায়, প্রশাসনিক ও বিক্রয় কর্মচারীর সংখ্যা প্রয়োজনমতো হ্রাসবৃদ্ধি করা যায় ইত্যাদি।

সুতরাং দীর্ঘকালীন অবস্থায় ফার্ম-এর সকল ব্যয়ই পরিবর্তনশীল হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ফার্মটি কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য যতদূর সম্ভব অধিকতর দক্ষতার সহিত অর্থাৎ যথাসম্ভব কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারে। কারণ ফার্মটি প্রয়োজনমতো উহার আয়তন পরিবর্তন এবং বিভিন্ন উপাদানের তারতম্য করার সুযোগ পায়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। স্বল্পকালীন অবস্থায়

উৎপাদনের পরিমাণ যদি হ্রাস করিতে হয় তাহা হইলে এককপিছু ব্যয় অধিকতর হইয়া পড়ে ; কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি স্বল্পকালীন স্থির ব্যয়ের বিষয়কে পরিবর্তিত করিয়া উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা যায়। পক্ষান্তরে, স্বল্প-কালীন অবস্থায় যদি উৎপাদন কাম্য স্তর (optimum level) হইতে বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় ফার্মটি বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ পরিবর্তন করিয়া স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির পথে যে সকল অসুবিধা থাকে তাহা দূর করিতে সমর্থ হয় এবং উহার ফলে গড় ব্যয়ের বৃদ্ধির মাত্রা হ্রাস করিতে পারে।

স্বল্পকালীন ব্যয়বিশ্লেষণের ন্যায় কোন ফার্ম-এর দীর্ঘকালীন ব্যয় বিশ্লেষণের কতকগুলি অনুমান ধরা হয় ঃ

(১) দীর্ঘকালীন অবস্থায় সকল উপাদানের (শ্রমশক্তি বা কলকারখানা বা উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী) পরিমাণ প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করা যায়। কোন উপাদানই স্থির থাকে না এবং ইহার ফলে ব্যয়ের সকল বিষয়ই পরিবর্তনশীল হইয়া পড়ে।

(২) উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত উপাদানগুলির মধ্যে ইচ্ছামত সমন্বয় সাধন করা যায় এবং পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করিয়া কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন সর্বাপেক্ষা কম ব্যয় উৎপাদন করা যায়।

(৩) কোন ফার্ম উহার উৎপাদন-ব্যবস্থার আয়তন হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারে। উৎপাদনের আয়তন পরিবর্তন করিয়া ফার্মটি বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য যথাসম্ভব কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারে।

(৪) স্বল্পকালীন অবস্থার ন্যায় দীর্ঘকালীন অবস্থায় কতকগুলি উপাদান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করিয়া নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। মূলধন-সামগ্রী, শ্রমশক্তি, গবেষণা, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি উপাদানের ক্ষেত্রে এইরূপ অবিভাজ্যতা (indivisibility) দেখা যায়।

(৫) দীর্ঘকালীন অবস্থায় সকল উপাদান প্রয়োজনমতো বৃদ্ধি করা যায় বলিয়া কোন একটি বিশেষ উপাদানের পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় এবং উহার ফলে ঐ াদানটির (যেমন—শ্রম, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি) বিভিন্ন এককের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষায়ণ (specialization) অর্জন করা যায়।

(৬) দীর্ঘকালীন অবস্থায় সকল উপাদানই ইচ্ছামতো বৃদ্ধি করা সম্ভব হইলেও পরিচালন-সংক্রান্ত উপাদানটি (যেমন, পরিচালকবর্গের সংখ্যা বা ব্যবসা-পরিচালনায় উচ্চপদস্থ কর্মচারী) বিশেষ বৃদ্ধি করা যায় না। সমগ্র ব্যবসায়ের উপর একক ও অভিন্ন নিয়ন্ত্রণ (uniform control) বজায় রাখিতে হয় বলিয়া ইহা সম্ভব হয় না।

(৭) দীর্ঘকালীন অবস্থায়ও উপাদানগুলির দাম অপরিবর্তিত থাকে এবং কোন একটি উপাদানের বিভিন্ন এককের সমান দক্ষতা থাকে এইরূপ ধরা হয়।

এই অনুমানগুলি ধরা হয় বলিয়া দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখাটিও ইংরাজী U-অক্ষরের মতো হয়। দীর্ঘকালীন অবস্থায় উপাদানের অবিভাজ্যতার অসুবিধাগুলি কাটাইয়া উঠা সম্ভব হয় এবং আয়তনজনিত সুযোগ-সুবিধার জন্য উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে প্রারম্ভিক পর্যায়ে গড় উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়, কিন্তু পরে গড় ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ইহা পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে।

১২. দীর্ঘকালীন ব্যয়-তালিকা স্বরূপ (Nature of Long-run Cost Schedule) : কোন ফার্ম-এর দীর্ঘকালীন ব্যয়-তালিকা উপরি-উক্ত অনুমানগুলির ভিত্তিতে তৈয়ারী করা হয়। দীর্ঘকালীন অবস্থায় কোন ফার্ম বিভিন্ন পরিমাণ ব্যয়ে যে বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন করিতে পারে, তাহা এই ব্যয়-তালিকায় দেখানো হইয়া থাকে। দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানটি সকল উপাদানই ইচ্ছামতো নিয়োগ করিতে পারে বলিয়া উপাদানগুলির কাম্য সমন্বয় (optimum combination of factors) সম্ভব হয়। ইহার ফলে উৎপাদনের প্রতি স্তরে কোন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে উৎপাদন করা সম্ভব হয়। সুতরাং দীর্ঘকালীন অবস্থায় ফার্ম যে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহার প্রতিটি একটি নির্দিষ্ট উৎপাদনের আয়তনের (a particular scale of production) মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ের উৎপাদন। প্রসঙ্গত উল্লেযোগ্য, দীর্ঘকালীন অবস্থায় কোনরূপ স্থির ব্যয় থাকে না। সুতরাং ঐ অবস্থায় কোন ফার্ম-এর ব্যয়ের সম্পূর্ণটাই পরিবর্তনশীল।

দীর্ঘকালীন ব্যয়-তালিকার বিষয়গুলি কতকগুলি স্বল্পকালীন ব্যয়-তালিকা হইতে সংগ্রহ করা হয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি স্বল্পকালীন অবস্থার সমষ্টি হইতেছে দীর্ঘকালীন অবস্থা। আবার ঐ সকল স্বল্পকালীন ব্যয়-তালিকার প্রতিটি কোন একটি নির্দিষ্ট আয়তনকে নির্দেশ দেয়। কোন ফার্ম প্রথমেই স্বল্পকালীন অবস্থার জন্য উৎপাদন-পরিকল্পনা তৈয়ার করে এবং সেইভাবেই কোন একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে উৎপদন-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে। কিন্তু উৎপাদন বৃধি করিতে করিতে যখন গড় ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন ফার্মটি বৃহদায়তনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্য উৎপাদন-ব্যবস্থায় উন্নত কলাকৌশল, উন্নত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রবর্তন করে। ইহার ফলে উৎপাদনের পরবর্তী পর্যায়ে (অর্থাৎ, দ্বিতীয় স্বল্পকালীন অবস্থায়) গড় ব্যয় হ্রাস পায়। উৎপাদনের এই ধারা চলিতে থাকে এবং উহা কতকাল চলিবে তাহা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ঐ বিষয়গুলি পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হইবে। সুতরাং দেখা যায়, কতকগুলি স্বল্পকালীন ব্যয়-তালিকা হইতে কোন ফার্ম-এর দীর্ঘকালীন ব্যয়-তালিকা তৈয়ার করা হয়।

১৩. দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় (Long-run Average Cost) : কোন ফার্ম-এর দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের বিষয়টি ইহার দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়। সংক্ষেপে বলা যায়, স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখার মতো

দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখাটিও সাধারণত ইংরেজী U-অক্ষরের মত হইবে, তবে উহা স্বল্পকালীন গড় ব্যয়-রেখার মতো সোজা আকৃতির না হইয়া অধিকতর চ্যাপ্টা (flatter) বা বিস্তৃত আকৃতির হইবে। দীর্ঘকালীন মেয়াদ যতই দীর্ঘ হইবে, গড় ব্যয় রেখার U-অক্ষরটি ততই কম প্রতীয়মান হইবে (The long-run average cost curves will normalty be U-shaped just as short-run ones will, but they will invariably be flatter than short-run ones. The U-shape of a cost curve will be less pronounced the longer the period to which the curve relates—*Stonier & Hague*)। স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের মতো দীর্ঘ কালীন গড় ব্যয় দ্রুত হ্রাস বা বৃদ্ধি পায় না। দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা U-অক্ষরের মতো হওয়ার কারণ খুবই সুস্পষ্ট। কোন ফার্ম যখন উহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে থাকে তখন প্রথম দিকে গড় ব্যয় হ্রাস পাইতে পাইতে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছায় এবং কিছুটা সময় স্থির থাকে। পরে আবার উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

দীর্ঘকালীন অবস্থায় কোন ফার্ম যাহাতে যতদূর সম্ভব কম ব্যয়ে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় তাঁহার জন্য ইহা কারখানার আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ফার্মটি এক আয়তন ছাড়িয়া অন্য আয়তনে চলিয়া যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট মুহূর্তে ইহা একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে থাকিয়া উৎপাদনের ব্যবস্থা করে এবং ঐ নির্দিষ্ট আয়তনের গড় ব্যয় রেখা হইল স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা। চাহিদা-বৃদ্ধির ফলে অধিক উৎপাদন করিতে গিয়া যদি ফার্মটি দেখে যে অন্য আয়তনে উৎপাদন করিলে গড় ব্যয় কম হইবে, তাহা হইলে ফার্মটি পূর্বেকার আয়তন পরিত্যাগ করিয়া নূতন আয়তনে উৎপাদন করিবে। এই এক-একটি আয়তনের গড় ব্যয় রেখাও হইল স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা। এইভাবে একাধিক আয়তন ও স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা হইতে সরিয়া গিয়া ফার্মটি দীর্ঘকালীন উৎপাদন সম্পন্ন করে। বিভিন্ন আয়তন-সম্পর্কিত এই সকল ভিন্ন ভিন্ন স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা হইতে কোন ফার্ম-এর দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা টানা হয়। কারণ দীর্ঘকালীন অবস্থায় বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন যে যথাসম্ভব কম ব্যয়ে উৎপাদন করা হয় তাহাই দেখানো হয়। সুতরাং ফার্মটি স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখাটির যে-বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য অন্য আয়তনের গড় ব্যয় অপেক্ষা কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারে সেই সকল বিন্দুকে নীচের দিক হইতে স্পর্শ করাইয়া একটি রেখা টানিলেই দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা পাওয়া যাইবে।

দীর্ঘকালীন এইরূপ গড় ব্যয় রেখাকে 'পরিকল্পনা রেখা' (planning curve) বা 'মোড়ক-রেখা' (envelope curve) বলা হয়। এই গড় ব্যয় রেখাটি কোন ফার্ম-এর দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদন ও আয়তনের পরিকল্পনার নির্দেশ দেয় বলিয়া ইহাকে 'পরিকল্পনা রেখা' বলা হয়। আবার দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখাটি কতকগুলি

স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখাকে মুড়িয়া রাখে (envelope) বলিয়া ইহাকে 'মোড়ক-রেখা' বলা হয়।

দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখাটি নিম্নের রেখাচিত্রে দেখানো হইল ঃ
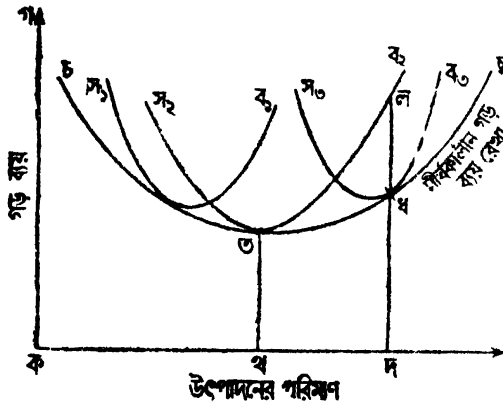
চিত্র-৩৩

উপরের রেখাচিত্রে কখ অক্ষটি দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণ এবং কগ অক্ষটি দ্বারা গড় ব্যয়ের পরিমাণ দেখানো হইতেছে। চছ রেখাটি কোন ফার্ম-এর দীর্ঘ-কালীন গড় ব্যয় রেখা। স১ ব১, স২ ব২ এবং স৩ ব৩—তিনটি পৃথক আয়তনের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা। রেখাচিত্রটিতে দেখা যায়, 'ত' বিন্দু পর্যন্ত অর্থাৎ কখ উৎপাদন পর্যন্ত দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় হ্রাস পায় এবং পরে উহা বৃদ্ধি পাইতেছে। দীর্ঘকালীন এই গড় ব্যয় রেখাটিও স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখার মতো ইংরাজী U-আকৃতির হয়। কিন্তু দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় ধীরে ধীরে হ্রাস এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় বলিয়া ইহা স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত বা চ্যাপ্টা হয়। চিত্রে দেখা যাইতেছে, চছ দীর্ঘকালীন ব্যয়-রেখাটি স্বল্পকালীন ব্যয়-রেখা তিনটিকে তলা হইতে স্পর্শ করিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য ইহা একমাত্র দ্বিতীয় স্বল্পকালীন ব্যয়-রেখাটির (অর্থাৎ সর্বনিম্ন স্বল্পকালীন ব্যয়-রেখা) সর্বনিম্ন বিন্দুতে (রেখাচিত্রে স২ ব২ রেখাটির ত বিন্দু) স্পর্শ করে।

এখানে উল্লেখযোগ্য, যে-বিন্দুতে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখাটি স্বল্পকালীন গড় ব্যয়-রেখাকে স্পর্শ করে, সেই বিন্দুতে উৎপন্ন-দ্রব্যের গড় ব্যয় অন্য যে কোন আয়তনে ঐ পরিমাণ দ্রব্যের গড় ব্যয় অপেক্ষা কম হয়। রেখাচিত্রে একটি উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, উৎপাদক কখ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে। এখন সে উহা বৃদ্ধি করিয়া কদ পরিমাণ উৎপাদন করিতে চাহে। স্বল্পকালীন অবস্থায় ঐ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে যাইলে গড় ব্যয় হইবে দল (দ্বিতীয় ব্যয়-রেখাটি অনুযায়ী)। কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় ফার্ম-এর আয়তন পরিবর্তন

করিয়া তৃতীয় আয়তনে (তৃতীয় স৩ ব৩ ব্যয়-রেখায়) চলিয়া যাইবে বলিয়া ঐ আয়তনে কদ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে গড় ব্যয় হইবে আরও কম অর্থাৎ দধ।

দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের তারতম্য হওয়ার কারণ হইতেছে, আয়তন-জনিত সুবিধার জন্য ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদান (returns) পাওয়া যায় বলিয়া দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় প্রথমে হ্রাস পায়। কিন্তু পরে আয়তন জনিত অসুবিধাগুলির ফলে ব্যয়াধিক্যের (diseconomics) জন্য ক্রমহ্রাসমান হারে প্রতিদান পাওয়া যায় বলিয়া একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের পরে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

১৪. **দীর্ঘকালীন অবস্থার অনুমানগুলির তাৎপর্য** (Significance of Long-run Assumptions): দীর্ঘকালীন ব্যয়-বিশ্লেষণের জন্য যে-সকল অনুমান ধরা হইয়াছে, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘকালীন অবস্থায় ধরা হয়, উৎপাদনের সকল উপাদানই ইচ্ছামতো পরিবর্তন করিয়া কোন ফার্ম এক আয়তন হইতে সরিয়া অন্য আয়তনে চলিয়া যায়। বাস্তবক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ বিশেষভাবে দেখা যায়। কারণ প্রায় সকল ফার্ম-এর ক্রমাগত বড় হওয়ার প্রবণতা থাকে। ইহার জন্য বর্তমান আয়তনে উৎপাদন-বৃদ্ধি লাভজনক না হইলে বা গড় ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে ফার্মটি অন্য আয়তনে সরিয়া গিয়া আরও কম ব্যয়ে উহা উৎপাদনের চেষ্টা করে। কিন্তু আয়তন-জনিত অসুবিধার জন্য দীর্ঘকালীন অবস্থায়ও গড় ব্যয় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের পর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আবার উপাদানগুলির ইচ্ছামতো পরিবর্তন সকল ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। কারণ যে-সকল ক্ষেত্রে বিশেষীকৃত উপাদানসমূহ (specialised factors) নিয়োগ করা হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে ঐরূপ পরিবর্তন (substitution) করা বিশেষ সম্ভব হয় না।

দীর্ঘকালীন অবস্থার আর একটি অনুমান হইতেছে উপাদানের অবিভাজ্যতা, অর্থাৎ কোন কোন উপাদান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে পাওয়া যায় না। এই অনুমানটিও উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সকল প্রকার মূলধন-যন্ত্রপাতি বা শ্রমশক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। এই কারণে দীর্ঘকালীন অবস্থায় সকল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু-না-কিছু অবিভাজ্যতার সম্মুখীন হইতে হয়।

ইহা ছাড়া, দীর্ঘকালীন ব্যয়বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ধরা হয়, উপাদানগুলির কাম্য সমন্বয়ের জন্য কোন একটি উপাদানের বিভিন্ন এককের পরিপূর্ণ ব্যবহারের ফলে ঐ উপাদানটি বিশেষায়ণ (specialization) অর্জন করিতে সমর্থ হয় এবং ইহার ফলে দীর্ঘকালীন অবস্থায় গড় ব্যয় হ্রাসের প্রবণতা থাকে।

পরিচালন-সংক্রান্ত ব্যাপারে দীর্ঘকালীন অবস্থায় যে-অনুমান ধরা হইয়াছে তাহাও বিশেষ তাৎপর্যমূলক। ফার্ম-এর আয়তন প্রসারিত হওয়ার ফলে সকল উপাদানেরই বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালকদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। পরিচালনার ক্ষেত্রে একক ও অভিন্ন নিয়ন্ত্রণের (single and uniform control) জন্য পরিচালকদের সংখ্যা একরূপ স্থির ও সীমিত থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, উপাদানগুলির দাম অপরিবর্তিত এবং উহাদের প্রতি এককের সমান দক্ষতা সম্পর্কে যে-অনুমান ধরা হইয়াছে তাহা বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় না। কারণ স্বল্পকালীন অবস্থার ন্যায় উপাদানের নিয়োগ-বৃদ্ধির সঙ্গে উহাদের দাম বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তী একক‌গুলির দক্ষতা কম হয়, ইহাই বাস্তবক্ষেত্রে বেশী দেখা যায়।

১৫. শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যয়ের অবস্থা (Cost Conditions of the Industry) : পূর্বেকার অংশগুলিতে উৎপাদন ব্যয়ের যে শিল্পের কোন উৎপাদন-ব্যয় নাই। কারণ একই দ্রব্য উৎপাদন করে এমন কতকগুলি ফার্ম লইয়াই কোন শিল্প গঠিত হয় (যেমন—ইস্পাত নির্মাণ করে এমন কতকগুলি ফার্ম লইয়াই হইতেছে ইস্পাত-শিল্প)। তবুও শিল্পের দিক হইতে ব্যয়ের অবস্থা বিশ্লেষণ করিতে হয়। কারণ সকল ফার্ম-এর যোগান লইয়াই হইতেছে শিল্পের যোগান এবং এই শিল্পের যোগানই বাজারের চাহিদা পূরণ করে।

ব্যয়ের দিক হইতে শিল্পগুলিকে (ক) ক্রমহ্রাসমান ব্যয়সম্পন্ন, (খ) সমব্যয় সম্পন্ন এবং (গ) ক্রমবর্ধমান ব্যয়সম্পন্ন—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এখন এই তিন প্রকার শিল্পের দিক হইতে ব্যয়ের অবস্থা বিশ্লেষণ করা হইবে।

ক. **ক্রমহ্রাসমান ব্যয়-সম্পন্ন শিল্প (Decreasing Cost Industries) :** যে-সকল শিল্পে উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে ফার্মগুলির গড় উৎপাদন ব্যয় ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে, সেই সকল শিল্পকে ক্রমহ্রাসমান ব্যয়সম্পন্ন শিল্প বলে। ইহার ফলে, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের যোগান দাম(the supply price) হ্রাস পাইতে পারে। ইহার মূল কারণ হইতেছে বৃহদায়তনের সুযোগ-সুবিধা বিশেষত বহিরাগত ব্যয়সংকোচ (external economies)[১]। কোন শিল্পের প্রসারের ফলে ঐ শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্ম এই 'বহিরাগত ব্যয়সংকোচ' (যেমন—গবেষণা বা শিল্পের স্থানীয়করণ প্রভৃতির সুবিধা) ভোগ করিতে পারে। ইহার ফলে, শিল্পটির প্রসারের জন্য ফার্মগুলি কম গড় ব্যয়ে অধিক উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। ইহা ছাড়া, শিল্পের প্রসারের জন্য ফার্মগুলি কম দামে অধিক পরিমাণে কাঁচামাল, শ্রম ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিলে উহাদের গড় উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ হ্রাস পাইতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ কোন স্থানে একটি নূতন শিল্প-অঞ্চল গড়িয়া উঠিলে ক্রমহ্রাসমান ব্যয় দেখা যাইতে পারে। প্রথমে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম হওয়ায় ঐ অঞ্চলে পরিবহণ, ব্যাংক, বীমা প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা কম থাকে। কিন্তু ঐ স্থানে ধীরে ধীরে অনুরূপ আরও কতকগুলি নূতন ফার্ম গড়িয়া উঠিলে উহারা উপরিউক্ত সুযোগসুবিধাগুলি ভোগ করিতে পারিবে এবং উহার ফলে উহাদের গড় উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকিবে।

১. পৃঃ ৬৬ দ্রষ্টব্য

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই ধরনের শিল্প খুব কমই দেখা যায়। কারণ বহিরাগত ব্যয়-সংকোচ-এর সীমা থাকে। উৎপাদন একটি সীমা অতিক্রমের পর উৎপাদন—বৃদ্ধির সঙ্গে গড় ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ক্রমহ্রাসমান ব্যয়সম্পন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যয় রেখা অর্থাৎ যোগান-রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নীচে নামিয়া যায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে ফার্মগুলির গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা নীচের দিকে নামিয়া যাইবে। এই অবস্থায় কম দামে অধিক যোগান দেওয়া সম্ভব হয়।

খ. **সমব্যয়সম্পন্ন শিল্প :** যে-সকল শিল্পের প্রসারের ফলে 'বহিরাগত ব্যয়-সংকোচ' ও 'বহিরাগত ব্যয়াধিক্য' পরস্পর সমান হইয়া পড়ে, সেই সকল ক্ষেত্রে সমব্যয়সম্পন্ন (constant cost) শিল্পের উদ্ভব ঘটে। এই প্রকার শিল্পের প্রসারের ফলে ফার্মগুলির ব্যয়-তালিকা বা ব্যয়রেখার কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না অর্থাৎ উহাদের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও গড় ব্যয় স্থির থাকে। ইহার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন যোগান-দাম অপরিবর্তিত থাকে।

বাস্তবক্ষেত্রে সমব্যয়সম্পন্ন শিল্পের দৃষ্টান্ত খুবই কম। যে-সকল শিল্পে কৃষিকার্য ও শিল্পকার্যের সমান প্রাধান্য (যেমন—চিনি শিল্পে) সেই সকল ক্ষেত্রে এইরূপ শিল্প দেখা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া, শিল্পের প্রসারের ফলে উপাদানগুলি একই দামে পাওয়া গেলে এবং উহাদের ক্ষমতা একই রূপ হইলে এই ধরনের শিল্প দেখা যাইতে পারে।

সমব্যয়সম্পন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যয়-রেখা বা যোগান রেখা একটি অনুভূমিক সরল-রেখা (a horizontal straight line) হইয়া থাকে ও শিল্পের প্রসারের ফলে সংশ্লিষ্ট ফার্মগুলির গড় ব্যয় রেখা বা প্রান্তিক ব্যয় রেখার কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না।

গ. **ক্রমবর্ধমান ব্যয়সম্পন্ন শিল্প :** কোন শিল্পের প্রসার ও উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে যদি ঐ শিল্পের অন্তর্গত ফার্মগুলির গড় উৎপাদন-ব্যয় এবং উৎপাদিত দ্রব্যের যোগান-দাম বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে ঐ শিল্পকে ক্রমবর্ধমান ব্যয়-সম্পন্ন (increasing cost) শিল্প বলিয়া অভিহিত করা হইবে। এই শিল্পের ক্ষেত্রে প্রসারের ফলে 'বহিরাগত ব্যয়-সংকোচ' এবং 'বহিরাগত ব্যয়াধিক্য'—উভয়ই সৃষ্টি হয়। কিন্তু ব্যয়সংকোচের তুলনায় ব্যয়াধিক্য বেশী হয় বলিয়া অধিক যোগান দিতে গড় উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইয়া পড়ে। এই নীট বহিরাগত ব্যয়াধিক্যের (net external diseconomies) জন্য ফার্মগুলির ব্যয়-রেখা পূর্বের তুলনায় উপরে সরিয়া যায়।

ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের মূল কারণ দুইটি : (১) বহিরাগতব্যয়বৃদ্ধি এবং (২) পরিচালনা-গত ব্যয়বৃদ্ধি। কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণের দাম বৃদ্ধির ফলে বহিরাগত ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, অধিক উৎপাদনের জন্য ক্রমশ নিকৃষ্টমানের বা কম দক্ষতা-সম্পন্ন উপাদান নিয়োগ করিতে হয়। ইহার ফলেও গড় উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

পরিচালনাগত ব্যয়বৃদ্ধির মূল কারণ হইতেছে পরিচালকদের ক্ষমতার তারতম্য। শিল্প-প্রসারের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ ফার্মগুলি মুনাফার আশায় উৎপাদন শুরু করে। কম দক্ষ ফার্মগুলির পরিচালন-দক্ষতা কম হওয়ার জন্য উহাদের উৎপাদন-ব্যয়ও অধিক হইবে। শিল্পটির উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা ও দাম আরও বৃদ্ধি পাইলে আরও কম দক্ষতার উৎপাদক শিল্পে প্রবেশ করিবে। ইহার ফলে, উহাদের গড় উৎপাদন-ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং দেখা যায়, ক্রমবর্ধমান ব্যয়সম্পন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম অধিক না হইলে উৎপাদিত দ্রব্যের যোগান অধিক হইবে না। ইহা বলা বাহুল্য, বাস্তব জগতে ক্রমবর্ধমান ব্যয়সম্পন্ন শিল্পেরই প্রাধান্য দেখা যায়।

কৃষিপণ্য বা শিল্পসামগ্রী—উভয় প্রকার উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ধরনের শিল্প দেখা যায়। যেমন—ধান বা গমের চাহিদা-বৃদ্ধির ফলে ক্রমশ নিকৃষ্ট মানের জমিতে ধান বা গম উৎপন্নের ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার ফলে কম দক্ষতার জমিতে গড় উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং বাজারে দাম বৃদ্ধি না পাইলে ধান বা গমের যোগান বৃদ্ধি পাইবে না। শিল্পসামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, উহাদের চাহিদা ও দাম বৃদ্ধির ফলে অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতাসম্পন্ন উপাদান দ্বারা বা অপেক্ষাকৃত অধিক দামে উপাদান ক্রয় করিয়া উৎপাদন-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহা ছাড়া, অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতার উৎপাদকরা উৎপাদন শুরু করে এবং ইহার ফলে দাম বৃদ্ধি না পাইলে অধিক যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না।
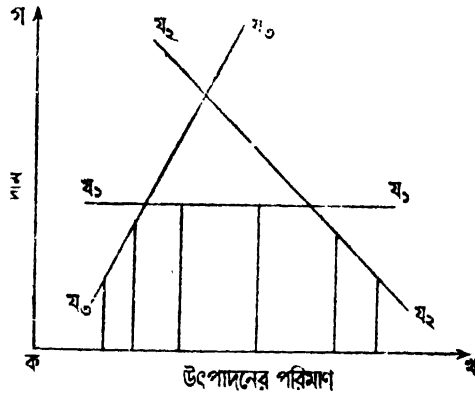
চিত্র ৩৪

এই তিনপ্রকার ব্যয়সম্পন্ন শিল্পের যোগান (দীর্ঘকালীন) কিরূপ হইয়া থাকে, তাহা উপরের রেখাচিত্রে দেখানো হইল ঃ

উপরের রেখাচিত্রে কখ অক্ষ দ্বারা উৎপাদনের মোট পরিমাণ এবং কগ অক্ষ দ্বারা

১৮

।। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় দাম ও উৎপাদন নির্ধারণ ।।

(Price and Output Determination under Pure Competition)

[পূর্ণ প্রতিযোগিতার ধারণা—পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থা দাম-নির্ধারণের সাধারণ প্রকৃতি—পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় বাজার-দাম নির্ধারণ—দাম-নির্ধারণে সময়-মেয়াদের প্রভাব -বাজার দাম ও স্বাভাবিক দাম—চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দামের পরিবর্তন—সর্বাধিক মুনাফার শর্ত—স্বল্পকালীন অবস্থায় ফার্ম-এর দাম ও উৎপাদন নির্ধারণ—দীর্ঘকালীন অবস্থায় দাম ও উৎপাদন নির্ধারণ—পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় শিল্পের ভারসাম্য ।

ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অর্থনৈতিক কার্যক্রম হইতেছে উৎপাদিত দ্রব্যসামাগ্রী ও সেবাকার্য বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা। উহার জন্য ফার্মকে উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করিতে হয়। আবার উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে প্রধানত বাজার দামের উপর। সুতরাং বাজার-দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় এবং ঐ বাজার-দামের ভিত্তিতে ফার্ম কিভাবে উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণের এই সমস্যাটি বিভিন্ন প্রকার বাজার অবস্থায় বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। বর্তমান অধ্যায়ে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় দাম ও উৎপাদন নির্ধারণ এবং পরবর্তী অধ্যায়ে একচেটিয়া অবস্থায় দাম ও উৎপাদন নির্ধারণের এই সমস্যাটি বিশদভাবে আলোচনা করা হইল।

১. **পূর্ণ প্রতিযোগিতার ধারণা (Concept of Pure Competition) :** পূর্ণ বা নিখুঁত প্রতিযোগিতা বলিতে কি বুঝায়, তাহা 'বাজার-সম্পর্কের বিশ্লেষণ' অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ আলোচনায় পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার (perfect competition) কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থবিদ্যাবিদগণ 'পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা' ও 'পূর্ণ প্রতিযোগিতা'—এই দুইটি বাজারকে একই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিলেও কোন কোন লেখক (যেমন—Chamberlin, Ryan প্রভৃতি) এই দুই প্রকার বাজারের মধ্যে সামান্য পার্থক্য করিয়াছেন। কিন্তু দাম ও উৎপাদন নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার অনুমানসমূহ : পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় যে-সকল অনুমান (assumptions) ধরা হয় তাহা পুনরায় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল : (ক) পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে। (খ) প্রত্যেক বিক্রেতাই একইধরনের সমগুণবিশিষ্ট (homogenous) বা একই দ্রব্য বিক্রয় করে। (গ) প্রত্যেক বিক্রেতা একই দ্রব্য বিক্রয় করে বলিয়া ক্রেতারা যে-কোন বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারে এবং দ্রব্য-ক্রয়ের ব্যাপারে কোন বিশেষ বিক্রেতার

দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের কোন পক্ষপাতিত্ব থাকে না। (ঘ) পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বহুসংখ্যক ফার্ম একই দ্রব্য উৎপাদন করে বা যোগান দেয় বলিয়া কোন একজন বিক্রেতা বাজার-যোগানের অতি সমান্যতম অংশ যোগান দিয়া থাকে। ইহার ফলে এককভাবে কোন বিক্রেতার বাজার-যোগান ও বাজার-দামের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সুতরাং ক্রেতা ও বিক্রেতা—উভয়ই বাজার-দামকে স্থির বলিয়া ধরিয়া লয় এবং ঐ বাজার-দামের উপর এককভাবে তাহাদের কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

যাহারা 'পূর্ণ প্রতিযোগিতা' ও 'পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা'র মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিচার করেন, তাঁহাদের মত পূর্ণ প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হইলে বাজারে প্রতিযোগিতা পূর্ণাঙ্গ হইবে। যেমন—ক্রেতা ও বিক্রেতার বাজার-দাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান, উৎপাদনের উপাদানগুলির সচলতা ইত্যাদি। তবে দাম-নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই দুই প্রকার বাজার-অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার যে-সকল অনুমান বর্ণনা করা হইল, তাহা বাস্তবজগতে দেখা যায় না বলিলেই চলে। এই কারণে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থাকে অনেকেই অবাস্তব (unreal) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং এই অবাস্তব অনুমানের ভিত্তিতে দাম-নির্ধারণের যে-তত্ত্ব দেওয়া হয়, তাহাও বহুলাংশে অবাস্তব হইয়া পড়ে। তবে বাস্তবজগতে কতকগুলি ক্ষেত্রে পূর্ণপ্রতিযোগিতার মতো অবস্থা দেখা যায়। প্রাকৃতিক দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতার মতো অবস্থা অনেকটা দেখা যায়। ধান, গম, পাট, আকরিক লৌহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দ্রব্যাদির উৎপাদনের ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতার মতো অবস্থা দেখা যায়। কারণ এই সকল দ্রব্য-উৎপাদনের ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক উৎপাদক থাকে এবং উহাদের উৎপাদিত দ্রব্যগুলি বহুলাংশে সমজাতীয় হইয়া থাকে। সুতরাং প্রাকৃতিক দ্রব্যাদির দাম-নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় মূল্যতত্ত্ব অনেকটা বাস্তব হইয়া উঠে।

২. **পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় দাম-নির্ধারণের সাধারণ প্রকৃতি : (General Nature of Price Determination under Pure Competition)** : পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় দাম অর্থাৎ বাজার দাম (market price) চাহিদা ও যোগানের সম্মিলিত শক্তি দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে। বাজারে অসংখ্য ক্রেতা দ্রব্যটি ক্রয় করে। কিন্তু কোন একজন ক্রেতা বাজার-যোগানের অতি সামান্য অংশ ক্রয় করে বলিয়া কোন ক্রেতা বাজার-দামের উপর কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ রাখিতে পারে না। অর্থাৎ, বাজার-দাম কোন ক্রেতার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে থাকে। বাজারে-যে দাম স্থির হয়, ক্রেতা সেই দামে দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া থাকে। ক্রয় করার সময় ক্রেতা দ্রব্যটির দাম ও প্রান্তিক উপযোগ বিচার করে। যে-পরিমাণ ক্রয়ে দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হইবে, কোন ক্রেতা সেই পরিমাণ দ্রব্যটির ক্রয় করে। এককভাবে কোন ক্রেতা বাজার দাম নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলেও সম্মিলিতভাবে ক্রেতারা সামগ্রিক চাহিদার পরিবর্তন ঘটাইয়া বাজার-দামে পরিবর্তন আনিতে পারে।

ক্রেতার মতো কোন বিক্রেতাও বাজার-যোগানের অতি সামান্যতম অংশ যোগান দিয়া থাকে। ইহার ফলে কোন একজন বিক্রেতা বাজার-দামকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। অর্থাৎ তাহাকে প্রচলিত বাজার-দামে তাহার সমগ্র যোগান বিক্রয় করিতে হয়। ক্রেতা যেরূপ ক্রয়ের মাধ্যমে সর্বাধিক উপযোগ ভোগ করার চেষ্টা করে, বিক্রেতাও সেইরূপ বিক্রয়ের মাধ্যমে সর্বাধিক মুনাফা গ্রহণের চেষ্টা করে। ইহার জন্য উৎপাদক বা বিক্রেতাকে দাম ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে তুলনা করিতে হয়। দেখা যায়, যে-পরিমাণ উৎপাদনে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হয়, সেই পরিমাণ উৎপাদনে উৎপাদক বা বিক্রেতার সর্বাধিক মুনাফা হয়। সুতরাং বিক্রেতা প্রচলিত বাজার দামে সেই পরিমাণ যোগান দিবে যেখানে দ্রব্যটির দাম ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পরের সমান হয়। ক্রেতার ন্যায় কোন একজন বিক্রেতা হয়তো বাজার দাম নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না, কিন্তু বিক্রেতারা সম্মিলিতভাবে বাজার-যোগানে পরিবর্তন ঘটাইয়া বাজার-দাম পরিবর্তন করিতে পারে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ভারসাম্য বাজার-দাম নির্ধারিত হইলেও এই দুইটি শক্তির প্রভাব সকল অবস্থায় একই রূপ হয় না। স্বল্পকালীন অবস্থায় দামের উপর যোগান অপেক্ষা চাহিদা-শক্তির প্রভাব বেশী থাকে। এই স্বল্পকালীন অবস্থায় কোন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে সাধারণত উহার দাম বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদা হ্রাস পাইলে দামও হ্রাস পায়। কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় দাম-পরিবর্তনের সঙ্গে উৎপাদক যোগানের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারে। ইহার ফলে দীর্ঘকালীন অবস্থায় চাহিদা-শক্তি অপেক্ষা যোগানের শক্তি অধিক ক্রিয়াশীল হইয়া পড়ে। সুতরাং দীর্ঘকালীন সময়ে যোগানের উঠা-নামার ফলে দামের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় ভারসাম্য দাম (equlibrium price) চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হইলেও চাহিদা বা যোগানের পরিবর্তনের ফলে ঐ ভারসাম্য দামের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। দাম ব্যতীত অন্যান্য বিষয়গুলির পরিবর্তনের ফলে চাহিদা বা যোগানের পরিবর্তন ঘটিলে ঐ ভারসাম্য দামেরও পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় দাম-নির্ধারণের এই সাধারণ বিষয়গুলি এই অধ্যায়ের পরের অংশগুলিতে বিশদভাবে আলোচিত হইবে।

৩. **পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় বাজার-দাম নির্ধারণ (Determination of Market Price under Pure Competition) :** পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় কোন দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে বাজার-দাম (market price) নির্ধারিত হয়। এখন দেখা যাউক, চাহিদা ও যোগান দ্বারা বাজার-দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় ? বাজারে দুইটি পক্ষ

থাকে—অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা। ক্রেতারা দ্রব্যটির চাহিদা করে এবং বিক্রেতারা উহা যোগান দেয়। চাহিদা ও যোগানের এই বিষয়টি পৃথকভাবে আলোচনা করিয়া পরে উহাদের সম্মিলিত শক্তির প্রভাবে কিভাবে বাজার দাম নির্ধারিত হয়, তাহা দেখানো হইবে।

চাহিদার দিক ঃ বাজারে ক্রেতারা চাহিদার সূত্র (Law of Demand) অনুসারে দ্রব্যটি ক্রয় করে। সুতরাং দ্রব্যের দাম অধিক হইলে উহার বাজার-চাহিদা কম হয় এবং দাম কম হইলে চাহিদা বেশী হয়। কোন একজন ক্রেতা কি পরিমাণ ক্রয় করে, তাহা দ্রব্যের দাম ও প্রান্তিক উপযোগের উপর নির্ভর করে। দেখা যায়, যে-পরিমাণে দ্রব্যের দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হয় ক্রেতারা সেই পরিমাণ দ্রব্যটি ক্রয় করে। সুতরাং চাহিদার দিক হইতে বাজার-দাম দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়।

বাজারে বিভিন্ন দামে ক্রেতারা যে-পরিমাণ চাহিদা বা ক্রয় করে তাহা বাজার চাহিদা-সূচী (market demand schedule) ও চাহিদা-রেখায় (demand curve) দেখানো হয়।[১] নিম্নে উহা দেখানো হইল ঃ

বাজার চাহিদা-সূচী

দ্রব্যের প্রতি একক দাম	মোট বাজার-চাহিদা
৫ টাকা	১০,০০০ একক
৪ ,,	১২,০০০ ,,
৩ ,,	১৫,০০০ ,,
২ ,,	১৮,০০০ ,,
১ ,,	২০,০০০ ,,

উপরের বাজার চাহিদা-সূচীতে দেখা যায়, দ্রব্যটির দাম অধিক হইলে চাহিদার পরিমাণ কম হয় এবং দাম কম হইলে চাহিদার পরিমাণ বেশী হয়। যেমন, ৫ টাকা দামে বাজার-চাহিদা হয় ১০,০০০ একক. ৪ টাকা দামে হয় ১২,০০০ একক, ৩ টাকা দামে হয় ১৫,০০০ একক প্রভৃতি।

১. পৃঃ ১৪৩-১৪৪ দ্রষ্টব্য

চাহিদা ও দামের এই সম্পর্কটি বাজার চাহিদা-রেখায় দেখানো হইল :
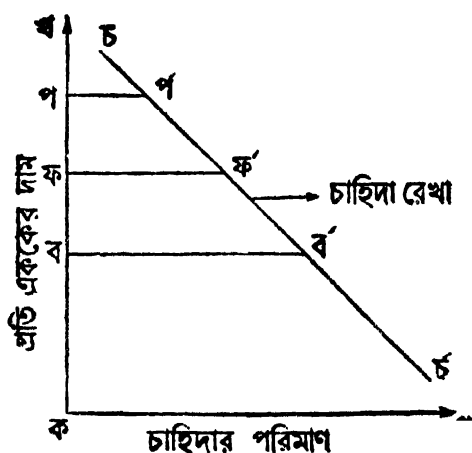
চিত্র ৩৫

উপরের চিত্রে **চচ'** চাহিদা-রেখা ইহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে (পৃ ১৪৩)। বিভিন্ন দামে কোন দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা হয়, তাহা এই চাহিদা-রেখায় দেখানো হয়।

যোগানের দিক : বাজার-দাম নির্ধারণের দ্বিতীয় শক্তিটি হইতেছে দ্রব্যটির বাজার-যোগান। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় অসংখ্য বিক্রেতারা বাজার-দাম ও প্রান্তিক ব্যয় অনুসারে দ্রব্যটি যোগান দিয়া থাকে। যে-পরিমাণ দ্রব্যে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয়, বিক্রেতারা সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া দ্রব্যটি বাজারে যোগান দিবে। সুতরাং যোগানের দিক হইতে দ্রব্যের দাম উহার প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়।

ক্রেতারা যেরূপ চাহিদার সূত্র অনুসারে বিভিন্ন দামে বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা করে, বিক্রেতারা সেইরূপ 'যোগানের সূত্র' (Law of Supply) অনুসারে বিভিন্ন দামে বিভিন্ন পরিমাণ যোগান দিয়া থাকে। যোগানের সূত্রে বলা হয়, যোগান নির্ধারণের অন্যান্য বিষয়গুলির (যেমন—উৎপাদন-পদ্ধতি, উৎপাদন-ব্যয় প্রভৃতি) পরিবর্তন না ঘটিলে অধিক দামে যোগানের পরিমাণ বেশী হইবে এবং কম দামে যোগানের পরিমাণ কম হইবে। ইহা 'বাজার যোগান-সূচী' (market supply schedule) এবং 'বাজার যোগান রেখা'য় (market supply curve) দেখানো হয়।

বাজার যোগান-সূচী

দ্রব্যের প্রতি একক দাম	মোট বাজার যোগান
৫ টাকা	২০,০০০ একক
৪ ,,	১৮,০০০ ,,
৩ ,,	১৫,০০০
২ ,,	১২,০০০ ,,
১ ,,	১০,০০০ ,,

উপরের বাজার যোগান-সূচীতে দেখা যায়, দাম অধিক হইলে যোগানের পরিমাণ বেশী হয়, কিন্তু দাম কম হইলে যোগানের পরিমাণ কম হয়। যেমন—৫ টাকা দামে বাজার যোগান ২০,০০০ একক, ৪ টাকা দামে উহা হয় ১৮,০০০ একক, ৩ টাকা দামে ১৫,০০০ একক প্রভৃতি। দাম ও যোগানের এই সম্পর্কটি নিম্নের বাজার যোগান-রেখায় (market supply curve) দেখানো হয়ঃ
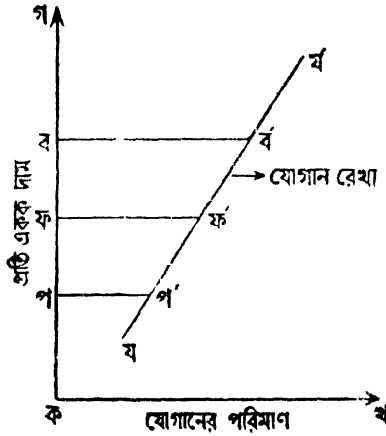
চিত্র—৩৬

উপরের রেখাচিত্রে **যয´** রেখাটি হইতেছে বাজার যোগান-রেখা। রেখাচিত্রে দেখা যায়, দাম **কপ** হইলে বাজার-যোগান হয় **পপ´**, দাম বৃদ্ধি পাইয়া **কফ** হইলে যোগান বৃদ্ধি পাইয়া **ফফ´** হয় এবং দাম আরও বৃদ্ধি পাইয়া **কব** হইলে যোগান আরও বৃদ্ধি পাইয়া **বব´** হয়। সুতরাং দেখা যায়, দাম বৃদ্ধি পাইলে বাজারে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

ভারসাম্য দাম-নির্ধারণঃ চাহিদা ও যোগানের এই দুইটি শক্তি দ্বারা পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় বাজারে 'ভারসাম্য দাম' (equilibrium price) নির্ধারিত হয়।

যে-দাম কোন একটি বিশেষ অবস্থায় আসিয়া স্থির থাকে অর্থাৎ বাড়েও না বা কমেও না, সেই দামকে ভারসাম্য দাম বলে। যে-দামে দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হইবে, তাহাই ভারসাম্য বাজার-দাম হইবে। ইহা নিম্নের তালিকায় দেখানো হইল :

ভারসাম্য বাজার-দাম

দ্রব্যের প্রতি একক দাম	মোট বাজার চাহিদা	মোট বাজার যোগান	দামের উপর প্রতিক্রিয়া
৫ টাকা	১০০,০০০ একক	২০,০০০ একক	দাম কমিবে
৪ ,,	১২,০০০ ,,	১৮,০০০ ,,	,,
৩ ,,	১৫,০০০ ,,	১৫,০০০ ,,	দাম স্থির থাকিবে
২ ,,	১৮,০০০ ,,	১২,০০০ ,,	দাম বাড়িবে
১ ,,	২০,০০০	১০,০০০ ,,	,,

উপরের উদাহরণে দেখা যায়, বাজার দাম ৫ টাকা বা ৪ টাকা হইলে দ্রব্যটির মোট যোগান উহার মোট চাহিদা অপেক্ষা বেশী হইবে। ইহার ফলে বিক্রেতারা ঐ দামে তাহাদের যোগানের সম্পূর্ণ অংশ বিক্রয় করিতে পারিবে না এবং বাজারে উহার দাম হ্রাস পাইবে। আবার, বাজার দাম ২ টাকা বা ১ টাকা হইলে দ্রব্যটির মোট চাহিদা উহার মোট যোগান অপেক্ষা বেশী হইবে। ইহার ফলে ক্রেতারা তাহাদের মোট চাহিদার সম্পূর্ণ অংশ ঐ দামে ক্রয় করিতে পারিবে না এবং বাজারে দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু যখন উহার দাম ৩ টাকা হইতেছে তখন উহার চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হইতেছে—অর্থাৎ ৩ টাকা দামে ক্রেতাদের চাহিদা সম্পূর্ণ মিটানো যাইতেছে এবং বিক্রেতাদের যোগান সম্পূর্ণ বিক্রয় হইতেছে। সুতরাং, দাম ৩ টাকায় আসিলে উহা আর বাড়িবেও না, কমিবে না এবং দাম ভারসাম্য-অবস্থায় আসিবে। ভারসাম্য অবস্থায় দাম ক্রেতার দিক হইতে প্রান্তিক উপযোগ এবং বিক্রেতার দিক হইতে প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত এই ভারসাম্য দাম পরপৃষ্ঠার রেখাচিত্র দ্বারা দেখানো হইয়াছে :

ঐ রেখাচিত্রে **চচ** ও **যয** কোন দ্রব্যের যথাক্রমে বাজার চাহিদা-রেখা ও বাজার যোগান-রেখা। দাম **কখ** হইলে দ্রব্যের মোট চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয়। সুতরাং **কখ** হইতেছে ভারসাম্য দাম। দাম **কখ**$_1$ হইলে দ্রব্যটির বাজার-যোগান

উহার বাজার চাহিদা অপেক্ষা বেশী হইবে এবং ফলে দাম হ্রাস পাইবে। আবার, দাম কখ₂ হইলে দ্রব্যটির বাজার-চাহিদা উহার যোগান অপেক্ষা বেশী হয় এবং ফলে দাম বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু দাম কখ হইলে বাজার দাম বাড়িবেও না, কমিবেও না এবং উহা
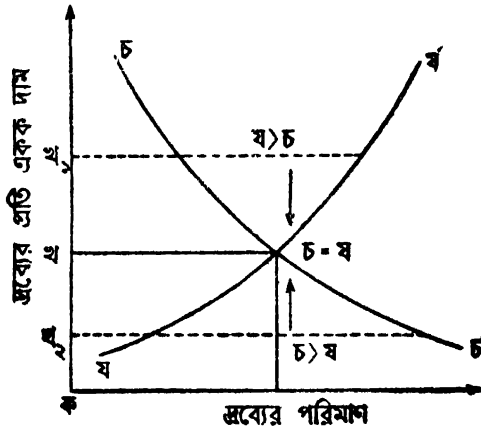
চিত্র ৩৭

স্থিতাবস্থায় আসিবে। কারণ ঐখানে চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হইতেছে। সুতরাং কখ হইতেছে ভারসাম্য দাম এবং ঐ দামে বাজার চাহিদা রেখা ও বাজার-যোগান-রেখা পরস্পর ছেদ করে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় বাজার-চাহিদা ও বাজার-যোগান দ্বারা দাম নির্ধারিত হইলেও দামের উপর চাহিদা ও যোগানের প্রভাব সব সময়ই একরূপ হয় না। এই প্রসঙ্গে দাম নির্ধারণে সময়ের প্রভাব আলোচনা করিতে হয়।

৪. **দাম নির্ধারণে সময়ের প্রভাব** (**Time element in the Theory of Price Determination**): পূর্বে 'বাজার-সম্পর্ক বিশ্লেষণ' অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে, অধ্যাপক মার্শাল চার প্রকার সময়-মেয়াদ বা কালপর্ব বর্ণনা করিয়াছেন।[১] ঐ চার প্রকার বাজার দামের ভারসাম্য এখানে আলোচনা করা হইল:

ক। অতি স্বল্পমেয়াদী বাজারে ভারসাম্য (Equilibrium in the very Short-period Market): অতি স্বল্পমেয়াদী বাজারে বিক্রেতাদের দ্রব্যের যোগান কম বেশী স্থির থাকে। দ্রব্যের চাহিদার উঠা নামার ফলে দামের উঠা-নামা ঘটে। অতি স্বল্পমেয়াদী সময়ে যদি দ্রব্যটির যোগানের সম্পূর্ণটা বিক্রেতাকে বিক্রয় করিতেই হয়, তাহা হইলে দ্রব্যের দাম পুরাপুরি উহার চাহিদার উপর নির্ভর করিবে; চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং চাহিদা হ্রাস পাইলে দাম হ্রাস পাইবে। সুতরাং এই ধরনের বাজারে (যেমন—মাছ, তরি-তরকারী প্রভৃতি পচনশীল দ্রব্যের বাজার)

১. পৃ: ১২৯-১৩০ দ্রষ্টব্য

যে-দাম নির্ধারিত হয় তাহার উপর চাহিদা বা প্রান্তিক উপযোগের প্রভাব বেশী থাকে, যোগানের বা উৎপাদন-ব্যয়ের বিশেষ কোন প্রভাব থাকে না। অতি স্বল্পমেয়াদী অবস্থায় দ্রব্যের যে-মূল্য বা দাম থাকে, তাহাকে দ্রব্যের বাজার-মূল্য বা বাজার দাম (market value or market price) বলা হয়।

খ। স্বল্পমেয়াদী বাজারে ভারসাম্য (Equilibrium in the Short-period Market): স্বল্পমেয়াদী অবস্থায় ফার্মগুলি উহাদের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম পরিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া দ্রব্যের যোগান যতখানি পরিবর্তন করিতে পারে যোগান ততখানি পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। দ্রব্যের যোগান কিছুটা পরিবর্তন করা সম্ভব হয় বলিয়া দামের উপর যোগান বা উৎপাদন-ব্যয়ের কিছুটা প্রভাব দেখা যায় এবং এই অবস্থায় দাম দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইবে। স্বল্পমেয়াদী অবস্থায় এই ভারসাম্য দামকে 'স্বল্পমেয়াদী স্বাভাবিক দাম' (Short-period Normal Price) বলে।

গ। দীর্ঘমেয়াদী বাজারে ভারসাম্য (Equilibrium in the Long-period Market): দীর্ঘমেয়াদী অবস্থায় কোন ফার্ম উহার উৎপাদনের আয়তন বাড়াইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারে। ইহা ছাড়া, ফার্ম-এর সংখ্যাও কম-বেশী হইতে পারে। এই অবস্থায় কোন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে বাজারে যোগান বৃদ্ধি পাইবে। যোগান বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে যদি গড় ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও দাম বৃদ্ধি পাইবে না। কিন্তু যোগান বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধার জন্য যদি দ্রব্যটির গড় উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়, তাহা হইলে দীর্ঘমেয়াদী অবস্থায় দাম হ্রাস পাইবে। আবার যোগান-বৃদ্ধির সঙ্গে বৃহদায়তন উৎপাদনের অসুবিধাগুলির জন্য যদি গড় উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে দাম বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু সকল অবস্থায় দাম দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে নির্ধারিত হইবে এবং দ্রব্যটির দাম উহার প্রান্তিক ব্যয় ও ন্যূনতম গড় ব্যয়ের (marginal cost and minimum average cost) সমান হইবে। এইভাবে নির্ধারিত দীর্ঘমেয়াদী বাজারের দামকে 'দীর্ঘমেয়াদী স্বাভাবিক দাম' (Long-period Normal Price) বলে। এই সম্পর্কে পরে আরও বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে।

ঘ। অতি দীর্ঘমেয়াদী বাজারে ভারসাম্য (Equilibrium in the Very Long-period Market): অতি দীর্ঘমেয়াদী বাজারে জনসংখ্যার আয়তন, সাজ-সরঞ্জামের যোগান ইত্যাদি বিষয়গুলির সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে। মূলধন-সামগ্রীর যোগান ও দামের পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যের যোগানের অতিমাত্রায় পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। আবার, ক্রেতার রুচি, অভ্যাস ইত্যাদির পরিবর্তনের ফলে চাহিদার সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন দেখা যায়। এই সকল পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যের দামের সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন দেখা যায়। এই অতি দীর্ঘমেয়াদী দাম ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে।

৫. **বাজার দাম ও স্বাভাবিক দাম (Market Price and Normal Price)** ঃ পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় বাজারে দুই প্রকার দাম নির্ধারিত হয়—(ক) বাজার দাম (market price) এবং (খ) স্বাভাবিক দাম (normal price)। সংক্ষেপে বাজার-দাম হইল স্বল্পকালীন দাম এবং স্বাভাবিক দাম হইল দীর্ঘকালীন দাম। এখন, এই দুই প্রকার দাম পৃথক করিয়া আলোচনা করা হইল ঃ

(ক) **বাজার দাম** ঃ বাজার-দাম হইল কোন দ্রব্যের অতি স্বল্পকালীন ভারসাম্য দাম, অর্থাৎ অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে যে-দামে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয় তাহাকেই বাজার-দাম বলে। এই অতি স্বল্পকালীন অবস্থায় কোন দ্রব্যের যোগান একরূপ স্থির (constant) থাকে। ইহার ফলে বাজার-দামের উপর প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন-ব্যয়ের বিশেষ কোন প্রভাব থাকে না। মাছ, তরিতরকারী, দুধ প্রভৃতি পচনশীল দ্রব্যের যোগান বাজারে স্থির থাকে বলিয়া উহাদের উৎপাদন-ব্যয় যাহাই হউক না কেন ক্রেতারা যে দাম দিতে চাহিবে বিক্রেতাদিগকে সেই দামেই উহা বিক্রয় করিতে হইবে। এই সকল দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে ইহাদের বাজার-দাম বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদা হ্রাস পাইলে বাজার-দাম হ্রাস পায়। সুতরাং বাজার-দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে যোগানের শক্তি অপেক্ষা চাহিদার শক্তি অধিক ক্রিয়াশীল হয় অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা প্রান্তিক উপযোগের প্রভাব বেশী থাকে। সুতরাং চাহিদা বা প্রান্তিক উপযোগ বাজার-দামকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এই অবস্থায় চাহিদা ও যোগানের সমতার ফলে যে-ভারসাম্য আসে, তাহাকে 'অস্থায়ী ভারসাম্য' (temporary equilibrium) বা মুহূর্তকালীন ভারসাম্য' (momentary equilibrium) বলে।

(খ) **স্বাভাবিক দাম** ঃ দীর্ঘকালীন অবস্থায় শেষ পর্যন্ত যে-দাম নির্ধারিত হওয়া সম্ভব তাহাকেই 'স্বাভাবিক দাম' (normal price) বলে। স্বাভাবিক দাম বলিতে কোন বিশেষ দামকে বুঝায় না; দীর্ঘকাল ধরিয়া চাহিদা ও যোগানের প্রভাবের ফলে যে-দাম নির্ধারিত হওয়া স্বাভাবিক তাহাকেই 'স্বাভাবিক দাম' বলিয়া অভিহিত করা হয়। দীর্ঘকালীন অবস্থায় চাহিদা-পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রাখিয়া উৎপাদক উৎপাদন বা যোগানের পরিমাণ পরিবর্তন করিতে পারে। সুতরাং স্বাভাবিক দাম-নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাহিদা বা প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা যোগান বা প্রান্তিক ব্যয়ের প্রভাব অধিক ক্রিয়াশীল হয়। দীর্ঘকালীন অবস্থায় চাহিদা-পরিবর্তনের ফলে দাম কতখানি পরিবর্তিত হইবে, তাহা নির্ভর করে যোগান কতখানি পরিবর্তন করা সম্ভব হইবে তাহার উপর।

স্বাভাবিক দাম আবার দুই প্রকার হইয়া থাকে ঃ—(১) স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম (short-run normal price) এবং (২) দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম (long-run normal price)।

(১) যে-অবস্থায় চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে যোগান কিছুটা পরিবর্তন করা যায় কিন্তু উৎপাদক উৎপাদন-পদ্ধতি পরিবর্তনই করিতে পারে না এবং শিল্পে নূতন

কোন ফার্ম প্রবেশ করিতে পারে না, সেই অবস্থায় চাহিদা ও যোগানের দ্বারা যে-দাম নির্ধারিত হয় তাহাকেই 'স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম' বলে। এই স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম উৎপাদকের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। অর্থাৎ, প্রত্যেক উৎপাদক সেই পর্যন্ত উৎপাদন করে, যেখানে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয়। কারণ পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় দাম ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হইলে উৎপাদকের মোট মুনাফা সর্বাধিক হয়।

(২) যে-অবস্থায় উৎপাদনের আয়তন এবং শিল্পে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পরিবর্তনের দ্বারা চাহিদা-বৃদ্ধির সঙ্গে সমন্বয়-সাধনের জন্য যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, সেই দীর্ঘকালীন অবস্থায় যে-দাম নির্ধারিত হয়, তাহাই হইতেছে 'দীর্ঘ-কালীন স্বাভাবিক দাম'। অর্থাৎ এই অবস্থায় চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রক্ষার জন্য একদিকে যেমন উৎপাদক উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারে, অন্যদিকে তেমনি নূতন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করিয়া উৎপাদন শুরু করার সুযোগ পায়। সুতরাং এইরূপে দীর্ঘকালীন অবস্থায় চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া যোগান প্রয়োজনীয় পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায়। দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম উৎপাদকের প্রান্তিক ব্যয় এবং গড় ব্যয় উভয়েরই সমান হয়। গড় ব্যয় এই অবস্থায় ন্যূনতম (minimum) থাকে বলিয়া দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম ন্যূনতম গড় ব্যয়ের সমান হয়। এ-সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইতেছে। সুতরাং স্বাভাবিক দাম স্বল্পকালীনই হউক বা দীর্ঘকালীন হউক উহা যোগান বা উৎপাদন ব্যয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এই দামের উপর চাহিদা বা প্রান্তিক উপযোগের প্রভাব খুবই কম।

পার্থক্য: বাজার দাম ও স্বাভাবিক দামের মধ্যে পার্থক্যের কয়েকটি বিষয় নিম্নে দেওয়া হইল:

(ক) বাজার দাম হইতেছে অতি-স্বল্পকালীন অবস্থায় চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত দাম। এই অবস্থায় যোগান মোটামুটি স্থির থাকে বলিয়া চাহিদা-পরিবর্তনের সঙ্গে উহা পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু স্বাভাবিক দাম হইতেছে দীর্ঘকালীন অবস্থায় চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত দাম। এই অবস্থায় চাহিদা-পরিবর্তনের সঙ্গে যোগানের পরিবর্তন করা যায় বলিয়া চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয়।

(খ) অতি-স্বল্পকালীন অবস্থায় বাজার দামের উপর যোগান অপেক্ষা চাহিদার প্রভাব বেশী দেখা যায়, কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় যে-স্বাভাবিক দাম হয় তাহার উপর

যোগানের প্রভাব বেশী থাকে। ইহার ফলে বাজার-দাম প্রধানত চাহিদার অবস্থা অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগের দ্বারা নির্ধারিত হয়। পক্ষান্তরে, স্বাভাবিক দাম প্রধানত যোগান বা উৎপাদন-ব্যয়ের অবস্থা দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

(গ) বাজার-দাম কোন একটা অস্থায়ী বা মুহূর্তকালীন ভারসাম্যের স্তরে নির্ধারিত হয়। কিন্তু স্বাভাবিক দাম চাহিদা ও যোগানের স্থায়ী শক্তির প্রভাবের ফলে নির্ধারিত হয়। ইহার ফলে বাজার-দাম অপেক্ষা স্বাভাবিক দাম অধিকতর স্থিতিশীল (stable) হইয়া থাকে।

(ঘ) বাজার-দাম স্থিতিশীল না হওয়ার জন্য উহার দ্রুত উঠা-নামা ঘটে। কিন্তু স্বাভাবিক দাম স্থিতিশীল বলিয়া ইহার দ্রুত উঠা-নামা ঘটে না। স্বাভাবিক দামকে কেন্দ্র করিরা বাজার-দামের উঠা-নামা ঘটিয়া থাকে। স্বাভাবিক দাম অপেক্ষা বাজার-দাম কখনও বেশী হয়, আবার কখনও কম হয়। কিন্তু স্বাভাবিক দাম বাজারে একটা স্থায়ী ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি করে।

(ঙ) পরিশেষে উল্লেখ করা যায়, এই দুই প্রকার দামের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও উহাদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। এই সম্পর্কটি অধ্যাপক মার্শাল একটি ঘড়ির দোলকের (the pendulum of a clock) সহিত তুলনা করিয়াছেন। ঘড়ির দোলক যেরূপ এদিক-ওদিকে দুলিলেও একটি কেন্দ্রস্থলে আসার উহার প্রবণতা থাকে, বাজার দামও সেইরূপ স্বাভাবিক দামের আশেপাশে ঘুরিলেও ইহার স্বাভাবিক দামের সমান হওয়ার একটি বিশেষ প্রবণতা থাকে।

৬. **চাহিদা ও যোগান-এর পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দামের পরিবর্তন (Changes in Equilibrium Price due to changes in Demand and Supply) :** পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় চাহিদা ও যোগানের শক্তি দ্বারা যে-ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয় তাহা চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত হয়, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দামে (equlibrium price) কিরূপ পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন তিনভাবে দেখানো যাইতে পারে : (ক) শুধুমাত্র চাহিদা পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দামে কিরূপ পরিবর্তন ঘটে। (খ) শুধুমাত্র যোগানের পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দামে কিরূপ পরিবর্তন ঘটে। (গ) চাহিদা ও যোগান উভয়েরই পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দামে কিরূপ পরিবর্তন ঘটে।

ভারসাম্য দামের উপর এই তিন প্রকার পরিবর্তনের প্রভাব নিম্নের রেখাচিত্রে ক্রমান্বয়ে দেখানো হইল ঃ
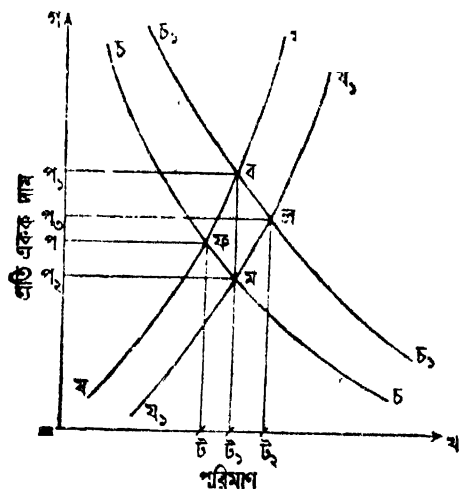
চিত্র ৩৮

প্রথমেই ধরা যাউক, চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু যোগান অপরিবর্তিত আছে। রেখাচিত্রে সূচনায় চাহিদা-রেখা হইতেছে **চচ**, যোগান-রেখা **যয** এবং ভারসাম্য দাম **কপ**। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নূতন চাহিদা-রেখা **চ১চ১**, **যয** যোগান-রেখাকে **ব** বিন্দুতে ছেদ করে। ফলে দাম বৃদ্ধি পাইয়া হয় **কপ১** এবং ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হয় **কট১**। অনুরূপভাবে দেখানো যায়, যোগান অপরিবর্তিত কিন্তু চাহিদা হ্রাস পাইতেছে, উহার ফলে দাম হ্রাস পাইবে এবং বিক্রয়ের পরিমাণও হ্রাস পাইবে।

দ্বিতীয়ত, ধরা যাউক যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু চাহিদা স্থির রহিয়াছে। এই অবস্থায় নতুন যোগান-রেখা **য১য১** মূল চাহিদা-রেখা **চচ**-কে **ম** বিন্দুতে ছেদ করে। সুতরাং দাম হ্রাস পাইয়া হইবে **কপ২** এবং ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া হইবে **কট১**। অনুরূপভাবে দেখানো যায়, যোগান হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু চাহিদা অপরিবর্তিত আছে, ইহার ফলে দাম বৃদ্ধি পাইবে।

পরিশেষে ধরা যাউক, চাহিদা ও যোগান উভয়েরই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এই অবস্থায় নূতন চাহিদা-রেখা **চ১চ১** নূতন যোগান রেখা **য১য১**-কে **ল** বিন্দুতে ছেদ করিবে। নূতন ভারসাম্য দাম হইবে **কপ৩** এবং ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হইবে **কট২**। এখানে দেখা যাইতেছে চাহিদা ও যোগান উভয়ের বৃদ্ধির ফলে দাম ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ উভয়েরই বৃদ্ধি ঘটিতেছে। পক্ষান্তরে, চাহিদা ও যোগান উভয়েরই হ্রাসের ফলে দামের উপর কি প্রভাব হইবে তাহাও রেখাচিত্রে দেখানো যায়।

চাহিদা ও যোগান যখন পরিবর্তন ঘটে তখন দাম বাড়িবে না কমিবে তাহা নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের মাত্রার উপর। চাহিদার তুলনায় যোগানের যদি পরিবর্তন অধিক হয় তাহা হইলে দাম পূর্বাপেক্ষা কম থাকে, আবার যোগানের তুলনায় যখন চাহিদার পরিবর্তন অধিক হয় তখন দাম পূর্বাপেক্ষা বেশী হয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক হেণ্ডারসন[1] (Henderson) একটি সাধারণ সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সূত্রটি হইতেছে, চাহিদার বৃদ্ধি বা যোগানের হ্রাস অন্তত স্বল্পকালীন সময়ে দাম বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে, চাহিদার হ্রাস বা যোগানের বৃদ্ধি অন্তত স্বল্প-কালীন সময়ে দাম হ্রাস করে। তাহা ছাড়া, চাহিদা ও যোগান-এর পরিবর্তনের ফলে দাম-এর উপর যে-পরিবর্তন ঘটায়, তাহার মাত্রা বাহির করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান-এর স্থিতিস্থাপকতার (elasticity of demand and supply) দিকে দৃষ্টি দিতে হয়।

৭. **সর্বাধিক মুনাফার শর্ত (Conditions of maximum profits)**ঃ কোন ফার্ম-এর অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অন্যতম বিষয় হইতেছে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ ও দাম নির্ধারণ করা। এই বিষয়টি আলোচনার পূর্বে সর্বাধিক মুনাফার বিষয়টি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কারণ উৎপাদনের পরিমাণ ও দাম নির্ধারণের মূল লক্ষ্য হইতেছে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। কোন ফার্ম-এর সর্বাধিক মুনাফা দুই ভাবে বাহির করা যায়ঃ (ক) কোন ফার্ম-এর মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পার্থক্য যেখানে সর্বাধিক হয়, সেই পরিমাণ উৎপাদনে উহার মোট মুনাফা সর্বাধিক হইবে। এই শর্তটি ১১০ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। (খ) দ্বিতীয় পন্থাটি হইতেছে বিভিন্ন পরিমাণে উৎপাদনের প্রান্তিক আয় (marginal revenue বা সংক্ষেপে *mr*) ও প্রান্তিক ব্যয়ের (marginal cost বা সংক্ষেপে *mc*) মধ্যে তুলনা করিয়া বলা হয়, যে-পরিমাণ উৎপাদনে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পরের সমান হয় সেইখানে মোট মুনাফা সর্বাধিক হয়। এই বিষয়টি নিম্নে বিশদভাবে আলোচনা করা হইল ঃ

প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয়ের সমতা ($mc = mr$)ঃ কোন ফার্ম কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে করিতে এমন একটি অবস্থায় আসে, যেখানে উৎপাদন হ্রাস-বৃদ্ধির আর কোন প্রবণতা থাকে না, তখন ফার্মটি ভারসাম্য অবস্থায় আসে। যে-পরিমাণ উৎপাদনে কোন ফার্ম মোট মুনাফা সর্বাধিক পায় সেই পরিমাণ উৎপাদন করা হইলে উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির আর কোন প্রবণতা থাকে না। ফার্ম-এর যখন প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হয়, তখন উহার মোট মুনাফা সর্বাধিক হয়। যখন প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা প্রান্তিক আয় অধিক হয়, তখন কোন ফার্ম উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়া মোট মুনাফা বাড়াইতে পারে ; সুতরাং সেই অবস্থায় উহা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। কিন্তু যখন ফার্ম-এর প্রান্তিক ব্যয় ইহার প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক হয়,

1. Henderson—*Supply and Demand* p 29

তখন উহার মোট মুনাফা হ্রাস পায় বলিয়া উহার ক্ষতি হয় ; ইহার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। কিন্তু ফার্মটির প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় যখন পরস্পর সমান হয় তখন ইহার মোট মুনাফা সর্বাধিক হইবে এবং ফার্মটি উৎপাদন হ্রাস বা বৃদ্ধি করিবে না। সুতরাং যে-পরিমাণ উৎপাদন করিলে প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় সমান হইবে কোন ফার্ম সেই পর্যন্ত উৎপাদন করিবে এবং উহাই হইবে ফার্মটির ভারসাম্যের মূল শর্ত। ইহা নিম্নের তালিকায় দেখানো হইলঃ

উৎপাদনের পরিমাণ	প্রান্তিক ব্যয়	প্রান্তিক আয় (=দাম=গড় আয়)
১ একক	৭ টাকা	১০ টাকা প্রা. আ. > প্রা. ব্য.
২ ,,	৮ ,,	,, ,,
৩ ,,	৯ ,,	,, ,,
৪ ,,	১০ ,,	,, ,, প্রা. আ. = প্রা. ব্য.
৫ ,,	১১ ,,	,, ,,
৬ ,,	১২ ,,	,, ,,
৭ ,,	১৩ ,,	,,
৮ ,,	১৪ ,,	,, ,, প্রা. আ. < প্রা. ব্য.

উপরের তালিকায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থা ধরা হইয়াছে। সেই কারণে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও প্রান্তিক আয় ১০ টাকায় স্থির রহিয়াছে এবং প্রান্তিক আয় উহার দাম বা গড় আয়ের সমান হইতেছে। তালিকায় দেখা যায়, ৩ একক পর্যন্ত উৎপাদনে প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা প্রান্তিক আয় অধিক হইতেছে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি করিয়া মোট মুনাকা বৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু ৪ একক উৎপাদনে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হইতেছে (অর্থাৎ $mr = mc$)। ইহার পর উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে প্রান্তিক আয়ের তুলনায় প্রান্তিক ব্যয় অধিক হইবে এবং ফলে ফার্মটির ক্ষতি শুরু হইবে। সুতরাং ৪ একক উৎপাদনের পর ফার্মটির মোট মুনাফা বৃদ্ধির আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। এই অবস্থায় ৪ একক উৎপাদনে উহার মোট মুনাফা সর্বাধিক হইবে।

সর্বাধিক মুনাফার এই শর্তটি (প্রান্তিক ব্যয় = প্রান্তিক আয়) সকল প্রকার বাজারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই শর্তটি একটু অন্য ভাবে প্রকাশ করা যায়। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় দ্রব্যের দাম প্রতি এককের জন্য স্থির থাকে বলিয়া দাম ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হয়। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় যে-পরিমাণ উৎপাদনে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয় সেই পরিমাণ উৎপাদনে মোট মুনাফা সর্বাধিক হইবে। কিন্তু স্থিতিশীল ভারসাম্য অবস্থার জন্য আরও একটি বিষয় পূরণ হওয়া প্রয়োজন। বলা হয়, পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারসাম্য অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে অর্থাৎ দাম যখন 'বাড়ন্ত প্রান্তিক ব্যয়ের' (rising marginal cost) সমান হইবে তখনই মোট মুনাফা বৃদ্ধির আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ দাম যখন 'পড়ন্ত প্রান্তিক ব্যয়ের (falling marginal cost) সমান হয় তখন উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ফার্মটি মুনাফার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিতে পারে। এই বিষয়টি নিম্নের রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে ঃ
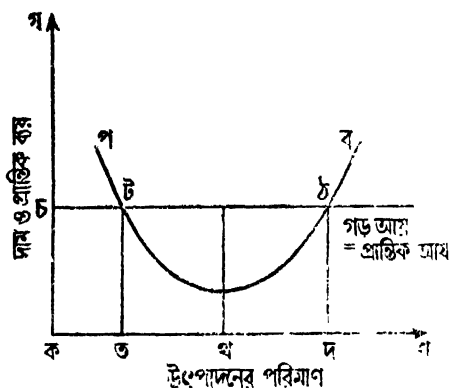
চিত্র—৩৯

উপরের রেখাচিত্রে চচ´ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন ফার্ম-এর দ্রব্যের চাহিদা-রেখা বা গড় আয় বা প্রান্তিক রেখা (১৯৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পব হইতেছে উহার প্রান্তিক ব্যয়-রেখা। রেখাচিত্রে দেখা যায় চচ´ প্রান্তিক আয় রেখাটি পব প্রান্তিক ব্যয় রেখাকে 'ট' ও 'ঠ'—এই দুইটি স্থানে ছেদ করিতেছে অর্থাৎ কত এবং কদ উভয় পরিমাণ উৎপাদনে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হইতেছে। কিন্তু কত উৎপাদনে প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পায় (প্রান্তিক রেখাটি ঐ স্থানে নীচে নামিয়া আসিতেছে) বলিয়া উহা অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করিলে কথ পর্যন্ত দাম ও প্রান্তিক ব্যয়ের পার্থক্য আরও অধিক হইতেছে অর্থাৎ মোট মুনাফা বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু কদ পরিমাণ উৎপাদনটির প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া (প্রান্তিক ব্যয়-রেখাটি

উপরের দিকে উঠিতেছে) উহা অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করা হইলে দামের তুলনায় প্রান্তিক ব্যয় অধিক হইতেছে বলিয়া মোট মুনাফা হ্রাস পাইবে। কম পরিমাণ উৎপাদন করিলে মোট মুনাফা বৃদ্ধির আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় সর্বাধিক মুনাফার শর্ত হইতেছে : (ক) দাম ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হইবে এবং (খ) প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় রেখাটি নীচের দিক হইতে আসিয়া দাম-রেখাকে ছেদ করিয়া উপরে চলিয়া যাইবে।

৮. স্বল্পকালীন অবস্থায় ফার্ম-এর বা প্রতিষ্ঠান-বিশেষের দাম ও উৎপাদন নির্ধারণ (Short-run Price-and-Output determination of an individual firm under Pure Competition) : স্বল্পকালীন অবস্থার দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে : প্রথমত, স্বল্পকালীন অবস্থায় কোন ফার্ম উহার উৎপাদনের আয়তন পরিবর্তন করিতে পারে না, অর্থাৎ কারখানার আয়তন, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকে।

দ্বিতীয়ত, স্বল্পকালীন অবস্থায় কোন নূতন ফার্ম সংশ্লিষ্ট শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে না বা শিল্পে অবস্থিত কোন ফার্ম শিল্প হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে না।

ফার্ম-এর স্বল্পকালীন ভারসাম্য শর্ত : উপরি-উক্ত স্বল্পকালীন অবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন ফার্ম সর্বাধিক নীট আয় উপার্জনের জন্য সেই পর্যন্ত উৎপাদন করিবে যেখানে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হয় (প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয়)। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন ফার্ম প্রচলিত বাজার দামে যত খুশি দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। ইহার ফলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় দাম ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হয় (দাম = প্রান্তিক আয়), ইহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে।[১]

উপরি-উক্ত ঐ দুইটি অবস্থা (প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয়, দাম = প্রান্তিক আয়) হইতে সহজে বলা যায়, পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারসাম্য অবস্থায় দাম ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হইবে। সুতরাং যতটা উৎপাদন করিলে ফার্ম-এর প্রান্তিক ব্যয় ও দ্রব্যের দাম সমান হইবে ততটা উৎপাদন করা হইলে ইহা ভারসাম্য অবস্থায় আসিবে। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, ভারসাম্য অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয় ক্রমবর্ধমান হয়। কারণ প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকিলে এবং বাজারে দাম স্থির থাকিলে ফার্মটি অধিক মুনাফার লোভে উৎপাদন বাড়াইয়াই চলিবে এবং ইহাতে ভারসাম্য অবস্থা আসিবে না, ইহা পূর্বের অংশে দেখানো হইয়াছে। সুতরাং পূর্ণ

---

১. পৃঃ ১৯২ দ্রষ্টব্য

প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্ম-এর ভারসাম্যের সূত্র হইল : দাম = প্রান্তিক ব্যয় ; এবং এই প্রান্তিক ব্যয় ঊর্ধ্বগামী (rising marginal cost) হইবে।

স্বল্পকালীন দাম ও গড় ব্যয় (সমাবস্থার বিন্দু ও উৎপাদন বন্ধকরণ বিন্দু) : উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল, পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় যে-পরিমাণ উৎপাদনে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হয় কোন ফার্ম সেই পরিমাণ উৎপাদন করিয়া ভারসাম্য অবস্থায় আসিবে। এই দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইলেও স্বল্পকালীন অবস্থায় উহা গড় ব্যয়ের সমান বা উহা অপেক্ষা কম বেশী হইতে পারে। ঐ দাম গড় ব্যয়ের সমান হইলে স্বল্পমেয়াদী অবস্থায় ফার্মটি শুধুমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা (normal profits) ভোগ করিবে। কারণ গড় ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা যুক্ত আছে। এই অবস্থাকে (দাম = প্রান্তিক ব্যয় = গড় ব্যয়) 'সমাবস্থার স্তর' (break-even point) বলা হয়। কারণ এই স্তর হইতে দাম বেশী হইলে অতিরিক্ত মুনাফা পাওয়া যায় এবং দাম কম হইলে ক্ষতি শুরু হয়। আবার কোন কোন সময় স্বল্পকালীন দাম গড়-ব্যয়ের বেশী হইতে পারে এবং তখন ফার্মটি অতিরিক্ত মুনাফা (supernormal profit) লাভ করিবে। স্বল্পকালীন অবস্থায় কোন ফার্ম অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতে পারে। কারণ অতিরিক্ত মুনাফা হইলেও নূতন নূতন ফার্ম আসিয়া যোগান বৃদ্ধি ও দাম হ্রাস করিতে পারে না।

আবার কোন কোন সময় স্বল্পকালীন দাম গড় ব্যয়ের কম হইতে পারে এবং তখন ফার্মটির ক্ষতি হইবে। স্বল্পকালীন অবস্থায় ইহাও সম্ভব হয়। কারণ দাম গড় ব্যয়ের কম হওয়ার ফলে ফার্মটি উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিলে ইহাকে স্থির ব্যয় (fixed cost) বহন করিতেই হইবে। অর্থাৎ উৎপাদন বন্ধ করিলেও ফার্মটিকে স্বল্পকালীন অবস্থায় স্থির ব্যয়ের সমান ক্ষতি বহন করিতে হইবে। এই অবস্থায় ফার্মটি উৎপাদনের মোট ব্যয় উঠাইতে না পারিলেও যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তনশীল ব্যয় (variable cost) তুলিয়া লইতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত উহা ভবিষ্যৎ সুদিনের আশায় উৎপাদন চালাইয়া যাইবে। কিন্তু ফার্মটি যদি পরিবর্তনশীল ব্যয় তুলিয়া লইতে না পারে তবেই উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে। সুতরাং স্বল্পকালীন অবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ন্যূনতম দাম হইতেছে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমান। ইহা অপেক্ষা দাম কম হইলে বা অবস্থার উন্নতি না ঘটিলে ফার্মটি উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে। এই কারণেই উৎপাদনের ঐ অবস্থাকে (দাম = প্রান্তিক ব্যয় = গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়) 'উৎপাদনবন্ধকরণ স্তর' (shut-down point) বলা হয়।

স্বল্পকালীন অবস্থায় ফার্ম-এর ভারসাম্য অবস্থা নিম্নের রেখাচিত্রে দেখানো হইল
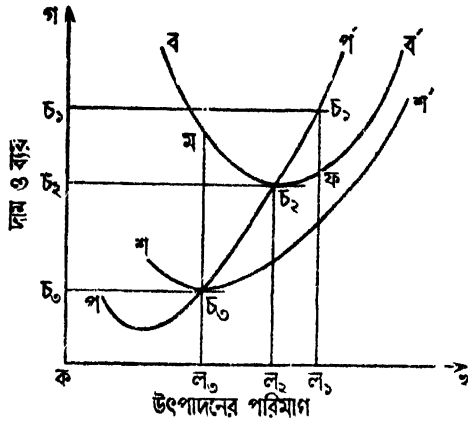
চিত্র—৪০

উপরের রেখাচিত্রে **চ১চ১**, **চ২চ২** এবং **চ৩চ৩** পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় কোন **ফার্ম**-এর উৎপাদিত দ্রব্যের তিনটি দাম রেখা বা গড় আয়-রেখা বা প্রান্তিক আয়-রেখা। **পপ'** ও **বব'** যথাক্রমে প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়-রেখা। রেখাচিত্রে দেখা যায়, দাম **কচ১** (দাম-রেখা **চ১চ১**) হইলে ফার্মটি **কল১** পরিমাণ উৎপাদন করিবে, কারণ ঐ পরিমাণ উৎপাদনে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হইতেছে। কিন্তু এই দাম গড় ব্যয় (**ল১ফ**) অপেক্ষা বেশী হইতেছে বলিয়া ফার্মটি অতিরিক্ত মুনাফা ভোগ করিতেছে। আবার, দাম **কচ২** (**চ২চ২** দাম-রেখা) হইলে ফার্মটি উৎপাদন হ্রাস করিয়া **কল২** পরিমাণ উৎপাদন করিবে, কারণ ঐ পরিমাণ উৎপাদনে তখন দাম ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হইতেছে। এই স্তরে দাম গড় ব্যয়ের সমান হইতেছে (এইখানে দাম-রেখা; প্রান্তিক ব্যয়-রেখা এবং গড় ব্যয়-রেখা পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে)। সুতরাং এই দামে ফার্মটি শুধু স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করিবে। ইহাকে 'সমাবস্থার স্তর' (break-even point) বলা হয়। আবার দাম আরও কমিয়া গিয়া **কচ৩** (দাম-রেখা **চ৩চ৩**) হইলে ফার্মটি উৎপাদন আরও হ্রাস করিয়া **কল৩** উৎপাদন করিবে। এই স্তরে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পরের সমান হইলেও দাম গড় ব্যয় (**ল৩ম**) অপেক্ষা কম হইতেছে। কিন্তু উহা গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের (**শশ'** রেখাটি দ্রষ্টব্য) সমান হইতেছে। স্বল্পকালীন অবস্থায় এই দাম যে সম্ভব হয়, তাহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে। ইহাকেই (দাম = প্রান্তিক ব্যয় = গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়) 'উৎপাদন-বন্ধকরণ স্তর' (shut-down point) বলা হয়।

১. **দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দামের সহিত বাজার দামের সমন্বয়সাধন বা দীর্ঘকালীন অবস্থায় দাম ও উৎপাদন নির্ধারণ (Adjustment of the Market Price to the Long-run Equilibrium level, or Long-run Price and Output Determination)** ঃ দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম ও বাজার দামের মধ্যে কিভাবে সমন্বয়-সাধন হয় তাহা কোন ফার্ম-এর দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করিতে হয়। দীর্ঘকালীন অবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্ম-এর ভারসাম্যের অবস্থাটি একটু অন্য ধরনের হইয়া থাকে। দীর্ঘ-কালীন অবস্থার দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, দীর্ঘকালীন অবস্থায় কোন ফার্ম উহার উৎপাদনের আয়তন পরিবর্তন করিতে পারে। সুতরাং দীর্ঘকালীন অবস্থায় ফার্ম-এর কোন স্থির ব্যয় থাকে না। দ্বিতীয়ত, ঐ অবস্থায় শিল্পে নূতন নূতন ফার্ম প্রবেশ করিতে পারে বা পুরাতন ফার্ম শিল্প হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে।

ফার্ম-এর বা প্রতিষ্ঠান-বিশেষের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ঃ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন অবস্থায়ও কোন ফার্ম সেই পর্যন্ত উৎপাদন করে যেখানে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয়। ভারসাম্য অবস্থার এই শর্তটি মৌল হইলেও দীর্ঘকালীন অবস্থায় ইহাই একমাত্র বা যথেষ্ট শর্ত নহে; আর একটি শর্ত হইতেছে ঐ দাম দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়েরও সমান হইবে। দীর্ঘকালীন অবস্থায় দাম যদি প্রান্তিক ব্যয়ের সমান কিন্তু দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের অধিক হয় তাহা হইলে ফার্মটি অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিবে। ইহার ফলে নূতন নূতন ফার্ম উচ্চ লাভের আশায় উৎপাদন শুরু করিবে। ফলে যোগান বৃদ্ধি ও দাম হ্রাস পাইবে। সুতরাং দাম দীর্ঘকালীন অবস্থায় গড় ব্যয়ের অধিক হইতে পারে না। আবার দাম যখন প্রান্তিক ব্যয়ের সমান কিন্তু দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের কম হইতেছে, তখন ক্ষতি হইতেছে বলিয়া কোন কোন ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে। ফলে শিল্পে অবস্থিত ফার্ম-এর সংখ্যা হ্রাস পাইবে, যোগান কমিয়া আসিবে এবং দাম বৃদ্ধি পাইবে।

অতএব দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় দাম গড় ব্যয়ের কম বা বেশী হইতে পারে না। দাম যখন ফার্ম-এর প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় উভয়েরই সমান হইবে তখন ফার্মটির ভারসাম্য অবস্থা আসিবে অর্থাৎ দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় ফার্ম-এর মোট আয় বা মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ উহার মোট ব্যয়ের সমান হইবে। এই অবস্থায় গড় ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম হয় বলিয়া দীর্ঘকালীন সময়ে দাম ন্যূনতম গড় ব্যয়ের (minimum average cost) সমান হয়। সুতরাং দীর্ঘকালীন অবস্থায় কোন ফার্ম ভারসাম্য অবস্থায় কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করিবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন অবস্থায় ফার্ম-এর স্থিতিশীল ভারসাম্যের (stable uilibrium) শর্তটি হইতেছে ঃ

দীর্ঘকালীন দাম = প্রান্তিক ব্যয়
= দীর্ঘকালীন ন্যূনতম গড় ব্যয়।

দীর্ঘকালীন অবস্থায় ফার্ম-এর ভারসাম্যটি নিম্নের রেখাচিত্রে দেখানো হইয়াছে ঃ
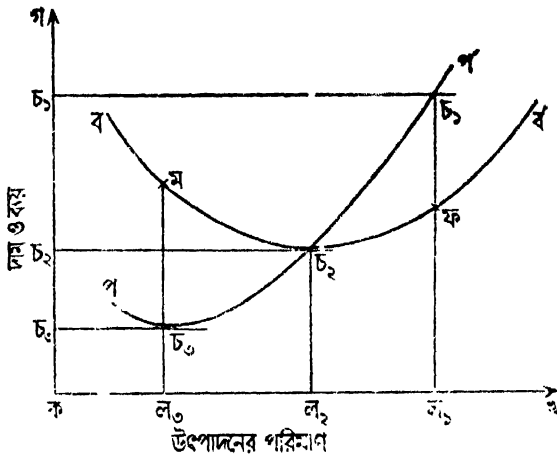
চিত্র—৪১

উপরের রেখাচিত্রে **পর্প** এবং **বর্ব** হইতেছে কোন ফার্ম-এর যথাক্রমে দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় রেখা। **চ১চ১, চ২চ২** এবং **চ৩চ৩** হইতেছে প্রতিযোগী-ফার্ম-এর তিনটি দাম-রেখা বা গড়-আয় রেখা বা প্রান্তিক আয়-রেখা। রেখাচিত্রে দেখা যায়, বাজার-দাম **কচ১** (দাম-রেখা **চ১চ১**) হইলে ফার্মটি উৎপাদন করিবে **কল১** পরিমাণ, কারণ ঐ পরিমাণ উৎপাদনে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হইতেছে। কিন্তু এই দাম গড় ব্যয় (**ল১ফ**) অপেক্ষা বেশী হওয়ায় ফার্মটি অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় দাম, গড় ব্যয়ের অধিক হইতে পারে না, কারণ অতিরিক্ত মুনাফা নূতন নূতন ফার্মকে উৎপাদন করিতে আকৃষ্ট করিবে। ইহার ফলে শিল্পে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, বাজারে মোট যোগান বাড়িবে এবং অবশেষে দাম হ্রাস পাইবে।

দাম হ্রাস পাইয়া **কচ২** (দাম-রেখা **চ২চ২**) হইলে ফার্মটি উৎপাদন হ্রাস করিয়া **কল২** পরিমাণ উৎপাদন করিবে, কারণ ঐ উৎপাদনে এখন দাম ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হইবে। এই দাম আবার গড় ব্যয়েরও সমান হইবে। সুতরাং এই স্তরে ফার্মটি শুধুমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করিতে পারে, ইহার ফলে নূতন ফার্মের শিল্পে প্রবেশ করার কোন আকর্ষণ থাকিবে না, বা পুরাতন ফার্মও শিল্প হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবে না। সুতরাং দীর্ঘকালীন অবস্থায় **কচ২** হইবে ভারসাম্য দাম এবং এই দাম, প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় উভয়েরই সমান হইতেছে। এই স্তরে গড় ব্যয় ন্যূনতম হইতেছে, ফলে দীর্ঘকালীন দাম 'ন্যূনতম গড় ব্যয়ের' (minimum average cost) সমান হয়।

আবার দাম যদি কোন সময় হ্রাস পাইয়া কচ৩ (দাম রেখা চ৩চ৩) হয়, তাহা হইলে ফার্মটি কল৩ উৎপাদন করিবে। কিন্তু এই স্তরে দাম দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় (ল৩ম) অপেক্ষা কম হওয়ায় ফার্মটির ক্ষতি হয়। ইহার ফলে, কিছু ফার্ম শিল্প হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবে, মোট উৎপাদন ও যোগান হ্রাস পাইবে এবং দাম বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং দাম গড় ব্যয়ের কম হইলে উহার বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল, দীর্ঘকালীন অবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দাম ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় উভয়েরই সমান হইতেছে। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে,

দীর্ঘকালীন দাম = প্রান্তিক ব্যয় (ক্রমবর্ধমান) = ন্যূনতম গড় ব্যয়

১০. **পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় শিল্পের ভারসাম্য (Equilibrium of the Industry under Perfect Competition)**ঃ পূর্বেকার অংশগুলিতে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ফার্ম-এর ভারসাম্য অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন শিল্পের ক্ষেত্রে ভারসাম্য অবস্থাটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল।

শিল্পের ভারসাম্যের শর্ত হইতেছে দুইটিঃ (১) শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সকল ফার্মই ভারসাম্য অর্জন করিবে অর্থাৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সকল ফার্মের ক্ষেত্রেই প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হইবে এবং প্রান্তিক ব্যয় রেখাটি নীচের দিক হইতে আসিয়া প্রান্তিক আয় রেখাটি ছেদ করিবে। (২) শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সকল ফার্মই স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করিবে, অর্থাৎ সকল ফার্মের ক্ষেত্রেই দাম এবং গড় ব্যয় পরস্পর সমান হইবে। কারণ কোন ফার্ম অতিরিক্ত মুনাফা ভোগ করিলে (অর্থাৎ, দাম গড় ব্যয়ের অধিক হইলে) শিল্পে নূতন ফার্ম প্রবেশ করিবে এবং ইহার ফলে শিল্পে ফার্মের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। পক্ষান্তরে, স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা কম অর্জন করিলে (অর্থাৎ, দাম গড় ব্যয়ের কম হইলে) কিছুসংখ্যক ফার্ম শিল্প হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবে এবং ইহার ফলে শিল্পে ফার্মের সংখ্যা কমিয়া যাইবে।

সুতরাং দেখা যায়, শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করিলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় শিল্পটির ভারসাম্য অবস্থা আসিবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় অর্থনৈতিক শক্তিগুলি শিল্পকে ভারসাম্য লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে।

॥ একচেটিয়া অবস্থায় দাম-ও-উৎপাদন নির্ধারণ ॥
(Price and Output Determination under Monopoly)

[নিখুঁত একচেটিয়া বাজারের ধারণা - একচেটিয়া অবস্থায় দাম-ও-উৎপাদন নির্ধারণ — একচেটিয়া উৎপাদকের ক্ষমতার সীমা — একচেটিয়া দাম ও প্রতিযোগিতার দামের মধ্যে পার্থক্য — একচেটিয়া অবস্থায় দাম পৃথকীকরণ]

পূর্বেকার অধ্যায়ে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাম ও উৎপাদন নির্ধারণের বিষয়টি আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে 'নিখুঁত একচেটিয়া অবস্থায়' (pure monopoly) কি ভাবে দাম ও উৎপাদন নির্ধারণ করা হয় তাহা বিশ্লেষণ করা হইবে। ঐ বিশ্লেষণের পূর্বে নিখুঁত একচেটিয়া অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

১. **নিখুঁত একচেটিয়া বাজারের ধারণা (Concept of Pure Monopoly)**
নিখুঁত একচেটিয়া বাজার বলিতে কি বুঝায় তাহা ১৩২-'৩৩ পৃঃ বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এই ধরনের বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি পুনরায় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল ঃ (১) নিখুঁত একচেটিয়া বাজারে শুধুমাত্র একজন উৎপাদক বা একজন বিক্রেতা থাকে এবং শিল্পে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান থাকে। (২) একচেটিয়া উৎপাদক যে-দ্রব্যটি উৎপাদন করে তাহা অন্য কোন উৎপাদক উৎপাদন করে না। এই অর্থে একচেটিয়া উৎপাদকের দ্রব্যের কোনরূপ বিকল্প থাকিতে পারে না। (৩) একচেটিয়া উৎপাদক দ্রব্যের যোগান ও দাম সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। (৪) একচেটিয়া অবস্থায় কোন নূতন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে না।

নিখুঁত একচেটিয়া বাজারের এই বৈশিষ্ট্যগুলি বাস্তবজগতে খুবই বিরল। এই কারণে অনেক লেখক পূর্ণ প্রতিযোগিতার মতোই নিখুঁত একচেটিয়া অবস্থাকে অবাস্তব বলিয়া অভিহিত করেন। তবে বাস্তবজগতে একচেটিয়া কারবারের কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সেইরূপ ক্ষেত্রে উৎপাদকের দ্রব্যটির বিকল্প থাকে, তবে উহা ঘনিষ্ঠ বিকল্প নহে। এইরূপ একচেটিয়া বাজারে কি ভাবে উৎপাদন ও দাম নির্ধারিত হয়, তাহা পরের অংশটিতে আলোচনা করা হইল।

২. **একচেটিয়া অবস্থায় দাম ও উৎপাদন নির্ধারণ (Price and Output Determination under Monopoly)** ঃ এখন দেখা যাউক, কিভাবে একচেটিয়া উৎপাদক তাহার দ্রব্যের উৎপাদন ও দাম নির্ধারণ করে ?

একচেটিয়া উৎপাদকের উৎপাদন ও দাম সম্পর্কিত কাজের মূল লক্ষ্য হইতেছে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে একচেটিয়া উৎপাদকের মুনাফা সর্বাধিক হইবে সে সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে। এখন

প্রশ্ন উঠিতে পারে, কি পরিমাণ উৎপাদনে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয়? ইহার উত্তরে বলা যায়, যে-পরিমাণ উৎপাদনে একচেটিয়া উৎপাদকের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হইবে সেই পরিমাণ উৎপাদনে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হইবে। প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা যদি প্রান্তিক আয় অধিক হয় তাহা হইলে একচেটিয়া উৎপাদক উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়া মুনাফা বৃদ্ধি করিতে পারিবে। আবার, প্রান্তিক ব্যয় যদি প্রান্তিক আয়ের তুলনায় বেশী হয় তাহা হইলে ক্ষতি হইবে বলিয়া সে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করিবে। কিন্তু প্রান্তিক আয় ও ব্যয় যখন পরস্পর সমান হয় তখন মোট মুনাফা সর্বাধিক হইবে এবং একচেচিয়া উৎপাদক সেই পর্যন্ত উৎপাদন করিবে। ঐ উৎপাদন হইবে একচেটিয়া অবস্থায় ভারসাম্য উৎপাদন (monopoly equilibrium output) এবং ঐ অবস্থায় উৎপাদন হ্রাস-বৃদ্ধি করার আর কোন প্রবণতা থাকিবে না। ঐ ভারসাম্য উৎপাদনের জন্য সে যে-দাম আদায় করিবে উহা হইবে 'একচেটিয়া অবস্থায় ভারসাম্য দাম' (monopoly equilibrium price)। একটি উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝানো যাইতে পারে।

নিম্নের উদাহরণে দেখা যায়, ১২ একক উৎপাদন পর্যন্ত প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা প্রান্তিক আয় অধিক হইতেছে। সুতরাং ঐ অবস্থায় একচেটিয়া উৎপাদক উৎপাদন বাড়াইয়া চলিবে। ১৩ একক উৎপাদন হইলে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হইতেছে এবং ঐ পরিমাণ উৎপাদনে মুনাফা সর্বাধিক হইতেছে। ১২ একক উৎপাদনে মুনাফা ১৩ এককের মুনাফার সমান হইলেও একচেটিয়া উৎপাদক ১২ একক উৎপাদন করিয়া থামিবে না। কারণ ১২ একক উৎপাদনে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হইতেছে না। ১৪ একক বা ১৫ একক উৎপাদন করিলে প্রান্তিক আয় অপেক্ষা প্রান্তিক ব্যয় অধিক হইতেছে এবং মোট মুনাফা হ্রাস পাইতেছে। সুতরাং ভারসাম্য অবস্থায় একচেটিয়া কারবারী ১৩ একক উৎপাদন করিবে এবং উহার জন্য দাম চাহিবে একক প্রতি ১'৮৫ টাকা।

মোট উৎপাদন	প্রতি একক দাম	মোট আয়	প্রান্তিক আয়	মোট ব্যয়	প্রান্তিক ব্যয়	একচেটিয়া কারবারীর লাভ
১০ একক	২ টাকা	২০ টাকা	—	১০ টাকা	—	১০ টাকা
১১ ,,	১ ৯৫ ,,	২১'৪৫ ,,	১ ৪৫ টাকা	১১ ০৫ ,,	১'০৫টাকা	১০ ৪০ ,,
১২ ,,	১'৯০ ,,	২২'৮০ ,,	১'৩৫ ,,	১২'১৮ ,,	১'১৩ ,,	১০.৬২ ,,
১৩ ,,	১ ৮৫ ,,	২৪.০৫ ,,	১'২৫ ,,	১৩'৪৩ ,,	১'১৫ ,,	১০ ৬২ ,,
১৪ ,,	১ ৮০	২৫'২০ ,,	১ ১৫ ,,	১৪'৮৩ ,,	১'৪০ ,,	১১.৩৭ ,,
১৫ ,,	১'৭৫ ,,	২৬'২৫ ,,	১'০৫ ,,	১৬'৪৩ ,,	১ ৬০ ,,	৯ ৮২ ,,

একচেটিয়া উৎপাদকের দাম ও উৎপাদনের ভারসাম্য অবস্থাটি নিম্নের রেখাচিত্রে দেখানো হইল ঃ
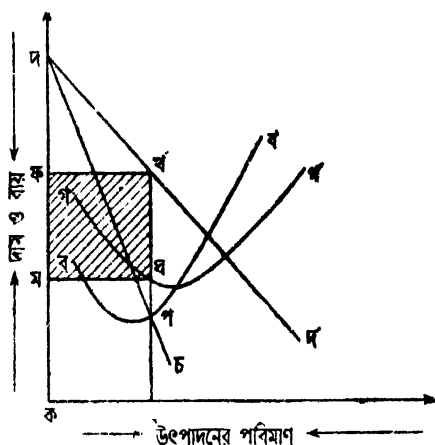
চিত্র—৪২

উপরের রেখাচিত্রে **দদ´** একচেটিয়া উৎপাদকের দাম-রেখা বা গড় আয়-রেখা, ইহা নিম্নগামী।[১] কারণ একচেটিয়া অবস্থায় যোগান বাড়াইলে দাম হ্রাস পায়। **দচ** হইতেছে একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক আয়-রেখা। এই রেখাটি **দদ´** রেখার নিম্নে অবস্থান করে। কারণ একচেটিয়া অবস্থায় দাম অপেক্ষা প্রান্তিক আয় কম হয়। **বব´** হইতেছে একচেটিয়া উৎপাদকের প্রান্তিক ব্যয়-রেখা এবং **গগ´** হইতেছে গড় ব্যয়-রেখা। একচেটিয়া উৎপাদক **কখ** উৎপাদন করিলে প্রান্তিক আয় (**খপ**—প্রান্তিক আয়-রেখা হইতে) ও প্রান্তিক ব্যয় (**খপ**—প্রান্তিক ব্যয়-রেখা হইতে) পরস্পর সমান হয়। সুতরাং **কখ** হইতেছে ভারসাম্য উৎপাদন এবং ঐ উৎপাদনের জন্য দাম হইবে **খখ´**। সুতরাং একচেটিয়া অবস্থায় ভারসাম্য দাম হইতেছে **খখ´** এবং ঐ দাম গড় ব্যয়ের বেশী বা সমান হইতে পারে। রেখাচিত্রে গড় ব্যয় অপেক্ষা দাম বেশী দেখানো হইতেছে। **কখ** পরিমাণ উৎপাদনের জন্য গড় ব্যয় হইতেছে **খঘ**। সুতরাং উহার জন্য মোট ব্যয় হইতেছে **কখঘম** ক্ষেত্রটি (=**কখ**×**খঘ**)। আবার ঐ উৎপাদনের প্রতি একক দাম হইতেছে **খখ´**, সুতরাং উহা বিক্রয় করিয়া পাওয়া যাইতেছে **কখখ´ক্ষ** (=**কখ**×**খখ´**) পরিমাণ অর্থ। ইহার ফলে একচেটিয়া উৎপাদকের অতিরিক্ত মুনাফা হইতেছে **ক্ষমঘখ´** ক্ষেত্রটি।

---

১. ১৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

একচেটিয়া অবস্থায় দাম-ও-উৎপাদন নির্ধারণের আরও কয়েকটি বিষয়ঃ দাম ও-উৎপাদন নির্ধারণের জন্য একচেটিয়া উৎপাদককে আরও কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। ঐ বিষয়গুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল ঃ

ক. **স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন দাম ঃ** স্বল্পকালীন অবস্থায় প্রতিযোগী ফার্ম-এর ন্যায় একচেটিয়া উৎপাদককে পরিবর্তনশীল ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। চাহিদার স্বল্পতা বা উহার মন্থরগতিতে বৃদ্ধির জন্য একচেটিয়া উৎপাদক স্বল্পকালীন অবস্থায় মোট ব্যয় কখনও কখনও উশুল করিতে সমর্থ না-ও হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রতিযোগী ফার্ম-এর ন্যায় কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল ব্যয় তুলিতে পারিলে সে উৎপাদন চালাইয়া যাইবে। কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় একচেটিয়া উৎপাদক উৎপাদনের আয়তন পরিবর্তন করিয়া ব্যবসায়ের ক্ষতি এড়াইতে পারে। এই ক্ষেত্রে দাম, গড় ব্যয়ের সমান বা বেশী হইতে পারে। নূতন ফার্ম শিল্পে আসিতে পারে না বলিয়া একচেটিয়া উৎপাদক দীর্ঘকালীন অবস্থায়ও অতিরিক্ত মুনাফা ভোগ করিতে পারে। তাই বোবার (Bober) মন্তব্য করিয়াছেন, একচেটিয়া উৎপাদক দ্রব্য উৎপাদন করে না, সে মুনাফা উৎপাদন করে।

খ. **দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ঃ** রেডিও, মোটরগাড়ী ইত্যাদি স্থিতিস্থাপক চাহিদার দ্রব্যগুলি একচেটিয়া উৎপাদক উৎপাদন করিলে উহাদের জন্য অপেক্ষাকৃত কম দাম ধার্য করিতে হইবে। কারণ বেশী দামে ঐ দ্রব্যগুলি বিক্রয় করিতে অসুবিধা হইবে। আবার, লবণ, কাপড় ইত্যাদি অস্থিতিস্থাপক চাহিদার দ্রব্যগুলি উৎপাদন করা হইলে সে অধিক দাম আদায় করিতে পারিবে। কারণ, এই দ্রব্যগুলির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হওয়ার জন্য একচেটিয়া উৎপাদক ঐগুলি অধিক দামেও বিক্রয় করিতে পারিবে।

গ. **উৎপাদনের ব্যয়বিধি ঃ** ক্রমবর্ধমান ব্যয়বিধি অনুসারে দ্রব্য উৎপাদিত হইলে একচেটিয়া উৎপাদক স্বল্প পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করিয়া গড় ব্যয় কম করিতে পারিবে। সুতরাং ঐরূপ অবস্থায় সে কম যোগান দিয়া বেশী দাম আদায় করিবে। আবার, ক্রমহ্রাসমান ব্যয়বিধি অনুসারে দ্রব্য উৎপাদিত হইলে একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইয়া গড় ব্যয় কমাইতে পারে। ফলে ঐরূপ ক্ষেত্রে সে বেশী যোগান দিয়া কম দাম ধার্য করিবে।

ঘ. **অন্যান্য বিষয় ঃ** ইহা ছাড়া, উপাদনের পরিমাণ ও দাম নির্ধারণের জন্য একচেটিয়া উৎপাদককে বিকল্প দ্রব্যের অস্তিত্ব, বৈদেশিক প্রতিযোগিতা, ভোগকারীদের বিরোধিতা, সরকারের নীতি ইত্যাদি বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হয়।

৩. **একচেটিয়া উৎপাদকের ক্ষমতার সীমা (Limits to the power of a Monopolist) ঃ** একচেটিয়া উৎপাদকের দ্রব্যের দাম ও যোগানের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকিলেও তাহার ক্ষমতার কতকগুলি সীমা দেখা যায়। দাম-সৃষ্টিকারী

(price-maker) হওয়া সত্ত্বেও সে স্বেচ্ছাচারীর (autocrat) মতো আচরণ করিতে পারে না বা ইচ্ছামতো যত খুশী দাম আদায় করিতে পারে না। সে বাজার হইতে 'সর্বাধিক সুবিধা' (maximum benefits) ভোগ করিতে চাহে, কিন্তু বাস্তব জগতে নিখুঁত একচেটিয়া অবস্থা খুব কম দেখা যায় বলিয়া সে শুধুমাত্র 'আপোষমূলক সুবিধা' (compromise benefits) পাইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি দীর্ঘ-কালীন বিষয়ের জন্য একচেটিয়া উৎপাদক সর্বাধিক সুবিধার পরিবর্তে কেবলমাত্র আপোষমূলক সুবিধা ভোগ করার প্রয়াস করে। ঐগুলিই তাহার ক্ষমতা সীমায়িত করে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সীমা এখানে আলোচনা করা হইল ঃ

(ক) **সম্ভাব্য বা ভবিষ্যৎ প্রতিযোগী ঃ** একচেটিয়া উৎপাদক বর্তমানে হয়তো কোন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতেছে না। কিন্তু ভবিষ্যতে প্রতিযোগীর আবির্ভাব ঘটিতে পারে। সে ক্রমাগত অত্যধিক দাম আদায় করিতে থাকিলে ভবিষ্যতে নূতন নূতন প্রতিযোগীর আবির্ভাব ঘটিয়া তাহার একচেটিয়া ক্ষমতা ক্ষুন্ন করিতে পারে। এই ভয়ে অত্যধিক দাম আদায় করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে অধিক দাম আদায় করিবে না।

(খ) **বৈদেশিক প্রতিযোগী ঃ** বৈদেশিক প্রতিযোগিতার ভয়ে একচেটিয়া উৎপাদক অত্যধিক দাম আদায় করিতে চাহে না। সে অত্যধিক দাম ক্রমাগত আদায় করিতে থাকিলে বৈদেশিক প্রতিযোগী তাহার সংরক্ষিত স্থানীয় বাজারে আকৃষ্ট হইতে পারে এবং ইহার ফলে তাহার ক্ষমতা সংকুচিত হয়।

(গ) **বিকল্প বা পরিবর্ত দ্রব্যের আবির্ভাব ঃ** তত্ত্বগতভাবে একচেটিয়া উৎপাদকের দ্রব্যের কোনরূপ বিকল্প বা পরিবর্ত দ্রব্য (substitutes) না থাকিলেও বাস্তব জগতে প্রতিটি দ্রব্যের কোন-না-কোন বিকল্প বা পরিবর্ত থাকে বা ভবিষ্যতে উহার আবির্ভাব ঘটিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে একচেটিয়া উৎপাদক খুশিমতো দাম আদায় করিতে ভয় পায়। কারণ সে বেশী দাম আদায় করিলে ক্রেতারা বিকল্প বা পরিবর্ত দ্রব্যের দিকে আকৃষ্ট হইবে।

(ঘ) **জনমতের চাপ বা ভোগকারীর বিরোধিতা ঃ** জনমতের প্রবল চাপ বা ভোগকারীদের বিরোধিতার জন্যও একচেটিয়া উৎপাদক ইচ্ছামতো বেশী দাম আদায় করিতে পারে না। সে ক্রমাগত চড়া দাম আদায় করিতে থাকিলে সংবাদপত্রে উহার বিরূপ সমালোচনা (adverse comments) হইতে পারে বা ক্রেতারা সংঘবদ্ধভাবে উহার বিরোধিতা করিতে পারে বা তাহার অধীন কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষের ভাব সৃষ্টি করিতে পারে। আধুনিককালে ক্রেতারা অধিক সচেতন বলিয়া তাহারা একচেটিয়া উৎপাদকের দ্রব্য বর্জনের জন্য আন্দোলনও করিতে পারে। ইহার ফলে, একচেটিয়া উৎপাদক ইচ্ছামতো অত্যধিক দাম আদায় করার প্রচেষ্টা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হয়।

(ঙ) **সরকারের হস্তক্ষেপ ও আইনগত ব্যবস্থা ঃ** একচেটিয়া উৎপাদক অত্যধিক

দাম-আদায়ের মাধ্যমে অত্যধিক মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করিলে সরকারও উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে এবং তাহার একচেটিয়া ক্ষমতা, আচরণ ও গর্হিত ব্যবসা-পদ্ধতি দমনের জন্য উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। যেমন, গর্হিত একচেটিয়া ক্ষমতা ও ব্যবসা-পদ্ধতি খর্ব করার জন্য ভারত সরকার সালে 'একচেটিয়া ও অন্তরায়মূলক ব্যবসা-আচরণ আইন' (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act—MRTP Act) প্রণয়ন করিয়াছে।

(চ) **সময় স্থিতিস্থাপকতা ও ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের প্রসার :** স্বল্পকালীন অবস্থার তুলনায় দীর্ঘকালীন অবস্থায় দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত অধিক স্থিতিস্থাপক (relatively more elastic) হওয়ার জন্য একচেটিয়া উৎপাদক বর্তমানে অধিক দাম আদায় করিতে ভয় পায়। প্রত্যেক উৎপাদকই ভবিষ্যতে ব্যবসা-প্রসারের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। একচেটিয়া উৎপাদক বর্তমান সময়ে অধিক দাম আদায় করিলে ভবিষ্যতে দ্রব্যের চাহিদা অধিক স্থিতিস্থাপক হয় বলিয়া উহার চাহিদা-হ্রাস পাওয়ার আশংকা থাকে। সুতরাং ভবিষ্যতে ব্যবসা-প্রসারের জন্য একচেটিয়া উৎপাদককে বর্তমানে যুক্তিসংগত কম দামে দ্রব্য-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার ফলে ভবিষ্যতে দ্রব্যের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং ব্যবসা-প্রসার অধিকতর সহজ ও লাভজনক হইবে।

(ছ) **শ্রমিক-সংঘ ও কাঁচামাল যোগানকারীদের প্রতিরোধ ক্ষমতা :** শ্রমিক-সংঘ ও কাঁচামাল যোগানদাররা একচেটিয়া উৎপাদকের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা নিবৃত্ত করিতে পারে। একচেটিয়া উৎপাদক অতি-মুনাফার লোভে ক্রমাগত দাম বৃদ্ধি করিতে থাকিলে শ্রমিক-সংঘ ঐ মুনাফার অংশ দাবী করিয়া মজুরি বৃদ্ধির জন্য চাপ দিতে পারে। সাধারণ কর্মচারীরাও অতি মুনাফার অংশ দাবী করিতে পারে। ইহা ছাড়া, কাঁচামাল যোগানদাররা কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি করিতে পারে। আধুনিককালে শ্রমিক সংঘ ও কাঁচামালের যোগানদাররা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় উৎপাদকের পক্ষে একচেটিয়া আধিপত্য ও ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

উপরি-উক্ত বিষয়গুলি একচেটিয়া উৎপাদকের ক্ষমতা সীমায়িত করে। আধুনিক-কালে অধিকাংশ রাষ্ট্র কল্যাণব্রতী হওয়ায় একচেটিয়া উৎপাদকের আচরণ ও কার্য-কলাপের উপর নানারূপে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। ইহার ফলে একচেটিয়া উৎপাদক দাম-সৃষ্টিকর্তা হওয়া সত্ত্বেও নিজের খুশিমতো দাম ধার্য করিতে পারে না।

৫. একচেটিয়া বাজারের দাম ও পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দামের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Monopoly Price and Competitive Price) : এখন একচেটিয়া বাজারের দাম ও পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দামের মধ্যে পার্থক্য সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে :

ক। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় বাজারে বহুসংখ্যক বিক্রেতা থাকে বলিয়া কোন একজন বিক্রেতা বাজার-যোগানের অতি সামান্য অংশ যোগান দেয়। ফলে তাহাকে প্রচলিত

বাজার দামে তাহার নিজস্ব যোগানের সমুদয় অংশ বিক্রয় করিতে হয়। এই কারণে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় দাম ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হয়। কিন্তু একচেটিয়া অবস্থায় শুধুমাত্র একজন বিক্রেতা থাকে এবং দ্রব্যের দামের উপর বিক্রেতার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে। সুতরাং একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করিলে দাম হ্রাস পাইবে। ফলে একচেটিয়া অবস্থায় দাম, প্রান্তিক আয় অপেক্ষা বেশী হয়।

খ। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় দ্রব্যের দাম উহার প্রান্তিক ব্যয়ের সমান থাকে, অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় কোন ফার্ম সেই পর্যন্ত দ্রব্য উৎপাদন করে, যেখানে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয়। কিন্তু দাম একচেটিয়া অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়। ইহার ফলে 'একচেটিয়া দাম' সাধারণত 'পূর্ণ প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রের দাম' অপেক্ষা অধিক হয়। এই কারণেই একচেটিয়া অবস্থায় উৎপাদন পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় উৎপাদন অপেক্ষা কম হয়। একচেটিয়া দাম (monopoly price) অবশ্য কোন কোন অবস্থায় প্রতিযোগিতার দাম (competitive price) অপেক্ষা কম হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, একচেটিয়া উৎপাদক যখন ক্রমহ্রাসমান ব্যয়বিধি অনুসারে উৎপাদন করে এবং দ্রব্যটির চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক (elastic) থাকে তখন সে অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া তাহা কম দামে বিক্রয় করিতে পারিবে। একচেটিয়া দাম এইরূপ অবস্থায় প্রতিযোগিতার দাম অপেক্ষা কম হইবে।

গ। পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাম দীর্ঘমেয়াদী অবস্থায় ফার্ম-এর গড় ব্যয়েরও সমান হয়। কারণ গড় ব্যয় অপেক্ষা দাম অধিক হইলে নূতন নূতন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করিয়া যোগান বাড়াইবে এবং ফলে দাম হ্রাস পাইয়া গড় ব্যয়ের সমান হইবে। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন অবস্থায় ফার্মগুলি শুধু স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করে। কিন্তু একচেটিয়া অবস্থায় শিল্পে নূতন ফার্ম প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া একচেটিয়া দাম গড় ব্যয়ের অধিক হইতে পারে। সুতরাং একচেটিয়া কারবারী দীর্ঘকালীন অবস্থায়ও উদ্বৃত্ত মুনাফা (excess profit) ভোগ করিতে পারে।

ঘ। একচেটিয়া অবস্থায় বিক্রেতা তাহার দ্রব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নিকট ভিন্ন ভিন্ন দাম চাহিতে পারে। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় ইহা সম্ভব নয়। কারণ ঐ বাজারে বহুসংখ্যক বিক্রেতা থাকে এবং প্রত্যেক বিক্রেতাকেই একই দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে হয়।

৫. **একচেটিয়া অবস্থায় দাম-পৃথকীকরণ (Price-Discrimination under Monopoly) :** একচেটিয়া অবস্থায় দামের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে দাম-পৃথকীকরণ। একচেটিয়া কারবারী দাম-সৃষ্টিকর্তা বলিয়া ইচ্ছা করিলে ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নিকট একই দ্রব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাম আদায় করিতে পারে, ইহাকেই দাম-পৃথকীকরণ বলা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একই ক্রেতার নিকট দ্রব্যের

ভিন্ন ভিন্ন এককের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাম আদায় করা যাইতে পারে। বাস্তবক্ষেত্রে অবশ্য এককভেদে দাম পৃথকীকরণের তুলনায় ব্যক্তিভেদে দাম-পৃথকীকরণের প্রয়োগ বেশী দেখা যায়।

দাম পৃথকীকরণের প্রকারভেদ ঃ মোটামুটিভাবে দাম-পৃথকীকরণ তিন প্রকার হয় ঃ

(ক) **ব্যক্তিভেদে দাম পৃথকীকরণ (Personal Discrimination) ঃ** এইরূপ ক্ষেত্রে একচেটিয়া বিক্রেতা একই দ্রব্য বা একই সেবামূলক কার্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন দাম আদায় করিয়া থাকে। যেমন—কোন চিকিৎসক-বিশেষজ্ঞ ধনী রোগীদের নিকট হইতে বেশী পারিশ্রমিক এবং গরীব রোগীদের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত কম পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারে।

(খ) **স্থানভেদে দাম পৃথকীকরণ (Local Discrimination) ঃ** একচেটিয়া বিক্রেতা তাহার দ্রব্যটির জন্য কোন একটি বাজারে বেশী দাম এবং অন্য একটি বাজারে একই দ্রব্যের জন্য কম দাম আদায় করিতে পারে। অনেক সময় একচেটিয়া বিক্রেতা বিদেশের বাজার দখল করিবার জন্য ঐ স্থানে তাহার দ্রব্যটি অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রয় করে, কিন্তু দেশের বাজারে একই দ্রব্যের জন্য বেশী দাম আদায় করে। ইহাকে অর্থবিদ্যায় 'ডাম্পিং' (dumping) বলা হয়। যেমন—বর্তমানে ভারত সরকার বিদেশের বাজারে কম দামে কিন্তু দেশের বাজারে বেশী দামে চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছে।

(গ) **ব্যবহারভেদে দাম-পৃথকীকরণ (Trade or Use Discrimination) ঃ** একই দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাম আদায় করাকে ব্যবহারভেদে দাম-পৃথকীকরণ বলে। যেমন—কিছুকাল পূর্বেও বাতি ও পাখার জন্য যে বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহার করা হয়, কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থা তাহার জন্য বেশী দাম এবং রান্নার কাজ বা ইস্ত্রির জন্য উহা ব্যবহার করা হইলে অপেক্ষাকৃত কম দাম আদায় করিত।

দাম-পৃথকীকরণ পদ্ধতি সফলতার শর্তসমূহ ঃ পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় বহুসংখ্যক বিক্রেতা একই দ্রব্য বিক্রয় করে বলিয়া ঐ ধরনের বাজারে দাম-পৃথকীকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। শুধুমাত্র একচেটিয়া বাজারেই এই পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হইয়া থাকে। আবার একচেটিয়া বাজারেও সকল ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব হয় না। অধ্যাপক পিগু (Pigou) এবং আরও অন্যান্য লেখকরা একই পদ্ধতির সফল প্রয়োগের নিম্নলিখিত শর্তগুলি উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

১। ভোগকারীর বিচিত্র মনোভাব ঃ ভোগকারীর বিচিত্র মনোভাবের ফলে এই পদ্ধতি একচেটিয়া কারবারী সফলতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারে। উহার তিনটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল ঃ

(ক) কোন কোন ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম সম্পর্কে ক্রেতাদের অজ্ঞতার (ignorance of the buyers) জন্য দাম-পৃথকীকরণ সম্ভব হয়। এইরূপ অবস্থায় একচেটিয়া বিক্রেতা

কোন ক্রেতার নিকট হইতে অধিক দাম এবং অন্য ক্রেতার নিকট হইতে একই জিনিসের জন্য কম দাম আদায় করিতে পারে।

(খ) কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রেতাদের অযৌক্তিক মনোভাবের ফলে দাম-পৃথকীকরণ সম্ভব হয়। যাহার নিকট হইতে অধিক দাম আদায় করা হয় সে হয়তো মনে করিতে পারে যে, তাহাকে উৎকৃষ্ট মানের দ্রব্য দেওয়া হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে সকল ক্রেতাকেই একই জিনিষ বিক্রয় করা হইতেছে।

(গ) কোন কোন ক্ষেত্রে দাম-তারতম্যের পরিমাণ এত কম হয় যে উচ্চ-মানের ক্রেতারা উহার দিকে কোনরূপ দৃষ্টিই দেয় না।

২। সেবাকার্যের ক্ষেত্রে দাম-পৃথকীকরণ: দাম-পৃথকীকরণের অন্যতম শর্ত হইতেছে দ্রব্যটির পুনর্বিক্রয়ের সুযোগের অভাব। যে-সকল দ্রব্য, প্রধানত ব্যক্তিগত সেবাকার্য (personal services), পুনরায় বিক্রয় করা সম্ভব হয় না সেইসকল ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হয়। এইসকল ক্ষেত্রে কোন কোন ক্রেতা অল্প দামে জিনিষ ক্রয় করিয়া অন্য ক্রেতার নিকট সামান্য অধিক দামে উহা বিক্রয় করিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন চিকিৎসকের সেবাকার্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন চিকিৎসক ধনী রোগীর নিকট হইতে বেশী পারিশ্রমিক কিন্তু একই কাজের জন্য গরীব রোগীর নিকট হইতে কম পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারে; কারণ চিকিৎসকের সেবাকার্য পুনরায় বিক্রয় করা সম্ভব হয় না। এই কারণটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, দুইটি অবস্থায় কোন দ্রব্য পুনরায় বিক্রয় করা সম্ভব হয় না:—প্রথমত, যেখানে উচ্চ-দামের বাজার হইতে নিম্ন-দামের বাজারে দ্রব্যটির চাহিদা (demand) স্থানান্তর করা বা চালান দেওয়া সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, যেখানে নিম্নদামের বাজার হইতে উচ্চ দামের বাজারে দ্রব্যটির যোগান (supply) স্থানান্তর করা বা চালান দেওয়া সম্ভব হয় না। ব্যক্তিগত সেবাকার্যের ক্ষেত্রে পুনর্বিক্রয় সম্ভব হয় না বলিয়া একচেটিয়া বিক্রেতা ঐরূপ ক্ষেত্রে দাম-পৃথকীকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়। যে-সকল ক্ষেত্রে দ্রব্য পুনরায় বিক্রয় করা যায় সেইসকল ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব হয় না।

৩। ভৌগোলিক ব্যবধানের জন্য দাম-পৃথকীকরণ: দুইটি বাজারের মধ্যে ভৌগোলিক বা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবধান বা বাধানিষেধ থাকিলে একচেটিয়া বিক্রেতা ঐ দুই বাজারে একই দ্রব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাম ধার্য করিতে পারে। কারণ এইরূপ ক্ষেত্রে এক বাজারের ক্রেতারা অন্য বাজারের ক্রেতাদের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করিতে পারে না বা এক বাজার হইতে অন্য বাজারে দ্রব্যটি চালান দেওয়া সম্ভব হয় না।

৪। চাহিদার তারতম্যের ফলে দাম-পৃথকীকরণ: দুইটি বা ততোধিক বাজারে একচেটিয়া বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার তারতম্য থাকিলে দাম-পৃথকীকরণ সম্ভব ও লাভজনক হয়। যে-বাজারে দ্রব্যটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (inelastic) হয়, সেই বাজারে অধিক দাম ধার্য করা হইবে। পক্ষান্তরে, যে বাজারে দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক (elastic) হয়, সেই বাজারে উহার জন্য অপেক্ষাকৃত কম দাম আদায় করা

হইবে। কিন্তু সকল বাজারেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একই রূপ হইলে দাম পৃথকীকরণ সম্ভবও হইবে না, লাভজনকও হইবে না।

৫। সরকারী হস্তক্ষেপের অভাব: দাম-ধার্যের উপর কোনরূপ সরকারী বাধা-নিষেধ না থাকিলে একচেটিয়া বিক্রেতা অবস্থাবিশেষে একই দ্রব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন দাম আদায় করিতে সফল হইবে।

দাম-পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য: দাম-পৃথকীকরণের ক্ষেত্রেও একচেটিয়া বিক্রেতা সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে। ইহার জন্য সে বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন পরিমাণে দ্রব্যটি যোগান দিয়া থাকে। বিভিন্ন বাজারে দ্রব্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার তারতম্য থাকিলেই দাম পৃথকীকরণ লাভজনক হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে ভারসাম্য অবস্থার জন্য দুইটি পৃথক শর্ত পূরণ করিতে হয়:

(১) দুই বা ততোধিক বাজারে একচেটিয়া বিক্রেতা দ্রব্যটি এমনভাবে যোগান দিবে, যেন প্রত্যেক বাজারের প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হইবে। অর্থাৎ 'ক' ও 'খ' —এই দুইটি বাজারে দ্রব্যটি যোগান দেওয়া হইলে ভারসাম্য অবস্থায় 'ক' ও 'খ' বাজারের প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হইবে।

(২) প্রত্যেকটি বাজার হইতে পৃথকভাবে যে-পরিমাণে প্রান্তিক আয় পাওয়া যায়, তাহা একত্রে যেন একচেটিয়া উৎপাদকের মোট উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। অর্থাৎ 'ক' ও 'খ' বাজারের দ্রব্যটি এমনভাবে বিভিন্ন পরিমাণে যোগান দেওয়া হইবে যেন ঐ দুই বাজারের সম্মিলিত প্রান্তিক আয় (combined marginal revenue) মোট উৎপাদনের ('ক' ও 'খ' বাজারে মোট যোগান) প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইবে।

এই দুইটি শর্ত সংক্ষেপে এইভাবে লেখা যাইতে পারে:

'ক' বাজার হইতে সংগৃহীত প্রান্তিক আয় = 'খ' বাজার হইতে সংগৃহীত প্রান্তিক আয় = 'ক' ও 'খ' বাজারে প্রদত্ত উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয়।

দাম-পৃথকীকরণের গুণাগুণ: বলা হয়, দাম-পৃথকীকরণ পদ্ধতির ফলে সমাজের কোন কোন শ্রেণীর লোকেরা লাভবান হয়। গরীব ক্রেতারা অপেক্ষাকৃত স্বল্প দামে জিনিষটি ক্রয় করিতে পারে বলিয়া তাহাদের লাভ হয়। কিন্তু এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে ধনী ক্রেতারা একই জিনিষের জন্য বেশী দাম দিতে একরূপ বাধ্য বলিয়া তাহাদের ক্ষতি হয় এবং একই দাম আদায় করা হইলে তাহারা যে-ভোগোদ্বৃত্ত (consumer's surplus) লাভ করিতে পারিত, তাহা আর ভোগ করিতে পারে না। আরও বলা হয়, দাম-পৃথকীকরণের নীতির ফলে একচেটিয়া উৎপাদকরা দ্রব্যটির মোট চাহিদা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু দ্রব্যটি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বা অপ্রয়োজনীয় হইলে উহা উৎপাদনের জন্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ নিযুক্ত হইয়া পড়িবে। ইহা সমাজের পক্ষে কাম্য বা শুভ হইবে না।

১০

।। উপাদানের দাম নির্ধারণ ।।

(Determination of Factor Prices)

[ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-সিদ্ধান্ত—উপাদানসমূহের আয় বা দাম—উপাদান দাম-তত্ত্বের বিশেষত্ব—প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার বণ্টন তত্ত্ব]

পূর্বেকার অধ্যায়গুলিতে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়ের দিক আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে ঐ কার্যক্রমের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অর্থাৎ উপাদান-ক্রয়ের দিক আলোচনা করা হইবে।

ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-সিদ্ধান্ত (Purchase Decision of a Firm) : পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ফার্ম-এর অর্থনৈতিক কার্যক্রমের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ—একটি হইতেছে বিক্রয় সিদ্ধান্ত (sales decisions) এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে ক্রয়-সিদ্ধান্ত (purchase decisions)। উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রয়-সম্পর্কিত কার্যকলাপ হইতেছে বিক্রয়-সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষান্তরে, ক্রয়-সিদ্ধান্ত হইতেছে উৎপাদনের জন্য যে-সকল উপাদান বা উপকরণ নিয়োগ করা হয়, সেই বিষয় সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়। দ্রব্য বা সেবাকার্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ বা উপাদান (যেমন—জমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি) নিয়োগ করিতে হয় এবং এই উপাদানগুলির অধিকাংশই দামের বিনিময়ে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে বাজার হইতে ক্রয় করিতে হয়। উপাদানগুলির জন্য ফার্ম বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কি দাম দিবে সেই সম্পর্কে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে যথোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। ঐ দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে জানিতে হয়। এই কারণে ক্রয়-সিদ্ধান্তের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে উপাদানের দাম-সম্পর্কিত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করিতে হয়। ঐ বিশ্লেষণের পূর্বে উপাদান-দাম সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন, পরবর্তী অংশে তাহাই বলা হইল।

২. উপাদানসমূহের আয় বা দাম (Factor Earnings or Prices) : উপাদানের দাম নির্ধারণের ব্যাপারে সর্বপ্রথমে উপাদানের আয় বা দাম সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। উপাদানের আয় বা দাম হইতেছে উৎপাদন-ক্ষেত্রে উহার সেবাকার্যের পারিশ্রমিক। ইহা উপাদান বা উহার মালিকের নিকট আয়, কিন্তু সমাজ বা উৎপাদন-ব্যবস্থা বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের নিকট উহা হইতেছে উপাদানের দাম বা উৎপাদনের ব্যয়। কারণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য পারিশ্রমিক দিয়া উপাদানের সেবাকার্য সংগ্রহ করিতে হয়। সুতরাং উপাদান-আয় = উপাদান-দাম।

উৎপাদনকার্যের জন্য চারটি উপাদানের প্রয়োজন হয়—জমি, শ্রম, মূলধন ও উদ্যোক্তা। উৎপাদনের কার্যে এই উপাদানগুলি বিভিন্ন ধরনের কাজ করিয়া থাকে এবং

ঐ কাজের বিনিময়ে উহারা পারিশ্রমিক পায়। জমি, শ্রম, মূলধন ও উদ্যোক্তা মিলিত হইয়া যে-দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদন করে উহার মোট মূল্যই উপাদানগুলির মধ্যে আয় হিসাবে বণ্টন (distribution) করিয়া দেওয়া হয়। এই কারণে উপাদানের দাম নির্ধারণের বিষয়টি অর্থবিদ্যার 'বণ্টন তত্ত্বে' (theory of distribution) আলোচিত হইয়া থাকে। জমি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে যে-দাম দেওয়া হয়, উহাকে খাজনা (rent) বলে। শ্রমিক তাহার শ্রমের পারিশ্রমিক হিসাবে যাহা পায় তাহা হইতেছে মজুরি (wages)। ঋণ-মূলধনের সেবাকার্যের দাম হইতেছে সুদ (interest) এবং উদ্যোক্তার সেবাকার্যের দামকে মুনাফা (profits) বলা হয়। উপরের বিষয়টি অর্থাৎ জাতীয় আয়ের 'ক্রিয়াগত বণ্টনের' (functional distribution) বিষয়টি নিম্নলিখিত ভাবে দেখানো যাইতে পারে :
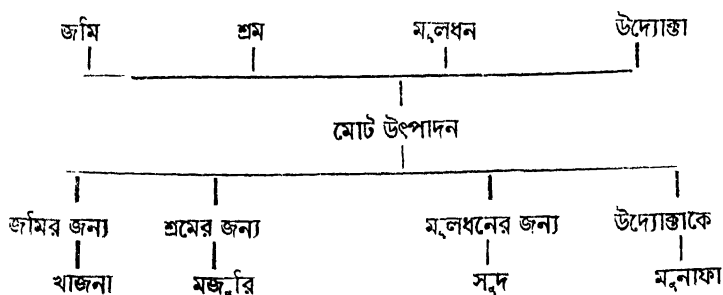
সুতরাং দেখা যায়, জমি, শ্রম, মূলধন ও উদ্যোক্তা একত্রে মিলিত হইয়া যাহা উৎপাদন করে তাহাই উহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। যেমন—ধরা যাউক, কোন একজন উদ্যোক্তা-কৃষক একটি জমিতে ১ জন শ্রমিক লইয়া ও কিছু পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করিয়া মোট যে-ধান উৎপাদন করিল তাহার মোট দাম হইতেছে ১০০ টাকা। উদ্যোক্তা ঐ ১০০ টাকা হইতে জমির জন্য খাজনা দিল ২০ টাকা, শ্রমিককে দিল ৩০ টাকা, মূলধনের জন্য সুদ দিল ১০ টাকা এবং বাকী ৪০ টাকা হইল তাহার আয় বা মুনাফা। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, উপাদানগুলির মধ্যে কে কত পাইবে? ইহার উত্তরে বলা হইবে, উহাদের যেরূপ উৎপাদিকাশক্তি (productivity) সেই অনুপাতে উহাদিগকে পারিশ্রমিক দিতে হইবে। অর্থাৎ, জমির উৎপাদিকা-শক্তি অনুসারে দিতে হইবে খাজনা, শ্রমিকের কার্যক্ষমতা অনুযায়ী দিতে হয় মজুরি, মূলধনের উৎপাদিকা-শক্তি অনুযায়ী দিতে হয় সুদ এবং উদ্যোক্তার কার্যদক্ষতা অনুযায়ী পাইবে মুনাফা। উপাদানের দাম-নির্ধারণের এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনার পূর্বে উপাদান-দামের কয়েকটি বিশেষত্ব মনে রাখা প্রয়োজন।

ত. **উপাদান দাম-তত্ত্বের বিশেষত্ব (Special Features of Factor Pricing) :** উৎপাদনের উপাদানসমূহের দাম সাধারণ দ্রব্যসামগ্রীর মতো উহাদের চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোন উপাদানের চাহিদা

অধিক এবং যোগান কম হইলে উহার দাম অধিক হইবে। পক্ষান্তরে, চাহিদা কম এবং যোগান অধিক হইলে দাম কম হইবে। এই কারণেই বলা হয়, উপাদানের দাম-নির্ধারণ তত্ত্বটি সাধারণ মূল্য তত্ত্বেরই একটি অংশবিশেষ। তাহা হইলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে, দ্রব্য ও উপাদানের উভয়ের দাম যদি এক নীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে উপাদানের দাম-নির্ধারণ তত্ত্বের পৃথক আলোচনার সার্থকতা কোথায়? ইহার উত্তরে বলা হয়, উৎপাদনের উপাদানগুলির ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যাহার জন্য উপাদানগুলির দামতত্ত্বের পৃথক আলোচনার প্রয়োজন হয়। নিম্নে উপাদান-দামতত্ত্বের বিশেষত্ব এবং সাধারণ দামতত্ত্বের সহিত ইহার পার্থক্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল ঃ

(১) চাহিদার দিক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, দ্রব্যের চাহিদা হইতেছে প্রত্যক্ষ, কিন্তু উপাদানের সেবাকার্যের চাহিদা হইতেছে 'উদ্ভূত চাহিদা' (derived demand)। অর্থাৎ দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোগকারীরা উহা সরাসরি চাহিদা করে এবং দ্রব্য হইতে তাহারা সরাসরি উপযোগ পাইয়া থাকে। কিন্তু উপাদানের চাহিদা করে উৎপাদকগণ এবং অন্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্যই উপাদানের চাহিদা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ক্রেতাদের চাহিদা বিশেষত ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা আছে বলিয়াই উপাদানের চাহিদা হয়। কোন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেই উহা উৎপাদনের জন্য যে-সকল উপাদানের প্রয়োজন পড়ে তখনই ঐ সকল উপাদানের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

(২) আবার উপাদানের চাহিদা হইতেছে মূলত 'যুক্ত চাহিদা' (joint demand) অর্থাৎ একযোগে একাধিক উপাদানের চাহিদা সৃষ্টি হয়। কারণ কোন একটি মাত্র উপাদান দ্বারা কোন দ্রব্য বা সেবাকার্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দ্রব্য ছাড়া (যেমন রুটি ও মাখন, গাড়ী ও পেট্রোল প্রভৃতি যুক্ত চাহিদার দ্রব্য) দ্রব্যের ক্ষেত্রে যুক্ত চাহিদা হয় না; অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা আলাদাভাবে দেখা দেয়।

(৩) যোগানের দিক হইতেও উপাদানসমূহের কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়। প্রায় সকল দ্রব্যের যোগান প্রয়োজন মতো কম-বেশী বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু সকল উপাদানের যোগানই প্রয়োজনমতো বৃদ্ধি করা যায় না। কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইলে অধিক দাম পাওয়ার আশায় উৎপাদক উহার উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি করে। কিন্তু উপাদানের দাম বৃদ্ধি পাইলে জমির যোগান বৃদ্ধি পায় না বা শ্রমের যোগান দ্রুত বৃদ্ধি করা যায় না। পক্ষান্তরে, চাহিদা-হ্রাসের ফলে দ্রব্যের দাম হ্রাস পাওয়ায় উহার যোগান সাধারণত হ্রাস পায়। কিন্তু চাহিদা কমিলেও জমির যোগানের হ্রাস ঘটে না বা শ্রমিকদের স্বল্প মজুরিতে কাজ করিতে হয়।

(৪) উপাদানের যোগানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে, অনেক ক্ষেত্রে যে যে বিষয়ের উপর উপাদানের যোগান নির্ভর করে তাহার উপর উপাদান-মালিকের বিশেষ হাত থাকে না। যেমন—মূলধন-যোগানের পরিমাণ বহুলাংশে নির্ভর করে দেশের

জাতীয় আয়, শান্তি-শৃংখলা, ব্যাংক-ব্যবস্থার উপর। এই বিষয়গুলির উপর মূলধন-যোগানকারী অর্থাৎ সঞ্চয়কারীর কোন হাত থাকে না। কিন্তু দ্রব্যের যোগানের ক্ষেত্রে সাধারণত এইরূপ দেখা যায় না।

(৫) সাধারণত বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের জন্য বিশেষ বিশেষ দাম-তত্ত্বের প্রয়োজন পড়ে না ; অধিকাংশ দ্রব্যের দাম একই দামতত্ত্ব দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু উপাদানের ক্ষেত্রে সাধারণ দামতত্ত্ব ছাড়াও পৃথক পৃথক দামতত্ত্বের প্রয়োজন পড়ে। জমি, মূলধন শ্রম ও সংগঠনের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের বিষয় বিভিন্ন ধরনের হয় বলিয়া খাজনা, সুদ, মজুরি ও মুনাফা নির্ধারণ সম্বন্ধে পৃথক পৃথক তত্ত্বের প্রয়োজন পড়ে।

উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্য উপাদানের দাম-নির্ধারণের জন্য পৃথক দামতত্ত্বের প্রয়োজন পড়ে। এই দাম-তত্ত্বের বিশ্লেষণের সময় উপাদান ও উৎপন্ন দ্রব্যের উভয় বাজারই একই সঙ্গে বিবেচনা করিতে হয়। দ্রব্যের ক্ষেত্রে সাধারণত উপাদানগুলির দাম অপরিবর্তিত থাকে এইরূপ ধরিয়া লইয়া বিভিন্ন ধরনের বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ ও উহার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সাধারণ দাম-তত্ত্বে বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু উপাদানের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার বাজারে (দ্রব্যের বাজার ও উপাদানের বাজার) অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপাদানের দামতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে হয়। এই কারণে সাধারণ দাম-তত্ত্বের তুলনায় উপাদানের দাম-তত্ত্বের বিশ্লেষণ অধিক জটিল হইয়া পড়ে।

৪. **প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার বন্টনতত্ত্ব** (Marginal Productivity Theory of Distribution): উপাদানের দাম-নির্ধারণ সম্বন্ধে অর্থাৎ মোট উৎপাদন বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পারিশ্রমিক হিসাবে কিভাবে বণ্টিত হয়, সেই সম্পর্কে অর্থবিদ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রচলিত আছে, ইহা 'প্রান্তিক উৎপাদন-শীলতার বণ্টনতত্ত্ব' নামে পরিচিত। জে. বি. ক্লার্ক (J. B. Clark), উইকস্টীড (Wicksteed) প্রমুখ লেখকরা এই তত্ত্বটি প্রচার করেন। এই তত্ত্বটিতে বলা হয়, কোন উপাদানের দাম বা পারিশ্রমিক ঐ উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন-মূল্যের (value of marginal product of the factor) সমান হইবে। অর্থাৎ খাজনা হইতেছে জমির প্রান্তিক উৎপাদন-মূল্যের সমান, মজুরি হইতেছে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্ন-মূল্যের সমান, সুদ হইতেছে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন-মূল্যের সমান, ইত্যাদি। সুতরাং, কোন উপাদানের উৎপাদনশীলতা অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার দ্বারাই দাম বা পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়।

উপাদানের দাম-নির্ধারণের জন্য এই তত্ত্বের প্রবর্তকরা মুনাফা-সর্বাধিককরণের সাধারণ সূত্রটি (অর্থাৎ, প্রান্তিক ব্যয়=প্রান্তিক আয়) প্রয়োগ করিয়াছেন। মুনাফা সর্বাধিককরণের জন্য উৎপাদক যেমন প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় সমান করে, সেইরূপ উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য ও উহার প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান করিয়া নিয়োগকর্তা মুনাফা সর্বাধিক করার চেষ্টা করে।

তত্ত্বটির অনুমানসমূহ ঃ এই তত্ত্বটিতে কতকগুলি অনুমান (assumptions) ধরা হইয়াছে ঃ

ক. দ্রব্যের বাজারে ও উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা ঃ তত্ত্বটিতে ধরা হয়, দ্রব্যের ও উপাদানের উভয় বাজারেই পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থা থাকিবে। ইহার ফলে দ্রব্যটির দাম এবং উপাদানের দাম উভয়ই অপরিবর্তিত থাকিবে

খ. সমজাতীয় উপাদান ঃ এই অনুমানটিতে বলা হয়, শ্রম বা মূলধনের উপাদানের প্রত্যেকটি এককের উৎপাদন-দক্ষতা একই রূপ (homogenous) হইবে। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি শ্রমিকের বা মূলধনের প্রত্যেকটি এককের উৎপাদনশীলতা একই থাকিবে।

গ. পরিবর্তনের নীতি ঃ এই তত্ত্বে ধরা হয়, কোন একটি উপাদানের পরিবর্তে অন্য উপাদান নিয়োগ করা যাইবে অর্থাৎ শ্রমের পরিবর্তে মূলধন, বা মূলধনের পরিবর্তে শ্রম নিয়োগ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইবে। প্রকৃতপক্ষে, একটি উপাদানের পরিমাণ স্থির রাখিয়া অপর একটি উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে। সুতরাং তত্ত্বটিতে পরিবর্তনের নীতি (principle of substitution) ধরা হইয়াছে।

ঘ. ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন-বিধির প্রয়োগ ঃ শ্রম বা মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইলে উহার প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পাইবে, এইরূপ তত্ত্বটিতে ধরা হয়।

ঙ. মুনাফা সর্বাধিককরণ ঃ নিয়োগকারী বিভিন্ন উপাদান এমন পরিমাণে এবং এমন অনুপাতে নিয়োগ করিবে যেন তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয়।

চ. পূর্ণ নিয়োগ ঃ উপাদানগুলিকে উহাদের প্রান্তিক উৎপাদন-মূল্যের সমান পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। কিন্তু ইহা কেবলমাত্র পূর্ণ নিয়োগ (full employment) অবস্থায় সম্ভব। কারণ কোন উপাদানের কোন একক বেকার থাকিলে উহা প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য অপেক্ষা কম পারিশ্রমিকে কাজে নিযুক্ত হইতে রাজী থাকিবে।

ছ. মোট উৎপাদনের নিঃশেষ ঃ প্রত্যেকটি উপাদানকে উহার সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক উৎপাদন-মূল্য অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হইলে মোট উৎপাদন-মূল্য পরিশেষে নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

দৃষ্টান্তসহ তত্ত্বটির ব্যাখ্যা ঃ উপরি-উক্ত অনুমানগুলির ভিত্তিতে তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা হয়। তত্ত্বটি অনুসারে কোন উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্যের সমান হইবে। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, প্রান্তিক উৎপন্ন মূল্য বলিতে কি বুঝায়? প্রান্তিক উৎপাদন (marginal product) বলিতে কোন উপাদানের অতিরিক্ত উৎপাদনকেই বুঝায়। যেমন—জমি ও মূলধনের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া শ্রমের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধি করা হইলে যে-অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়া যাইবে তাহাই হইবে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন। প্রান্তিক উৎপাদনকে দ্রব্যের প্রতি একক দাম দ্বারা গুণ করিলে 'প্রান্তিক উৎপন্ন মূল্য' (value of the marginal product) পাওয়া

যায়। আবার প্রান্তিক উৎপাদনকে প্রান্তিক আয় দ্বারা মূল্যায়ন বা গুণ করা হইলে 'প্রান্তিক আয় উৎপন্ন' (marginal revenue product) পাওয়া যাইবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় দ্রব্যের দাম ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হয় বলিয়া 'প্রান্তিক উৎপন্ন মূল্য' ও 'প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন' পরস্পর সমান হইবে।

তত্ত্বটিতে বলা হয়, কোন নিয়োগকারী কোন একটি উপাদান সেই পরিমাণে নিয়োগ করিবে যেখানে উপাদানটির দাম উহার 'প্রান্তিক উৎপাদন-মূল্য বা প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের' সমান হইবে। কারণ ঐ অবস্থায় নিয়োগকারীর মুনাফা সর্বাধিক হইবে। মজুরির উদাহরণ দ্বারা এই তত্ত্বটি বিশ্লেষণ কর যায়।

ধরা যাউক, দ্রব্যের প্রতি একক দাম ৩ টাকা এবং শ্রমিকের মজুরি জনপ্রতি ১২ টাকা। প্রথম অনুমানটি অনুযায়ী দ্রব্যের এই দাম বা শ্রমের মজুরি উভয়ই অপরিবর্তিত থাকিবে। নিম্নের তালিকাটি দ্বারা তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করা হইল ঃ

জমি	মূলধন	শ্রম	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপন্ন মূল্য বা প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন	মজুরির হার
১ একক	১ একক	১ একক	১০ একক	X	X	১২ টাকা
,, ,,	,, ,,	২ ,,	১৬ ,,	৬ একক	১৮ টাকা	,, ,,
,, ,,	,, ,,	৩ ,,	২১ ,,	৫ ,,	১৫ ,,	,, ,,
,, ,,	,, ,,	৪ ,,	২৫ ,,	৪ ,,	১২ ,,	,, ,,
,, ,,	,, ,,	৫ ,,	২৮ ,,	৩ ,,	৯ ,,	,, ,,
,, ,,	,, ,,	৬ ,,	৩০ ,,	২ ,,	৬ ,,	,, ,,

উপরের তালিকাটি হইতে দেখা যায়, ৩ একক শ্রম পর্যন্ত মজুরি অপেক্ষা শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন-মূল্য (বা প্রান্তিক আয় উৎপন্ন) অধিক হয়। সুতরাং ঐ স্তরে শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া মুনাফা বাড়াইবার সুযোগ থাকে। ৪ একক শ্রমে মজুরি ও শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন-মূল্য (বা প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন) পরস্পর সমান হইতেছে। এই স্তরের পর মুনাফা বাড়াইবার আর সুযোগ থাকে না। সুতরাং নিয়োগকারী মোট মুনাফা এই স্তরে (প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হওয়ায়) সর্বাধিক হইতেছে। ৫ বা ৬ একক শ্রম নিয়োগ করা হইলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য অপেক্ষা মজুরি অধিক হওয়ায় নিয়োগকারীর ক্ষতি হয়।

সুতবাং দেখা যায়, ভারসাম্য অবস্থায় নিয়োগকারীর ৪ একক শ্রম নিয়োগ করিবে। কারণ ঐ অবস্থায় শ্রমের মজুরি উহার প্রান্তিক উৎপাদন-মূল্যের বা প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হইতেছে এবং ঐ স্তরে নিয়োগকারীর মোট মুনাফা সর্বাধিক হইবে। অনুরূপভাবে দেখানো যায়, সুদ মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন-মূল্যের সমান,

খাজনা জমির প্রান্তিক উৎপাদন-মূল্যের সমান এবং মুনাফা সংগঠনকারীর প্রান্তিক উৎপাদন-মূল্যের সমান হইবে।

তত্ত্বটি একটি রেখাচিত্রের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় ঃ

নিম্নের রেখাচিত্রে **কখ** দ্বারা শ্রমের পরিমাণ এবং **কগ** দ্বারা মজুরি ও শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন মূল্য বা প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন দেখানো হইতেছে। **মম´** রেখাটি
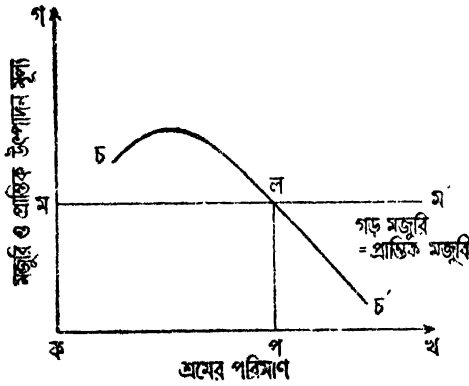
চিত্র-৪৩

শ্রমের মজুরি রেখা। মজুরির হার অপরিবর্তিত ধরা হইয়াছে বলিয়া **মম´** একটি সমান্তরাল রেখা হইতেছে। সুতরাং গড় মজুরি ও প্রান্তিক মজুরি পরস্পর সমান হইবে। **চচ´** রেখাটি শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন-মূল্য বা প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা হইয়াছে বলিয়া এই রেখাটি নিম্নগামী হইতেছে। উপরের রেখাচিত্রে দেখা যায়, নিয়োগকারী **কপ** পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করিবে, কারণ ঐ পরিমাণ শ্রমের মজুরি অর্থাৎ **কম** বা **পল** শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন-মূল্য বা প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হইতেছে।

সমালোচনা ঃ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার বণ্টন তত্ত্বটি নানাভাবে সমালোচনা করা হয় ঃ

(১) টাউজিগ্ (Taussig), ড্যাভেনপোর্ট (Davenport) প্রমুখ লেখকরা দেখাইয়াছেন, কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন পৃথকভাবে বাহির করা যায় না। কারণ সকল উৎপাদনই সকল উপাদানের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে উৎপাদিত হয়। সুতরাং শ্রম বা মূলধনে কোন পৃথক উৎপাদন থাকিতে পারে না।

(২) তত্ত্বটিতে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থা ধরা হইয়াছে বলিয়া তত্ত্বটি অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে। কারণ পূর্ণ প্রতিযোগিতা বাস্তব জগতে দেখা যায় না বলিলেই চলে। কিন্তু চেম্বারলিন (Chamberlin) প্রমুখ লেখকেরা দেখাইয়াছেন, একচেটিয়া বা অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার অবস্থায়ও তত্ত্বটি প্রয়োগ করা যায়।

(৩) তত্ত্বটিতে পরিবর্তনশীলতার নীতি ধরা হইয়াছে। কিন্তু উৎপাদনের প্রক্রিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ হইয়া পড়ে যে একটি উপাদানের পরিবর্তে অন্য উপাদান নিয়োগ করা সম্ভব হয় না।

(৪) তত্ত্বটির সমালোচনা প্রসঙ্গে আরও বলা হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে কোন একটি উৎপাদনের অতিরিক্ত এক একক নিয়োগের ফলে সমগ্র সংগঠন-ব্যবস্থায় এমন উন্নতি ঘটে যাহার ফলে ঐ উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় (অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদান বৃদ্ধি পাইলে) প্রান্তিক উৎপাদন অনুসারে পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব হইবে না। কারণ তখন বণ্টন-কার্য সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই মোট উৎপাদন নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

(৫) তত্ত্বটির বিরুদ্ধে আরও বলা হয়, ইহা উপাদানের দাম-নির্ধারণের ব্যাপারে শুধুমাত্র উপাদানের চাহিদার দিক অর্থাৎ নিয়োগকারীর দিক আলোচনা করিয়াছে। উপাদানের যোগানের দিক অর্থাৎ উপাদানের মালিকের দিক বিবেচনা করা হয় নাই। এই কারণে স্যামুয়েলসন (Samuelson) মন্তব্য করিয়াছেন, তত্ত্বটিতে কেবল মাত্র ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপাদানের সেবাকার্যের চাহিদার দিক বিবেচনা করা হইয়াছে।

উপসংহার ঃ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার বণ্টন-তত্ত্বের নানারূপ ত্রুটি থাকার জন্য উহাকে উপাদানের দাম-নির্ধারণের সন্তোষজনক বা পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই কারণে আধুনিক লেখকরা উপাদানের দাম-নির্ধারণের জন্য 'চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের' (demand and supply theory) উপর অধিক গুরুত্ব দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যের দাম যেরূপ উহার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়, উপাদানের দামও সেইরূপ উহার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

২১

॥ খাজনা ॥
(Rent)

[চুক্তিবদ্ধ খাজনা ও অর্থনৈতিক খাজনা—রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব—আধুনিক খাজনা তত্ত্ব—রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব ও আধুনিক তত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক—অন্যান্য উপাদানের আয়ের ক্ষেত্রে খাজনা উপাদান—খাজনা ও আধা-খাজনা বা অপূর্ণাঙ্গ খাজনা—খাজনা ও অর্থনৈতিক প্রগতি]

উপাদানের দাম-নির্ধারণের সাধারণ নীতি আলোচনার পর বিভিন্ন উপাদানের দাম অর্থাৎ খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা সম্বন্ধে পৃথক করিয়া আলোচনা করিতে হয়। কারণ এই উপাদানগুলির চাহিদা ও যোগানের অবস্থা একইরূপ নহে। বর্তমান অধ্যায়ে জমির সেবাকার্যের দাম অর্থাৎ খাজনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে মজুরি, সুদ ও মুনাফা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হইবে।

১. **'চুক্তিবদ্ধ খাজনা' ও 'অর্থনৈতিক খাজনা' (Contract Rent and Economic Rent)**ঃ দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন জিনিস ভাড়া লওয়া হইলে উহার জন্য যে দাম দিতে হয়, তাহাকে 'খাজনা' বলে। এই খাজনা জমি বা বাড়ীর মালিক ও ভাড়াটের সঙ্গে পূর্ব-চুক্তিমতো স্থির করা হয় এবং ইহাকে 'চুক্তিবদ্ধ খাজনা' (contract rent) বলা হয়। অর্থবিদ্যায় 'চুক্তিবদ্ধ-খাজনা' লইয়া আলোচনা করা হয় না। অর্থবিদ্যার আলোচ্য খাজনাকে 'অর্থনৈতিক খাজনা' (economic rent) বলা হয়।

'অর্থনৈতিক খাজনা' বলিতে ব্যাপক অর্থে উৎপাদনের কোন উপাদানের যোগানের সীমাবদ্ধতার জন্য যে-আয় তাহাকেই বুঝায়। জমির যোগান প্রাকৃতিক কারণে সীমাবদ্ধ। সুতরাং শুধুমাত্র জমির ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে যে-দাম দিতে হয়, তাহাকেই 'অর্থনৈতিক খাজনা' বলা হইবে। বিষয়টি আরও পরিস্কারভাবে বুঝানো দরকার। কোন জমি বা বাড়ী ভাড়া লওয়া হইলে মালিককে চুক্তি অনুযায়ী নিয়মিত খাজনা দিতে হয়। জমি বা বাড়ীর মালিক যে-খাজনা পায়, তাহার মধ্যে কতকগুলি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথমত, জমি বা বাড়ীর জন্য মালিক যে-মূলধন নিয়োগ করিয়াছে, তাহার জন্য সে সুদ আদায় করিয়া লয়। দ্বিতীয়ত, খাজনা আদায়-সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য মালিককে যে-ব্যয় করিতে হয়, তাহাও আদায় করা হয়। তৃতীয়ত, নিছক জমি বা বাড়ী ব্যবহারের জন্য মালিক অর্থ আদায় করে। এই তিনটি বিষয়ের সমষ্টিকে 'মোট খাজনা' (gross rent) বা 'চুক্তিবদ্ধ খাজনা' বলা হয়। মোট খাজনা হইতে প্রথম দুইটি বিষয় বাদ দিলে যে তৃতীয় বিষয়টি থাকে (অর্থাৎ, জমি বা বাড়ী ব্যবহারের জন্য দেয় অর্থ) তাহাই হইবে অর্থনৈতিক খাজনা।

অর্থনৈতিক খাজনাকে 'উৎপাদকের উদ্বৃত্ত' (producer's surplus) বলিয়া অভিহিত করা হয়। উৎপাদন-ব্যয়ের অতিরিক্ত যাহা কিছু থাকে, তাহাই হইতেছে

অর্থনৈতিক খাজনা। কোন জমি হইতে ২৫০ টাকার ফসল পাওয়া গেল এবং ঐ জমি চাষ করার জন্য মজুরি, সুদ, উৎপাদকের স্বাভাবিক মুনাফা ও অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যয় হইল ২২৫ টাকা। সুতরাং সকল প্রকার ব্যয় মিটাইবার পর উৎপাদকের উদ্বৃত্ত হইতেছে ২৫ টাকা এবং ইহাই হইতেছে অর্থনৈতিক খাজনা। এই উদ্বৃত্ত সৃষ্টির জন্য জমির মালিককে কোন কিছু করিতে হয় না, ইহা সম্পূর্ণ জমির দান এবং ইহা জমির মালিকেরই প্রাপ্য।

অর্থনৈতিক খাজনা সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দেখা যায়। ঐ মতভেদকে ভিত্তি করিয়া অর্থবিদ্যায় দুইটি প্রধান খাজনা-তত্ত্ব (যেমন—রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্ব ও আধুনিক খাজনা-তত্ত্ব) আলোচিত হয়। পরবর্তী অংশগুলিতে ঐ দুইটি খাজনা-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইল।

২. রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব (The Ricardian Theory of Rent): ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো (Ricardo) জমির খাজনা সম্পর্কে একটি তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। খাজনার সংজ্ঞা দিতে গিয়া তিনি উক্তি করিয়াছেন, জমির উৎপাদনের যে-অংশ উহার মৌলিক ও অবিনশ্বর ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়া হয়, তাহাই হইতেছে খাজনা ("Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use o the original and indestructible powers of the soil."—*Ricardo*) এই তত্ত্ব অনুসারে খাজনা হইতেছে প্রকৃতপক্ষে 'উৎপাদকের উদ্বৃত্ত' (producer's surplus) বা 'পার্থক্যজনিত লাভ' (differential gain)।

তত্ত্বটির অনুমানসমূহ: রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বে কতকগুলি অনুমান ধরা হয়:

(ক) খাজনা হইতেছে জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর ক্ষমতার প্রতিদান। বিভিন্ন জমির উৎপাদন-ক্ষমতা বা উর্বরতা এবং অবস্থানের পার্থক্যের জন্য জমির খাজনা দেখা দেয়।

(খ) জমির উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধি ক্রিয়া করে। বিভিন্ন জমির উৎপাদন-শক্তির তারতম্যের জন্যই একই ব্যয়ে উৎকৃষ্ট জমির তুলনায় নিকৃষ্ট জমিতে ফসলের পরিমাণ কম হইবে।

(গ) রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্বে জমির যোগানের বিষয়টি সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা হইয়াছে, কোন ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা বিবেচনা করা হয় নাই।

(ঘ) রিকার্ডোর তত্ত্বে আরও ধরা হইয়াছে, জমি প্রকৃতির দান বলিয়া ইহার কোন যোগান-দাম বা উৎপাদন-ব্যয় নাই। সুতরাং জমির খাজনা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নহে। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

উদাহরণসহ তত্ত্বটির ব্যাখ্যা: এই সকল অনুমানের ভিত্তিতে রিকার্ডো তাঁহার তত্ত্বে দেখাইয়াছেন, জমির উৎপাদন-শক্তির তারতম্য বা জমির অবস্থানের তারতম্যের

ফলে খাজনার উদ্ভব হয়। বিভিন্ন জমির উৎপাদন-শক্তি বিভিন্ন রূপে ; কোন কোন জমির উৎপাদন-শক্তি খুবই বেশি, আবার কোন কোন জমির উৎপাদন-শক্তি অপেক্ষাকৃত কম। জমির উৎপাদন-শক্তির এইরূপে তারতম্যের ফলে নিকৃষ্ট জমির তুলনায় একই ব্যয়ে উৎকৃষ্ট জমিতে অধিক উৎপাদন করা সম্ভব হয় এবং ঐ উদ্বৃত্ত উৎপাদনকে পার্থক্যমূলক (বা তারতম্যমূলক) খাজনা (differential rent) বলা হয়। ইহা ছাড়া, জমির অবস্থানের তারতম্যের জন্যও খাজনার উদ্ভব হইয়া থাকে। যেমন—কোন একটি জমি হয়তো বাজারের খুব নিকটেই আছে, আবার অপর একটি জমি বাজার হইতে কিছুটা দূরে আছে। ইহার ফলে বাজারের সন্নিকটস্থ জমিটি অপর জমিটির তুলনায় কিছু উদ্বৃত্ত-আয় ভোগ করিতে পারিবে ; কারণ ঐ জমির উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবহণ-ব্যয় (transport cost) নাই বা উহার পরিমাণ খুবই স্বল্প। এই খাজনাকে 'অবস্থান-জনিত খাজনা' (situation rent) বলা হয়।

আবার, জমির ক্ষেত্রে উৎপাদন-শক্তি বা অবস্থানের কোন তারতম্য না থাকিলেও খাজনার উদ্ভব হইতে পারে। জমির যোগান প্রাকৃতিক কারণে সীমাবদ্ধ। সুতরাং দীর্ঘকালীন সময়েও জমির খাজনা বৃদ্ধি পাইলেও ইহার যোগান বৃদ্ধি পাইবে না। ফলে দীর্ঘকালীন সময়েও জমির আয় অত্যধিক থাকিতে পারে। জমির সীমিত বা দুষ্প্রাপ্য যোগানের জন্য এই ধরনের খাজনার উদ্ভব ঘটে, ইহাকে দুষ্প্রাপ্যজনিত খাজনা (scarcity rent) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বে তারতম্য-জনিত খাজনার যে-বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, বিভিন্ন উৎপাদন-শক্তিসম্পন্ন তিনটি সমপরিমাণের ধানের জমি লওয়া হইল। সর্বপ্রথমে প্রথম মানের জমিটিতে ২০০ টাকা বিনিয়োগ করা হইল এবং ধান পাওয়া গেল ১০০ কিলোগ্রাম। সুতরাং প্রতি কিলোগ্রাম ধানের ব্যয় ও দাম হইল ২ টাকা। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অধিক ফসল উৎপাদনের প্রয়োজন দেখা দিল এবং ইহার ফলে দ্বিতীয় মানের জমি চাষ করার প্রয়োজন দেখা দিল। ঐ জমিতেও ২০০ টাকা বিনিয়োগ করা হইল, কিন্তু উৎপাদন হইল মাত্র ৫০ কিলোগ্রাম ধান (ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির প্রয়োগ)। সুতরাং ধানের বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইয়া হইবে ৪ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম। ইহার ফলে প্রথম জমিটিতে এখন উদ্বৃত্ত হইবে ২০০ টাকা (১০০ কি. গ্রা. × ৪ টাকা —২০০ টাকা = ২০০ টাকা)। ঐ ২০০ টাকাই হইবে প্রথম মানের জমিটির খাজনা। দ্বিতীয় জমিটিতে কোন উদ্বৃত্ত নাই ; সুতরাং ঐ অবস্থায় দ্বিতীয় জমিটিতে কোন খাজনা থাকিবে না। পরে তৃতীয় মানের জমি চাষ করার প্রয়োজন পড়িল, ঐ জমিতেও ২০০ টাকা বিনিয়োগ করা হইল। কিন্তু উৎপাদন হইল মাত্র ২৫ কিলোগ্রাম ধান। সুতরাং ধানের বাজার-দাম আরও বৃদ্ধি পাইয়া হইবে ৮ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম। ইহার ফলে প্রথম জমিটির খাজনা হইবে ৪০০ টাকা এবং দ্বিতীয় জমিটির খাজনা হইবে ২০০ টাকা। এইরূপ ক্ষেত্রে তৃতীয় জমিটিতে কোন উদ্বৃত্ত বা খাজনা নাই।

উহা হইতেছে প্রান্তিক জমি বা খাজনা-বিহীন জমি (marginal or no-rent land)। ইহা হইতে দেখা গেল, বিভিন্ন জমির উৎপাদন-শক্তি তারতম্যের জন্য উৎকৃষ্ট জমিতে খাজনা দেখা দিতেছে। নিম্নের রেখাচিত্রটিতে ইহা দেখানো হইল ঃ

চিত্র—৪৮
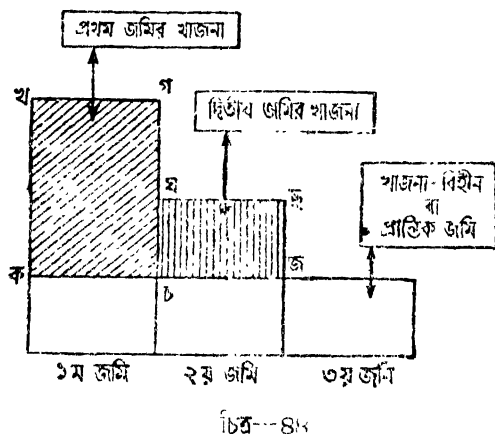
উপরের রেখাচিত্রটিতে দেখা যায় যে, ১ম জমিটির খাজনা হইতেছে **কখগচ**, ২য় জমিটির খাজনা হইতেছে **চঘঙজ**, ও ৩য় জমিটির কোন খাজনা নাই। কারণ ঐ জমিটিতে কোন উদ্বৃত্ত নাই। সুতরাং উহা হইতেছে খাজনা-বিহীন বা প্রান্তিক জমি।

সমালোচনা ঃ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি নানাভাবে সমালোচনা করা হয় ঃ

(১) রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্বটি শুধুমাত্র জমির খাজনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আধুনিক লেখকদের মতে, যে-সকল উপাদানের যোগান সীমাবদ্ধ সেইসকল ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক খাজনা দেখা দিতে পারে।

(২) জমির উৎপাদন-ক্ষমতা অবিনশ্বর, ইহা সত্য নহে। কারণ একই জমিতে বৎসরের পর বৎসর সার প্রয়োগ না করিয়া চাষের ব্যবস্থা করা হইলে উহার উৎপাদন-ক্ষমতা কমিতে বাধ্য।

(৩) রিকার্ডোর জমি-চাষের যে-পর্যায় (order of cultivation) দিয়াছেন, তাহাও বাস্তবোচিত নহে। অর্থাৎ, সর্বপ্রথম উৎকৃষ্ট জমি এবং পরে নিকৃষ্ট জমি চাষ করা হয়, ইহা সকল ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়।

(৪) রিকার্ডো খাজনা-বিহীন জমির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা বাস্তব জগতে দেখা যায় না। কারণ প্রত্যেক জমিরই কিছু-না-কিছু খাজনা থাকে।

(৫) ব্যয় বা দামের মধ্যে খাজনা প্রবেশ করে না—রিকার্ডোর এই প্রতিপাদ্য বিষয়টি ঠিক নহে। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যয়ের অন্যান্য বিষয়ের মত খাজনাও ব্যয় ও দামের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হয়।

৩. আধুনিক খাজনা তত্ত্ব (Modern Theory of Rent) ঃ আধুনিক কালের লেখকরা জমির আয় ছাড়াও অন্যান্য উপাদানের আয়ের ক্ষেত্রে খাজনা-তত্ত্ব প্রসারিত করিয়াছেন। খাজনা-তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য তাহারা 'অর্থনৈতিক খাজনা' (economic rent) ধারণাটি প্রবর্তন করেন। আধুনিক খাজনা-তত্ত্বটি নিম্নে বিভিন্ন অংশে আলোচনা করা হইল ঃ

(ক) **অর্থনৈতিক খাজনা ও স্থানান্তর আয়** ঃ মিসেস্ রবিনসন (Mrs Robinson) প্রমুখ আধুনিক লেখকরা কোন উপাদনের 'স্থানান্তর আয়ে'র (transfer earnings of a factor) পরিপ্রেক্ষিতে 'অর্থনৈতিক খাজনা' ধারণাটি বিশ্লেষণ করেন। তাঁহাদের মতে, কোন একটি উপাদান (শ্রম বা জমি বা মূলধন) উহার স্থানান্তর আয় অপেক্ষা যে-পরিমাণ অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত আয় উপার্জন করে (a payment in excess of its transfer earnings) তাহাই হইতেছে কোন বিশেষ শিল্প বা ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ হইতে অর্থনৈতিক খাজনা। এই প্রসঙ্গে বেন্হাম (Benham) মন্তব্য করিয়াছেন, কোন উপাদান উহার স্থানান্তর আয় অপেক্ষা যে-পরিমাণ অতিরিক্ত আয় ভোগ করে সাধারণভাবে তাহাই হইতেছে খাজনা। সুতরাং প্রশ্ন উঠে, স্থানান্তর আয় কি? কোন একটি উপাদান যাহাতে বর্তমান নিয়োগ হইতে পরবর্তী উত্তম বিকল্প (next-best alternative) কাজে সরিয়া না যায়, তাহার জন্য উপাদানটিকে যে ন্যূনতম পারিশ্রমিক দিতে হয় তাহাই হইতেছে স্থানান্তর আয়। সংক্ষেপে, পরবর্তী উত্তম বিকল্প কাজের আয়কে স্থানান্তর আয় বলা হয়। এই স্থানান্তর আয় অপেক্ষা যদি কোন উপাদান অধিক উপার্জন করে, তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত আয়কে অর্থনৈতিক খাজনা বলিয়া অভিহিত করা হইবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝানো যাইতে পারে ঃ

ধরা যাউক, কোন একটি জমিতে ধান বা পাট উৎপন্ন করা যায়। জমিটি যখন ধান উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন উহা হইতে আয় হয় ২০০ টাকা। কিন্তু জমিটি বর্তমানে পাট উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে এবং উহা হইতে আয় হইতেছে ২২৫ টাকা। এই ক্ষেত্রে জমিটির স্থানান্তর আয় হইতেছে ২০০ টাকা। ইহার অর্থ হইল, জমিটি যদি পাট-উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে অন্ততপক্ষে ২০০ টাকা আয় হইতে হইবেই তাহা না হইলে জমিটি ধান উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হইবে। এই উদাহরণে বর্তমানে জমিটির প্রকৃত আয় হইতেছে ২২৫ টাকা এবং স্থানান্তর আয় ২০০ টাকা। সুতরাং অর্থনৈতিক খাজনা হইবে ২৫ টাকা।

(খ) উপাদানের প্রকৃত উপার্জন ও ন্যূনতম যোগান-দাম ঃ অর্থনৈতিক খাজনার ধারণাটি অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। এই অর্থে, কোন উপাদানের প্রকৃত উপার্জন ও ন্যূনতম যোগান-দামের যে-ব্যবধান তাহাই হইতেছে অর্থনৈতিক খাজনা (Economic rent is the difference between the actual earnings and its minimum supply price—*Ryan*)। কোন উপাদান একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে

উহার সেবাকার্য বিক্রয় করিয়া যে-দাম পায়, তাহাই হইতেছে উপাদানটির প্রকৃত উপার্জন। পক্ষান্তরে, বর্তমানে কাজে কোন উপাদানকে ধরিয়া রাখিতে হইলে যে ন্যূনতম অর্থ প্রদান করিতে হয় তাহাই হইতেছে উপাদানটির যোগান-দাম। কোন উপাদান এই ন্যূনতম যোগান-দাম অপেক্ষা যে-পরিমাণ অধিক উপার্জন করে, তাহাই হইবে অর্থনৈতিক খাজনা। ধরা যাউক, কোন একজন কাঠের মিস্ত্রীকে কাজে নিযুক্ত রাখিতে হইলে সপ্তাহে অন্তত ১৪০ টাকা দিতে হইবে (অর্থাৎ ন্যূনতম যোগান দাম ১৪০ টাকা)। কিন্তু বর্তমানে সে কাজ করিয়া সপ্তাহে ১৭৫ টাকা উপার্জন করিতেছে। সুতরাং, অর্থনৈতিক খাজনা হইতেছে প্রতি সপ্তাহে ৩৫ টাকা। এই অর্থে কোন উপাদানের ন্যূনতম যোগান-দাম অপেক্ষা প্রকৃত উপার্জন অধিক হইলে মজুরি বা সুদ বা মুনাফার ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক খাজনা দেখা দিতে পারে।

(গ) **অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভবের কারণ**ঃ আধুনিক লেখকদের মতে অর্থনৈতিক খাজনা বা উদ্বৃত্ত-আয়ের উদ্ভব তখনই হইতে পারে, যখন কোন উপাদানের যোগান অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক (relatively inelastic) হয় এবং যখন ঐ উপাদানটি নির্দিষ্ট কোন নিয়োগের বিশেষ উপযোগী (specific) হয়। কোন উপাদানের যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic) হইলে একই দামে ঐ উপাদানটির বিভিন্ন একক নিয়োগ করা যায়। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে উপাদানের প্রকৃত উপার্জন বা বাজার-দাম ন্যূনতম যোগান-দামের মধ্যে কোন পার্থক্য বা উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে না। ফলে কোন উপাদানের এককই যোগান-দামের অতিরিক্ত কিছু পায় না বা অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভব হয় না। কিন্তু উপাদানের যোগান অস্থিতিস্থাপক হইলে উহা বেশী পরিমাণে নিয়োগ করিতে হইলে অধিক দাম দিতে হয়। অর্থাৎ, উপাদানের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে উহার প্রকৃত উপার্জন বা বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে উহার আয়-উদ্বৃত্ত বা অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভব ঘটিবে।

আবার, উপাদানের বিনিয়োগের বিনির্দিষ্টতার (specificity) জন্যও অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভব ঘটে। যখন কোন উপাদান বিশেষীকৃত (specialised) ধরনের হয় এবং যখন উহা কোন দ্রব্য বা সেবাকার্য উৎপাদনের ব্যাপারে একরূপ অপরিহার্য হয়, তখন কোন উপাদান 'বিনির্দিষ্ট' হইয়া পড়ে। এইরূপ ক্ষেত্রে উপাদানটির কোন বিকল্প থাকে না বা উহার পরিবর্তে অন্য উপাদান নিয়োগ করা যায় না। সুতরাং বিনির্দিষ্ট উপাদানটির সেবাকার্যের চাহিদা বৃদ্ধিপাইলে স্বল্পকালীন সময়ে উহার প্রকৃত উপার্জন যোগান-দাম অপেক্ষা কিছুটা বেশী হইতে পারে বা উহার প্রকৃত উপার্জনে উদ্বৃত্ত (বা অর্থনৈতিক খাজনা) দেখা দিতে পারে। সুতরাং দেখা যায়, উপাদানের যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা এবং উহার নিয়োগের বিনির্দিষ্টতার জন্যই খাজনার উদ্ভব হয়।

প্রাচীন লেখকদের মতে, একমাত্র জমির যোগানই অস্থিতিস্থাপক এবং সকল

অবস্থায় জমির নিয়োগের বিনির্দিষ্টতা দেখা যায়। কিন্তু আধুনিক লেখকদের মতে, অন্যান্য উপাদানের যোগান অস্থিতিস্থাপক এবং উহাদের নিয়োগও বিনির্দিষ্ট হইতে পারে। যেমন—বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন গায়ক বা চিত্রাভিনেতা বা চিত্রাঙ্কনবিদের যোগান সীমাবদ্ধ—অধিক দাম দিলেও ইহাদের যোগান বৃদ্ধি করা যায় না। আবার স্বল্প-কালীন অবস্থায় কোন বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির যোগান বৃদ্ধি করা যায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে ইহাদের পরিবর্তে অন্য কোন উপাদান নিয়োগ করা যায় না এবং ইহাদের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে স্বল্পকালীন সময়ে ইহাদের প্রকৃত উপার্জন বৃদ্ধি পাইয়া উহাতে উদ্বৃত্ত বা অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভব ঘটে। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে উপাদানের স্থানান্তর আয় শূন্য (zero) হইয়া পড়ে এবং সেইসকল ক্ষেত্রে উপাদানটির আয়ের সমগ্র অংশই অর্থনৈতিক খাজনা। যেমন—কোন প্রখ্যাত অন্ধ-গায়কের সাধারণত কোন বিকল্প কাজ থাকে না বলিয়া তাহার স্থানান্তর বা বিকল্প আয় শূন্য হয়। সুতরাং সংগীত হইতে তাহার উপার্জনের সম্পূর্ণটাই উদ্বৃত্ত বা অর্থনৈতিক খাজনা। ইহা হইতে দেখা যায়, সকল প্রকার উপাদান-আয়ের ক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অর্থনৈতিক খাজনা দেখা দিতে পারে। এ সম্পর্কে পরে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

আধুনিক খাজনা তত্ত্বটি নিম্নের রেখাচিত্রে দেখানো যাইতে পারে:

নিম্নের রেখাচিত্রটিতে **চচ´** ও **যয´** যথাক্রমে শ্রমের চাহিদা ও যোগান রেখা। রেখাচিত্রটিতে দেখা যায়, **কব** শ্রমের যোগান-দাম হইতেছে **বত**, কিন্তু প্রকৃত
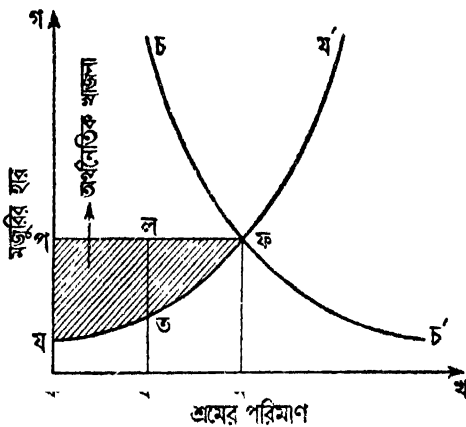
চিত্র-৪৫

উপার্জন হইতেছে **বল** (অর্থাৎ, চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত ভারসাম্য মজুরি **মফ**)। সুতরাং ঐ পরিমাণ শ্রমের অর্থনৈতিক খাজনা হইতেছে **তল**। কিন্তু **কম** একক শ্রমের কোন উদ্বৃত্ত-আয় নাই, কারণ ঐ ক্ষেত্রে প্রকৃত উপার্জন (**মফ**) এবং যোগান-দাম (**মফ**) পরস্পর সমান হইতেছে। **কম** মোট পরিমাণ শ্রমের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত-আয় বা অর্থনৈতিক খাজনা হইতেছে **যপফ** ক্ষেত্রটি।

৪. **রিকার্ডীয় খাজনা-তত্ত্ব ও আধুনিক খাজনা-তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য (Difference between the Ricardian Theory and the Modern Theory of Rent)** ঃ রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্ব ও আধুনিক খাজনা-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিলে উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখা যায় ঃ

(ক) **তত্ত্ব দুইটির আলোচনা ক্ষেত্র** ঃ রিকার্ডো তাঁহার খাজনা-তত্ত্বটি জমির খাজনার ক্ষেত্রে সীমায়িত করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক লেখকরা খাজনা তত্ত্বটি সকল প্রকার উপাদানের আয়ের মধ্যে যে-খাজনা দেখা যায়, সেইসকল ক্ষেত্রে উহা প্রসারিত করিয়াছেন। সুতরাং আধুনিক তত্ত্বে খাজনা জমির কোন বিশেষ আয় বলিয়া ধরা হয় না। যে-সকল উপাদানের যোগান অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক বা কম স্থিতিস্থাপক হয়, সেই সকল উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনার উদ্ভব ঘটিতে পারে; অর্থাৎ, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মজুরি, সুদ ও মুনাফার মধ্যেও খাজনা-উপাদান থাকিতে পারে।

(খ) **খাজনার উদ্ভব** ঃ বিভিন্ন জমির উৎপাদন-ক্ষমতা বা অবস্থানের তারতম্যের ফলে খাজনার উদ্ভব ঘটে—ইহাই রিকার্ডোর তত্ত্বে দেখানো হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক তত্ত্বে দেখানো হইয়াছে, উপাদানের স্থিতিস্থাপক যোগান বা বিনির্দিষ্টতার (specificity) জন্য খাজনার উদ্ভব হয়। সুতরাং খাজনার উদ্ভবের কারণ দুইটি তত্ত্বে দুই রকম ভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

স্থানান্তর আয় : জমির উৎপাদনের জন্য কোন ব্যয় হয় না এবং ইহার ফলে জমির কোন যোগান-দাম নাই—ইহাই রিকার্ডোর তত্ত্বে ধরা হইয়াছে। সমগ্র অর্থব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে রিকার্ডোর এই ধারণাটি সত্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষের বা কোন ফার্ম-এর দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, জমির একটি ন্যূনতম যোগান-দাম আছে। আবার রিকার্ডো ধরিয়াছেন, কোন জমির কোন বিকল্প ব্যবহার নাই। সুতরাং ইহার কোন স্থানান্তর বা বিকল্প আয় থাকিতে পারে না। কিন্তু আধুনিক লেখকরা দেখাইয়াছেন, কোন জমির নানারূপে বিকল্প ব্যবহার থাকিতে পারে; অর্থাৎ ধানের জমিতে গম বা পাট বা তৈলবীজ উৎপাদন করা যায়। সুতরাং জমিরও বিকল্প বা স্থানান্তর আয় থাকিতে পারে।

(ঘ) **খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক** ঃ রিকার্ডোর মতে, উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা যাহা বেশী পাওয়া যায়, তাহাই হইতেছে খাজনা। সুতরাং উৎপাদন-ব্যয় বা দামের মধ্যে খাজনা যুক্ত হয় না অর্থাৎ খাজনা, ব্যয় বা দামের মধ্যে প্রবেশ করে না। কিন্তু আধুনিক লেখকরা দেখাইয়াছেন, কোন ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যয়ের অন্যান্য বিষয়ের মতোই খাজনাও ব্যয়ের একটি উপাদান। সুতরাং, ইহা ব্যয় ও দামের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ সম্পর্কে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

উপসংহার : রিকার্ডোর তত্ত্বটির নানারূপ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ইহা পরিহার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে স্টোনিয়ার ও হেগ (Stonier & Hague) মন্তব্য করিয়াছেন, **স্থানান্তর** আয়ের ধারণাটি সহজ রিকার্ডীয় খাজনা-তত্ত্বটিকে বাস্তব অবস্থার সহিত **ঘনিষ্ট সম্পর্ক** স্থাপন করিতে সাহায্য করে (The concept of transfer earnings helps to bring the simple Ricardian Theory of Rent into close relation with reality.)।

৫. খাজনা ও দাম বা ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Rent and Price or Cost) : খাজনা ও দামের (বা ব্যয়ের) মধ্যে যে-সম্পর্ক দেখা যায় তাহা দুইটি পরস্পর বিরোধী মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়—(ক) রিকার্ডোর মতবাদ এবং (খ) আধুনিক মতবাদ। এই সম্পর্কটি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(ক) **রিকার্ডোর মতবাদ :** রিকার্ডোর মতে, কৃষিপণ্যের ব্যয় বা দামের মধ্যে খাজনা কোনভাবেই যুক্ত হয় না। পক্ষান্তরে, দাম বৃদ্ধির ফলে খাজনার উদ্ভব ঘটে। তাই তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, খাজনা দেওয়া হয় বলিয়া শস্যের দাম অধিক হয় না, কিন্তু শস্যের দাম অধিক হয় বলিয়া খাজনা দিতে হয় (Corn is not high because a rent is paid, but rent is paid because corn is high.) এই সিদ্ধান্তের পক্ষে রিকার্ডোর যুক্তিটি বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। প্রতিযোগিতার অবস্থায় কৃষিপণ্য বা শিল্পদ্রব্যের দাম উহার প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। রিকার্ডোর তত্ত্বে প্রান্তিক ব্যয় বলিতে প্রান্তিক জমিতে যে উৎপাদন-ব্যয় হয়, তাহাকেই বুঝায়। কিন্তু প্রান্তিক জমিতে কোনরূপ খাজনা থাকে না, ইহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে। সুতরাং প্রান্তিক জমিতে যে উৎপাদন-ব্যয় হয়, তাহার মধ্যে খাজনা বলিয়া কোন বিষয় থাকে না। ইহা হইতে রিকার্ডো সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন, খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত কোনরূপ বিষয় নহে।

পক্ষান্তরে, রিকার্ডোর তত্ত্বে দাম বৃদ্ধির ফলেই খাজনার বৃদ্ধি ঘটে। প্রান্তিক ব্যয়ের বৃদ্ধি বা চাহিদার বৃদ্ধির ফলে শস্যের দাম বৃদ্ধি পাইলে উচ্চমানের জমিতে উদ্বৃত্ত-অংশ বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে ঐ সকল জমিতে খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার, চাহিদা-হ্রাসের ফলে দাম হ্রাস পাইলে উচ্চমানের জমিতে উদ্বৃত্ত বা খাজনা হ্রাস পায়। সুতরাং, জমির খাজনা শস্যের ব্যয় বা দাম নির্ধারণ করে না ; পক্ষান্তরে, দামের দ্বারাই খাজনা নির্ধারিত হয় (Rent is price-determined and not a price-determining cost.)।

কিন্তু রিকার্ডোর এই অভিমত কেবলমাত্র সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। বস্তুতপক্ষে রিকার্ডো জমির খাজনার বিষয়টি সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতেই বিবেচনা করিয়াছেন। জমি প্রকৃতির দান বলিয়া সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে জমির উৎপাদন-ব্যয় থাকে না এবং ইহার ফলে জমির কোন যোগান-দাম থাকে না কিন্তু শ্রম বা মূলধনের উৎপাদন-ব্যয় ও যোগান দাম আছে।

শ্রমিককে প্রতিপালন করিতে হয়, সুতরাং কোনরূপে মজুরি না দেওয়া হইলে শ্রমের যোগান হ্রাস পাইবে। আবার মূলধন হইতেছে প্রতীক্ষার (waiting) ফল। সুতরাং কোনরূপে সুদ প্রদান না করা হইলে ঋণ-মূলধনের যোগান হ্রাস পাইবে, কিন্তু কোনর খাজনা না দেওয়া হইলে জমির যোগান হ্রাস পাইবে না। সুতরাং সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে জমির কোনরূপ উৎপাদন-ব্যয় থাকিতে পারে না এবং ইহার ফলে জমির খাজনা, ব্যয় বা দামের কোন অংশই নয়। পক্ষান্তরে, খাজনা হইতেছে প্রতি-যোগিতার অবস্থায় দাম-পরিবর্তনের ফল (the result of the price) অর্থাৎ দামের পরিবর্তনের ফলে খাজনার পরিবর্তনের ঘটে।

আধুনিক মতবাদ ঃ কিন্তু রিকার্ডোর এই যুক্তি ও বিশ্লেষণ আধুনিক লেখকরা গ্রহণ করে না। তাঁহাদের মতে, জমির কোন যোগান-দাম নাই—ইহা সকল অবস্থায় ঠিক বা সত্য নহে। কোন দেশের বা সমাজের বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ হইতে জমির কোন যোগান-দাম না থাকিতে পারে, কিন্তু কোন বিশেষ শিল্পে বা ব্যবহারের ষ্টিকোণ হইতে জমির যোগান-দাম থাকিবে। যেমন, কোন একটি জমির নানারূপ ব্যবহার থাকিতে পারে। কোন এক উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করা হইলে তাহা বিকল্প কাজের জন্য পাওয়া যায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে জমির যোগান-দাম বা স্থানান্তর-আয় (transfer earnings) থাকিবেই। কোন একটি জমিতে ধান বা গম চাষ করা সম্ভব হইলে উহা যদি ধান-চাষের জন্য ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে উহা গম-চাষের জন্য পাওয়া যাইবে না। সুতরাং জমিটিতে ধানের পরিবর্তে গম উৎপন্ন করিতে হইলে স্থানান্তর ব্যয় (transfer cost) হইবে এবং উহা উৎপাদন-ব্যয়ের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িবে; অবশেষে উহা দ্রব্যমূল্যেরও অংশবিশেষ হইবে। সুতরাং দেখা যায়, জমির একাধিক ব্যবহার আছে—এইরূপ ধরা হইলে কোন একটি বিশেষ-ব্যবহারের জন্য যে-খাজনা দিতে হয়, তাহা ব্যয় ও দামের অংশ হইয়া পড়ে। এই কারণেই কেয়ার্নক্রশ (Cairncross) মন্তব্য করিয়াছেন, জমির একক ব্যবহারের ক্ষেত্রে চাষকার্যের প্রান্তসীমায় (margin of cultivation) খাজনা, ব্যয় ও দামের অন্তর্ভুক্ত না-ও হইতে পারে, কিন্তু জমির একাধিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানান্তরের প্রান্তসীমায় (margin of transference) খাজনা, ব্যয় ও দামের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে।

আবার, কোন ফার্ম-এর (the individual firm) দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, খাজনা উৎপাদন-ব্যয় ও দামের অংশ হইয়া পড়ে। কোন ফার্মকে যেরূপ মজুরি, সুদ, কাঁচামাল ইত্যাদির জন্য ব্যয় করিতে হয়, সেইরূপ জমি বা কারখানার জন্য খাজনা দিতে হয়। ব্যয়ের অন্যান্য বিষয়ের জন্য জমির দেয় খাজনা উৎপাদন-ব্যয়ের অংশবিশেষ হইয়া পড়ে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল, সমাজের বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ হইতে বা জমির একক ব্যবহার আছে এইরূপ দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার-বিবেচনা করা হইলে

১ Cairncross—*Introduction to Economics*, Chap. 22

জমির খাজনা, ব্যয় বা দামের অংশ হয় না। কিন্তু কোন ফার্ম-এর বা জমির বিকল্প ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ হইতে খাজনা, ব্যয় ও দামের অংশ হইয়া পড়ে। এই কারণে অধ্যাপক স্যামুয়েলসন (Samuelson) মন্তব্য করিয়াছেন, জমির খাজনা দাম-নির্ধারণকারী ব্যয় হইবে কি-না তাহা নির্ভর করে কোন্ দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করা হইতেছে (Whether rent is or is not price-determining cost, depends upon the view-point from which we look at—*Samuelson*)।

৬. **অন্যান্য উপাদানের আয়ের ক্ষেত্রে খাজনা-উপাদান (Rent element in other Factor-Incomes)**: রিকার্ডো (Ricardo) প্রমুখ লেখকরা কেবলমাত্র জমির ক্ষেত্রে খাজনার বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু আধুনিককালের লেখকরা দেখাইয়াছেন, জমি ছাড়াও অন্যান্য উপাদানের (যেমন, শ্রম, বা মূলধন বা উদ্যোক্তা) আয়ের ক্ষেত্রেও অল্পবিস্তর খাজনার অংশ দেখা যায়। জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক বলিয়া উহার আয়ের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত বা খাজনার অংশ দেখা দিতে পারে। বস্তুতপক্ষে যে-কোন উপাদান উহার স্থানান্তর আয় বা ন্যূনতম যোগান-দাম অপেক্ষা অধিক উপার্জন করিলে তাহাই ঐ উপাদানটির আয়ের খাজনা-উপাদান হইবে। জমি ছাড়া অন্যান্য উপাদানের আয়ের ক্ষেত্রে যে-খাজনার অংশ দেখা যাইতে পারে, তাহা নিম্নে কয়েকটি অংশে আলোচনা করা হইল ঃ

(ক) **মজুরির মধ্যে খাজনার অংশ ঃ** শ্রমিকের মজুরির মধ্যে খাজনার অংশ দেখা যায়। যে-সকল শ্রমিকের যোগান অপেক্ষাকৃত অধিক অস্থিতিস্থাপক বা যে-সকল শ্রমিকের যোগানের তুলনায় চাহিদা অনেক বেশী বা যে-সকল শ্রমিকের সেবাকার্য বিনির্দিষ্ট সেই সকল শ্রমিকের মজুরিতে খাজনার অংশের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। প্রত্যেক শ্রমিকেরই সেবাকার্যের একটি ন্যূনতম যোগান-দাম থাকে এবং শ্রমিক যখন ঐ দামের অধিক কিছু পায় তখন তাহার মজুরিতে খাজনার অংশ দেখা দিবে। আবার, কোন কোন শ্রমিক বিশেষ নিপুণতা বা বিশেষ দক্ষতার জন্য সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা অনেক বেশী পায়। ইহাকে 'নৈপুণ্যের খাজনা' (rent of ability) বলা হয়। ইহা ছাড়া, যোগানের তুলনায় সমাজে চাহিদা অনেক বেশী বলিয়া প্রখ্যাত চিত্রতারকা বা চিত্রশিল্পী বা গায়ক বা খেলোয়াড় প্রভৃতি ব্যক্তিদের আয়ে এক বিরাট উদ্বৃত্ত বা খাজনার অংশ দেখা যায়। বিশেষ প্রতিভার অধিকারী বলিয়া সমাজে ইহাদের যোগান অপেক্ষাকৃত অধিক অস্থিতিস্থাপক হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, বিকল্প কাজের সুযোগ বিশেষ নাই বলিয়া কোন প্রখ্যাত অন্ধ গায়কের আয়ের সম্পূর্ণ অংশই উদ্বৃত্ত বা খাজনা হইয়া পড়ে। সাধারণভাবে বলা যায়, যে-সকল শ্রমিকের বিশেষায়ণ বা বিনির্দিষ্টতা যত বেশী তাহাদের আয়ে খাজনার অংশ তত বেশী হইয়া থাকে।

বিভিন্ন শ্রমিকের মজুরির মধ্যে খাজনার অংশ অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন পরিমাণ হইয়া থাকে। ইহা পরপৃষ্ঠার তালিকায় দেখানো হল ঃ

মজুরিতে খাজনার অংশ

শ্রমিক	মজুরি	শ্রমের যোগান-দাম	মজুরিতে খাজনার অংশ
'ক'	২০ টাকা	১০ ,,	১০ ,,
'খ,	১৫ ,,	১০ ,,	৫ ,,
'গ'	১২ ,,	১০ ,,	২ ,,
'ঘ'	১০ ,,	১০ ,,	০ ,,

'ক', 'খ', 'গ', ও 'ঘ'—এই চারজন শ্রমিকের মজুরিতে অর্থনৈতি কখাজনা অংশ দেখানো হইয়াছে। প্রত্যেকটি শ্রমিকের শ্রমের যোগান-দাম ১০ টাকা, কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে তাহারা বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকিয়া বিভিন্ন হারে মজুরি পাইতেছে এবং ইহার ফলে তাহাদের মজুরিতে খাজনার অংশ বিভিন্ন পরিমাণ হইতেছে। 'ঘ' শ্রমিকের মজুরিতে কোনরূপ খাজনার অংশ নাই।

শ্রমিকের মজুরির খাজনার অংশটি ২৯৩ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রেও দেখানো হইয়াছে।

(খ) **সুদের মধ্যে খাজনার অংশ**ঃ শ্রমিকের মজুরির মতো ঋণ-মূলধনের (loanble fund) সুদের মধ্যেও কখনও কখনও উদ্বৃত্ত বা খাজনার অংশ দেখা যাইতে পারে। শ্রমিকের শ্রমের ন্যায় ঋণ-মূলধনের ব্যবহারেরও একটি ন্যূনতম যোগান-দাম আছে। ঋণ-মূলধনের চাহিদা হঠাৎ বাড়িয়া যাওয়ার ফলে বাজারের প্রচলিত সুদের হার ঐ যোগান-দাম অপেক্ষা অধিক হইতে পারে। তাহা হইলে সুদের মধ্যে যে-উদ্বৃত্ত দেখা দিবে, তাহাই হইবে সুদের মধ্যে খাজনার অংশ। ধরা যাউক, কোন ব্যক্তি বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা সুদের হারে ঋণ-মূলধন যোগান দিতে রাজী থাকে। কিন্তু বাজারে উহার যোগান কম বা চাহিদা বেশী থাকায় সুদের হার হইতেছে বার্ষিক শতকরা ১৪ টাকা। এইরূপ ক্ষেত্রে শতকরা ৪ টাকা হইবে সুদের মধ্যে খাজনার অংশবিশেষ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য স্বল্পকালীন সময়ে ঋণ-মূলধনের যোগান অল্পবিস্তর সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়াই এই উদ্বৃত্ত-আয়ের উদ্ভব ঘটে।

(গ) **মুনাফার মধ্যে খাজনার অংশ**ঃ উদ্যোক্তার মুনাফার মধ্যেও খাজনার অংশ দেখা যাইতে পারে। স্বল্পকালীন সময়ে সুদক্ষ ও কুশলী উদ্যোক্তার যোগান সীমাবদ্ধ থাকার জন্য ঐ সকল উদ্যোক্তারা উদ্বৃত্ত-আয় ভোগ করিতে পারে অর্থাৎ স্বাভাবিক মুনাফার অধিক আয় উপার্জন করিতে সক্ষম হইবে। ঐ উদ্বৃত্ত আয় হইতেছে মুনাফার মধ্যে খাজনার অংশ। ইহা ছাড়া, পরিচালন-দক্ষতার তারতম্যের জন্যও উদ্যোক্তার মুনাফার মধ্যে খাজনার অংশ আসিতে পারে। অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোক্তারা অন্যান্য সাধারণ উদ্যোক্তার তুলনায় অধিক মুনাফা উপার্জন করে এবং ঐ উদ্বৃত্ত মুনাফাই হইতেছে খাজনার অনুরূপ।

জমির খাজনা ও অন্যান্য উপাদানের আয়ের খাজনার মধ্যে পার্থক্য : সুতরাং দেখা যায়, মজুরি, সুদ ও মুনাফার মধ্যেও খাজনার উপাদান থাকিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে জমির খাজনা এবং অন্যান্য আয় একই বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়। উপাদানের যোগানের সীমাবদ্ধতা বা অস্থিতিস্থাপকতার জন্য সকল প্রকার উপাদান-আয়ের মধ্যে খাজনার অংশ দেখা যায়। কিন্তু জমির আয়ের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত অংশ স্থায়ী হয় এবং উহা দীর্ঘকালীন সময়েও দেখা যায়। কারণ ইহার যোগান দীর্ঘকালীন সময়েও সীমাবদ্ধ থাকে; কিন্তু অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যে যে-উদ্বৃত্ত বা খাজনা দেখা যায় তাহা কেবলমাত্র স্বল্পকালীন সময়েই সম্ভব। কারণ দীর্ঘকালীন অবস্থায় উহাদের যোগান বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই কারণেই অধ্যাপক মার্শাল জমির খাজনাকে স্বতন্ত্রভাবে না দেখিয়া একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্যতম শাখা বলিয়া গণ্য করার নির্দেশ দিয়াছেন ("The rent of land is seen, not as a thing by itself but as a leading species of a large genus".—*Marshall.*)

৪. **খাজনা ও আধা-খাজনা বা অপূর্ণাঙ্গ খাজনা (Rent and Quasi-Rent) :** রিকার্ডো (Ricardo) ও তাঁহার অনুগামীরা জমির খাজনাকে 'তারতম্যজনিত আয়' বা 'উৎপাদকের উদ্বৃত্ত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, দীর্ঘকালীন সময়েও জমির যোগান সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া কেবলমাত্র জমির ক্ষেত্রে এই খাজনা বা উদ্বৃত্ত আয় দেখা দেয়।

কিন্তু জমি ছাড়াও অন্যান্য কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ক্ষেত্রে স্বল্পকালীন সময়ে এই উদ্বৃত্ত আয় দেখা দিতে পারে। এই প্রসঙ্গেই অধ্যাপক মার্শাল (Marshall) সর্বপ্রথম 'আধা-খাজনা' বা 'অপূর্ণাঙ্গ খাজনা'র ধারণাটি বিশ্লেষণ করেন। মানুষ কর্তৃক তৈয়ারী উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম মূলধন-দ্রব্যসামগ্রীর (man-made appliances and capital goods) ক্ষেত্রে এই 'আধা-খাজনা' দেখা যায়। মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা স্বল্পকালীন সময়ে উহা হইতে যে-অধিক আয় পাওয়া যায় তাহাকেই 'আধা-খাজনা' বলা হয়। অর্থাৎ, যন্ত্রপাতি ও মানুষ কর্তৃক তৈয়ারী উৎপাদনের সাজসরঞ্জামের 'স্বল্পকালীন নীট আয়' (the short-run net earnings of machines and man-made appliances) হইতেছে 'আধা-খাজনা'। জমির আয় হইতেছে সম্পূর্ণ বা প্রকৃত খাজনা, কিন্তু মানুষ-সৃষ্ট যন্ত্রপাতির স্বল্পকালীন নীট আয় হইতেছে 'আধা-খাজনা'। স্বল্পকালীন সময়ে এই সকল মূলধন-সামগ্রী ও যন্ত্রপাতির যোগান একরূপ স্থির থাকে; সুতরাং জমির খাজনার মতো ইহাদের আয়ও একটি উদ্বৃত্ত-অংশ থাকে। এই কারণে জমির খাজনা ও ইহাদের আয়ের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

কিন্তু জমির যোগান স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন—উভয় সময়-মেয়াদেই সীমাবদ্ধ থাকে। মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের যোগান স্বল্পকালীন সময়ে একরূপ

স্থির থাকে। সুতরাং উহাদের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে ইহারা অধিক আয় উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে ইহাদের যোগান বৃদ্ধি পায় বলিয়া ঐ দ্রব্যগুলি হইতে উদ্ভূত আয় স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায় এবং তখন উহাদের আয়ের মধ্যে উদ্বৃত্ত-অংশ বা খাজনা-উপাদান আর দেখা যাইবে না। সুতরাং দেখা যায়, জমির খাজনা ও আধা-খাজনার মধ্যে যেরূপ সাদৃশ্য আছে সেইরূপ পার্থক্যও রহিয়াছে। স্বল্পকালীন সময়ে যন্ত্রপাতির আয় অনেকটা জমির খাজনারই অনুরূপ, তাই ইহাকে খাজনা বলা হইতেছে ; কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে উহা থাকে না বলিয়া তাহা 'অপূর্ণাঙ্গ' বা 'আধা' হইয়া পড়িতেছে।

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে মার্শাল 'আধা-খাজনা' বিষয়টি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মাছ ধরিবার জন্য প্রয়োজন পড়ে মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট নৌকা ও জালের। স্বল্পকালীন সময়ে নৌকা ও জালের যোগান একরূপ স্থির থাকে। সুতরাং মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে উহার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় নৌকা ও জাল হইতে প্রাপ্ত আয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে এবং তখন উহাতে উদ্বৃত্ত-অংশ দেখা দিবে। কিন্তু দীর্ঘ-কালীন সময়ে অধিক সংখ্যায় নৌকা ও জাল তৈয়ারীর ফলে উহাদের আয় স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। সুতরাং, নৌকা ও জালের স্বল্পকালীন আয় হইতেছে 'আধা-খাজনা'।

আধুনিক লেখকরা আধা-খাজনার তত্ত্বটি অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। শহরাঞ্চলে হঠাৎ যদি কোন কারণে বাড়ীঘরের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সাময়িকভাবে বাড়ীভাড়া বহু গুণ বাড়িয়া যাইবে। এই অবস্থায় বাড়ীঘরের যে নীট-আয় হইবে, তাহাই হইবে অপূর্ণাঙ্গ খাজনা। কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য নূতন নূতন বাড়ীঘর নির্মিত হইবে। ফলে বাড়ীভাড়া স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়া আসিবে। অনুরূপভাবে সুদক্ষ ও বিশেষীকৃত কর্মীর ক্ষেত্রেও এই ধারণাটি প্রয়োগ করা যায়। যেমন—কোন কারণে যদি সমাজে ইঞ্জিনিয়ার-এর চাহিদা বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়। তাহা হইলে তাহাদের আয় বিশেষ বাড়িয়া যাইবে এবং ইঞ্জিনিয়াররা তাহাদের স্থানান্তর আয় (transfer earnings) অপেক্ষা যাহা বেশী উপার্জন করে, তাহাই হইবে অপূর্ণাঙ্গ খাজনা।

দামতত্ত্বের ক্ষেত্রেও অপূর্ণাঙ্গ খাজনা ধারণাটির প্রয়োগ দেখা যায়। স্বল্পকালীন সময়ে কোন প্রতিযোগী ফার্ম-এর ন্যূনতম দাম হইতেছে উহার উৎপাদনের গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়। ঐ ব্যয় হইতে কোন ফার্ম স্বল্পকালীন সময়ে যাহা অধিক দাম পাইয়া থাকে তাহাকেই অপূর্ণাঙ্গ খাজনা বলিয়া অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ অপূর্ণাঙ্গ খাজনা = দ্রব্যের স্বল্পকালীন দাম—গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়।[১]

পরিশেষে বলা যায়, জমির খাজনা ও অপূর্ণাঙ্গ খাজনার মধ্যে কোনরূপ মূলগত পার্থক্য নাই। উভয়ের উদ্ভব হয় উপাদানের যোগানের অস্থিতিস্থাপকতার জন্য। জমির খাজনা অবশ্য দীর্ঘকালীন অবস্থায়ও বজায় থাকে। কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ খাজনা দীর্ঘকালীন অবস্থায় টিকিয়া থাকে না।

---

১. পৃঃ ২৬৫ দ্রষ্টব্য

৮. **খাজনা ও অর্থনৈতিক প্রগতি** (**Rent and Economic Progress**) **:** খাজনা ও অর্থনৈতিক প্রগতির মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি কয়েকটি অংশে আলোচনা করা যাইতে পারে।

(ক) **খাজনার উপর উন্নত কৃষিপদ্ধতির প্রভাব :** অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে কৃষিপদ্ধতির উন্নতি ঘটিয়া থাকে। ইহার ফলে খাজনার উপর বিভিন্ন ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হয়। কৃষিপদ্ধতি উন্নত হওয়ার ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় এবং কৃষিপণ্যের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বাজারে কৃষিপণ্যের দাম হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে। ঐ দাম হ্রাস পাইলে খাজনার পরিমাণ হ্রাস পাইবে। উন্নত কৃষিপদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের জমির উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে খাজনা হ্রাসের পরিমাণ অধিক হইবে। কিন্তু উন্নত কৃষিপদ্ধতির ফলে কেবলমাত্র অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের জমি উপকৃত হইলে উচ্চমানের জমিতে উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে খাজনার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

(খ) **খাজনার উপর উন্নত পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রভাব :** অর্থনৈতিক প্রগতির আর একটি দিক হইতেছে দেশের পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি। উন্নত পরিবহণ-ব্যবস্থার ফলে দেশের দূরে দূরে স্থান হইতে বাজারে কৃষিপণ্য সহজেই আনা যাইবে। ইহার ফলে দূর অঞ্চলের উচ্চমানের জমির যে অবস্থানগত অসুবিধা (situational disadvantages) ছিল তাহা এখন অপসারিত হইবে। এই কারণে দেশের নূতন অঞ্চলে জমির খাজনা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু পুরাতন অঞ্চলে প্রান্তিক জমিতে চাষের কাজ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে এবং ফলে পুরাতন অঞ্চলে খাজনার পরিমাণ হ্রাস পাইবে।

(গ) **খাজনার উপর জনবৃদ্ধির প্রভাব :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রারম্ভিক পর্বে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে জনবৃদ্ধির আশংকা থাকে। জনবৃদ্ধির ফলে সাধারণ ভাবে খাজনা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। কারণ—জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে কৃষিপণ্যের দাম বাড়িয়া যায় বলিয়া খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উৎপাদন-সংগঠন ও শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পাইলে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে উৎপাদন-ব্যয় ও দাম কমিয়া যায় এবং অবশেষে খাজনা হ্রাস পায়।

(ঘ) **খাজনার উপর আয়-বৃদ্ধির প্রভাব :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক হইতেছে দেশের লোকেদের আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি। আয়-বৃদ্ধির ফলে কিন্তু দেশের লোকেরা খাদ্যের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি করে না। তাহারা বর্ধিত আয় অন্য দ্রব্যসামগ্রীর জন্য ব্যয় করে। ইহার ফলে অন্যান্য দ্রব্যের দাম যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় খাদ্যশস্যের দাম সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং দেশের লোকদের আয়বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে আনুপাতিক হারে খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু আয়-বৃদ্ধির ফলে শহরে বসতবাড়ীর চাহিদা বৃদ্ধি পায় বলিয়া 'শহরে জমির খাজনা' (urban site rent) বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং দেখা যায়, জমির খাজনার উপর অর্থনৈতিক প্রগতির প্রভাব বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে।

২২

।। মজুরি ।।
(Wages)

(আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরি -প্রকৃত মজুরি নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ - মজুরির হার নির্ধারণ -- প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার মজুরি তত্ত্ব -- আপেক্ষিক মজুরি বা মজুরির হারে তারতম্য ও উহার কারণসমূহ মজুরি ও শ্রমিকের কার্যদক্ষতা - মজুরি ও উদ্ভাবনকার্য -- শ্রমিক সংঘ -- কার্যাবলী ও উপযোগিতা -- অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘের ভূমিকা - শ্রমিক-সংঘ কি মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারে ? -- মজুরি বৃদ্ধির ক্ষমতার সীমা)

বর্তমান অধ্যায়ে শ্রমিকের শ্রমকার্যের দাম অর্থাৎ মজুরি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

১. **আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরি (Money Wages or Nominal Wages and Real Wages)** : উৎপাদনকার্যের জন্য শ্রমিক শ্রম প্রদান করে। উহার বিনিময়ে শ্রমিককে যে-দাম দিতে হয়, তাহাকে 'মজুরি' (wages) বলা হয়। শ্রমিকরা সাধারণত দিনের বা সপ্তাহের বা মাসের শ্রমকার্যের ভিত্তিতে এই মজুরি পাইয়া থাকে। শ্রমিক তাহার শ্রমের বিনিময়ে যে-পরিমাণ টাকাকড়ি পায় তাহাকে 'আর্থিক (বা 'অর্থকরী') মজুরি' (money or nominal wages) বলে। কোন শ্রমিক তাহার দৈনিক শ্রমের বিনিময়ে পাইল ১৫ টাকা, এইক্ষেত্রে শ্রমিকের দৈনিক আর্থিক মজুরি হইল ১৫ টাকা। আর্থিক মজুরির বিনিময়ে বাজার হইতে সে কিছু পরিমাণ দ্রব্যাদি ও সেবাকার্য অর্থাৎ মজুরি-পণ্য (wage-goods) কিনিতে পারে, উহার সমষ্টিকে প্রকৃত বা আসল মজুরি (real wages) বলে। ১৫ টাকা আর্থিক মজুরির বিনিময়ে যদি ৪ কিলোগ্রাম চাউল বা ৫ কিলোগ্রাম গম পাওয়া যায়, তাহা হইলে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি হইবে ৪ কিলোগ্রাম চাউল বা ৫ কিলোগ্রাম গম।

প্রকৃত মজুরি নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ : শ্রমিকের নিকট আর্থিক মজুরি অপেক্ষা প্রকৃত মজুরির গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ তাহাদের জীবনযাত্রার মান বা অর্থনৈতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য এই প্রকৃত মজুরির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রকৃত মজুরি অবশ্য আর্থিক মজুরি ছাড়া আরও কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে :

(ক) **মজুরি-পণ্যের দামস্তর** : শ্রমিকরা যে-সকল দ্রব্যাদি ও সেবাকার্য ক্রয় করে (অর্থাৎ মজুরি-পণ্য) উহাদের দামের উপর প্রকৃত মজুরি নির্ভর করে। মজুরি-পণ্যের দাম অধিক হইলে আর্থিক মজুরির বিনিময়ে স্বল্প পরিমাণ দ্রব্যাদি ও সেবাকার্য পাওয়া যাইবে। সুতরাং প্রকৃত মজুরি কম হইবে। আবার উহাদের দাম কম হইলে প্রকৃত মজুরি বেশি হইবে।

(খ) **অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা** : শ্রমিকরা উহাদের কাজের বিনিময়ে আর্থিক মজুরি ছাড়াও কোন কোন স্থানে আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে।

যেমন—বিনা ভাড়ায় বা কম ভাড়ায় বসবাসের বাসস্থান, সস্তায় খাদ্যদ্রব্যাদি, রেল-কর্মীদের বিনা ভাড়ায় রেলে ভ্রমণের সুবিধা, ক্ষেতমজুরদের দ্রব্যের আকারে নানারূপ প্রাপ্তি ইত্যাদি। ঐ সুযোগসুবিধাগুলি যেখানে বেশী হয়, সেখানে প্রকৃত মজুরি বেশী হইবে। এইসকল ক্ষেত্রে আর্থিক মজুরি কম হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক হয়।

(গ) **কাজের প্রকৃতি, ঝুঁকি ও স্থায়িত্ব ঃ** যে-সকল কাজ খুবই কষ্টদায়ক এবং যেখানে বিপদের আশংকা থাকে, সেখানে আর্থিক মজুরি সামান্য বেশী হইলেও প্রকৃত মজুরি কম হয়। খনির শ্রমিকদের মজুরি সাধারণ শ্রমিকদের তুলনায় কিছু বেশী। কিন্তু উহাদের প্রকৃত মজুরি খুবই কম হয়, কারণ তাহাদিগকে বিরাট ঝুঁকি ও বিপজ্জনক অবস্থায় কাজ করিতে হয়। আবার কাজ স্থায়ী (permanent) হইলে আর্থিক মজুরি কম হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক হয়। কিন্তু সাময়িক বা অস্থায়ী ও ব্যক্তিগত কাজে স্থায়িত্ব কম বলিয়া প্রকৃত মজুরি কম হয়।

(ঘ) **অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা ঃ** যে-সকল কাজে অতিরিক্ত আয়ের (extra earnings) সম্ভাবনা থাকে, সেখানে আর্থিক মজুরি কম হইলেও প্রকৃত মজুরি বেশী হইতে পারে। যেমন—গৃহ-শিক্ষকতার কাজ করিয়া বা পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করিয়াও শিক্ষকদের বাড়তি উপার্জনের সম্ভাবনা থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে আর্থিক মজুরি কম হইলেও প্রকৃত মজুরি বেশী হইয়া থাকে।

(ঙ) **পদোন্নতির সম্ভাবনা ঃ** কোন কাজে ভবিষ্যতে অধিক মজুরি ও উচ্চপদে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে বর্তমানে কম আর্থিক মজুরিতেও অনেকে কাজ করিতে রাজী থাকে। এইক্ষেত্রে প্রকৃত মজুরি অধিক হয়।[১]

(চ) **অন্যান্য বিষয় ঃ** পরিশেষে বলা যায়, কাজের শর্তাবলী, কাজের মর্যাদামূল্য, কাজের সময়ের দৈর্ঘ্য, বোনাস ও মুনাফার ভাগাভাগি ইত্যাদি বিষয়গুলির উপরও শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি নির্ভর করে। ইহা ছাড়া, পেন্সন, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তার (social security) সুযোগ-সুবিধাগুলিও শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, আর্থিক মজুরি অপেক্ষা শ্রমিকরা প্রকৃত মজুরির দিকে অধিক আকৃষ্ট হয়। কারণ প্রকৃত মজুরি উহাদের জীবনযাত্রার মান বা অর্থনৈতিক সুখসাচ্ছন্দ্য নির্ধারণ করিয়া দেয়। প্রকৃত মজুরি অধিক হইলে ইহাদের জীবনযাত্রার মান সাধারণত উন্নত হয়। কারণ শ্রমিকরা তখন অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও সেবামূলক কাজ ভোগ করিতে পারে। পক্ষান্তরে, প্রকৃত মজুরি কম হইলে জীবনযাত্রার মানও নিম্ন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, উন্নতদেশের তুলনায় ভারতে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি খুব কম বলিয়া ভারতীয় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান ঐ সকল দেশের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের তুলনায়

১. Thomas—*Elements of Economics*, P. 236

খুবই নিম্ন। ভারতীয় শ্রমিকদের স্বল্প প্রকৃত মজুরির কারণসমূহ হইতেছে—আর্থিক মজুরির নিম্ন হার, স্বল্প উৎপাদনক্ষমতা, অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, উৎপাদনকার্যে উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগের অভাব ইত্যাদি।

২. **মজুরির হার নির্ধারণ (Determination of the Rate of Wages) ঃ** মজুরির হার নির্ধারণ সম্পর্কে অর্থবিদ্যায় কতকগুলি তত্ত্ব প্রচলিত আছে। ঐগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল ঃ

১. জীবনধারণোপযোগী মজুরি-তত্ত্ব বা মজুরির লৌহ-বিধি (Subsistence Theory of Wages) ঃ এই তত্ত্বে বলা হয়, শ্রমিকদের জীবনধারণের জন্য যে-পরিমাণ টাকাকড়ি প্রয়োজন পড়ে, মজুরির হার সেই পরিমাণ টাকাকড়ির সমান হইবে। মজুরি উহা অপেক্ষা বেশী বা কম হইবে না। ইহাকে মজুরির লৌহ-বিধি (Iron Law of Wages) বলিয়া অভিহিত করা হয়। উহা অপেক্ষা মজুরির হার অধিক হইলে শ্রমিকরা তাড়াতাড়ি বিবাহ করিবে ; ফলে জনসংখ্যা ও শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি পাইবে এবং মজুরি হ্রাস পাইবে। পক্ষান্তরে, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় টাকাকড়ি অপেক্ষা মজুরির হার কম হইলে শ্রমিকরা বিলম্বে বিবাহ করিবে এবং উহার ফলে জনসংখ্যা ও শ্রমিকের যোগান হ্রাস পাইবে। ফলে, মজুরি বৃদ্ধি পাইবে।[১] সুতরাং দেখা যায়, জীবনধারণের উপযোগী যে-পরিমাণ টাকাকড়ির প্রয়োজন পড়ে, মজুরি উহার সমান থাকিবে।

কিন্তু তত্ত্বটিতে কতকগুলি ত্রুটি দেখা যায়। বলা হয়, তত্ত্বটিতে মজুরি-নির্ধারণের ব্যাপারে শুধুমাত্র শ্রমিকের যোগানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে ; মালিকদের নিকট শ্রমের চাহিদার দিক সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, মজুরি অধিক হইলেই জনসংখ্যা ও শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি পাইবে, ইহাও সকল অবস্থায় না-ও ঘটিতে পারে।

২. জীবনযাত্রার মান মজুরি-তত্ত্ব (Standard of Living Theory of Wages) ঃ এই তত্ত্বটি প্রথমটির সংশোধিত ব্যাখ্যা। এই তত্ত্বটিতে বলা হয়, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উহাদের মজুরি নির্ধারণ করে। শ্রমিকেরা এক ধরনের জীবনযাত্রা অনুসরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। ঐ অভ্যস্ত জীবনযাত্রা (a habituated standard of living) বহাল রাখার জন্য যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন পড়ে, শ্রমিকদের মজুরি তাহার সমান হইবে। মজুরি জীবনযাত্রার ব্যয় অপেক্ষা বেশী বা কম থাকিতে পারে না।

জীবনযাত্রার মান মজুরিকে বহুলাংশে প্রভাবান্বিত করে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তত্ত্বটির কতকগুলি ত্রুটি দেখা যায়। পূর্বের তত্ত্বটির ন্যায় এই তত্ত্বটিও মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে শুধুমাত্র শ্রমিকদের যোগানের উপর গুরুত্ব

---

১. Thomas—*Elements of Economics*, p. 220

দিয়াছে। আবার জীবনযাত্রার মান যেমন মজুরি নির্ধারণ করে, সেইরূপ মজুরিও জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবান্বিত করে।

৩. অবশিষ্ট-উৎপন্নের দাবিদার তত্ত্ব (Residual Cleaimant Theory): এই তত্ত্বে বলা হয়, শ্রমিকরা হইতেছে অবশিষ্ট-উৎপন্নের দাবিদার। অর্থাৎ, মোট উৎপাদিত অর্থ দ্বারা সর্বপ্রথমে খাজনা, সুদ ও মুনাফা মিটাইয়া ফেলিতে হইবে; পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু এই তত্ত্বটিতেও ত্রুটি আছে। বলা হয়, শ্রমিক মোট উৎপন্ন-মূল্যের শেষ দাবিদার নহে; সংগঠনকারী হইতেছে মোট উৎপন্ন-মূল্যের শেষ দাবিদার।

৪. মজুরি-তহবিল তত্ত্ব (Wages-fund Theory): এই তত্ত্বটির প্রধান প্রবক্তা ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)। ইহাতে বলা হয়, মালিক তাহার চলতি মূলধনের একটি নির্দিষ্ট অংশ দ্বারা একটি মজুরি-তহবিল (wages-fund) সৃষ্টি করে। এই মজুরি-তহবিল হইতে শ্রমিকদিগকে মজুরি দেওয়া হয়। মজুরি তহবিলে জমা অর্থ নির্দিষ্ট (fixed) থাকে বলিয়া অধিক শ্রমিক নিয়োগ করা হইলে মজুরির হার কম হইবে এবং কম শ্রমিক নিয়োগ করা হইলে মজুরির হার বেশী হইবে।

এই তত্ত্বটিতে মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে শ্রমিকের চাহিদা ও যোগান—উভয় দিকই বিবেচনা করা হইয়াছে। কিন্তু তত্ত্বটিতে নানা ত্রুটি থাকার জন্য মিল (Mill) নিজেই তত্ত্বটি পরিত্যাগ করেন।

৫. প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার মজুরি-তত্ত্ব (Marginal Productivity Theory of Wages): পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মজুরির হার নির্ধারণ করে। ভারসাম্য অবস্থায় শ্রমিকের মজুরি উহার প্রান্তিক উৎপন্ন-মূলের সমান হইবে।

[প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার বণ্টন-তত্ত্ব দ্রষ্টব্য (২৮২ পৃঃ)। পরে এই তত্ত্বটি বিশদভাবে আলোচনা করা হইতেছে।]

৬. চাহিদা ও যোগানের মজুরি-তত্ত্ব (Demand and Supply Theory of Wages): এই তত্ত্বে বলা হয়, মজুরির হার নির্ধারিত হয় শ্রমিকের চাহিদা ও যোগান দ্বারা। শ্রমিক শ্রমের দ্বারা দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া মালিক-পক্ষ শ্রমিকদের শ্রমের চাহিদা করে। মজুরির হার অধিক হইলে মালিকপক্ষের নিকট শ্রমের চাহিদা কম হইবে এবং মজুরির হার কম হইলে উহাদের নিকট শ্রমের চাহিদা বেশী হইবে। পক্ষান্তরে, শ্রমিকরা শ্রমের যোগান দেয়। শ্রমের যোগানের দিক হইতে মজুরি শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। মজুরির হার অধিক হইলে শ্রমের যোগান বেশী হইবে এবং মজুরির হার কম হইলে শ্রমের যোগান কম হইবে। প্রকৃতপক্ষে, মজুরির হার শ্রমের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

যে-মজুরিতে শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান পরস্পর সমান হইবে, তাহাই হইবে ভারসাম্য মজুরি। একটি রেখাচিত্র দ্বারা ইহা দেখানো হইল ঃ
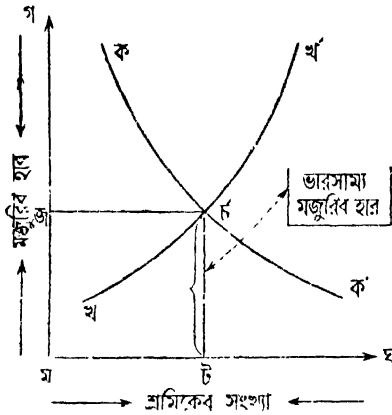
চিত্র ৪৬

উপরের রেখাচিত্রে **মগ** মজুরির হার এবং **মঘ** শ্রমিকের সংখ্যার নির্দেশ দেয়। **কক´** শ্রমিকের শ্রমের চাহিদা-রেখা এবং **খখ´** শ্রমিকের শ্রমের যোগান-রেখা। মজুরির হার **মজ** বা **টচ´** হইলে শ্রমের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয়। সুতরাং **মজ** বা **টচ´** হইতেছে ভারসাম্য মজুরি এবং ঐ মজুরিতে শ্রমিক-নিয়োগের সংখ্যা হইতেছে **টম**।

৩. **প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার মজুরি-তত্ত্ব ঃ (Marginal Productivity Theory of Wages)** ঃ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার মজুরি-তত্ত্বটি প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার বণ্টন-তত্ত্বের একটি অঙ্গবিশেষ। এই তত্ত্বটিতে বলা হয়, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা ইহার মজুরি নির্ধারণ করে এবং মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্ন-মূল্যের (value of the marginal product of labour বা সংক্ষেপে শ্রমিকের vmp) অর্থাৎ শ্রমিকের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের (marginal revenue product বা সংক্ষেপে mrp) সমান হইবে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে, শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-মূল্য বলিতে কি বুঝায়? জমি বা মূলধন উপাদানের পরিমাণ স্থির রাখিয়া শ্রমিক-নিয়োগের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধি করিলে যে-অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়া যায়, তাহাই হইতেছে 'শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন'। এই প্রান্তিক উৎপাদনকে দ্রব্যের প্রতি একক দাম দ্বারা গুণ দিলে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্ন-মূল্য (vmp) পাওয়া যায়। নিয়োগকারী শ্রম-নিয়োগের সময় এই প্রান্তিক উৎপন্ন-মূল্য বিচার-বিবেচনা করে। যে-পরিমাণ শ্রমে মজুরি ও শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্ন-মূল্য (বা শ্রমিকের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন) সমান হয়, নিয়োগকারী সেই পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করিবে। কারণ ঐ স্তরে নিয়োগ-কারীর মোট মুনাফা সর্বাধিক হইবে।

তত্ত্বটির অনুমানসমূহ ঃ পূর্বেই দেখানো হইয়াছে এই তত্ত্বটিতে কতকগুলি অনুমান ধরা হয় (২৮২ পৃঃ)। ঐ অনুমানগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল ঃ (ক) শ্রমের ও উৎপাদিত দ্রব্যের উভয় বাজারেই পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থা থাকিবে। (খ) শ্রম পরিপূর্ণভাবে সচল (mobile) হইবে এবং বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পরিবর্তন (substitution) করা সহজেই সম্ভব হইবে। (গ) উৎপাদনের ক্ষেত্রে 'ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি' কার্যকর হইবে অর্থাৎ শ্রম-নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইলে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পাইবে। (ঘ) নিয়োগকারী সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করিবে এবং শ্রমিকের ক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়োগ (full employment) অবস্থা থাকিবে। (ঙ) শ্রমের এককগুলি বিভাজনযোগ্য (divisible) এবং সমজাতীয় (homogeneous) হইবে।

তত্ত্বটির উদাহরণ ও রেখাচিত্র ঃ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার মজুরি-তত্ত্বটি একটি উদাহরণ ও রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। ২৮৪ পৃষ্ঠার তালিকায় ও ২৮৫ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে উহা দেখানো হইয়াছে।

তত্ত্বটির সমালোচনা ঃ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মজুরি তত্ত্বটি নানাভাবে সমালোচিত হয়। কয়েকটি প্রধান প্রধান সমালোচনা এখানে দেওয়া হইল ঃ

(১) টাউজিগ (Taussig) ও অন্যান্য লেখকরা দেখাইয়াছেন, শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন পৃথক করিয়া নিরূপণ করা যায় না। কারণ মোট উৎপাদন সকল উপাদানেরই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে উৎপাদিত হয়।

(২) পূর্ণ প্রতিযোগিতা বা পূর্ণ কর্মসংস্থান কোনটিই বাস্তব নহে। সুতরাং তত্ত্বটিতে কতকগুলি অবাস্তব অনুমান ধরা হইয়াছে। অপূর্ণাঙ্গ বা একচেটিয়া বাজারের ক্ষেত্রে তত্ত্বটি একরূপ অচল হইয়া পড়ে।

(৩) সমজাতীয় শ্রম-উৎপাদনও বিশেষ দেখা যায় না অর্থাৎ শ্রমের সকল এককেরই সমান দক্ষতা থাকে ইহা বিশেষ দেখা যায় না। আবার প্রথা, সংস্কার, ভাষা ইত্যাদি কারণে শ্রমিকরা সচল (mobile) হইতে পারে না. ইহাও পূর্বে দেখানো হইয়াছে (২১৪ পৃঃ)।

(৪) তত্ত্বটিতে পরিবর্তনশীলতার নীতি (the principle of substitution) প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে মূলধন বা জমির পরিবর্তে অধিক সংখ্যায় শ্রমিক সকল অবস্থায় নিয়োগ করা সম্ভব হয় না।

(৫) তত্ত্বটিতে মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে শ্রমের যোগানের দিক বিবেচনা করা হয় নাই, কেবলমাত্র শ্রমের চাহিদার দিক বিবেচনা করা হইয়াছে। কিন্তু মজুরির হার নির্ধারণ করিতে হইলে শ্রমের চাহিদা ও যোগান—উভয় দিকই বিবেচনা করিতে হয়।

উপসংহার ঃ শ্রমিকের মজুরির হার কেবলমাত্র উহার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। ইহা শুধু মজুরির সর্বোচ্চ সীমা (the maximum

limit) স্থির করিয়া দেয়। অর্থাৎ, মালিক সর্বোচ্চ কত মজুরি দিতে পারিবে শুধু তাহাই স্থির করিয়া দেয়। মজুরির হার নির্ভর করে শ্রমিকের জীবনযাত্রার ব্যয়েরও উপর। মালিকপক্ষ সর্বদাই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-মূল্যের কম মজুরি দিতে চাহে। পক্ষান্তরে, শ্রমিকপক্ষ জীবনযাত্রার ব্যয়ের অধিক মজুরি আদায় করিতে চাহে। প্রকৃতপক্ষে মজুরি—এই দুই সীমার মধ্যে কোন একটি স্থানে নির্ধারিত হয় এবং উহা কোন্ স্তরে নির্ধারিত হইবে তাহা নির্ভর করে মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের আপেক্ষিক শক্তির উপর।

৪. **আপেক্ষিক মজুরি বা মজুরির হারে তারতম্য (Relative Wages or Differences in Wage-Rates)ঃ** আপেক্ষিক মজুরি বলিতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিকের ভিন্ন ভিন্ন মজুরির হারকেই বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে 'মজুরির সাধারণ হার' (general rate of wages) বলিতে কিছুই নাই। ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শ্রমিক বা একই পেশায় নিযুক্ত শ্রমিক বা দেশের বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরির হারে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়।

মজুরির হারের এইরূপ তারতম্য বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। প্রথমত, ভিন্ন ভিন্ন পেশায় বা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের একইরূপ কর্মক্ষমতা ও শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও মজুরির হারে তারতম্য থাকিতে পারে। ইহাকে 'মজুরির অনুভূমিক তারতম্য' (horizontal differences in wages) বলে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন পেশা বা একই পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকদের কর্মকুশলতা ও শিক্ষার তারতম্যের ফলে উহাদের মজুরির হারে তারতম্য ঘটিতে পারে, ইহাকে মজুরির 'উল্লম্ব তারতম্য' (vertical differences in wages) বলে। পরিশেষে বলা যায়, একই দেশের বিভিন্ন স্থানে বা বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের মধ্যে মজুরির হারে তারতম্যও দেখা যায়। ইহাকে 'মজুরির ভৌগোলিক তারতম্য' (geographical differences in wages) বলে। অনুরূপভাবে একই পেশায় বা একই শিল্পে এবং বিভিন্ন পেশায় বা বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরিতেও এইরূপ তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কোন একজন বিশেষজ্ঞ এবং একজন সাধারণ ডাক্তার ডাক্তারি-পেশায় নিযুক্ত থাকিলেও উহাদের আয়ে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। আবার ইঞ্জিনিয়ার ও শিক্ষকের আয়ের মধ্যেও পার্থক্য থাকে।

মজুরির হারে তারতম্যের কারণসমূহ : মজুরির হারে তারতম্য নানাকারণে দেখা দেয়। কতকগুলি প্রধান কারণ এখানে উল্লেখ করা হইল ঃ

(i) **কাজের প্রকৃতি ও ঝুঁকি বা কাজের সাচ্ছন্দ্য বা অসাচ্ছন্দ্যঃ** বিভিন্ন পেশায় কাজের প্রকৃতি ও ঝুঁকি একইরূপ হয় না। ঝুঁকিবহুল, আয়াসসাধ্য ও বিপজ্জনক কাজে (যেমন—খনির কাজে) মজুরির হার অধিক না হইলে শ্রমিকরা এই সকল কাজে আকৃষ্ট হইবে না। পক্ষান্তরে, যে-সকল কাজে সাচ্ছন্দ্য বেশী বা ঝুঁকি কম (যেমন—অফিসের কাজে) সেই সকল কাজ স্বল্প মজুরিতেও শ্রমিকরা কাজ করিতে রাজী থাকে।

(ii) **শিল্প-শিক্ষার ব্যয় ও সময়-মেয়াদ** ঃ কোন কোন পেশার কাজ শিখিতে দীর্ঘকাল সময় লাগে এবং উহার জন্য ব্যয়ের পরিমাণও বেশী হইয়া থাকে। প্রশিক্ষণের ব্যয় পূরণের জন্য ঐ সকল পেশায় স্বাভাবিক কারণেই মজুরির হার উচ্চ হইয়া থাকে। ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পেশায় শিক্ষার জন্য প্রচুর পরিমাণে দীর্ঘকাল ধরিয়া অর্থ ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং ঐ ব্যয় পূরণের জন্য ঐ সকল পেশায় মজুরির হার উচ্চ হওয়াই স্বাভাবিক, তাহা না হইলে অনেকেই ঐ সকল কাজে আকৃষ্ট হইবে না।

(iii) **পদমর্যাদা বা দায়িত্বের পার্থক্য** ঃ দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য মজুরির হার অধিক হয় এবং যে-সকল কাজে শ্রমিকদের সেইরূপ দায়িত্ব থাকে না সেই সকল কাজের জন্য মজুরির হার অপেক্ষাকৃত কম হয়। এই কারণেই কোন অফিসে সাধারণ কর্মচারীদের বেতনের তুলনায় সেক্রেটারির বেতন অনেক বেশী হইয়া থকে।

(iv) **স্বাভাবিক নৈপুণ্যের তারতম্য** ঃ স্বাভাবিক নৈপুণ্যের (general skill) তারতম্যের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে মজুরির বিভিন্ন হার দেখা যায়। যে-সকল শ্রমিকের কার্যদক্ষতা উচ্চমানের স্বভাবতই তাহাদের মজুরি অধিক হয়, কিন্তু স্বল্প-দক্ষতার শ্রমিকের মজুরি অপেক্ষাকৃত কম হয়। চলচ্চিত্র-শিল্পে সাধারণ শিল্পী অপেক্ষা প্রতিভাবান শিল্পীর উপার্জন অনেক বেশী হয়, কারণ প্রতিভাবান শিল্পীর নিপুণতা অনেক বেশি! স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্যের জন্য উচ্চদক্ষ শ্রমিকের আয়ে যে-উদ্বৃত্ত দেখা যায়, তাহাকে 'নৈপুণ্যজনিত উদ্বৃত্ত বা খাজনা' (rent of ability) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

(v) **সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য** ঃ সুযোগ-সুবিধার পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীর উপার্জনের হারে তারতম্য দেখা যায়। দুইজন শ্রমিক সমশিক্ষিত ও সমদক্ষ হইলেও একজন হয়তো সুপারিশের জোরে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া অপর কর্মীর তুলনায় অধিক উপার্জন করিতে পারে। মজুরির এই ধরনের পার্থক্য অবশ্য সামাজিক স্বার্থে কাম্য নহে। এই কারণে ইহার বিলোপসাধন করা রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(vi) **ভবিষ্যতে অধিক উপার্জনের সম্ভাবনা** ঃ যে-সকল পেশায় ভবিষ্যতে অধিক উপার্জনের সম্ভাবনা থাকে (যেমন—আইন পেশায়), সেই সকল পেশায় চাহিদার তুলনায় কর্মীর যোগান অধিক হওয়ায় উপার্জনের হার অপেক্ষাকৃত কম হইয়া পড়ে।

(vii) **পেশার আপেক্ষিক সামাজিক মর্যাদা** ঃ যে-সকল পেশায় সামাজিক মর্যাদা অপেক্ষাকৃত বেশী (যেমন শিক্ষকতার কার্য বা ওকালতি কার্য), সেই সকল পেশায়ও চাহিদার তুলনায় যোগান অধিক হইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে মজুরির হারও অপেক্ষাকৃত কম হইয়া পড়ে।

(viii) **মালিকের মজুরি-প্রদানের ক্ষমতা ও শ্রমিকদের দর-কষাকষির ক্ষমতা** ঃ যে-সকল প্রতিষ্ঠানের (যেমন—ভারতে বিদেশী প্রতিষ্টানের) উচ্চ-মজুরি দেওয়ার

ক্ষমতা আছে, সেইস্থানে সাধারণত মজুরির হার বেশি হয়। আবার শ্রমিকের মজুরি-বৃদ্ধির ক্ষমতা বেশী হইলে সেই সকল স্থানে সাধারণত মজুরির হার অধিক হইয়া থাকে।

(ix) **শ্রমিকের সচলতার অভাব**ঃ শ্রমিকের সচলতার (mobility of labour) অভাবের জন্য শ্রমিকেরা এক পেশা হইতে অন্য পেশায় বা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সহজে যাইতে পারে না। ইহার ফলে কোন পেশায় বা কোন স্থানে চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের যোগান অধিক হইয়া পড়ে এবং শ্রমিকের মজুরি হারে তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

(x) **বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অভাব**ঃ মজুরির হারে তারতম্যের অন্য একটি অন্যতম কারণ হইতেছে সমাজে বহুসংখ্যক অপ্রতিযোগী শ্রেণীর (non-competing groups) অস্তিত্ব। সম্পদ, আয়, শিক্ষা, জন্মসূত্র, বংশগত ধারা ইত্যাদির তারতম্যের ফলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের উদ্ভব হয় এবং ঐ সকল শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ কোন প্রতিযোগিতা দেখা যায় না। বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকেরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থাকে এবং এক শ্রেণীর শ্রমিক নিজস্ব পেশা পরিত্যাগ করিয়া সহজে অন্য পেশা গ্রহণ করিতে পারে না। যেমন—তাঁতির ছেলে জন্মসূত্রে তন্তুবায়ের পেশায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে বা স্বর্ণকারের ছেলে স্বর্ণশিল্পে নিযুক্ত হইয়া পড়ে। উহাদের পক্ষে সহজে নিজস্ব পেশা পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় না এবং ঐ সকল বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে কোন প্রতি-যোগিতাও থাকে না। ইহার ফলে যে-সকল পেশায় শ্রমিকের যোগান উহার চাহিদার তুলনায় বেশী হয়, সেই সকল পেশায় মজুরির হার অপেক্ষাকৃত কম হয়। পক্ষান্তরে, যে-সকল পেশায় চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের যোগান কম হয়, সেই সকল পেশায় মজুরির হার অধিক হয়।

(xi) **অন্যান্য কারণ**ঃ মজুরির হারের তারতম্যের অন্যান্য কারণগুলি হইতেছেঃ বিভিন্ন ফার্ম-এর মজুরি প্রদানের বিভিন্নরূপ ক্ষমতা, বিভিন্ন অঞ্চলে জীবনযাত্রার ব্যয়ের পার্থক্য, বিভিন্ন দেশে উন্নয়নের স্তরে পার্থক্য ইত্যাদি।

স্ত্রী-শ্রমিকের মজুরি কম হওয়ার কারণঃ মজুরি তারতম্যের আর একটি দিক হইতেছে, পুরুষ-শ্রমিক ও স্ত্রী-শ্রমিকের মজুরিতে তারতম্য। সাধারণভাবে দেখা যায়, পুরুষ-শ্রমিকদের তুলনায় স্ত্রী-শ্রমিকের গড় আয় কম হয়। কতকগুলি কারণে এইরূপ হইয়া থাকেঃ প্রথমত, পুরুষ-শ্রমিকদের তুলনায় স্ত্রী-শ্রমিকের শারীরিক ক্ষমতা কম হওয়ায় তাহারা ভারী কাজ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের মজুরি কম হয়। দ্বিতীয়ত, সামাজিক বা আইনগত নানা কারণে স্ত্রী-শ্রমিকরা সকল প্রকার কাজে নিযুক্ত হইতে পারে না। ইহার ফলে তাহারা কতকগুলি নির্দিষ্ট কাজে ভীড় করে এবং সেখানে চাহিদার তুলনায় যোগান অধিক হয় বলিয়া মজুরি কম হইয়া পড়ে।[১]

১. Thomas—*Elements of Economics* p. 242

তৃতীয়ত, স্ত্রী-শ্রমিকের কাজের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম হয় বলিয়া তাহারা কম মজুরিতেও কাজ করিতে রাজী থাকে। পরিশেষে উল্লেখ করা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রী-শ্রমিকেরা সাময়িক কালের জন্য কাজ করে বা পুরুষ-শ্রমিকের তুলনায় তাহাদের সামাজিক দায়িত্ব (social responsibility) অপেক্ষাকৃত কম থাকে এবং ইহার ফলেও তাহাদের মজুরি কম হইয়া পড়ে। আজকাল অবশ্য মজুরির এইরূপ বৈষম্য সরকার আইন দ্বারা তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে। একই কাজের জন্য পুরুষ-শ্রমিক ও স্ত্রী-শ্রমিকের মজুরি বা বেতন সমান হইবে—এই মর্মে প্রায় প্রত্যেক দেশেই আইন প্রণয়ন করা হয়।

৫. **মজুরি ও শ্রমিকের কার্যদক্ষতা (Wages and Efficiency of Labour) :** মজুরি ও শ্রমিকের কার্যদক্ষতার মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। শ্রমিকদিগকে ন্যায্য বা যুক্তিসঙ্গত মজুরি (fair wages) দিলে শ্রমিকরা তাহাদের জীবনধারণের প্রয়োজন পূরণ করিতে পারে অর্থাৎ তাহারা ও তাহাদের পরিবারের খাদ্য, বাসস্থান শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদির প্রয়োজন মিটাইতে পারে। ইহার ফলে তাহাদের শারীরিক যোগ্যতা বা কাজ করার ক্ষমতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে, তাহাদের কার্যদক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, শ্রমিকদের যুক্তিসঙ্গত মজুরি না দেওয়া হইলে তাহার ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং ইহার ফলে দৈহিক ক্ষমতা ও কার্যদক্ষতা হ্রাস পায়। এই কারণে দেখা যায়, উন্নত দেশগুলিতে মজুরির হার বেশী হওয়ায় শ্রমিকের কার্যদক্ষতা বেশী হয়। কিন্তু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে মজুরির হার কম হওয়ায় কার্যদক্ষতাও কম হয়।

ইহা ছাড়া, শ্রমিকদিগকে যুক্তিসঙ্গত মজুরি দেওয়া হইলে তাহাদের কাজ করার ইচ্ছা বা প্রেরণা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। অধিক মজুরি পাওয়ায় তাহাদের মানসিক পরিতৃপ্তি আসে এবং ফলে কাজের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ ও মনোযোগ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। আবার, কার্যদক্ষতা অনুযায়ী মজুরি দেওয়া হইলে শ্রমিকরা আরও অধিক উৎসাহে কাজ করে। অধিক মজুরি পাওয়ার আশায় আরও দক্ষ ও কুশলী হওয়ার চেষ্টা করে। ইহার ফলেও উচ্চ-মজুরি শ্রমিকদের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে, মজুরির হার কম হইলে শ্রমিক-অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়, কাজ করার প্রেরণা হ্রাস পায়, কাজের আকর্ষণ কমিয়া যায়, কাজে গাফিলতি আসে এবং পরিণামে শ্রমিকদের কার্যদক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়।

তদুপরি, অধিক মজুরি দেওয়ার ফলে শ্রমিকদের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি পায় বলিয়া উৎপাদন-সংগঠনের দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে মালিকরাও উপকৃত হয়। শ্রমিকদিগকে অধিক মজুরি দিলে হয়তো মজুরি-ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু অধিক মজুরির ফলে শ্রমিকদের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি পায় বলিয়া প্রতি একক উৎপাদন-ব্যয় বা গড় ব্যয় হ্রাস পায়। ইহার ফলে মালিকরা লাভবান হয়। আবার, অধিক মজুরি দিয়া মালিকরা সুদক্ষ শ্রমিকদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে এবং উহার ফলে গড় উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যায়, মজুরির হার অধিক হইলে

একদিকে যেমন শ্রমিকদের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, অন্যদিকে তেমনি উৎপাদন-সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া মালিকরাও লাভবান হইতে পারে। ইহাকেই 'উচ্চমজুরিজনিত ব্যয়-সংকোচ' (economy of high wages) বলা হয়।

কিন্তু মজুরি অধিক হইলেই যে শ্রমিকের কার্যদক্ষতা সকল অবস্থায় বৃদ্ধি পাইবে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। শ্রমিক যদি শারীরিকভাবে অপটু হয় বা সংশ্লিষ্ট কাজে শ্রমিকের যদি কোন দক্ষতাই না থাকে, তাহা হইলে মজুরি বৃদ্ধি করিয়াও তাহাদের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি করা যায় না।

ইহা ছাড়া, ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি করা যাইবে কি-না তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বা অন্যান্য উন্নত দেশে শ্রমিকদের মাথাপিছু উৎপাদন বেশী বলিয়াই তাহাদের মজুরিও বেশী। প্রকৃতপক্ষে অধিক মজুরি হইতেছে উচ্চ কার্য-দক্ষতার ফল বা পরিণতি, অধিক মজুরি উচ্চ কার্যদক্ষতার কারণ নহে (The high wages are the effect, not the cause, of the greater productivity of labour—*Benham*)। উন্নত দেশগুলিতে শ্রমিকেরা উন্নত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম লইয়া কাজ করে এবং ঐ সকল দেশে উচ্চমানের কারিগরীজ্ঞান ও কলাকুশলতা পাওয়া যায়। তাহার ফলেই তাহারা অধিক উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় এবং তাহাদের কার্যদক্ষতা উচ্চমানের ও মজুরি বেশী হয়। কিন্তু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে শ্রমিকরা ঐ সকল সুযোগ-সুবিধা পায় না। এরূপ অবস্থায় এইসকল দেশে মজুরি বৃদ্ধি করিয়া শ্রমিকদের কার্যদক্ষতা বিশেষ বৃদ্ধি করা যায় না। সুতরাং স্বল্পমজুরির দেশে মালিক যদি মজুরি বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে শ্রমিকদের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে বা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, তাহার সম্ভাবনা খুবই কম। ইহা সত্ত্বেও শ্রমিকদের কার্যদক্ষতার উপর মজুরির যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

৬. **মজুরি ও উদ্ভাবনকার্য (Wages and Inventions)**ঃ আধুনিক গতিশীল উৎপাদন-সংগঠনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে নূতন যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন-পদ্ধতি উদ্ভাবন করা এবং তাহা উৎপাদন-কার্যে প্রয়োগ করা। শ্রমিকের মজুরির উপর এই সকল বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনকার্যের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। অবশ্য এই প্রভাব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ধরনের উপর নির্ভর করে। ইহাই নিম্নে আলোচনা করা হইল ঃ

প্রথমত, শ্রম-সাশ্রয়কারী যন্ত্রপাতির (labour-saving machines) উদ্ভাবন ঘটিলে শ্রমিকের চাহিদা এবং উহার প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে মজুরি হ্রাসের সম্ভাবনা দেখা দেয়। যেমন—গণনার যন্ত্র (calculating machines) উদ্ভাবন ও উহার প্রয়োগের ফলে গণনাকার্যে নিযুক্ত কর্মীদের চাহিদা হ্রাস পায় এবং

[1] Benham—*Economics*, Chap, 26

ফলে উহাদের মজুরি কমিয়া যায়। কাপড়-ধোয়ার যন্ত্র উদ্ভাবন এবং উহার প্রয়োগের ফলে ধোপাদের আয় হ্রাস পায়। বিড়ি-প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি প্রয়োগের ফলে বিড়ি-শ্রমিকদের চাহিদা হ্রাস পায় বলিয়া উহাদের আয়ও হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়ত, উন্নত ও অভিনব যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে শ্রমিকদের কার্যদক্ষতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহার ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিকদের মজুরিও বৃদ্ধি পায়। উন্নত দেশগুলিতে প্রায়ই নূতন নূতন অভিনব যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইতেছে এবং উহার প্রয়োগের ফলে শ্রমিকদের কার্যদক্ষতা ও মজুরি বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়ত, মূলধন-সাশ্রয়কারী (capital-saving machines) যন্ত্রপাতিও উৎপাদন-পদ্ধতির উদ্ভাবিত হইলে মূলধন-যন্ত্রপাতির চাহিদা হ্রাস পায় এবং শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়। যেমন—বেতার-টেলিগ্রাফ যন্ত্রপাতি (wireless telegraphs) উদ্ভাবনের পর তারযুক্ত টেলিগ্রাফ যন্ত্রপাতির চাহিদা হ্রাস পায়, কিন্তু শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ইহার ফলে মজুরি বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়।

চতুর্থত, যে-সকল শ্রমিকরা শুধুমাত্র দৈহিক পরিশ্রমে পটু থাকে এবং নূতন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে অসমর্থ হয়, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ফলে সেই সকল শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস পাইতে পারে। কিন্তু নূতন যন্ত্রপাতি প্রয়োগের ফলে যে-সকল শ্রমিকদের কারিগরী নিপুণতা (technical skill) বৃদ্ধি পায়, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ফলে সেই সকল শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যেমন—যন্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজ করা সম্ভব হয়। যে-সকল শ্রমিকের সাহায্যে এই নূতন উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতিগুলি ব্যবহার করা হয়, তাহাদের কার্যদক্ষতা বাড়িয়া যায় এবং উহার ফলে তাহাদের মজুরিও বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায়, দীর্ঘকালীন সময়ে নূতন নূতন উদ্ভাবন ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি নূতন নূতন দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া দেয়, উহা নূতন ও পুরাতন উভয় প্রকার দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা ও শ্রমকার্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে। ইহার ফলে দীর্ঘকালীন সময়ে উন্নত দেশগুলিতে নূতন নূতন উদ্ভাবন শ্রমিকদের মজুরি বাড়াইয়া দেয়। ইহা ছাড়া, নূতন নূতন উদ্ভাবনের ফলে সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থব্যবস্থা উন্নত হয়, শ্রমকার্যের চাহিদা বাড়ে এবং পরিণামে মজুরিও বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং দেখা যায় শ্রমিকের মজুরির উপর উদ্ভাবনের কি প্রভাব পড়িবে, তাহা নির্ভর করে উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর।

৭. শ্রমিক সংঘ—ইহার কার্যাবলী ও উপযোগিতা (Trade Union —its Functions and Utilities) : আধুনিককালে শিল্প-শ্রমিকদের মজুরি-বৃদ্ধির একটি অন্যতম উপায় হইতেছে শ্রমিক-সংঘের মাধ্যমে আন্দোলন গড়িয়া তোলো। শ্রমিক-সংঘ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারে কি-না উহার বিচার করার পূর্বে শ্রমিক সংঘের কার্যাবলী ও উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

শ্রমিক-সংঘ হইতেছে শ্রমিকদের স্বার্থ-সংরক্ষণ ও কল্যাণ-প্রসারের জন্য শ্রমিকদের দ্বারাই গঠিত একটি স্থায়ী সংগঠন। সিড্‌নী ও বিয়াট্রিস্‌ ওয়েব-এর (Sydney & Beatrice Webb) ভাষায় বলা যায়, শ্রমিক-সংঘ হইতেছে মজুরি-জীবীদের একটি স্থায়ী সংগঠন, যাহার দ্বারা তাহারা তাহাদের নিয়োগের অবস্থা সংরক্ষণ বা উন্নত করার চেষ্টা করে ('A trade union is a continuous association of wage-earners for the purpose of maintaining or improving the conditions of their employment.')। সংক্ষেপে বলা যায়, শ্রমিকরা নিজস্ব স্বার্থ-সংরক্ষণ ও কল্যাণ-প্রসারের জন্য যে-স্থায়ী সংগঠন স্থাপন করে তাহাই হইতেছে শ্রমিক-সংঘ।

কার্যাবলী : শ্রমিক-সংঘের কার্যাবলীকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় :

(ক) **সংগ্রামমূলক কার্যকলাপ** (**Militant Functions**) : শ্রমিক-সংঘ শ্রমিকদের মজুরি, ভাতা, বোনাস ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্য, কাজের অবস্থা ও শর্তাবলীর উন্নতিসাধনের জন্য এবং ছাঁটাই প্রতিরোধের জন্য যৌথভাবে মালিকদের সঙ্গে দর-কষাকষি করে—ইহাই শ্রমিক-সংঘের সংগ্রামমূলক কাজ। ইহা ছাড়া, শ্রমিকদের উপর মালিকের অন্যায় নির্যাতন ও শোষণমূলক জুলুম অন্যায়ভাবে শ্রমিককে কাজ হইতে বরখাস্ত এবং তাহার পুনর্নিয়োগ, মালিক কর্তৃক বে-আইনী কারখানা বন্ধ ইত্যাদির বিরুদ্ধে শ্রমিক-সংঘ আন্দোলন গড়িয়া তুলে।

এইগুলির মধ্যে মজুরি-বৃদ্ধির জন্য যে-আন্দোলন শুরু করা হয়, তাহাই হইতেছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিক-সংঘ ধর্মঘট ও নানারূপ আন্দোলনের মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন করে। আন্দোলন সফল করার জন্য ইহা সদস্যদের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ্ করে এবং নানারূপ প্রচার চালায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মালিকের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে দাবীদাওয়া পূরণের ব্যবস্থা করে এবং শিল্প-বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করে। আজকাল শ্রমিক-সংঘ শ্রমিক-নিয়োগও অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের দাবীদাওয়া পূরণের জন্য ইহারা এমনকি মালিককে 'ঘেরাও' (gherao) করিয়া থাকে। যে-সকল দেশে শ্রমিক-সংঘ আন্দোলনের বিশেষ প্রসার ঘটে নাই সেই সকল দেশে সংগ্রামমূলক কাজই শ্রমিক-সংঘের একমাত্র কাজ। ভারতের শ্রমিক-সংঘ আন্দোলনের নানা কারণে বিশেষ অগ্রগতি ঘটে নাই, ফলে অধিকাংশ শ্রমিক-সংঘ শুধুমাত্র সংগ্রামমূলক কাজেই লিপ্ত থাকে—এইরূপ অভিযোগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সকল দেশে শ্রমিক সংঘকে 'নিছক ধর্মঘট কমিটি' (mere strike committee) বলিয়া অভিহিত করা হয়, ইহাদের গঠনমূলক কাজ বিশেষ নাই বলিলেই চলে।

(খ) **সৌহার্দ্যমূলক বা কল্যাণমূলক কার্যকলাপ (Fraternal or Welfare Functions) :** শ্রমিক-কল্যাণ বা শ্রমিকদের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক-সংঘ যে সকল কাজ করিয়া থাকে, সেইগুলিকে সৌহার্দ্যমূলক বা ক্যলাণমূলক কাজ বলা হয়। বয়স্ক শ্রমিকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় এবং শ্রমিক-পরিবারে ছেলেমেয়েদের

জন্য দিবা-বিদ্যালয় গঠন, শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করা, আমোদ-প্রমোদ, চিত্তবিনোদন ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা, শিল্পশ্রমিক ও তাহার পরিবারের অন্যান্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, বিপদগ্রস্থ শ্রমিক-পরিবারকে সাহায্য করা ইত্যাদি সৌহার্দ্যমূলক কাজের দৃষ্টান্ত। শ্রমিক-সংঘের এই সকল কল্যাণমূলক বা গঠনমূলক কার্যকলাপ শ্রমিকদের দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করে এবং ইহার ফলে তাহাদের কর্ম-দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। যে-সকল ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রমিক-সংঘ সংগঠন খুবই উন্নত, সেই সকল দেশে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশে শ্রমিক-সংঘের এই কাজের গুরুত্ব খুব বেশী। কিন্তু ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিক-সংঘের এই প্রকার কার্যকলাপ বিশেষ দেখা যায় না বলিলেই চলে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রমিকসংঘের বিশেষ ভূমিকা ঃ ভারতের ন্যায় পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক-সংঘের কিছু বিশেষ কাজ দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক দেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে (developing economy) শ্রমিক-সংঘ নিম্নলিখিতভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে ঃ

ক. শ্রমিক-সংঘ মালিকপক্ষের সহিত সময়ভিত্তিক চুক্তি (time-bound agreements) দ্বারা শিল্পোৎপাদনের লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়াস চালাইতে পারে।

খ. উন্নয়ন-পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য শিল্পে স্থায়ীভাবে শান্তি রক্ষা করিয়া উৎপাদনের গতিকে অব্যাহত রাখিতে হয়। শ্রমিক-সংঘ ও মালিকপক্ষের সহিত পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক-অসন্তোষ দূর করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

গ. শ্রমিক-সংঘ দর-কষাকষির মাধ্যমে শিল্পবিরোধ (industrial disputes) দ্রুত নিষ্পত্তি করিয়া শিল্পক্ষেত্রে বাধাবিঘ্ন সীমায়িত করিতে পারে।

ঘ. শ্রমিক-সংঘ নানারূপ কল্যাণমূলক কার্যাবলী দ্বারা শিল্পশ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া পরিকল্পনার জন্য লক্ষ্য অনুযায়ী উৎপাদন-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে পারে।

ঙ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহের ব্যাপারেও ইহা সরকারকে সাহায্য করিতে পারে। শিল্প-শ্রমিকরা যে-সকল বর্ধিত মজুরি বা বোনাস পাইয়া থাকে, তাহারা একাংশ যাহাতে শ্রমিকরা উন্নয়নমূলক কার্যে বিনিয়োগ করে তাহার জন্য শ্রমিক-সংঘ শ্রমিকদিগকে নানারূপ উৎসাহ বা প্রেরণা দিতে পারে।

শ্রমিক-সংঘের উপযোগিতা ঃ শ্রমিক-সংঘের নানারূপ কার্যাবলীর মধ্যেই শিল্প-ব্যবস্থায় ইহার উপযোগিতা অনুধাবন করা যায়। এই উপযোগিতা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল ঃ

ক. শ্রমিক-সংঘ হইতেছে শ্রমিকদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য একটি স্থায়ী সংগঠন। সুতরাং ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় মালিক কর্তৃক শ্রমিক যে-শোষিত ও উৎপীড়িত হয়, তাহার হাত হইতে শ্রমিকদিগকে মুক্ত করা যায়।

খ. শ্রমিক-সংঘ থাকাতে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীদাওয়ার বিশেষত মজুরি, বোনাস, কাজের শর্ত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে যথাসময়ে যথোচিত আন্দোলন গড়িয়া তোলা সম্ভব হয়।

গ. শ্রমিক-সংঘ মালিকপক্ষের সহিত পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শিল্প-ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। ইহা ছাড়া, শ্রমিক-শৃঙ্খলা (labour discipline) ও নিয়মানুবর্তিতা উন্নত করা যায়।

ঘ. শ্রমিক-সংঘ শিল্পবিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া শিল্পক্ষেত্রে অশান্তি হ্রাস করিতে পারে।

ঙ. আধুনিক বিরাট শিল্প-কারখানায় মালিকপক্ষ বহুসংখ্যক শ্রমিকের সঙ্গে সরাসরি আলাপ-আলোচনা করিতে পারে না। শ্রমিক-সম্পর্কিত কোন বিষয়ের আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন পড়িলে মালিকপক্ষে কয়েকজন শ্রমিক-নেতার সঙ্গেই উহা করিতে পারে।

চ. অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে শ্রমিক-সংঘ অংশ গ্রহণ করিতে পারে এবং ইহাতে শিল্পোৎপাদনের গতি ত্বরান্বিত করা যায়।

কিন্তু শ্রমিক-সংঘ সুসংগঠিত ও সুপরিচালিত না হইলে ইহা শিল্পক্ষেত্রে অযথা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা আনিতে পারে।

৮. **শ্রমিক-সংঘ কি মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারে? (Can Trade Unions Raise Wages?)ঃ** শ্রমিক-সংঘের একটি অন্যতম কাজ হইতেছে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা করে। শ্রমিক-সংঘ মালিকের সঙ্গে নানারূপ আলাপ-আলোচনা বা দর-কষাকষি বা আন্দোলনের মাধ্যমে মজুরি বাড়াইবার চেষ্টা করে। শ্রমিক-সংঘ স্থায়ীভাবে কোন শিল্পে মজুরি বাড়াইতে পারিবে কি না সে-সম্পর্কে মতবিরোধ আছে।

পুরাতন মতবাদ ঃ পূর্বেকার লেখকের মতে শ্রমিক-সংঘ সফলতার সহিত কোন শিল্পে মজুরি বাড়াইতে পারিবে না। কারণ চাপ দিয়া মজুরি বাড়ানো হইলে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার ফলে দাম না বাড়াইলে মালিকদের মুনাফা হ্রাস পাইবে, অবশেষে শ্রমিক-নিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। ইহাতে শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। আবার উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পূরণের জন্য মালিকরা জিনিসের দাম বাড়াইলে উহার চাহিদা হ্রাস পাইবে। ইহার ফলে উৎপাদন কমিয়া যাইবে এবং শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। সুতরাং দেখা যায়, মজুরি-বৃদ্ধির প্রচেষ্টা শ্রমিকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়।

আধুনিক মতবাদ ঃ কিন্তু আধুনিক লেখকরা পূর্বেকার এই বিশ্লেষণ মানিয়া লন না। তাঁহাদের মতে শ্রমিক-সংঘ কতকগুলি অবস্থায় মজুরি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে। অবশ্য সাধারণভাবে সকল শিল্পেই মজুরি-বৃদ্ধির দাবী করা হইলে শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। কারণ সাধারণভাবে সকল শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাইলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি হ্রাস পাইবে। আবার সাময়িক-

কালের জন্য শ্রমিক-সংঘ কোন বিশেষ শিল্পে মজুরি বাড়াইতে পারে। কিন্তু আমাদিগকে দেখিতে হইবে, স্থায়ীভাবে শ্রমিক-সংঘ কখন মজুরি বাড়াইতে পারে? শ্রমিক-সংঘ কোন বিশেষ শিল্পে স্থায়ীভাবে মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারিবে কি-না তাহা বিচার করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে ঃ

ক. **শিল্পে প্রচলিত মজুরির হার ঃ** যে-সকল শিল্পে প্রচলিত মজুরির হার খুবই স্বল্প অর্থাৎ শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপাদন-মূল্য কম, সেই সকল শিল্পে শ্রমিকরা মালিকের উপর চাপ দিয়া প্রান্তিক উৎপাদন-মূল্য পর্যন্ত মজুরি বাড়াইতে সক্ষম হইবে। কিন্তু যে-সকল শিল্পে মজুরির হার অপেক্ষাকৃত বেশী, সেই সকল শিল্পে মজুরি বৃদ্ধি সম্ভব হইবে না।

খ. **বিকল্প শিল্পে মজুরির হার ঃ** বিকল্প শিল্পে শ্রমিকদের মজুরির হার বেশী হইলে শ্রমিকরা সহজেই বিকল্প শিল্পে চলিয়া যাইতে পারিবে। এইরূপ অবস্থায় ভীতি প্রদর্শন করিয়া বা মালিকের উপর চাপ দিয়া শ্রমিক-সংঘ মজুরি বাড়াইতে পারিবে।

গ. **শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপাদনবৃদ্ধি ঃ** শ্রমিক-সংঘ নানারূপ কল্যাণমূলক কার্যাবলীর মাধ্যমে শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া উহাদের প্রান্তিক উৎপাদন বাড়াইতে পারে। ঐভাবে প্রান্তিক উৎপাদন বাড়ানো হইলে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের অধিক মজুরি দিতে দ্বিধাবোধ করিবে না।

ঘ. **উৎপাদিত বস্তুর চাহিদা ঃ** শ্রমিক-সংঘ শ্রমিকদের মজুরি বাড়াইতে পারিবে কি-না তাহা বহুলাংশে উৎপাদিত বস্তুর চাহিদার উপর নির্ভর করে। উৎপাদিত বস্তুর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (inelastic) হইলে মালিকপক্ষ সেই বস্তুর দাম বাড়াইয়া শ্রমিকদিগকে বেশী মজুরি দিতে পারিবে। কিন্তু শ্রমিকরা যদি স্থিতিস্থাপক (elastic) চাহিদার বস্তু উৎপাদন করে, তাহা হইলে মালিকপক্ষ উহার দাম বাড়াইতে পারিবে না। এইরূপ অবস্থায় শ্রমিক-সংঘ চাপ দিয়া মজুরি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে না।

ঙ. **মালিকের নিকট শ্রমিকদের কাজের চাহিদা ঃ** মালিকের নিকট শ্রমিকদের কাজের চাহিদা খুবই প্রয়োজনীয় অর্থাৎ অস্থিতিস্থাপক (inelastic) হইলে শ্রমিক-সংঘ আন্দোলন করিয়া মজুরি বাড়াইতে সক্ষম হয়। কারণ শ্রমিকরা অধিক মজুরির দাবী করিলে ঐরূপ ক্ষেত্রে মালিক মজুরি বৃদ্ধি করিতে একরূপ বাধ্য হইবে। অর্থাৎ শ্রমিকদের পরিবর্তে অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব না হইলে মালিকপক্ষ মজুরি বৃদ্ধি করিতে একরূপ বাধ্য হইবে। পক্ষান্তরে, মালিকের নিকট শ্রমিকদের কাজের চাহিদা স্থিতিস্থাপক (elastic) অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজন না হইলে মালিক শ্রমিকের পরিবর্তে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘ মজুরি বাড়াইতে সাধারণত সফল হইবে না।

চ. **মজুরি-ব্যয়ের পরিমাণ** ঃ শ্রমিকদের মজুরি মোট ব্যয়ের এক বিরাট অংশ হইলে (যেমন—গৃহনির্মাণ শিল্পে) মালিকপক্ষ সামান্য পরিমাণেও বাড়াইতে রাজী হয় না। কারণ ঐরূপ ক্ষেত্রে মজুরি সামান্যও বাড়ানো হইলে মোট ব্যয় খুব বেশী বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু শ্রমিকদের মজুরি মোট ব্যয়ের এক ক্ষুদ্র বা সামান্য অংশ হইলে মালিক মজুরি বাড়াইয়া দিতে বিশেষ দ্বিধাবোধ করে না। কারণ ঐরূপ অবস্থায় মজুরি বৃদ্ধি পাইলেও মোট ব্যয় বিশেষ বৃদ্ধি পায় না।

ছ. **অন্যান্য উপাদানের পারিশ্রমিক হ্রাস করার সম্ভাবনা** ঃ কোন কোন সময় মালিকপক্ষ মজুরি বাড়াইবার জন্য অন্যান্য উপাদানগুলির পারিশ্রমিক (যেমন—কারখানার ভাড়া, কাঁচামালের দাম, ঋণ-মূলধনের সুদ ইত্যাদি) হ্রাস করিবার চেষ্টা করে। মালিকপক্ষ ঐরূপ করিতে সমর্থ হইলে শ্রমিক-সংঘ মজুরি বাড়াইতে পারিবে। অন্যথায় মালিকপক্ষ মজুরি বৃদ্ধি করিতে রাজী হইবে না; ফলে শ্রমিক-সংঘের আন্দোলন ব্যর্থ হইতে পারে।

জ. **শ্রমিক সংঘের ক্ষমতা ও অর্থসংগতি** ঃ শ্রমিক-সংঘের মজুরি-বৃদ্ধির ক্ষমতা উহার সংগঠন-শক্তি ও অর্থসংগতির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনের সময় সংঘকে শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যের ভাব বজায় রাখিতে হয়। ইহা ছাড়া ধর্মঘটী শ্রমিকদিগকে ধর্মঘটের সময় অর্থসাহায্য দেওয়ার জন্য সংঘের হাতে যথেষ্ট অর্থসংগতি থাকা প্রয়োজন। তদুপরি, উচ্চ মজুরির হার বজায় রাখিতে হইলে শ্রমিকের যোগানও নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। যে-সকল শ্রমিক-সংঘ খুবই শক্তিশালী, সেই সকল সংঘের মজুরি-বৃদ্ধির আন্দোলনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

মজুরি-বৃদ্ধির ক্ষমতার সীমা ঃ শ্রমিক-সংঘের দর-কষাকষির ক্ষমতা (bargaining power) নিরঙ্কুশ (absolute) নহে অর্থাৎ ঐ ক্ষমতার সীমাও আছে। শ্রমিকদের বর্তমান মজুরি অধিক হইলে বা উৎপাদিত বস্তুর চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে বা শ্রমিকের পরিবর্তে অন্য পদ্ধতি বা কার্যপ্রণালী প্রবর্তনের সম্ভাবনা থাকিলে বা শ্রমিক-সংঘ দুর্বল হইলে মজুরি-বৃদ্ধির ক্ষমতাও বহুলাংশে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

উপসংহার ঃ উপরি-উক্ত বিষয়গুলি ছাড়া বাস্তবক্ষেত্রে শ্রমিক-সংঘের মজুরি-বৃদ্ধির ক্ষমতা নানারূপ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সংস্থাগত বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন—মালিকপক্ষ ও সরকারের মনোভাব, শ্রম-সংক্রান্ত প্রচলিত আইনসমূহ, শ্রমিকদের দাবীর প্রতি গণ-সমর্থন, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা, দামস্তর ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি শ্রমিকদের স্বার্থের অনুকূলে থাকিলে সংঘের মজুরি-বৃদ্ধির ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। পূর্বের তুলনায় আজকাল অবশ্য শ্রমিক-সংঘগুলি অধিকতর শক্তিশালী ও সুপরিচালিত হইয়াছে। ইহার ফলে আধুনিক সমাজে শ্রমিক-সংঘের ক্ষমতাও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য রাজনৈতিক দলাদলি বা সংঘগুলির মধ্যে অন্তর্বিরোধ বা দুর্বল নেতৃত্ব অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের যথোচিত দাবীকেও নষ্ট করিয়া দেয়।

২৩

॥ সুদ ॥

(Interest)

[সুদ-এর অর্থ—মোট সুদ ও নীট সুদ—সুদের হারে তারতম্য—প্রান্তিক—উৎপাদনশীলতার সুদতত্ত্ব—অর্থনৈতিক প্রগতি ও সুদের হার—সুদের হার কি শূন্যে নামিতে পারে ?]

উৎপাদন-কার্যে ব্যবহৃত ঋণ-মূলধন-এর দাম অর্থাৎ সুদ এই অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে।

১. 'সুদ'-এর অর্থ—মোট সুদ ও নীট সুদ (Meaning of Interest —Gross Interest and Net Interest) : কোন ব্যক্তি অপরের নিকট হইতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে টাকা ধার লয়, তাহার জন্য তাহাকে যে-দাম দিতে হয় সাধারণ অর্থে তাহাকেই সুদ বলা হয় অর্থাৎ ঋণ-গ্রহীতা গৃহীত ঋণের জন্য ঋণদাতাকে যে দাম দেয়, তাহাই হইতেছে সুদ। অর্থবিদ্যায় উৎপাদনাকার্যে ব্যবহৃত ঋণমূলধনের জন্য যে দাম দেওয়া হয় তাহাকেই সুদ বলে। যেমন, কোন ব্যক্তি ১০০ টাকা ধার লইয়া এক বৎসর পরে ১১২ টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সুদের বাৎসরিক হার হইবে শতকরা ১২ টাকা। ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের পর ঋণদাতাকে আসল ছাড়াও যে-অতিরিক্ত অর্থ দেয়, তাহাই হইতেছে সুদ।

ঋণদাতা যে-সুদ পায় তাহা হইতেছে 'মোট সুদ' (gross interest)। এই মোট সুদের মধ্যে শুধুমাত্র ঋণ-মূলধন ব্যবহারের জন্য দেয় অর্থ ছাড়াও আরও কতকগুলি বিষয় যুক্ত হইয়া পড়ে। মোট সুদ হইতে ঐ বিষয়গুলি বাদ দিলে 'নীট সুদ' (net interest) পাওয়া যাইবে। এখন দেখা যাউক, মোট সুদের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয় যুক্ত হয় ?

প্রথমত, অর্থ-মূলধন ধার দিলে ঋণগ্রহীতা উহা নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে বা সে উহা ফেরত না-ও দিতে পারে। সুতরাং ধারের মধ্যে মূলধন নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি রহিয়াছে। ঋণদাতা ঐ ঝুঁকি বাবদ কিছু অর্থ সুদের মধ্যে যোগ করিয়া তাহা আদায় করিয়া লয়।

দ্বিতীয়ত, ঋণদাতা তখন অর্থ-মূলধন ধার দেয়, তাহাকে কতকগুলি অসুবিধা মানিয়া লইতে হয়। যেমন—ঋণের হিসাব তাহাকে রাখিতে হইবে বা ঋণের টাকা আদায় করার জন্য নিয়মিত তাগাদা দিতে হইবে। এই সকল অসুবিধার মূল্য বাবদ ঋণদাতা কিছু অর্থ আদায় করে, উহা মোট সুদের অংশ হয়।

তৃতীয়ত, ধারের হিসাব রাখা ও ধার আদায়ের জন্য ঋণদাতাকে যে-অর্থ ব্যয় করিতে হয়, উহাও মোট সুদের মধ্যে ধরা হয়।

চতুর্থত, ঋণ মূলধন ব্যবহারের জন্য ঋণদাতা অর্থ দাবী করে। ঋণ-মূলধন উৎপাদনের কার্য নিয়োগ করা হইলে উৎপাদন সম্ভব হয় বা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ঐ বাবদও অর্থ দিতে হয়।

মোট সুদ হইতে প্রথম তিনটি বিষয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই হইবে 'নীট সুদ'। সুতরাং নীট সুদ হইতেছে শুধুমাত্র ঋণ-মূলধন ব্যবহারের জন্য দেয় অর্থ। 'মোট সুদ' বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ হইতে পারে। কারণ বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন অবস্থায় প্রথম তিনটি বিষয়ের বিশেষ তারতম্য থাকিতে পারে। কিন্তু 'নীট সুদ' সর্বত্রই সমান হইবে। অন্যথায় যেখানে নীট সুদের হার অন্য ক্ষেত্রের বা অন্য স্থানে তুলনায় অধিক হয়, সেইখানে ঋণ-মূলধন চলিয়া যাইবে।

'সুদ' সম্পর্কে ধারণা : বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখক সুদ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কোন কোন লেখকদের মতে, সুদ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন-মূল্যের সমান এবং মূলধন উৎপাদনশীল বলিয়া সুদ দিতে হয়। এই মতবাদটি পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে। আবার, সিনিয়র (Senior) প্রমুখ লেখকদের মতে, সুদ হইতেছে বর্তমান ভোগ-বিরতির (abstinence from present consumption) পুরস্কার। অধ্যাপক মার্শাল-এর (Marshall) মতে সুদ হইতেছে ভবিষ্যৎ ভোগের জন্য প্রতীক্ষার (waiting) পুরস্কার। রবার্টসন (Robertson) সুদকে 'ঋণযোগ্য তহবিলে'র (loanable fund) ব্যবহারের দাম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পরিশেষে কেইনস্-এর (Keynes) মতে, কোন নির্দিষ্ট সময়-মেয়াদে নগদ টাকা পরিত্যাগ করার জন্য যে-পুরস্কার পাওয়া যায়, তাহাই হইতেছে সুদ (a reward for the sacrifice of liquidity for a specified period o time)

২. **সুদের হারে তারতম্য (Difference in the Rates of Interest) :** প্রতিযোগিতার শক্তি অনুসারে একই প্রকার ঋণের জন্য একই সুদের হার হওয়ার প্রবণতা থাকে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার ঋণের জন্য বিভিন্ন প্রকার সুদের হার দেখা যায়। যেমন—কোন সুনামী ব্যবসায়ী ব্যাংকের নিকট হইতে স্বল্প সুদের হারে ঋণ লইতে পারে, কিন্তু কৃষি-ঋণের জন্য কৃষককে চড়া সুদ দিতে হয়। আবার সরকারী ঋণপত্রের (government securities) সুদের হার অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু কোম্পানী-আমানতের (company deposits) ক্ষেত্রে সুদের হার অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। উৎপাদনশীল কার্যের জন্য ঋণের উপর সুদের হার অপেক্ষাকৃত কম হয়, কিন্তু ভোগ-ঋণের জন্য সুদের হার অধিক হয়। সুদের হারের এইরূপ তারতম্যের কতকগুলি কারণ দেখা যায় :

ক. **ঋণের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা :** যে-সকল ঋণের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার (risk and uncertainly in loan) পরিমাণ অধিক হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে সুদের হার অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। পক্ষান্তরে, ঋণের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা কম হইলে সুদের হার অপেক্ষাকৃত কম হয়। সরকারকে ধার দেওয়া হইলে, তাহাতে ঝুঁকি বিশেষ থাকে না বা টাকা ফেরত পাওয়ার বিশেষ কোন অনিশ্চয়তা থাকে না। এই কারণে সরকারী ঋণের সুদের হার কম। কিন্তু কোন কোম্পানীকে ধার দেওয়া

হইলে তাহাতে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার পরিমাণ বেশী হয়। ইহার ফলে কোম্পানী-আমানতের উপর সুদের হার অপেক্ষাকৃত বেশী হয়।

খ. **ঋণের সময়-মেয়াদ**ঃ দীর্ঘকালীন ঋণের জন্য সুদের হার বেশী হয়, কিন্তু স্বল্পকালীন ঋণের জন্য সুদের হার কম হয়। দীর্ঘ সময়ের জন্য ঋণ দেওয়া হইলে ঋণদাতা দীর্ঘকালের জন্য ঋণের টাকা ফেরত পায় না বলিয়া অধিক সুদ দাবী করে। কিন্তু স্বল্পকালীন ঋণের ক্ষেত্রে স্বল্পকাল পরেই ঋণের টাকা ফেরত পায় বলিয়াই কম সুদের হারে সে টাকা টাকা ধার দিতে রাজী হয়।

গ. **ঋণের পরিমাণ** সুদের হার ঋণের পরিমাণের উপরও নির্ভর করে। ঋণের পরিমাণ অধিক হইলে সুদের হার অধিক হয়। কিন্তু ঋণের পরিমাণ কম হইলে সুদের হার কম হয়।

ঘ. **ঋণের জামিনের তারতম্য**ঃ ঋণগ্রহণের জন্য যে-জামিন (security) দিতে হয়, তাহার তারতম্যের ফলে সুদের হারে তারতম্য ঘটিয়া থাকে। জমি, বাড়ী ইত্যাদি জামিন হস্তান্তর করিতে অসুবিধা হয় বলিয়া উহাদের বিরুদ্ধে ঋণ লওয়া হইলে সুদের হার অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। কিন্তু সোনা, সরকারী ঋণপত্র ইত্যাদি জামিন খুবই নিরাপদ এবং ঐগুলি সহজেই হস্তান্তর করা যায় বলিয়া উহাদের বিরুদ্ধে কম সুদের হারে ঋণ পাওয়া যায়।

ঙ. **ঋণ-গ্রহীতার আর্থিক অবস্থা ও সুনাম**ঃ ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইলে বা বাজারে তাহার সুনাম থাকিলে, তাহাকে ঋণ দেওয়ার বিশেষ ঝুঁকি থাকে না। ইহার ফলে, তাহার পক্ষে বাজার হইতে অপেক্ষাকৃত কম সুদের হারে ঋণগ্রহণ করা সম্ভব হয়। এই কারণে বড় বড় সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত কম সুদের হারে বাজারে বন্ড (bond) অর্থাৎ ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া ঋণ লইতে পারে। কিন্তু গরীব কৃষক বা স্বল্পবিত্তের কারিগরকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ হারে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। কারণ তাহাদের টাকা ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম হয়।

চ. **ঋণের উদ্দেশ্য**ঃ উৎপাদনশীল কার্যের জন্য ঋণ লওয়া হইলে সুদের হার কম হয়, কিন্তু ভোগকর্মের জন্য যে-ঋণ (consumption loan) লওয়া হয় তাহার জন্য সুদের হার বেশী হয়। কারণ ভোগ-ঋণের তুলনায় উৎপাদনশীল কাজের জন্য ঋণ অধিকতর নিরাপদ।

ছ. **মূলধনের অসচলতা**ঃ মূলধনের সচলতার (mobility of capital) অভাবের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন দেশে সুদের হারও বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। মূলধন নানাকারণে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বা এক দেশ হইতে অন্য দেশে চালান দেওয়া সম্ভব হয় না বলিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে বা বিভিন্ন দেশে সুদের হার বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে।

জ. **সরকারের বৈষম্যমূলক সুদ নীতি**ঃ কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, রপ্তানি-বাণিজ্য প্রভৃতি উৎপাদনশীল ক্ষেত্র প্রসারিত করার জন্য বা সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অধিকতর ঋণপ্রদানের জন্য কোন কোন দেশে সরকার সুদের হার বাজার-হার

অপেক্ষা কম ধার্য করার নির্দেশ দিয়া থাকে। আবার ফটকা-কারবার সংক্রান্ত কার্য-কলাপের জন্য সুদের হার অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। ভারতেও ব্যাংকগুলি সুদের এই বৈষম্যমূলক নীতি (differential interest rate) অনুসরণ করিতেছে। ইহার ফলে ব্যাংকগুলি উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে ঋণপ্রদানের ক্ষেত্রে কম সুদ এবং ফটকা-কারবার সংক্রান্ত কার্যকলাপের জন্য অধিক সুদ আদায় করিয়া থাকে।

ঝ. **ঋণকার্যের জন্য ঋণদাতার অতিরিক্ত কাজ**ঃ কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণের টাকার নিরাপত্তার জন্য ঋণদাতাকে কিছু অতিরিক্ত কাজ করিতে হয়। যেমন, ঋণের টাকা লইয়া ঋণগ্রহীতা যাহাতে পলাইয়া না যায়, সেইজন্য তাহার গতিবিধির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হয় বা কারখানা শ্রমিকদের নিকট হইতে ঋণের টাকা আদায়ের জন্য বেতনের দিন কারখানার দরজায় অপেক্ষা করিতে হয়। এই সকল ক্ষেত্রে সুদের হার স্বভাবতই বেশী হয়।

ঞ. **অপূর্ণাঙ্গ ঋণের বাজার**ঃ সুদের হারের তারতম্যের অন্যতম কারণ হইতেছে ঋণের বাজারের অপূর্ণাঙ্গ অবস্থা অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার ঋণের জন্য প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান দেখা যায় এবং উহাদের মধ্যে বিশেষ কোন প্রতিযোগিতা থাকে না। যেমন—বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সাধারণত স্বল্পকালীন ঋণ দেয়, শিল্প-ব্যাংকগুলি (যেমন—শিল্প অর্থ কর্পোরেশন, শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক প্রভৃতি) শিল্পসংস্থাকে দীর্ঘকালীন ঋণ দেয়, কৃষি ব্যাংক (যেমন—কৃষি ও গ্রামীন উন্নয়নের জাতীয় ব্যাংক প্রভৃতি) কৃষিকার্যের জন্য ঋণ দেয়, সমবায় ঋণদান সমিতি উহার সদস্যকে ঋণ দেয়, গ্রামীন মহাজন পল্লী-অঞ্চলে ঋণ দেয় প্রভৃতি। ঋণপ্রদানকারী এই সকল সংস্থা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সুদের হারে দিয়া থাকে। অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণের চাহিদা ও যোগান একরূপ না হওয়ায় এই সংস্থাগুলি ঋণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুদের হার দাবী করে।

উপসংহারঃ উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্য কোন দেশে সুদের একক এবং অভিন্ন হার দেখা যায় না। বাস্তবক্ষেত্রে একক সুদের হারের পরিবর্তে দেখা যায় বিভিন্ন প্রকার ঋণের জন্য বিভিন্ন প্রকার সুদের হার।

৩. **প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সুদ-তত্ত্ব (Marginal Productivity Theory of Interest)**ঃ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা সুদ-তত্ত্বটিও প্রান্তিক উৎপাদন-শীলতার বন্টন-তত্ত্বের একটি অংশবিশেষ। এই তত্ত্বে বলা হয়, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা সুদের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দেয় অর্থাৎ সুদের পরিমাণ বেশী হইবে না কম হইবে তাহা মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভর করে।

মূলধন হইতেছে উৎপাদনশীল, কারণ ইহা উৎপাদন-কার্যে ব্যবহার করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা যায়। আধুনিক, জটিল ও বৃহদায়তনের উৎপাদনে মূলধনের বিরাট ভূমিকা দেখা যায়। মূলধনের সাহায্যে যতটা উৎপাদন

করা যায়, মূলধনের সাহায্য ব্যতীত ততটা উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। যেমন— কোন জেলে শুধুমাত্র খালি হাতে যতটা মাছ ধরিতে সমর্থ হয়, জাল ও নৌকা (অর্থাৎ মূলধন সামগ্রী) দ্বারা উহা অপেক্ষা অধিক মাছ ধরিতে সমর্থ হইবে। মূলধনের জন্য সুদ দিতে রাজী থাকে। সুতরাং মূলধনের উৎপাদনশীলতা যত বেশী হইবে সুদের পরিমাণও তত বেশী হইবে এবং মূলধনের উৎপাদনশীলতা যখন কম হইবে সুদের পরিমাণও তখন কম হইবে।

কিন্তু অন্যান্য উপাদানের মতো মূলধন নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইলে মূলধনের প্রান্তিক উপাদান (অর্থাৎ, এক একক অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগের ফলে অতিরিক্ত উপাদান) ক্রমশ হ্রাস পায়। এই অবস্থায় মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ যতক্ষণ মূলধনের জন্য দেয় সুদের হার অপেক্ষা অধিক হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদক বা ফার্ম মূলধন ধার করিয়া উহা উৎপাদনের কার্যে বিনিয়োগ করিবে। অবশেষে মূলধনের প্রান্তিক উপাদান হ্রাস পাইতে পাইতে যখন সুদের হারের সমান হয়, তখন ফার্ম অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ করা বন্ধ করিয়া দিবে। কারণ ইহার পর আরও মূলধন নিয়োগ করা হইলে সুদ অপেক্ষা মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন কম হইবে। সুতরাং ভারসাম্য অবস্থায় ঋণ-মূলধনের জন্য দেয় সুদ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্যের সমান হইবে। ভবিষ্যতে যদি কোন কারণে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে এবং কোন কারণে উহা হ্রাস পাইলে সুদের হার হ্রাস পাইবে।

তত্ত্বটির সমালোচনা ঃ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার বন্টন-তত্ত্বের বিরুদ্ধে যে-সকল সমালোচনা করা যায় সেইগুলি এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে বলা যায়। এই তত্ত্বটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা এখানে দেওয়া হইল ঃ

প্রথমত, সুদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি হইতেছে একটি এক-তরফা (one-sided) বিশ্লেষণ। কারণ ব্যবসায়ে বা উৎপাদনকার্যে কত মূলধন নিয়োগ করা হইবে তাহা শুধুমাত্র মূলধনের উৎপাদনশক্তি অর্থাৎ চাহিদার দিকের উপর নির্ভর করে না, উহা মূলধনের যোগানের উপরও নির্ভর করে। সুদ-নির্ধারণের ব্যাপারে এই তত্ত্বটি শুধুমাত্র মূলধনের চাহিদার দিকই বিবেচনা করিয়াছে, ইহা যোগানের দিক বিবেচনা করে নাই।

দ্বিতীয়ত, কেইন্স (Keynes) এই তত্ত্বটি গ্রহণ করেন নাই। কারণ তাঁহার মতে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে ভবিষ্যত মুনাফা-সম্ভাবনা ও মূলধন-সামগ্রীর ব্যয়ের উপর। কিন্তু এই বিষয় দুইটি সুদের হার নিরূপণ করিতে পারে না। আবার, মূলধনের উৎপাদনশক্তিই ভবিষ্যৎ সুদের হারের দ্বারাই বহুলাংশে নিরূপিত হয়। সুতরাং ইহা সুদের হার নির্ধারণ করিতে পারে না।

তৃতীয়ত, মূলধন ব্যবহারের ফলে মোট উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে, একথা ঠিক। কিন্তু অধিক মূলধন ব্যবহারের ফলে সকল ক্ষেত্রেই অধিক মূল্য উৎপাদিত হয়, একথা

ঠিক নহে। কারণ মূলধন ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ এত বাড়িয়া যাইতে পারে যে উহার ফলে মূলধন কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যাইতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, জমি বা শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন যে কারণে পৃথকভাবে নিরূপণ করা যায় না, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনও সেই কারণে পৃথক করিয়া নিরূপণ করা যায় না। কারণ উৎপাদন হইতেছে সকল উপাদানের যৌথ প্রচেষ্টার ফল। সুতরাং মূলধনের কোন পৃথক প্রান্তিক উৎপাদন থাকিতে পারে না।

উপসংহার ঃ এই তত্ত্বটির নানারূপ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ইহার আংশিক সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। মূলধন ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং তাহার জন্য ব্যবসায়ী ঋণ-মূলধনের উপর সুদ দিতে রাজী থাকে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সুদের হার নির্ধারণের জন্য শুধু মূলধনের চাহিদার দিকই যথেষ্ট নহে, উহার যোগানের দিকও বিবেচনা করিতে হয়। এই কারণে পরবর্তীকালের লেখকরা সুদের হার নিধারণের জন্য পৃথক পৃথক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যেমন—রবার্টসন (Robertson) প্রমুখ লেখকরা ঋণযোগ্য তহবিলের (loanable fund) চাহিদা ও যোগান দ্বারা সুদের হার নির্ধারণ করিতে চাহিয়াছেন। আবার, কেইনস্ নগদ-পছন্দ (liquidity preference) দ্বারা সুদের হার নির্ধারণ করার কথা বলিয়াছেন।

৪. **অর্থনৈতিক প্রগতি ও সুদের হার (Economic Progress and the Rate of Interest) ঃ** অর্থনৈতিক প্রগতি বলিতে দেশের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের নিয়মিত বৃদ্ধি, উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতি, কারিগরী কলাকুশলের উন্নতি, শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রভৃতিকে বুঝায়। অর্থনৈতিক প্রগতি ও সুদের হারের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায়। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সুদের হার বাড়িবে না কমিবে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাইতে হইলে ঋণের ভবিষ্যত চাহিদা ও যোগান বিশ্লেষণ করিতে হয়। কারণ সুদের হার প্রকৃতপক্ষে ঋণযোগ্য তহবিলের (loanable funds) চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে।

সাধারণভাবে বলা হয়, অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান বৃদ্ধি পায়। কয়েকটি কারণে এই বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে ঃ

প্রথমত, অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে দেশের লোকদের আয় বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে তাহাদের সঞ্চয় করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে সমাজে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে দেশে ঋণযোগ্য তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক প্রগতি দেশের লোকদের চিন্তাধারায় ও দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন আনে, তাহাদের দূরদৃষ্টি বৃদ্ধি করে এবং তাহারা ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করিতে চাহে। অর্থাৎ মানুষ যতই সভ্য ও সমৃদ্ধ হইতে থাকে তাহার আয়বৃদ্ধির সঙ্গে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা (marginal

propensity of save) বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলেও উন্নত অর্থব্যবস্থায় দেশের লোকেদের সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নতি দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে অগ্রগতির সূচনা করে। ইহার ফলে দেশে আয়স্তর বৃদ্ধি পায় এবং পরিশেষে সঞ্চয় ও ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং দেখা যায়, অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে দেশের লোকেদের সঞ্চয় করার ক্ষমতা ও ইচ্ছা উভয়ই বৃদ্ধি পায় বলিয়া ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে সুদের হার হ্রাস পাওয়ার প্রবণতা থাকে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুদের হার হ্রাস পাইবে কি-না তাহা নির্ভর করে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদার উপর। অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে পারে বা হ্রাসও পাইতে পারে। অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য দেশের কৃষি, শিল্প, ববসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়। উহার জন্য প্রয়োজন পড়ে অধিক পরিমাণ ঋণযোগ্য তহবিলের। ইহা ছাড়া, অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে কৃষি, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে নূতন নূতন মূলধন-সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করা হয়। তাহার জন্যও ঋণ-মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে উৎপাদনক্ষেত্রে নূতন পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রক্রিয়া পূর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল হইতে পারে। এই কারণে মূলধন-সামগ্রীর ব্যবহার হ্রাস পাইতে পারে। তদুপরি, উৎপাদনকার্যে শ্রমনিয়োগের সুযোগ প্রসারিত হওয়ার ফলেও মূলধন ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে। এই দুইটি কারণে ঋণ-মূলধনের চাহিদা হ্রাস পাইতে পারে।

সুদের হারের উপর অর্থনৈতিক প্রগতির কি প্রভাব আসিবে, তাহা ঋণ-মূলধনের চাহিদা ও যোগানের আপেক্ষিক শক্তির উপর নির্ভর করে। সাধারণত ভবিষ্যতে সুদের হার হ্রাস পাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। কারণ অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে কোন দেশে দীর্ঘকালীন সময়ে জনসংখ্যার পরিমাণ স্থিতিশীল হয় বা হ্রাস পায়। ইহার ফলে ঋণ-মূলধনের চাহিদা হ্রাস পাইবে। তদুপরি যতই কোন দেশ উন্নত হইতে থাকে ততই সেই দেশের লোকদের প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা (marginal propensity to consume) হ্রাস পায় এবং প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে একদিকে যেমন ঋণ-মূলধনের যোগান বৃদ্ধি পায়, তেমনি অন্যদিকে ভোগ্যপণ্য ও অবশেষে মূলধন দ্রব্যাদির চাহিদা হ্রাস পাইবে। সুতরাং দীর্ঘকালীন সময়ে অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে সুদের হার হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

সুদের হার কি শূন্যে নামিতে পারে?: সুদের হার হ্রাস পাইতে পাইতে কি শূন্যে (zero) নামিতে পারে? কোন কোন লেখকের মতে, স্থিতিশীল অর্থব্যবস্থায় (static economy) ঋণযোগ্য মূলধনের চাহিদা শূন্য হয় বলিয়া সুদের হারও শূন্যে নামিয়া যাইবে। ঐরূপ অর্থব্যবস্থায় কোন নূতন বিনিয়োগ হয় না বলিয়া ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা শূন্য হইয়া পড়ে এবং উহার ফলে সুদের হারও শূন্য হইয়া পড়িবে।

কিন্তু এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে। সুদের হার শূন্য হওয়ার অর্থ হইল মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হইবে। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। আবার গতিশীল অর্থব্যবস্থায় নূতন নূতন দ্রব্য বা যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ইত্যাদি গতিশীল শক্তির জন্য সমাজে সকল সময়ই ঋণমূলধনের অল্পাবিস্তর চাহিদা থাকিবেই এবং উহার ফলে সুদের হার কখনই শূন্য হইতে পারে না। তদুপরি, সুদের হার শূন্য হওয়ার অর্থ হইবে নগদ টাকার জন্য পছন্দ (liquidity preference) থাকিবে না। কিন্তু ইহাও সত্য নহে। কারণ অন্যান্য সম্পদের তুলনায় নগদ টাকার অপেক্ষাকৃত অধিক সুবিধা থাকার জন্য সমাজে সকল সময়ই লোকেরা অন্তত লেনদেন ও সর্তকতার (transaction and precautionary movtives) জন্য নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চাহিবে। সুতরাং সামগ্রিক অর্থব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ হইতে নগদ পছন্দ সকল সময়ই অল্পাবিস্তর থাকিবে এবং ফলে সুদের হারও কখনই শূন্যে নামিবে না।

ইহা ছাড়া, আধুনিক অর্থনীতিবিদ কেইনস্ (Keynes) তাঁহার নগদ-পছন্দ সুদ-তত্ত্বে দেখাইয়াছেন যে, সুদের হার শূন্য হওয়াতো দূরের কথা, তাহা কোন একটা স্তরের নিম্নে যাইতে পারে না। উক্ত স্তরের নিম্নে গেলেই কেহই টাকা ধার দিতে রাজী থাকিবে না। অর্থাৎ উক্ত সুদের হারে নগদ টাকার চাহিদা অসীম (infinite) হইবে। উহাকেই কেইনস্ 'নগদাবস্থার ফাঁদ' (liquidity trap) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

উপরি-উক্ত আলোচনায় সুদের হারের উপর অর্থনৈতিক প্রগতির প্রভাব বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, সুদের হার অর্থনৈতিক প্রগতিকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করে?

অর্থনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে সুদেরও বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়ঃ

প্রথমত, অর্থনৈতিক-প্রগতির প্রারম্ভিক পর্বে অর্থব্যবস্থার বিভিন্নক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়। ইহার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে সুদের হার হ্রাস করিতে হয়। বিনিয়োগবৃদ্ধির জন্য যাহাতে দেশে ব্যাংকসমূহ ও অন্যান্য অর্থকরী প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ দেয় তাহার জন্য সুদের হার কম রাখিতে হয়।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতি যাহাতে চরমে না উঠে তাহার জন্য ফটকা-ঋণ (speculative credit) নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ক্ষেত্রবিশেষে সুদের হার বৃদ্ধি করিতে হয়। বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের জন্য একদিকে যেমন সুদের হার কম রাখিতে হয়, তেমনি অপ্রয়োজনীয় বা অকাম্য বিনিয়োগের জন্য সুদের হার বেশী রাখিতে হয়।

তৃতীয়ত, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য দেশে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও আমানতের পরিমাণ বাড়াইতে হয়। এই উদ্দেশ্যে সঞ্চয় ও আমানতের জন্য সুদের হার বৃদ্ধি করিতে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, দেশে সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য বিশেষত অনগ্রসর এলাকার (backward areas) দ্রুত উন্নয়নের জন্য ঐ সকল এলাকায় কম-সুদের হারের সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়। অনগ্রসর অঞ্চলে নূতন নূতন শিল্পস্থাপনের জন্য স্বল্প-সুদের হারে ঋণপ্রদানের ব্যবস্থা করিতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে দেশের প্রগতির জন্য সরকার ও ব্যাংক-ব্যবস্থাকে একক সুদের হারের পরিবর্তে বৈষম্যমূলক সুদের হার নীতি অনুসরণ করিতে হয়।

২৪

॥ মুনাফা ॥
(Profits)

[মুনাফার সংজ্ঞা—মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা—মুনাফার স্বরূপ ও উপাদানসমূহ—মুনাফা ও অন্যান্য আয়ের মধ্যে পার্থক্য—স্বাভাবিক মুনাফা—মুনাফা সমান হওয়ার প্রবণতা—প্রান্তিক উৎপাদনশক্তি ও মুনাফা।]

উৎপাদন-কার্যে ব্যবহৃত চতুর্থ উপাদানের অর্থাৎ উদ্যোক্তার সেবাকার্যের দাম হইতেছে 'মুনাফা'। বর্তমান অধ্যায়ে 'মুনাফা' সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

১. **মুনাফার সংজ্ঞা—মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা (Definition of Profit —Gross Profit and Net Profit)ঃ** পূর্বেই দেখানো হইয়াছে, উৎপাদন-কার্যে একজন উদ্যোক্তাকে নানারূপ কাজ করিতে হয়। উদ্যোক্তা তাহা জন্য যে-আয় বা তাহার সেবাকার্যের জন্য যে-দাম পায়, তাহাকেই 'মুনাফা' বলা হয়। উদ্যোক্তা দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া যে-অর্থ পায়, উহা হইতে খাজনা সুদ ও মজুরি ইত্যাদি বাবদ যে-ব্যয় হয়, তাহা বাদ দিলে মোট মুনাফা (gross profits) পাওয়া যাইবে অর্থাৎ মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে মোট উৎপাদন-ব্যয় বাদ দিলে মোট মুনাফা পাওয়া যায়। যেমন—কোন একজন উদ্যোক্তা তাহার উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ৩০,০০০ টাকা পাইল এবং ঐ দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য তাহার ব্যয় হইতেছে ২০,০০০ টাকা। এইক্ষেত্রে উদ্যোক্তার মোট মুনাফা হইতেছে ১০,০০০ টাকা। সুতরাং **মোট মুনাফা =মোট বিক্রয়লব্ধ আয়—মোট উৎপাদন ব্যয়**। ইহা পরপৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দোখানো হইল।

পরপৃষ্ঠার রেখাচিত্রে **কট** দ্বারা মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ও মোট উৎপাদন ব্যয় দেখানো হইতেছে এবং **কপ** মোট বিক্রয় পরিমাণ নির্দেশ করে। **কখ** রেখাটি হইতেছে মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের রেখা এবং **কগ** মোট উৎপাদন ব্যয় রেখা। **কচ** পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করা হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইতেছে **চছ** এবং মোট উৎপাদন-ব্যয় **চজ**। সুতরাং ঐ অবস্থায় মোট মুনাফা **ছজ**। **ঘ** বিন্দুর পরে দ্রব্যাদি বিক্রয় হইলে বিক্রেতার ক্ষতি হয়, তাহাও রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে। মোট মুনাফা হইতে কতকগুলি বিষয় (যেমন—উদ্যোক্তার নিজস্ব জমির খাজনা, তাহার

১. মুনাফা সম্পর্কে দশম অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে।

নিজস্ব মূলধনের সুদ ইত্যাদি) বাদ দিলে নীট মুনাফা (net profits) পাওয়া যায়। এ-সম্পর্কে পরের অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হইতেছে।
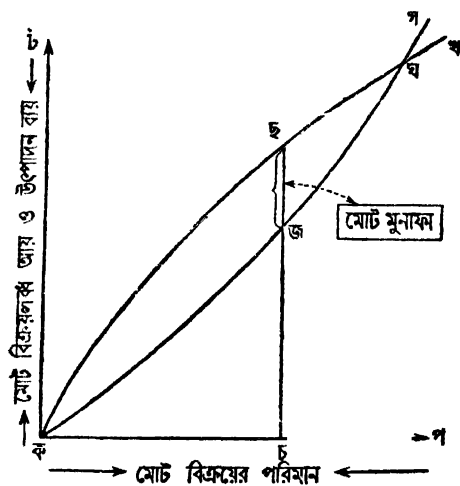
চিত্র-৪৭

মুনাফার স্বরূপ ও উপাদানসমূহ (Natures and Elements of Profits)ঃ মুনাফার স্বরূপ সম্বন্ধে ১১২ পৃষ্ঠায় বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। এখন ইহার উপাদানগুলি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হইবে। 'মোট মুনাফা' ও 'নীট মুনাফা'র উপাদানগুলি এখানে পৃথক করিয়া আলোচনা করা হইল।

মোট মুনাফার উপাদানসমূহঃ মোট মুনাফার কতকগুলি উপাদান আছে। প্রথমত, উদ্যোক্তা তাহার নিজস্ব বাড়ী বা জমি উৎপাদনের কাজে লাগাইতে পারে। তাহার নিজস্ব বাড়ী বা জমির জন্য কোন খাজনা দেওয়া হয় না। সুতরাং, ঐ জমি ভাড়া করা হইলে যে- খাজনা দিতে হইত, উহা মোট মুনাফার মধ্যে যুক্ত হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তার নিজস্ব মূলধন উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করা হইলে উহার জন্য কোন সুদ দিতে হয় না। সুতরাং ঐ সুদও মোট মুনাফার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

তৃতীয়ত, উদ্যোক্তা উৎপাদানকার্যে শ্রমিকদের ন্যায় যে-পরিশ্রম করে তাহার জন্য সে কোন মজুরি গ্রহণ করে না। উহাও মোট মুনাফার মধ্যে যোগ হয়।

চতুর্থত, উদ্যোক্তা উৎপাদনকার্যের ঝুঁকি (risk) গ্রহণ করে। তাহাকে বাজারের ভবিষ্যত অবস্থা পরীক্ষা করিয়া উৎপাদনকার্য চালাইতে হয়। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলিয়া এই কাজে বিশেষ ঝুঁকি থাকে। ঐ ঝুঁকি গ্রহণের জন্য উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রত্যাশা করে এবং উহা মোট মুনাফার মধ্যে যুক্ত হয়। এই শেষোক্ত উপাদানটি হইতেছে 'নীট মুনাফা' (net profit)। সুতরাং উৎপাদন-কার্যে ঝুঁকি গ্রহণের জন্য উদ্যোক্তা যে- পুরস্কার পায় তাহাই হইতেছে 'নীট মুনাফা'। ইহা হইতে

বলা যায়, **নীট মুনাফা = মোট মুনাফা—উদ্যোক্তার নিজস্ব উপকরণগুলির দাম।** এখন দেখা যাউক, নীট মুনাফার উপাদানগুলি কি ?

নীট মুনাফার উপাদানসমূহ : নীট মুনাফার কতকগুলি উপাদান দেখা যায় :

ক. ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার পুরস্কার : উৎপাদনকার্যে উদ্যোক্তার অন্যতম কাজ হইতেছে ব্যবসায়ের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা (risk and uncertainty) গ্রহণ করা। বেন্‌হাম (Benham) মন্তব্য করিয়াছেন, অনিশ্চয়তার মধ্যেই মুনাফার উদ্ভব ঘটে (Profits have their origin in uncertainty—*Benham*)। নাইট-এর (Knight) মতে, সকল বিশুদ্ধ মুনাফা অনিশ্চয়তার সঙ্গে জড়িত থাকে (All true profit is linked with uncertainty—*Knight*)। ব্যবসায়ের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা গ্রহণের কাজ আরামপ্রদ নহে, ইহা বিশেষ কষ্টসাপেক্ষ ব্যাপার। সুতরাং ঐ কাজের জন্য উপযুক্ত পুরস্কার অর্থাৎ মুনাফা না থাকিলে কেহই উহা গ্রহণ করিতে রাজী হইবে না।

খ একচেটিয়া লাভ : কোন কোন ক্ষেত্রে বাজারে উদ্যোক্তা বা উৎপাদকের একচেটিয়া আধিপত্য বা কর্তৃত্ব থাকে এবং উহার ফলে উৎপাদক কিছু অতিরিক্ত মুনাফা ভোগ করিতে সমর্থ হয়। এই একচেটিয়া উপার্জন (earnings of monopoly) কখনও কখনও নীট মুনাফার অন্তর্ভুক্ত হয়।

গ. আকস্মিক প্রাপ্তি বা লাভ : ব্যবসাজগতের নানারূপ অনিশ্চিত পরিস্থিতির জন্য কখনও কখনও চাহিদা ও যোগান-এর আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। উহার ফলে উৎপাদক কিছু পরিমাণ 'অপ্রত্যাশিত লাভ' (windfall profits) করার সুযোগ পায়, ইহাও নীট মুনাফার একটি উপাদান হইয়া পড়ে। যেমন—অকস্মাৎ বিদ্যুৎশক্তি বন্ধ হইয়া গেলে মোমবাতি বা কেরোসিন-বাতি বিক্রেতারা কিছু বাড়তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহাই হইতেছে আকস্মিক লাভ।

ঘ. দ্রব্য-পৃথকীকরণের আয় : আধুনিক অর্থব্যবস্থায় বাজারের অপূর্ণাঙ্গতার জন্য বিজ্ঞাপন, প্রচারকার্য প্রভৃতির মাধ্যমে উৎপাদকরা তাহাদের বস্তুগুলি অন্যান্য দ্রব্য হইতে পৃথক করিয়া তুলিতে সমর্থ হয়। এই দ্রব্য-পৃথকীকরণের ফলেও উৎপাদকের বিশেষ লাভ হয় এবং উহা নীট মুনাফার মধ্যে যুক্ত হয়।

ঙ. উদ্ভাবনকার্যের লাভ : গতিশীল অর্থব্যবস্থায় নূতন নূতন দ্রব্য বা নূতন নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি বা নূতন নূতন বাজার উদ্ভাবন (innovation) করা উদ্যোক্তার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। উদ্ভাবনকারী উদ্যোক্তা অন্যান্য উদ্যোক্তার তুলনায় অন্তত কিছুকালের জন্য অতিরিক্ত আয় উপার্জন করিতে পারে। ঐ লাভও নীট মুনাফার আর একটি উপাদান।

চ. শোষণকার্য হইতে আয় : ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় পুঁজিপতি উদ্যোক্তা শ্রমিককে কম দিয়া বা ক্রেতার নিকট হইতে অধিক দাম আদায় করিয়া তাহাদের মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধির চেষ্টা করে। শোষণকার্যের এই লাভ (gains from exploitation)

নীতির দিক হইতে সমর্থনীয় নহে, কিন্তু ইহা অবস্থাবিশেষে নীট মুনাফার অন্তর্গত হইয়া পড়ে।

মুনাফা ও অন্যান্য আয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ মুনাফার স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মুনাফা ও অন্যান্য আয়ের মধ্যে যে-পার্থক্য দেখা যায়, তাহা বিশ্লেষণ করিতে হয়। এখানে অন্যান্য আয় বলিতে অন্যান্য উপাদানের আয় অর্থাৎ খাজনা, মজুরি ও সুদকেই বুঝাইতেছে। উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায় ঃ

প্রথমত, খাজনা, মজুরি ও সুদ পূর্ব-চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয় বলিয়া উহাদিগকে 'চুক্তিবদ্ধ আয়' (contractual income) বলা হয়। কিন্তু মুনাফা কোনরূপ চুক্তি দ্বারা স্থির হয় না। সুতরাং ইহা চুক্তিবদ্ধ আয় নহে।

দ্বিতীয়ত, মুনাফাকে অবশিষ্ট আয় (residual income) বলিয়া অভিহিত করা হয় অর্থাৎ মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে উদ্যোক্তা প্রথমে খাজনা, মজুরি ও সুদ দেয়। উহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই হইতেছে মুনাফা।

তৃতীয়ত, ব্যবসায়ে কোন লাভ বা কোন ক্ষতি না হইলে মুনাফা শূন্য (zero) হয়। আবার ক্ষতি হইলে মুনাফা নেতিবাচক (negative) হয়। কিন্তু অন্যান্য আয় কখনই শূন্য বা নেতিবাচক হয় না।

চতুর্থত, সকল আয়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি অল্পাবিস্তর থাকিলেও মুনাফার মধ্যে ঝুঁকিরই বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। বলা হয়, ঝুঁকিবহুল কাজে মুনাফার সম্ভাবনা বেশী এবং স্বল্প-ঝুঁকির কাজে উহার সম্ভাবনা কম। মুনাফার ক্ষেত্রে ঝুঁকির যত প্রাধান্য দেখা যায়, মজুরি বা সুদ বা খাজনার ক্ষেত্রে ঐরূপ প্রাধান্য দেখা যায় না।

পঞ্চমত, মুনাফার দ্রুত উঠা-নামা ঘটে। কিন্তু অন্যান্য আয়ের ঐরূপ দ্রুত পরিবর্তন ঘটে না। দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুনাফারও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু অন্যান্য আয়ের ঐরূপ দ্রুত পরিবর্তন ঘটে না।

ষষ্ঠত, মুনাফা খুবই অনিশ্চিত (uncertain) এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মুনাফার মধ্যে বিরাট তারতম্য দেখা যায়। কিন্তু অন্যান্য আয় একরূপ নিশ্চিত এবং উহাদের ক্ষেত্রে তারতম্যের মাত্রা খুব বেশী হয় না।

পরিশেষে বলা যায়, মুনাফা হইতেছে উদ্বৃত্ত-আয়, কারণ স্বাভাবিক মুনাফা ছাড়া অতিরিক্ত মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে যুক্ত করা হয় না। উৎপাদন-ব্যয়ের তুলনায় যে-উদ্বৃত্ত আয় পাওয়া যায় তাহাই হইতেছে মুনাফা। কিন্তু অন্যান্য আয় উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মুনাফার এই সকল বিশেষত্ব থাকার জন্য অধ্যাপক টাউজিগ (Taussig) মুনাফাকে 'এক মিশ্র ও এক বিরক্তিকর আয়' (a mixed and a vexed income) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

৩. **স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profits) ঃ** 'স্বাভাবিক মুনাফা'র ধারণাটি অধ্যাপক মার্শাল প্রবর্তন করেন। দীর্ঘকালীন অবস্থায় কোন উদ্যোক্তাকে একটি

নির্দিষ্ট ব্যবসায়ে বা উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত থাকার জন্য যে-পরিমাণ মুনাফা প্রয়োজন হয়, তাহাকেই স্বাভাবিক মুনাফা বলা হয়। মিসেস জোয়ান রবিনসন-এর (**Mrs Joan Robinson**) ভাষায় বলা যায়, যে-স্তরে মুনাফা থাকিলে দীর্ঘকালীন অবস্থায় কোন নূতন ফার্ম কোন একটি নির্দিষ্ট ব্যবসায়ে বা শিল্পে প্রবেশ করার উৎসাহ পায় না বা কোন পুরাতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান ব্যবসা বা শিল্প হইতে বাহির হইয়া যায় না, সেই স্তরের মুনাফাকেই 'স্বাভাবিক মুনাফা' বলা হয়। বাস্তবক্ষেত্রে কোন ফার্ম যে-পরিমাণ মুনাফা উপার্জন করে, তাহাকে 'বাস্তব মুনাফা' (actual profit) বলে। প্রতিষ্ঠানের গড় ব্যয় যখন দ্রব্যের দাম সমান হয়, তখন ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু বাস্তব মুনাফা স্বল্পকালীন সময়ে স্বাভাবিক মুনাফার বেশীও হইতে পারে।

সুতরাং স্বাভাবিক মুনাফা বলিতে সেই পরিমাণ মুনাফাকে বুঝায়, যাহা না পাইলে উদ্যোক্তা দীর্ঘকালীন অবস্থায় কোন কিছু উৎপাদন করে না বা যাহা উদ্যোক্তা পাইবার আশা করে। এই কারণে স্বাভাবিক মুনাফা উদ্যোক্তার পারিশ্রমিক হিসাবে উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে যুক্ত হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন অবস্থায় কোন ফার্ম শুধুমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করিতে পারে। কারণ অস্বাভাবিক মুনাফা নূতন ফার্মকে শিল্পে আসিতে আকৃষ্ট করে। সুতরাং কোন ফার্ম যখন স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করে, তখন শিল্পের ভারসাম্য আসে। কিন্তু স্বল্পকালীন অবস্থায় ফার্মগুলির সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে বলিয়া স্বাভাবিক মুনাফারও বেশী উপার্জন করা সম্ভব হয়। একচেটিয়া অবস্থায় শিল্পে নূতন কোন ফার্ম-এর প্রবেশাধিকার থাকে না বলিয়া একচেটিয়া ফার্ম দীর্ঘকালীন অবস্থায়ও স্বাভাবিক মুনাফার অধিক উপার্জন করিতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, স্বাভাবিক মুনাফা উদ্যোক্তার সেবাকার্যের ন্যূনতম পারিশ্রমিক বলিয়া উহা উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে যুক্ত হয়। সুতরাং দাম যখন গড় ব্যয়ের সমান হয় তখন ফার্ম শুধুমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় দীর্ঘকালীন সময়ে দাম গড় ব্যয়ের সমান হয় এবং ইহার ফলে ফার্মটি শুধুমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করিতে পারে।

স্বাভাবিক মুনাফার ধারণাটি অর্থবিদ্যায় প্রতিষ্ঠানবিশেষ ও শিল্পের ভারসাম্য আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ধারণাটি মূলত তত্ত্বগত, কারণ বাস্তবক্ষেত্রে স্বাভাবিক মুনাফা সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না।

৪. **মুনাফা সমান হওয়ার প্রবণতা (Profits tend to Equality):** প্রতিযোগিতার অবস্থায় মুনাফা সর্বত্র সমান বা একই পরিমাণ হওয়ায় প্রবণতা দেখা যায়। কোন শিল্পে অন্য শিল্পের তুলনায় মুনাফার পরিমাণ অধিক হইলে নিম্ন-

---

১. ৬৬-পৃঃ দ্রষ্টব্য

মুনাফার শিল্প হইতে মূলধন ও উদ্যোগ উচ্চ-মুনাফার শিল্পে সরিয়া যাইবে। ইহার ফলে নিম্ন-মুনাফার শিল্পে উৎপাদন হ্রাস পাইবে এবং উচ্চ-মুনাফার শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। অবশেষে প্রথম শ্রেণীর শিল্পে মুনাফার হার বৃদ্ধি পাইবে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পে মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পাইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সকল শ্রেণীর শিল্পে মুনাফা সমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিযোগিতার এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকিবে এবং পরিণতিতে মুনাফা সর্বত্রই সমান হইয়া যাইবে। অবশ্য সকলপ্রকার শিল্পে ঝুঁকির পরিমাণ সমান—ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায়, প্রতিযোগিতা হইতেছে মুনাফা সমতা করার একটি বলিষ্ঠ শক্তি।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে মুনাফার সমতা বিশেষ দেখা যায় না বলিলেই চলে। কারণ প্রতিযোগিতার শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে কাজ করিতে দেওয়া হয় না। ইহা ছাড়া, মুনাফা হইতেছে উৎপাদনকার্যে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার পুরস্কার। ইহার ফলে যে-সকল উৎপাদনকার্যে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার পরিমাণ বেশী হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে সাধারণত মুনাফার পরিমাণ বেশী হয়। পক্ষান্তরে, যে-সকল উৎপাদন-কার্যে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার পরিমাণ কম হয়, সাধারণত সেই সকল ক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ কম হয়। তদুপরি বিভিন্ন উদ্যোক্তার দক্ষতা একরূপ নহে, ইহার ফলেও মুনাফার হারে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। যে-সকল উদ্যোক্তার ব্যবসা-দক্ষতা উচ্চমানের হয় তাহার পক্ষে অধিক মুনাফা উপার্জন করা খুবই সহজ হয়। কিন্তু যে-সকল উদ্যোক্তার ব্যবসা-নিপুণতা কম, তাহার পক্ষে অধিক মুনাফা ভোগ করা বিশেষ সম্ভব হয় না।

সুতরাং দেখা যায়, তত্ত্বগতভাবে প্রতিযোগিতার শক্তির ক্রিয়ার ফলে সর্বত্র মুনাফা সমান হওয়ার প্রবণতা থাকিলেও অন্যান্য আয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ তারতম্য দেখা যায়, মুনাফার ক্ষেত্রেও সেইরূপ তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

৫. প্রান্তিক উৎপাদন-শক্তি ও মুনাফা (Marginal Productivity and Profits)ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার বণ্টন-তত্ত্ব দ্বারা যে-কোন উপাদানের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা যায়। কোন কোন লেখক ঐ তত্ত্বটি প্রয়োগ করিয়া উদ্যোক্তার মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, উদ্যোক্তার ব্যবসা-দক্ষতার জন্যই মুনাফার উদ্ভব ঘটে। সুতরাং মুনাফা হইতেছে উদ্যোক্তার বা সংগঠনের প্রান্তিক নীট উৎপাদনের (marginal net product) সমান। কোন সমাজ উদ্যোক্তার সাহায্য ছাড়া যে-পরিমাণ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহা অপেক্ষা উদ্যোক্তার সাহায্যে যতখানি অধিক উৎপাদন করা যায়, তাহাই হইতেছে উদ্যোক্তার প্রান্তিক নীট উৎপাদন।

কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার বণ্টন-তত্ত্বটি সরাসরি মুনাফা-নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। কারণ উদ্যোক্তা নিজেই প্রান্তিক অবস্থায় পরিবর্তনের নীতি (principle of substitution) প্রয়োগ করিয়া জমি, শ্রম এবং মূলধনের প্রান্তিক নীট উৎপাদন নির্ধারণ করে। কিন্তু অনুরূপভাবে উদ্যোক্তার নিজের আয়, অর্থাৎ

মুনাফা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। কারণ অন্যান্য উপাদান স্থির রাখিয়া উৎপাদনকালে অতিরিক্ত এক একক উদ্যোক্তা নিয়োগ করিয়া তাহার প্রান্তিক নীট উৎপাদন বাহির করা যায় না। ইহার কারণ হইতেছে, প্রত্যেকটি ফার্ম-এর কেবলমাত্র একজন করিয়া উদ্যোক্তার প্রয়োজন পড়ে। এইরূপ অবস্থায় যদি ঐ উদ্যোক্তাকে তুলিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উৎপাদন-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আবার প্রান্তিক নীট উৎপাদন নির্ণয়ের জন্য একজন অতিরিক্ত উদ্যোক্তা নিয়োগ করা হইলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে নানারূপ বিশৃংখলা দেখা দিবে।

অধ্যাপক মার্শাল-এর মতে, মুনাফা-নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি পরোক্ষভাবে প্রযোজ্য। তাহার মতে, ব্যবসা-জগতে প্রাকৃতিক নির্ধারণের নীতিটি (principle of natural selection) স্থায়ীভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে যে-সকল উদ্যোক্তা দক্ষ ও যোগ্য শুধু তাহারাই টিঁকিয়া থাকে এবং অযোগ্য উদ্যোক্তারা ব্যবসা-জগৎ হইতে কালক্রমে হটিয়া যাইতেছে। সুতরাং দেখা যায়, উদ্যোক্তা যেরূপ ব্যবসায়ে অন্যান্য উপাদানের বিভিন্ন একক নিয়োগের পরিমাণ স্থির করে, প্রকৃতি বা প্রতিযোগিতার অন্ধশক্তি সেইরূপ অযোগ্য উদ্যোক্তাকে সরাইয়া দিয়া শুধুমাত্র যোগ্য উৎপাদককে ব্যবসায়ে থাকিতে দিতেছে, ইহার ফলে যোগ্য উদ্যোক্তার উৎপাদনশক্তি অধিক বলিয়া তাহাদের মুনাফার পরিমাণও অধিক হইতেছে।

কিন্তু এই তত্ত্বটি পুরাপুরিভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ ব্যবসায়ে উদ্যোক্তা যে-মুনাফা উপার্জন করে, তাহা শুধুমাত্র তাহার দক্ষতা বা উৎপাদন-শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, উদ্যোক্তাকে প্রচুর ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করিতে হয়। এই বোঝা বহনের পুরস্কার হিসাবে সে মুনাফা অর্জন করিয়া থাকে, ইহা প্রান্তিক উৎপাদনশক্তির তত্ত্বে বলা হয় নাই। আবার উৎপাদনক্ষেত্রে নূতন নূতন কলাকৌশল উদ্ভাবন করিয়া তাহার সার্থক প্রয়োগের ফলেও মুনাফা দেখা দিয়া থাকে, ইহাও এই তত্ত্বে উল্লেখ করা হয় নাই। সুতরাং প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি মুনাফার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করা যায় না, অন্যদিকে তেমনি ইহার দ্বারা মুনাফার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ দেওয়াও সম্ভব হয় না।

॥ সামগ্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ॥

(The Business Firm in the Total Economy)

"Money is the most dynamic element in a modern economy——a link between the present and the future."

KENNETH K KURIHARA

২৫ ॥ টাকাকড়ির স্বরূপ ও কার্যাবলী ॥

(Nature and Functions of Money)

[টাকাকড়ির স্বরূপ ও সংজ্ঞা—দ্রব্যবিনিময় প্রথা ও ইহার অসুবিধাসমূহ—টাকাকড়ির কার্যাবলী—টাকাকড়ির প্রকারভেদ—কাগজী টাকাকড়ির সুবিধা ও অসুবিধা—মুদ্রাব্যবস্থা ও উহার প্রকারভেদ—স্বর্ণমান—কাগজীমুদ্রার প্রচলন নীতি ও পদ্ধতি—গ্রেসহামের সূত্র]

ব্যবসায়-অর্থবিদ্যা মূলত ব্যষ্টিগত (micro) আলোচনা হইলেও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ ও আচরণ বিশ্লেষণ করিতে হইলে কিছু সমষ্টিগত (macro) বিষয়বস্তুর আলোচনার প্রয়োজন পড়ে। প্রকৃতপক্ষে অর্থব্যবস্থার ভিতরেই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে কাজ করিতে হয়। সুতরাং ইহাকে টাকাকড়ি, ব্যাংকিং, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের সম্মুখীন হইতে হয়। সরকারের আয়-ব্যয়ও ইহার কার্য-কলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই কারণেই সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার (macro-economics) কতকগুলি বিষয় ব্যবসায়-অর্থবিদ্যায় আলোচনা করিতে হয়। বর্তমান ও পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ঐ বিষয়গুলি আলোচনা করা হইল।

১. **টাকাকড়ি স্বরূপ ও সংজ্ঞা (Nature and Functions of Money):** আধুনিক অর্থব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে, টাকাকড়ির উপর ইহার নির্ভরশীলতা। সমাজে লোকেরা টাকাকড়ির আকারে আয় উপার্জন করে, টাকাকড়ি ব্যয় করিয়া দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদন করা হয়, টাকাকড়ির বিনিময়ে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় চলে ইত্যাদি অর্থাৎ, সমাজের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ টাকাকড়িকে কেন্দ্র করিয়া সম্পন্ন হয়। টাকাকড়ি ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা থাকায় আধুনিক সমাজে টাকাকড়ির প্রচলন হইয়াছে। সুতরাং টাকাকড়ির স্বরূপ বুঝিতে হইলে আমাদের সমাজে ইহার উদ্ভবের কারণ কিছুটা বিশ্লেষণ করিতে হয়।

দ্রব্য-বিনিময় প্রথা ও ইহার অসুবিধাসমূহ: প্রাচীনকালে মানব-সমাজে টাকাকড়ির প্রচলন ছিল না। তখন যে-প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা দ্রব্য-বিনিময় প্রথা (barter system) নামে পরিচিত। দ্রব্য-বিনিময় প্রথা অনুযায়ী একটি দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্যের বিনিময় হইত। যেমন—ধানের বদলে গম, কাপড়ের বদলে তেল ইত্যাদি। কিন্তু কালক্রমে ঐ দ্রব্য-বিনিময় প্রথার কতকগুলি অসুবিধা দেখা দিল এবং উহার জন্য আমাদের সমাজে ধীরে ধীরে টাকাকড়ির প্রচলন হইল। এখন দেখা যাউক, দ্রব্য-বিনিময় প্রথার কি কি অসুবিধা ছিল?

প্রথমত, দ্রব্য-বিনিময় প্রথায় বিনিময়কারীদের অভাবের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য (coincidence of wants) না থাকিলে বিনিময় সম্ভব হইত না। যে-ব্যক্তির ধানের বিনিময়ে গমের প্রয়োজন, সেই ব্যক্তিকে এমন একজনকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত

যে গমের বিনিময়ে ধান লইতে রাজী থাকে। কিন্তু ইহা সকল সময়েই পাওয়া যায় না বলিয়া উহাদের অভাব পূরণ করা সম্ভব হইত না। টাকাকড়ি থাকিলে এই সমস্যা দূর হয়। যাহার ধান আছে সে ধান বিক্রয় করিয়া টাকাকড়ি পাইল এবং টাকাকড়ির বিনিময়ে সে বাজার হইতে গম সংগ্রহ করিল।

দ্বিতীয়ত, দ্রব্য-বিনিময়ের ক্ষেত্রে সকল সময়েই দ্রব্য বিভক্ত করিয়া বিনিময় করা যায় না। একটি উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন এক ব্যক্তির একটি গরু আছে এবং তাহার প্রয়োজন ১ মিটার কাপড়, ১ জোড়া জুতা ২ কিলোগ্রাম চাউল এবং ১ লিটার কেরোসিন তৈল। ঐ দ্রব্যগুলি চারজন পৃথক ব্যক্তির নিকটে আছে। গরুর মূল্য ঐ চারটি দ্রব্যের প্রত্যেকটির মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। এইরূপ ক্ষেত্রে গরুকে চারটি খণ্ড করিয়া চারটি দ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ইহার ফলে দ্রব্য-বিনিময় সম্ভব হইবে না। কিন্তু টাকাকড়ির এই সমস্যার সমাধান করিতে পারে। ঐ ব্যক্তি গরুটি বিক্রয় করিয়া যে-পরিমাণ টাকাকড়ি পাইবে তাহা দ্বারা পৃথকভাবে চার ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ চারটি দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে।

তৃতীয়ত, দ্রব্য-বিনিময় ব্যবস্থার প্রত্যেকটি দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করিবার কোন নির্দিষ্ট মান থাকে না। এই অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের বিশেষ অসুবিধা হয়। যেমন—১ জোড়া জুতার বিনিময়ে ২০ কিলোগ্রাম লবণ, ৪ কিলোগ্রাম লবণের বিনিময়ে ১ কিলোগ্রাম চাউল এবং ৫ কিলোগ্রাম চাউলের বিনিময়ে ১ খানি কাপড় পাওয়া গেলে ১ জোড়া জুতার বিনিময়ে কতকগুলি কাপড় পাওয়া যাইবে, তাহা নির্ণয় করা বিশেষ কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। টাকাকড়ি থাকিলে এই সমস্যা আর থাকে না। কারণ, টাকাকড়ির অংকে প্রত্যেকটি দ্রব্যের মূল্য প্রকাশ করা হয়। ১ জোড়া জুতার দাম ৫০ টাকা এবং ১টি কাপড়ের দাম ২৫ টাকা হইলে কাপড়ের আকারে এক জোড়া জুতার মূল্য ২টি কাপড়ের সমান হইবে।

পরিশেষে বলা যায়, দ্রব্য-বিনিময় প্রথায় ভবিষ্যতের জন্য কোন দ্রব্যের বিনিময় মূল্য সঞ্চয় করিয়া রাখা যাইত না। কোন কৃষক ৫০ কিলোগ্রাম আলু উৎপন্ন করিল এবং উহার মধ্যে সে ৫ কিলোগ্রাম ভোগ করিল। অবশিষ্ট ৪৫ কিলোগ্রাম আলু সে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিত না। কারণ আলু কিছুকাল পরেই পচিয়া যাইবে। কিন্তু টাকাকড়ি থাকিলে সঞ্চয় সম্ভব হয়। কৃষকটি ৪৫ কিলোগ্রাম আলু বিক্রয় করিয়া যে-পরিমাণ অর্থ পাইবে তাহা সে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দিতে পারে।

দ্রব্য-বিনিময়-প্রথার উপরি-উক্ত অসুবিধাগুলির জন্যই আমাদের সমাজে টাকা-কড়ির উদ্ভব ঘটিয়াছে। এখন দেখা যাউক, টাকাকড়ি বলিতে কি বুঝায় এবং ইহার কাজ কি ?

ইংরাজীতে একটি কথা আছে, টাকাকড়ির যে কাজ করে তাহাই হইতেছে টাকাকড়ি

(money is what money does)—অর্থাৎ, টাকাকড়ির কাজের পরিপ্রেক্ষিতে টাকাকড়ির সংজ্ঞা দিতে হয়। টাকাকড়ির কাজের বর্ণনা দেওয়ার পূর্বে টাকাকড়ির সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায়, যে-কোন বস্তু বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপ, দেনা পাওনার মান ও সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে সকলের নিকট গ্রহণীয় হয়, তাহাকেই টাকা-কড়ি বলা হইবে। এই অর্থে যে কাগজী মুদ্রা বা ধাতব মুদ্রা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে, তাহাই টাকাকড়ি নামে পরিচিত। সুতরাং টাকাকড়ির মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে, বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ইহা সমাজের সকলের নিকট অবাধে গ্রহণীয় হইবে। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বস্তু টাকাকড়ির কাজ করিয়াছে, যেমন—গরু, মেষ, চামড়া, মাছ, কড়ি ইত্যাদি। কিন্তু ঐ সকল বস্তুর নানারূপ অসুবিধা থাকায় কালক্রমে আমাদের সমাজে ধাতুনির্মিত টাকাকড়ি ও কাগজী-নোটের প্রচলন ঘটিয়াছে।

২. **টাকাকড়ির কার্যাবলী (Fubctions of Money)ঃ** পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, টাকাকড়ির স্বরূপ বুঝিতে হইলে ইহার কার্যাবলী আলোচনা করিতে হয়। টাকাকড়ির কার্যাবলী সম্পর্কে ইংরাজীতে দুই লাইনের একটি ছড়া আছে ঃ—

Money is a matter of functions *four*—

A medium, a measure a standard, a store.

উপরের ছড়াটি হইতে দেখা যায়, টাকাকড়ির চারটি প্রধান কাজ আছে :

ক। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ ঃ টাকাকড়ি হইতেছে দ্রব্য-বিনিময়ের মাধ্যম (medium of exchange)। টাকাকড়ির মাধ্যমে আমাদের সমাজে দ্রব্যের বিনিময় চলিতেছে। কোন ব্যক্তির নিকট গম থাকিলে সে উহা বিক্রয় করিয়া কিছু পরিমাণ টাকাকড়ি পাইবে এবং ঐ টাকাকড়ির বিনিময়ে সে কাপড় বা অন্য দ্রব্য কিনিতে পারে। এখানে টাকাকড়ির মাধ্যমে গম ও কাপড় বা অন্য দ্রব্যের বিনিময় ঘটিল। যে-সমাজে টাকাকড়ির প্রচলন আছে, সেই সমাজে প্রত্যেকটি দ্রব্যই টাকাকড়ির মাধ্যমে ক্রয় বা বিক্রয় করা চলে এবং ইহার ফলে দ্রব্য-বিনিময়ের কাজ সহজ হয় ও উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এই কাজের জন্য যে-বস্তু টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাহা সর্বজনগৃহীত হওয়া আবশ্যক।

খ। মূল্যের পরিমাপ হিসাবে কাজ ঃ টাকাকড়ির মাধ্যমে প্রতিটি জিনিসের বিনিময় হয় এবং টাকাকড়ির অংকে সকল জিনিসের দাম প্রকাশ করা হয় বলিয়া প্রত্যেকটি জিনিসের মূল্য অনায়াসে বাহির করা যায়, যেমন—এক কিলোগ্রাম সরিষার তেলের দাম ১৫ টাকা এবং দুইখানি কাপড়ের দাম ৩০ টাকা হইলে এক কিলোগ্রাম সরিষার তেলের মূল্য একখানি কাপড়ের সমান। বিভিন্ন জিনিসের দাম তুলনা করিয়া এইভাবে প্রত্যেকটি জিনিসের মূল্য বাহির করা যায়। প্রত্যেকটি দেশেই দ্রব্যের দাম প্রকাশ করার জন্য নিজস্ব টাকাকড়ির একক আছে। আমাদের দেশে ঐ একক হইতেছে টাকা (Rupee), ইংল্যান্ডে পাউন্ড (£), আমেরিকায়

ডলার ($) ইত্যাদি। সুতরাং প্রত্যেক দেশেই টাকাকড়ি দ্রব্যমূল্য নিরূপণের মাপকাঠির (measure of value) কাজ করে। কিন্তু এ ব্যাপারে টাকাকড়ি নিখুঁত মাপকাঠির কাজ করিতে পারে না, কারণ দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তনের সঙ্গে টাকাকড়ির মূল্যেরও পরিবর্তন ঘটে।

গ। দেনা-পাওনার মানদণ্ড হিসাবে কাজ ঃ আধুনিক সমাজে টাকাকড়ি স্থগিত আদান-প্রদানের মানদণ্ড (standard of deferred payments) হিসাবে কাজ করে। 'স্থগিত আদান-প্রদান' বলিতে দেনা-পওনাকে বুঝায়। ঋণগ্রহীতা টাকার অংকে ধার নেয় এবং ঋণদাতা টাকার অংকে ধার দেয়। ইহাতে সুবিধা হইল, ঋণদাতা যে-টাকা ধার দেয়, সে সুদসমেত সেই টাকা ফেরত পায়। কিন্তু দ্রব্য ধার দেওয়া হইলে ঋণদাতা সেই দ্রব্যটিই ফেরত না-ও পাইতে পারে। যেমন—এক ব্যক্তি একজনকে একটি গরু দুই বছরের জন্য ধার দিল। দুই বছর পরে সেই গরুর অবস্থা পরিবর্তন হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে ঋণদাতা দুই বছর পরে অবিকল সেই গরু ফেরত পাইবে না কিন্তু টাকা ধার দিলে ঋণদাতা পরে সেই টাকা ফেরত পাইবে এবং সুদের চুক্তি থাকিলে ঐ টাকার সঙ্গে সুদও পাইবে। অবশ্য টাকাকড়িও এরূপ ক্ষেত্রেও নিখুঁত মানদণ্ড হিসাবে কাজ করিতে পারে না। কারণ দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তনের সঙ্গে টাকা-কড়ির মূল্যের (value ofmoney) পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং টাকাকড়ির এই কাজের জন্য টাকাকড়ির মূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষা করা প্রয়োজন।

ঘ। সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কাজ ঃ টাকাকড়ি সঞ্চয়ের ভাণ্ডার (store of value) হিসাবে কাজ করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, দ্রব্য পচনশীল বলিয়া উহা সঞ্চয় করিয়া রাখা যায় না। কিন্তু টাকাকড়ি সঞ্চয় করিয়া দ্রব্যের মূল্য সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। ভবিষ্যতে বিপদ-আপদের সময় ঐ সঞ্চিত টাকাকড়ি সঞ্চয়কারীর প্রয়োজনে আসে। দ্রব্যের আকারে সঞ্চয় নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু টাকাকড়ির আকারে সঞ্চয় সাধারণত নষ্ট হইয়া যায় না। এই কারণে বর্তমান যুগে সঞ্চয় টাকাকড়ির আকারে ব্যাংকে বা পোস্ট অফিসে জমা রাখা হয়। সুতরাং দেখা যায়, টাকাকড়ি সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করিতেছে।

এই চারটি মুখ্য কাজ ছাড়া টাকাকড়ি আধুনিক সমাজে আরও কতকগুলি গৌণ কাজ করে। প্রথমত, টাকাকড়ি প্রচলনের ফলে বর্তমান যুগে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে শ্রমবিভাগের কাজে সুবিধা হইতেছে। কারণ বর্তমানে শ্রমিকদিগকে দ্রব্যের আকারে মজুরি না দিয়া টাকাকড়ির আকারে মজুরি দেওয়া হইতেছে। ইহার ফলে উৎপাদন-কার্যকে অব্যাহত রাখা সহজ হইতেছে।

দ্বিতীয়ত, টাকাকড়ি সমাজে সম্পদের 'নগদাবস্থা (liquidity) রক্ষা করিতেছে। কারণ, টাকাকড়ির বিনিময়ে ইচ্ছা করিলেই অন্য জিনিস সহজেই পাওয়া যায়—অর্থাৎ টাকাকড়িকে অন্য জিনিসে সহজেই রূপান্তরিত করা যায়। এই

কারণেই লেনদেনের প্রয়োজন, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা দূর করার প্রয়োজন ইত্যাদি কারণে টাকাকড়ি বা নগদ টাকা সব সময়েই হাতে রাখিতে হয়।

৩. **টাকাকড়ির প্রকারভেদ** (**Different kinds of Money**): টাকাকড়ি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে :

ক। **হিসাব-নিকাশের টাকাকড়ি ও আসল টাকাকড়ি :** হিসাব-নিকাশের টাকাকড়ি (money of account) হইতেছে হিসাবনিকাশের একক অর্থাৎ যে-টাকাকড়ির অংকে হিসাব-নিকাশ রাখা হয় এবং জিনিসপত্রের দাম, ক্রয়শক্তি ও দেনাপাওনা প্রকাশ করা হয়, তাহাই হইতেছে হিসাব-নিকাশের টাকাকড়ি।[১] যেমন—ভারতে জিনিসপত্রের মূল্য 'টাকায়' (rupee) প্রকাশ করা হয়। ইংল্যান্ডে হিসাব-নিকাশ প্রকাশ করা হয় 'পাউন্ড'-এ (pound)। সুতরাং আমাদের দেশে হিসাব-নিকাশের টাকাকড়ি হইতেছে 'টাকা' এবং ইংল্যান্ডে হইতেছে 'পাউন্ড'। হিসাব-নিকাশের টাকাকড়ি হইতেছে একটি অবস্তুগত ধারণা (abstract concept)। কিন্তু আসল টাকাকড়ি (actual money) দ্বারা প্রকৃতপক্ষে লেনদেন সম্পন্ন হয় অর্থাৎ ইহা প্রদান করিয়া ঋণ-চুক্তি ও দাম-চুক্তি (debt-contract and price-contract) নিষ্পত্তি করা হয়।[২] যেমন আমাদের দেশে কাগজী নোট, ১ টাকার ধাতব মুদ্রা, ৫০ পয়সা, ২৫ পয়সার মুদ্রা ইত্যাদি হইতেছে আসল টাকাকড়ি। এই দুই প্রকার টাকাকড়ির মধ্যে মূল পার্থক্য হইতেছে, হিসাবনিকাশের টাকাকড়ির কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু আসল টাকাকড়ি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের হইতে পারে। যেমন—ভারতে পূর্বে রূপার টাকাকড়ি ছিল এবং বর্তমানে হইতেছে নিকেলের বা কাগজের। কিন্তু 'টাকা' হিসাব-নিকাশের মান পূর্বেও ছিল, এখনও আছে।

খ। **কাগজী টাকাকড়ি ও ধাতব টাকাকড়ি :** আসল টাকাকড়ি দুই প্রকারের হইয়া থাকে **কাগজী টাকাকড়ি** (paper money) ও **ধাতব টাকাকড়ি** (metallic monoy)। কাগজী টাকাকড়ি হইতেছে কাগজের নোট এবং ইহা সরকার ও দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক চালু করে। যেমন—আমাদের দেশে ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা ও ১০০ টাকার মানের কাগজী টাকাকড়ি প্রচলিত আছে। কাগজী টাকাকড়ি প্রতিনিধিমূলক (representative paper money), পরিবর্তনীয় (convertible) ও অপরিবর্তনীয় (inconvertible) কাগজী টাকাকড়ি হইতে পারে। 'প্রতিনিধিমূলক কাগজী টাকাকড়ির' পশ্চাতে সমমূল্যের সোনা বা রূপা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভাণ্ডারে জমা থাকে। 'পরিবর্তনীয় কাগজী টাকাকড়ির' ক্ষেত্রে জনসাধারণ দাবি করিলে দেশের সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাগজী টাকাকড়ির

---

১. "Money of account is the money in which debts and prices and general purchasing power are expressed," (*Keynes*)

২. Actual money is one "by delivery of which debt-contracts and price-contracts are discharged." (*Keynes*)

পরিবর্তে সমমূল্যের সোনা বা রূপা দিতে বাধ্য থাকে। কিন্তু 'অপরিবর্তনীয় কাগজী টাকাকড়ি'র ক্ষেত্রে এইরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার এক টাকার যে-নোট প্রচলন করে, তাহা 'অপরিবর্তনীয় কাগজী টাকাকড়ি'। কাগজী টাকাকড়ি স্থানান্তর করিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না এবং প্রয়োজনমত ইহা স্বল্প ব্যয়ে ছাপানো যায় বলিয়া আধুনিককালে কাগজী টাকাকড়ির বহুল প্রচলন দেখা যায়।

ধাতব মুদ্রা সাধারণত দুই প্রকার হইয়া থাকে—প্রামাণিক মুদ্রা (standard money) ও প্রতীক মুদ্রা (token money)। প্রামানিক মুদ্রা দেশের প্রধান মুদ্রা এবং হিসাব-নিকাশের টাকাকড়ি। সাধারণত ইহা সোনার বা রূপার মুদ্রা হইয়া থাকে এবং ইহার ধাতুমূল্য বা অন্তর্নিহিত (intrinsic value) মুদ্রার উপরে লিখিত মূল্যের (face value) সমান হইয়া থাকে। আমাদের দেশে পূর্বে যে-রূপার এক টাকা ছিল উহা প্রামাণিক মুদ্রা। উহাকে গলাইয়া ফেলিলে ১ টাকা মূল্যের রূপা পাওয়া যাইত। প্রামাণিক মুদ্রার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে, উহা 'অসীম বিহিত মুদ্রা' (unlimited legal tender)—অর্থাৎ, প্রামাণিক মুদ্রার অংকে যে-কোন পরিমাণ মূল্যের ধার পরিশোধ করা যায়। বর্তমান যুগে প্রামাণিক মুদ্রা লোপ পাইতেছে। পক্ষান্তরে, প্রতীক মুদ্রার ধাতুমূল্য উহার উপরে লিখিত মূল্যের তুলনায় কম হয়; উহারা মূল্যের নির্দেশক মাত্র। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত নিকেলের ১ টাকা, ৫০ পয়সা, ২৫ পয়সা, ১০ পয়সা ইত্যাদি মুদ্রাগুলি প্রতীক মুদ্রা; উহাদের গলাইয়া ধাতু হিসাবে বিক্রয় করিলে সম-পরিমাণ মূল্য পাওয়া যায় না।

গ। **বিহিত টাকাকড়ি**ঃ বিহিত টাকাকড়ি (legal tender) আইন অনুযায়ী টাকাকড়ি বলিয়া গণ্য হয় এবং পাওনাদাররা এইগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকে। বিহিত টাকাকড়ি গ্রহণ করিতে কেহ অস্বীকার করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু সকল টাকাকড়ি বিহিত নয়। আমাদের দেশে বর্তমান যে-টাকাকড়ি প্রচলিত আছে তাহা বিহিত টাকাকড়ি। কিন্তু পূর্বেকার পিতলের দুআনা বর্তমানে বিহিত মুদ্রা নয়, উহা গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য নই।

বিহিত টাকাকড়ি দুই প্রকারের—অসীম বিহিত (unlimited legal tender) ও সসীম বিহিত (limited legal tender)। যে-সকল বিহিত টাকাকড়ি দ্বারা যে কোন পরিমাণ দেনাপাওনা মিটানো যায় সেগুলি হইতেছে অসীম বিহিত। যেমন—আমাদের দেশে আমরা এক টাকার নোট দ্বারা আমরা যে-কোন মূল্যের পাওনা শোধ করিতে পারি। সুতরাং এক টাকার নোট হইতেছে অসীম বিহিত। কিন্তু কোন কোন মুদ্রা নির্দিষ্ট পরিমাণ [illegible] প্রচলন করা হয়, সেগুলিকে সসীম বিহিত টাকাকড়ি বলা হয়। যেমন—পাঁচ পয়সা বা দশ পয়সা বা পঞ্চাশ পয়সা মুদ্রা দ্বারা বেশী টাকার পাওনা পরিশোধ করা যায় না।

উপরি-উক্ত টাকাকড়ি ছাড়া আধুনিককালে ব্যাংকের টাকাকড়িও (bank money) প্রচলিত আছে। ব্যাংক এই টাকাকড়ি সৃষ্টি করে এবং ঐগুলি টাকাকড়ির কাজ

করিতেছে। ব্যাংক কিভাবে টাকাকড়ি সৃজন করে, তাহা পরে আলোচনা করা হইবে।

কাগজী টাকাকড়ির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, আধুনিক সমাজে কাগজী টাকাকড়ির প্রচলন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কতকগুলি সুবিধা দেখা যায়ঃ

ক. কাগজী টাকাকড়ি সহজে স্থানান্তর করা যায়। ইহা ছাড়া, সহজেই গণনা করা যায় বলিয়া ইহা দ্বারা অতি সহজেই অধিক মূল্যের লেনদেন সম্পন্ন করা যায়।

খ. ধাতবমুদ্রার তুলনায় কাগজী টাকাকড়ি প্রস্তুত করিতে কম খরচ লাগে।

গ. কাগজী টাকাকড়ি পুরাতন হইয়া গেলে বা ছিঁড়িয়া গেলে উহার পরিবর্তে অতি সহজেই নূতন টাকাকড়ি ছাপানো যায়।

ঘ. কাগজী টাকাকড়ির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশের সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকাকড়ির মূল্যে স্থিতিশীলতা রক্ষা করিতে পারে।

ঙ. কাগজী টাকাকড়ির যোগান সহজেই বৃদ্ধি করা যায়। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে টাকাকড়ির যোগান দ্রুত বৃদ্ধি করিতে হয়। কাগজী টাকাকড়ির দ্বারা ইহা সম্ভব হয়।

কিন্তু কাগজী টাকাকড়ির কতকগুলি অসুবিধাও আছেঃ ক কাগজী টাকাকড়ির যোগান সহজেই বৃদ্ধি করা যায় বলিয়া অত্যধিক কাগজী টাকাকড়ির ছাপার বিপদ আছে এবং ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতি (inflation) দেখা দিতে পারে।

খ. 'অপরিবর্তনীয় কাগজী টাকাকড়ি' প্রচলনের জন্য সমপরিমাণের সোনা বা মূল্যবান ধাতু জমা রাখা হয় না এবং উহার বিনিময়ে সোনা বা অন্য কোন মূল্যবান ধাতু ফেরত দেওয়ার কোন ব্যবস্থা থাকে না। ফলে ইহার উপর লোকেদের আস্থা না-ও থাকিতে পারে।

গ. কাগজী টাকাকড়ি আগুনে বা জলে সহজে বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু ধাতব মুদ্রা সহজে বিনষ্ট হয় না।

ঘ. একদেশের কাগজী টাকাকড়ি অন্য দেশে প্রচলন করা যায় না। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের হিসাব কাগজী টাকাকড়ির সাহায্যে সম্পন্ন করা যায় না।

কাগজী টাকাকড়ির নানারূপ অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইহা বর্তমান যুগে প্রতিটি দেশেই প্রধান টাকাকড়ি রূপে গণ্য হইতেছে।

৪. মুদ্রা-ব্যবস্থা (Monetary Systems)ঃ টাকাকড়ির প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণ এবং উহার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক—উভয় মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন দেশে যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তাহাকে মুদ্রা-ব্যবস্থা বলা হয়। ইহাকে 'মুদ্রামান' (monetary standard) ব্যবস্থাও বলা হয়। সুতরাং অভ্যন্তরীণ দিক হইতে

মুদ্রার একক ও উহার বিভাজন এবং বাহ্যিক দিক হইতে বৈদেশিক বিনিময়-মান উভয়ই মুদ্রা-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা-ব্যবস্থাঃ সাধারণত তিন প্রকার মুদ্রাব্যবস্থা দেখা যায়ঃ (ক) একধাতুমান ব্যবস্থা (monometallism), (খ) দ্বি-ধাতুমান ব্যবস্থা (bi-metallism), এবং (গ) নিয়ন্ত্রিত কাগজী মুদ্রামান ব্যবস্থা (managed paper standard)। নিম্নে এইগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইলঃ

ক। **একধাতুমান ব্যবস্থা**ঃ একধাতুমান মুদ্রা-ব্যবস্থায় দেশের বিহিত মুদ্রা (legal tender) স্বর্ণ অথবা রৌপ্য দ্বারা প্রস্তুত করা হয় এবং মুদ্রার মূল্য নির্দিষ্ট ধাতুর মূল্যের সহিত সংযোজন করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত মুদ্রা সংশ্লিষ্ট ধাতুতে রূপান্তরের (convertible) ব্যবস্থা করা হয়। স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত হইলে উহাকে স্বর্ণমান (gold standard) এবং রৌপ্যের দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত হইলে উহাকে রৌপ্যমান (silver standard) বলা হয়। ভারতে ১৮৩৫ সাল হইতে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত রৌপ্যমান প্রচলিত ছিল।

খ। **দ্বি-ধাতুমান ব্যবস্থা**ঃ দ্বি-ধাতুমান ব্যবস্থায় মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য দুই প্রকার ধাতু (যেমন—স্বর্ণ ও রৌপ্য) ব্যবহার করা হয় এবং দেশের প্রচলিত মুদ্রার মূল্য উভয় ধাতুর মূল্যের উপর নির্ভর করে। স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুর মুদ্রা বিহিত মুদ্রা বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহা ছাড়া, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বা স্থির অনুপাত (fixed ratio) থাকে এবং দেশের সরকার ঐ অনুপাত বজায় রাখার চেষ্টা করে। মুদ্রা-প্রচলন কর্তৃপক্ষ (mint authorities) বিনাব্যয়ে বা সামান্য ব্যয়ে মুদ্রায় রূপান্তর করার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে স্বর্ণ বা রৌপ্য গ্রহণ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্স ও ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশে এই মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

দ্বি-ধাতুমানের পক্ষে বলা হইত, এই ব্যবস্থার ফলে দুইটি ধাতুর মুদ্রা থাকে বলিয়া মুদ্রার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রা প্রচলনের জন্য দুই প্রকার ধাতুতে রিজার্ভ রাখা যায় বলিয়া ঐ রিজার্ভ রাখিতে অসুবিধা হয় না। আবার, দুইটি ধাতুর মুদ্রা থাকার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেন সহজসাধ্য হয়। কারণ স্বর্ণমান ও রৌপ্যমান অনুসরণকারী উভয় প্রকার দেশগুলির মধ্যে বিনিময় হারের স্থিরতা রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু ইহার বিপক্ষে বলা হইত, দুইটি ধাতুর মুদ্রা থাকায় উহাদের মধ্যে বিনিময় হার রক্ষা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইত। পরবর্তীকালে কাগজী মুদ্রা প্রচলিত হওয়ায় ধাতবমুদ্রার প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং এই কারণে দ্বি-ধাতুমান সকল দেশেই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

গ। **নিয়ন্ত্রিত কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থা**ঃ আজকাল পৃথিবীর সকল দেশেই ধাতব মুদ্রামানের পরিবর্তে কাগজী মুদ্রাব্যবস্থা চালু হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে দেশের বাস্তব মুদ্রা কাগজীনোটে ছাপানো হয় এবং ইহা স্বর্ণে বা রৌপ্যে রূপান্তরযোগ্য

হয় না অর্থাৎ দেশের সরকার বা নোট প্রচলন কর্তৃপক্ষ কাগজী-মুদ্রা স্বর্ণে বা রৌপ্যে রূপান্তর করিতে বাধ্য নহে। তবে উহাদিগকে কাগজী-মুদ্রা প্রচলনের জন্য কতকগুলি বিধি-ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হয় এবং ঐ বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে কাগজী-মুদ্রার মোট পরিমাণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই মুদ্রাব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার বিধি-ব্যবস্থাগুলি একটু পরেই বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে।

এই তিন প্রকার মুদ্রাব্যবস্থার মধ্যে স্বর্ণমান ও কাগজী মুদ্রাব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে ইহাদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। পরবর্তী অংশগুলিতে উহাই করা হইল।

৫. **স্বর্ণমান (Gold Standard)**ঃ স্বর্ণমান বলিতে এমন একটি মুদ্রাব্যবস্থা বুঝায় যেখানে দেশের মুদ্রার মূল্য কোন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের মূল্যের সমান রাখা হয়। স্বর্ণমান মুদ্রাব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়:

প্রথমত, স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে দেশে স্বর্ণমুদ্রা (gold currency or gold coins) প্রচলিত থাকে বা দেশের আইনবিহিত মুদ্রা একটি নির্দিষ্ট মূল্যে স্বর্ণে রূপান্তর করা যায়।

দ্বিতীয়ত, এইরূপ মুদ্রাব্যবস্থায় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট দামে অবাধে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করে বা আমদানি-রপ্তানি করে।

তৃতীয়ত, স্বর্ণের দাম দেশের মুদ্রামূল্যের অংকে স্থির রাখা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, স্বর্ণমান মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্বর্ণের মূল্যের সঙ্গে ও দেশের মুদ্রার মূল্যের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটেনে স্বর্ণমান মুদ্রাব্যবস্থা চালু করা হয় এবং উহা ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল।

স্বর্ণমানের বিভিন্ন রূপঃ স্বর্ণমান চারপ্রকারের দেখা যাইত:

ক। **বিশুদ্ধ স্বর্ণমুদ্রামান**ঃ ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও আরও কতকগুলি দেশে ১৯১৪ সালের পূর্বে বিশুদ্ধ স্বর্ণমান (gold currency standard বা pure gold standard) প্রচলিত ছিল। বিশুদ্ধ স্বর্ণমান মুদ্রাব্যবস্থার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল:

প্রথমত, দেশের প্রচলিত মুদ্রা স্বর্ণধাতুর দ্বারা প্রস্তুত হয় এবং ঐ স্বর্ণমুদ্রা দেশের প্রামাণিক মুদ্রার (standard money) কাজ করিত।

দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থায় স্বর্ণধাতু কোন একটি নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণমুদ্রায় বিনাব্যয়ে বা সামান্য ব্যয়ে রূপান্তর করা যাইত। আবার দেশের সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট দরে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করিত। ইহা ছাড়া, আন্তর্জাতিক লেনদেন মিটাইবার জন্য বিনা বাধায় স্বর্ণের আমদানি-রপ্তানি চলিত।

খ। স্বর্ণপিণ্ডমান ঃ স্বর্ণপিণ্ডমান মুদ্রাব্যবস্থার (gold bullion standard) কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ

প্রথমত, দেশের অভ্যন্তরে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকে না, কিন্তু স্বর্ণের মূল্য ও দেশের মুদ্রার মূল্যের সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিত।

দ্বিতীয়ত, দেশের জনসাধারণ এই ব্যবস্থায় প্রচলিত মুদ্রা স্বর্ণে রূপান্তরিত করিতে পারে না।

তৃতীয়ত, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা সরকার একটি নির্দিষ্ট দামে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করে ও বৈদেশিক পাওনা মিটাইবার জন্য একটি নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণের যোগান দিয়া থাকে।

এই প্রকার স্বর্ণমান মুদ্রাব্যবস্থা ব্রিটেনে ১৯২৫ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এবং ভারতে ১৯২৭ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।

গ। স্বর্ণ বিনিময় মান ঃ স্বর্ণ-বিনিময় মান (gold exchange standard) ভারতে ১৮৯৮ সাল হইতে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। এই প্রকার স্বর্ণমান মুদ্রাব্যবস্থায় দেশে স্বর্ণমুদ্রা থাকে না, তাহার পরিবর্তে দেশে কাগজী টাকাকড়ি বা প্রতীক মুদ্রা (token coins) প্রচলিত থাকে। স্বর্ণধাতু মুদ্রায় রূপান্তর করা যায় না এবং দেশের সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করে না। কিন্তু বৈদেশিক লেনদেনের প্রয়োজন পূরণের জন্য যে-সকল দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত আছে ইহা সেই সকল দেশের মুদ্রার যোগান দিত এবং এইভাবে দেশের মুদ্রার মূল্য এবং স্বর্ণের মূল্যের সঙ্গে একটি পরোক্ষ সম্পর্ক বজায় রাখা হইত।

ঘ। স্বর্ণ রিজার্ভ প্রথা ঃ ব্রিটেনে এবং অন্যান্য কতকগুলি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে ১৯৩৬ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই মুদ্রা-ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। এই ব্যবস্থায়ও প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকে না। মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য রক্ষার জন্য একটি তহবিল[১] খোলা হইত। ঐ তহবিল হইতে সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রার বৈদেশিক মান রক্ষার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বা স্বর্ণ বিক্রয় করে।

ইহা ছাড়া, আরও এক প্রকার স্বর্ণমান দেখা যাইত—উহা 'স্বর্ণ সমতামান' (gold parity standard) নামে পরিচিত। এই প্রকার স্বর্ণমান ব্যবস্থায় দেশে কোনরূপ স্বর্ণমুদ্রা থাকে না। কিন্তু দেশের মুদ্রার মূল্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের মূল্যের অঙ্কে প্রকাশ করা হয়। স্বর্ণের সরকারী দাম স্থির থাকে এবং 'আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার'এর (International Monetary Fund বা সংক্ষেপে I. M. F.) তত্ত্বাবধানে ঐ মূল্য স্থির রাখা হয়। কয়েকবৎসর পূর্বেও ভারত সহ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার অন্য সদস্য-দেশের মুদ্রার মূল্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের মূল্যে প্রকাশ করিতে হইত। কিন্তু বর্তমানে মুদ্রার বহির্মূল্য আর স্বর্ণমূল্যে প্রকাশ করা হয় না।

---

১. *Exchange Equalisation Fund.*

স্বর্ণমানের সুবিধাসমূহ : উনবিংশ শতাব্দীতে অর্থবিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানকে সর্বোৎকৃষ্ট মুদ্রাব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করিতেন। প্রত্যেকটি দেশে স্বর্ণমান চালু থাকিলে ইহার কতকগুলি সুবিধা পাওয়া যায় :

প্রথমত, স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হারের স্থিরতা রক্ষা করা যায়। এই মুদ্রা ব্যবস্থায় অবাধে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় ও আমদানী-রপ্তানির মাধ্যমে মুদ্রার একটি নির্দিষ্ট স্বর্ণমূল্য (gold value of the currency) বজায় রাখা হয়। ইহার ফলে বিনিময়-হারের একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে উঠা-নামা ছাড়া বিরাট কোন পরিবর্তন ঘটে না। ইহাতে ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের বিশেষ সুবিধা হয়।

দ্বিতীয়ত, স্বর্ণমান মুদ্রাব্যবস্থায় দেশের মুদ্রার পরিমাণ স্বর্ণের যোগানের উপর নির্ভর করে বলিয়া অবাঞ্ছিত মুদ্রাপ্রচলন প্রতিরোধ করা যায়। ইহার ফলে একদিকে যেমন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়, অন্যদিকে তেমনি মুদ্রামূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষা করা যায়।

তৃতীয়ত, প্রতিটি দেশ স্বর্ণমান-মুদ্রাব্যবস্থার নিয়মগুলি (the rules of the game of the gold standard) সঠিকভাবে মানিয়া চলিলে স্বর্ণের অবাধ আমদানি-রপ্তানি ও দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আপনা হইতেই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

চতুর্থত, স্বর্ণমান মুদ্রাব্যবস্থায় প্রত্যেক দেশেই স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লেনদেনের সুবিধা হয়। ফলে অন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

পঞ্চমত, স্বর্ণমান মুদ্রাব্যবস্থায় দেশের মূল্যস্তর ও বৈদেশিক বিনিময় হার আপনা হইতেই নির্ধারিত হয়। ইহার ফলে মূল্যস্তর ও বিনিময় হার প্রায় সর্বত্রই অপরিবর্তিত থাকে।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায়, দেশের জনসাধারণ স্বর্ণমুদ্রা পছন্দ করে বলিয়া এই মুদ্রাব্যবস্থায় তাহাদের বিশ্বাস থাকে।

স্বর্ণমানের অসুবিধাসমূহ : বাস্তবক্ষেত্রে স্বর্ণমানের কতকগুলি অসুবিধা দেখা যায়। ইহার ফলে ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশে ১৯৩১ সালে স্বর্ণমানের পতন ঘটে। ইহার প্রধান প্রধান অসুবিধাগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :

প্রথমত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বর্ণমান সফল করার জন্য দুইটি নিয়ম প্রত্যেকটি দেশকে মানিয়া চলিতে হয়, যেমন—একদেশ হইতে অন্যদেশে স্বর্ণের গমনাগমনের পথে কোনরূপ বাধানিষেধ থাকিবে না এবং স্বর্ণের গমনাগমনের ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের উপর যে-প্রভাব আসিবে, দেশের কর্তৃপক্ষ তাহা বন্ধ করার কোনরূপ চেষ্টা করিবে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে স্বর্ণমানের দেশগুলিতে এই নিয়ম মানিয়া চলা হয় নাই। ইহার ফলে শেষ পর্যায়ে স্বর্ণমান একটি স্বয়ংক্রিয় মুদ্রাব্যবস্থার পরিবর্তে 'নিয়ন্ত্রিত মুদ্র্যাব্যবস্থা'য় (managed monetary standard) পরিণত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, স্বর্ণমান ব্যবস্থায় প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী মূল্যেস্তর বা স্থায়ী বিনিময়-হার কোনটাই রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ক্যালিফোর্ণিয়াতে স্বর্ণের খনি আবিষ্কার হওয়ায় স্বর্ণের যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং উহার ফলে দেশে টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পায় এবং পরিশেষে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়ত, স্বর্ণমানকে 'সুদিনের বা সুসময়ের মান' (a fair-weather standard) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। বিদেশ হইতে যতক্ষণ দেশে স্বর্ণ আসে ততক্ষণ ইহা সফলতার সহিত কার্যকর হয়। দেশ হইতে যখন স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যায় তখন আর এই মুদ্রামান বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান ব্যবস্থায় কোন দেশ স্থায়ীভাবে অর্থসংক্রান্ত কোন নীতি অনুসরণ করিতে পারে না। কারণ এই নীতি স্বর্ণের গমনাগমনের (inflow and outflow of gold) উপর নির্ভর করে। ইহা ছাড়া, স্বর্ণমানের দেশগুলিতে এই নীতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থাকার জন্য কোন দেশের পক্ষে স্বাধীনভাবে কোন নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হয় না।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায়, স্বর্ণমান মুদ্রাব্যবস্থা বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ। কারণ মুদ্রা প্রচলনের জন্য ব্যয়বহুল স্বর্ণ সংগ্রহ ও মজুদ করিতে হয়।

উপসংহারঃ অতীতে স্বর্ণমান প্রকৃষ্ট মুদ্রাব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইলেও বর্তমান পৃথিবীতে আর কোন দেশেই ইহার অস্তিত্ব দেখা যায় না। স্বর্ণমানের নিয়মগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ অনুসরণ করে, ততক্ষণ ইহা আদর্শ আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ঐ নিয়ম নিষ্ঠার সহিত মানা হইত না বলিয়া ইহার পতন ঘটিয়াছে। এই কারণে ক্রাউথার (Crowther) মন্তব্য করিয়াছেন, স্বর্ণমান হইতেছে অহংকারী দেবতা, পরম নিষ্ঠার সহিত সেই দেবতাকে অনন্যভাবে মান্য বা তুষ্ট না করা হইলে ইহার কোন সুফল পাওয়া যাইবে না ("The gold standard is a jealous god. It will work provided it is given exclusive devotion".—*Crowther*[১])।

৬. কাগজী-নোটের প্রচলন নীতি ও পদ্ধতি (Principles and Methods of Issue of Paper-Notes)ঃ আধুনিককালে ধাতব মুদ্রার তুলনায় কাগজী নোটেরই প্রচলন অনেক বেশী। কাগজী-নোটের প্রচলন সম্পর্কে প্রত্যেক দেশেই নানারূপ বিধিব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়। কাগজী-নোট প্রচলন সম্পর্কে দুইটি প্রধান নীতি দেখা যায়—কারেন্সী নীতি ও ব্যাংকিং নীতি। এই নীতি দুইটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল ঃ

ক। কারেন্সী নীতি ঃ কারেন্সী নীতি (currency principle) অনুসারে বলা হয়, কাগজী-নোট হইতেছে ধাতব-মুদ্রার বিকল্প। সুতরাং কাগজী মুদ্রা প্রচলনের জন্য মূল্যবান ধাতুতে (স্বর্ণ বা রৌপ্য) সমপরিমাণ রিজার্ভ রাখিতে হইবে

---

১ Crowther—*An Outline of money*

অর্থাৎ প্রতিটি কাগজী-মুদ্রার জন্য সমমূল্যের স্বর্ণ বা রৌপ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হইবে। ইহার ফলে কাগজী-মুদ্রার পরিবর্তে কোন ব্যক্তি স্বর্ণ বা রৌপ্য দাবী করিলে তাহা মিটানো সম্ভব হইবে। ইংল্যাণ্ডের ১৮৪৪ সালের 'ব্যাংক চার্টার আইন'-এ (Bank Charter Act, 1844) এই নীতি গৃহীত হইয়াছিল। এই নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে অত্যধিক কাগজী-মুদ্রা প্রচলনের আর কোন বিপদ থাকে না।

খ। ব্যাংকিং নীতি ঃ ব্যাংকিং নীতিতে (banking principle) বলা হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির প্রয়োজন পূরণের জন্যই কাগজী-মুদ্রা প্রচলন করা হয়। কাগজী-মুদ্রা প্রচলনের জন্য কি পরিমাণ রিজার্ভ রাখিতে হইবে তাহা প্রচলন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংকই স্থির করিয়া দিবে। এ-সম্পর্কে কোন বাধাধরা নিয়ম থাকিলে তাহা অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে।

প্রকৃতপক্ষে কাগজী-মুদ্রা প্রচলনের জন্য আজকাল ব্যাংকিং নীতিই অনুসরণ করা হয়। কাগজী-মুদ্রা প্রচলনের জন্য প্রত্যেক দেশেই কিছু পরিমাণে রিজার্ভ রাখিতে হয় এবং কোন দেশেই কাগজী-মুদ্রার জন্য সমপরিমাণ রিজার্ভ রাখা হয় না।

কাগজী-নোট প্রচলনের পদ্ধতিসমূহ ঃ কাগজী-নোট প্রচলনের জন্য কতকগুলি পদ্ধতি দেখা যায় ঃ

ক। স্থির ফাইডুসিয়ারী প্রথা ঃ এই প্রথা অনুসারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত কাগজী-মুদ্রা ছাপানো হইলে তাহার জন্য কোন স্বর্ণ-রিজার্ভ রাখিতে হয় না। ঐ পরিমাণকে ফাইডুসিয়ারী সীমা (fiduciary limit) বলা হয় এবং ঐ সীমা পর্যন্ত নোট-প্রচলনের জন্য সরকারী ঋণপত্রে রিজার্ভ রাখিতে হয়। ফাইডুসিয়ারী সীমার অধিক কাগজী-নোট প্রচলন করিতে হইলে প্রতিটি কাগজী-নোটের জন্য সমপরিমাণ স্বর্ণের রিজার্ভ রাখিতে হয়। দেশের প্রয়োজনমতো ফাইডুসিয়ারী সীমা উচ্চে তোলা হয়। এই প্রথার ফলে অপ্রয়োজনীয় স্বর্ণের রিজার্ভ রাখিতে হয় বলিয়া ইহা গ্রহণযোগ্য হয় না। ইহা ছাড়া, মজুত স্বর্ণ প্রয়োজন হইলেও কাজে লাগানো যায় না। ইংল্যাণ্ডে এই প্রথা চালু ছিল, বর্তমানে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিলেই চলে।

খ। উচ্চতম ফাইডুসিয়ারী প্রথা ঃ এই প্রথা অনুসারে কোন একটি নির্দিষ্ট উচ্চতম সীমা পর্যন্ত কাগজী-মুদ্রা প্রচলনের জন্য কোন রিজার্ভ রাখিতে হয় না; সাধারণত ঐ সীমা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক উচ্চে ধার্য করা হয়। এই প্রথার ফলে কাগজী-মুদ্রা ব্যবস্থা খুব নমনীয় হয় এবং প্রয়োজন মত কোন রিজার্ভ না রাখিয়াই কাগজী-মুদ্রা ছাপানো যায়। এই প্রথা ফ্রান্সে প্রচলিত ছিল।

গ। আনুপাতিক রিজার্ভ প্রথা ঃ এই প্রথা অনুসারে কাগজী-মুদ্রার একটি নির্দিষ্ট অনুপাত (proportion) রিজার্ভ স্বর্ণে বা বৈদেশিক মুদ্রায় রাখিতে হয়। যেমন—১৯৫৬ সালের পূর্বে কাগজী-মুদ্রা ছাপাইবার জন্য ভারতের রিজার্ভ ব্যাংককে মোট কাগজী-মুদ্রার ৪০ শতাংশ স্বর্ণে ও বৈদেশিক মুদ্রায় জমা রাখিতে হইত। এই

পদ্ধতি বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ হয় না, কারণ কাগজী-মুদ্রা ছাপাইবার জন্য সমপরিমাণ রিজার্ভ রাখিতে হয় না। কিন্তু এই পদ্ধতি বিশেষ নমনীয় (elastic) হয় না, কারণ কাগজী-মুদ্রা ছাপাইবার জন্য আনুপাতিক রিজার্ভ রাখিতে হয়। ভারতের ন্যায় সম্প্রসারণশীল অর্থব্যবস্থায় অধিক পরিমাণে কাগজী-মুদ্রা প্রচলনের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় কাগজী-মুদ্রা দ্রুত বৃদ্ধি করা যায় না।

ঘ। **ন্যূনতম রিজার্ভ প্রথা**ঃ এই পদ্ধতি অনুসারে কাগজী-মুদ্রা প্রচলনের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রিজার্ভ রাখিতে হয়। ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ ন্যূনতম (minimum) রিজার্ভ রাখিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনমতো কাগজী-মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। এই পদ্ধতিটি বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। এই প্রথা অনুযায়ী বর্তমানে কাগজী-মুদ্রা প্রচলনের জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে ন্যূনতম ২০০ কোটি টাকার রিজার্ভ রাখিতে হয়—উহার মধ্যে অন্তত ১১৫ কোটি টাকার রিজার্ভ রাখা হয় স্বর্ণে এবং অবশিষ্ট ৮৫ কোটি টাকার রিজার্ভ রাখিতে হয় বৈদেশিক মুদ্রায়।[১] এই ন্যূনতম রিজার্ভ রাখিয়া ইহা যত খুশী কাগজী-নোট ছাপাইতে পারে। এই প্রথার ফলে কাগজী-মুদ্রা ব্যবস্থা খুব নমনীয় হয়। কারণ ন্যূনতম রিজার্ভ রাখিয়া অর্থব্যবস্থার প্রয়োজনমত কাগজী-নোট ছাপানো সম্ভব হয়। কিন্তু এই প্রথার ফলে কাগজী-মুদ্রা অত্যধিক পরিমাণে ছাপানোর বিপদ থাকে।

কাগজী নোট প্রচলনের সঠিক পদ্ধতিঃ উপরে বর্ণিত প্রথাগুলির মধ্যে কোন্‌টি সর্বোৎকৃষ্ট তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। দেশের অবস্থার তারতম্য অনুসারে কাগজী-মুদ্রা প্রথার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, কাগজী-নোট প্রচলনের জন্য দুইটি নীতি প্রত্যেক দেশেই অনুসরণ করা হয়ঃ

প্রথমত, কাগজী-মুদ্রা প্রচলনের জন্য প্রত্যেক দেশেই কিছু পরিমাণ রিজার্ভ সোনাতে ও বৈদেশিক মুদ্রায় রাখা হয়।

দ্বিতীয়ত, রিজার্ভের পরিমাণ কত হইবে তাহা বৈদেশিক বাণিজ্যের স্বল্পমেয়াদী ঘাটতির উপর নির্ভর করে। দেশের সঞ্চিত সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রা, বৈদেশিক বাণিজ্যের স্বল্পমেয়াদী ঘাটতি পূরণের জন্য ব্যবহার করা হয়। সুতরাং উক্ত ঘাটতির পরিমাণকে ভিত্তি করিয়া রিজার্ভের পরিমাণ স্থির করিতে হয়।

৭। **গ্রেস্‌হামের সূত্র (Gresham's Law)**ঃ রাণী প্রথম এলিজাবেথের (Elizabeth I) রাজত্বকালে (১৫৫৮-১৬০৩) ইংল্যান্ডে স্যার টমাস গ্রেস্‌হাম (Sir Thomas Gresham) নামে একজন লেখক টাকার প্রচলন সম্বন্ধে একটি সূত্র বাহির করেন। এই সূত্রে বলা হয়, দেশে যখন উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট—উভয় প্রকার মুদ্রা একই সঙ্গে প্রচলিত থাকে, নিকৃষ্ট মুদ্রা তখন বাজার বা প্রচলন হইতে উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বিতাড়িত করে ("*Bad money tends to drive good money out of*

---

১. প্রকৃতপক্ষে এই রিজার্ভের পরিমাণ ২০০ কোটি টাকার অনেক বেশী। বর্তমানে (১৯৮৬ সালের এপ্রিল) ঐ স্বর্ণরিজার্ভের পরিমাণ হইতেছে ২৪৭ কোটি টাকা।

circulation".)। অর্থাৎ ভাল মুদ্রা ও খারাপ মুদ্রা উভয়ই বাজারে প্রচলিত থাকিলে ভাল মুদ্রা বাজার হইতে অন্তর্হিত হয় এবং খারাপ মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকে।

নিকৃষ্ট মুদ্রা বলিতে এখানে নকল মুদ্রাকে বুঝায় না। নিকৃষ্ট মুদ্রা হইতেছে: (ক) বাজারে শুধুমাত্র ধাতব মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে পুরাতন ও কম ওজনের ধাতুর মুদ্রা নিকৃষ্ট মুদ্রা এবং নূতন ও পূর্ণ-ওজনের ধাতুর মুদ্রা হইতেছে উৎকৃষ্ট মুদ্রা (খ) বাজারে যখন কাগজী-মুদ্রা ও ধাতব মুদ্রা প্রচলিত থাকে তখন কাগজী-মুদ্রা হইতেছে নিকৃষ্ট মুদ্রা এবং ধাতব মুদ্রা হইতেছে উৎকৃষ্ট মুদ্রা। (গ) দেশে যখন দ্বি-ধাতু মুদ্রামান (bi-metallism) চালু থাকে তখন টাঁকশালে যে-ধাতুর মূল্য **বাজার মূল্য** অপেক্ষা বেশী (overvalued) হয়, তাহা হইবে নিকৃষ্ট মুদ্রা এবং **টাঁকশালে যে-ধাতুর মূল্য** বাজার-মূল্য **অপেক্ষা** কম (undervalued) হয়, তাহা **হইবে উৎকৃষ্ট মুদ্রা।**

এখন দেখা যাউক, **কিভাবে খারাপ মুদ্রা ভাল মুদ্রাকে বাজার** হইতে **হঠাইয়া** দেয় ?

১। **নূতন মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতু কোনরূপ ক্ষয় না।** কিন্তু পুরাতন মুদ্রা **ব্যবহারের ফলে উহার ধাতু কিছুটা ক্ষয় ও হীন (debased)** হওয়া যায়। ইহার **ফলে** কাহারও নিকট দুইটি মুদ্রা থাকিলে যেটি পুরাতন তাহাই সে আগে খরচ করে, এবং নূতনটি নিজের নিকট রাখিয়া দেয়। সুতরাং ভাল মুদ্রা লোকেরা জমায় বলিয়া ইহা বাজার হইতে অন্তর্হিত হয় **এবং শুধুমাত্র** খারাপ মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকে।

২। **নূতন মুদ্রা গলানোর ফলে বা রপ্তানির (export) ফলে ইহা** বাজার হইতে অন্তর্হিত হয়। যাহারা মুদ্রা গলায় বা সোনা লইয়া ব্যবসা করে তাহারা পূর্ণ-ওজনের নূতন মুদ্রা **(full weight new coins) পছন্দ** করে। কারণ বহুল ব্যবহৃত পুরাতন মুদ্রার ধাতুর পরিমাণ হ্রাস পায়। সুতরাং অলংকার তৈয়ারের জন্য ভাল মুদ্রাগুলি গলানো হইলে ভাল মুদ্রা বাজার হইতে অন্তর্হিত হইবে। ইহা ছাড়া, বৈদেশিক লেন-দেনের হিসাব পূরণ করার জন্য ভারী ওজনের নূতন মুদ্রা ধাতু হিসাবে রপ্তানি করা হইত এবং উহার ফলে শুধুমাত্র হাল্কা ওজনের পুরাতন মুদ্রা বাজারে চালু থাকিত।[১]

৩। আবার দ্বি-ধাতুমান মুদ্রাব্যবস্থায় টাঁকশালে যে-ধাতুর মূল্য বাজার-দর অপেক্ষা কম, তাহা গলানো হয় বলিয়া ভাল মুদ্রা বাজার হইতে অন্তর্হিত হয়। একটি উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, সোনা-রূপার টাঁকশালে দর ১ : ১৫ স্থির আছে অর্থাৎ ১ তোলা সোনা ১৫ তোলা রূপার সমান। কিন্তু বাজারে কোন কারণে উহাদের দামের অনুপাত হইল ১ : ১৬। সুতরাং বাজার-দর অপেক্ষা টাঁকশালে সোনার দাম কম হইতেছে। এই অবস্থায় রূপার মুদ্রার পরিবর্তে সোনার মুদ্রা জমাইয়া তাহা গলানো হইলে বাজার হইতে ১ তোলা রূপা বেশী পাওয়া যাইবে। সুতরাং লাভের আশায় জনসাধারণ সোনার মুদ্রা (উদাহরণে

১. Thomas—*Elements of Economics*, p. 326

ভাল মুদ্রা) গলানোর ফলে উহা বাজার হইতে অন্তর্হিত হইবে এবং শুধুমাত্র রূপার মুদ্রা (উদাহরণে খারাপ মুদ্রা) বাজারে থাকিবে।

৪। পরিশেষে বলা যায়, কাগজী-নোট ও ধাতব মুদ্রা চালু থাকিলে লোকেরা ধাতব মুদ্রা জমাইতে থাকে। কারণ কাগজী-নোটের কোনরূপ অন্তর্নিহিত মূল্য (intrinsic value) নাই বলিলেই চলে। ইহা ছাড়া, বিদেশীরা কাগজী মুদ্রা গ্রহণ করে না। সুতরাং বৈদেশিক দেনা মিটানোর জন্য ধাতব মুদ্রা অর্থাৎ ভাল মুদ্রা বিদেশে রপ্তানি হইবে এবং কাগজী-মুদ্রা অর্থাৎ খারাপ মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকিবে।

অতএব দেখা যায়, নানাভাবে খারাপ মুদ্রা বাজার হইতে ভাল মুদ্রাকে হঠাইয়া দেয়।

সীমাবদ্ধতা ঃ গ্রেসহামের সূত্রটি কয়েকটি অবস্থায় প্রযোজ্য হয় না। প্রথমত, ভাল মুদ্রা ও খারাপ মুদ্রার মোট পরিমাণ দেশের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট না হইলে দেশের লোকেরা উভয় মুদ্রাই ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে এবং তখন লোকেরা ভাল মুদ্রা আটক রাখিতে পারিবে না বা বিদেশে রপ্তানি করিবে না। দ্বিতীয়ত, দেশের লোকেরা যদি খারাপ মুদ্রা গ্রহণ করিতে সাফল্যের সহিত অস্বীকার করে তাহা হইলে ভাল মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকিবে। তৃতীয়ত, মুদ্রার যে-অংশের অবক্ষয় (depreciation) ঘটে, তাহা দেশের জনসাধারণ লক্ষ্য করিবে এবং সেই মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।[১]

কিন্তু আধুনিককালে কাগজী-মুদ্রার বহুল প্রচলনের ফলে এই সূত্রটির সত্যতা ও আকর্ষণ বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে।

———

১ Thomas—*Elemente of Economics*, p. 329

২৬

॥ টাকাকড়ির মূল্য ॥
(Value of Money)

[টাকাকড়ির মূল্য বলিতে কি বোঝায় ?—টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তনের পরিমাপ—দ্রব্য-মূল্যের সূচকসংখ্যা—মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন—মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ—দামস্তরের পরি-বর্তনের ফলাফল—দাম স্থিতিকরণ—দামস্তর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাসমূহ]

পূর্বেকার অধ্যায়ে টাকাকড়ির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে টাকাকড়ির মূল্য এবং উহার পরিবর্তন সম্পর্কিত বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

১ টাকাকড়ির মূল্য বলিতে কি বুঝায় ? (What is meant by Value of Money ?) ঃ টাকাকড়ির মূল্য বলিতে টাকাকড়ির ক্রয়ক্ষমতাকেই (the purchasing power of money) অর্থাৎ টাকাকড়ির দ্বারা যে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য ক্রয় করা যায় তাহাকেই বুঝায়। যেমন—১ টাকা দ্বারা যদি ২৫০ গ্রাম চাউল পাওয়া যায়, তাহা হইলে চাউলের আকারে ১ টাকার মূল্য হইতেছে ২৫০ গ্রাম চাউল। অনুরূপভাবে এই ১ টাকার বিনিময়ে অন্যান্য যে-সকল দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়, সেই ক্রয়ক্ষমতাকেই টাকাকড়ির মূল্য বলে।

ইহা সহজেই বোঝা যায়, দেশে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাইলে সমপরিমাণ টাকাকড়ি দ্বারা পূর্বের তুলনায় কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য ক্রয় করা যায় বলিয়া টাকাকড়ির মূল্য হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে, জিনিসপত্রের দাম হ্রাস পাইলে সমপরিমাণ টাকাকড়ির দ্বারা পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য পাওয়া যায় বলিয়া টাকাকড়ির মূল্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জিনিসপত্রের দাম-স্তর (price-level) ও টাকাকড়ির মূল্যের সহিত একটি বিপরীত সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কটি এইভাবে দেখানো হয় ঃ **টাকাকড়ির মূল্য** $= \frac{১}{\text{দাম-স্তর}}$। ইহার অর্থ হইল জিনিসপত্রের দাম-স্তর বৃদ্ধি পাইলে টাকাকড়ির মূল্য হ্রাস পায় এবং দাম-স্তর হ্রাস পাইলে টাকাকড়ির মূল্য বৃদ্ধি পায়।

টাকাকড়ির মূল্য অবশ্য স্থিতিশীল নয়। দাম-স্তরের পরিবর্তনের সঙ্গে টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এখন দেখা যাউক, টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন হয় কেন ? এ-সম্পর্কে অর্থবিদ্যায় কতকগুলি তত্ত্ব আছে। এখানে শুধুমাত্র আমেরিকার অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ফিশার-এর (Fisher) ‘টাকাকড়ির পরিমাণ তত্ত্বটি’ (Quantity Theory of Money) বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে।

২ **টাকাকড়ির পরিমাণ তত্ত্ব (Quantity Theory of Money) :** অধ্যাপক ফিশার বর্ণিত টাকাকড়ির পরিমাণ তত্ত্বে[১] বলা হয়, টাকাকড়ির মূল্য নির্ধারিত হয় টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগানের দ্বারা। টাকাকড়ির চাহিদা (the demand for money) বলিতে টাকাকড়ির বিনিময়ে যে-সকল দ্রব্যাদি ও সেবাকার্য পাওয়া যায় তাহাকেই বুঝায়। টাকাকড়ির বিনিময়ে যে-সকল দ্রব্যাদি ও সেবাকার্য পাওয়া যায় তাহার সমষ্টিকে তিনি 'T' রূপে আখ্যা দিয়াছেন। উহাদের গড় দাম হইতেছে 'P'। সুতরাং টাকাকড়ির মোট চাহিদা হইতেছে PT ($=T\times P$)। পক্ষান্তরে, টাকাকড়ির যোগান (the supply of money) বলিতে সেই পরিমাণ টাকাকড়িকে বুঝায়, যাহা লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা হয়। ইহার দুইটি অংশ আছে : একটি হইতেছে আইনগ্রাহ্য সরকারী মুদ্রা (M) এবং অন্যটি হইতেছে ব্যাংক মুদ্রা (M^1)। টাকাকড়ির যোগান বাহির করিতে হইলে সরকারী মুদ্রা ও ব্যাংক-মুদ্রার পরিমাণ ছাড়া উহাদের গড় প্রচলন গতি (average velocity of circulation of money) বিবেচনা করিতে হয়। কোন একটি টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেনদেনের জন্য যতবার হাত বদল হয়, তাহাকে টাকার প্রচলন-গতি বলা হয়। যেমন—কোন একদিন একটি নির্দিষ্ট টাকা লেনদেনের জন্য পাঁচ বার হাত বদল হইল; তখন ঐ টাকার প্রচলন-গতি হইবে ৫। সরকারী মুদ্রার প্রচলন-গতিকে 'V' এবং ব্যাংক-মুদ্রার প্রচলন-গতিকে 'V^1' ধরা হইল। সুতরাং সরকারী মুদ্রার মোট যোগান হইবে MV ($=M\times V$) এবং ব্যাংক-মুদ্রার মোট যোগান হইবে M^1V^1 ($=M^1\times V^1$)। ইহার ফলে টাকার সামগ্রিক যোগান হইবে $MV+M^1V^1$।

অধ্যাপক ফিশার দেখাইয়াছেন, টাকার মোট চাহিদা উহার মোট যোগানের সমান হইবে। ইহা নিম্নের সমীকরণে[১] দেখানো হইল :

$$PT=MV+M^1V^1$$

$$\text{অথবা,}\quad P=\frac{MV\times M^1V^1}{T}$$

উপরের সমীকরণে ফিশার ধরিয়া লইয়াছেন, কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে V, V^1 ও T-এর কোন পরিবর্তন হয় না। ব্যাংক-মুদ্রার পরিমাণ (M^1) ও সরকারী মুদ্রার (M) সঙ্গে একটি বিশেষ সম্পর্ক থাকার ফলে ব্যাংক মুদ্রার স্বতন্ত্র কোন পরিবর্তন ঘটে না। ইহার ফলে ফিশারের সমীকরণে শুধুমাত্র সরকারী মুদ্রা (M) ও দাম-স্তর (P) পরিবর্তনশীল হয়। সুতরাং M বৃদ্ধি পাইলে P বৃদ্ধি পাইবে এবং M হ্রাস পাইলে

১. টাকার পরিমাণ তত্ত্বের বিকল্প ব্যাখ্যা আছে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অর্থবিজ্ঞানী যেমন, মার্শাল পিগু ইত্যাদি ঐ বিশ্লেষণ দিয়াছেন। ঐ বিশ্লেষণে তাঁহারা টাকার মূল্য-নির্ধারণের ব্যাপারে টাকাকড়ির চাহিদার উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। কেমব্রীজ সমীকরণ হইতেছে : $P=M/R.K.$। P হইতেছে দামস্তর, M টাকাকড়ির মোট পরিমাণ R দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের সমষ্টি এবং K হইতেছে নগদ-সম্পদের অনুপাত।

P হ্রাস পাইবে। আবার M-এর অর্থাৎ টাকাকড়ির মোট পরিমাণে যে-হারে পরিবর্তন ঘটিবে P-এর অর্থাৎ দাম-স্তরের সেই হারে পরিবর্তন ঘটিবে। সুতরাং বলা যায়, M বাড়িয়া দ্বিগুণ হইলে P দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে এবং M কমিয়া অর্ধেক হইলে P হ্রাস পাইয়া অর্ধেক হইবে। টাকাকড়ির মূল্য দাম-স্তরের বিপরীত বলিয়া M দ্বিগুণ হইলে P দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে এবং টাকাকড়ির মূল্য ঠিক অর্ধেক হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে, M অর্ধেক হইলে P হ্রাস পাইয়া অর্ধেক হইবে এবং টাকাকড়ির মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং দেখা যায়, টাকাকড়ির পরিমাণ ও দাম-স্তরের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ ও আনুপাতিক সম্পর্ক (a direct and proportional relationship) রহিয়াছে। তাই ফিশারের মতবাদটি টাকাকড়ির পরিমাণ-তত্ত্ব (Quantity Theory of Money) নামেও পরিচিত।[১]

সমালোচনা: ফিশারের তত্ত্বটি নানাভাবে সমালোচনা করা হয়। কয়েকটি প্রধান সমালোচনা এখানে দেওয়া হইল:

ক. অনুমানগুলি ভ্রান্তিমূলক: ফিশারের তত্ত্বে যে-সকল অনুমান ধরা হইয়াছে, তাহা সত্য নহে। ফিশার ধরিয়াছেন, টাকার পরিমাণ (M) বা দাম-স্তরের (P) পরিবর্তনের ফলে টাকার প্রচলন-গতি (V) বা মোট লেনদেনের (T) কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। কিন্তু এই অনুমানটি ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দেখা যায়, দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে মোট লেনদেনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইলে মোট লেনদেনের পরিমাণও হ্রাস পায়। আবার টাকাকড়ির পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিলে উহার প্রচলন-গতিতেও পরিবর্তন ঘটে। ফিশার অবশ্য পরবর্তী-কালে এই পরিবর্তনগুলির কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে, দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক সময়ে ঐ পরিবর্তনগুলি ঘটিবে না। ইহার ফলে তত্ত্বটির উপযোগিতা বিশেষভাবে সীমায়িত হইয়া পড়ে। কারণ ইহার দ্বারা দামের স্বল্প-কালীন উঠা-নামা বিশ্লেষণ করা যায় না।

খ. বেকার অবস্থায় অপ্রযোজ্য: ফিশার-এর সমীকরণটি একমাত্র পূর্ণ নিয়োগ (full employment) অবস্থায় সত্য হইতে পারে। কারণ সেই অবস্থায় টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পাইলেও দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি করা যায় না বলিয়া মূল্যস্তর আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু অর্থব্যবস্থায় যদি প্রাকৃতিক সম্পদের বেকারত্ব থাকে, তাহা হইলে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান সহজেই বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পাইলে মূল্যস্তর আনু-পাতিক হারে বৃদ্ধি পাইবে না। এই কারণে অধ্যাপক কেইনস্ (Keynes) মন্তব্য করিয়াছেন, কেবলমাত্র পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় টাকাকড়ির পরিমাণ-তত্ত্বটি আপন সত্তায় প্রকাশিত হয়।[২]

১. ইহা ফিশারের বিনিময়-সমীকরণ (Equation of Exchange) নামে পরিচিত।

২. "The quantity theory of money comes into its own being only during full employment."—*Keynes*

গ. টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি অনিরূপিত: এই তত্ত্বটি দ্বারা টাকাকড়ির প্রকৃত ক্রয়শক্তি নির্ধারণ করা যায় না। কারণ 'T'-এর মধ্যে যে-সকল লেনদেন ধরা হইয়াছে, তাহা অধিকাংশই শিল্পগত, বাণিজ্যগত ও অর্থসংক্রান্ত দ্রব্য-সামগ্রী। ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ উহার মধ্যে বিশেষ ধরা হয় নাই। কিন্তু টাকাকড়ির ক্রয়-ক্ষমতা প্রধানত ভোগ্যদ্রব্যের মূল্যস্তরের উপর নির্ভর করে। সুতরাং ফিশারের সমীকরণ টাকাকড়ির ক্রয়-ক্ষমতা নিরূপণ করে না। ইহা শুধুমাত্র নগদ লেনদেনের মান (cash transaction standard) নির্ধারণ করে।

ঘ. আয়-স্তরের উপর মূল্যস্তর নির্ভরশীল: লর্ড কেইন্‌স (Lord Keynes) দেখাইয়াছেন, জিনিসপত্রের মূল্য-স্তর টাকাকড়ির পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, ইহা দেশের আয়-স্তরের উপর নির্ভর করে। দেশের লোকদের আর্থিক আয় যখন বৃদ্ধি পায় তখন মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় এবং উহা যখন হ্রাস পায় মূল্যস্তর তখন হ্রাস পায়। সুতরাং টাকাকড়ির ক্রয়-ক্ষমতা টাকাকড়ির পরিমাণের পরিণতি না হইয়া উহা আয়-স্তরের পরিণতি হয় ("the value of money is the consequence of the level of income rather than of the quantity of money")।

ঙ. দাম-পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার অপূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ: টাকাকড়ির পরিমাণের পরিবর্তনের ফলে মূল্য-স্তরে কিভাবে পরিবর্তন আসে, তাহা এই তত্ত্বে বিশ্লেষণ করা হয় নাই। টাকাকড়ির পরিবর্তনের ফলে প্রথমে সুদের হার ও উৎপাদনের মধ্যে পরিবর্তন আসে এবং ঐ পরিবর্তনের মাধ্যমে দাম-স্তরে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই তত্ত্বে দাম-পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করা হয় নাই।

চ. সমীকরণটি নিছক অভেদ বা স্বতঃসিদ্ধ: ফিশারের সমীকরণটিকে একটি নিছক অভেদ (identity) বা স্বতঃসিদ্ধ (truism) বলিয়া বর্ণনা করা হয় এবং ইহার ফলে সমীকরণটির কোনরূপ বাস্তব উপযোগিতা দেখা যায় না। সমীকরণের দুইটি দিক (অর্থাৎ, PT এবং MV) প্রকৃতপক্ষে একই জিনিসের দুইটি দিক। ইহার ফলে টাকাকড়ির পরিমাণ ও মূল্য-স্তরের মধ্যে কারণগত সম্পর্ক (causal relationship) প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

ছ. বাণিজ্য-চক্রের অপূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ: ক্রাউথার (Crowther) দেখাইয়াছেন, এই তত্ত্বটি দ্বারা বাণিজ্য চক্রের (business cycle বা অর্থনৈতিক অবস্থার নিয়মিত উত্থান-পতন) পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ দেওয়া সম্ভব হয় না। তাঁহার মতে তত্ত্বটি দ্বারা দাম-স্তরের দীর্ঘকালীন গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করা গেলেও ইহার দ্বারা দাম ও উৎপাদনের স্বল্পকালীন উঠা-নামা সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না।[1]

জ. দামস্তর নির্ধারণের অন্যান্য বিষয়: তত্ত্বটির বিরুদ্ধে আরও বলা হয়, দাম-স্তর শুধুমাত্র টাকাকড়ির পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। ইহা আয়-স্তর,

1. "The quantity theory explains, as it were, the average level of the sea but it cannot explain the violence of the tides."—*Crowther*

ব্যয়-স্তর, ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিস্থিতি, বিনিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ের উপরও নির্ভর করে। কিন্তু তত্ত্বটিতে দাম-স্তর নির্ধারণের অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয় নাই।

উপসংহার : তত্ত্বটির এই সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ইহার আংশিক সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে দাম-স্তর নির্ধারণের বিষয়টি তত্ত্বটিতে অতি সহজ ও সরলভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, কিন্তু উহা এত সহজ বা সরল বিষয় নহে। ইহা ছাড়া, দাম-স্তরের বাস্তব গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে এই তত্ত্বটির আংশিক সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। দেখা যায়, চরম মুদ্রাস্ফীতির সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দাম-স্তরের উপর যে টাকাকড়ির পরিমাণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

৩. টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপের পদ্ধতি—দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যা (Method of measurement of changes in the Value of Money —Index Numbers of Prices) : টাকাকড়ির মূল্য স্থির থাকে না, জিনিসপত্রের দামস্তরের পরিবর্তনের সঙ্গে ইহারও পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। যেমন বলা হয়, দামস্তর ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইলে টাকাকড়ির মূল্য ১০ শতাংশ হ্রাস পায়। এখন প্রশ্ন উঠে, টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন কিভাবে পরিমাপ করা হয় ?

টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপের জন্য একটি পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি (statistical device) অনুসরণ করা হয়। উহা দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যা নামে পরিচিত। এখন দেখা যাউক, দাম-স্তরের সূচক-সংখ্যা কি ?

দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যা কি ? দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যা (index number of prices) কতকগুলি বৎসরের কয়েকটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের মূল্যস্তরের তালিকাকেই বুঝায় অর্থাৎ দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তন পরিমাপের জন্য কতকগুলি বৎসরের কয়েকটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের মূল্যস্তরের যে-তালিকা প্রস্তুত করা হয়, তাহাকেই দ্রব্যমূল্যের সূচক সংখ্যা বলা হয়। ইহা ছাড়া, আধুনিককালে উৎপাদন, জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার ব্যয়, আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতি অর্থনৈতিক বিষয়গুলির পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত সূচক-সংখ্যা প্রস্তুত করা হয়

দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যা নির্মাণ-পদ্ধতি দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যা নির্মাণের জন্য কতকগুলি বিষয় প্রয়োজন পড়ে :

প্রথমত, দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যা প্রস্তুত করার জন্য কোন একটি বৎসরকে (বা একাধিক বৎসরকে) ভিত্তি-বৎসর (base year) হিসাবে ধরিয়া লইতে হয়। যে বৎসরে মূল্য-স্তর ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকে, সেই বৎসরকেই সাধারণত ভিত্তি-বৎসর হিসাবে নির্বাচন করিতে হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে পাইকারী-দামের সূচক-সংখ্যা নির্মাণের জন্য সালকে ভিত্তি বৎসর হিসাবে ধরা হইতেছে।

দ্বিতীয়ত, ইহার পরবর্তী পর্যায়ে কতকগুলি প্রধান প্রধান প্রতিনিধিমূলক

(representative) দ্রব্য নির্বাচন করিতে হয়। হিসাবের সুবিধার জন্য দ্রব্যগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে (যেমন—খাদ্যশস্য, শিল্পগত কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্য প্রভৃতি) দেখানো হয়।

তৃতীয়ত, ইহার পরে নির্বাচিত দ্রব্যগুলির বাজার-দাম (market price) সংগ্রহ করিতে হয়। ভিত্তি-বৎসর ও পরবর্তী বৎসরগুলিতে ঐ সকল দ্রব্যের যে-বাজার দাম দেখা যায়, সেই সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়।

চতুর্থত, পরবর্তী পর্যায়ে সংগৃহীত দামগুলির গড় নির্ণয় করিতে হয়। সূচক-সংখ্যার এই গড় নির্ণয়ের জন্য নির্বাচিত দ্রব্যগুলির দাম টাকার অংকে প্রকাশ না করিয়া ১০০ বা অনুরূপ সংখ্যায় প্রকাশ করিতে হয়। উহাকে আপেক্ষিক দাম (price-relative) বলা হয়।

পরিশেষে, নির্বাচিত দ্রব্যগুলির গুরুত্ব অনুসারে উহাদের উপর বিভিন্ন পরিমাণে **'ওজন'** (weights) দিতে হয় অর্থাৎ উহাদের গুরুত্ব অনুসারে দ্রব্যগুলিকে বিভিন্ন অনুপাতে লইতে হয়। সাধারণ দ্রব্যের তুলনায় খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব বেশী বলিয়া ইহার উপর অপেক্ষাকৃত বেশী 'ওজন' দিতে হয়। আজকাল সকলক্ষেত্রেই 'ওজনযুক্ত সূচক-সংখ্যা' (weighted index numbers) দেখা যায়, 'ওজনবিহীন সূচক-সংখ্যা' (unweighted index numbers) নির্ভরশীল নহে।

সূচক-সংখ্যার দৃষ্টান্ত : নিম্নে একটি কাল্পনিক 'ওজন-যুক্ত' সূচক-সংখ্যা দেখানো হইল :

উপরের সূচক-সংখ্যায় চাউল, গম, কাপড়, চিনি ও লবণ—এই পাঁচটি প্রধান দ্রব্য লওয়া হইয়াছে এবং উহাদের গুরুত্ব অনুসারে উহাদের উপর যথাক্রমে ৩, ৩, ২, ১ ও ১ ওজন দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ ঐ অনুপাতে বিভিন্ন দ্রব্যগুলি লওয়া হইয়াছে।

সূচক-সংখ্যায় ভিত্তি-বৎসরে (১৯৭০-৭১) দামস্তর হইতেছে ১০০, কিন্তু ১৯৮৪-৮৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে ২২০ অর্থাৎ ১৯৮৪-৮৫ সালে ভিত্তি-বৎসরের তুলনায় দামস্তর ১২০ শতাংশ বেশী ছিল বা টাকাকড়ির মূল্য ১২০ শতাংশ কম ছিল।

দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যা নির্মাণে অসুবিধাসমূহ: দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যা নির্মাণে কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়:

ক. ভিত্তি-বৎসর নির্বাচনে অসুবিধা: দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যার জন্য ভিত্তি বৎসর খুব সতর্কতার সহিত নির্বাচন করিতে হয়। দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তনের সঠিক পরিমাণ বাহির করার জন্য একটি স্বাভাবিক বা প্রামাণিক বৎসরকে (a standard year) ভিত্তি-বৎসর হিসাবে নির্বাচন করিতে হয়। ঐ বৎসরে যাহাতে দ্রব্যমূল্য খুব বেশী বা কম না থাকে তাহা দেখিতে হয়। কোন কোন সময়ে কোন একটি স্বাভাবিক বৎসর না পাওয়া গেলে একাধিক বৎসরকে ভিত্তি বৎসর হিসাবে ধরিতে হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কোন ঐতিহাসিক বা অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন বৎসরকে উহার জন্য নির্বাচন করিতে হয়। ইহা ছাড়া, সূচক-সংখ্যা যাহাতে পুরাতন না হইয়া পড়ে, তাহার জন্য প্রায়ই নূতন ভিত্তি বৎসর স্থির করিয়া নূতন করিয়া সূচক-তৈয়ারী করিতে হয়।

খ. দ্রব্য-নির্বাচনে অসুবিধা: দ্রব্য-নির্বাচনে নানারূপ অসুবিধা দেখা দেয়:

প্রথমত, সমাজে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য দেখা যায়। সকল দ্রব্য লইয়া সূচক-সংখ্যা তৈয়ার করা সম্ভব নয়। ঐ দ্রব্যগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি ধরা হইবে এবং কোন্‌গুলি বাদ দেওয়া হইবে তাহা সঠিকভাবে নিরূপণ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অবশ্য সূচক-সংখ্যার উদ্দেশ্য বুঝিয়াই দ্রব্য নির্বাচন করিতে হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত প্রধান প্রধান দ্রব্যগুলি নির্বাচন করিতে হয়। ইহা ছাড়া, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিরা বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য ভোগ করিয়া থাকে। ইহার ফলে সঠিকভাবে দ্রব্য-নির্বাচনে অসুবিধা দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, ভিত্তি-বৎসরে যে-সকল দ্রব্য লওয়া হয়, পরবর্তী বৎসরগুলিতেও একই দ্রব্য লইতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও নানারূপ অসুবিধা আসিয়া পড়ে। কারণ সময়ের পরিবর্তনের সংগে কতকগুলি দ্রব্য পুরাতন হইয়া পড়ে এবং আবার নূতন কতকগুলি দ্রব্য ভোগ-তালিকায় স্থান পায়। এইরূপ ক্ষেত্রে পুরাতন দ্রব্যগুলি বাদ দিয়া কিভাবে নূতন দ্রব্যগুলি লইয়া সূচক-সংখ্যা তৈয়ার করা হইবে সেই ব্যাপারে নানারূপ জটিলতা দেখা দেয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য মার্শাল 'শৃংখল সূচক-সংখ্যা' (chain index numbers) তৈয়ারের নির্দেশ দিয়াছিলেন। ঐরূপ সূচক-সংখ্যায় প্রতি বৎসরই পূর্বের বৎসরকে ভিত্তি-বৎসর ধরিয়া ও পুরাতন দ্রব্য বাদ দিয়া নূতন দ্রব্য যুক্ত করিয়া সূচক-সংখ্যা তৈয়ার করা হয়।

পরিশেষে, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নির্বাচিত দ্রব্যগুলির যে-গুণগত মানের পরিবর্তন হয়, তাহা সূচক-সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

গ. দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে অসুবিধা ঃ নির্বাচিত দ্রব্যগুলির কোন্ মূল্য ধরিতে হইবে সে-সম্পর্কেও অসুবিধা দেখা দেয়। অনেকের মতে দ্রব্যগুলির পাইকারী দাম সহজেই সংগ্রহ করা যায় বলিয়া উহার ভিত্তিতে সূচক-সংখ্যা প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু এই পাইকারী দামকে ভিত্তি করিয়া সূচক-সংখ্যা তৈয়ার করা হইলে উহা হইতে জীবনযাত্রার ব্যয় সঠিকভাবে বাহির করা যায় না ; কারণ উহা পাইকারী দামের উপর নির্ভর করে না, উহা নির্ভর করে খুচরা দামের উপর। কিন্তু খুচরা দাম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ হয় বলিয়া উহাকে ভিত্তি করিয়া সূচক-সংখ্যা তৈয়ার করা খুবই কষ্টসাপেক্ষ ব্যাপার হয়। ইহা ছাড়া, উপযুক্ত সংগঠনের অভাবে দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে সঠিক তথ্যও সংগ্রহ করা যায় না।

ঘ. গড় মূল্য নির্ধারণে অসুবিধা ঃ গড় মূল্য নির্ধারণের নানারূপ পদ্ধতি আছে—যেমন পাটিগাণিতিক, জ্যামিতিক ইত্যাদি। ঐ পদ্ধতিগুলির মধ্যে কোন্‌টি উত্তম ও নির্ভরশীল হইবে তাহাও সকলক্ষেত্রে সঠিকভাবে স্থির করা যায় না। সাধারণত পাটিগাণিতিক পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়।

ঙ. ওজন প্রদানে অসুবিধা ঃ নির্বাচিত দ্রব্যগুলির উপর কি পরিমাণে 'ওজন' দিতে হইবে তাহা সঠিকভাবে বাহির করা যায় না। কারণ সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির নিকট একই দ্রব্যের বিভিন্নরূপ গুরুত্ব দেখা যায়। যেমন, ধূমপান-কারীদের নিকট তামাকের গুরুত্ব খুবই বেশী অথচ অ-ধূমপানকারীদের নিকট ইহার গুরুত্ব খুবই কম। আমিষাশী-ব্যক্তিদের নিকট মাছ-মাংসের গুরুত্ব বেশী, কিন্তু নিরামিষাশীদের নিকট উহার কোন গুরুত্বই নাই। এই কারণে নির্বাচিত দ্রব্যগুলির উপর সঠিকভাবে 'ওজন' দেওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়। আবার সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নির্বাচিত দ্রব্যগুলির আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। 'ওজন'-প্রদানের সময় ইহাও বিবেচনা করিতে হয়।

এই সকল অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আধুনিককালে প্রত্যেক দেশেই দ্রব্যমূল্যের সূচকসংখ্যা তৈয়ার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহার নানারূপ প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়।

দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যার উপযোগিতা ও সীমাবদ্ধতা ঃ দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যার নানারূপ উপযোগিতা (utilities) দেখা যায় ঃ

ক. দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যার অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করা। বিভিন্ন বৎসরের মূল্যান্তরের মধ্যে তুলনা করিয়া ঐ পরিবর্তনের মাত্রা পরিমাপ করা যায়।

খ. বিগত কয়েক বৎসরের মূল্য সূচক-সংখ্যা ও বর্তমান বৎসরের মূল্য সূচক-সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক উহার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অর্থসংক্রান্ত (অর্থাৎ, টাকাকড়ির যোগান সংক্রান্ত নীতি) প্রণয়ন করে।

গ. দ্রব্যমূল্যের বাৎসরিক সূচক-সংখ্যা দ্বারা কোন দেশের মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচনের মাত্রা (degrees of inflation or deflation) পরিমাপ করা হয়।

ঘ. আজকাল দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যার গতিপ্রকৃতি বিচার করিয়া বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের বেতন ও দুর্মূল্য ভাতার সংশোধনের প্রশ্ন বিচার-বিবেচনা করা হয়।

ঙ. দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যা বিশেষত জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচক-সংখ্যা দ্বারা দেশের লোকেদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যায়। ইহা ছাড়া, সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকেদের (যেমন—শিল্প-শ্রমিক) আয় ও জীবন-যাত্রার ব্যয়ের গতিপ্রকৃতিও ইহার দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়।

চ. দেশের সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের জন্য দ্রব্যমূল্যের ও অন্যান্য সূচক-সংখ্যা ব্যবহার করিয়া থাকে।

ছ. আবার, দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যা ছাড়াও অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্যও উপযুক্ত সূচক-সংখ্যা তৈয়ারী করা হয়, যেমন—আমদানি-রপ্তানির সূচক-সংখ্যা, মজুরির সূচক-সংখ্যা, উৎপাদনের সূচক-সংখ্যা ইত্যাদি। এই সকল সূচক-সংখ্যা দ্বারা অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়গুলির গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা যায়।

জ. বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য-শর্ত (terms of trade) নিরূপণের জন্য দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। ইহা ছাড়া, বৈদেশিক বিনিময় হার ও উহার পরিবর্তন নির্ধারণের জন্যও ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে।

সীমাবদ্ধতা : দ্রব্যমূল্যের সূচক সংখ্যার নানারূপ ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও ইহা খুবই সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হয়। কারণ ইহার কতকগুলি সীমাবদ্ধতা (limitations) দেখা যায় :

প্রথমত, দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যা তৈয়ারের জন্য যে-সকল তথ্য বা পরিসংখ্যান (statistics) ব্যবহার করা হয়, তাহা সব সময়ই নির্ভরশীল বা নির্ভুল হয় না। এই কারণে সূচক-সংখ্যা দামের পরিবর্তন সঠিকভাবে পরিমাপ করিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, সূচক-সংখ্যা তৈয়ারের জন্য নানারূপ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়, ইহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে। অসুবিধাগুলির জন্য দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যা যথার্থ হইতে পারে না।

তৃতীয়ত, দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যা দ্বারা দ্রব্যমূল্যের দীর্ঘকালীন গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যায় না। ১৯৩৯ সালকে ভিত্তি বৎসর ধরিয়া সালের সূচক সংখ্যা তৈয়ার করা হইলে, উহা নিরর্থক হইয়া পড়িবে। কারণ ঐ সময়ের মধ্যে অর্থব্যবস্থায় নানারূপ পরিবর্তন ঘটায় ঐ সূচক-সংখ্যার কোনরূপ উপযোগিতা থাকিতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায়, দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যা দ্বারা শুধুমাত্র গড় দ্রব্যমূল্যের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়।

উপসংহার : দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যার ঐরূপ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আজকাল ইহার বহুল প্রচলন দেখা যায়। ইহার নানারূপ সীমাবদ্ধতা মনে রাখিয়া

ইহা প্রয়োগ করিতে হয়। পরিশেষে বলা যায়, দ্রব্যমূল্যের সূচক-সংখ্যা সতর্কতার সহিত প্রস্তুত করা হইলে ইহা হইতে দ্রব্যমূল্যের স্বল্পকালীন গতিপ্রকৃতির একটি মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়।

৪. **মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন (Inflation and Deflation)** : মূল্যস্তরের পরিবর্তনের ফলে যে-পরিস্থিতি দেখা যায় তাহাকে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন বলিয়া অভিহিত করা হয়। মূল্যস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধিকে অর্থবিদ্যায় 'মুদ্রাস্ফীতি' (inflation) এবং উহার ক্রমাগত হ্রাসকে 'মুদ্রাসংকোচন' (deflation) বলা হয়। অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের ভাষায় বলা যায়, অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রী ও উৎপাদনের উপাদানগুলির দাম-বৃদ্ধিকে সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয় এবং অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রীর দাম ও ব্যয়ের হ্রাসকে মুদ্রাসংকোচন (By inflation we mean a time of generally rising prices for goods and factors of production. By deflation we mean a time when most prices and costs are falling—*Samuelson*)[১]। 'মুদ্রাস্ফীতি' ও 'মুদ্রাসংকোচন'—দুইটি পরস্পর বিরোধী অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। মুদ্রাস্ফীতির সময় খাদ্যদ্রব্য, কাপড়-চোপড়, তৈল, লবণ, মোটরগাড়ী ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রীর দাম এবং খাজনা, মজুরি, সুদ প্রভৃতি উপাদানের আয় নিয়মিত ও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। মুদ্রাসংকোচনের সময় ঐ বিষয়গুলির নিয়মিত ও যথেষ্ট হ্রাস ঘটিয়া থাকে। ভারতে সাম্প্রতিককালের বৎসরগুলিতে নিত্যব্যবহার্য ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর দামের যথেষ্ট ও ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ভারতে চতুর্থ পরিকল্পনার সময় (১৯৬৯-৭৪) সাধারণ দামস্তর ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং শুধুমাত্র ১৯৭৩-৭৪ সালে দাম-স্তর প্রায় ৩০ শতাংশের মতো বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই কারণে ১৯৭৩ ৭৪ সালকে রিজার্ভ ব্যাংক একটি 'অভূতপূর্ব মুদ্রা-স্ফীতির বৎসর' (a year of unprecedented inflation) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল। বর্তমানে বার্ষিক মুদ্রা-স্ফীতির হারকে এক অংকের মধ্যে রাখার প্রয়াস চলিতেছে।

'মুদ্রাস্ফীতি' ও 'মুদ্রাসংকোচন'—এই দুইটি পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিলেই 'মুদ্রাসংকোচন' সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা যাইবে। এই কারণে মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন দিক বিশদভাবে আলোচনা করা হইল।

মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে অভিমত : মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে অর্থনীতি-বিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। পূর্বেকার লেখকদের মতে, দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের তুলনায় টাকাকড়ির পরিমাণ অধিক বৃদ্ধি পাইলে দাম-স্তরের বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতি ঘটে অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির সময় "অত্যধিক টাকাকড়ি অত্যল্প দ্রব্যসামগ্রীর দিকে ধাবিত হয়" (too much money chasing too few goods)। পূর্বেকার লেখকদের এই অভিমত আমেরিকার অর্থনীতিবিদ ফিশারের টাকাকড়ির পরিমাণ-তত্ত্বের (Quantity Theory of Money) উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ তত্ত্বে বলা হয়,

১ Samuelson—*Economics* (11th Edition)

দেশে টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া দাম-স্তরের আনুপাতিক বৃদ্ধি ঘটে।

আধুনিককালের লেখকরা টাকাকড়ির যোগানের পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রাস্ফীতির বিশ্লেষণ না করিয়া সামগ্রিক আয়-ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অধ্যাপক পিগু-এর (Pigou) মতে, দেশে আর্থিক আয় যখন আয়-সৃষ্টিকারী কাজ অপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পায় তখনই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে ("Money income is expanding more than in proportion to income-earning activity.")। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যাইতে পারে, দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-বৃদ্ধির হার অপেক্ষা আর্থিক আয়বৃদ্ধির হার অধিক ও দ্রুততর হইলে দামস্তর ঊর্ধ্বগামী হইতে থাকে। যেমন—কোন সময়ে আর্থিক আয় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল মাত্র ৩০ শতাংশ। এমতাবস্থায় আয়-বৃদ্ধির দরুণ দেশের লোকদের ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি না পাওয়ায় অল্প পরিমাণ দ্রব্যের জন্য অধিক আয় ব্যয়িত হইবে এবং তাহার ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ; ইহাকেই মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

লর্ড কেইন্‌স (Lord Keynes)-ও মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে প্রায় একইরূপ অভিমত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে, যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে অব্যবহৃত ও বেকার সম্পদ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও দাম-স্তরের উপর উহার প্রভাব থাকিবে না। এইরূপ অবস্থায় টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পাইলে দেশে 'কার্যকর চাহিদা' (effective demand) ও নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় দাম-স্তর বৃদ্ধি পাইবে না। কিন্তু দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ পরিপূর্ণ-ভাবে ব্যবহৃত হইলে অর্থাৎ পূর্ণ নিয়োগ (full employment) আসবার পর টাকাকড়ির যোগান বাড়িলেও দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি পাইবে না : এই অবস্থায় কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার ফলে দাম-স্তরের ঊর্ধ্বগতি দেখা দিবে। সুতরাং দেখা যায়, পূর্ণ নিয়োগের সময় মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব ঘটে। এই কারণে অনেক লেখক মুদ্রাস্ফীতিকে একটি "পূর্ণ নিয়োগ সংক্রান্ত ঘটনা" (a full-employment phenomenon) বলিয়া অভিহিত করেন। অবশ্য কখনও কখনও কোন বিশেষ উপাদানের স্বল্পতার জন্য দেশে অব্যবহৃত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। ইহাকে 'আধা-মুদ্রাস্ফীতি' (semi-inflation) বা 'প্রতিবন্ধকজনিত মুদ্রাস্ফীতি' (bottleneck inflation) বা 'চাহিদা-স্থানান্তর মুদ্রাস্ফীতি' (demand shift inflation) বলে। যেমন—ভারতে প্রাকৃতিক সম্পদের বেকারত্ব থাকা সত্ত্বেও মূলধন-স্বল্পতা ও কারিগরী দক্ষতার অপ্রাচুর্যের জন্য দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির পথে নানারূপ প্রতিবন্ধকতা দেখা যাইতেছে এবং ইহার ফলে বেকার পরিস্থিতির মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যাইতেছে।

মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা পরিমাপের জন্য আধুনিক লেখকরা "মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক"

(inflationary gap) ধারণাটি প্রবর্তন করেন। তাঁহাদের মতে, ভিত্তি-বৎসরের দামস্তরে মূল্যায়িত ক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য অপেক্ষা কোন বৎসরে প্রত্যাশিত ব্যয়ের পরিমাণে যে আধিক্য দেখা যায় তাহাই হইতেছে মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক ("an excess of anticipated expenditures over available output at base prices."—*Kurihara*)[১]।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ ও উহাদের কারণসমূহ : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ ও গতিবেগ অনুসারে মুদ্রাস্ফীতিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় :

ক। ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি ও মজুরি বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি : যুদ্ধ ও উন্নয়ন প্রকল্পের অত্যধিক ব্যয় মিটাইবার জন্য সরকারী বাজেটে ঘাটতি হয় এবং উহা পূরণের জন্য অধিক পরিমাণে টাকাকড়ির প্রচলন করিতে হয়। ইহার ফলে যে-মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাহা 'ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতির (deficit-induced inflation) পরিস্থিতি'। বর্তমানে ভারত সরকার উন্নয়নের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অধিক পরিমাণে টাকাকড়ি সৃষ্টি করিতেছে এবং ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে। সুতরাং ভারতের বর্তমান দাম-বৃদ্ধি অংশত ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি। পক্ষান্তরে, শ্রমিক-সংঘের চাপে বা অন্য কোন কারণে শ্রমিকদের মজুরি উহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাইলে উহার ফলে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং দাম বাড়িয়া যায়। এই প্রকার মুদ্রাস্ফীতি 'মজুরিবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি' (wage-induced inflation) নামে পরিচিত।

খ। মৃদুগতিসম্পন্ন মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রুতগতিসম্পন্ন মুদ্রাস্ফীতি : দাম-বৃদ্ধির গতিবেগের দৃষ্টিকোণ হইতে মুদ্রাস্ফীতিকে 'মৃদুগতিসম্পন্ন' (creeping বা mild) ও 'দ্রুতগতিসম্পন্ন' (runaway বা galloping বা hyperinflation), এই দুই-শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। মৃদুগতিতে দাম-স্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধিকে 'মৃদুগতিসম্পন্ন মুদ্রাস্ফীতি' বলা হয়। কিন্তু দামবৃদ্ধির গতিবেগ খুব দ্রুত হইলে তাহাকে দ্রুতগতিসম্পন্ন মুদ্রাস্ফীতি বা অতি-মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে অতি-মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছিল। ইহা ছাড়া, ভারতে ১৯৭৩-৭৪ সালে দাম-স্তরের যে-দ্রুত বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, তাহাকে 'দ্রুতগতিসম্পন্ন মুদ্রাস্ফীতি' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

গ। মুদ্রাবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও ঋণবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি : সরকার কর্তৃক প্রচলিত টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে দাম-স্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধিকে 'মুদ্রাবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি' (currency inflation) এবং ব্যাংক-ঋণের অত্যধিক প্রসারের ফলে যে-দামবৃদ্ধি ঘটে, তাহাকে 'ঋণবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি' (credit inflation) বলে।

১. K. Kurihara—*Monetary Theory and Public Policy*—Chap. 4

ঘ। উন্মুক্ত মুদ্রাস্ফীতি ও দমিত মুদ্রাস্ফীতি: সরকার বা অর্থ-কর্তৃপক্ষ যখন দেশের জনসাধারণের বর্ধিত ব্যয় নিয়ন্ত্রণের কোনরূপ চেষ্টা করে না, তখন যে-দাম-বৃদ্ধি ঘটে তাহাকে 'উন্মুক্ত বা অবাধ মুদ্রাস্ফীতি' (open inflation) বলে। কিন্তু সরকার কর্তৃক কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম-নিয়ন্ত্রণ ও ভোগ-বরাদ্দের চেষ্টা সত্ত্বেও তখন যে-দামবৃদ্ধি ঘটে, তাহাকে 'দমিত মুদ্রাস্ফীতি' (suppressed বা repressed inflation) বলে। দমিত মুদ্রাস্ফীতির সময় দেশের লোকদের নগদ টাকা ও ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স বৃদ্ধি পায়; নিয়ন্ত্রিত দামের দ্রব্যগুলির দাম বাড়িতে পারে না, কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত দামের দ্রব্যগুলির দাম অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুদ্রাস্ফীতি দমিত হইয়া থাকে।

ঙ। মুনাফা মুদ্রাস্ফীতি: দাম-স্তর যখন স্থির থাকে, কিন্তু উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ হ্রাস পাইয়া যে মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তখন মুনাফা-মুদ্রাস্ফীতি (profit inflation) দেখা দেয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৪-২৯ সালে এই প্রকার মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতি দেখা গিয়াছিল।

চ। চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি: আধুনিককালের লেখকরা মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করিতে গিয়া এই দুই প্রকার মুদ্রাস্ফীতি উল্লেখ করেন। পূর্ণ নিয়োগ স্তরে যে-পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা যায়, তাহার তুলনায় দেশে মোট ব্যয়ের (ভোগব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারী ব্যয়) পরিমাণ অধিক হইলে যে-দামবৃদ্ধি ঘটে, তাহাকে 'চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি' (demand-pull inflation) বলে। এমতাবস্থায় সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে মোট ভোগ-ব্যয় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পূর্ণনিয়োগ অবস্থা থাকার জন্য দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না, ফলে দাম-স্তর ঊর্ধ্বগামী হয়। এইরূপ দাম-বৃদ্ধি পরিশেষে মজুরি বাড়াইয়া দেয়। অবশ্য এই প্রকার মুদ্রাস্ফীতি পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা আসিবার পরই ঘটিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে, উৎপাদনের উপকরণের (যেমন—কাঁচামাল, শ্রম ইত্যাদি) দাম-বৃদ্ধির ফলে অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধির ফলে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তাহাকে 'ব্যয়বৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি' (cost-push inflation) বলে। আধুনিক লেখকদের মতে, আজকাল সমাজে কোন কোন অর্থনৈতিক গোষ্ঠী বিশেষত শ্রমিক-সংঘ এতবেশী ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে যে, উহারা মালিকের উপর চাপ দিয়া মজুরি ও দাম বৃদ্ধি করিতে পারে। ইহার ফলে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং পরিশেষে দাম-স্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতা যে-হারে বৃদ্ধি পাইল শ্রমিক-সংঘের চাপে তাহা অপেক্ষা অধিক হারে মজুরির বৃদ্ধি ঘটিলে বর্ধিত মজুরির ধাক্কায় দামবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং ইহার ফলে 'ব্যয়-বৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি' দেখা দেয়। এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি বেকারাবস্থায় অর্থাৎ পূর্ণ-নিয়োগের পূর্বেও দেখা যাইতে পারে।

পূর্বে মনে করা হইত, 'ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি' মূলত 'মজুরি-ধাক্কাজনিত' (wage-push)। কিন্তু স্যামুয়েলসন প্রমুখ আধুনিক লেখকরা দেখাইয়াছেন, ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দামবৃদ্ধির ধাক্কা (price-push) এবং মজুরি-বৃদ্ধির ধাক্কার (wage-push) সংমিশ্রণ।[১] তাঁহাদের মতে, প্রথমে দাম বৃদ্ধি পায় এবং উহার ফলে শ্রমিকসংঘ মজুরি বৃদ্ধির চাপ দেয়। পরিশেষে উৎপাদনব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া 'ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি' ঘটায়। ইহাকেই স্যামুয়েলসন 'বিক্রেতার মুদ্রাস্ফীতি' (Sellers' Inflation) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[২]

ছ। স্থিতাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি: অর্থনীতির প্রচলিত তত্ত্ব অনুসারে পূর্ণ-নিয়োগাবস্থায় প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি (pure inflation) ঘটে। বর্তমানে কিন্তু অধিকাংশ দেশেই দেখা যায়, পূর্ণনিয়োগাবস্থার বহু পূর্বেই দাম নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ও স্থিতাবস্থার (inflation and stagnation) সহ-অবস্থান দেখা যাইতেছে। স্যামুয়েলসনের ভাষায় বলা যায়, অর্থনৈতিক প্রসার ও নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা ঘটিয়াছে, কিন্তু দাম নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে (...stagnation of growth and employment at the same time that prices are rising.')। ইহাকেই 'স্থিতাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি' বা 'স্থিতি-স্ফীতি' (stagflation) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইতেছে। ইহার কারণস্বরূপ বলা হয়, কাঁচামালের ঘাটতি ও অনিয়মিত যোগান, দ্রব্যসামগ্রীর অপর্যাপ্ত চাহিদা ইত্যাদির জন্য উন্নতির হার অপর্যাপ্ত ও মন্থর হয়, অথচ অর্থব্যবস্থায় পূর্বোল্লিখিত 'বিক্রেতার মুদ্রাস্ফীতি' ঘটিতেছে। ভারত সহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এইরূপ বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতির সহ-অবস্থান দেখা যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে ইহা বিশ্বজনীন অভিশাপে পরিণত হইয়াছে।

৫. দামস্তরের পরিবর্তনের ফলাফল (Consequences of changes in the Price-level): দাম-স্তরের পরিবর্তনের ফলাফল দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে—মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল ও মুদ্রাসংকোচনের ফলাফল। এই দুই প্রকার ফলাফল নিম্নে পৃথকভাবে আলোচনা করা হইল:

মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল: মুদ্রাস্ফীতি অর্থব্যবস্থায় নানারূপ ফলাফল সৃষ্টি করে। উক্ত ফলাফল কয়েকটি অংশে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে:

ক। আয় ও সম্পদ বণ্টনের উপর ফলাফল: মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজের আয় ও সম্পদ বণ্টনের কাঠামোতে নানারূপ পরিবর্তন দেখা যায়। কোন কোন সম্প্রদায় লাভবান এবং কোন কোন সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহা নিম্নে কয়েকটি অংশে ভাগ করিয়া আলোচনা করা হইল।

১। পাওনাদার ও দেনাদার: মুদ্রাস্ফীতির ফলে পাওনাদাররা ক্ষতিগ্রস্ত

১. "Cost-push is the combination of price-push and wage-push"—*Samuelson*

২. Samuelson—*Economics* (11th Edition)

এবং দেনাদাররা লাভবান হয়। টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি হ্রাস পায় বলিয়া পাওনাদাররা যে-অর্থ ফেরত পায়, তাহার মূল্য পূর্বাপেক্ষা কম হয়। কিন্তু দেনাদাররা ঋণ পরিশোধের জন্য দ্রব্যের আকারে কম ফেরত দেয়।

২। **উৎপাদক ও শ্রমিক:** মুদ্রাস্ফীতির ফলে উৎপাদকরা লাভবান হয়; কারণ উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া তাহারা অধিক দাম পায় এবং ফলে তাহাদের মুনাফা বৃদ্ধি পায়। ব্যয়বৃদ্ধির তুলনায় দামবৃদ্ধির পরিমাণ সাধারণত বেশী হয় বলিয়া মুদ্রাস্ফীতির সময় উৎপাদকের লাভ হয়। ইহা ছাড়া, ব্যয়ের কিছু বিষয় (যেমন—স্থায়ী কর্মচারীদের বেতন, কারখানার খাজনা প্রভৃতি) চুক্তি অনুযায়ী স্থির থাকে বলিয়া উৎপাদন-ব্যয় বিশেষ বৃদ্ধি পায় না, ফলে মুদ্রাস্ফীতির সময় উৎপাদকের লাভের অঙ্ক বেশি হয়। পক্ষান্তরে, শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কারণ তাহাদের প্রকৃত মজুরি (real wages) দাম-বৃদ্ধির ফলে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তদুপরি, মুদ্রাস্ফীতির সময় দাম-বৃদ্ধির তুলনায় মজুরি-বৃদ্ধির পরিমাণ কম হয় বলিয়া শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকরা মুদ্রাস্ফীতির সময় লাভবান হয়, কারণ তাহারা ঐ সময় উৎপাদন-বৃদ্ধির ফলে কাজের সুযোগ বেশী পাইয়া থাকে।

৩। **স্থির-আয়ের ব্যক্তিবর্গ:** বেতনজীবী, পেন্সনভোগী, বাড়ীর মালিক প্রভৃতি স্থির-আয়ের ব্যক্তিবর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কারণ মুদ্রাস্ফীতির সময়ে তাহাদের আয়ের ক্রয়শক্তি হ্রাস পায়।

৪। **বিনিয়োগকারী:** কোম্পানীর শেয়ারে লগ্নীকারীরা মুদ্রাস্ফীতির সময় লাভবান হয়; কারণ তাহাদের শেয়ারের মূল্যে বা মূলধন-সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং কোম্পানীর লাভের পরিমাণ বেশী হয় বলিয়া উচ্চহারে ডিভিডেন্ড (dividend) পায়। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তিরা সরকারের ঋণপত্রে বা কোম্পানীর বণ্ডে টাকা বিনিয়োগ করে তাহাদের লাভ হয় না, কারণ তাহারা নির্দিষ্ট হারে সুদ ভোগ করে এবং দাম-বৃদ্ধির ফলে ঐ সুদের প্রকৃত মূল্য হ্রাস পায়।

৫। **ব্যবসাদার, মজুতদার ও ফটকা কারবারী:** দাম-বৃদ্ধির ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে লাভের সুযোগ প্রসারিত হয় বলিয়া ইহারা লাভবান হয়। কালো-বাজারের ব্যবসায়ীরা মুদ্রাস্ফীতির সময় মোটা লাভের সুযোগ পায়।

৬। **কৃষিজীবী:** মুদ্রাস্ফীতির সময় কৃষকরা সাধারণত লাভবান হয়; কারণ তাহারা অধিক দামে কৃষিপণ্য বিক্রয় করিতে পারে। ইহা ছাড়া, সাধারণত অন্যান্য উৎপাদিত দ্রব্যের তুলনায় কৃষিপণ্যের দাম অধিক বৃদ্ধি পায় বলিয়া কৃষকরা শ্রেণীগত হিসাবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অধিক লাভবান হয়।

সুতরাং দেখা যায়, মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশে আয় ও সম্পদ বণ্টনের কাঠামোতে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। ধনী ব্যক্তিদের আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি এবং গরীব ব্যক্তিদের উহা হ্রাস পায় বলিয়া আয় ও সম্পদ বণ্টনের কাঠামোতে বৈষম্যের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

মুদ্রাস্ফীতির সময় ধনী আরও ধনী এবং গরীব আরও গরীব হয় বলিয়া ইহাকে 'অন্যায্য' (unjust) বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

খ। উৎপাদনের উপর ফলাফল: মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশে সামগ্রিকভাবে উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় বলিয়া উৎপাদকরা তাহাদের কারখানায় উৎপাদন-ক্ষমতা পূর্ণ ব্যবহার করিয়া উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রয়াস করে। দাম যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, উৎপাদকের লাভের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পায় বলিয়া তাহারা যতদূর সম্ভব অধিক দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের চেষ্টা করে। প্রথমে সাধারণত ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং উহার ধাক্কায় মূলধন-দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু দাম বাড়িতে বাড়িতে চরম পর্যায়ে পৌঁছাইলে উৎপাদন আর বৃদ্ধি করা যায় না, কারণ পূর্ণ নিয়োগের ফলে উৎপাদন-বৃদ্ধির পথে নানারূপ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়।

উৎপাদন-বৃদ্ধির উপর মুদ্রাস্ফীতির এই প্রভাব অবশ্য সর্বত্র না-ও দেখা যাইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, দ্রব্যসামগ্রীর দাম নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে মন্দাভাব রহিয়াছে; এই পরিস্থিতিকে 'স্থিতাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি' (stagflation) বলা হয়, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতেও বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির সময় এই পরিস্থিতি দেখা গিয়াছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে ভারতে 'অভূতপূর্ব মুদ্রাস্ফীতি' হওয়া সত্ত্বেও নানাকারণে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিদারুণ মন্দাভাব দেখা দিয়াছিল।

গ। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের উপর ফলাফল: মুদ্রাস্ফীতির সময় দাম-স্তরের নিয়মিত বৃদ্ধি ঘটায় ব্যবসা-বাণিজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ীদের লাভের পরিমাণ ও সম্ভাবনা বাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা অতি-লাভের প্রত্যাশায় দ্রব্যসামগ্রীর মজুদ বৃদ্ধি করে এবং বাজারে দ্রব্যাদির কৃত্রিম ঘাটতি করিয়া ক্রেতাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং দামবৃদ্ধির গতিবেগ দ্রুততর করে। ফটকা কারবারীরা শেয়ার, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রভৃতি লইয়া বৃহদাকারে ফটকা কারবার করে। এই অবস্থায় সরকারী নিয়ন্ত্রণের অভাবে ঘটিলে চোরাকারবারীরা অতি মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে। দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের আয়তন ও লেনদেন বৃদ্ধি পাইলেও বিদেশে দেশের দ্রব্যাদির চাহিদা হ্রাস পায় বলিয়া রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়িয়া যায় বলিয়া মুদ্রাস্ফীতির সময় দেশে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ প্রসারিত হয় এবং বেকারত্বের পরিমাণ হ্রাস পায়।

ঘ। আয়ের উপর ফলাফল: মুদ্রাস্ফীতির সময় টাকাকড়ির যোগান ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় বলিয়া দেশের লোকদের আর্থিক আয় সাধারণত বৃদ্ধি পায়। জাতীয় আয়ের অর্থমূল্যে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দাম-বৃদ্ধির ফলে দেশের লোকদের আয় বিশেষভাবে হ্রাস পায়।

ঙ। **সরকারের আয়-ব্যয়ের উপর ফলাফল :** মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকার বিভিন্ন সূত্র (যেমন—আয় কর, বিক্রয় কর, উৎপাদন শুল্ক, মুনাফা কর প্রভৃতি) হইতে অধিক আদায় করিতে পারে বলিয়া উহার রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। প্রশাসন, উন্নয়ন ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য অধিক ব্যয় করিতে হয় বলিয়া সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সরকারের ঋণের প্রকৃত বোঝা (real burden of public debt) হ্রাস পায় বলিয়া ঋণ-পরিশোধের সময় সরকার প্রকৃতপক্ষে পূর্বাপেক্ষা কম ক্রয়শক্তি ফেরত দেয়।

চ। **অর্থনৈতিক প্রসারের উপর ফলাফল :** 'মৃদু মুদ্রাস্ফীতি' উৎপাদনকে উৎসাহিত করে বলিয়া সাধারণত ইহা অর্থনৈতিক প্রসারের সহায়ক হয়। কিন্তু 'দ্রুতগতিসম্পন্ন মুদ্রাস্ফীতি' অর্থনৈতিক উন্নয়নকে শ্লথ করিয়া দেয় ; কারণ ইহা উন্নয়ন-প্রকল্পের ব্যয় অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি করে এবং উন্নয়নের পথে নানারূপ বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করে। মুদ্রস্ফীতির অত্যধিক হার উন্নয়নের হারকে যে হ্রাস করে তাহা ভারতেই দেখা গিয়াছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে ভারতে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৩০ শতাংশের মতো, কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারে অর্থাৎ, জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার হইয়াছিল মাত্র ৩ শতাংশ।

ছ। **সমাজের উপর ফলাফল :** মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে সমাজ একদিকে যেরূপ লাভবান হয়, অন্যদিকে তেমনি অস্থিতিশীল ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সমাজে বেকারত্বের পরিমাণ হ্রাস পায় বলিয়া সমাজকে খুব প্রাণবন্ত ও সমৃদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অন্যদিকে দেখা যায় চরম অসন্তোষ, শিল্প-বিরোধ ও সাধারণ লোকের দুর্গতি। ইহার ফলে সামাজিক ভারসাম্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়।

মুদ্রাসংকোচনের ফলাফল : মুদ্রাসংকোচনের ফলাফল মুদ্রাস্ফীতির ফলাফলের ঠিক বিপরীত। মুদ্রাসংকোচনের সময় দাম হ্রাস পাওয়ায় টাকাকড়ির মূল্য বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে পাওনাদাররা লাভবান এবং দেনাদাররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উৎপাদনকারীরা কম দামে জিনিস বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় বলিয়া তাহাদের ক্ষতি হয়। পক্ষান্তরে, টাকাকড়ির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায় বলিয়া শ্রমিকরা লাভবান হয়।

মুদ্রাসংকোচনের ফলে দাম-স্তর ক্রমাগত হ্রাস পায় বলিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পায়। ইহার ফলে একদিকে যেমন জাতীয় আয়ের মূল্য হ্রাস পায়, অন্যদিকে তেমনি কর্মসংস্থানের সুযোগ কমিয়া যায় এবং দেশের বেকারত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দাভাব আসে এবং ব্যবসায়ীদের মনে নিরাশার ভাব দেখা দেয়। দাম-স্তর ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকিলে পরিণামে অর্থব্যবস্থা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

উপসংহার : 'মুদ্রাস্ফীতি' বা 'মুদ্রাসংকোচন' কোনটিই অর্থব্যবস্থার পক্ষে শুভ নহে। মুদ্রাস্ফীতি আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য বৃদ্ধি করে বলিয়া ইহা যেমন

অন্যায্য (unjust), মুদ্রাসংকোচনের ফলে দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে মন্দাভাব আসে বলিয়া ইহা তেমনি অনিষ্টকর (harmful)। তবে অনেক লেখকের মতে, মুদ্রাস্ফীতি অপেক্ষা মুদ্রাসংকোচন অধিকতর অনিষ্টকর।

৬. দাম-স্থিতিকরণ (Price Stabilisation): পূর্বের অংশে দেখানো হইয়াছে, অর্থব্যবস্থার পক্ষে মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন কোনটিই কাম্য নহে। সুতরাং ইহার জন্য প্রয়োজন পড়ে দাম-স্তর স্থিতিশীল রাখা। দাম-স্তর স্থিতিশীল রাখার জন্য অর্থবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন ধরনের অর্থসংক্রান্ত, রাজস্বসংক্রান্ত ও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা সুপারিশ করেন এবং বাস্তবক্ষেত্রে ঐগুলি প্রয়োগ করিয়া দামস্তর স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ ব্যবস্থাগুলি আলোচনার পূর্বে দাম-স্থিতিকরণ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

কোন কোন লেখকের মতে, মূল্যস্তর বা টাকাকড়ির মূল্য স্থিতিশীল রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অর্থসংক্রান্ত নীতির (monetary policy) অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। স্থিতিশীল দাম-নীতির সমর্থনে কয়েকটি যুক্তি দেখানো হয়। প্রথমত, দাম-স্তরের উঠানামা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উপর বিভিন্ন ধরনের প্রভাব সৃষ্টি এবং ইহার ফলে একশ্রেণীর লোকেরা লাভবান এবং অন্য শ্রেণীর লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয়ত, অস্থিতিশীল মূল্যস্তর অর্থব্যবস্থায় নানারূপ কুফল সৃষ্টি করে। ইহা ছাড়া, আপেক্ষিক দামের (relative prices) মধ্যে সমতা রক্ষার করারও প্রয়োজন আছে। পরিশেষে বলা হয়, টাকাকড়ি সমাজে মূল্যের মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে। সুতরাং ঐ মানদণ্ড স্থিতিশীল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই সকল কারণেই দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কিন্তু দাম-স্থিতিকরণের কয়েকটি অসুবিধা দেখানো হয়। প্রথমত, অর্থব্যবস্থায় বেকার-সম্পদ থাকিলে স্থিতিশীল দাম কাম্য হইবে না। কারণ বেকারত্বের সমাধান করিতে হইলে উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু দাম-স্তর কিছু বৃদ্ধি না পাইলে উৎপাদন-বৃদ্ধির কোনোরূপ প্রেরণা থাকে না। সুতরাং স্থিতিশীল দাম-স্তর দ্বারা বেকারত্বের অবসান ঘটানো সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া, বিকাশশীল দেশে দাম-স্তরের অল্পস্বল্প বৃদ্ধি (a gently rising price-level) অর্থনৈতিক প্রসারের সহায়ক হয়। দ্বিতীয়ত, স্থিতিশীল দামনীতি অনুসরণ করা হইলে কোন্ দাম স্থিতিশীল করা হইবে সেই ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দিতে পারে; দ্রব্যমূল্যের পাইকারী দাম না খুচরা দাম স্থিতিশীল করা হইবে তাহা নির্ধারণে বিশেষ অসুবিধা দেখা দিতে পারে। পরিশেষে, অধ্যাপক হাম্ (Halm) মন্তব্য করিয়াছেন, দামস্তরের সম্পূর্ণ স্থিতিকরণ সম্ভব নয়, কাম্যও নয়।

এই কারণে দাম স্থিতিকরণের নীতিটি সর্বজনগ্রাহ্য হয় না। দাম-স্তরের তীব্র উঠা-নামাও কাম্য নহে। অধিকাংশ লেখকদের মতে, দামস্তরের তীব্র উঠানামা বন্ধ করিয়া উহাকে একটি যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে রাখিতে পারিলে তাহা অর্থব্যবস্থার

পক্ষে শুভ হইবে। আবার বিকাশশীল দেশগুলিতে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রসারের জন্য দাম-স্থিতিকরণের পরিবর্তে দাম-স্তরের অল্পস্বল্প বৃদ্ধিই বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

৭. দাম-স্তর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাসমূহ (Measures for Price Control) : দাম-নিয়ন্ত্রণ বা দাম-স্তর নিয়ন্ত্রণ বলিতে দামের উঠা-নামা প্রতিহত করাকেই বুঝায়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণের জন্য যে-সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহাকেই বুঝায়। এই ব্যবস্থাগুলি মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া বর্ণনা করা হইল :

ক. অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থাসমূহ : দাম-স্তর নিয়ন্ত্রণের অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি (monetary measures) প্রধানত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ব্যবস্থাগুলি দ্বারা দেশে টাকাকড়ি ও ব্যাংক-ঋণের যোগান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় টাকাকড়ির যোগান নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের প্রচলিত টাকাকড়ি কিছু পরিমাণে তুলিয়া লওয়ার আবশ্যক হইয়া পড়ে। মুদ্রাস্ফীতি চরম আকার ধারণ করিলে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত টাকাকড়ি অচল (demonetisation) করার ব্যবস্থা করা হয়, যেমন—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এবং ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতে উচ্চমূল্যের কাগজী নোট অচল করা হইয়াছিল বা কয়েক বৎসর পূর্বে বাংলাদেশে প্রচলিত টাকাকড়ি অচল করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া, ডিভিডেন্ড-এর উপর বাধানিষেধ আরোপ, বাধ্যতামূলক আমানত, বর্ধিত বেতন ও দুর্মূল্য ভাতা আটক, ব্যাঙ্ক-আমানত ও অন্যান্য নগদ-সম্পদ আটক প্রভৃতি ব্যবস্থা দ্বারাও দেশের টাকাকড়ির যোগান-হ্রাসের চেষ্টা করা হয়।

দাম-স্তরের ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধের জন্য অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে ব্যাঙ্ক-ঋণ যোগানের পরিমাণ হ্রাসের ব্যবস্থাই অধিক গুরুত্বসম্পন্ন। ব্যাঙ্ক-রেট বৃদ্ধি, খোলাবাজারে ঋণপত্র-বিক্রয়, রিজার্ভ অনুপাত বৃদ্ধি, নির্বাচিত ঋণের ক্ষেত্রে উচ্চতর জামিনের ব্যবস্থা প্রভৃতি পদ্ধতি দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মুদ্রাস্ফীতির সময় ব্যাঙ্ক-ঋণ সংকোচনের ব্যবস্থা করে। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

পক্ষান্তরে, দাম-স্তরের নিম্নগতি প্রতিরোধের জন্য টাকাকড়ি ও ব্যাঙ্ক ঋণের যোগান বৃদ্ধি করিতে হয়। দ্রব্যমূল্য যখন হ্রাস পাইতে থাকে, তখন ব্যাঙ্ক-রেট হ্রাস বা রিজার্ভ অনুপাত বা খোলাবাজারে ঋণপত্র ক্রয়ের মাধ্যমে অর্থব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক-ঋণের যোগান বৃদ্ধি করিতে হয় অর্থাৎ তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 'সুলভ অর্থ-সংক্রান্ত নীতি' (cheap money policy) অনুসরণ করিবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, কেবলমাত্র অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রা-সংকোচন পরিপূর্ণভাবে দমন করা যায় না। এই কারণেই অধ্যাপক হ্যানসেন (H[illegible]) মন্তব্য করিয়াছেন, মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবিধানের জন্য পুরাপুরিভাবে অর্থসংক্রান্ত নীতির

উপর নির্ভরশীলতা বিপজ্জনকভাবে এক-তরফা ব্যবস্থা।[১] আবার দাম-স্তর যখন ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে তখন কেবলমাত্র টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করিয়া উহা প্রতিহত করা যায় না।

খ. রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যবস্থাসমূহ: দাম-স্তর নিয়ন্ত্রণের রাজস্বসংক্রান্ত (fiscal measures) ব্যবস্থাগুলি হইতেছে সরকারের আয়, ব্যয় ও ঋণ সম্পর্কিত ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাগুলি দেশের সরকারই প্রয়োগ করে। মুদ্রাস্ফীতি দমনের জন্য সরকারকে আয়কর, সম্পদ কর, উৎপাদন শুল্ক, মুনাফা কর, মূলধন-লাভ কর প্রভৃতির হার বৃদ্ধি করিতে হয়। অপ্রয়োজনীয় ও বিলাস দ্রব্যসামগ্রীর ভোগ-নিয়ন্ত্রণের জন্য উহাদের উপর চড়া হারে কর ধার্য করা হয়। ইহা ছাড়া, মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকারকে উহার ব্যয় হ্রাস করিতে হয়। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার, অপচয় রোধ ও ব্যয়-সংকোচন, প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস, ঘাটতি ব্যয়ের (deficit spending) পরিমাণ হ্রাস প্রভৃতি দ্বারা সরকারী ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা করিতে হয়। পরিশেষে বলা যায়, দেশের লোকদের হাতে 'ব্যয়যোগ্য আয়ের' (disposable income) পরিমাণ হ্রাসের জন্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, বিলম্বে বেতন প্রদান (deferred pay), সরকারী ঋণবৃদ্ধি প্রভৃতি রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি অনুসরণ করা হয়।

পক্ষান্তরে, মুদ্রা-সংকোচনের সময় করের হার হ্রাস করিয়া একদিকে যেমন দেশে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয় এবং অন্যদিকে তেমনি উৎপাদন-কার্য যাহাতে বিশৃংখলিত না হয়, তাহার জন্য কর-রেহাই বা ভরতুকি (subsidies) প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহা ছাড়া, দেশের লোকেরা যাহাতে অধিক পরিমাণে ব্যয় করিতে পারে, তাহার জন্য সরকারী ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হয় বা বাধ্যতামূলক আমানত তুলিয়া লইতে হয়। আবার, পূরণমূলক ব্যয় (compensatory spending) নীতির দ্বারা সরকারের ব্যয়-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হয়। কিন্তু রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। কারণ এইগুলি সরকার কর্তৃক প্রয়োগ হয় বলিয়া উহা অধিষ্ঠিত সরকারের রাজনৈতিক আদর্শের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। ইহা ছাড়া, এই ব্যবস্থাগুলি উপযুক্ত সময়ে গ্রহণ করা না হইলে উহা হইতে বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না।

গ. প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাসমূহ: দাম-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাগুলিও (direct measures) সরকার প্রয়োগ করে। এই ব্যবস্থাগুলি দ্বারা মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালানো হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় দ্রব্যসামগ্রীর ঘাটতি প্রতিরোধের জন্য উহাদের উৎপাদন-বৃদ্ধি ও বণ্টনের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হয়। খাদ্যশস্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যগুলির উৎপাদন ও যোগান অব্যাহত রাখার

---

১. Hansen—*Monetary Theory and Fiscal Policy* ("Exclusive reliance upon monetary policy as the means to cope with the inflation is a dangerously one-sided weapon"—*Hansen*.)

জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। ইহা ছাড়া, মজুরি-বৃদ্ধি স্থগিত (wage freeze), দাম-নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ-ব্যবস্থা (price control and rationing), কালোবাজারী ও চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, চোরাই-চালান (smuggling) প্রতিরোধ, অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মজুতনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি দমনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

পক্ষান্তরে, দ্রব্যমূল্য হ্রাসের সময় উপরি-উক্ত বাধানিষেধগুলি শিথিল করিতে হয়। মজুরি-বৃদ্ধি বা দাম-বৃদ্ধির উপর যে-সকল বিধিনিষেধ থাকে, তাহা তুলিয়া লইতে হয়। ভোগের প্রসারের জন্য ভোগ-নিয়ন্ত্রণ রহিত করিতে হয়। উৎপাদকরা বিশেষত কৃষি-উৎপাদকরা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তাহার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর সর্বনিম্ন দাম (minimum price) বাঁধিয়া দিতে হয়। ইহা ছাড়া, চরম দাম-হ্রাসের সময় আর্থিক বিপর্যয় এড়াইবার জন্য সরকারকে কাঁচামাল ইত্যাদি ক্রয় করিয়া মজুত করার ব্যবস্থা করিতে হয়। উৎপাদক যাহাতে শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরি দিতে পারে, তাহার জন্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়।

উপসংহার : দাম-নিয়ন্ত্রণের এই ব্যবস্থাগুলি সর্বত্র কমবেশী অবলম্বন করা হয়। তবে অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, শুধুমাত্র কোন একশ্রেণীর ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন দমনের পক্ষে যথেষ্টই নহে। এই কারণে দাম-স্তরের উঠা-নামা বন্ধ করার জন্য সকলপ্রকার ব্যবস্থাই একযোগে গ্রহণ করিতে হয়।

ক্রেডিট কার্ড-এর নমুনা

২৭

॥ ক্রেডিট বা ঋণ ॥

(Credit)

[ক্রেডিট বা ঋণ-এর অর্থ—ক্রেডিট পত্র বা ঋণপত্র—নিকাশ-গৃহ—ঋণের পরিমাণ নির্ধারণকারী উপাদানসমূহ—ঋণের উপযোগিতা ও কার্যাবলী—ঋণের বিপদসমূহ বা কুফল]

আধুনিক সমাজে সরকারের বিহিত মুদ্রা ছাড়াও আর এক প্রকার ব্যবস্থার মাধ্যমে লেনদেনের একটা মোটা অংশ পরিচালিত হয়, উহা ক্রেডিট বা ঋণব্যবস্থা নামে পরিচিত। বর্তমান অধ্যায়ে এই ক্রেডিট (credit) বা ঋণ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে।

১. ক্রেডিট বা ঋণ-এর অর্থ (**Meaning of Credit**): ক্রেডিট কথাটির সাধারণ অর্থ হইতেছে 'বিশ্বাস' (trust বা confidence)। অর্থবিদ্যায় ক্রেডিট বলিতে ঋণ-গ্রহীতার টাকা ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা ও ক্ষমতায় যে-বিশ্বাস বা আস্থা থাকে, তাহাকেই বুঝায়। ইহা ছাড়া, ভবিষ্যতে টাকা দিবার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে জিনিস-পত্রের ক্রয়-বিক্রয়কে ক্রেডিট বলা হয়। ক্রেডিট কারবারে বিক্রেতা ক্রেতাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর ক্রীত দ্রব্যমূল্য প্রদানের সুযোগ দেয় এবং ক্রেতাও ঐ মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে। ক্রেডিটের কারবার হইতেছে নগদ-কারবারের ঠিক বিপরীত। নগদ-কারবারে ক্রেতা মাল-ক্রয়ের সঙ্গে টাকা দিয়া দেয়, কিন্তু ক্রেডিট-কারবারের দেনা-পাওনা সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকায় মিটানো হয় না। ক্রেডিট কারবারে কিছুদিন পরে বিক্রেতাকে ক্রীত দ্রব্যের মূল্য মিটাইয়া দিবে এই মর্মে ক্রেতা একটি প্রতিশ্রুতি দেয়।

ক্রেডিট-এর মূল ভিত্তি হইতেছে আস্থা বা বিশ্বাস। আস্থা থাকে বলিয়াই বিক্রেতা ধারে জিনিসপত্র দেয়, ব্যাঙ্ক ঋণ-প্রদান করে ইত্যাদি। এই সকল কাজ-কারবারের প্রত্যেকটির মূলে থাকে একটি করিয়া প্রতিশ্রুতি। ঋণের কারবারে এই পারস্পরিক বিশ্বাসই যথেষ্ট নহে, ইহার সহিত সময়ের প্রশ্নও জড়িত আছে। ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পাওনা মিটাইবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে তাহার ইচ্ছা বা সংগতি পরিবর্তিত হইতে পারে। সুতরাং ঋণ বা ঋণের কারবারের ভিত্তি হইতেছে দুইটি—(ক) বিশ্বাস বা আস্থা এবং (খ) সময়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আধুনিককালে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা মোটা অংশ ক্রেডিটের মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়।

ক্রেডিট সাধারণত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—বাণিজ্যিক ক্রেডিট এবং ব্যাঙ্ক-ক্রেডিট। ব্যবসায়ের লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে দ্রব্যমূল্য ফেরত দেওয়ার জন্য যে-সময় ও সুযোগ দেয়, তাহাকে 'বাণিজ্যিক ক্রেডিট' (commercial credit) বলে। পক্ষান্তরে, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা নূতন টাকাকড়ি সৃজন করিয়া যে ধার দেয়, তাহাকে ব্যাঙ্ক-ক্রেডিট (bank credit) বলে। ইহা ছাড়া, আর এক প্রকার ক্রেডিট দেখা

যায়, যাহা 'ভোগকারীর ক্রেডিট' consumer's credit) নামে পরিচিত। ভোগ্যদ্রব্য সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য (যেমন—গাড়ী, রেফ্রিজারেটার ইত্যাদি) ক্রয়ের জন্য ক্রেতাকে ইহা দেওয়া হয়।

২. **ক্রেডিট-পত্র বা ঋণ-পত্র (Credit Instruments) :** ঋণের কারবারে ঋণ-গ্রহীতা বা ক্রেতা ভবিষ্যতে ঋণ-দাতা বা বিক্রেতাকে নগদ টাকা দিবে—এই মর্মে যে-প্রতিশ্রুতিপত্র দেয় তাহাকেই ঋণপত্র বা ক্রেডিট-পত্র বলে। আধুনিক যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঋণপত্রসমূহ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই ঋণপত্র লেনদেন মিটাইবার কাজে এক ব্যক্তির নিকট হইতে অন্য ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যায় বলিয়া ইহা সমাজে টাকাকড়ির কাজ করে। এই কারণে, ইহাদিগকে 'টাকাকড়ির পরিবর্ত' (money substitutes) বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল ঃ

ক. **প্রতিশ্রুতিপত্র (Promissory Notes) :** প্রতিশ্রুতিপত্র হইল চাহিদামাত্র বা একটি নির্দিষ্ট তারিখে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার একটি লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র। অর্থপ্রাপক (payee) অর্থাৎ যে-ব্যক্তি প্রতিশ্রুতিপত্র অনুযায়ী অর্থ পাইবে, সেই ব্যক্তি ইহার পশ্চাতে সহি করিয়া দিলে উহা হস্তান্তর (negotiable) করা যায় এবং ফলে উহা টাকাকড়ির মতোই বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করিতে পারে। অবশ্য ইহার জন্যই প্রত্যেকেরই পরস্পরের প্রতি আস্থা থাকিবে।

খ. **বিনিময়পত্র বা হুণ্ডি (Bill of Exchange or Hundee) :** বিনিময় পত্র বা হুণ্ডি—এক বিশেষ ধরনের ঋণপত্র। এই ধরনের ঋণপত্র হইতেছে একটি শর্ত-বিহীন আদেশপত্র এবং ইহাতে ইহার লেখক (অর্থাৎ হুণ্ডিকার বা drawer) কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে (অর্থাৎ হুণ্ডিপ্রাপক বা payee) অথবা ঐ ব্যক্তির আদেশমতো অন্য কাহাকে বা ইহার বাহককে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে একটি নিশ্চিত পরিমাণ অর্থ-প্রদানের জন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের (অর্থাৎ হুণ্ডিগ্রাহক বা drawee) উপর লিখিতভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, এই ঋণপত্রে ক্রেতাকে কোন একটি বিশেষ ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ দ্রব্যমূল্যের দাম কিছুকাল পরে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। যাহার উদ্দেশ্যে এই ঋণপত্র লেখা হইতেছে সে উহা গ্রহণ করিলে ইহা হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং তখন ইহা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করিতে পারে। ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি একই দেশেই অধিবাসী হয়, তাহা হইলে এই ঋণপত্রকে দেশীয় বিল বা হুণ্ডি বলে। আবার ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি দুই দেশের অধিবাসী হয়, তাহা হইলে উহাকে বৈদেশিক বিনিময়-পত্র (foreign bill of exchange) বলা হইবে।

হুণ্ডি দ্বারা দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের আর্থিক লেনদেন পরিশোধ করা যায়। ইহা ছাড়া, বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনের পক্ষে ইহা খুবই প্রয়োজনীয়।

ইহাতে নগদ টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হয় না এবং স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহারেরও প্রয়োজন পড়ে না। আবার হুণ্ডি হস্তান্তরযোগ্য হওয়ায় ব্যবসায়ীগণ ইহা সুবিধামতো ভাঙ্গাইয়া বর্তমান আর্থিক প্রয়োজন মিটাইতে পারে।

গ. চেক (Cheque) ঃ চেক হইতেছে আর এক ধরনের ঋণপত্র। ব্যাঙ্ক-আমানতকারী যদি নিজের আমানত হইতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিজেকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে বা বাহককে (bearer) প্রদান করার জন্য ব্যাঙ্ক-এর উপর লিখিত নির্দেশ দেয়, তখন সেই নির্দেশ-পত্রকে চেক বলা হয়। ঋণ পরিশোধের জন্য বা দ্রব্য-মূল্য মিটাইবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উহার ব্যাঙ্ক-আমানত হইতে টাকা তুলিয়া তাহা প্রদানের জন্য চেকের মাধ্যমে নিজস্ব ব্যাঙ্কের উপর এই আদেশ বা নির্দেশ দিয়া থাকে। এই চেকও সাধারণত হস্তান্তরযোগ্য (negotiable) হয় অর্থাৎ যাহাকে টাকা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইতেছে, সে চেকের পশ্চাতে সই করিয়া তাহা অপরের নিকট হস্তান্তর করিতে পারে। চেক যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের নিকট ভাঙ্গাইবার জন্য উপস্থিত না করা হয়, ততক্ষণ ইহা ঋণপত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য চেক একটি গুরুত্বপূর্ণ ঋণপত্র। ইহা একদিকে যেমন নগদ টাকার ব্যবহার হ্রাস করে অন্যদিকে তেমনি বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। অবশ্য ইহার জন্য যে-ব্যক্তি চেক কাটে এবং যে-ব্যাঙ্কের উপর উহা কাটা হয়, তাহাদের প্রতি আস্থা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু চেক বিহিতমুদ্রা (legal tender) নহে। কারণ পাওনাদার চেকের মাধ্যমে টাকা ফেরত লইতে বাধ্য থাকে না। ইহা ছাড়া, ইহা বেশীবার হস্তান্তর করা যায় না, এবং ফলে ইহার প্রচলন খুবই সীমিত। চেক ও টাকাকড়ির মধ্যে নানারূপ সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ইহাকে টাকাকড়ি হিসাবে গণ্য করা হয় না, ইহা টাকার পরিবর্ত মাত্র।[১]

৩. **ক্লিয়ারিং হাউস বা নিকাশগৃহ** (**Clearing House**) ঃ 'ক্লিয়ারিং হাউস' বা 'নিকাশ-গৃহ' হইতেছে দেশের ব্যাঙ্কগুলি দ্বারা গঠিত একটি সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান যাহার মাধ্যমে উহাদের প্রদত্ত চেক ও প্রাপ্য চেকের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করা হয় অর্থাৎ ব্যাঙ্কগুলির চেক-সংক্রান্ত পারস্পরিক দেনাপাওনা মিটানো হয় হয়। প্রত্যেক দেশেই বড় বড় শহরে নিকাশ-গৃহের মাধ্যমে নগদ-লেনদেন ছাড়াই একটি ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের সহিত পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটাইয়া ফেলিতে পারে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কই নিকাশ-গৃহের সদস্য হয় এবং প্রত্যেক ব্যাঙ্কের নামে নিকাশ-গৃহে একটি হিসাব (account) থাকে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কেরই অন্যান্য ব্যাকের সহিত দেনা-পাওনার হিসাব নিকাশ-গৃহের হিসাব-বইতে লেখা থাকে। বিভিন্ন সদস্য-ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের

---

১. **ক্রেডিট কার্ড ঃ** আজকাল পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ব্যাঙ্কগুলি এক ধরনের কার্ড চালু করিয়াছে যাহা টাকার পরিবর্ত হিসাবে কাজ করে। ইহা ব্যাংকারের কার্ড, চেককার্ড, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি নামে পরিচিত—যেমন বারক্লেশ কার্ড ইত্যাদি। ব্যাংক উহার আমানতকারীদের এই কার্ড দিয়া থাকে এবং ঐ কার্ড দেখাইয়া কার্ডধারী দোকান হইতে নগদ টাকা না দিয়া একটি নির্দিষ্ট মূল্য পর্যন্ত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে পারে। ইহা বাস্তবিকই টাকার পরিবর্ত হিসাবে কাজ করিতেছে। ভারতেও কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার প্রচলন শুরু হইয়াছে।

উপর কাটা যে-সকল চেক পাইয়া থাকে, তাহা এই নিকাশ-গৃহে পাঠাইয়া দেয় এবং উহাদের প্রতিনিধিগণ হিসাব পরীক্ষা করিয়া যাহার নীট পাওনা হয়, তাহা নিজের হিসাবে জমা করিয়া লয়। এইভাবে ব্যাঙ্কের বিরাট চেক-লেনদেনের হিসাব নিকাশ-গৃহের মাধ্যমে অতি সহজেই সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

নিকাশ-গৃহের মাধ্যমে ব্যাংকগুলির পারস্পরিক দেনা-পাওনা কিভাবে সম্পন্ন হয় তাহা একটি কাল্পনিক উদাহরণ দ্বারা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, একটি অঞ্চলে চারটি ব্যাংকে (A, B, C এবং D) কাজ করে এবং উহারা প্রত্যেকেই নিকাশ-গৃহের সদস্য। নিকাশ-গৃহে উহাদের প্রত্যেকেরই একটি করিয়া স্বতন্ত্র হিসাব আছে এবং প্রতিদিন প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কের যাবতীয় প্রাপ্ত চেক ঐ নিকাশ-গৃহে পাঠানো হয়। ধরা যাউক, কোন একদিন নিকাশ-গৃহের হিসাবে এই চারটি ব্যাঙ্কের অবস্থা নিম্নরূপ হইল :

ব্যাংক	অন্য ব্যাংকের উপর কাটা চেক যাহা এই ব্যাংকে জমা পড়িয়াছে	এই ব্যাঙ্কের উপর কাটা চেক যাহা অন্য ব্যাঙ্কে জমা পড়িয়াছে	অবশিষ্ট পরিমাণ
A	১,৫০,০০০ টাকা	১,৫১,০০০ টাকা	—১০০০ টাকা
B	১,২৫,০০০ ,,	১,২৪,০০০ ,,	+১০০০ ,,
C	১,৬০,০০০ ,,	১,৫৬,০০০ ,,	+৪০০০ ,,
D	১,৬৫,০০০ ,,	১,৬৯,০০০ ,,	—৪০০০ ,,
	৬,০০,০০০ ,,	৬,০০,০০০ ,,	—

উপরের উদাহরণে দেখা যায়, নিকাশ-গৃহের দেনা-পাওনার হিসাবে 'A' ও 'D'—ব্যাঙ্কের দেনা হইয়াছে যথাক্রমে ১০০০ টাকা এবং ৪০০০ টাকা এবং 'B' ও 'C' ব্যাঙ্কের পাওনা হইয়াছে যথাক্রমে ১০০০ টাকা এবং ৪০০০ টাকা। এখন নিকাশগহের মাধ্যমে 'D' ব্যাঙ্ক যদি 'C' ব্যাংককে ৪০০০ টাকা এবং 'A' ব্যাঙ্ক যদি 'B' ব্যাংককে ১০০০ টাকা দিয়া দেয় (নগদ টাকা নয়, চেকের মাধ্যমে) তাহা হইলে ব্যাংকগুলির ৬,০০,০০০ টাকার দেনা-পাওনা মাত্র ৫০০০ টাকা হস্তান্তরের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হইতেছে। এমন কি উক্ত ৫০০০ টাকাও নগদ টাকা প্রদানের প্রয়োজন পড়ে না। ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর চেক কাটিয়া প্রদান করা হইবে। কারণ প্রত্যেক ব্যাংকেরই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হিসাব (account) রাখিতে হয়।

সুতরাং দেখা যায়, আধুনিককালে দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় নিকাশ-গৃহের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহা দ্বারা একদিকে যেমন বিরাট টাকার লেনদেন নগদ টাকা

ব্যতীত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়, অন্যদিকে নগদ টাকা স্থানান্তরের জন্য যে-অসুবিধা ঘটে ও সময়ের অপচয় হয়, তাহাও এড়ানো সম্ভব হয়। ০ ইহা ছাড়া, ব্যবসা-জগতে বিরাট পরিমাণের লেনদেন চেক-নিকাশের মাধ্যমে সহজে মিটানো সম্ভব হয় বলিয়া ব্যবসায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ব্যাংকের মাধ্যমে যাহাতে লেনদেন সম্পন্ন হয় তাহার চেষ্টা করা হয়। ভারতে রিজার্ভ ব্যাংক বড় বড় শহরগুলিতে (যেমন—কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নয়াদিল্লী, কানপুর প্রভৃতি) নিকাশী-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। ইহার ফলে প্রত্যহ কোটি কোটি টাকার লেনদেন নগদ টাকা ছাড়াই মিটমাট করা সম্ভব হইতেছে।

৪. **ঋণের পরিমাণ নির্ধারণকারী উপাদানসমূহ (Factors Determining the Volume of Credit) :** পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, আধুনিককালে ঋণপত্রগুলি (credit instruments) বিহিত টাকাকড়ি না হইলে টাকাকড়ির পরিবর্ত হিসাবে কাজ করে। ঋণের পরিমাণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রধান প্রধান এই বিষয়গুলি এখানে বর্ণনা করা হইল :

প্রথমত, অর্থব্যবস্থায় ঋণের পরিমাণ ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিস্থিতির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থায় তেজীভাব থাকিলে অধিক পরিমাণে ঋণের প্রয়োজন পড়ে এবং ব্যবসায়ীগণ অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয়। ঐ অবস্থায় যদি ভাল সুদ পাওয়া যায় এবং ঋণের টাকা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা থাকে তাহা হইলে ঋণপ্রদানকারীও অধিক পরিমাণে ঋণ দিবে। পক্ষান্তরে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দাভাব দেখা দিলে ঋণের চাহিদা হ্রাস পায় এবং উহার ফলে সমাজে ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়ত, সমাজে ঋণের পরিমাণ বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধার উপরও নির্ভর করে। যে-দেশে বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা বেশী, সেই দেশে ঋণের টাকা বিনিয়োগের করিয়া অধিক প্রতিদান (return) পাওয়া যায়। সুতরাং তখন ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিনিয়োগের সুযোগ কম হইলে ঋণের টাকা বিনিয়োগের বিশেষ সুযোগ থাকে না। উহার ফলে ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়।

তৃতীয়ত, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সময় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। মূল্যবৃদ্ধির সময় ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার সুযোগ পায় বলিয়া তাহারা ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হইতে অধিক পরিমাণের ঋণ লইতে থাকে। ইহা ছাড়া, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সময় ফটকা-কারবারের সুযোগও বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে ঋণের বিশেষ প্রসার ঘটে। সালে ভারতে যে-অভূতপূর্ব মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছিল তাহার মূলে একটি প্রধান কারণ ছিল ব্যাঙ্ক-ঋণের দ্রুত প্রসার। পক্ষান্তরে, দ্রব্যমূল্য হ্রাসের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন-কার্যে মন্দাভাব আসে বলিয়া ঋণের পরিমাণও হ্রাস পায়।

চতুর্থত, ঋণের পরিমাণ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরও নির্ভর করে। যুদ্ধ অথবা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সময় বিনিয়োগকারীরা নূতন বিনিয়োগ বা

উদ্যোক্তারা নূতন উদ্যম গ্রহণ করিতে রাজী হয় না। ইহার ফলে ঋণের পরিমাণও হ্রাস পায়। কিন্তু দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকিলে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তার অবস্থা থাকে বলিয়া বিনিয়োগকারীরা বা উদ্যোক্তরা অধিক পরিমাণে ঋণগ্রহণ করিতে আগ্রহী হয়।

পঞ্চমত, দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পরিমাণের উপর ঋণ বিশেষভাবে নির্ভরশীল। দেশে যে-সকল উন্নয়নকার্য পূরাদমে চলে (যেমন—ভারতে) সেই সকল দেশে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে ঋণের প্রয়োজন পড়ে এবং ইহার ফলে ঋণের সম্প্রসারণ ঘটে।

ষষ্ঠত, ঋণের পরিমাণ দেশের মুদ্রাব্যবস্থার উপরও নির্ভরশীল। দেশের মুদ্রাব্যবস্থা যদি উৎকৃষ্ট ধরনের হয় এবং দ্রব্যমূল্য যদি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল থাকে, তাহা হইলে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু দেশের মুদ্রাব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়।

পরিশেষে বলা যায়, ঋণের পরিমাণ ব্যাংক-ব্যবস্থা ও সুদের হারের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। ব্যাংক-ব্যবস্থা উন্নত ও সুসংগঠিত হইলে ব্যাংকসমূহ চেক-ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিক পরিমাণে ঋণসৃজন করার সুযোগ পায়। ঐ অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার নিম্নস্তরে রাখিলে ঋণের প্রসার ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংক সুদের হার উচ্চস্তরে রাখিলে বাণিজ্যিক ব্যাংক অধিক পরিমাণে ঋণ সৃজন করিতে পারে না এবং ব্যবসায়ীরা অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিতে চাহে না। ইহার ফলে ঋণের সংকোচন ঘটে। ব্যাংক-ব্যবস্থার ঋণ সৃজন করার ক্ষমতা অবশ্য দেশের আয়-স্তর ও দেশের লোকদের সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে। ইহা ছাড়া, যে-সকল দেশে নগদ টাকার প্রচলন বেশী অর্থাৎ দেশের লোকেরা ব্যাংক-চেকের পরিবর্তে নগদ টাকায় লেনদেন করিতে চাহে, সেইসকল দেশে ঋণের পরিমাণ কম হয়।

সুতরাং দেখা যায়, ঋণের পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের উপর নির্ভর করে। আধুনিক সমাজে ঋণ বিশেষত ব্যাংক-ঋণ দেশের টাকাকড়ির একটি অন্যতম অংশ বলিয়া অর্থব্যবস্থার স্বার্থে ইহার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখিতে হয়।

৫. ঋণের উপযোগিতা ও কার্যাবলী (Utilities and Functions of Credit) : আধুনিক সমাজে ঋণ-ব্যবস্থার মাধ্যমে নানারূপে কার্যকলাপ সম্পন্ন হইতেছে এবং ঐ সকল কার্যকলাপের মধ্যে ঋণের উপযোগিতা উপলব্ধি করা যায়।

১. আধুনিক সমাজে ঋণপত্রগুলি ধাতবমুদ্রার ব্যবহার বিশেষভাবে সংক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে। চেক, প্রতিশ্রুতিপত্র, বিনিময়-পত্র প্রভৃতি ঋণপত্রগুলি সমাজে অর্থের পরিবর্ত হিসাবে কাজ করে। ইহার ফলে ধাতবমুদ্রা ও কাগজী মুদ্রা প্রচলনের জন্য সরকারের যে ব্যয় পড়ে, তাহাও হ্রাস পাইয়াছে। ইহা ছাড়া, নগদ টাকার লেনদেনে যে ঝুঁকি ও অসুবিধা দেখা দেয়, তাহাও বিশেষভাবে হ্রাস পায়।

২. ঋণপত্রগুলি নগদ টাকার লেনদেন বা ব্যবহার বিশেষভাবে হ্রাস করিয়াছে।

ইহার ফলে অর্থের হস্তান্তর ব্যতীত পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটানো সম্ভব হইতেছে। ইহাতে একদিকে যেমন ব্যয়সংকোচ হইতেছে অন্যদিকে তেমনি বিনিময়ের কাজ সহজ ও সরল হওয়ায় বিনিময়ের পরিমাণ প্রসারিত হইতেছে।

৩. ক্রেডিট উৎপাদন-কার্যকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। উৎপাদক ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ লইয়া উৎপাদন-বৃদ্ধির সুযোগ পায়। প্রকৃতপক্ষে আজকাল খুব কম উৎপাদকই ব্যাংক-ঋণ ব্যতীত উৎপাদন-কার্যে অগ্রসর হয়। প্রকৃতপক্ষে, ব্যাংক-ঋণ ব্যতীত বৃহদায়তনের উৎপাদন-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া, ক্রেডিটের সাহায্যে উৎপাদকের নিকট হইতে পাইকারী ব্যবসায়ী, পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে খুচরা ব্যবসায়ী এবং খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ভোগকারীর নিকট নিয়মিতভাবে পণ্য-চলাচল অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়।

৪. ঋণপত্র বিশেষত বিনিময়-পত্র (bills of exchange) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটাইতেছে। সম্পদের বিশেষত স্বর্ণের স্থানান্তর না ঘটাইয়া বিনিময়-পত্রের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানির লেনদেন সম্পন্ন করা সহজ হইয়াছে।

৫. ধারের কারবারের ফলে ক্রেতাকে দ্রব্যমূল্য সঙ্গে সঙ্গে দিতে হয় না বলিয়া ক্রেতা দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের সুযোগ পায়। ইহার ফলে, ব্যবসা-বাণিজ্যের আয়তন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

৬. ঋণব্যবস্থার ফলে আধুনিককালে ব্যাংকগুলি স্বল্প পরিমাণে নগদ রিজার্ভ রাখিয়া অধিক পরিমাণে ঋণ দেওয়ার সুযোগ পায়। প্রকৃতপক্ষে ব্যাংকগুলি জনসাধারণের নিকট হইতে যে-পরিমাণ আমানত পায়, তাহা অপেক্ষা বহুগুণ ঋণ দিয়া থাকে। এই কারণে ব্যাংককে ঋণ-সৃজনের কারখানা বলিয়া অভিহিত করা হয়।

৭. ঋণ-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার জন্য বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান একদিকে যেমন সাময়িক অসুবিধা এড়াইতে পারে অন্যদিকে তেমনি ইহারা তীব্র সংকট বা নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার সুযোগ পায়।

পরিশেষে বলা যায়, ব্যাংক-ঋণের সুযোগ থাকার জন্য ভোগকারীও ব্যাংক-এর নিকট হইতে ঋণ লইয়া প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য বিশেষত দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য (যেমন—গাড়ী, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি) ক্রয়ের সুযোগ পায়। স্বল্পবিত্তের কারিগর, ক্ষুদ্রশিল্পের মালিক প্রভৃতি ব্যবসা, উৎপাদন-কার্য ইত্যাদি গঠন করার সুযোগ পায়।

সুতরাং দেখা যায়, আধুনিক সমাজে ঋণ বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়া থাকে এবং ইহার উপযোগিতাও অপরিসীম। কিন্তু ইহার কুফলও আছে। এই কারণে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে হয়।

৬. ঋণের বিপদসমূহ বা কুফল (Dangers or Evils of Credit): ঋণব্যবস্থা সমাজে নানারূপ সুবিধার সৃষ্টি করিলেও ইহার কতকগুলি কুফলও আছে:

প্রথমত, ব্যাংকসমূহ ও অন্যান্য ঋণ-প্রচলন কর্তৃপক্ষ যদি অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঋণের প্রসার ঘটায়, তাহা হইলে ঋণের পরিমাণ অত্যধিক হইয়া পড়িবে। কিন্তু সেই তুলনায়

দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের যোগান বৃদ্ধি না পাইলে মুদ্রাস্ফীতির আবির্ভাব ঘটিবে এবং উহার কুফলগুলি অর্থব্যবস্থার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয়ত, ব্যাংক-ঋণ ও অন্যান্য ঋণ যদি সহজলভ্য হয়, তাহা হইলে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান অতিমাত্রায় ঋণ লইয়া অধিক ব্যয়ের চেষ্টা করিবে। ফলে একদিকে যেমন অমিতব্যয়িতা দেখা দিবে, অন্যদিকে তেমনি ঋণের সদ্ব্যবহার হইবে না।

তৃতীয়ত, অতিমাত্রায় ঋণের যোগান বৃদ্ধি পাইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের অকাম্য প্রসার ঘটে এবং উহার ফলে পরিণতিতে অর্থ-ব্যবস্থায় মন্দা, সংকট ও নানারূপ বিশৃংখল পরিস্থিতি দেখা যায়।

চতুর্থত, ঋণের যোগান সুলভ হইলে দেশে ফটকা-কারবার বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। শেয়ার, অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফটকা-কারবার বৃদ্ধি পায় এবং উহার ফলে ঐ সকল দ্রব্যসামগ্রীর দাম আশংকাজনকভাবে বাড়িয়া যায়।

পঞ্চমত, দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধির সময় ঋণের প্রসার ঘটিলে উহা আরও বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতির গতিবেগ তীব্রতর হয়।

পরিশেষে বলা যায়, অর্থব্যবস্থায় ঋণের পরিমাণ বিশেষত ব্যাংক-ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দেশে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিরা ঐ ঋণের এক বৃহদংশ করায়ত্ত করার চেষ্টা করে এবং ইহার ফলে অর্থ-ব্যবস্থায় একচেটিয়া ব্যবসা প্রসার লাভ করে।

ঋণ-ব্যবস্থায় এই সকল বিপদ থাকার জন্য ঋণের পরিমাণ যাহাতে অত্যধিক না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এই কারণে প্রত্যেক দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

৭. ঋণ ও জিনিসপত্রের দাম (Credit and Prices)ঃ কোন কোন লেখকের মতে, ঋণ ও জিনিসপত্রের দামের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। তাঁহাদের মতে, ঋণ দেশের টাকাকড়ির যোগানের একটি অন্যতম অংশ। সুতরাং নগদ টাকার বৃদ্ধি যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি করে, ক্রেডিটের বৃদ্ধিও ঠিক সেইভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়াইয়া দেয়। ইহা ছাড়া, ঋণ ক্রয়-শক্তির কাজ করে বলিয়া ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দেশে লোকদের ক্রয়-শক্তির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইবে। পক্ষান্তরে, অন্য একদল লেখকদের মতে, জিনিসপত্রের দামের উপর ঋণের কোন প্রভাব নাই। কারণ ঋণ প্রকৃতপক্ষে টাকা নহে, উহা টাকার পরিবর্ত (money substitute) মাত্র।

কিন্তু উভয় মতবাদই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। ঋণ সম্পূর্ণরূপে নগদ টাকার বিকল্প হিসাবে কাজ করে না। সুতরাং নগদ টাকা বাড়িয়া গেলে দেশের লোকদের ক্রয়-শক্তি যেরূপ বাড়ে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ক্রয়-শক্তির পরিমাণ সেইরূপ বাড়ে না। ইহার ফলে নগদ টাকা বাড়িলে দাম যেরূপ বৃদ্ধি পায়, ঋণ বৃদ্ধি পাইলে দাম সেইরূপ বৃদ্ধি পায় না। ইহা ছাড়া, নগদ টাকা কেবলমাত্র ক্রয়-শক্তির

নির্দেশ দেয় না, সম্পদ তরল রাখার ক্ষমতাও ইহার আছে। কিন্তু ক্রেডিট শুধুমাত্র ক্রয়-শক্তিরই নির্দেশ দেয়।

পক্ষান্তরে, দাম-স্তরের উপর ঋণের কোনরূপ প্রভাব নাই—ইহাও সত্য নহে। ইহা সত্য, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য প্রচলিত টাকাকড়ির কিছু অংশ রিজার্ভ রাখিতে হয় বলিয়া নগদ টাকার পরিমাণ কিছু হ্রাস পায় এবং উহার ফলে দাম হ্রাস পাইবে। কিন্তু ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য নগদ টাকার যে-রিজার্ভ রাখিতে হয়, তাহার পরিমাণ খুবই সামান্য অর্থাৎ খুব অল্প পরিমাণ নগদ-টাকার রিজার্ভ রাখিয়া বিরাট পরিমাণে ঋণের যোগান বৃদ্ধি করা যায়। সুতরাং ঋণের পরিমাণ অত্যধিক হইলে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইবে। ঋণের অত্যধিক প্রসার যে-মুদ্রাস্ফীতির কারণ হইতে পারে তাহার প্রমাণ আমাদের দেশের সম্প্রতিক কালের তীব্র মুদ্রাস্ফীতি হইতে পাওয়া যায়। বর্তমানে দাম-স্তরের যে অত্যধিক বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার একটি প্রধান কারণ হইতেছে ব্যাংক-ঋণের অত্যধিক প্রসার। সুতরাং জিনিসপত্রের দামের উপর ঋণের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

৮. ঋণ ও মূলধন (Credit and Capital) ঃ ঋণকে অনেক সময় মূলধন বলিয়া ধরা হয়। বলা হয়, চেক, বিনিময়পত্র প্রভৃতি ঋণপত্রগুলি বাস্তবক্ষেত্রে টাকাকড়ির কাজ করে বলিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মূলধনের কাজ করে। আরও বলা হয়, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ব্যাংক প্রভৃতি সংস্থা হইতে ঋণসংগ্রহ করিয়া ব্যবসায়ের মূলধন বৃদ্ধি করে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ঋণকে মূলধন রূপে ধরা যায় না। কারণ ঋণপত্র বাস্তবক্ষেত্রে টাকাকড়ি নহে, উহা টাকাকড়ির প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র। কোন ব্যবসায়ীকে চেক দেওয়া হইলে তাহাকে টাকাকড়ি দেওয়া হয় না। চেকটি ভাঙ্গাইয়া সে ব্যাংক হইতে টাকাকড়ি সংগ্রহ করিতে পারে। সুতরাং ঋণকে মূলধন ধরা যাইতে পারে না। অবশ্য ঋণের টাকাকড়ি দ্বারা ব্যবসায়ী মূলধন-সামগ্রী ও সাজসরঞ্জাম ক্রয় করিতে পারে। ইহা ছাড়া, সামগ্রিক অর্থে টাকাকড়ি যে-রূপ মূলধন নহে, ঋণও সেই কারণে মূলধন নহে। ঋণ যদি মূলধন হইতো তাহা হইলে কোন দেশ বা সমাজ ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া রাতারাতি মূলধন-স্বল্পতার সমস্যার সমাধান করিতে পারিত।

আবার ঋণ যে মূলধন সৃষ্টি করে তাহাও ঠিক নহে। ইহা একজনের নিকট হইতে অন্যের নিকট মূলধন-সংগ্রহ করার ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে সাহায্য করে মাত্র। যে-ব্যক্তির নিকট সম্পদ অব্যবহৃত থাকে, ঋণের মাধ্যমে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে অপর এমন একজন ব্যক্তির নিকট সম্পদ হস্তান্তর করা যায়, যে-ব্যক্তি উহা উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করিতে পারে। এই ধরনের হস্তান্তর উৎপাদন-বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক হয়। সুতরাং দেখা যায়, সাধারণ অর্থে ঋণকে মূলধন ধরা হইলে বাস্তবক্ষেত্রে ইহা মূলধন নয় অথবা ইহা মূলধন সৃষ্টি করে না। ইহা শুধুমাত্র মূলধন স্থানান্তর করিতে সাহায্য করে এবং ঐ স্থানান্তর উৎপাদন-বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক হয়।

২৮

॥ ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ॥

(Banking System)

[ব্যাংক কাহাকে বলে ?—ব্যাংকের প্রকারভেদ—বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী—ব্যাংক-ব্যবস্থার অর্থনৈতিক গুরুত্ব—ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকাকড়ির সৃজন—উন্নয়ন ব্যাংক ও উহার কার্যাবলী—ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের কার্যাবলী—কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ]

পূর্বের অধ্যায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, আমাদের সমাজে ব্যাংক টাকাকড়ি সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং ঐ টাকাকড়িকে 'ব্যাংক-টাকাকড়ি' (bank-money) বলে। ঐ আলোচনার পূর্বে ব্যাংক-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমেই দেখা যাউক, ব্যাংক কাহাকে বলে ?

১. ব্যাংক কাহাকে বলে ? (What is a Bank ?) ; ব্যাংক হইতেছে আমানত-গ্রহণকারী ও ঋণ-প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। যে-প্রতিষ্ঠান দেশে জনসাধারণের নিকট হইতে নিয়মিতভাবে আমানত গ্রহণ করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ইত্যাদি কার্যের জন্য ঋণ-প্রদান করে তাহাকে 'ব্যাংক' বলা হয়। কিন্তু ঐ ধরনের সকল প্রতিষ্ঠানকেই ব্যাংক বলা যায় না। দেশের মহাজনরাও আমানত গ্রহণ করে এবং ঋণ প্রদান করে। কিন্তু ঐ মহাজনদের 'ব্যাংকার' (banker) বলা যায় না। মহাজন ও ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে, ব্যাংকের নিকট যে-আমানত রাখা হয়, তাহা চাহিবামাত্র ফেরৎ পাওয়া যায় এবং আমানতকারী চেক লিখিয়া ঐ আমানত তুলিয়া লইতে পারে। কিন্তু মহাজনের নিকট গচ্ছিত আমানত চেকের দ্বারা তোলা যায় না।

বলা হয়, ব্যাংক ঋণ (credit) লইয়া কারবার করে—অর্থাৎ, ব্যাংক হইতেছে ঋণের কারবারী (dealer in credit)। ব্যাংক জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে এবং ঐ আমানত শিল্পপতি, বণিক, ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে ঋণ হিসাবে প্রদান করে। সুতরাং ব্যাংক একদিকে সঞ্চয়কারী এবং অন্যদিকে ঋণগ্রহীতা—এই দুই পক্ষের ভিতর মধ্যবর্তী-প্রতিষ্ঠানের (intermediary) কাজ করিতেছে। ব্যাংক এইভাবে ঋণ আদান-প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা-লাভের চেষ্টা করে। ব্যাংক কর্তৃক ঋণ আদান-প্রদানের এই ব্যবসাকে ব্যাংক-ব্যবসা (banking business) বলে এবং যে-প্রতিষ্ঠানটি ব্যাংকিং ব্যবসায় নিযুক্ত থাকে তাহাকে 'ব্যাংক' বলে।

ব্যাংক-ব্যবসা আস্থার বা বিশ্বাসের (confidence or trust) উপর নির্ভরশীল। যে-ব্যক্তি ব্যাংকে টাকা জমা রাখে, সে বিশ্বাস করে যে, চাহিবামাত্র সে টাকা ফেরত পাইবে। তেমনি ব্যাংক যখন ঋণ দেয়, তখন ইহা বিশ্বাস করে ঐ টাকা আদায় করা যাইবে। ঋণ-গ্রহীতার উপর ব্যাংকের বিশ্বাস না থাকিলে ব্যাংক বিশ্বাসযোগ্য (trustworthy) জামিনের দাবী করে। সুতরাং দেখা যায়, ব্যাংকের ব্যবসা হইতেছে 'বিশ্বাসের বা আস্থার কারবার' (dealings in credit)।

ব্যাংকের কারবার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রত্যেক দেশেই ব্যাংকিং সংক্রান্ত আইন থাকে। ভারতে ব্যাংক-ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে-আইনটি আছে, তাহা '১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইন' (Banking Regulation Act, 1949) নামে পরিচিত। এই আইনে ব্যাংকিং-ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মকানুন লিপিবন্ধ লিপিবন্ধ আছে। ইহা ছাড়া, কোন দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি (commercial banks) জাতীয়করণ করিয়া রাষ্ট্রের মালিকানায় করিয়া আনা হয়। যেমন, ভারতে ১৯৫৫ সালে পূর্বেকার 'ইম্পিরিয়াল ব্যাংক' জাতীয়-করণ করিয়া 'স্টেট ব্যাংক' গঠন করা হয় এবং ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে শীর্ষস্থানীয় ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং পরে ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে আরও ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক জাতীয়করণ করা হয়। ব্যাংকিং-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে ঋণ-প্রদানে জন্য ব্যাংক জাতীয়করণ করা হয়।

২. **ব্যাংক-এর প্রকারভেদ (Different types of Banks) :** আধুনিক সমাজে ব্যাংকিং-সংক্রান্ত কার্যকলাপ সম্পন্নের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং-প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। উহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক (**Central Bank**) **:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় ও নেতৃস্থানীয় ব্যাংক-প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক দেশেই ব্যাংক-ব্যবস্থার শীর্ষে একটি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে এবং দেশের টাকাকড়ি প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণের পুরোপুরি দায়িত্ব ইহার হস্তে ন্যস্ত থাকে। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম হইতেছে 'ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক' (Reserve Bank of India)। ইংল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতেছে 'ব্যাংক অফ্ ইংল্যাণ্ড' (Bank of England)। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা কর হইতেছে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক (**Commercial Banks**) **:** প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রধানত স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেওয়ার জন্য বহুসংখ্যক বাণিজ্যিক ব্যাংক থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি সাধারণত তিন মাসের বা বড়জোর এক বছরের মেয়াদী ঋণ প্রদান করে। অবশ্য আজকাল ইহারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মেয়াদী-ঋণও (term loan) দিতেছে। উহা অপেক্ষা বেশী মেয়াদী-ঋণ ইহারা সচরাচর দিয়া থাকে না। ইহারা জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে এবং হুণ্ডি, বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি ভাঙ্গাইয়া স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে কয়েকটি নীতি (principles) অনুসরণ করিয়া কাজ করিতে হয়। প্রথমত, জনসাধারণের আমানত যাহাতে নিরাপদ স্থানে থাকে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়।

দ্বিতীয়ত, আমানতকারীদের টাকা চাহিবামাত্র ফুটিয়া দেওয়ার জন্য উহাদের সম্পদ যতদূর সম্ভব নগদাবস্থায় (in liquid form) রাখিতে হয়।

তৃতীয়ত, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য যাহাতে প্রয়োজনমতো ঋণ পায়, তাহার জন্য উহাদিগকে ঋণের ব্যবস্থা করিতে হয়। আবার টাকাকড়ির প্রয়োজন কম হইলে উহাদিগকে ঋণের পরিমাণ কমাইতে হয়। সুতরাং ঋণ-প্রদান সম্পর্কে উহাদের কাজের মধ্যে নমনীয়তা (elasticity) বজায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

পরিশেষে, ইহারা ঋণ প্রদান, বিনিয়োগ প্রভৃতি কার্যকলাপের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যৌথ মূলধনী কোম্পানীর নীতিতে গঠিত হয় বলিয়া উহাদিগকে যৌথ মূলধনী ব্যাংকও (joint-stock banks) বলা হয়। আমাদের দেশের 'ইউনাইটেড ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়া', 'ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়া', 'সেণ্ট্রাল ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি বাণিজ্যিক ব্যাংকের দৃষ্টান্ত।

গ. বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়-ব্যাংক (Foreign Exchange Banks) : বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় ব্যাংকগুলি বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করে। ইহারা দেশের আমদানি-রপ্তানি কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেয়। ইহার জন্য এই ব্যাংকগুলি আমদানীকারী ও রপ্তানীকারীদের বিনিময়-বিল বাট্টা (discount) করিয়া টাকা দেয়। ইহারা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মতো জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ঋণ প্রদান করে।

ঘ. শিল্প-ব্যাংক বা উন্নয়ন-ব্যাংক (Industrial Banks or Development Banks) : শিল্প-ব্যাংকগুলি দেশের শিল্পকে দীর্ঘমেয়াদী অর্থসাহায্য প্রদান করে। ইহারা বড় বড় শিল্পের শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে। কোন কোন দেশে ইহাদিগকে উন্নয়ন-ব্যাংকও বলা হয়। 'ভারতের শিল্প অর্থযোগান করপোরেশন', 'ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক' প্রভৃতি হইতেছে শিল্প ব্যাংক। উন্নয়ন ব্যাংক সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

ঙ. কৃষি-ব্যাংক (Agricultural Banks) : কৃষি-ব্যাংক কৃষকদিগকে কৃষির উন্নয়ন ও কৃষি-যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়। ভারতের 'কৃষি ও গ্রামীন উন্নয়নের জাতীয় ব্যাংক (National Bank for Agriculturre and Rural Development) কৃষি-ব্যাংকের দৃষ্টান্ত। কৃষি-ব্যাংক বীজ ও সার ক্রয়, কৃষি-যন্ত্রপাতি ক্রয়, জমির পুনরুদ্ধার কার্য, জলসেচের কার্য প্রভৃতি উদ্দেশ্যে নানাভাবে স্বল্প সুদের হারে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন অর্থসাহায্য দিয়া থাকে। কৃষি-ব্যাংকের অন্যান্য দৃষ্টান্ত হইতেছে কৃষি-সমবায় সমিতি, ভূমি-উন্নয়ন ব্যাংক ইত্যাদি। ইহা ছাড়া, পল্লী অঞ্চলে কৃষি ও আনুষঙ্গিক কার্যকলাপ সম্পন্নের জন্য 'আঞ্চলিক গ্রামীণ-ব্যাংক' (regional rural banks) গঠন করা হয়। সম্প্রতি ভারতে এই ধরনের কতকগুলি গ্রামীণ ব্যাংক গঠন করা হইয়াছে।

চ. সমবায়-ব্যাংক (Co-operative Banks) : এই ব্যাংকগুলি সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত হয়। যেমন, 'সমবায়-ঋণদান সমিতি', 'কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক'

'রাজ্য সমবায় ব্যাংক' ইত্যাদি। ইহারা সমিতির সদস্যগণকে স্বল্প সুদের হারে ঋণ দেয়।

ছ. সেভিংস্-ব্যাংক বা সঞ্চয়ী ব্যাংক (Savings Banks) : অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যাহাতে ভবিষ্যতে সঞ্চয়ের ব্যাপারে উৎসাহিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই প্রকার সঞ্চয়ী ব্যাংক গঠন করা হয়। ভারতে ডাকঘরের সংগে এইরূপ সেভিংস-ব্যাংকের কার্য পরিচালনা করা হয়।

ইহা ছাড়া, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (International Monetary Fund), বিশ্ব-ব্যাংক (World Bank), আন্তর্জাতিক অর্থ-যোগান করপোরেশন (International Finance Corporation) ইত্যাদি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লেনদেন ও ঋণদানের ব্যাপারে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি সাহায্য করে।

ভারতের দৃষ্টান্ত : ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থায়ও অনুরূপ বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক দেখা যায়। যেমন—

১. ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক—ইহা ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বর্তমানে ইহা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও পরিচালনায় গঠিত।

২. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ—ভারতে স্টেট ব্যাংক সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক। ইহা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে ২০টি বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বেসরকারী ক্ষেত্রে অনেকগুলি বাণিজ্যিক ব্যাংক আছে।

৩. বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় ব্যাংকসমূহ—ইহারা বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থ-সংস্থানের কাজে নিযুক্ত আছে।

৪. শিল্প-ব্যাংক—ইহারা বিভিন্ন ধরনের শিল্পগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়; যেমন—ভারতের শিল্প-অর্থ-যোগান সংস্থা, ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক ইত্যাদি।

৫. কৃষি-ব্যাংক—ইহারা কৃষিসংক্রান্ত ব্যাপারে ঋণ দেয়। ভারতের পূর্বেকার কৃষি পুনঃ অর্থযোগান ও উন্নয়ন করপোরেশন, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাংক (National Bank for Agriculture and Rural Development বা সংক্ষেপে NABARD) ইত্যাদি ইহার দৃষ্টান্ত।

৬. সমবায় ব্যাংক—ভারতে সমবায়ের বিভিন্ন স্তরে রাজ্য-সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি আছে।

৭. ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক—এই ব্যাংকগুলি জমি উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়।

৮. পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক—ইহা ভারতীয় ডাকঘরের অধীনে কাজ করে। ইহারা লোকেদের সঞ্চয় জমা রাখে।

৯. গ্রামীণ ব্যাংক—পল্লী অঞ্চলে কৃষক, কুটির শিল্পের কারিগর, ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ের মালিক প্রভৃতিকে অর্থ সাহায্য প্রদানের জন্য সম্প্রতি কয়েকটি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক (regional rural banks) গঠন করা হইয়াছে।

১০. দেশীয় ব্যাংকার, মহাজন ইত্যাদি—ইহারা প্রাচীন পদ্ধতিতে ব্যাংক-ব্যবসায়ের কাজ করে। ইহাদের কার্যকলাপের উপর রিজার্ভ ব্যাংকের কোনরূপ কর্তৃত্ব নাই বলিলেই চলে।

৩. **বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী . (Functions of Commercial Banks) :** বাণিজ্যিক ব্যাংক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, বাণিজ্যিক ব্যাংক কি কি কাজ করে? বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত নিম্নলিখিত কাজগুলি করিয়া থাকে।

ক। **আমানত-গ্রহণ :** ব্যাংক জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ জমা রাখে। দেশের জনসাধারণ, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থা তাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকের নিকট জমা রাখে। এই জমাকে আমানত বলে। ব্যাংক নানা শর্তে টাকা জমা লইয়া থাকে এবং ঐ শর্তের তারতম্য অনুযায়ী আমানত তিন প্রকার হইয়া থাকে—চলতি আমানত, সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত। চলতি আমানতের টাকা (Current Account Deposit or Demand Deposit) যে-কোন সময়ে চাহিবামাত্র ফেরত দেওয়া হয় এবং ইহার জন্য কোন সুদ দেওয়া হয় না বা সুদ দিলেও উহার পরিমাণ খুবই অল্প হয়। সঞ্চয়ী আমানত (Savings Deposit) তুলিয়া লওয়ার ব্যাপারে কিছু বাধানিষেধ থাকে। সাধারণত কোন একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত এই আমানতের টাকা তোলা যায়। নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত জমা এই আমানত হইতে তুলিতে হইলে ব্যাংককে কিছুদিনের নোটিশ দিতে হয়। ব্যাংক সঞ্চয়ী আমানতের জন্য নিয়মিত সুদ দেয়। স্থায়ী আমানতের (Fixed or Time Deposit) টাকা চাহিবামাত্র ফেরত পাওয়া যায় না। যে সময়-মেয়াদের (সাধারণত এক বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর) জন্য এই আমানতে টাকা জমা রাখা হয়, সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ না হইলে ইহা হইতে সাধারণত টাকা তোলা হয় না এবং ব্যাংকের বিশেষ অনুমতিক্রমে ঐ মেয়াদের পূর্বে টাকা তুলিলে উহার জন্য কম সুদ পাওয়া যায়। যেমন—এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত রাখা হইলে, এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে ঐ টাকা ব্যাংকের নিকট হইতে তোলা হইলে পুরাপুরি সুদ পাওয়া যাইবে। স্থায়ী আমানতের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক সুদ দেওয়া হয়।

খ। **ঋণ-প্রদান :** জনসাধারণ, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থাগুলিকে ঋণ প্রদান করা—বাণিজ্যিক ব্যাংকের দ্বিতীয় অন্যতম কাজ। ব্যাংক জনসাধারণের ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে-অর্থ জমা রাখে ইহার সবটাই নিজের তহবিলে জমা রাখে না। ব্যাংকারগণ অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছে, আমানতকারীরা তাহাদের

আমানতের সম্পূর্ণটাই কোন একদিন তুলিয়া লয় না ; কোন একদিন মোট আমানতের সামান্য অংশই আমানতকারীরা তুলিয়া থাকে। কাজেই আমানতকারীদের টাকা তুলিয়া লওয়ার চাহিদা মিটাইবার জন্য ব্যাংক উহার মোট আমনতের একটি অংশ নিজের তহবিলে জমা রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ ধার দেওয়ার কাজে বিনিয়োগ করে। ব্যাংক যে ধার দেয়, তাহার জন্য ব্যক্তিগত জামিন বা অতিরিক্ত জামিন দাবি করে। যে-সব ব্যক্তি ব্যাংকের নিকট খুবই অপরিচিত, তাহাদিগকে ব্যাংক ব্যক্তিগত জামিনে টাকা ধার দেয়। অবশ্য ব্যাংক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণ-গ্রহীতার নিকট হইতে সরকারী ঋণপত্র, জমিজমা, বাড়ী, নির্দিষ্ট দ্রব্যাদির মজুত, কোম্পানীর কাগজপত্র ইত্যাদি অতিরিক্ত জামিন দাবী করে। ব্যাংক হইতে গৃহীত ঋণ সময়মতো পরিশোধ করা না হইলে জামিনের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ব্যাংক ঋণের টাকা উসুল করিতে পারে। ব্যাংক ঋণ-প্রদানের জন্য সুদ আদায় করিয়া থাকে এবং ব্যাংক সরাসরি বাণিজ্যিক হুন্ডি (hundies) ভাঙ্গাইয়া বা ওভার-ড্রাফটের (overdraft) মাধ্যমে এইসকল ঋন দিয়া থাকে।

এখানে উল্লেখ করিতে হয়, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি উহাদের সম্পদের নগদাবস্থা (liquidity) বজায় রাখার জন্য সাধারণত স্বল্পকালীন অর্থ সাহায্য দিয়া থাকে। ইহা ছাড়া কোন কোন দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কৃষক, স্বল্পবিত্তের লোক, কারিগর, ক্ষুদ্রশিল্পের মালিক প্রভৃতি স্বল্প আয়ের ব্যক্তিদিগকে স্বল্পসুদের হারে বিশেষ ঋণ দিয়া থাকে। ভারতে এইরূপ করা হইতেছে।

গ। বিনিয়োগ : বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর একটি কাজ হইতেছে বিনিয়োগের (investment) কাজ। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি সরাসরি বিনিয়োগের কাজে নিযুক্ত হইতে পারে। ইহারা সরকারী ঋণপত্র বা কোম্পানীর শেয়ার ও ঋণপত্র বা জমিজমা কিনিয়া ঐগুলিতে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া থাকে। বিনিয়োগের সময় ব্যাংককে দুইটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রথমত, বিনিয়োগের কাজ এমনভাবে সম্পাদন করা হয়, যাহাতে ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি পায়। ইহা 'মুনাফার্জনের নীতি (principle of profitability) নামে পরিচিত। দ্বিতীয়ত, বিনিয়োগের ফলে ব্যাংক-সম্পদের নিরাপত্তা ও নগদাবস্থা (liquidity) যাহাতে নষ্ট না হয়, সেইদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হয়। ইহাকে 'নিরাপত্তা ও নগদাবস্থার নীতি' (principle of safety and liquidity) বলা হয়।

ঘ। টাকাকড়ি সৃজন : বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতকারীকে চেক (cheque) কাটিবার সুযোগ দেয়। ঐ চেক আমাদের সমাজে টাকাকড়ির মতো কাজ করিতেছে। পূর্বে অনেক ব্যাংক নোট ছাপাইয়া টাকাকড়ি সৃষ্টি করিতে পারিত। কিন্তু বর্তমানে শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকই টাকাকড়ি সৃষ্টি করিতে পারে। অবশ্য অন্যান্য ব্যাংক আমানত-সৃষ্টির মাধ্যমে টাকাকড়ি সৃজন করিতেছে। চেক হইতেছে ব্যাংকের উপর টাকা দিবার হুকুমনামা (order) এবং এই সম্পর্কে আলোচনা পূর্বেকার অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক কিভাবে এ টাকাকড়ি সৃজন করে, তাহা পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

ঙ। **অন্যান্য কার্য** ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক আরও বিভিন্ন ধরনের কাজ করিয়া থাকে। আজকাল বহু বাণিজ্যিক ব্যাংক জনসাধারণের মূল্যবান সম্পদ নিরাপদে গচ্ছিত রাখার ব্যবস্থা করিতেছে। ব্যাংক তাহার মক্কেলদের হইয়া শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে সাহায্য করে। ইহা অর্থ স্থানান্তরে সাহায্য করে। মক্কেলদের চেক ভাঙ্গানোর কাজেও সাহায্য করে। হান্ডি ক্রয় করা এবং বৈদেশিক হুন্ডি বা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করাও ইহার কাজ। আমানতকারীদের ডিভিডেন্ড- আদায়, চিঠিপত্র প্রদান ইত্যাদি কাগজগুলিও বাণিজ্যিক ব্যাংক করিয়া থাকে। বীমা-কোম্পানীর হইয়া ইহারা প্রিমিয়াম আদায় করে। ইহা ছাড়া, ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি একদিকে যেমন অর্থ-সংগ্রহের কাজ জোরদার করে, অন্যদিকে তেমনি অর্থব্যবস্থার অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে (priority sectors) প্রয়োজনমতো ঋণ-যোগানের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই কারণে ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি একদিকে যেমন ব্যাংক-আমানত বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে, অন্যদিকে তেমনি কৃষি, শিল্প ও রপ্তানি-বাণিজ্য—এই তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে ঋণ দিতেছে।

সুতরাং দেখা যায়, দেশের অর্থব্যবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সক্রিয় রাখিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

৪. **ব্যাংক-ব্যবস্থার অর্থনৈতিক গুরুত্ব বা সুবিধা ঃ (Economic Importance or Utility of the Banking System)** ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপরি-উক্ত কার্যাবলীর বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, আধুনিক সমাজে বিশেষ করে ব্যবসা-জগতে ব্যাংকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংক-ব্যবস্থার সুবিধাগুলি অর্থনৈতিক গুরুত্ব সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা হইল।

ক। ব্যাংকগুলি দেশের অভ্যন্তরে সঞ্চয়-সংগ্রহের কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে। ঐ সঞ্চয় দেশের বিনিয়োগ প্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করিতেছে।

খ। ব্যাংক-ব্যবস্থার সর্বাধিক অর্থনৈতিক গুরুত্ব হইতেছে ব্যাংক-আমানত স্থানান্তর (transfer) মাধ্যমে জনগণের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হইতেছে। চেকের মাধ্যমে একজনের নাম হইতে অন্যের নামে ব্যাংক-আমানত স্থানান্তর হইতেছে এবং উহারই মাধ্যমে সমাজে দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি হইতেছে।[১]

গ। ব্যাংকগুলি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে ঋণের যোগান দিয়া উৎপাদন-কার্যকে অব্যাহত রাখিতেছে। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ লইয়া

১. Sayers– *Modern Banking*, Chap I ("Bank deposits are commonly accepted in final settlement of other people's debts through the transfer of these deposits from one person to another".)

কাঁচামাল, মূলধন-সামগ্রী প্রভৃতি ক্রয় করিতেছে এবং উহার ফলে বৃহদায়তনের উৎপাদন সম্ভব হইতেছে। এই কারণেই বলা হয়, ব্যাংক-ঋণ উৎপাদনের চাকাকে প্রতিনিয়ত আবর্তিত করিতেছে।

ঘ। ব্যাংক চেক প্রবর্তন করিয়া দেশে নগদ টাকার ব্যবহার কমাইতেছে। চেকের মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন করিতে সুবিধা হয়। ব্যাংক ক্রেডিট সৃজন করিয়া দেশে প্রয়োজনমতো টাকাকড়ির যোগান বাড়াইতেছে।

ঙ। ব্যাংকসমূহ অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ দিয়া উহাদের প্রসার ঘটাইতেছে।

চ। শিল্প-ব্যাংক অর্থাৎ উন্নয়ন ব্যাংকগুলি দেশের শিল্পসমূহকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয় বলিয়া শিল্পগুলি ভারী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ক্রয় করিতে পারে। ইহা ছাড়া, কৃষি-ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংকসমূহ কৃষকদিগকে বিভিন্ন ধরণের ঋণ দিয়া কৃষির উন্নতির কাজে অংশগ্রহণ করিতেছে।

ছ। আবার দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করিয়া দ্রব্যমূল্য ও অর্থব্যবস্থার অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব রক্ষা করিতেছে।

জ। পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় ব্যাংকগুলির প্রয়োজনীয়তা আরও অনেক বেশী। ঐরূপ অর্থব্যবস্থায় ইহারা পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ এবং দ্রব্যমূল্য ও বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করিয়া উন্নয়ন-পরিকল্পনাকে সফল করিবার প্রচেষ্টা করে। ইহা ছাড়া, গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকগুলি নতুন নতুন শাখা খুলিয়া ওইসকল স্থানে ব্যাংকিং-এর সুযোগ প্রসার করে। ভারতেও বর্তমানে ব্যাকগুলি, বিশেষত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি, অনুরূপ ভূমিকায় কাজ করিতেছে।

৫. ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকাকড়ি-সৃজন (The Banking System and Creation of Money)ঃ প্রখ্যাত ব্যাংকিং বিশারদ অধ্যাপক সেয়ারস্ (Prof. Sayers) মন্তব্য করেন, ব্যাংকসমূহ শুধুমাত্র টাকাকড়ি লইয়া কারবার করে না, ইহা টাকাকড়ি সৃজনও করে। এখন দেখা যাউক, ব্যাংক-ব্যবস্থা কিভাবে টাকাকড়ি সৃজন করে?

ব্যাংক-সমূহ আমানত সৃষ্টি করিয়া টাকাকড়ি সৃজন করে। আমানতের উদ্ভব হয় দুই ভাবেঃ (১) কোন ব্যক্তি যখন নগদ টাকা ব্যাংকের নিকট জমা দেয়, তখন ঐ ব্যাংকে তাহার হিসাবে আমানত সৃষ্টি হয়। যেমন, ক একদিন তাহার ব্যাংকে ১,০০০ টাকা জমা দিল। ইহার ফলে ব্যাংকে ক-এর আমানত-হিসাবে ১,০০০ টাকা আমানত সৃষ্টি হইল।

(২) ব্যাংক যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন ব্যাংক সরাসরি তাহাকে নগদ টাকা ধার না দিয়া তাহার নামে একটি আমানতের হিসাব খুলিয়া দেয়। ঐ ব্যক্তি তাহার ইচ্ছামতো ওই আমানত

১. Banks are not merely purveyors of mony but also in an important sense manufactures of money—*Sayers*.

হিসাব হইতে টাকা তুলিতে পারে। সুতরাং দেখা যায়, ব্যাংকের প্রতিটি ঋণ একটি করিয়া আমানত সৃজন করে (every loan creates a deposit)।

এই কারণে হার্টলি হুইদার্স (Hartely Withers) প্রমুখ লেখকেরা মনে করেন, ব্যাংকের ঋণ প্রতিটি ক্ষেত্রে আমানত বা ক্রেডিট সৃষ্টি করে এবং ব্যাংক নিজেই উদ্যোগী হইয়া ঋণ সৃজন করিয়া থাকে। কিন্তু ডক্টর লীফ্ (Dr. Leaf) প্রমুখ লেখকদের মতে, ব্যাংক-ব্যবস্থা ঋণ সৃজন করিতে পারে না। আমানতকারীরা ব্যাংক হইতে আমানতের যে অংশ তুলিয়া লয় না, ব্যাংকগুলি কেবলমাত্র সেই পরিমাণে ঋণ দিয়া থাকে। এই দুইটি মতবাদের মধ্যে আংশিক সত্যতা দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে ঋণ সৃজন করিয়া থাকে। ইহা নিম্নের অংশে দেখানো হইল।

ব্যাংক কিভাবে টাকাকড়ি সৃজন করে, তাহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, দেশে অনেকগুলি ব্যাংক আছে এবং দেশের লোকেরা ব্যাংকের বা চেকের মাধ্যমে লেনদেন করে ও তাহারা নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চাহে না। কোন একদিন 'ভারত ব্যাংক' নামে একটি ব্যাংকে কোন একজন আমানতকারীর হিসাবে ১,০০০ টাকা জমা পড়িল। ঐ ব্যাংক উহার অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছে, আমানতকারীরা তাহাদের আমানতের সবটাই একদিনে তুলিয়া লয় না। ধরা যাউক, আমানতকারীদের জমা তুলিয়া লওয়ার চাহিদা মিটাইবার জন্য ব্যাংক উহার আমানতের ১০ শতাংশ নিজের তহবিলে জমা রাখিয়া অবশিষ্টাংশ ধার দেয়, ঐ ব্যাংকটি মোট ১০০ টাকা জমা রাখিয়া নগদ ৯০০ টাকা ধার দিল। যে-ব্যক্তি ৯০০ টাকা ধার লইল সেই ব্যক্তি পুনরায় ঐ ব্যাংকে বা অন্য একটি ব্যাংক-এ (ধরা যাউক 'লক্ষ্মী ব্যাংক') ঐ ৯০০ টাকা জমা দিল। তাহা হইলে 'লক্ষ্মী ব্যাংক'-এর ৯০০ টাকা আমানত বৃদ্ধি পাইল। 'লক্ষ্মী ব্যাংক'-ও ঐ আমানতের ১০ শতাংশ, অর্থাৎ ৯০ টাকা জমা রাখিয়া বাকী ৮১০ টাকা ধার দিল। যে ব্যক্তি ঐ ৮১০ টাকা ধার নিল, সে তাহার ব্যাংকে ('সরস্বতী ব্যাংক') উহা জমা দিল। সুতরাং 'সরস্বতী ব্যাংক'-এর ৮১০ টাকা আমানত বৃদ্ধি পাইল। ঐ ব্যাংক উহার ১০ শতাংশ জমা রাখিয়া বাকী অংশটুকু অর্থাৎ ৭২৯ টাকা ধার দিবে। এইভাবে চলিতে থাকিলে অবশেষে দেখা যাইবে, মোট (৯০০ টাকা + ৮১০ টাকা × ৭২৯ টাকা + ...) ৯,০০০ টাকা ঋণ সৃজন হইয়াছে। উহার সংগে মূল আমানত ১,০০০ টাকা ধরা হইলে মোট আমানত হইবে ১০,০০০ টাকা। সুতরাং দেখা যায়, উপরের উদাহরণ অনুযায়ী ১,০০০ টাকা আমানত হইতে ব্যাংকগুলি ১০ গুণের সমান আমানত সৃজন করিতে পারে। ইহা হইতে বলা যায়, ব্যাংক-ব্যবস্থা স্বল্প পরিমাণ আমানতের ভিত্তিতে ঋণব্যবস্থার এক বিরাট কাঠামো (a vast superstructure of credit) গড়িয়া তুলিতে পারে।

এখানে মনে রাখিতে হইবে, কোন একটি বিশেষ ব্যাংকের পক্ষে এই টাকাকড়ি সৃজন করা সম্ভব নয়। কারণ, কোন ব্যাংক তাহার প্রাপ্ত আমানতের অধিক টাকা

ধার দিতে পারে না। কিন্তু সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থা একত্রে টাকাকড়ি সৃজন করিতে পারে। উপরের উদাহরণে কোন একটি ব্যাংক টাকাকড়ি সৃজন করে নাই, কিন্তু 'ভারত ব্যাংক', 'লক্ষ্মী ব্যাংক' ইত্যাদি ব্যাংকগুলি একত্রে ধরা হইলে দেখা যাইবে, উহারা প্রাপ্ত আমানত হইতে টাকাকড়ি সৃজন করিতেছে।

টাকাকড়ি সৃজনের সীমাবদ্ধতা: অবশ্য ব্যাংকগুলির পক্ষে এই পদ্ধতিতে টাকাকড়ির সৃজনের পথে কতকগুলি প্রতিবন্ধক বা সীমা (limitations) আছে ঃ

ক. ঃ **নগদ টাকার মোট পরিমাণ**ঃ ব্যাংক-ব্যবস্থা কর্তৃক টাকাকড়ি সৃজনের পরিমাণ দেশের ব্যবহারযোগ্য মোট নগদ টাকাকড়ির উপর নির্ভর করে। কারণ টাকাকড়ি সৃজনের জন্য ব্যাংকগুলিকে কিছু নগদ টাকা জমা রাখিতে হয়। ব্যাংক-গুলি অধিক পরিমাণে নগদ টাকা না পাইলে অধিক পরিমাণে টাকাকড়ি সৃজন করিতে পারে না।

খ. **নগদ-রিজার্ভের পরিমাণ**ঃ ব্যাংকগুলি উহাদের আমানতের যে-অংশ নগদ টাকায় জমা রাখে, ঐ অনুপাতের (cash reserve) উপর উহাদের টাকাকড়ি সৃজন করার ক্ষমতা নির্ভর করে। উপরের উদাহরণে ধরা হইয়াছে, ব্যাংকগুলি উহাদের আমানতের ১০ শতাংশ নগদ টাকায় জমা রাখে। কিন্তু উহাদিগকে উহা অপেক্ষা বেশী জমা রাখিতে হইলে ব্যাংকগুলির টাকাকড়ির সৃজন করার ক্ষমতা হ্রাস পাইবে। যেমন, আমানতের ২০ শতাংশ নগদ টাকায় জমা রাখিলে উহারা মূল আমানতের মাত্র ৫ গুণ টাকাকড়ি সৃজন করিতে পারিবে।

গ. **নগদ-ব্যালেন্স ও ব্যাংকিং অভ্যাস**ঃ ব্যাংকের টাকাকড়ি সৃজন করার ক্ষমতা দেশের লোকদের অভ্যাসের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। যে-সকল দেশে লোকেরা চেকের সাহায্যে লেনদেন করিতে অভ্যস্ত নয় এবং যে-দেশের লোকেরা নগদ টাকাকড়ি অধিক পরিমাণে হাতে ধরিয়া রাখিতে চাহে, সেই দেশে ব্যাংকের টাকাকড়ি সৃজন করার ক্ষমতা কমিয়া যায়। যেমন—কেহ ব্যাংকের নিকট হইতে ১,০০০ টাকা ধার লইয়া নগদ টাকায় নিজের কাছে গচ্ছিত রাখিল। ফলে, অন্য ব্যাংক তাহার নিকট হইতে ঐ টাকা জমা পাইল না ও টাকাকড়ি সৃজন করিবার সুযোগ পাইল না। কিন্তু যে-সকল দেশে চেকের মাধ্যমে অধিক লেনদেন হয়, সেই সকল দেশে টাকাকড়ি সৃজনের পরিমাণও বেশী হয়।

ঘ. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট রিজার্ভের পরিমাণ**ঃ বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক দেশেই প্রথাগত বিধি বা ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যাংককেই উহার আমানতের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট নগদ টাকায় জমা রাখিতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐ জমার অনুপাত বৃদ্ধি করিয়া ব্যাংকের টাকাকড়ি সৃজন করার পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে।

ঙ. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতি**ঃ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক উহার

ঋণনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করিয়া বাণিজ্যিক ঋণের পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইবে।

চ. উপযুক্ত জামিনের অভাব : ব্যাংক-ব্যবস্থা উপযুক্ত জামিনের বিরুদ্ধে ঋণ দিয়া থাকে, কিন্তু উহার অভাব থাকিলে ঋণ-সৃজনের ক্ষমতা হ্রাস পায়। ইহা ছাড়া, ঋণগ্রহীতার সংখ্যা কম হইলে ঋণ-সৃজনের পরিমাণ কম হয়।

উপসংহার : সুতরাং দেখা যায়, ব্যাংক-ব্যবস্থা অধিক পরিমাণে ঋণ-সৃজন করিতে পারিলেও বাস্তবক্ষেত্রে নানাকারণে ঐ ক্ষমতা সীমায়িত হইয়া থাকে। এই কারণে অধ্যাপক স্যামুয়েল্‌সন (Samuelson) মন্তব্য করিয়াছেন, ক্রেডিট-সৃজনে কোনরূপ স্বয়ংক্রিয়তা নাই ("nothing automatic about credit creation")। ইহা দেশের লোকদের লেনদেনের অভ্যাস ও রীতিনীতি, ব্যবসা ও অর্থনৈতিক অবস্থা, নগদ রিজার্ভের অনুপাত ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।[1]

৬. উন্নয়ন ব্যাংক এবং ইহার কার্যাবলী (Development Banks and their Functions) : পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থব্যবস্থার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষত শিল্পক্ষেত্রে প্রসারমূলক কার্যের জন্য কোন কোন দেশে বিশেষীকৃত অর্থ-প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। ঐ সকল বিশেষীকৃত অর্থযোগান প্রতিষ্ঠানকে কোন কোন দেশে উন্নয়ন-ব্যাংক বলা হয়। যেমন, ভারতের শিল্প-অর্থযোগান করপোরেশান (Industrial Finance Corporation of India—IFCI), রাজ্য অর্থযোগান করপোরেশন (State Financial Coporations—SFCs), ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক (Industrial Development Bank of India—IDBI) প্রভৃতি। এই সকল বিশেষ সংস্থার কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন-ব্যাংকের কার্যাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল :

ক. সরাসরি ঋণপ্রদান : উন্নয়ন ব্যাংকগুলি শিল্পক্ষেত্রে সরাসরি দীর্ঘকালীন ঋণ দিয়া থাকে। কারখানা-ক্রয়, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ক্রয় ও প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠানের প্রসার ও পুনর্বিন্যাস প্রভৃতি উদ্দেশ্যে সরাসরি ঋণ ও অর্থ-সাহায্য দেওয়া হয়। এই ঋণ দেশীয় ও বিদেশী মুদ্রায় প্রদান করা হয়।

খ. ঋণের গ্যারান্টি-প্রদান : উন্নয়ন ব্যাংকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন ঋণ সম্পর্কে গ্যারান্টি দিয়া থাকে। যেমন—বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান বাজার বা অন্য সংস্থা হইতে অনধিক ২৫ বৎসরের মেয়াদী যে-ঋণ সংগ্রহ করে, সেই সম্পর্কে শিল্প অর্থ-যোগান করপোরেশন গ্যারান্টি প্রদান করিয়া থাকে।

গ. শেয়ার ও বণ্ডে বিনিয়োগ : শিল্পক্ষেত্রে অর্থ-যোগানোর জন্য উন্নয়ন ব্যাংকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও বণ্ড ক্রয় করিয়া থাকে। ইহার ফলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নয়ন ব্যাংকের নিকট হইতে ইক্যুইটি (equity) মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে।

1, Samuelson—*Economics* (11th Edition), Chap. 16

ঘ. শেয়ার, বন্ড প্রভৃতি অবলেখনের কার্য : উন্নয়ন ব্যাংকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার, বন্ড প্রভৃতি অবলেখনের (underwriting) কার্য (অর্থাৎ, উহা বিক্রয় না হইলে ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া) করিয়া থাকে। ইহার ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি বাজারে শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি বিক্রয় করিতে উন্নয়ন ব্যাংকগুলির সাহায্য পাইয়া থাকে।

ঙ. অন্যান্য বিষয়ে গ্যারাণ্টি প্রদান : উন্নয়ন ব্যাংকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিল্প-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূলধন-সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিলম্বে মূল্য-প্রদানের (deferred payments) ব্যাপারে নানাভাবে গ্যারাণ্টি দিয়া থাকে।

চ. বিল পুনর্বাট্টা : উন্নয়ন ব্যাংকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিল পুনর্বাট্টা (rediscounting of bills) করিয়া থাকে। যেমন—ভারতে শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিল পুনর্বাট্টা করিয়া থাকে।

ছ. নূতন শিল্প স্থাপন : উন্নয়ন ব্যাংক কোন কোন ক্ষেত্রে স্বীয় উদ্যোগে বিশেষ ধরনের নূতন নূতন শিল্প-কারখানা গড়িয়া থাকে। যেমন—ভারতে জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন (National Industrial Development Corporation) প্রারম্ভে পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প-কারখানা স্বীয় উদ্যোগে গঠন করিত।

জ. পুনঃ অর্থযোগানের ব্যবস্থা : কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন ব্যাংকগুলি অন্যান্য অর্থকরী প্রতিষ্ঠানকে পুনরায় অর্থ-যোগানের (refinancing) সুযোগ-সুবিধা দেয়। যেমন—ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শিল্প-অর্থযোগান করপোরেশন, বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রভৃতি অর্থ-যোগান-প্রতিষ্ঠানকে পুনরায় অর্থ-যোগানের সুযোগ-সুবিধা দিয়া থাকে।

ঝ. অন্যান্য কার্যাবলী : ইহা ছাড়া, উন্নয়ন ব্যাংকগুলি নানাভাবে শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে সাহায্য করিয়া থাকে। অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্প-কারাখানা স্থাপন, শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনা (potentials) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, শিল্প-গবেষণা, কারিগরী সাহায্য প্রদান ইত্যাদি কার্যকলাপ করিয়া থাকে।

সুতরাং দেখা যায়, ভারতের ন্যায় শিল্পে অনগ্রসর দেশে উন্নয়ন-ব্যাংকগুলি নানাভাবে শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে সাহায্য করিয়া থাকে। উপরন্তু, এই সকল ব্যাংক অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারী সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে গড়িয়া উঠে বলিয়া শিল্পবিকাশের কাজ দ্রুততর করা সম্ভব হয়।

৭. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ইহার কার্যাবলী (Central Bank and its Functions) : প্রত্যেক দেশেই ব্যাংক-ব্যবস্থার শীর্ষে আছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ইহা হইতেছে দেশের টাকাকড়ির বাজারের দলনেতা (the leader the money market) এবং ইহারই নেতৃত্বে দেশের টাকাকড়ির বাজার গড়িয়া উঠে। সুতরাং, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমেই প্রশ্ন উঠে,

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি ? কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতেছে কোন দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান যাহার হাতে দেশের টাকাকড়ির যোগান নিয়ন্ত্রণের ও মুদ্রামূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষা করার একক দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। প্রত্যেক দেশেই একটি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে, যেমন—আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম রিজার্ভ ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়া, ইংল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতেছে ব্যাংক অফ্ ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি। আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে গঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বরূপ বুঝিতে হইলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সহিত ইহার পার্থক্য আলোচনা করিতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমত, দেশের টাকাকড়ি ও ব্যাংক-ঋণের যোগান নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে এককভাবে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি এই ক্ষমতা ভোগ করে না ; ইহারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ও তত্ত্বাবধানে কাজ করে।

দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে। কিন্তু মুনাফা অর্জন করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজের উদ্দেশ্য নয়। দেশে অর্থসংক্রান্ত বিষয়গুলিতে স্থায়িত্ব আনা ইহার কাজের মুখ্য উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে কাগজী টাকাকড়ি প্রচলন করার ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঐ অধিকার নাই।

চতুর্থত, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি জনসাধারণের নিকট হইতে সরাসরি আমানত গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত ঐ আমানত গ্রহণ করে না।

পরিশেষে দেখা যায়, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংকার হিসাবে কাজ করে এবং আজকাল অধিকাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগে গঠিত হয়।[১]

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী : সুতরাং দেখা যায়, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। এখন দেখা যাউক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি কি কাজ করে ? কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজগুলি নিম্নরূপ :

ক. ব্যাংক-ঋণের যোগান-নিয়ন্ত্রণ : দেশের আর্থিক ব্যাপারে স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য বাণিজ্যিক ও অন্যান্য ব্যাংকগুলি যে-ঋণ দিয়া থাকে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক উহার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনের সংগে সংগতি রাখিয়া ব্যাংক-ঋণের হ্রাসবৃদ্ধিকে ব্যাংক-ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। ঐ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে কতকগুলি অস্ত্র (weapons of credit control) থাকে এবং উহাদের মাধ্যমে ব্যাংক-ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

---

১. ভারতে অবশ্য রাষ্ট্রীয় ব্যাংকসমেত আরও ২০টি শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে।

খ. **কাগজী টাকাকড়ি প্রচলনের ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার :** আজকাল প্রত্যেক দেশেই কাগজী টাকাকড়ি প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে থাকে। অন্য কোন ব্যাংক কাগজী টাকাকড়ি প্রচলন করিতে পারে না। এই অধিকারের বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের টাকাকড়ির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। কাগজী টাকাকড়ি প্রচলনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আইনানুযায়ী কিছু পরিমাণ সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখিতে হয়। আমাদের দেশে বর্তমানে কাগজী টাকাকড়ি প্রচলনের জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে অন্তত ২০০ কোটি টাকার রিজার্ভ রাখিতে হয়—উহার মধ্যে সোনাতে রিজার্ভ রাখিতে হয় অন্তত ১১৫ কোটি টাকা।

গ. **সরকারের ব্যাংকার হিসাবে কাজ :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের নগদ টাকা জমা রাখে। সরকারের ব্যাংকিং সংক্রান্ত লেনদেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজন মতো সরকারকে ঋণ দেয়। ইহা সরকারের ঋণপত্র বিক্রয় করার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সরকারের ঋণব্যবস্থা (public debt) পরিচালনা করে। ইহা ছাড়া, আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাংকার হিসাবেও কাজ করিতেছে। আমাদের দেশেও রিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির ব্যাংকার হিসাবে কাজ করিতেছে।

ঘ. **অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কাজ :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতেছে দেশের অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার (bankers' bank)। অন্যান্য ব্যাংকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট একটি করিয়া হিসাব রাখে এবং উহাদের গৃহীত আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট নগদ টাকায় জমা রাখে। ভারতে তপশীলী ব্যাংকগুলি উহাদের গৃহীত আমানতের অন্তত ৩ শতাংশ রিজার্ভ ব্যাংক-এর নিকট জমা রাখে। ঐ জমা রাখা এবং অন্যান্য কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্তপূরণ সাপেক্ষে অন্যান্য ব্যাংকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সরকারী ঋণপত্র বা অন্যান্য কতকগুলি অনুমোদিত ঋণপত্র জমার বিরুদ্ধে ব্যাংক-রেটে (bank rate) টাকা ধার নিতে পারে এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রথম শ্রেণীর বিল পুনর্বাট্টা (rediscounting of bills) করার সুবিধা পায়।

ঙ. **অন্যান্য ব্যাংকের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও তদারক :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থার নেতা হিসাবে অন্যান্য ব্যাংকের কার্যকলাপ যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করিয়া থাকে। ইহার জন্য ইহা প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও নির্দেশনামা তৈয়ার করে এবং অন্যান্য ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়া থাকে।

চ. **বৈদেশিক বিনিময় হার রক্ষা ও আন্তর্জাতিক লেনদেন :** অন্যান্য দেশের মুদ্রার সহিত দেশের মুদ্রার নির্দিষ্ট বিনিময়-হার কেন্দ্রীয় ব্যাংককে রক্ষা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তত্ত্বাবধান করা এবং দেশের প্রয়োজনে উহা নিয়োগ করা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ। ইহা ছাড়া, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থার সঙ্গে লেনদেন পূরণের জন্যও কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কিছু কার্যকলাপ সম্পন্ন করিতে হয়।

ছ. জাতীয় সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রা গচ্ছিত রাখা ঃ দেশের জাতীয় সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রার মোট পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত থাকে।

জ. উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ ঃ উন্নয়নের জন্য দেশের সম্পদ সংগ্রহ করা, ব্যাংক-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা, উন্নয়নের প্রয়োজনে ক্রেডিট ব্যবস্থা পরিচালিত করা ইত্যাদি নানারূপ উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ কেন্দ্রীয় ব্যাংক করিয়া থাকে। ইহা নিম্নে বিশদ-ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ঝ. অন্যান্য কার্য ঃ ইহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও কতকগুলি কাজ করিয়া থাকে। যেমন—কোন কোন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কৃষি-ঋণ ও শিল্প-ঋণ ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে। দেশে ব্যাংক-পতন রোধ করিয়া আমানতের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। বিপদের সময় ইহা অন্যান্য ব্যাংকগুলিকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও সাহায্য দিয়া থাকে। বিভিন্ন ব্যাংকের পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য যে-নিকাশ-ঘর (clearing house) থাকে, তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ইহা ছাড়া, পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় উন্নয়নশীল দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ-সংগ্রহ, আমানত-বৃদ্ধি, ব্যাংক-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা ইত্যাদি বিষয়ে কতকগুলি কাজ করিয়া থাকে। এই বিশেষ কাজগুলি নিম্নের অংশে আলোচনা করা হইল।

উন্নয়নশীল অর্থব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিশেষ ভূমিকা ঃ ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে (developing country) কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কতকগুলি বিশেষ কাজ করিতে হয়। উহা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল ঃ

প্রথমত, উন্নয়নশীল অর্থব্যবস্থায় উন্নয়ন কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেওয়ার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় পরিমাণে কাগজী টাকাকড়ি বৃদ্ধি করে। ইহার জন্য অবশ্য কাগজী-নোট প্রচলন ব্যবস্থা নমনীয় (flexible) হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ-সংগ্রহের কাজ জোরদার করে। ব্যাংক-আমানত বৃদ্ধি, সরকারের ঋণপত্র বিক্রয়, ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থসংগ্রহের কাজে ইহা সরকারকে সাহায্য করে।

তৃতীয়ত, অর্থব্যবস্থার কাম্যপথে উন্নয়নের ব্যবস্থা করার জন্য ইহা অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে (priority sectors) অধিক পরিমাণে ব্যাংক-ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ফটকা-ঋণের উপর নানারূপ বাধানিষেধ আরোপ করা হয়।

চতুর্থত, উন্নয়ন ও মুদ্রাস্ফীতি একরূপ সহগামী বলিয়া দামস্তরের বৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য ইহাকে দৃঢ়হস্তে ব্যাংকঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে হয়। পরিমাণগত ও নির্বাচনমূলক নানারূপ ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দ্বারা ইহা কঠোরভাবে ব্যাংক-ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

পঞ্চমত, দেশের কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অর্থযোগানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ইহা উদ্যোগী হইয়া নানারূপ উন্নয়ন-ব্যাংক গঠনের ব্যবস্থা করে। আবার পল্লী অঞ্চলে

ঋণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য গ্রামীণ ব্যাংক (rural bank) ইত্যাদি স্থাপনের ব্যবস্থা করে ;

ষষ্ঠত, দেশের উন্নয়ন-প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া ইহা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তত্ত্বাবধান করে। ইহার জন্য ইহাকে কঠোর বিনিময় নিয়ন্ত্রণের (exchange control) ব্যবস্থা করিতে হয়।

সপ্তমত, উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সুদৃঢ় ব্যাংক-ব্যবস্থা অপরিহার্য বলিয়া ইহা দেশে শক্তিশালী ব্যাংক-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার প্রচেষ্টা করে।

পরিশেষে বলা যায়, পরিকল্পনা-প্রণয়ন ও উহার সার্থক রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে নানারূপ উপদেশ দিয়া থাকে এবং অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে।

সুতরাং দেখা যায়, প্রত্যেক দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক নানারূপ গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ সম্পন্ন করিয়া অর্থব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষা ও দ্রুত উন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের কার্যাবলী : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীর পটভূমিকায় ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের কার্যাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতে পারে ঃ

(ক) কাগজী-নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ঃ অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকেরও কাগজী-নোট প্রচলনের (issue) ব্যাপারে একচেটিয়া কর্তৃত্ব রহিয়াছে। এক টাকার কাগজী-নোট[১] ছাড়া অন্যান্য কাগজী নোট (যেমন—২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা ও ১০০ টাকা মূল্যের) একমাত্র রিজার্ভ ব্যাংকই প্রচলন করিয়া থাকে। ইহার জন্য ইহাকে কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকার রিজার্ভ রাখিতে হয়, ঐ রিজার্ভ ১১৫ কোটি টাকা রাখা হয় স্বর্ণে এবং অবশিষ্ট ৮৫ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রায়। এই ন্যূনতম রিজার্ভ রাখিয়া ইহা দেশের প্রয়োজনে যত খুশি কাগজী নোট ছাপাইতে পারে।

(খ) সরকারের ব্যাংকার হিসাবে কাজ ঃ রিজার্ভ ব্যাংক ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের ব্যাংকার হিসাবে কাজ করে। ইহার জন্য ইহা সরকারের টাকাকড়ি জমা রাখে এবং উহাদিগকে ঋণ দেয়।

(গ) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কাজ ঃ রিজার্ভ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কাজ করে, অন্যান্য ব্যাংক ইহার নিকট হইতে ঋণ ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা লইয়া থাকে। ইহার জন্য অন্যান্য ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট উহাদের আমানতের অন্তত ৩ শতাংশ জমা (reserve) রাখিতে হয় এবং প্রয়োজনবোধে ঐ অনুপাত ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়।

(ঘ) ব্যাংক-ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ঃ রিজার্ভ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ব্যাংক-রেট, খোলা-বাজারে কারবার, নির্বাচনমূলক

১. ১ টাকার কাগজী নোট প্রচলন করে ভারত সরকার।

ঋণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে ঐ ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ-সম্পর্কে পরে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

(ঙ) অন্যান্য ব্যাংকের কার্যকলাপ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ : রিজার্ভ ব্যাংক 'ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইন' (Banking Regulation Act) অনুসারে অন্যান্য ব্যাংকের কার্য-কলাপ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ব্যাংকের লাইসেন্স প্রদান, মূলধন, রিজার্ভ, শাখা-বিস্তার, সংযুক্তিকরণ, নগদ-ব্যালেন্স ইত্যাদি সম্পর্কে এই নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(চ) বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ : রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিচালনা করে এবং অন্যান্য দেশের মুদ্রার সঙ্গে টাকার বিনিময় হার ধার্য করে এবং উহা রক্ষা করে।

(ছ) উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ : কৃষিঋণ, শিল্পঋণ, অনগ্রসর অঞ্চলে ব্যাংকের প্রসার, দেশের সঞ্চয়-সংগ্রহ, ব্যাংক-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা ইত্যাদি ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংক নানারূপ উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ করিয়া থাকে।

(ছ) অন্যান্য কাজ : ইহাছাড়া, রিজার্ভ ব্যাংক অ-ব্যাংকিং কোম্পানীগুলির জন-আমানত (public deposits) নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা নিকাশ-গৃহ (clearing house)-এর কাজও করিয়া থাকে।

সুতরাং দেখা যায়, ভারতের অর্থব্যবস্থায় রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৮. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ (Control or Regulation of Bank Credit by the Central Bank) : ব্যাংক-ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলিতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যাংক-ঋণের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করাকেই বুঝায়। দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উহা প্রতিরোধের জন্য ব্যাংক-ঋণ সংকোচন (credit contraction) এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইতে থাকিলে উহা প্রতিহত করার জন্য ব্যাংক-ঋণ বৃদ্ধি (credit expansion) করিতে হয়। দাম-স্তর ও বৈদেশিক বিনিময় হারে স্থায়িত্ব রক্ষা করা ঋণ-নিয়ন্ত্রণের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া, বাণিজ্য-চক্র প্রতিরোধ, স্থায়িত্ব রক্ষা করিয়া অর্থনৈতিক প্রসারের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি উদ্দেশ্য ঋণ-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পূরণের চেষ্টা করা হয়। পরিকল্পনাধীন সময়ে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের অর্থসংক্রান্ত ও ব্যাংক-ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইতেছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'স্থায়িত্ব রক্ষা করিয়া দ্রুত বিকাশের' (growth with stability) ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাংক সাম্প্রতিককালে যে ব্যাংক-ঋণ নীতি অনুসরণ করিতেছে, উহা 'নিয়ন্ত্রণমূলক প্রসার' (controlled expansion) নামে পরিচিত।

'নিয়ন্ত্রণমূলক প্রসার' ঋণনীতি অনুসারে পরিকল্পনার কার্যের জন্য উন্নয়ন-মূলক ঋণ-এর (development credit) পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইতেছে। কিন্তু ব্যাংকে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে গিয়া যাহাতে ফটকা কারবারের জন্য অধিক পরিমাণে

ব্যাংক-ঋণ দেওয়া না হয় তাহার জন্য 'ফটকা-ঋণ' (speculative credit) সংকোচনের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। বিশ্লেষণ করিয়া বলা যাইতে পারে, উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য কৃষি, সমবায়, ক্ষুদ্রশিল্প, রপ্তানি-বাণিজ্য প্রভৃতি অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ক্রেডিট-নিয়ন্ত্রণ শিথিল (selective liberalization of credit) করা হইতেছে। পক্ষান্তরে, অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী ও শেয়ারপত্র লইয়া যাহাতে ফটকা কারবার না চলে এবং উহার ফলে যাহাতে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি না ঘটে, তাহার জন্য ঐ সকল ক্ষেত্রের ঋণ-সংকোচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য দ্বারাই পরিচালিত হইয়া রিজার্ভ ব্যাংক পরিকল্পনাধীন সময়ে বিভিন্ন ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে 'নিয়ন্ত্রণমূলক প্রসার' ঋণনীতি অনুসরণ করিতেছে।

ঋণ-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ : ব্যাংক-ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে কতকগুলি অস্ত্র (weapons) থাকে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকও ঐ অস্ত্রগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করিতেছে। রিজার্ভ ব্যাংকের দৃষ্টান্তসহ ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ঐ পদ্ধতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল :

১। **ব্যাংক-রেটের হ্রাসবৃদ্ধি (Variation in the Bank Rate)** : কেন্দ্রীয় ব্যাংক ন্যূনতম যে-হারে বিল পুনর্বাট্টা (rediscounting of bills) করে, সেই হারকে ব্যাংক-রেট (Bank Rate) বলা হয়, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ন্যূনতম যে-বাট্টার হারে বিল ভাঙ্গাইয়া অন্যান্য ব্যাংকগুলিকে টাকা দেয়, সেই বাট্টার হারই হইতেছে ব্যাংক-রেট। ইহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারী ঋণপত্র জমার বিরুদ্ধে অন্যান্য ব্যাংকগুলিকে ন্যূনতম যে-সুদের হারে টাকা ধার দেয়, তাহাকেও ব্যাংক-রেট বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক উহার ব্যাংক-রেট বৃদ্ধি করিলে অন্যান্য ব্যাংক উহাদের সুদের হার বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হয়।[১] কারণ প্রয়োজনমতো তাহাদিগকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে ঋণ লইতে হয় এবং ব্যাংক-রেট বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে গৃহীত ঋণের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং ঋণ-প্রাপ্তির পরিমাণ হ্রাস পায়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে ঋণ-গ্রহীতারা ব্যাংকের নিকট হইতে কম পরিমাণ ঋণ লইবে এবং ফলে দেশে মোট ব্যাংক-ঋণের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক-রেট হ্রাস করিলে অন্যান্য ব্যাংক উহাদের সুদের হার হ্রাস করিবে বলিয়া দেশে মোট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই কারণে, মুদ্রাস্ফীতির সময় ক্রেডিট-সংকোচনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক উহার ব্যাংক-রেট বৃদ্ধি করে এবং মুদ্রা-সংকোচনের সময় ক্রেডিট-প্রসারের জন্য ব্যাংক-রেট হ্রাস করে। ইহা ছাড়া, ব্যাংক-রেট হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া বৈদেশিক বিনিময় হারে স্থায়িত্ব রক্ষা করা যায়।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংক-রেট হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া ক্রেডিটের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ

---

১. প্রকৃতপক্ষে আজকাল ব্যাংক-রেট ও ঋণের অন্যান্য সুদের হার একযোগেই পরিবর্তন করা হয়। অবশ্য বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাংক রেট বৃদ্ধি না করিয়া রিজার্ভ ব্যাংক অন্যান্য সুদের-হার বৃদ্ধি করিয়াছে।

করে। ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাস হইতে রিজার্ভ ব্যাংক 'দুর্লভ টাকাকড়ি-নীতি' (dear money policy) অনুসরণ করিতেছে বলিয়া কয়েক দফায় ব্যাংক-রেট বৃদ্ধি করে। সালে জুলাই মাসে ব্যাংক-রেট ৭ শতাংশ হইতে একদফায় ২ শতাংশ বৃদ্ধি করিয়া ৯ শতাংশ ধার্য করা হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে ভারতে যে অভুতপূর্ব মুদ্রাস্ফীতি দেখা গিয়াছিল, তাহা প্রতিরোধের জন্য ব্যাংক-রেট বাড়াইয়া এবং উহার সঙ্গে ব্যাংক-কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের উপর দেয় সুদের হার বৃদ্ধি করিয়া ঋণ-সংকোচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সর্বশেষ বৃদ্ধি করা হয় ১৯৮১ সালের ১২ই জুলাই এবং ঐ সময়ে ব্যাংক-রেট ১০ শতাংশে ধার্য করা হয়। তদানীন্তন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের জন্যই ব্যাংক-রেট ৭ বৎসর পরে বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। কিন্তু ভারতে বিল বাজার এখনও উন্নত ও প্রসারিত হয় নাই, ইহার ফলে উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশে ব্যাংক-রেট নীতির কার্যকারিতা অপেক্ষাকৃত কম হয়।

২. খোলা বাজারে কারবার (Open Market Operations): খোলা বাজারের কারবারে অর্থ হইতেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সরকারী বা অনুমোদিত ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের কারবার। কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে জনসাধারণের বা ব্যাংকের নিকট ঋণপত্র বিক্রয় করিলে ক্রেতারা ব্যাংক-আমানত হইতে টাকা তুলিয়া ইহার মূল্য প্রদান করে। ফলে ব্যাংক-আমানত হ্রাস পায় এবং ব্যাংকগুলির ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাও হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক জনসাধারণ বা ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণপত্র ক্রয় করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে টাকাকড়ি চলিয়া আসে বলিয়া ব্যাংকগুলির নগদ-ব্যালেন্স বৃদ্ধি পাইবে। ফলে ব্যাংকগুলির ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা বাড়িবে এবং ব্যাংক-ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকের হাতে প্রচুর পরিমাণ নগদ-ব্যালেন্স (cash balances) থাকিলে ব্যাংক-ঋণ সংকোচনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষ কার্যকর হয় না।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তবে প্রধানত সরকারী ঋণপত্রের বাজারে শৃঙ্খলা রাখার জন্য এবং কর্মব্যস্ত ঋতুতে (busy season) টাকার বাজারের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে। ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাস হইতে ঋণ-সংকোচনের জন্য রিজার্ভ ব্যাংক ঋণপত্র ক্রয় অপেক্ষা বিক্রয়ের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিতেছে। ইহার ফলে ঋণপত্র ক্রয়ের পরিমাণ অপেক্ষা উহার বিক্রয়ের পরিমাণ অধিক হইতেছে।

৩. পরিবর্তনশীল রিজার্ভ অনুপাত (Variable Reserve Ratio): প্রত্যেক দেশেই আইনগত বা প্রথাগত নিয়ম অনুসারে ব্যাংকগুলিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট উহাদের গৃহীত আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ জমা রাখিতে হয়, ইহাকে রিজার্ভ অনুপাত (reserve ratio) বলা হয়। কোন কোন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনমতো রিজার্ভ-অনুপাত হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারে। রিজার্ভ-অনুপাত বৃদ্ধি করিলে ব্যাংকগুলিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট উহাদের গৃহীত আমানতের অধিক

অংশ জমা রাখিতে হইবে। ফলে ব্যাংকগুলির হাতে নগদ ব্যালেন্স-এর পরিমাণ হ্রাস পাইবে ও ব্যাংক-ঋণের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে, রিজার্ভ-অনুপাত হ্রাস করা হইলে, ব্যাংকগুলিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট কম জমা রাখিতে হইবে; তখন ব্যাংকগুলি অধিক পরিমাণে ঋণ দিতে পারে বলিয়া ব্যাংক-ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।[১] এই পদ্ধতিটির সুবিধা সম্পর্কে বলা হয়, ইহার দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভের অনুপাত বৃদ্ধি করিয়া অতি দ্রুত বা 'এক কলমের খোঁচায়' (at a pen's stroke) ব্যাংক-ঋণের পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে। ব্যাংকিং-বিশেষজ্ঞ প্রয়াত ডক্টর এস. এন. সেন (Dr. S. N. Sen)-এর মতে, ভারতের মতো অনুন্নত টাকাকড়ির বাজারে এই এই পদ্ধতিটি বিশেষ কার্যকর হয়।

ভারতের মূল রিজার্ভ ব্যাংক আইন অনুসারে শুরুতে রিজার্ভ-অনুপাত স্থির (fixed) থাকিত, কিন্তু ১৯৫৬ সালে এক সংশোধন দ্বারা রিজার্ভ ব্যাংককে রিজার্ভ-অনুপাত হ্রাস-বৃদ্ধি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংক রিজার্ভ-অনুপাত ব্যাংকের মোট আমানতের ৩ শতাংশ হইতে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারে। ইহা ছাড়া, বিশেষ বিশেষ সময়ে অতিরিক্ত ব্যাংক-আমানতের জন্য অতিরিক্ত জমা দাবি করিতে পারে। ১৯৬০ সালে রিজার্ভ ব্যাংক অতিরিক্ত জমা দাবি করিয়া ক্রেডিটের অতি-সংকোচনের (credit squeeze) ব্যবস্থা করিয়াছিল। ইহা ছাড়া, ১৯৭৩ সালের মে মাসে জমার অনুপাত বৃদ্ধি করিয়া ৫ শতাংশ এবং পরে সেপ্টেম্বর মাসে ৭ শতাংশ করা হয়। উহা এক বৎসরের জন্য বলবৎ ছিল। ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে উহা কিছুকালের জন্য পুনরায় বৃদ্ধি করিয়া ৯ শতাংশ করা হয়। উপরন্তু সালের ১১ই নভেম্বর হইতে ব্যাংকগুলির আমানত যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আমানতের (incremental deposits) ১০ শতাংশ রিজার্ভ ব্যাংক-এর নিকট জমা রাখিতে হয়। সম্প্রতি জমার মূল অনুপাত পুনরায় কয়েকবার বৃদ্ধি করা হয়। প্রথমে সালের আগস্ট মাস হইতে উহা দুই দফায় ৬ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৭ শতাংশ করা হয়। সর্বশেষে ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উহা পুনরায় বৃদ্ধি করিয়া ৯ শতাংশ করা হয়। ইহা ছাড়া, পূর্বের ন্যায় অতিরিক্ত আমানতের জন্য ১০ শতাংশ রিজার্ভ রাখিতে হইতেছে।

৪. **নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ (Selective Credit Controls)**: এই পদ্ধতি দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সামগ্রিকভাবে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ না করিয়া কতকগুলি নির্বাচিত দ্রব্যসামগ্রী বা জামিনের বিরুদ্ধে যে ঋণ দেওয়া হয় কেবলমাত্র সেইসকল

১. রিজার্ভ অনুপাতের অনুরূপ আর একটি অনুপাত হইতেছে 'বিধিবদ্ধ নগদ অনুপাত' (statutory liquidity ratio বা SLR। এই অনুপাত অনুযায়ী ভারতে প্রত্যেকটি ব্যাংককে প্রতিদিনের কাজের শেষে উহার মোট আমানতের একটি অংশ অর্থাৎ ২৫ শতাংশ উহার 'নিজের নিকট নগদ টাকা, সোনাতে ও অনুমোদিত ঋণপত্রে জমা রাখিতে হয়। বর্তমানে এই অনুপাত হইতেছে (১৯৮৫ সালের জুলাই হইতে) মোট আমানতের ৩৭ শতাংশ।

ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা ঋণ-নিয়ন্ত্রণের গুণগত পদ্ধতি (qualitative method of credit control) নামে পরিচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দাম-বৃদ্ধির সময়ে ধান ও চাউল, পাট, তুলাবস্ত্র, চিনি, তৈলবীজ, শেয়ার ইত্যাদির বিরুদ্ধে ব্যাংকগুলি যে ঋণ দেয় তাহার জন্য উচ্চতর জামিনের (higher margin) ব্যবস্থা করা হয় বা স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য (যেমন—মোটরগাড়ি, টেলিভিশন ইত্যাদি) 'ভাড়ার ভিত্তিতে ক্রয়ের' (hire purchase) জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাংক-ঋণের উপর বাধানিষেধ প্রবর্তন করা হয়। ভারতে ও অন্যত্র যে-সকল নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা সাধারণত তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে : (ক) বিশেষ কতকগুলি জামিনের বিরুদ্ধে ঋণের জন্য ন্যূনতম জমা রাখা, (খ) নির্বাচিত কতকগুলি উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ঋণের উচ্চতম সীমা নির্ধারণ করা এবং (গ) বিশেষ বিশেষ ঋণের জন্য বৈষম্যমূলক সুদের হার (differential rate of interest) প্রবর্তন করা।[১] ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি সময় হইতে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংক এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করিয়া দাম-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য, তুলা ও কার্পাস, তৈলবীজ, ডাল ও ভোজ্য তৈল, সুতীবস্ত্র, চিনি, পাট ইত্যাদি জমার বিরুদ্ধে ব্যাংকগুলি-যে ঋণ দেয়, তাহার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণ (উচ্চতর বা নিম্নতর) জামিন (margin) রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত টাকাকড়ির বাজারে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছে। কিন্তু ডক্টর এস. এন. সেন (Dr. S. N. Sen)-এর মতে, নির্বচনমূলক, ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিটির কার্যকারিতা খুবই সীমাবদ্ধ এবং অন্যান্য পরিমানগত পদ্ধতির সহযোগে ইহা প্রয়োগ না করা হইলে ইহা কার্যকর হইবে না।

৫. **ঋণ-বরাদ্দ পদ্ধতি ও নীট নগদ অনুপাত (Rationing of Credit and Net Liquidity Ratio) :** এই পদ্ধতি অনুসারে কোন ব্যাংক কি পরিমাণ ঋণ প্রদান করিতে পারিবে তাহার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংককে প্রয়োজনীয় ঋণ দেয়। ইহা ছাড়া, ব্যাংকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে কি পরিমাণ ঋণ ব্যাংক-রেটে আনিতে পারে, তাহাও স্থির করিয়া দেওয়া হয়। ভারতের ব্যাংকগুলির 'নীট নগদ-অনুপাত' (net liquidity ratio) বিচার করিয়া রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে ব্যাংক-রেটে ঋণ-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিল। ঐ অনুপাত নির্ধারিত অনুপাত অপেক্ষা কম হইলে প্রতি ১ শতাংশ কমের জন্য ব্যাংক-রেট অপেক্ষা ১ শতাংশ অধিক সুদ দিতে হইত। বিভিন্ন সময়ে 'নীট নগদ অনুপাত' বিভিন্ন পরিমাণ করা হইয়াছিল।

১ Reserve Bank of India—Functions & Working.

২ Dr S N. Sen—*Central Banking in Undeveloped Money Markets*.

১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে এই প্রথার বিলোপ করা হয় এবং ঐ সময়ে ঐ অনুপাত ছিল মোট আমানতের ৩৯ শতাংশ। ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমানে বিধিবদ্ধ নগদ অনুপাত (statutory liquidity ratio) বৃদ্ধি করা হইতেছে। ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঐ অনুপাত ৩৬ শতাংশ (মোট আমানতের) হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৩৭ শতাংশ করা হয় এবং ঐ বৃদ্ধি সালের জুলাই হইতে পুরোপুরি বলবৎ হয়।

৬ **প্রত্যক্ষ আদেশ (Direct Order) :** অন্যান্য ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে কাজ করে বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক উহাদিগকে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে আদেশ দিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে ভারতে প্রচলিত 'ক্রেডিট অনুমোদন প্রকল্প' (credit authorization scheme) উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত প্রকল্প অনুসারে কোন ঋণ-গ্রহীতাকে ১ কোটি টাকার অধিক মেয়াদী-ঋণ (term loan) মঞ্জুর করিতে হইলে ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন লইতে হয়।

৭. **নৈতিক প্রণোদন (Moral Suasion) :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে বলিয়া ঋণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য উহা অন্যান্য ব্যাংকগুলির নিকট অনুরোধ-বার্তা বা নির্দেশনামা পাঠাইয়া উহাদের বিচার-বুদ্ধির নিকট আবেদন করিতে পারে। ঋণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য রিজার্ভ ব্যাংকও মাঝে মাঝে অন্যান্য ব্যাংকের নিকট অনুরোধ বার্তা পাঠাইয়া থাকে।

উপসংহার : উপসংহারে বলা যাইতে পারে, যে সকল দেশে টাকাকড়ির বাজার উন্নত ও সুসংগঠিত হয়, যেমন—ইংল্যান্ডের টাকার বাজার—সেই সকল দেশে উপরি-উক্ত পদ্ধতিগুলি খুবই কার্যকর হয়। কিন্তু যে সকল দেশে টাকাকড়ির বাজার অনুন্নত ও অসংগঠিত, যেমন— ভারতে টাকাকড়ির বাজার—সেই সকল দেশে ঐ পদ্ধতিগুলি বিশেষত প্রথম তিনটি পদ্ধতি পুরাপুরি কার্যকর হয় **না**। এই সকল অর্থবাজারে নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অধিক কার্যকর হয়। ভারত ও অন্যান্য অনুন্নত অর্থবাজারের অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

---

১ ব্যাংকের 'নীট নগদ অনুপাত' বাহির করিতে হইলে ব্যাংকের নিজের কাছে ও রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট ও অন্যান্য ব্যাংকের নিকট যে-নগদ অর্থ জমা আছে এবং সরকারী ঋণপত্রে যে বিনিয়োগ আছে উহাদের সমষ্টি হইতে রিজার্ভ ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক ও ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক হইতে গৃহীত ঋণের মোট পরিমাণ বাদ দিতে হইত, বাদ দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা ব্যাংকটির মোট আমানতের যত শতাংশ হইবে, তাহাই হইল নীট নগদ অনুপাত।

।। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ।।

(Internationai Trade)

[আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কি ?—অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি—তুলনামূলক সুবিধা বা ব্যয়ের নীতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ—বাণিজ্য-শর্ত—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধা—বৈদেশিক বাণিজ্যের বাধা—বাণিজ্য উদ্বৃত্ত—লেনদেন-উদ্বৃত্তের হিসাবের বিষয়সমূহ—লেনদেন-উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রে ভারসাম্য—লেনদেন-উদ্বৃত্তে অসমতা সংশোধনের পদ্ধতিসমূহ ।]

আধুনিককালে অধিকাংশ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিধি দেশের মধ্যে সীমায়িত থাকে না। ব্যবসা-বাণিজ্য শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরেই সংগঠিত হয় না, উহা বহু দেশের সংগে সংগঠিত হইয়া থাকে। এই কারণে ব্যবসায়-অর্থবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্রে বহু দেশের মধ্যে যে-বাণিজ্য চলে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (international trade) তাহা আলোচনা করিতে হয় ।

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কি ? (What is International Trade ?) ঃ দেশের অভ্যন্তরে এক স্থানের সঙ্গে অপর স্থানের বা এক অঞ্চলের সহিত অন্য অঞ্চলের যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে, তাহাকে 'অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য' (domestic trade) বলে। পক্ষান্তরে, দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে বিভিন্ন বস্তু লইয়া যে ব্যবসা-বাণিজ্য সংগঠিত হয়, তাহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। যেমন—কলিকাতা ও বোম্বাই বা কলিকাতা ও মাদ্রাজের মধ্যে যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে, তাহাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। কিন্তু ভারত ও জাপান বা ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বা দুই-য়ের অধিক দেশের মধ্যে যে-বাণিজ্য চলে তাহাকে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য (foreign trade) বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। এইরূপ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যকারী দেশগুলি পরস্পর মধ্যে দ্রব্য-বিনিময় করে, এই কারণে ইহাকে অনেকেই দ্রব্য বিনিময় প্রথার একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থা (a highly organised system of barter) বলিয়া অভিহিত করে।

২. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (Domestic Trade and International Trade) ঃ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য —এই দুই প্রকার বাণিজ্যের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও উহাদের মধ্যে কয়েকটি ব্যাপারে পার্থক্য দেখা যায়। উহাদের সাদৃশ্যস্বরূপ বলা হয়, দুইপ্রকার বাণিজ্যই আঞ্চলিক বিশেষায়ণের (regional specialisation) ফলে উদ্ভব হয়। দেশের সকল অঞ্চলে সকল বস্তু উৎপাদনের ব্যাপারে সমান পারদর্শিতা বা যোগ্যতা থাকে না। যে-অঞ্চলে যে-বস্তুর ঘাটতি থাকে, তাহা অন্য উদ্বৃত্ত-অঞ্চল হইতে আনা

হয়। এই একই কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটিয়া থাকে। যে-দেশ যে-বস্তু উৎপাদনের ব্যাপারে পারদর্শী হয় না, সেই দেশ সেই বস্তুটি অন্য দেশ হইতে আমদানি করে। এইরূপ সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও এই দুই প্রকার বাণিজ্যের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে তারতম্য থাকে বলিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্লেষণের জন্য পৃথক তত্ত্বের প্রয়োজন পড়ে। এই দুই প্রকার বাণিজ্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়ঃ

প্রথমত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দেশের মধ্যেই সীমায়িত থাকে বলিয়া শ্রম ও মূলধনের বিশেষ সচলতা (mobility of labour and capital) দেখা যায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভাষাগত, রীতিনীতি, ধর্মগত, প্রথাগত, আইনগত ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারতম্যের জন্য শ্রমের ঐরূপ সচলতা দেখা যায় না। এই কারণে, অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) মন্তব্য করিয়াছেন, সকল জিনিষের মধ্যে মানুষই স্থানান্তর করা সর্বাধিক দুরূহ কাজ।[১] আবার, আন্তর্জাতিক বাধানিষেধের জন্য এক দেশ হইতে মূলধন সহজে অন্য দেশে চলিয়া যাইতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, একই দেশের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ সম্পদের যোগান, শ্রমের কার্যদক্ষতা ইত্যাদির যতটা পার্থক্য দেখা যায়, বিভিন্ন দেশের মধ্যে উহা অপেক্ষা অধিকতর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন দেশের হয়তো যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা বেশী, আবার অন্য একটি দেশের হয়তো চা বা পাট উৎপাদনের ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধা অপেক্ষাকৃত অধিক। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক বিশেষায়ণের উদ্ভব ঘটে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বস্তু উৎপাদনের ব্যাপারে 'তুলনামূলক ব্যয়' (comparative cost) বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে।

তৃতীয়ত, যে-দেশে যে-বস্তু উৎপাদন হয়, সেই দেশে প্রতিযোগিতার শক্তির জন্য সেই বস্তুটির দাম উহার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হওয়ার প্রবণতা থাকে। কিন্তু অন্য দেশে যে-বস্তু উৎপাদন হয়, তাহার দাম দেশের অভ্যন্তরে উহার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হওয়ার কোন প্রবণতা থাকে না।

চতুর্থত, একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রায় একইরূপ বিধিব্যবস্থা, ব্যাংকিং-ব্যবস্থা বা মুদ্রাব্যবস্থা বা বাণিজ্য-নীতি প্রচলিত থাকে। কিন্তু বিভিন্ন দেশে ঐগুলি একরূপ হয় না। প্রত্যেক দেশই আমদানি-রপ্তানির উপর অল্পবিস্তর বাধানিষেধ আরোপ করে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বস্তু ছাড়া মাল-চলাচলের উপর সাধারণত ঐরূপ বাধানিষেধ থাকে না।

পরিশেষে বলা যায়, দেশের অভ্যন্তরে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য একই প্রকার মুদ্রা প্রচলিত থাকে। যেমন—ভারত লেনদেনের জন্য শুধুমাত্র 'টাকা' (rupee) ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা প্রচলিত থাকে বলিয়া

---

১. "Of all sorts of luggage, man is the most difficult to be transported."
—*Adam Smith*

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একাধিক মুদ্রার প্রয়োজন পড়ে (যেমন—আমেরিকার সহিত বাণিজ্যের জন্য ডলার বা ইল্যাণ্ডের সহিত বাণিজ্যের জন্য পাউণ্ড-স্টার্লিং ইত্যাদি)। এই কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিময় (foreign exchange) এবং বিনিময়-হারের (exchange rate) সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই সমস্যা থাকে না।

উপসংহারঃ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে এই সকল পার্থক্য থাকার জন্য অর্থবিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্লেষণের জন্য পৃথক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, এই পার্থক্য বিশেষ মৌলিক নহে, উহা মাত্রাগত মাত্র। কারণ, উভয় প্রকার বাণিজ্যের ভিত্তি হইতেছে বিশেষায়ণ।

৩, **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি—তুলনামূলক সুবিধা বা ব্যয় নীতি (Basis of International Trade—The Principle of Comparative Advantage or Cost)**ঃ বলা হয়, দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে যে-বাণিজ্য চলে, তাহার মূল ভিত্তি হইতেছে আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষায়ণ বা শ্রমবিভাগ (international division of labour)। কোন ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ সকলপ্রকার কাজ করা সম্ভব নয়, কোন দেশের পক্ষে সেইরূপ সকলপ্রকার বস্তু উৎপাদন করা সম্ভব হয় না বা সহজ হয় না। যে-ব্যক্তি যে-কাজে পারদর্শী, সেই ব্যক্তি অন্য কাজ ছাড়িয়া শুধুমাত্র ঐ কাজে নিযুক্ত থাকিলে তাহার পক্ষে বিশেষায়ণ অর্জন করা সম্ভব হয়। অনুরূপভাবে কোন দেশের পক্ষে বহু বস্তু উৎপাদন করা সম্ভব হইলেও কোন বিশেষ বস্তু উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত অধিক সযোগ-সুবিধা থাকিতে পারে। ঐ দেশের পক্ষে সকল প্রকার বস্তু উৎপাদন না করিয়া ঐ বিশেষ বস্তুটি উৎপাদন করা সমীচীন হইবে।

প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্যের জন্য উৎপাদনের উপাদানগুলি সমান পরিমাণে পাওয়া যায় না, উহাদের উৎপাদন-শক্তিও বিভিন্ন দেশে সমান নয়। ইহার ফলে ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু উৎপাদনে পারদর্শিতা অর্জন করিতে পারে এবং প্রত্যেক দেশ অন্য দেশ হইতে অপেক্ষাকৃত কমদামে বস্তু আমদানি করিতে পারিবে। যেমন—ভারতে মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদনের তুলনায় চা বা পাট উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা অপেক্ষাকৃত বেশী। কিন্তু জার্মানীতে চা বা পাট উৎপাদনের তুলনায় মূলধন-দ্রব্যাদি উৎপাদনের সুযোগ-সবিধা অপেক্ষাকৃত বেশী। এইরূপ ক্ষেত্রে ভারত মূলধন-দ্রব্যাদির পরিবর্তে চা বা পাট উৎপাদন করিবে এবং জার্মানী চা বা পাটের পরিবর্তে মূলধন-দ্রব্যাদি উৎপাদন করিবে। উভয় দেশই বস্তুগুলি কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারিবে। ভারত জার্মানী হইতে অপেক্ষাকৃত কম দামে মূলধন-দ্রব্যাদি আমদানি করিবে এবং জার্মানী ভারত হইতে চা বা পাট আমদানি করিবে। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য শুরু হইলে উভয় দেশেরই লাভ হইবে। সুতরাং দেখা যায়, আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগ বা বিশেষায়ণ হইতেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি

এবং ইহার দ্বারা বাণিজ্যকারী দেশগুলি পরস্পরের মধ্যে দ্রব্য বিনিময় করে বলিয়া ইহা দ্রব্য-বিনিময় প্রথার একটি সুসংগঠিত রূপ মাত্র।

তুলনামূলক সুবিধা বা ব্যয়ের নীতি ঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া রিকার্ডো (Ricardo), মিল (Mill) প্রমুখ ক্ল্যাসিক্যাল লেখকরা 'তুলনামূলক সুবিধা বা ব্যয়ের নীতি' (Principle of Comparative Advantage or Cost) ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই নীতিটিতে বলা হয়, দুইটি দেশের মধ্যে দুইটি বস্তুর তুলনামূলক উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকিলে বাণিজ্য সম্ভব হইবে এবং ঐ বাণিজ্য উভয় দেশের পক্ষে লাভজনক হইবে।

অনুমানসমূহ ঃ তুলনামূলক ব্যয় নীতিটি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ক্লাসিক্যাল লেখকরা কতকগুলি অনুমান (assumptions) ধরিয়া লইয়াছেন ঃ

(১) দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিবে।

(২) বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দুইটি বস্তু থাকিবে অর্থাৎ উহারা কেবলমাত্র দুইটি বস্তু লইয়া বাণিজ্য করিবে।

(৩) উভয় দেশেই বস্তুর উৎপাদন-ব্যয় শ্রমিকের শ্রমের অংকে প্রকাশ করা হইবে।

(৪) উভয় দেশেই বস্তু দুইটির গড় উৎপাদন-ব্যয় স্থির (constant) থাকিবে।

(৫) দুইটি দেশের মধ্যে যে-বাণিজ্য চলিবে, তাহার জন্য কোন পরিবহণ-ব্যয় থাকিবেনা বা উহার পরিমাণ এত স্বল্প হইবে যে তাহা অপেক্ষা করা যাইবে।

এই অনুমানগুলির ভিত্তিতে তত্ত্বটিতে বলা হয়, দুইটি দেশে দুইটি বস্তুর 'উৎপাদন-ব্যয়ে সমান পার্থক্য' (equal differences in cost) থাকিলে বাণিজ্য লাভজনক হইবে না, কিন্তু ঐ 'ব্যয়ের চরম পার্থক্য' (absolute differences in cost) বা 'তুলনামূলক পার্থক্য' (comparative differences in cost) থাকিলে বাণিজ্য উভয় দেশের পক্ষে লাভজনক হইবে। দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

'ক' দেশে

১০ জনের শ্রম … উৎপাদন করে … ২০ একক পাট
১০ " … " " … ১০ " তুলা

'খ' দেশে

১০ জনের শ্রম … উৎপাদন করে … ১০ একক পাট
১০ " " … " " … ২০ " তুলা

উপরের উদাহরণে দেখা যায়, সমপরিমাণ শ্রমব্যয়ে 'খ'দেশের তুলনায় 'ক' দেশে পাট-এর উৎপাদন-ব্যয় কম এবং 'ক' দেশের তুলনায় 'খ' দেশে তুলার উৎপাদন-ব্যয় কম। এই ক্ষেত্রে 'ক' দেশে পাট ও তুলার উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাত হইতেছে

২ঃ ১। কিন্তু 'খ' দেশে উহা হইতেছে ১ঃ ২ বা ২ঃ ৪। ইহার ফলে 'ক' দেশ সম-পরিমাণ পাট-এর বিনিময়ে 'খ' দেশ হইতে অধিক তুলা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে এবং 'খ' দেশ সমপরিমাণ তুলার বিনিময়ে 'ক' দেশ হইতে অধিক পরিমাণে পাট আনিতে পারিবে। সুতরাং দেখা যায়, উৎপাদন-ব্যয়ে চরম পার্থক্য (absolute difference) থাকিলে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য যে হইবেই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু দুইটি দেশে উৎপাদন-ব্যয়ের চরম পার্থক্যের পরিবর্তে তুলনামূলক পার্থক্য (comparative difference) থাকিলেও বাণিজ্য সম্ভব হইতে পারে। ইহা নিম্নে আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখানো হইল ঃ

'ক' দেশে

১০ জনের শ্রম	···	উৎপাদন করে	···	২০ একক পাট
,, ,,	···	,, ,,	···	৪০ ,, তুলা

'খ' দেশে

১০ জনের শ্রম	···	উৎপাদন করে	···	১০ একক পাট
,, ,,	···	,, ,,	···	৩০ ,, তুলা

উপরের উদাহরণে দেখা যায়, 'খ' দেশের তুলনায় 'ক' দেশে উভয় বস্তুরে উৎপাদন-ব্যয় কম হইতেছে। ইহা সত্ত্বেও দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্ভব হইবে। কারণ দুইটি দেশে উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাতে পার্থক্য দেখা যায়। 'ক' দেশে ব্যয়ের অনুপাত হইতেছে ২ঃ ৪, কিন্তু 'খ' দেশে উহা হইতেছে ২ঃ ৬। অনুপাত দুইটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, 'ক' দেশে ২ একক পাট এর বিনিময়ে পাওয়া যায় ৪-একক তুলা, 'খ' দেশে পাওয়া যায় ৬ একক তুলা। সুতরাং পাট-এর বিনিময়ে 'খ' দেশ হইতে তুলা আনিলে 'ক' দেশ-এর লাভ হইবে। পক্ষান্তরে, 'খ' দেশে ৬ একক তুলার বিনিময়ে পাওয়া যায় ২ একক পাট, কিন্তু 'ক' দেশে পাওয়া যায় ২ এককের অধিক পাট। সুতরাং তুলার বিনিময়ে 'ক' দেশ হইতে পাট আনিলে 'খ' দেশের লাভ হইবে। এইরূপ অবস্থায় 'ক' ও 'খ' দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিলে উভয় দেশের লাভ হইবে এবং ইহা হইতে বুঝা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাভ পারস্পরিক (mutual gains) হইয়া থাকে।

সমালোচনা ঃ ক্ল্যাসিকাল লেখকদের এই বিশ্লেষণ নানাভাবে সমালোচনা করা হয়। প্রথমত, এই বিশ্লেষণে উৎপাদন-ব্যয় কেবলমাত্র শ্রমের অংকে প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রমই উৎপাদন-ব্যয়ের একমাত্র উপাদান নয়। দ্বিতীয় নীতিটিতে গড় উৎপাদন-ব্যয় স্থির (constant) থাকে এইরূপ ধরা হইয়াছে। সুতরাং ক্রম-বর্ধমান বা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করা যায় না। পরিশেষে, ক্ল্যাসিক্যাল লেখকরা নীতিটি কেবলমাত্র দুইটি দেশের মধ্যে দুইটি বস্তু লইয়া যে

বাণিজ্য চলে, সেইরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছে। সুতরাং বহু দেশের মধ্যে বহু বস্তু লইয়া যে বাণিজ্য চলে সেই ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করা যায় না।

নীতিটির আধুনিক বিশ্লেষণঃ আধুনিককালের লেখকরা নীতিটি সংশোধন করিয়া ইহার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহারা উৎপাদন-ব্যয়কে শ্রমের অংকে প্রকাশ না করিয়া টাকাকড়ির অংকে (প্রান্তিক ব্যয়ের বা সুযোগ ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে) প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, দুই-এর অধিক দেশের মধ্যে দুই-এর অধিক বস্তু লইয়া যে-বাণিজ্য চলে, সেইরূপ ক্ষেত্রেও তাঁহারা নীতিটি প্রয়োগ করিয়াছেন।

সংশোধিত নীতিটি বহু দেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। বহু দেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে-দেশের বাণিজ্য বিবেচনা করা হয়, সেই দেশকে একটি দেশ এবং অন্যান্য দেশগুলির সংগে যে-বাণিজ্য চলে, সেইগুলিকে একত্র করিয়া দ্বিতীয় দেশ ধরা হইবে। এইরূপ সংশোধন করা হইলে তুলনামূলক ব্যয় নীতিটি দ্বারা বহু দেশের বাণিজ্য বিশ্লেষণ করা যায়। তবে এইরূপ ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের সঙ্গে কোন দেশের আমদানির-রপ্তানির সমতা না থাকিলেও চলে, শুধুমাত্র সামগ্রিকভাবে আমদানি-রপ্তানির সমতা থাকিলেই বাণিজ্য চলিতে পারে।

আবার, সংশোধিত নীতিটি বহু দ্রব্যের বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। দুইটি দেশে যখন বহু দ্রব্য উৎপাদন করা যায়, তখন ঐ দ্রব্যগুলিকে আপেক্ষিক সুবিধা অনুসারে অবরোহণ পর্যায়ে (descending order) সাজাইতে হইবে। নিম্নের উদাহরণ দ্বারা বুঝানো হইল ঃ

গম | চিনি | চা | কাপড় | যন্ত্রপাতি

'ক' দেশ ←——————————————→ 'খ' দেশ

উপরের উদাহরণে দেখা যায়, পাঁচটি দ্রব্যই 'ক' এবং 'খ' উভয় দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব হইলেও 'ক' দেশের সর্বাধিক সুবিধা হইতেছে 'গম' উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং 'খ' দেশের সর্বাধিক সুবিধা হইতেছে 'যন্ত্রপাতি' নির্মাণের ক্ষেত্রে। এইরূপ অবস্থায় 'ক' দেশ গম উৎপাদনে বিশেষায়ণ অর্জন করিয়া উহা 'খ' দেশে রপ্তানি করিবে। পক্ষান্তরে, 'খ' দেশ 'যন্ত্রপাতি' নির্মাণে বিশেষায়ণ অর্জন করিয়া উহা 'ক' দেশে রপ্তানি করিবে। অন্যান্য বস্তুগুলির ব্যাপারে কোন দেশের আমদানি বা রপ্তানি ঐ দ্রব্যগুলির বিশ্ব-চাহিদা (world demand) এবং বাণিজ্য-শর্তের (terms of trade) উপর নির্ভর করিবে। বাণিজ্য-শর্ত অনুকূল হইলে কোন দেশ কমসংখ্যক বস্তু রপ্তানি করিয়া অধিকসংখ্যক বস্তু আমদানি করিতে পারিবে। পক্ষান্তরে, বাণিজ্য-শর্ত প্রতিকূল হইলে আমদানির জন্য উহাকে অধিকসংখ্যক বস্তু রপ্তানি করিতে হইবে।

উপসংহারঃ ক্ল্যাসিকাল লেখকদের দ্বারা বর্ণিত তুলনামূলক ব্যয় নীতিটি আধুনিক লেখকদের দ্বারা সংশোধিত হওয়ার পর বর্তমান যুগেও উহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সন্তোষজনক বিশ্লেষণ বলিয়া গণ্য হইতেছে।

৪. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ (Gains from International Trade) : কোন দেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য করিয়া যে-লাভ ভোগ করে, তাহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করিয়া যে-পরিমাণ দ্রব্য পাওয়া যায় এবং বাণিজ্য ব্যতীত যে-পরিমাণ দ্রব্য পাওয়া যায়—এই দুইয়ের মধ্যে যে-পার্থক্য, তাহাই হইতেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভের বাস্তব পরিমাপ। এখানে উল্লেখ করিতে হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ পারস্পরিক (mutual) হইতেই হইবে ; অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির প্রত্যেকেরই লাভ হইতে হইবে। বিভিন্ন দেশ এই বাণিজ্য হইতে যে-পরিমাণ লাভ অর্জন করিতে পারে, তাহা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে ঃ

ক. **বস্তুর উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাত ঃ** তুলনামূলক ব্যয় নীতি অনুসারে দুইটি দেশে দ্রব্যগুলির উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে তারতম্য থাকিলেই উহাদের মধ্যে বাণিজ্য দেখা দেয়। ধরা যাউক, পাট ও তুলার উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাত 'ক' দেশে ও 'খ' দেশে যথাক্রমে ২ ঃ ৩ এবং ২ ঃ ৮। উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে এইরূপ তারতম্যের ফলে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য দেখা দিবে এবং এই ব্যয়ের অনুপাতের দুই সীমার মধ্যে দ্রব্য-বিনিময় চলিবে। সুতরাং, এই ব্যয়ের অনুপাতকে ভিত্তি করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে উভয় দেশের লাভ পরিমাপ করা হয়।

খ. **বাণিজ্য-শর্ত ঃ** যে-হারে দুইটি দেশের মধ্যে দুইটি দ্রব্যের বিনিময় চলে, তাহাকে বাণিজ্য-শর্ত (terms of trade) বলে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ বাণিজ্য-শর্তের উপর নির্ভর করে। ধরা যাউক, চুক্তি অনুযায়ী 'ক' ও 'খ' দেশ দুইটি ২ একক পাটের পরিবর্তে ৫ একক তুলা বিনিময় করিতে রাজী হইল—অর্থাৎ বাণিজ্য-শর্ত হইল ২ ঃ ৫। এই শর্ত অনুযায়ী 'ক' দেশের লাভ হইবে ২ একক তুলা, কারণ 'ক' দেশে ২ একক পাটের বিনিময়ে পাওয়া যায় মাত্র ৩ একক তুলা। পক্ষান্তরে, 'খ' দেশ ৩ একক তুলা সাশ্রয় করিতে পারিবে। কারণ 'খ' দেশে ২ একক পাট ক্রয় করিতে প্রয়োজন পড়ে ৮ একক তুলার। ইহা সহজেই অনুমান করা যায়, এই বাণিজ্য-শর্তের পরিবর্তন ঘটিলে উভয় দেশের লাভের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিবে।

গ. **পারস্পরিক চাহিদা ঃ** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ পারস্পরিক চাহিদার (reciprocal demand) উপরও নির্ভর করে। 'পারস্পরিক চাহিদা' বলিতে একদেশে অপর দেশের দ্রব্যটির চাহিদাকেই বুঝায়। পারস্পরিক চাহিদার পরিবর্তন ঘটিলে (অর্থাৎ 'ক' দেশে তুলার চাহিদা হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইলে) বাণিজ্য-শর্তের পরিবর্তন ঘটে এবং উহার ফলে লাভের পরিমাণেরও পরিবর্তন ঘটিবে।

ঘ. **আমদানি-পণ্য ও রপ্তানি-পণ্যের দামের অনুপাত ঃ** এই অনুপাতও আন্ত-র্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দেয়। আমদানি-পণ্যের তুলনায় রপ্তানি-পণ্যের দাম যত অধিক হয়, বাণিজ্য-শর্ত তত দেশের পক্ষে অনুকূল

হইবে এবং উহার ফলে লাভের পরিমাণও বেশী হইবে। ইহার বিপরীতক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ কম হইবে।

ঙ. **বাণিজ্যের আয়তন**ঃ ক্ল্যাসিক্যাল লেখকদের মতে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ, বাণিজ্যের মোট আয়তনের উপর নির্ভরশীল। বাণিজ্যের আয়তন যত বেশী হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ তত বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

চ. **বাণিজ্যকারী দেশগুলির আয়তন**ঃ বাণিজ্যকারী একটি দেশের তুলনায় অন্য দেশটির আয়তন ক্ষুদ্রতর হইলে ক্ষুদ্র দেশটির রপ্তানি বেশী ও আমদানি কম হয় বলিয়া উহার লাভের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। পক্ষান্তরে, যে-দেশটির আয়তন অপর দেশের আয়তনের তুলনার বড় হয়, তাহার রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশী হয় বলিয়া লাভের পরিমাণ কম হয়।

সুতরাং দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে উদ্ভুত লাভের পরিমাণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

৫. **বাণিজ্য-শর্ত (Terms of Trade)**ঃ বাণিজ্য-শর্ত সম্বন্ধে কিছু আভাষ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। এখন ইহা বিশদভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের যে-বিনিময় হার নির্ধারিত হয়, তাহাকেই বাণিজ্য-শর্ত বলা হয়। হ্যানসন্ (Hanson)-এর ভাষায় বলা যায়, যে-হারে বা অনুপাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দ্রব্যগুলির বিনিময় হয় সেই হার বা অনুপাতই (ratio) হইল বাণিজ্য-শর্ত (By terms of trade we mean the rate at which one country's commodities exchange for those of another —*Hanson*)। সংক্ষেপে বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে-হারে কোন দেশ উহার রপ্তানির বিনিময়ে আমদানি পাইয়া থাকে তাহাই হইতেছে বাণিজ্য-শর্ত।

বাণিজ্য-শর্ত বিবেচনার সময় কোন দেশের মোট আমদানি ও মোট রপ্তানি বিবেচনা করিতে হয় এবং উহার জন্য আমদানি-দ্রব্যের মূল্য-স্তর ও রপ্তানি-দ্রব্যের মূল্য-স্তরের মধ্যে তুলনা করিতে হয়। সমীকরণের ভাষায় বাণিজ্য-শর্তকে নিম্নলিখিত ভাবে দেখানো হয়ঃ

$$\text{বাণিজ্য-শর্ত} = \frac{\text{আমদানির মোট মূল্য}}{\text{রপ্তানির মোট মূল্য}}$$

সমীকরণটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, আমদানি ও রপ্তানি যখন সমান হয়, তখন

$$\text{বাণিজ্য-শর্ত} = \frac{\text{আমদানির দাম}}{\text{রপ্তানির দাম}}$$

ইহা খুবই স্পষ্ট, আমদানির দামে ও রপ্তানির দামে পরিবর্তন ঘটিলে বাণিজ্য-শর্তেরও পরিবর্তন ঘটিবে।

বাণিজ্য-শর্ত কিভাবে নির্ধারিত হয় ? : বাণিজ্য-শর্ত নির্ধারণের বিষয়টি একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক—'ক' দেশে পাট ও তুলার অভ্যন্তরীণ বিনিময়-হার হইতেছে ২ : ৩ অর্থাৎ 'ক' দেশে সমপরিমাণ উৎপাদন-ব্যয়ে ২ একক পাট বা ৩ একক তুলা উৎপাদন করা যায়। পক্ষান্তরে, 'খ' দেশে পাট ও তুলার অভ্যন্তরীণ বিনিময়-হার হইতেছে ২ : ৮। অর্থাৎ 'খ' দেশে সমপরিমাণ উৎপাদন-ব্যয়ে ২ একক পাট বা ৮ একক তুলা উৎপাদন করা যায়। বলা হয়, 'ক' ও 'খ' দেশের মধ্যে বাণিজ্য-শর্ত উহাদের অভ্যন্তরীণ বিনিময়-হারের এই দুই সীমার মধ্যে স্থির হইবে—অর্থাৎ ২ : ৩ এবং ২ : ৮—এই দুই সীমার মধ্যে কোন একটি স্থানে বাণিজ্য-শর্ত স্থির হইবে। প্রকৃতপক্ষে ঐ শর্ত কোন্ স্থানে স্থির হইবে, তাহা নির্ভর করে পরস্পরের দ্রব্যের চাহিদা অর্থাৎ পারস্পরিক চাহিদার (reciprocal demand) উপর। 'ক' দেশে তুলার চাহিদা অধিক এবং 'খ' দেশে পাটের চাহিদা কম হইলে 'ক' দেশকে বেশী পরিমাণ পাট দিয়া 'খ' দেশ হইতে তুলা আনিতে হইবে অর্থাৎ বাণিজ্য-শর্ত ২ : ৩-এর কাছাকাছি কোন স্থানে স্থির হইবে এবং উহার ফলে 'ক' দেশের লাভ অপেক্ষাকৃত কম হইবে। আবার, 'খ' দেশে পাট-এর চাহিদা কম হওয়ায় ইহা অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ তুলার বিনিময়ে 'ক' দেশ হইতে অধিক পরিমাণে পাট আনিতে পারিবে। বিপরীতক্ষেত্রে, অর্থাৎ, 'ক' দেশে তুলার চাহিদা কম এবং 'খ' দেশে পাট-এর চাহিদা বেশী হইলে বাণিজ্য-শর্ত ২ : ৮ অনুপাতের কাছাকাছি কোন স্থানে স্থির হইবে এবং উহার ফলে 'খ' দেশের লাভ অপেক্ষাকৃত কম হইবে।

সুতরাং দেখা যায়, বাণিজ্য-শর্ত মূলত পারস্পরিক চাহিদার (অর্থাৎ, আমদানি ও রপ্তানির পারস্পরিক চাহিদা) উপর নির্ভর করে। ইহা খুবই স্পষ্ট, পারস্পরিক চাহিদার পরিবর্তন ঘটিলে বাণিজ্য-শর্তের পরিবর্তন ঘটিবে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, পারস্পরিক চাহিদা প্রধানত আমদানি ও রপ্তানির দামের উপর নির্ভর করে।

বাণিজ্য-শর্তের গুরুত্ব : কোন দেশের অর্থব্যবস্থায় বাণিজ্য-শর্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্য-শর্ত প্রতিকূল হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে কোন দেশের লাভের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। উহার ফলে একদিকে যেমন সমপরিমাণ আমদানির জন্য পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে রপ্তানি করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি দেশে আয়-স্তর হ্রাস পাইবে। যেমন, পাটের কোন বিকল্প বাহির হইলে সারা বিশ্বে পাটের চাহিদা কমিয়া যাইবে এবং বিশ্বের বাজারে পাট-এর দাম হ্রাস পাইবে। ইহার ফলে ভারতে পাটদ্রব্য-উৎপাদনকারীদের আয় হ্রাস পাইবে এবং পাট-উৎপাদনকারীদেরও আয় কমিয়া যাইবে। এই কারণে পাটশিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের মজুরি ও বেতন হ্রাস পাইবে এবং উহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অন্য শিল্পে কর্মীদের মজুরি ও বেতন হ্রাস পাওয়ার আশংকা দেখা দিবে।

পক্ষান্তরে, বাণিজ্য-শর্ত কোন দেশের অনুকূলে আসিলে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি

পাওয়ায় সামগ্রিকভাবে দেশে আয়, কর্মসংস্থান ও মজুরি বাড়িয়া যাইবে। এই কারণে বেনহাম (Benham) মন্তব্য করিয়াছেন, কোন দেশে মাথাপিছু প্রকৃত আয় প্রধানত মাথাপিছু উৎপাদন ও অংশত বাণিজ্য-শর্তের উপর নির্ভর করে (The real income per head of a country depends mainly on its output per head and partly on its terms of trade—*Benham*)।

৬. **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of International Trade)**ঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কতকগুলি সুবিধা ও অসুবিধা দেখা যায়। প্রথমে ইহার **সুবিধাগুলি** আলোচনা করা হইল ঃ

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষায়ণ (international specialisation) সৃষ্টি করে। যে-দেশে যে বস্তুর উৎপাদনের ব্যাপারে অধিক সুযোগ-সুবিধা থাকে, সেই দেশ সেই বস্তু উৎপাদন করে বলিয়া প্রত্যেকটি দেশ নিজস্ব সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী বস্তু উৎপাদন করে এবং ইহার ফলে বাণিজ্যকারী প্রত্যেক দেশের পক্ষে বিশেষায়ণের সুবিধা ভোগ করা সম্ভব হয়।

খ. প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী প্রত্যেকটি দেশ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করে বলিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়। ইহার ফলে কম উৎপাদন-ব্যয়ে উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করা যায়।

গ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শ্রমিকদের উপার্জন বৃদ্ধি করে। শ্রমিকরা সমৃদ্ধ রপ্তানি-শিল্পে নিযুক্ত থাকে বলিয়া তাহাদের উপার্জন বৃদ্ধি পায় এবং উহার ফল-স্বরূপ অন্যান্য শিল্পেও মজুরি-বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়।

ঘ. বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিলে প্রত্যেক দেশই বিভিন্ন দ্রব্যের ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ হইতে কম দামে উহা আমদানি করিতে পারে। যেমন—অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির ঘাটতি-পূরণের জন্য আমাদের দেশ বিদেশ হইতে ঐগুলি যথাসম্ভব কম দামে প্রয়োজনীয় পরিমাণে আমদানি করিতেছে।

ঙ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠিত হওয়ায় বাণিজ্যকারী দেশগুলি বিদেশ হইতে নানারূপ উচ্চমানের দ্রব্য অপেক্ষাকৃত কম দামে আমদানি করিতে পারে।

চ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য বাণিজ্যকারী দেশগুলিকে সমগ্র বিশ্বের চাহিদা-পূরণের জন্য উৎপাদন করিতে হয় বলিয়া মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। আবার অপেক্ষাকৃত কম দামে বিদেশী দ্রব্য আমদানী করা যায় বলিয়া মোট ভোগের পরিমাণও বাড়িয়া যায়।

ছ. ভারতের ন্যায় বিকাশশীল দেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্নয়নের বিশেষ সহায়ক হয়। উন্নয়ন-প্রকল্প রূপায়ণের জন্য একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কারিগরী কৃৎকুশলতা ও সাজসরঞ্জাম আমদানি করা যায়, অন্যদিকে তেমনি

নূতন নূতন শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যগুলি বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হয়। ইহার ফলে উন্নয়নের গতি তরান্বিত করা যায়।

জ. পরিশেষে বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং উহা বিশ্বমৈত্রীর (world peace) বিশেষ সহায়ক হয়।

কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নানারূপ **অসুবিধা** দেখা দেয় ঃ

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দেশের পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে। যুদ্ধ বা জরুরী পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ঘাটতি সৃষ্টি করিতে পারে এবং উহার ফলে দেশের অর্থব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া থাকে।

খ. অবাধে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা চলিতে থাকিলে বিনাবাধায় বিদেশী দ্রব্যের আমদানি চলিবে। ইহার ফলে দেশীয় শিল্প বিনষ্ট হইতে পারে। বিদেশী দ্রব্যাদি অভ্যন্তরীণ বাজারে অবাধে আসিলে দেশীয় দ্রব্যাদি উহাদের সহিত প্রতি-যোগিতায় দাঁড়াইতে সক্ষম না-ও হইতে পারে। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শিল্প-প্রসারের পথে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করে।

গ. বিদেশী দ্রব্যাদির অবাধ আমদানি দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতে পারে। স্বাধীনতার পূর্বে ব্রিটেন হইতে উৎপাদিত-দ্রব্যাদি বিশেষত ভোগ্যপণ্য অবাধে আমদানি করা হইত। ইহার ফলে ভারতের বহু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

ঘ. বাণিজ্যকারী দেশগুলির পারস্পরিক আয়তন অসমান হইলে লাভের পরিমাণ সমান হয় না এবং উহার ফলে সম্পূর্ণ বিশেষায়ণও সম্ভব হয় না।

ঙ. অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থাকিলে বিদেশ হইতে কোন দেশ নানারূপ অনিষ্টকর ও ব্যয়বহুল বিলাসদ্রব্যাদি আমদানি করিতে পারে। উহা দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হইবে।

চ. পরিশেষে উল্লেখ করা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কোন কোন সময় বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করিয়া থকে।

উপসংহার ঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নানারূপ অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আধুনিককালে ইহা সকল দেশের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

৭. **বৈদেশিক বাণিজ্যের বাধা (Barriers to Foreign Trade) ঃ** বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানারূপ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে বাধা সৃষ্টি হইতে পারে।

প্রথমত, রপ্তানিবাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হইতেছে রপ্তানি-পণ্যের অনিয়মিত যোগান এবং উহার গুণগত মানের অবনতি। যে-সকল বস্তু কোন দেশ রপ্তানি করে, বিদেশের চাহিদা পূরণের জন্য সেই সকল বস্তুর উৎপাদনের গতি অব্যাহত রাখিতে হয়। ইহা ছাড়া ঐ সকল বস্তুর গুণগত মানের যাহাতে অবনতি না ঘটে, সেই দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হয়। রপ্তানি-পণ্যের মান হ্রাস পাইলে বিদেশের বাজারে

উহার চাহিদা হ্রাস পায় এবং প্রতিযোগী দেশগুলির উচ্চমানের দ্রব্যাদি রপ্তানি করিলে ঐ বাধা তীব্রতর হয়।

দ্বিতীয়ত, রপ্তানি-পণ্যের বিকল্প দ্রব্য বাহির হইলে উহার চাহিদা হ্রাস পায় বলিয়া রপ্তানি-বাণিজ্যের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। যেমন—পাটের বিকল্প বাহির হওয়ায় উহার আন্তর্জাতিক চাহিদা হ্রাস পাইতেছে এবং উহার ফলে পাট-রপ্তানির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হইয়াছে।

তৃতীয়ত, দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে বৈদেশিক বাণিজ্যের পথে বাধা সৃষ্টি হইতে পারে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যাদির দাম বিশেষত রপ্তানি-পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশের বাজারে উহার চাহিদা হ্রাস পাইতে পারে। বিদেশে বা অন্যান্য প্রতিযোগী দেশে কোনরূপ মুদ্রাস্ফীতি না ঘটিলে ঐ বাধা তীব্রতর হয়।

চতুর্থত, বাণিজ্যকারী দেশগুলি কর্তৃক গৃহীত নীতির ফলেও বৈদেশিক বাণিজ্যের পথে নানারূপ বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি হয়। আমদানি ও রপ্তানির উপর বাণিজ্য-কারী দেশগুলি নানারূপ বাধানিষেধ (যেমন—আমদানি-রপ্তানি শুল্ক বৃদ্ধি, আমদানি কোটা, বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) আরোপ করিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মোট আয়তন হ্রাস পায়। দেশের সংরক্ষণ (protection) বা শুল্কনীতিও (tariff policy) বাধা সৃষ্টি করে।

পঞ্চমত, আমদানি-পণ্যের স্বল্প যোগান ও বৈদেশিক মুদ্রার অভাব আমদানি-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। আমদানি-পণ্যের স্বল্প যোগান ও বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের জন্য কোন দেশ প্রয়োজনীয় পরিমাণে দ্রব্যাদি আমদানি করিতে পারে না। ইহা ছাড়া, বিদেশে মুদ্রাস্ফীতির জন্য আমদানি-পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাইলে আমদানি-বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে।

ষষ্ঠত, যুদ্ধ বা আন্তর্জাতিক বিরোধের ফলে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিন্ন হয় বলিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয়।

পরিশেষে বলা যায়, রাজনৈতিক কারণেও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা দেখা দিতে পারে। যেমন—পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ থাকার জন্য বহু বৎসর ঐ দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য বন্ধ ছিল।

উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের বাধাবিঘ্ন হয়। অবশ্য আধুনিককালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি (যেমন, আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার ইত্যাদি) এই সকল বাধাবিঘ্ন অপসারণের চেষ্টা করে।

১ বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে দেশের শিল্পকে রক্ষা করার জন্য যে নীতি অনুসরণ করা হয় তাহাকে সংরক্ষণ (protection) নীতি বলা হয়। এই সংরক্ষণের দ্বারা আমদানি-দ্রব্যের উপর চড়া হারে শুল্ক ধার্য করা হয় বা দেশীয় শিল্পকে ভরতুকী (subsidies) দেওয়া হয়। শিশু শিল্পের সংরক্ষণ, শিল্পের বৈচিত্র্যকরণ, প্রতিরক্ষা শিল্পের সংরক্ষণ, জাতীয় উন্নয়ন ইত্যাদি কারণে দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হয়।

ইহা ছাড়া, বাণিজ্যকারী দেশগুলিও নানারূপ চুক্তির মাধ্যমে ঐ বাধাবিঘ্নগুলি সীমায়িত করিতেছে।

৮। বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ও লেনদেন-উদ্বৃত্ত (Balance of Trade and Balance of Payments)ঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ও বৈদেশিক লেনদেন-উদ্বৃত্ত—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়কালে (সাধারণত এক বৎসরে) কোন দেশের আমদানির মোট মূল্য এবং রপ্তানির মোট মূল্যের মধ্যে যে-সম্পর্ক থাকে তাহাকে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (balance of trade) বলা হয়। আমদানির মোট মূল্য অপেক্ষা রপ্তানির মোট মূল্য অধিক হইলে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত দেশের অনুকূল (favourable balance of trade) হয় অর্থাৎ রপ্তানি-উদ্বৃত্ত (export surplus) দেখা যায়। পক্ষান্তরে, রপ্তানির মোট মূল্য অপেক্ষা আমদানির মোট মূল্য অধিক হইলে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত দেশের প্রতিকূল (unfavourable balance of trade) হয় অর্থাৎ আমদানি-উদ্বৃত্ত (import surplus) দেখা যায়। বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের হিসাবে কোন দেশের শুধুমাত্র দৃশ্য-আমদানি ও দৃশ্য-রপ্তানি (visible imports and visible exports) বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ, এই হিসাবে কেবলমাত্র দ্রব্যসামগ্রীর সেবাকার্য নয়) আমদানি-রপ্তানি বিবেচনা করা হয়। দৃশ্য-আমদানি (visible imports) বলিতে দ্রব্য-সামগ্রীর (goods) আমদানি বুঝায়। যেমন—আমাদের দেশের 'দৃশ্য-আমদানি' হইতেছে খাদ্যশস্য, মূলধন সাজসরঞ্জাম, কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্য প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী। আবার, 'দৃশ্য-রপ্তানি' (visible exports) বলিতে দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানিকে বুঝায়। যেমন—আমাদের দেশ পাটজাত দ্রব্যাদি, চা, তুলাবস্ত্র, চিনি প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে। সরকারের শুল্ক-বিভাগে (Customs Department) এই দৃশ্য আমদানি-রপ্তানির হিসাব নথিভুক্ত করা হয়। কোন নির্দিষ্ট সময়কালে যখন দৃশ্য-আমদানির মোট মূল্য দৃশ্য-রপ্তানির মোট মূল্যের সমান হয়, তখন বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের সমতা আসে।

পক্ষান্তরে, লেনদেন-উদ্বৃত্ত (balance of payments) হইতেছে কোন নির্দিষ্ট সময়কালে (সাধারণত এক বৎসরে) পৃথিবীর অন্য সকল দেশগুলির সঙ্গে কোন দেশের আর্থিক লেনদেনের (monetary transactions) একটি সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ হিসাব।[১] আমদানির মূল্য প্রদানের জন্য যে-লেনদেন হয়, তাহা এই হিসাবের দেনার (debit) দিকে এবং রপ্তানির মূল্য গ্রহণের জন্য যে-লেনদেন হয়, তাহা পাওনার (credit) দিকে দেখানো হয়। লেনদেন-উদ্বৃত্তের হিসাবে শুধু আমদানি-রপ্তানির দৃশ্য বিষয়গুলি (visible items of imports and exports) ধরা হয় না, এই হিসাবে আমদানি-রপ্তানির অদৃশ্য বিষয়গুলিও (invisible items of imports and exports) একযোগে ধরিতে হয়। সুতরাং দেখা যায়, লেনদেন-উদ্বৃত্তের

১. "The balance of payment of a country is a record of its all money transactions, over a period, with the rest of the world."—*Benham*

হিসাব হইতে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে পৃথিবীর অন্য দেশগুলির সহিত কোন দেশের অর্থসংক্রান্ত লেনদেনের একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়।

৯. **লেনদেন-উদ্বৃত্তের হিসাবের বিষয়সমূহ (Items entering into Balance of Payments)** ঃ পূর্বের অংশে উল্লেখ করা হইয়াছে, লেনদেন-উদ্বৃত্তের হিসাবে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখন দেখা যাউক, ঐ বিষয়গুলি কি ?

ক. বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের হিসাবের মতো লেনদেন-উদ্বৃত্তের হিসাবে দৃশ্য আমদানি ও দৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্য অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি-রপ্তানির মোট মূল্য ধরিতে হয়।

খ. দৃশ্য বিষয়গুলি ছাড়া লেনদেন-উদ্বৃত্তের হিসাবে আমদানি-রপ্তানির অদৃশ্য বিষয়গুলিও (invisible items) ধরা হয়। অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানি বলিতে নানারূপ সেবাকার্যের (services) আমদানি-রপ্তানিই বুঝায়। যেমন—দেশের জাহাজ কোম্পানী, বীমা কোম্পানী, ব্যাংক প্রভৃতি বিদেশ হইতে যে-টাকা উপার্জন করে, তাহা আমাদের দেশেই চলিয়া আসে। সুতরাং, ইহা হইতেছে অদৃশ্য রপ্তানি। অনুরূপভাবে, বিদেশীরা আমাদের দেশে আসিয়া দেশভ্রমণের জন্য টাকা খরচ করে বা বিদেশী ছাত্রছাত্রী আমাদের দেশে থাকিয়া পড়াশুনা করে বা আমাদের দেশ অন্য দেশকে যে ঋণ দেয়, তাহার উপর সুদ পাওয়া যায় প্রভৃতি অদৃশ্য রপ্তানির বিষয়। পক্ষান্তরে, বিদেশী জাহাজী কোম্পানী বা বীমা কোম্পানী বা ব্যাংক আমাদের দেশ হইতে উপার্জনের টাকা বিদেশে পাঠায়, অথবা আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা বিদেশে শিক্ষা-গ্রহণের জন্য যায় ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ের জন্য দেশ হইতে বিদেশে টাকাকড়ি চলিয়া যায়। এইগুলি হইতেছে অদৃশ্য আমদানির বিষয়। লেনদেন-উদ্বৃত্তের হিসাবে এই সকল অদৃশ্য রপ্তানি ও অদৃশ্য আমদানির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গ. লেনদেন-উদ্বৃত্ত হিসাবের অন্য একটি বিষয় হইতেছে মূলধনের গমনাগমন (inflow and outflow of capital)। সরকারী ও বেসরকারী ঋণের গমনাগমন, শেয়ারপত্র, ঋণপত্র প্রভৃতির আমদানি ও রপ্তানি এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়।

ঘ. ইহা ছাড়া, পূর্বে বৈদেশিক লেনদেন দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য স্বর্ণের যে-আমদানি-রপ্তানি হইত তাহাও এই হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইত। বর্তমানে অবশ্য স্বর্ণের অবাধ আমদানি-রপ্তানি একরূপ নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হইতে বৈদেশিক দেনা-পাওনার হিসাব মিটানো হয়।

১০. **লেনদেন-উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (Equilibrium in the Balance of Payments)** ঃ হিসাবের দিক হইতে লেনদেন-উদ্বৃত্তে সবসময়ই সমতা দেখানো হয় (balance of payments always balances)। ইহার অর্থ হইল, লেনদেন-উদ্বৃত্তের দেনার পরিমাণ ও পাওনার পরিমাণ সকল সময় সমান হইয়া থাকে। হিসাব-শাস্ত্রে যে-রূপ মোট দেনা (debit) ও মোট পাওনা (credit) সমান করিয়া দেখানো

হয়, লেনদেন-উদ্বৃত্তের হিসাবেও ঐভাবে সবসময়ই উহা সমান দেখানো হয়। একটি উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝানো যাইতে পারে।

ধরা যাউক, কোন বৎসরে কোন দেশের মোট দৃশ্য রপ্তানির পরিমাণ হইল ৩০০ কোটি টাকা এবং দৃশ্য আমদানির পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকা। সুতরাং বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের হিসাবে ঘাটতি হইবে ১০০ কোটি টাকা। আরও ধরা যাউক, সেই বৎসরে সেই দেশের নীট অদৃশ্য পাওনার পরিমাণ হইল ২৫ কোটি টাকা। সুতরাং শেষে নীট ঘাটতি হইল ৭৫ কোটি টাকা। এই ঘাটতি পূরণের জন্য ৭৫ কোটি টাকা বিদেশ হইতে ঋণ করিতে হইবে এবং ঐ ৭৫ কোটি টাকা ঋণ হিসাবের খাতায় পাওনার দিকে দেখানো হইবে। সুতরাং দেখা যায়, দেনার দিকে মোট পরিমাণ ছিল ৪০০ কোটি টাকা এবং পাওনার দিকেও মোট পরিমাণ হইল ৪০০ কোটি টাকা। ইহার ফলে, লেনদেন-উদ্বৃত্তে সমতা আসিবে।

পক্ষান্তরে, কোন বৎসর আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ বেশী হইলে বিদেশকে ধার দিতে হয় এবং সেই টাকা দেনার খাতে দেখানো হইবে। কারণ ঐ টাকা দেশ হইতে বাহিরে চলিয়া যায়। অবশেষে মোট দেনা ও পাওনা পরস্পর সমান হইবে।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে, লেনদেন-উদ্বৃত্তে যে-সমতা দেখানো হয় তাহা শুধু নিছক হিসাব রাখার জন্যই। প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের লেনদেন-উদ্বৃত্তে ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে। শুধু যখন মোট দেনা ও মোট পাওনা বাস্তবিকই সমান হইবে শুধু তখনই লেনদেন-উদ্বৃত্তে ভারসাম্য (equilibrium) আসিবে।

রপ্তানি ও আমদানি সমতা ঃ লেনদেন উদ্বৃত্তের ভারসাম্য সম্বন্ধে অনেক সময় বলা হয়, প্রত্যেক দেশের মোট রপ্তানি উহার মোট আমদানির সমান হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায় (exports tend to equal imports)। আবার অনেক সময় ঐ একই অর্থে বলা হয়, কোন দেশের রপ্তানির দ্বারা ঐ দেশের আমদানি দেনা পরিশোধ করা হয় (our exports pay for our imports)। অবশ্য এখানে আমদানি ও রপ্তানি বলিতে দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় প্রকার আমদানি-রপ্তানি ধরা হয়। এই বিশেষ অর্থে কিভাবে লেনদেন উদ্বৃত্তে ভারসাম্য বজায় থাকে বা ভারসাম্যের অভাব ঘটিলে কিভাবে স্বয়ংক্রিয় উপায়ে পুনরায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সম্পর্কে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রথম মতবাদটিকে ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদ এবং দ্বিতীয়টিকে আধুনিক মতবাদ বলা হয়।

ক. ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদ ঃ রিকার্ডো (Ricardo) প্রমুখ ক্ল্যাসিক্যাল লেখকদের মতে, স্বর্ণের আমদানি-রপ্তানি ও দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে সমতা বজায় থাকে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, 'ক' দেশে আমদানির পরিমাণ উহার রপ্তানি অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। এবং 'খ' দেশে রপ্তানির আধিক্য (export surplus) ঘটিয়াছে। এমতাবস্থায় দুইটি দেশে স্বর্ণমান (gold standard) বজায় থাকার জন্য 'ক' দেশ হইতে স্বর্ণ 'খ' দেশে চলিয়া যাইবে। 'খ' দেশে স্বর্ণ আসায় টাকাকড়ির যোগান খুব বৃদ্ধি পাইবে। কারণ টাকাকড়ির পরিমাণ স্বর্ণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। 'খ' দেশে টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে 'খ'

দেশ পূর্বের ন্যায় আর অধিক রপ্তানি করিতে পারিবে না। পরিশেষে, 'খ' দেশের রপ্তানি হ্রাস পাইয়া উহার আমদানির সমান হইবে। বিপরীত দিকে, 'ক' দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাওয়ায় ঐ দেশে টাকাকড়ির যোগান হ্রাস পাইবে, দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইবে, 'খ' দেশে 'ক' দেশের দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং অবশেষে 'ক' দেশের রপ্তানি বাড়িয়া গিয়া উহার আমদানির সমান হইবে।

কিন্তু আধুনিক লেখকরা এই মতবাদ মানিয়া লহেন না। তাহাদের মতে, এই মতবাদটি দুইটি কারণে ভ্রান্তিমূলক। প্রথমত, এই মতবাদে ধরা হইয়াছে, টাকাকড়ির পরিবর্তন ঘটিলে দ্রব্যমূল্যেরও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটিবে। কিন্তু ইহা সব সময়ই সত্য নহে। দ্বিতীয়ত, এই মতবাদে দুইটি দেশেই স্বর্ণমানের প্রচলন ধরা হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক যুগে স্বর্ণমান আর দেখা যায় না।

খ. আধুনিক মতবাদ ঃ মিসেস্ রবিনসন্ (Mrs Robinson), হ্যারোড (Harrod) প্রমুখ আধুনিক লেখকরা দেখাইয়াছেন, আয়, কর্মনিয়োগ ও উৎপাদনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্লেষণে বলা হয়, 'ক' দেশের আমদানি বেশী হওয়ায় ঐ দেশের আয়, কর্মনিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস পাইবে। ইহার ফলে 'ক' দেশে দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পাইবে এবং 'খ' দেশ হইতে আনীত আমদানি পরে কমিয়া গিয়া রপ্তানির সমান হইবে। পক্ষান্তরে, 'খ' দেশের রপ্তানির পরিমাণ বেশী হয় বলিয়া সেখানে রপ্তানি-কার্যে ও অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের আয় বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে 'খ' দেশে দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহা পূর্বের মতো আর রপ্তানি করিতে পারিবে না। অবশেষে বর্ধিত চাহিদা-পূরণের জন্য 'ক' দেশ হইতে অধিক পরিমাণে আমদানি করিতে হইবে এবং ঐ আমদানি বৃদ্ধি পাইয়া রপ্তানির সমান হইবে।

উপসংহার ঃ লেনদেনে-উদ্বৃত্তে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য উভয় মতবাদই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির বিশ্লেষণ করিয়াছে। বাস্তবক্ষেত্রে অবশ্য এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে লেনদেন-উদ্বৃত্তে ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না। উহার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। ঐ ব্যবস্থাগুলি পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হইল।

১১. লেনদেন-উদ্বৃত্তে অসমতা সংশোধনের পদ্ধতিসমূহ (Methods of Correcting Disequilibrium in the Balance of Payments) ঃ লেনদেন-উদ্বৃত্তের হিসাবে ভারসাম্যের অভাব ঘটিলে তাহা সংশোধনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে ঃ

ক. আমদানি-নিয়ন্ত্রণ ও আমদানি-সাশ্রয় ঃ লেনদেন-উদ্বৃত্তের ঘাটতি অপসারণের জন্য আমদানির মোট পরিমাণ হ্রাস করিতে হয়। উচ্চহারে আমদানি শুল্ক, আমদানি-কোটা (import quota), আমদানি পরিহার ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলি দ্বারা আমদানির পরিমাণ দ্রুত হ্রাসের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রয়োজনবোধে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর আমদানি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করিতে হয়। ইহা ছাড়া, আমদানিকৃত দ্রব্যগুলি যাহাতে দেশের অভ্যন্তরেই উৎপাদন করা যায় অর্থাৎ আমদানি সাশ্রয়ের (import substitution) ব্যবস্থা করিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আমদানি-হ্রাসের জন্য দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়।

খ. রপ্তানির প্রসার : লেনদেন-উদ্বৃত্তের ঘাটতির প্রতিবিধানকল্পে রপ্তানির দ্রুত প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হয়। উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস, রপ্তানি শুল্ক হ্রাস বা পরিহার, বিদেশে প্রতিনিধিদল প্রেরণ, রপ্তানি প্রসার পর্ষদ গঠন, বিদেশের বাজারে দেশীয় দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যাপক প্রচার প্রভৃতি ব্যবস্থা দ্বারা রপ্তানির পরিমাণ বাড়াইতে হয়। ইহা ছাড়া, রপ্তানি-দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতে হয় এবং প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (state trading) প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

গ. মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাস : মুদ্রামান হ্রাসের (devaluation)[১] দ্বারা বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। দেশীয় মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাস করা হইলে বিদেশের বাজারে দেশীয় দ্রব্যাদির দাম কম হইয়া যায় এবং উহার ফলে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, মুদ্রামান হ্রাসের ফলে আমদানিকৃত দ্রব্যের দাম দেশের বাজারে বৃদ্ধি পায় এবং উহার ফলে আমদানি হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুতরাং মুদ্রামান-হ্রাসের ফলে রপ্তানি প্রসারিত এবং আমদানি সংকুচিত হয় এবং অবশেষে লেনদেন-উদ্বৃত্তের হিসাবে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যবস্থাটি লেনদেনের ঘাটতি কতদূর অপসারণ করা যাইবে, তাহা অবশ্য রপ্তানিপণ্য ও আমদানি-পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে।

ঘ. বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ : বৈদেশিক লেনদেনের ঘাটতি প্রতিবিধানের জন্য কঠোরভাবে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের (exchange control) ব্যবস্থা করিতে হয় এবং দুষ্প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা যাহাতে সদ্ব্যবহার করা যায়, তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

ঙ. মুদ্রাসংকোচন : মুদ্রাসংকোচন (deflation) বলিতে এখানে দেশের জাতীয় আয়ের অর্থমূল্যে হ্রাস করাকে বুঝাইতেছে। জাতীয় আয়ের অর্থমূল্যে হ্রাস করা হইলে দেশের লোকদের ক্রয়শক্তি হ্রাস পাইবে। উহার ফলে, দেশে আমদানি করার ক্ষমতা কমিয়া যাইবে। বিপরীতদিকে, অর্থ আয় হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া যায় এবং উহা রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে।

চ. অন্যান্য ব্যবস্থাসমূহ : লেনদেন-উদ্বৃত্তের ঘাটতির সমস্যা যখন সংকটরূপ ধারণ করে তখন উহার প্রতিবিধানের জন্য স্বল্পকালীন কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। যেমন—আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে স্বল্পকালীন ঋণ গ্রহণ, স্বর্ণের রপ্তানি, বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে অর্থসাহায্য গ্রহণ ইত্যাদি।

উপসংহার : প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতে হয়, লেনদেন-উদ্বৃত্তের ঘাটতির সমস্যা সমাধানের কোন সাধারণ সূত্র নাই। কারণ এই ঘাটতির কারণগুলি বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে—যেমন, জাতীয় আয়ের উঠানামা, রপ্তানি-শিল্পে ব্যয় ও দামের কাঠামোতে পরিবর্তন, ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে এক দেশ হইতে অন্য দেশে মূলধন স্থানান্তর, উন্নয়নের প্রয়োজনের জন্য আমদানি বৃদ্ধি ইত্যাদি। লেনদেন-উদ্বৃত্তে ঘাটতির কারণের পরিপ্রেক্ষিতেই ঐ সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করিতে হয়।

১. সরকারীভাবে কোন দেশের মুদ্রার মান স্বর্ণের অঙ্কে বা বিদেশের কোন প্রধান মুদ্রার অর্থে হ্রাস করাকেই মুদ্রামানহ্রাস (devaluation) বলা হয়।

৩০

॥ সরকারী আয়-ব্যয় ও রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ॥

(Public Finance and State Economic Activites)

[সরকারী আয়ব্যয় কি ?—সরকারী আয়-ব্যয় ও ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়—সরকারী ব্যয় ও ইহার শ্রেণীবিভাগ—সরকারী ব্যয়ের নীতিসমূহ—সরকারী আয়ের বিভিন্ন উৎসসমূহ—করের নিয়মাবলী—করপাত, করচালনা ও করভার -প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর—প্রগতিশীল, সমানুপাতিক ও অধোগতিশীল কর—সরকারী ঋণ—ইহার শ্রেণীবিভাগ ও উদ্দেশ্যসমূহ—ঘাটতি ব্যয়—আধুনিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ—সরকারী হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র—ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ]

ব্যবসায়-অর্থবিদ্যায় সরকারের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে হয়। কারণ, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নীতি দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই অধ্যায়ে সরকারের আয়-ব্যয়, সরকারের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

১. সরকারী আয়-ব্যয় কি ? (What is Public Finance ?) : সরকারী আয়-ব্যয় (govenment finance) বা জনসাধারণের আয়ব্যয় (public finance) অর্থবিদ্যার একটি অন্যতম শাখা। প্রখ্যাত লেখক ডাল্টন (Dalton) মন্তব্য করিয়াছেন, সরকারী আয়-ব্যয় আলোচনা এমন একটি বিষয়বস্তু—যাহা অর্থবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যৌথ সীমানার উপর অবস্থান করে। সরকারী আয়-ব্যয়—সরকারের আয়, ব্যয় ও ঋণ-সংক্রান্ত বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা করে। এখানে সরকার বলিতে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য অর্থাৎ প্রাদেশিক বা স্থানীয় সকল প্রকার শাসন-কর্তৃপক্ষকে বুঝাইতেছে। সরকারী আয়ব্যয়-শাস্ত্রের তিনটি শাখা আছে :

(ক) সরকারী আয় বা রাজস্ব, (খ) সরকারী ব্যয় এবং (গ) সরকারী ঋণ। এই বিষয়গুলি পর্যায়ক্রমে এখন আলোচনা করা হইবে।

২. সরকারী আয়-ব্যয় ও ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় (Public Finance and Private Finance) : সরকারী আয়-ব্যয়ের স্বরূপ সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের (private finance) সঙ্গে ইহার পার্থক্য আলোচনা করিতে হয়। সরকারী আয়-ব্যয় হইতেছে সরকারের আয়, ব্যয়, ও ঋণ সম্বন্ধে আলোচনা অর্থাৎ ইহা সরকারের আয়, ব্যয় ও ঋণ সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় বিশ্লেষণ করে। পক্ষান্তরে, ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়—ব্যক্তিবিশেষের আয়, ব্যয়, ঋণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায় :

প্রথমত, সরকারী আয়-ব্যয় সরকারের আয়, ব্যয় ইত্যাদি বিষয়গুলি বিচার-বিবেচনা করে বলিয়া ইহার সহিত জনসাধারণের কল্যাণের বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত

থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় ব্যক্তিবিশেষের আয়, ব্যয় ইত্যাদি বিচার-বিবেচনা করে বলিয়া ইহার সহিত ব্যক্তির কল্যাণ জড়িত থাকে এবং জনকল্যাণের কোন বিষয় জড়িত থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির আয় তাহার ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দেয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তাহার আয়ের অনুপাতে ব্যয় করে। কিন্তু সরকারী আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় উহার আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে। সরকার প্রথমে ব্যয়ের পরিমাণ স্থির করে এবং পরে ঐ ব্যয়-নির্বাহের জন্য আয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

তৃতীয়ত, কোন ব্যক্তি সাধারণত তাহার আয় অপেক্ষা কম ব্যয় করিয়া ভবিষ্যতের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু বর্তমান যুগে সরকারের এইরূপ কোন উদ্দেশ্য থাকে না। আধুনিক সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আয়ের তুলনায় অধিক ব্যয় করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে সরকারের বাজেট-ঘাটতি আজকাল একটি নিয়মিত ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চতুর্থত, সরকার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় সূত্র হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। সরকার একদিকে যেমন দেশের জনসাধারণ ও দেশীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অভ্যন্তরীণ ঋণ (internal debt) গ্রহণ করিতে পারে, তেমনি ইহা বিদেশ হইতে বাহ্যিক ঋণ (external debt) গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু কোন ব্যক্তির নিকট সকল ঋণই হইতেছে বাহ্যিক, কারণ সে নিজের নিকট হইতে কোন ঋণ লইতে পারে না।

পঞ্চমত, সরকার ধাতব মুদ্রা তৈয়ার করিয়া বা কাগজী মুদ্রা ছাপাইয়া ব্যয় নির্বাহ করিতে পারে। কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহার ব্যয়-নির্বাহের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে নূতন টাকাকড়ি তৈয়ার করিতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায়, কোন ব্যক্তি সাধারণত তাহার ভবিষ্যত ভোগকর্ম অপেক্ষা বর্তমান ভোগকর্মের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়। কিন্তু সরকারকে বর্তমান ও ভবিষ্যত—উভয় ভোগকর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। উন্নয়ন-কার্যকলাপের ফলে যাহাতে বর্তমান ও ভবিষ্যত—উভয় ভোগের সুযোগ বা সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়, সেই দিকে সরকারকে দৃষ্টি রাখিতে হয়।

সুতরাং দেখা যায়, সরকারী আয়-ব্যয় ও ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে।

৩. **সরকারী ব্যয় ও ইহার শ্রেণীবিভাগ (Public Expenditure and its Classification)**ঃ সরকারী আয়-ব্যয় আলোচনায় প্রথমেই সরকারের ব্যয় আলোচনা করা যাইতে পারে। সরকার জনসাধারণের হইয়া তাহাদের জন্য ব্যয় করে বলিয়া ইহাকে 'জনসাধারণের ব্যয়' (public expenditure) বলা হয়। সরকারী বা জনসাধারণের ব্যয় বলিতে দেশের বিভিন্ন ধরনের সরকার দেশ-শাসন, প্রতিরক্ষা,

জনকল্যাণ, আর্থিক উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য যে-ব্যয় করে, তাহাকেই বুঝায়। এখানে 'সরকার' বলিতে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকার ও স্থানীয় সরকার সকলকেই বুঝায়। যেমন, আমাদের দেশে সরকারী ব্যয় বলিতে ভারত সরকারের ব্যয়, বিভিন্ন রাজ্য সরকারের ব্যয়, করপোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয় প্রভৃতিকে বুঝায়।

শ্রেণীবিভাগ : সরকারী ব্যয়কে বিভিন্ন ভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয় :

১. সরকারী ব্যয়কে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়, রাজ্য-সরকারের বা প্রাদেশিক সরকারের ব্যয় ও স্থানীয় সরকারের ব্যয় হিসাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। দেশের কেন্দ্রীয় সরকার যে-ব্যয় করে, তাহাকে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় বলে। যেমন—ভারত সরকারের ব্যয়কে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় বলে। যুক্তরাষ্ট্রে দেশের বিভিন্ন যেমন—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বা ত্রিপুরা সরকারের ব্যয় হইতেছে রাজ্য সরকারের ব্যয়। করপোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড, গ্রাম-পঞ্চায়েত ইত্যাদি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ব্যয়কে স্থানীয় সরকারের ব্যয় বলে।

২. সরকারী ব্যয়কে অনুদানজনক (grants) ও ক্রয়-দামজনক (purchase price)—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। দেশের সরকারের ব্যয় অনেক সময় দানের আকারে নির্বাহ করা হয়। ঐ প্রকার সরকারী ব্যয়কে 'অনুদান' বলা হয়। যেমন, সরকারী কর্মচারীদের পেন্সন, বেকার-ভাতা বাবদ সরকারী ব্যয়, দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য সরকারী ব্যয় প্রভৃতি অনুদানমূলক সরকারী ব্যয়। পক্ষান্তরে, সরকার যে-সকল দ্রব্যাদি সেবামূলক কার্য ক্রয় করার জন্য ব্যয় করে, তাহাকে ক্রয়-দামজনক সরকারী ব্যয় বলে। যেমন—সরকারী কর্মচারীদের বেতন বাবদ সরকার যে-ব্যয় করে, তাহা এই পর্যায়ে পড়ে।

৩. সরকারী ব্যয়কে উৎপাদনশীল (productive) ও অনুৎপাদনশীল (unproductive)—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যে-সকল সরকারী ব্যয়ের ফলে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদের প্রসার ঘটে সেই সকল ্যয়কে উৎপাদনশীল সরকারী ব্যয় বলা হয়। শিল্প, কৃষি, পরিবহণ ইত্যাদির জন্য সরকার যে-ব্যয় করে, তাহা উৎপাদনশীল ব্যয়। ইহা ছাড়া, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, আবাসন ইত্যাদির জন্য যে-ব্যয় করা হয়, তাহাও উৎপাদনশীল। কারণ, ঐ সকল ব্যয়ের ফলে দেশের লোকদের কল্যাণ বৃদ্ধি পায় এবং ভবিষ্যতে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। পক্ষান্তরে, যে-সকল সরকারী ব্যয়ের ফলে দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় না, তাহাকে অনুৎপাদনশীল ব্যয় বলে। কোন বিষয়ের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় অর্থাৎ অপচয়মূলক ব্যয়, আক্রমণাত্মক যুদ্ধের জন্য ব্যয়, অত্যাধিক পরিমাণে প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয় ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল ব্যয়। অবশ্য. দেশরক্ষার জন্য যে পরিমাণ সেনা-বাহিনী রাখা প্রয়োজন তাহার জন্য সরকার যে-ব্যয় করে তাহা একরূপ অপরিহার্য

বলিয়া ইহার একাংশকে উৎপাদনশীল ব্যয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু ঐ বিষয়গুলির জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে-ব্যয় করা হয় তাহা অনুৎপাদনশীল হইবে।

সরকারী ব্যয়ের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি (ভারতের দৃষ্টান্তসহ): আধুনিক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে দেশের সরকারকে বিভিন্ন খাতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ-ব্যয় করিতে হয়। যেমন—ভারতের সালের বাজেট-প্রস্তাব অনুযায়ী ঐ বৎসরে রাজস্ব খাতে ও মূলধনী খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়, যথাক্রমে ৩৬,৮৫০ কোটি টাকা ও ১৬,০১২ কোটি টাকা। সরকারী ব্যয়ের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল:

ক. প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয়: বৈদেশিক আক্রমণের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক দেশের সরকার প্রতিরক্ষা খাতে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে অর্থ-ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র-উৎপাদন সেনাবাহিনী পোষণ ও প্রসার, যানবাহন ও যুদ্ধ-বিমান ক্রয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হয়। ফলে ঐ বিষয়গুলির জন্য সরকারকে ব্যয় করিতে হয়। ভারতে সালের বাজেট অনুযায়ী রাজস্ব খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের শতকরা ১৪ ভাগের মতো ব্যয় হয় প্রতিরক্ষা খাতে। অনিশ্চিত বৈদেশিক পরিস্থিতির জন্য এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সালের বাজেটে প্রতিরক্ষার জন্য রাজস্ব ও মূলধনী খাতে ধরা হয় প্রায় ৮৭২৮ কোটি টাকা।

খ. বেসামরিক শাসন-কার্য পরিচালনার জন্য ব্যয়: দেশের বেসামরিক শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সরকারকে ব্যয় করিতে হয়। আমাদের দেশে রাজ্য-সরকারগুলি দেশ-শাসনের জন্য পুলিশ, জেলখানা, বিচারবিভাগ প্রভৃতির জন্য কর্মচারী নিয়োগ করে এবং তাহাদের বেতন বাবদ ও অন্যান্য খাতে প্রতি বৎসর অর্থ ব্যয় করে। ইহা ছাড়া, সরকারকে শাসনবিভাগ পরিচালনার জন্য দেশের মন্ত্রী, বিদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত, জেলাশাসক, বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের জন্য বেতন ও অন্যান্য খাতে অর্থ-ব্যয় করিতে হয়। আমাদের দেশে এই খাতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১৯৮৫-৮৬ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে ঐ খাতে ধরা হয় প্রায় ১৩৬০ কোটি টাকা।[?]

গ. জনকল্যাণমূলক কার্যের জন্য ব্যয়: প্রতিরক্ষা ও দেশ-শাসনের জন্য ব্যয় ছাড়া আধুনিক কালে সরকারকে জনকল্যাণমূলক কার্যের জন্য ব্যয় করিতে হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, আবাসন, শ্রমিক-কল্যাণ, বেকার-ভাতা, বার্ধক্যকালীন পেন্সন ইত্যাদি বিষয়গুলির জন্য সরকার যে-ব্যয় করে, তাহাকে জনকল্যাণমূলক ব্যয় বলে। কারণ এইপ্রকার সরকারী ব্যয়ের ফলে দেশের লোকদের কল্যাণ বৃদ্ধি পায়; আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি এই খাতে অর্থ ব্যয় করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রয়োজনের তুলনায় এই খাতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ খুবই নগণ্য।

ঘ. আর্থিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনার জন্য ব্যয়ঃ আধুনিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক সরকারকে দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা রূপায়িত করিয়া প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে হয়। দেশের অবকাঠামো (infra-structure) সুদৃঢ় করার জন্য সরকারকে কৃষি, শিল্প, সমবায়, পরিবহণ ইত্যাদি বিষয়গুলির দ্রুত প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে হয়। তদুপরি, উপরি-উক্ত বিষয়গুলির দ্রুত উন্নয়নের জন্য দেশের সরকার যে-অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজ গ্রহণ করে, তাহার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হয়। আমাদের দেশেও কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি দ্রুত আর্থিক উন্নয়নের জন্য অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। ইহা ছাড়া, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-গুলির জন্য সরকারকে ব্যয় করিতে হইতেছে। চলতি সপ্তম পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে যথাক্রমে ২০,০৭৪ কোটি ও ২২,৩০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়।[১]

উপরি-উক্ত চারটি খাতে সরকারী ব্যয়ের এক বৃহদংশ চলিয়া যায়। ইহা ছাড়া, দেশের সরকারকে রাজস্ব-সংগ্রহের জন্য ব্যয়, সরকারী ঋণ ও অগ্রিম এবং ঋণ-পরিশোধ ভরতুকী (subsidies) প্রদান, সুদ প্রদান, ত্রাণমূলক কার্য ইত্যাদির জন্যও ব্যয় করিতে হয়। ইহা ছাড়া, ভারতের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারগুলিকে অনুদান ও ঋণপ্রদান করিয়া থাকে এবং উহার জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারকে এক বিরাট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হয়।

৪. **সরকারী ব্যয়ের নীতিসমূহ (Principles of Public Fxpenditure) :** জে. বি. সে (J. B. Say) ও অন্যান্য পূর্বেকার লেখকদের মতে, সরকার যত কম ব্যয় করিবে এবং করের পরিমাণ যত কম হইবে, সরকারী আয়-ব্যয় ব্যবস্থা ততই উৎকৃষ্ট হইবে। তাঁহাদের মতে, দেশে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বহিরাক্রমণের হাত হইতে দেশকে রক্ষার জন্য যতখানি ব্যয়ের প্রয়োজন, সরকারের ব্যয় শুধুমাত্র ততখানিই হওয়া উচিত। কিন্তু আধুনিককালে এই মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। কারণ, আধুনিক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে সরকার নানারূপ ব্যয়ের মাধ্যমে দেশের লোকদের কল্যাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। এই কারণে, আধুনিককালে ব্যয়ের জন্য সরকারকে কতকগুলি নীতি মানিয়া চলিতে হয়ঃ

ক. **সর্বাধিক সামাজিক সুযোগ-সুবিধার নীতিঃ** প্রখ্যাত লেখক ডালটন (Dalton)-এর মতে, যে-সকল কার্যকলাপের ফলে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা (maximum social advantages) সৃষ্টি হয়, তাহাই হইবে সরকারী আয়-ব্যয়ের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। এই নীতিটির অর্থ হইল, সরকার এমনভাবে ব্যয় করিবে যে, ইহার ফলে যেন সর্বাধিক সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়। বিশ্লেষণ করিয়া বলা যায়, সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন-বৃদ্ধি ও বণ্টন-ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকে সরকারী ব্যয়কে চালিত করিতে হয়।

খ. **ক্রিয়াগত আয়-ব্যয় ব্যবস্থাঃ** আধুনিককালে সরকারী ব্যয়কে ক্রিয়াগত

আয়-ব্যয় ব্যবস্থার (functional finance) অঙ্গ হিসাবে ধরা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে অর্থব্যবস্থার প্রয়োজন পূরণের জন্য সরকারকে ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকারী ব্যয় হ্রাস করিতে হইবে এবং মুদ্রা-সংকোচন ও সংকটের সময় সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন পড়ে।

গ. **পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন**ঃ কেইনসীয় অর্থনীতিতে (Keynesian economics) পূর্ণ কর্ম-সংস্থান প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী ব্যয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এই মতবাদে বলা হয়, সমাজে পূর্ণ কর্ম-সংস্থানের জন্য মোট ব্যয়ে যে-ঘাটতি থাকে, তাহা সরকারকে 'পূরণ-মূলক ব্যয়নীতি' (policy of compensatory spending) অনুসারে ঘাটতি-ব্যয় (deficit financing)[১] পদ্ধতি দ্বারা পূরণ করিতে হয়। ইহা ছাড়া, ভারতের ন্যায় বিকাশশীল দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়।

ঘ. **অর্থব্যবস্থার উপর অশুভ ফল প্রতিরোধ**ঃ সরকারী ব্যয়ের আর একটি নীতি হইতেছে, উৎপাদন ও বন্টন-ব্যবস্থার উপর ঐ ব্যয়ের ফলাফল যাহাতে অশুভ না হয় অর্থাৎ সরকারী ব্যয়ের ফলে যাহাতে অর্থব্যবস্থার উৎপাদন ও বন্টন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনরূপে ব্যাঘাত না ঘটে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়।

ঙ. **ব্যয়-সংকোচ**ঃ সরকারকে অপ্রয়োজনীয় ও অপচয়মূলক ব্যয় এড়াইয়া ব্যয়-সংকোচ-এর (economy) ব্যবস্থা করিতে হয়। দেশের জনসাধারণের অর্থ যাহাতে অপব্যয় না হয় বা অপচয় না ঘটে, তাহার জন্য প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক ব্যয়ের পরিমাণ যুক্তিযুক্ত সীমার মধ্যে রাখিতে হয়।

সরকারী ব্যয়ের এই নীতিগুলি অল্পাবিস্তর প্রায় সকল দেশেই অনুসরণ করা হয়। সরকারী ব্যয়ের ফলে যাহাতে জনকল্যাণবৃদ্ধি এবং দ্রুত অর্থনৈতিক প্রসার ঘটে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকারের ব্যয়নীতি পরিচালিত হইলে তাহা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়।

৫। **সরকারী ব্যয়ের ফলাফল (Effects of Public Expenditure)**ঃ সরকারী ব্যয়ের ফলাফল অধ্যাপক ডাল্টন (Dalton) তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন ঃ

(১) **উৎপাদনের উপর ফলাফল**ঃ ডাল্টন-এর মতে, উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাব তিনটি দিক হইতে বিবেচনা করিতে হয় ঃ

ক. কর্মোদ্যম ও **সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর প্রভাব**ঃ করস্থাপনের (taxation) ফলে কোন ব্যক্তির কর্মোদ্যম যেরূপ হ্রাস পাইতে পারে, সরকারী ব্যয় সেইরূপ কর্মোদ্যম বাড়াইতে পারে। যে-সকল সরকারী ব্যয়ের প্রভাবে জনসাধারণের কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় সেই সকল ব্যয় কর্মোদ্যম বাড়াইয়া দেয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

১. এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইতেছে।

যেমন—শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সরকারী ব্যয় জনসাধারণের কর্মোদ্যম বৃদ্ধি করে। কিন্তু, বেকার-ভাতা (unemployment allowance), বার্ধক্যকালীন পেন্সন ইত্যাদি কর্মোদ্যম হ্রাস করে এবং উহার ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়। আবার সরকারী ব্যয়ের ফলে জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পাইলে উহাদের সঞ্চয়-ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং অবশেষে দেশে উৎপাদন-বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়।

খ. কর্মোদ্যমের ইচ্ছা ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর প্রভাব: যে—সকল সরকারী ব্যয়ের ফলে ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ও শর্তবিহীন সুবিধা (যেমন—বার্ধক্যকালীন পেন্সন, যুদ্ধকালীন কার্যের জন্য পেন্সন ইত্যাদি) পাওয়ার প্রত্যাশা দেশের লোকদের মধ্যে সৃষ্টি হয়, সেই সকল সরকারী ব্যয়ের ফলে কাজ করা ও সঞ্চয় করার ইচ্ছা (willingness to work and to save) হ্রাস পায়। এই ধরনের ব্যয়ের ফলে স্বভাবতই উৎপাদন হ্রাস পাইতে পারে। পক্ষান্তরে, যে-সকল সরকারী অনুদান বা সুযোগ-সুবিধা কর্মপ্রচেষ্টা বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পায় (যেমন—আয় বা সঞ্চয়ের অনুপাতে অনুদান) এইসকল ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয়, কাজ করার ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি করে। উহার ফলে ভবিষ্যতে উৎপাদন-বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই শেষোক্ত ধরনের সরকারী অনুদান খুব কমই দেখা যায়।

গ. উৎপাদনের উপকরণসমূহের নিয়োগের দিক্ পরিবর্তনের প্রভাব: সরকারী ব্যয়ের ফলে উপকরণসমূহের নিয়োগের স্থানান্তর ঘটিতে পারে। যেমন—যুদ্ধের সময় প্রতিরক্ষার জন্য অধিক পরিমাণে ব্যয় করা হইলে দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ ও উপকরণ যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনের কার্যে নিযুক্ত হইয়া পড়িবে। ইহার ফলে দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল শুভ নাও হইতে পারে।

(২) **বণ্টনের উপর ফলাফল:** সরকারী ব্যয়ের সাহায্যে সমাজে আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য (unequal distribution of income and wealth) হ্রাস করা সম্ভব হয়। সরকার ধনী ব্যক্তিদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা দরিদ্রশ্রেণীর লোকেদের কল্যাণের জন্য ব্যয় (যেমন—বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার সুবিধা, বেকারভাতা, বিনা ব্যয়ে শিক্ষা প্রভৃতি) করে, তাহা হইলে সেই ব্যয়ের প্রভাবে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পাইতে পারে। ডাল্টন-এর মতে, সরকারের অনুদান-ব্যয় প্রগতিশীল পদ্ধতিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। যেমন—যে-যত বেশী গরীব, সে সরকার হইতে তত বেশী আর্থিক সাহায্য পাইবে। প্রগতিশীল অনুদান পদ্ধতি (progressive grants) দ্বারা দেশের গরীব সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের আয় বৃদ্ধি করা যায় বলিয়া ইহার দ্বারা আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভব হয়।

(৩) **জাতীয় আয় ও কর্ম-নিয়োগের উপর প্রভাব:** আধুনিক কালে সকল অর্থবিজ্ঞানীই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেশে

জাতীয় আয় ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা যায়। লর্ড কেইন্‌স-এর (Lord Keynes) মতে, সমাজে পূর্ণ কর্ম-নিয়োগের জন্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকিলে সরকার উহার বিনিয়োগ-ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া দেশে পূর্ণ কর্মনিয়োগ আনিতে পারে এবং উহার দ্বারা দেশে জাতীয় আয় দ্রুত বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

(৪) **অর্থনৈতিক প্রসারের উপর ফল ঃ** বিকাশশীল দেশে অর্থনৈতিক প্রসারের উপর সরকারী ব্যয়ের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব দেখা যায়। এই সকল দেশে কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, সামাজিক সেবাকার্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকার ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের ব্যবস্থা করিতে পারে। অবশ্য অত্যধিক সরকারী ব্যয়ের ফলে এই সকল দেশে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে।

সরকারী ব্যয়ের এই সকল শুভ ফলাফলের জন্য অতীতের ন্যায় বর্তমানে ইহাকে আর অনিষ্টমূলক বা অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বলিয়া গণ্য করা হয় না। ইহার শুভ ফলাফল অবশ্য ব্যয়ের পদ্ধতি, ব্যয়ের উদ্দেশ্য এবং প্রশাসনিক দক্ষতার উপর বিশেষ-ভাবে নির্ভর করে।

৬. **সরকারী আয়ের বিভিন্ন উৎসসমূহ (Different Sources of Public Revenue) ঃ** সরকারী ব্যয়ের পর সরকারী আয়ের বা জনসাধারণের আয়ের (public revenue) বিষয় আলোচনা করিতে হয়। সরকারী আয় কথাটির ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় প্রকারের অর্থ আছে। ব্যাপক অর্থে সরকারের সামগ্রিক প্রাপ্তিকে (total receipts) সরকারের বা জনসাধারণের আয়ের মধ্যে ধরা হয়। এই অর্থে সরকার যে সকল ঋণ করে তাহাও সরকারের আয়ের মধ্যে যুক্ত হয়। কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে সরকার রাজস্ব হিসাবে যে-আয় পায়, তাহাই হইতেছে সরকারী আয়। সুতরাং সরকারের সামগ্রিক প্রাপ্তি হইতে সরকারী ঋণের পরিমাণ বাদ দিলে সরকারের রাজস্ব (revenue) পাওয়া যায়। সরকারের আয় মূলত এই দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সরকার বিভিন্ন সূত্র হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া থাকে। সরকারের রাজস্বের সূত্রগুলি মোটামুটি চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ (১) অনুদান ও দান (Grants and Gifts), (২) প্রশাসনিক রাজস্ব (Administrative Revenues), (৩) বাণিজ্যিক রাজস্ব (Commercial Revenues) এবং (৪) কর (Tax)। ইহার মধ্যে প্রথম তিন প্রকারের রাজস্বকে কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব (non tax-revenue) এবং কর হইতে যে-রাজস্ব গৃহীত হয় তাহাকে কর-রাজস্ব (tax-revenue) বলা হয়। নিম্নের ঐ সূত্রগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করা হইল।

ক অনুদান ও দান ঃ এক সরকার অন্য সরকারকে কতকগুলি নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করিবার জন্য যে-অর্থ সাহায্য দেয় তাহাকে 'অনুদান' বলে। ভারতের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাজ্যের সরকারকে শিক্ষা, পরিকল্পনা, আবাসন-নির্মাণ

ইত্যাদি বিষয়গুলির জন্য প্রায়ই অনুদান দিয়া থাকে। ভারতেও কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যসরকারগুলিকে একরূপ নিয়মিতভাবে বাজেটের ঘাটতি পূরণ, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, অনুন্নত শ্রেণীর লোকেদের অবস্থার উন্নয়ন, পরিবহণ, ও যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়গুলির জন্য নিয়মিতভাবে অনুদান দিয়া থাকে। অনুদানের মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ইহা এক সরকার অন্য সরকারকে প্রদান করে এবং অনুদান বাবদ দেয় অর্থ-সাহায্য যে বিশেষ উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়, তাহা ঐ উদ্দেশ্যের জন্য ব্যয় হইবে।

দেশের লোকেরা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন বিশেষ কাজের জন্য সরকারকে স্বেচ্ছায় যে-অর্থ প্রদান করে, তাহা হইতেছে 'দান'। দান সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক এবং জাতীয় জরুরী পরিস্থিতিতে দানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যেমন—যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা তহবিলে দান, বন্যার্তদের জন্য সাহায্য-তহবিলে দান ইত্যাদি। আমাদের দেশেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও লোকেরা জাতির জরুরী পরিস্থিতিতে সরকারকে অর্থ ইত্যাদি দান করে। ইহা ছাড়া, রাজ্যসরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে নিয়মিতভাবে পরিকল্পনার কাজ ও পরিকল্পনা-বহির্ভূত কাজের জন্য অনুদান (plan-grants and non-plan grants) পাইয়া থাকে। যেমন— সালে এই দুইখাতে পশ্চিমবঙ্গের অনুদান-প্রাপ্তির পরিমাণ হয় যথাক্রমে ২৩১·১৫ কোটি টাকা ও ১৭৪·৭১ কোটি টাকা।[১]

খ. প্রশাসনিক রাজস্বঃ প্রশাসনিক রাজস্ব বলিতে ফী, লাইসেন্স, জরিমানা, সম্পত্তির বাজেয়াপ্ত, সম্পত্তির স্বত্বলোপ প্রভৃতি প্রাপ্তিকে বুঝায়। সরকারের শাসন-কার্য পরিচালনার উপজাত (by-product) প্রাপ্তি হিসাবে সংগৃহীত হয় বলিয়া, ইহাদিগকে সামগ্রিকভাবে প্রশাসনিক রাজস্ব বলে। প্রশাসনিক রাজস্বের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সূত্র বর্ণনা করা যাইতে পারে।

প্রথমত, দেশের সরকার ফী, লাইসেন্স ও অনুমতিপত্র-প্রদান হইতে কিছু পরিমাণ রাজস্ব পাইয়া থাকে; যেমন—কোর্ট ফী, দোকানদারের লাইসেন্স, মদ বিক্রয় করার অনুমতিপত্র ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে মূলত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ইহাদের মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে, সরকার সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কতকগুলি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং ঐ বিষয়গুলির জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে হইলে সরকারকে কিছু অর্থ দিতে হয়। যেমন—রাস্তায় মোটরগাড়ী চালাইতে হইলে গাড়ী চালাইবার লাইসেন্স লইতে হয় এবং গাড়ী-চালককে ঐ লাইসেন্স বাবদ সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ দিতে হয়। আমাদের দেশের সরকার কোর্ট ফী, লাইসেন্স ফী, ইত্যাদি বাবদ রাজস্ব পাইয়া থাকে।

দ্বিতীয়ত, দেশের আইন লংঘন করিলে শাস্তিস্বরূপ আইন-লংঘনকারীকে যে-অর্থ দিতে হয়, তাহাকে 'জরিমানা' (fine) বলে—যেমন, চুরি করিলে চোরকে জেল খাটিতে হয়, জরিমানা দিতে হয়। ইহা ছাড়া, কেহ সরকারের প্রাপ্ত অর্থ না দিলে সরকার তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে পারে। যেমন—সরকারের প্রাপ্য আয়কর

না দিলে উহা আদায় করিবার জন্য সরকার বাকিদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া থাকে, কিন্তু রাজস্ব হিসাব এই সূত্রগুলির বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। কারণ এইগুলি হইতে কি পরিমাণ রাজস্ব পাওয়া যাইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা থাকে না।

তৃতীয়ত, কোন ব্যক্তির কোনরূপ উত্তরাধিকারী না থাকিলে সরকার ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি-স্বত্ব লোপ করিয়া উহা নিজের মালিকানায় আনে। ইহা ছাড়া, কোন ব্যাংক-আমানতের বা সম্পত্তির কোন দাবিদার না থাকিলে উহা সরকারের প্রাপ্য হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সরকারের কোন উন্নয়নমূলক কার্যের ফলে কোন অঞ্চলের অধিবাসীরা বিশেষ কোন সুবিধা ভোগ করিতে পারে। ঐ সুবিধার সমানুপাতে সুবিধা-ভোগীদের নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে সরকার 'বিশেষ কর' (special assessment) আদায় করিতে পারে। যেমন—কোন অনুন্নত অঞ্চলে সরকারের উন্নয়নকার্যের ফলে ঐ অঞ্চলের লোকেদের সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং উহার জন্য সরকার বাধ্যতামূলকভাবে ঐ অঞ্চলের লোকেদের নিকট 'বিশেষ কর' আদায় করিতে পারে। এইরূপ 'বিশেষ করের' বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ইহা প্রদান করা বাধ্যতামূলক এবং এইরূপ অর্থ-প্রদানের পরিবর্তে লোকেরা বিশেষ সুবিধা ভোগ করে।

গ. **বাণিজ্যিক রাজস্ব ঃ** বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের লোকেদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ও সেবামূলক কার্যাদির জন্য সরকার যে-দাম (price) আদায় করে, তাহাদিগকে সামগ্রিকভাবে বাণিজ্যিক রাজস্ব (commercial revenues) বলে যেমন—সরকারের সম্পত্তি থাকিলে উহা ভাড়া খাটাইয়া সরকার আয় পায়। ইহা ছাড়া, সরকার বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি যে-সকল দ্রব্যাদি ও সেবামূলক কার্য উৎপাদন করে, তাহা বিক্রয় করিয়া দাম, মাশুল ইত্যাদি আদায় করে। যেমন—আমাদের দেশে ভারত সরকারের ডাক ও তার-বিভাগ হইতে আয়, রেলপথ হইতে আয়, বেতার-কেন্দ্র হইতে আয়, বিভিন্ন শিল্প-কারখানার মুনাফা ইত্যাদি। এই রাজস্ব সরকারের সাধারণ প্রশাসনিক কার্যের আয় হিসাবে সংগৃহীত হয় না, ইহা সরকারের বিশেষ সেবাকার্য বা উৎপাদন-কার্যের আয় হিসাবে আদায় করা হয়। সরকারের বাণিজ্যিক কার্যাবলীর প্রসারের ফলে এইপ্রকার রাজস্বের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতের দৃষ্টান্ত ঃ আমাদের দেশে সরকার এই সূত্র হইতে ক্রমশ অধিক পরিমাণে রাজস্ব পাইতেছে। যেমন—রাজ্য সরকার রাষ্ট্রীয় পরিবহণ হইতে ভাড়া বাবদ আয় পায়, পশ্চিমবংগ সরকার হরিণঘাটা ডেয়ারির দুধ বিক্রয় করিয়া আয় সংগ্রহ করে, রাজ্য-সরকার সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠরত ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন পায়, ভারত সরকার ষ্টীল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়ার অধীন কোম্পানীগুলির ইস্পাত বিক্রয় করিয়া দাম আদায় করে, কেন্দ্রীয় সরকার টেলিফোনের মাশুল ও টেলিফোন ব্যবহারের জন্য দাম পায়, ইত্যাদি।

ঘ. **কর :** কর হইতেছে আধুনিক সরকারের আয়ের প্রধানতম সূত্র। সরকারের আয়ের এক বৃহদংশ কর হইতে সংগৃহীত হয়। দেশের লোকেরা সরকারের ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য কোনরূপ প্রত্যক্ষ সুবিধা প্রত্যাশা না করিয়া সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে যে-অর্থ প্রদান করে তাহাকে 'কর' (tax) বলে। করের সংজ্ঞা আলোচনা করিলে ইহার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :

প্রথমত, কর প্রদান করা বাধ্যতামূলক। যেমন, আয় বা সম্পদের উপর কর ধার্য করা হইলে আয়-উপার্জনকারীকে বা সম্পদের মালিককে ঐ কর দিতেই হইবে, অর্থাৎ ঐ কর প্রদান করা বাধ্যতামূলক।

দ্বিতীয়ত, কর-প্রদানের সংগে প্রত্যক্ষ সুযোগ-সুবিধার কোন সম্পর্ক থাকে না, অর্থাৎ কর-প্রদানকারী করের বিনিময়ে সরকারের নিকট হইতে সরাসরি কোন সুযোগ-সুবিধা পায় না। সরকার কর-রাজস্ব সাধারণ উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং করপ্রদানকারী সরকারী ব্যয় হইতে পরোক্ষভাবে সুযোগ-সুবিধা পায়।

ভারতের দৃষ্টান্ত : সরকারের রাজস্বের সূত্র হিসাবে করের গুরুত্ব সর্বাধিক। ভারতেও সরকারী রাজস্বের সূত্র হিসাবে কর রাজস্বের অধিক গুরুত্ব দেখা যায় ; যেমন—১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেট-হিসাব অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খাতে (revenue account) মোট রাজস্ব ২৬,৭৭৩ কোটি টাকার মধ্যে কর-রাজস্বের (tax-revenue) পরিমাণ হইয়াছিল ১৮,৯২২ কোটি টাকা এবং কর-নিরপেক্ষ রাজস্বের (non-tax revenue) পরিমাণ হইয়াছিল ৭,৮৫১ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট রাজস্বে কর-রাজস্বের অনুপাত ছিল ৭০ শতাংশ। প্রত্যেক দেশেই সরকার তাহার ব্যয়-নির্বাহের জন্য নানা প্রকার কর ধার্য করে। যেমন—আয়কর, সম্পদকর, মৃত্যুকর বা সম্পত্তি কর, বিক্রয়কর, অন্তঃশুল্ক, দানকর ইত্যাদি।[১] আমাদের দেশেও এই করগুলি প্রচলিত আছে। সালে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীয় কর হইতে অনুমিত রাজস্বের পরিমাণ এখানে দেওয়া হইল : কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক—৬৭৫৯ কোটি টাকা ; বাণিজ্য শুল্ক অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানি কর—৭৮৮১ কোটি টাকা ; ব্যক্তিগত আয়কর—৬২৪ কোটি টাকা , কোম্পানী আয়কর—২৮০৪ কোটি টাকা ; সম্পদকর—১০৪ কোটি টাকা ; দানকর ১০ কোটি টাকা।[২] কর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া কর-সংগ্রহের নিয়মাবলী, করের প্রকারভেদ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার।

৭. **করের নিয়মাবলী (Canons of Taxation) :** কর-ধার্য ও করসংগ্রহের জন্য সরকারকে যে-নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হয়, উহাদিগকে করের নিয়মাবলী (canons of taxation) বলে। এ-সম্পর্কে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) বর্ণিত করের চারটি নিয়ম নিম্নে আলোচনা করা হইল :

ক. সামর্থ্যের বা সমতার নিয়ম (**Canon of Ability or Equality**) **:** এই নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি সরকারের কার্য-নির্বাহের জন্য তাহার ক্ষমতার সমানুপাতে কর প্রদান করিবে। দরিদ্র ব্যক্তিদের তুলনায় ধনী ব্যক্তিদের করপ্রদানের ক্ষমতা বেশী। সুতরাং, দরিদ্রের তুলনায় ধনীরা অধিক হারে কর প্রদান করিবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সামর্থ অনুযায়ী কর প্রদান করিলে করপ্রদানের জন্য যে-ত্যাগ (sacrifice) স্বীকার করিতে হয় তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সমপরিমাণ হইবে। এই নিয়মটি ন্যায়নীতির (equity) উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা সর্বত্রই কর-ব্যবস্থার মধ্যে গৃহীত হইয়াছে।

খ. নিশ্চয়তার নিয়ম (**Canon of Certainty**) **:** এই নিয়মে বলা হয়, করের পরিমাণ, কর-প্রদানের সময় ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকিবে। ঐ বিষয়গুলি সম্পর্কে নিশ্চয়তা না থাকিলে করপ্রদানকারী কর দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হইবে এবং দেশের সরকারও উহার সঠিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বা বাজেট (budget) প্রস্তুত করিতে পারিবে না।

গ. সুবিধার নিয়ম (**Canon of Convenience**) **:** এই নিয়মে বলা হয়, জনসাধারণের নিকট হইতে এমনভাবে কর আদায় করিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের বিশেষ অসুবিধা না হয়। কর বাবদ সকল প্রাপ্য অর্থ একসঙ্গে পরিশোধ করিতে বলিলে বা অসময়ে কর প্রদান করিতে বলিলে কর-প্রদানকারীদের বিশেষ অসুবিধা হয়। এই কারণেই তাহাদের সুবিধা অনুযায়ী কর-প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন—যাহারা মাসের ভিত্তিতে বেতন পায়, তাহাদের মাহিনা হইতে প্রতিমাসে আয়কর কাটা হয় বা শস্যতোলাকালীন সময়ে কৃষকদের নিকট হইতে ভূমি-রাজস্ব আদায় করা হয়।

ঘ. ব্যয়-সংকোচের নিয়ম (**Canon of Economy**) **:** এই নিয়মটির অর্থ হইতেছে, কর-আদায় ও কর-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সরকারের যে-ব্যয় হয়, তাহার পরিমাণ যেন আদায়ীকৃত রাজস্বের তুলনায় কম হয়। যে-কর আদায় করিতে বিপুল পরিমাণে ব্যয় হয়, অথচ গৃহীত রাজস্বের পরিমাণ খুবই নগণ্য, সেইরূপ কর ধার্য না করাই উচিত হইবে।

এই চারটি নিয়মের মধ্যে প্রথম নিয়মটি কর-ধার্য করার নিয়ম এবং শেষের তিনটি কর-ব্যবস্থা পরিচালনার নিয়মাবলী। আধুনিক লেখকরা অ্যাডাম স্মিথের এই চারটি নিয়মের গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহারা আরও কয়েকটি নিয়ম উল্লেখ করিয়াছেন, **:**

ক. উৎপাদনশীলতার নিয়ম (**Canon of Productivity**) **:** কর-রাজস্ব অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করাই কর-ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রতিটি কর-ধার্যের সময় দেখিতে হইবে যেন রাজস্ব-সংগ্রহ পর্যাপ্ত হয়। ইহা ছাড়া আরও দেখিতে হইবে, কর-ধার্যের ফলে যেন উৎপাদন-কার্য ও সঞ্চয় ব্যাহত না হয়।

খ. নমনীয়তার নিয়ম (**Canon of Elasticity**) ঃ দেশের কর-ব্যবস্থা এমন নমনীয় হইবে যে, করের হার পরিবর্তন করিয়া সরকার যেন প্রয়োজনমতো কম-বেশী কর-রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারে।

গ. সরলতার নিয়ম ঃ (**Canon of Simplicity**) **ঃ** এই নিয়ম অনুসারে বলা হয়, দেশের কর-ব্যবস্থা সরল হইবে এবং লোকেরা ও সরকার যেন ইহা সহজেই বুঝিতে পারে।

উপরি-উক্ত নিয়মগুলি করধার্য ও কর সংগ্রহের জন্য সরকারকে মানিয়া চলিতে হয়। যে-করের মধ্যে এই নিয়মগুলি বর্তমান থাকে, তাহা উত্তম কর (good tax) বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং, এই নিয়মগুলিকে উত্তম করের বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করা হয়।

৮. করপাত, কর-চালনা ও করভার (**Impact, Shifting and Incidence of Taxation**) **ঃ** অধ্যাপক ডাল্টন-এর (Dalton) মতে, কোন দ্রব্যের উপর যখন কর ধার্য করা হয়, তখন কতকগুলি প্রক্রিয়া কার্যকর হইতে দেখা যায়। ঐ প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে করের বোঝা চালান দেওয়া (**shifting of the burden of taxation**)।

সরকার যে-ব্যক্তির উপর আইনত কর ধার্য করে, করপাত (impact of taxation) অর্থাৎ করের প্রাথমিক বোঝা তাহার উপর চাপে। কিন্তু সেই ব্যক্তি করের বোঝা অন্যের উপর চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করে। উহাকেই কর-চালনা বা করের বোঝা চালান দেওয়া (shifting of taxation) বলা হয়, কর-চালনা সফল হইলে পরিশেষে যাহার উপর উহা চাপে তাহার উপর করের চূড়ান্ত বোঝা বা করভার (incidence of taxation) ন্যস্ত থাকে।

কর-চালনার দুইটি পদ্ধতি আছে। প্রথমত, বিক্রেতা যখন দাম বৃদ্ধি করিয়া ক্রেতাদের উপর কর-চালান দেয়, তখন উহাকে 'সম্মুখমুখী কর-চালনা' (forward shifting) বলে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনকারী যখন কাঁচামাল-বিক্রেতার উপর কর-চালান দেয়, তখন উহাকে 'পশ্চাতমুখী কর-চালনা' (backward shifting) বলে। কর-চালনা অবশ্য সকলক্ষেত্রে সম্ভব নয়, উহা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ঐ বিষয়গুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল ঃ

কর-চালনা ও করভার নির্ধারণের বিষয়গুলি ঃ কর-চালনা ও করভার নিম্নলিখিত
জন্য সংগুলির দ্বারা নির্ধারিত হয়।
(canons **দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ঃ** করভার নির্ধারণের জন্য যে-সকল দ্রব্যের
(Adam Sm ধার্য করা হয় সেইগুলির 'চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা' (elasticity of

১. *E. B.*) বিচার করিতে হয়। স্থিতিস্থাপক চাহিদার (elastic demand) দ্রব্যের
২. মুতুকর রেডিও, টেলিভিশন সেট, দামী সুগন্ধি ইত্যাদি) উপর কর ধার্য ধরা হইলে
সনের বাজেট প্রস্তু হার দাম বৃদ্ধি করিয়া ক্রেতার উপর করচালনা করিতে পারে না।

কারণ ঐ দ্রব্যগুলির দাম বাড়াইলে চাহিদা হ্রাস পায়। এই সকলক্ষেত্রে করভার বিক্রেতার উপরই থাকে।

পক্ষান্তরে, অস্থিতিস্থাপক চাহিদার (inelastic demand) দ্রব্যের (যেমন,—জামা-কাপড়, তেল, লবণ প্রভৃতি) উপর কর ধার্য করা হইলে, বিক্রেতা উহার দাম বাড়াইয়া করের বোঝা ক্রেতার উপর চালান দিতে পারিবে। কারণ উহাদের দাম বৃদ্ধি পাইলেও চাহিদা বিশেষ হ্রাস পায় না। এইসকল ক্ষেত্রে করভার ক্রেতার উপরই চাপিবে।

সুতরাং দেখা যায়, দ্রব্যের চাহিদা যত বেশী স্থিতিস্থাপক হইবে, করভার ততবেশী বিক্রেতার উপর থাকিবে। আবার চাহিদা যত বেশী অস্থিতিস্থাপক হইবে করভার ততবেশী ক্রেতার উপর আসিবে।

খ. দ্রব্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ঃ করভার নির্ধারণের জন্য দ্রব্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও বিচার করিতে হয়। স্থিতিস্থাপক যোগানের (elastic supply) দ্রব্যের (যেমন,—কাপড়, তৈল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) উপর করধার্য করা হইলে বিক্রেতা উহার যোগান হ্রাস করিয়া দাম বাড়াইতে পারিবে। ফলে ক্রেতার উপর করভার আসিবে।

পক্ষান্তরে, অস্থিতিস্থাপক যোগানের (inelastic supply) দ্রব্যের (যেমন,—পচনশীল দ্রব্যাদি) উপর কর ধার্য করা হইলে বিক্রেতা উহাদের যোগান হ্রাস করিতে পারে না বলিয়া দাম বাড়াইতে পারিবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে করভার বিক্রেতার উপর চাপিবে।

অতএব দেখা যায়, যোগান যত বেশী স্থিতিস্থাপক হয়, করভার ততবেশী ক্রেতার উপর চাপে এবং উহা যত অস্থিতিস্থাপক হয়, করভার ততবেশী বিক্রেতার উপর থাকে।

প্রকৃতপক্ষে করের বোঝা চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা অনুসারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া থাকে। দ্রব্যের চাহিদা যত স্থিতিস্থাপক এবং যোগান যত অস্থিতিস্থাপক হইবে, করভার তত বিক্রেতার উপর থাকিবে। পক্ষান্তরে, চাহিদা যত অস্থিতিস্থাপক এবং যোগান যত স্থিতিস্থাপক হইবে, করভার তত ক্রেতার উপর চাপিবে। অধ্যাপক ডালটন (Dalton) এই বিষয়টি একটি সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

$$\frac{\text{করভারে বিক্রেতার অংশ}}{\text{করভারে ক্রেতার অংশ}} = \frac{\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা}}{\text{যোগানের স্থিতিস্থাপকতা}}$$

গ. বিকল্প দ্রব্যের অস্তিত্ব ঃ দ্রব্যের বিকল্প (substitutes) থাকিলে বিক্রেতা উহার দাম বাড়াইয়া করের বোঝা ক্রেতার উপর সহজেই চালান দিতে পারিবে না। এইক্ষেত্রে করভার মূলত বিক্রেতার উপর থাকিবে। কিন্তু যে-সকল দ্রব্যের বিকল্প নাই, সেই সকল ক্ষেত্রে করভার ক্রেতার উপর চালান দেওয়া সম্ভব হয়।

ঘ. **সময়-মেয়াদ ঃ** উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা অনেক সময় ক্রেতাদের সহিত সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য স্বল্পকালীন সময়ে নিজেই কর দিয়া দেয়। কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে তাহারা ধীরে ধীরে দাম বৃদ্ধি করিয়া করের বোঝা ক্রেতার উপর চালান দেয়।

ঙ. **করের পরিমাণ ঃ** কোন কোন ক্ষেত্রে করের পরিমাণ খুব সামান্য হইলে ক্রেতাদিগকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য বিক্রেতারা নিজের পকেট হইতেই কর দিয়া দেয়।

চ. **উৎপাদন-ব্যয়ের অবস্থা ঃ** করভার দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়ের উপরও নির্ভর করে। ক্রম-হ্রাসমান ব্যয়ের (decreasing cost) ক্ষেত্রে কর অপেক্ষা দ্রব্যের দাম অধিক বৃদ্ধি পায় বলিয়া ক্রেতার উপর করভার অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। পক্ষান্তরে, ক্রম-বর্ধমান ব্যয়ের (increasing cost) ক্ষেত্রে কর অপেক্ষা দ্রব্যের দাম কম বৃদ্ধি পায় বলিয়া ক্রেতার উপর করভার অপেক্ষাকৃত কম হয়। আবার, সম-ব্যয়ের (constant cost) ক্ষেত্রে করের সমান দাম বৃদ্ধি পায় বলিয়া ক্রেতার উপর ধার্য করের সমান করভার থাকে।

ছ. **করভার ও একচেটিয়া অবস্থা ঃ** একচেটিয়া বিক্রেতাও দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া ক্রেতার উপর কর চালান দেওয়ার চেষ্টা করে। এইক্ষেত্রেও দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা দ্বারা করভার নির্ধারণ করা হয়, তবে একচেটিয়া অবস্থায় বিশেষ বিশেষ করের ক্ষেত্রে করভার বিভিন্নরূপ হইতে পারে। মুনাফার একটি নির্দিষ্ট শতাংশ (a fixed percentage of profits) কর বাবদ আদায় করা হইলে তাহার পক্ষে দাম-বৃদ্ধি করা লাভজনক হইবে না। সুতরাং এইক্ষেত্রে করভার একচেটিয়া উৎপাদকের উপরই থাকিবে। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণকে ভিত্তি করিয়া করধার্য করা হইলে একচেটিয়া উৎপাদক উৎপাদন-হ্রাস ও দাম-বৃদ্ধি করিয়া করভার অংশত ক্রেতার উপর চালান দিতে পারিবে।

৯. **প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর (Direct Taxes and Indirect Taxes) ঃ** কর প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ঃ (১) প্রত্যক্ষ কর (Direct Tax) ও (২) পরোক্ষ কর (Indirect Tax)। যে-করের ভার অন্যের উপর চালান করা যায় তাহাকে 'প্রত্যক্ষ কর' বলে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কর যাহার উপর ধার্য করা হয়, তাহাকেই ঐ করের ভার বহন করিতে হয় এবং সে অন্য কাহারও উপরে উহা সরাইতে পারে না। সুতরাং করপাত (impact) ও করভার (incidence) একই ব্যক্তির উপর থাকে। আয়কর, সম্পদকর, দানকর ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করের দৃষ্টান্ত। **ক** ব্যক্তির আয়ের উপর আয়কর ধার্য করা হইলে উহার ভার **ক** ব্যক্তিকে বহন করিতে হইবে। সে ঐ করের ভার **খ** বা **গ** ব্যক্তির উপর সরাইতে পারে না। আমাদের দেশে কর-ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি প্রত্যক্ষ কর আছে, যেমন—আয়কর, সম্পদ-কর, সম্পত্তি-কর বা মৃত্যু-কর (বর্তমানে লুপ্ত), দানকর, মূলধন-লাভ কর, বৃত্তিকর ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে, যে-করের ভার অন্য ব্যক্তির উপর সরানো যায়, তাহাকে 'পরোক্ষ কর

বলে। পরোক্ষ কর যাহার উপরে ধার্য করা হয়, সেই ব্যক্তি উহার ভার বহন করে না, সে উহা অন্য ব্যক্তির উপরে চালান করিয়া দেয়। সুতরাং করপাত ও করভার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপর থাকে। যেমন—বিক্রয়কর, অন্তঃশুল্ক, প্রমোদকর, আমদানি ও রপ্তানি কর ইত্যাদি। বিক্রয়-করের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিক্রয়ের উপর কর ধার্য করা হয়, কিন্তু বিক্রেতা ঐ করের ভার ক্রেতার উপরে চালান করিয়া দেয়। আমাদের দেশের কর-ব্যবস্থার মধ্যে অনেক পরোক্ষ কর দেখা যায়, যেমন—অন্তঃশুল্ক (excise duty), বাণিজ্য-শুল্ক, (customs duty), বিক্রয়কর (sales tax), প্রমোদকর (amusement tax) ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—উভয় শ্রেণীর করের গুণ ও দোষ আছে। উহাদের গুণ ও দোষগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল ঃ

প্রত্যক্ষ করের গুণসমূহ ঃ প্রথমত, প্রত্যক্ষ কর হইতেছে ন্যায্য কর। কারণ এই করের ভার চালান করা যায় না বলিয়া ইহা বিভিন্ন ব্যক্তির সামর্থ্য অনুযায়ী ধার্য করা যায়। গরীব ব্যক্তির তুলনায় ধনী ব্যক্তির কর দেওয়ার ক্ষমতা বেশী। সুতরাং প্রত্যক্ষ করের দ্বারা ধনীদের উপর অধিক হারে এবং স্বল্প-আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর কম হারে কর ধার্য করা যায়। প্রয়োজন পড়িলে গরীবদিগকে কর হইতে সম্পূর্ণ-ভাবে মুক্তও রাখা যায়। সুতরাং দেখা যায়, প্রত্যক্ষ কর সমতার নিয়ম অনুসারে ধার্য করা যায় এবং ইহার দ্বারা করকে প্রগতিশীল (progressive) করা যায়। প্রগতিশীল কর সম্পর্কে একটু পরেই আলোচনা করা হইতেছে।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ কর সুনির্দিষ্ট থাকে বলিয়া লোকেদের করপ্রদান করিতে অসুবিধা হয় না। করপ্রদানকারীকে কত কর দিতে হইবে এবং উহা কখন দিতে হইবে, ইহা নির্দিষ্ট থাকে। সুতরাং কর দেওয়ার জন্য করপ্রদানকারী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

তৃতীয়ত, প্রত্যক্ষ কর উৎপাদনশীল (productive) হয়। আয়কর, সম্পদকর, কোম্পানীর আয়ের উপরে কর ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করগুলির মাধ্যমে সরকার প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব আদায় করিতে পারে।

চতুর্থত, প্রত্যক্ষ করের হার প্রয়োজনমতো বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যায়। সুতরাং করের হার পরিবর্তন করিয়া সরকার তাহার প্রয়োজনমতো রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারে।

পঞ্চমত, অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ করিতে সরকারের বিশেষ অসুবিধা হয় না, এবং কর-সংগ্রহের ব্যয়ের পরিমাণ বেশী হয় না।

ষষ্ঠত, ধনী ব্যক্তিদের আয় ও সম্পদের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করা হইলে প্রত্যক্ষ করের দ্বারা দেশের আয় ও সম্পদ-বণ্টনের অসমতা হ্রাস করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, করপ্রদানকারী প্রত্যক্ষ করের ভার অনুভব করে বলিয়া ইহা করপ্রদানকারীদের নাগরিক চেতনা (civic consciousness) জাগাইয়া তুলিতে পারে। ফলে সরকার কর-রাজস্ব কিভাবে ব্যয় করিতেছে, সে-সম্পর্কে তাহারা সচেতন হয়।

প্রত্যক্ষ করের দোষসমূহ : প্রথমত, প্রত্যক্ষ করের ভার অন্যের উপরে চাপানো যায় না বলিয়া এই কর লোকদের নিকট অপ্রিয় হইয়া ওঠে। এই কারণেই করপ্রদানকারীরা আয়কর, সম্পদকর ইত্যাদির বিরুদ্ধে নানারূপে অভিযোগ তুলিয়া থাকে।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ কর অনেক সময় সুবিধার নিয়মকে লঙ্ঘন করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, লোকেদের হাতে যখন কর দেওয়ার মতো টাকা থাকে না, তখন তাহাদিগকে কর দিতে বলা হয়।

তৃতীয়ত, প্রত্যক্ষ কর যাহার উপর ধার্য করা হয়, তাহাকেই কর দিতে হয় বলিয়া অনেক সময় করদাতারা ঐ কর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে। আয়কর বা সম্পদকর-দাতারা তাহাদের আয় ও সম্পদের মিথ্যা হিসাব দিয়া কর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে। ইহার ফলে সরকারের বিশেষ ক্ষতি হয়।

চতুর্থত, আয় ও সম্পদের উপর করের হার অতিমাত্রায় প্রগতিশীল হইলে দেশের সঞ্চয় ও মূলধন-গঠনের কাজ বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

পরিশেষে দেখা যায়, প্রত্যক্ষ কর দেশের সকলকে দিতে হয় না বলিয়া ইহা দেশের সকল ব্যক্তির মধ্যে নাগরিক চেতনা জাগাইয়া তুলিতে পারে না। শুধু যাহারা কর দেয়, তাহাদের মধ্যে নাগরিক চেতনা জাগ্রত হয় এবং শুধু তাহারাই সরকারের ব্যয় সম্পর্কে সচেতন হয়।

পরোক্ষ করের গুণসমূহ : প্রথমত, পরোক্ষ কর দ্বারা সরকার প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারে। চিনি, সিগারেট, দিয়াশলাই, কাপড়, তামাক ইত্যাদি বহুল ভোগের দ্রব্যগুলির উপর কর ধার্য করিয়া প্রত্যেক দেশে সরকার নিয়মিতভাবে অধিক পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। আমাদের দেশেও সরকার ঐ দ্রব্যগুলির উপর কর ধার্য করিয়া প্রতিবৎসর বিপুল পরিমাণে কর-রাজস্ব সংগ্রহ করিতেছে।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন দ্রব্যাদির উপর যে-সকল পরোক্ষ কর থাকে, তাহা ক্রেতারা ক্রয় করিবার সময়ই প্রদান করে বলিয়া কর-প্রদান করিতে লোকেদের বিশেষ অসুবিধা হয় না।

তৃতীয়ত, পরোক্ষ করের ভার লোকেরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে না বলিয়া ইহা তাহাদের নিকট অপ্রিয় হয় না।

চতুর্থত, পরোক্ষ কর দেশের সকল লোককেই কমবেশী স্পর্শ করে। সুতরাং রাষ্ট্রকার্য পরিচালনার জন্য দেশের সকলেই অর্থ প্রদান করিবে, এই নীতি পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়।

পঞ্চমত, মদ, গাঁজা, আফিম ইত্যাদি অনিষ্টকর দ্রব্যাদির উপর অতি উচ্চ হারে কর ধার্য করিয়া উহাদের ভোগের পরিমাণ হ্রাস করা যায়। ইহা ছাড়া, অতি-বিলাস দ্রব্যাদির ভোগের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ঐ সকল দ্রব্যাদির উপর উচ্চহারে

পরোক্ষ কর ধার্য করা যাইতে পারে। আমাদের দেশেও এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

ষষ্ঠত, ভারতের ন্যায় বিকাশশীল দেশে পরোক্ষ করের বিশেষ তাৎপর্য দেখা যায়। এই করের দ্বারা একদিকে যেমন উন্নয়ন-কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করা যায়, অন্যদিকে তেমনি ইহার দ্বারা উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে কাম্যপথে পরিচালিত করা যায়। বিলাস দ্রব্যসামগ্রীর উপর উচ্চহারে কর ধার্য করিয়া মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতাকেও উপশম করা যায়। আমদানি ও রপ্তানির উপর কর ধার্য করিয়া দেশের প্রয়োজনে বৈদেশিক বাণিজ্যকে পরিচালিত করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, বিভিন্ন দ্রব্যাদির উপর যে সকল কর থাকে, তাহা উহাদের দামের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায় বলিয়া লোকেরা এই কর সহজেই ফাঁকি দিতে পারে না।

পরোক্ষ করের দোষসমূহ : প্রথমত, পরোক্ষ কর ন্যায়নীতিকে লঙ্ঘন করে। ধনী ও গরীবকে একই হারে পরোক্ষ কর দিতে হয় বলিয়া ইহা ন্যায্য কর হয় না, অর্থাৎ, ইহা ধনী ও গরীবের সামর্থ্য অনুযায়ী ধার্য করা হয় না এবং ইহা অধোগতিশীল (regressive) হইয়া পড়ে। ফলে পরোক্ষ কর প্রদান করিতে ধনীর তুলনায় গরীবকে অধিক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়।

দ্বিতীয়ত, পরোক্ষ কর সুনিশ্চিত নহে। করের ভার একজনের নিকট হইতে অন্যের নিকট চালান করা হয় বলিয়া কর-প্রদানকারী কি পরিমাণে কর দিবে তাহা নিশ্চিত থাকে না। পরোক্ষ কর হইতে সরকারের কি পরিমাণ রাজস্ব সংগৃহীত হইবে, সে সম্পর্কেও সুনিশ্চয়তা থাকে না।

তৃতীয়ত, বাণিজ্য-শুল্ক ইত্যাদির ন্যায় কতকগুলি পরোক্ষ কর আছে, যাহা সংগ্রহ করিতে সরকারের বিশেষ অসুবিধা হয়। ইহা ছাড়া, লোকেরা বিক্রেতার সহযোগিতায় কোন কোন সময়ে বিক্রয়-কর ফাঁকি দিয়াও থাকে।

পরিশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে, পরোক্ষ করের ভার লোকেরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে না বলিয়া এই কর তাহাদের মধ্যে নাগরিক-চেতনা জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারে না।

ভারতের দৃষ্টান্ত : উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর উভয়ই দোষ-গুণে মিশ্রিত। এই কারণেই প্রত্যেক দেশের কর-ব্যবস্থার মধ্যে উভয় প্রকার করই দেখা যায়। আমাদের দেশের কর-ব্যবস্থার মধ্যেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, উভয় প্রকার কর আছে। তবে অন্যান্য বিকাশশীল দেশের ন্যায় ভারতে প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ করের গুরুত্ব অনেক বেশী। এই কারণে ভারতের কর-ব্যবস্থায় পরোক্ষ করের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। বর্তমানে ভারতে মোট কর-রাজস্বের (কেন্দ্রীয় সরকারের মোট কর-রাজস্ব) শতকরা মাত্র ১৯ ভাগ আসে প্রত্যক্ষ কর হইতে এবং পরোক্ষ কর হইতে আসে শতকরা

৮১ ভাগ। সামাজিক ন্যায়-বিচার (social justice) ও করভার সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের গুরুত্ব অনেক বেশী। কিন্তু উন্নয়নের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য দ্রুত অর্থ-সংস্থান করিতে হয় এবং উহার জন্য পরোক্ষ করের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভর করিতে হয়। এই কারণে ভারতে প্রতিটি পরিকল্পনার জন্য অর্থ-সংস্থানের উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণে অতিরিক্ত কররাজস্ব বিশেষত পরোক্ষ কর-রাজস্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।[১]

১০. প্রগতিশীল, সমানুপাতিক ও অধোগতিশীল কর (Progressive, Proportional and Regressive Taxes)ঃ দেশের লোকদের মধ্যে করভার কিভাবে বণ্টন করা হইবে সে সম্পর্কে তিনটি পদ্ধতি আছে। ঐ পদ্ধতিগুলি হইতেছে —প্রগতিশীল, সমানুপাতিক ও অধোগতিশীল। প্রগতিশীল কর (progressive tax) পদ্ধতিতে লোকেদের আয় বা সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে করের হার বৃদ্ধি পায়। ইহা নিম্নের উদাহরণে দেখানো হইল ঃ

করযোগ্য আয়ের পরিমাণ	করের হার	মোট কর
১০,০০০ টাকা	শতকরা ২০ টাকা	২,০০০ টাকা
১৫,০০০ ,,	,, ২৫ ,,	৩,৭৫০ ,,
২০,০০০ ,,	,, ৩০ ,,	৬,০০০ ,,

উপরের উদাহরণে দেখা যায়, আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে করের হার বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহাকেই 'প্রগতিশীল কর' বলে। আয়কর, সম্পদ-কর, দানকর ইত্যাদি প্রগতিশীল করের দৃষ্টান্ত। ভারতে এই করগুলি প্রগতিশীল হারে প্রবর্তন করা হইয়াছে।

সমানুপাতিক করের (proportional tax) ক্ষেত্রে আয় বা সম্পদের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, করের হার সবসময়ই অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ দেশের সকল লোকেদের নিকট হইতে তাহাদের আয়ের বা সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ কর হিসাবে সংগৃহীত হয়। ইহার নিম্নের উদাহরণে দেখানো হইল ঃ

করযোগ্য আয়ের পরিমাণ	করের হার	মোট কর
১০,০০০ টাকা	শতকরা ২০ টাকা	২,০০০ টাকা
১৫,০০০ ,,	,, ,, ,,	৩,০০০ ,,
২০,০০০ ,,	,, ,, ,,	৪,০০০ ,,

উপরের উদাহরণে দেখা যায়, আয়ের পরিমাণ যতই হউক না কেন, করের হার সকল ক্ষেত্রেই শতকরা ২০ টাকা রহিয়াছে। ইহাকে 'সমানুপাতিক কর' বলে।

অধোগতিশীল কর-পদ্ধতিতে (regressive tax method) আয় বা সম্পদের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে করের হার হ্রাস পায়। পরপৃষ্ঠায় ইহা দেখানো হইল ঃ

করযোগ্য আয়ের পরিমাণ	করের হার	মোট কর
১০,০০০ টাকা	শতকরা ২০ টাকা	২,০০০ টাকা
১৫,০০০ ,,	,, ১৫ ,,	২,২৫০ ,,
২০,০০০ ,,	,, ১২ ,,	২,৪০০ ,,

উপরের উদাহরণে দেখা যাইতেছে, আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে করের হার হ্রাস পাইতেছে। পরোক্ষ কর হইতেছে অধোগতিশীল। কারণ পরোক্ষ কর ধনী ও গরীবকে একই হারে দিতে হয়। ইহার ফলে আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গরীবদের তুলনায় ধনীদের উপর করের ভার অপেক্ষাকৃত কম হয়।

প্রগতিশীল করের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ ঃ এই তিন প্রকার কর-পদ্ধতির মধ্যে অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) প্রমুখ লেখকরা সমানুপাতিক করপদ্ধতি সুপারিশ করিয়াছিলেন। তিনি করের প্রথম নিয়মটিতে অর্থাৎ সমতার নিয়মটিতে বলিয়াছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ কর বাবদ দেওয়া হইলে কর-প্রদানের ক্ষেত্রে সমতার নিয়মকে স্বীকার করা হইবে এবং ঐভাবে কর ধার্য করিলে কর-ব্যবস্থা ন্যায্য হইবে। যেমন—যাহার ৫০০ টাকা আয়, সে শতকরা ৫ টাকা হারে ২৫ টাকা কর দিবে এবং যাহার ২,০০০ টাকা আয় সেই ব্যক্তিও শতকরা ৫ টাকা হারে ১০০ টাকা কর দিবে। ইহা ছাড়া, করের হার সকল স্তরে একই হইলে কর-ব্যবস্থা খুবই সরল হয়। কিন্তু আধুনিক লেখকরা প্রগতিশীল কর-পদ্ধতিকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন। ইহার সপক্ষে নিম্নের যুক্তিগুলি দেখানো হয় ঃ

ক. সামর্থ্যের যুক্তি ঃ প্রগতিশীল কর সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপর তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী স্থাপন করা যায়। সুতরাং করের হার ক্রমশ বৃদ্ধি করিয়া ধনীদের উপর চড়া হারে এবং নিম্ন-আয়ের ব্যক্তিদের উপর স্বল্প হারে কর ধার্য করা সম্ভব হয়।

খ. আয়ের উদ্বৃত্ত-অংশের উপর করধার্যের যুক্তি ঃ অধ্যাপক হবসন (Hobson) প্রগতিশীল করের সমর্থনে অন্য একটি যুক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে, ব্যক্তির আয়ের মধ্যে দুইটি উপাদান থাকে—উদ্বৃত্ত উপাদান (surplus element) ও ব্যয়-উপাদান (cost element)। ব্যয়-উপাদানের উপর কর ধার্য করা হইলে ব্যক্তির কর্মদক্ষতা ক্ষুন্ন হইবে। সুতরাং আয়ের উদ্বৃত্ত-উপাদানের উপরই কর ধার্য হওয়া উচিত। আয় বৃদ্ধি পাইলেও উহার উদ্বৃত্ত অংশ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আয়-বৃদ্ধির সঙ্গে করের হারও বৃদ্ধি করা আবশ্যক। ইহা একমাত্র প্রগতিশীল কর-পদ্ধতির দ্বারাই সম্ভব।

গ. আয় ও সম্পদ-বণ্টনের বৈষম্য হ্রাসের যুক্তি ঃ অধ্যাপক মার্শাল (Marshall) আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য প্রগতিশীল করের নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই করের মাধ্যমে ধনী সম্প্রদায়ের আয় ও সম্পদ হ্রাস করা সম্ভব হয়। ফলে সমাজে বণ্টন-ব্যবস্থায় সমতার ভাব আসে।

ঘ. ন্যূনতম ত্যাগ-স্বীকারের যুক্তি ঃ অধ্যাপক পিগু (Pigou) এই করের সমর্থনে 'ন্যূনতম ত্যাগ নীতি' (principle of minimum sacrifice) বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, কর-প্রদানের জন্য করদাতাদের যে-ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহা ন্যূনতম হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধনী ব্যক্তিদের নিকট টাকার প্রান্তিক উপযোগ কম বলিয়া কেবলমাত্র তাহাদের উপর প্রগতিশীল হারে কর-ধার্যের ব্যবস্থা করা হইলে কর-প্রদানের জন্য সমাজকে যে-ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহার মোট পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম হইবে।

ঙ. ভোগব্যয় ও কর্মনিয়োগ বৃদ্ধির যুক্তি ঃ লর্ড কেইন্স (Lord Keynes) সমাজে ভোগব্যয় ও কর্মনিয়োগ দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রগতিশীল করের সুপারিশ করিয়াছেন। ধনী ব্যক্তিদের তুলনায় গরীব ব্যক্তিদের নিকট প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা (marginal propensity to consume) অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। সুতরাং ধনীদের উপর চড়া হারে কর ধার্য করিয়া সেই কর-রাজস্ব গরীবদের জন্য ব্যয় করা হইলে, সমাজে মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। আবার সমাজে মোট ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে একদিকে যেমন কর্ম-নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর করা সম্ভব হইবে।

চ, উৎপাদনশীলতার যুক্তি ঃ প্রগতিশীল কর বিশেষ উৎপাদনশীল ; কারণ আয়, সম্পদ ইত্যাদির উপর প্রগতিশীল হারে কর ধার্য করিয়া সরকার প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব আদায় করিতে পারে।

প্রগতিশীল করের বিপক্ষে যুক্তিসমূহ ঃ কিন্তু প্রগতিশীল কর-পদ্ধতির সমালোচনা করা হয় ঃ

ক. প্রগতিশীল কর-পদ্ধতিতে করের হারকে যুক্তিসংগত উপায়ে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করা যায় না। উহা অনেকটা সরকারের খামখেয়ালীপনার উপর নির্ভর করে।

খ. আয় ও সম্পদের উপর করের হারকে অতিমাত্রায় প্রগতিশীল করা হইলে সঞ্চয় ও মূলধন-গঠনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

গ. এই করের বিরুদ্ধে আরও বলা হয়, উচ্চ-আয়ের ব্যক্তিদের আয়ের উপর চড়া হারে কর ধার্য করা হয় বলিয়া তাহাদের কাজ ও সঞ্চয় করার ইচ্ছা কমিয়া যায়।

ঘ. কর-ব্যবস্থাকে অতিমাত্রায় প্রগতিশীল করা হইলে, করপ্রদানকারীরা আয় ও সম্পদের মিথ্যা হিসাব পেশ করিয়া কর-ফাঁকি (tax-evasion) দেওয়ার চেষ্টা করে।

যাহাতে অতিমাত্রায় প্রগতিশীল না হয় এবং উহা যাহাতে উৎপাদন-কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

১১. সরকারী ঋণ—শ্রেণীবিভাগ, উদ্দেশ্যসমূহ, অর্থনৈতিক ফলাফল ও পরিশোধের উপায় (Public Debt—its Classification, Purposes, Economic Effects and Methods of Repayment) ঃ সরকারের আয়ের উৎসগুলি বর্ণনা করিতে গিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সরকারী ঋণ বা জাতীয় ঋণ বা জনসাধারণের ঋণ ব্যাপক অর্থে সরকারী আয়ের একটি উৎস। প্রকৃতপক্ষে ইহা সরকারের রাজস্বের উৎস নয়। এখন দেখা যাউক, সরকারী ঋণ বা জাতীয় ঋণ বলিতে কি বুঝায় ?

সরকারী ঋণ হইতেছে দেশের সরকারের বা দেশের জনসাধারণের ঋণ। দেশের কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিভিন্ন দেশীয় বা বিদেশী সূত্র হইতে যে-ঋণ গ্রহণ করে তাহাকে সরকারী ঋণ বলা হয়। প্রয়োজনমতো ব্যয় করিবার জন্য অনেক সময়ই দেশের সরকারকে ঋণ করিতে হয়।

সরকারী ঋণের প্রকারভেদ ঃ সরকারী ঋণ বিভিন্ন রূপে শ্রেণীবিভাগ করা হয় ঃ

১. অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বহিরাগত ঋণ ঃ দেশের অভ্যন্তরে সরকার লোকদের বা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে যে-ঋণ সংগ্রহ করে, তাহাকে অভ্যন্তরীণ ঋণ (internal debt) বলে। ইহা ছাড়া, দেশের সরকার আর্থিক উন্নয়নের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে ঋণ সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহাকে বহিরাগত ঋণ (external debt) বলে।

২. স্বেচ্ছাগত ঋণ ও বাধ্যতামূলক ঋণ ঃ দেশের লোকেরা স্বেচ্ছায় সরকারকে যে-ঋণ দেয় তাহা স্বেচ্ছাগত ঋণ (voluntary debt)। অধিকাংশ সরকারী ঋণই স্বেচ্ছাগত, যেমন—সরকারের ঋণপত্র ক্রয় করিয়া সরকারকে ঋণ প্রদান করা স্বেচ্ছাগত ঋণ। পক্ষান্তরে, যুদ্ধ বা অন্য কোন জরুরী পরিস্থিতিতে দেশের লোকেরা সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে যে ঋণ দেয়, তাহা হইতেছে বাধ্যতামূলক ঋণ (compulsory loan)। যেমন,—আমাদের দেশে কয়েক বৎসর পূর্বে যে-বাধ্যতামূলক আমানত ছিল তাহা এক ধরনের বাধ্যতামূলক ঋণ।

৩. উৎপাদনশীল ঋণ ও অনুৎপাদনশীল ঋণ ঃ রেল-পরিবহণ, জলসেচের কার্য, শিল্প-স্থাপন, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি উৎপাদনশীল কার্যের জন্য সরকার যে-ঋণ নেয়, তাহা হইতেছে উৎপাদনশীল ঋণ (productive debt)। এইপ্রকার ঋণের টাকা উৎপাদনশীল কার্যে ব্যবহার করা হয় বলিয়া ঋণের সমতুল্য সম্পদ থাকে এবং উহা হইতে সৃষ্ট আয়-দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা যায়। পক্ষান্তরে, যুদ্ধ ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল কার্যের জন্য সরকার যে-ঋণ গ্রহণ করে তাহাকে অনুৎপাদনশীল ঋণ (unproductive debt) বলা হয়। এই প্রকার ঋণের ফলে কোন সম্পদ সৃষ্টি

হয় না এবং ইহা পরিশোধ করিতে বিশেষ অসুবিধা হয়। অনুৎপাদনশীল ঋণকে মৃতভার ঋণও (deadweight debt) বলা হয়।

৪. আবদ্ধ ঋণ ও অনাবদ্ধ ঋণ: সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী সরকারী ঋণকে আবদ্ধ ঋণ (funded debt) বলা হয়, যেমন—সরকারী ঋণপত্র। স্বল্প-মেয়াদী সরকারী ঋণকে অনাবদ্ধ ঋণ বা ভাসমান ঋণ (unfunded or floating debt) বলা হয়, যেমন—ট্রেজারী বিল (treasury bills)।

৫. পরিশোধযোগ্য ঋণও অপরিশোধযোগ্য ঋণ: যে ঋণ পরিশোধের সময়মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে, তাহা হইতেছে পরিশোধযোগ্য (redeemable) ঋণ। কিন্তু যে-ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট সময়-মেয়াদ থাকে না, তাহা হইতেছে অপরিশোধযোগ্য (unredeemable) ঋণ।

ভারতের দৃষ্টান্ত: সালের মার্চ মাসের শেষে ভারত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৫,৩৫৬ কোটি টাকা—অর্থাৎ মোট অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনের ৩৩ শতাংশ—উহার মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিাণ ছিল ৫০,০৪৫ কোটি টাকা এবং বহিরাগত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫,৩১১ কোটি টাকা। ভারত সরকারের ঋণের ৯০ শতাংশ হইতেছে উৎপাদনশীল; কারণ উহার পশ্চাতে উৎপাদনশীল সম্পদ রহিয়াছে। ভারতে পরিকল্পনাধীন সময়ে সরকারের ঋণ বিশেষ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারত সরকারের ন্যায় বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলিরও যথেষ্ট ঋণ রহিয়াছে; ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসের শেষে রাজ্য সরকারগুলির মোট ঋণ-দায়ের (debt liabilities পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭,৯৮৪ কোটি টাকায়।[১]

সরকারী ঋণের উদ্দেশ্যসমূহ: সরকার যে যে উদ্দেশ্যে ঋণ সংগ্রহ করে, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি হইতেছে প্রধান:

ক. বাজেটে ঘাটতি মিটাইবার জন্য ঋণ: সরকারের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবকে 'বাজেট' (budget) বলে। সরকারের বাজেটে প্রত্যাশিত আয়ের পরিমাণ সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ অপেক্ষা কম হইলে, সরকারের বাজেটে ঘাটতি (deficit) দেখা যায়। ঐ ঘাটতি পূরণ করার জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে।

খ. জরুরী প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ঋণ: দেশে যুদ্ধ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি জরুরী (emergency) অবস্থা দেখা দিলে ব্যয়ের তুলনায় সরকারের রাজস্ব পর্যাপ্ত হয় না বলিয়া সরকার ঐ অবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য ঋণ করে। যেমন—বিগত চৈনিক ও পাকিস্তানী আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সরকার আমাদের দেশের লোকদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল।

গ. উন্নয়নমূলক ব্যয়ের জন্য ঋণ: দেশের সরকারকে নানারূপ উন্নয়নমূলক ব্যয়ের জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। ভারতের ন্যায় পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় দ্রুত

আর্থিক উন্নয়নের জন্য সরকারকে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত, উভয় প্রকার ঋণই গ্রহণ করিতে হয়।

ঘ. সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য ঋণ: সরকারী ঋণের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে সঞ্চয় বৃদ্ধি করা যায়। সরকার ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া ঋণ সংগ্রহ করিলে দেশের লোকেরা তাহাদের সঞ্চয় সরকারী ঋণপত্রে বিনিয়োগ ব র সুযোগ পায়।

ঙ. মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ ও অর্থনৈ সংকট অবসানের জন্য ঋণ: দেশে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সরকার লোকদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহাদের ব্যয় করার ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং উহার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিহত হয়। পক্ষান্তরে, আর্থিক সংকটের সময় সরকার ঋণ সংগ্রহ করিয়া রাস্তাঘাট, সেতু, ঘরবাড়ী ইত্যাদি নির্মাণমূলক কার্যে অর্থ বিনিয়োগ করিলে দেশের লোকদের কর্মনিয়োগ ও আয় বৃদ্ধি পায় এবং উহার ফলে সংকটের কিছুটা অবসান ঘটে।

সরকারী ঋণের অর্থনৈতিক ফলাফল: সরকারী ঋণের নানারূপ অর্থনৈতিক ফলাফল দেখা যায়:

প্রথমত, সরকারী ঋণ-গ্রহণ, ঋণের টাকা ব্যয় এবং ঋণ-পরিশোধের ফলে দেশের এক শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে অন্য শ্রেণীর লোকদের নিকট টাকাকড়ি স্থানান্তরিত হয়। বলা হয়, অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে ঐ স্থানান্তর দেশের লোকদের মধ্যেই হয় বলিয়া ইহার কোন বোঝা (burden) নাই, কিন্তু বহিরাগত ঋণের ফলে দেশের বাহিরে টাকাকড়ি চলিয়া যায় বলিয়া উহার বোঝা থাকে। কিন্তু ইহা সত্য নহে, কারণ অভ্যন্তরীণ ঋণেরও বোঝা থাকে।

দ্বিতীয়ত, ব্যাংকের নিকট হইতে সরকারী ঋণ গ্রহণ করা হইলে ব্যাংক-ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু জনসাধারণের নিকট হইতে উহা লওয়া হইলে লোকেদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং উহার ফলে দাম হ্রাস পাইতে পারে।

তৃতীয়ত, সরকারী ঋণের ফলে দেশের জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বিনিয়োগের সুযোগ পায়।

চতুর্থত, ঋণের দ্বারা সরকার উৎপাদনকার্য সম্পন্ন করিলে প্রাকৃতিক সম্পদের বিলিবণ্টনের গতি বা দিক্ পরিবর্তন হয়।

পরিশেষে, সরকারী ঋণের দ্বারা একদিকে যেমন জরুরী পরিস্থিতির অবসান ঘটানো যায়, অন্যদিকে তেমনি বিকাশশীল দেশে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা যায়।

ঋণ পরিশোধের উপায়: আধুনিককালে সরকার নানা উদ্দেশ্যে যুক্তিসংগত কারণে ঋণ করিতেছে। সরকারকে ঐ ঋণের উপর নিয়মিত সুদ এবং ঐ ঋণ পরিশোধের জন্য বিশেষ কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে সরকারী ঋণ পরিশোধের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট উপায় আছে:

১. বাজেট-উদ্বৃত্ত (Budget Surplus): সরকারের বাজেটে উদ্বৃত্ত (অর্থাৎ ব্যয়ের তুলনায় আয় অধিক) থাকিলে তাহা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা যায়।

২. ঋণ-পরিশোধ সঞ্চিত তহবিল (The Sinking Fund): সরকারী ঋণ পরিশোধ করার জন্য একটি বিশেষ তহবিল তৈয়ার করা হয় এবং সরকারের রাজস্ব হইতে নিয়মিতভাবে ঐ তহবিলে অর্থ জমা রাখা হয়। তহবিলে সঞ্চিত অর্থ পর্যাপ্ত হইলে তাহার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হইয়া থাকে।

৩. ঋণ-রূপান্তর (Conversion): ঋণ-রূপান্তর দ্বারা ঋণের ভার লাঘব করা হয়। বাজারে সুদের হার হ্রাস পাইলে সরকার কম সুদের হারে নূতন ঋণ গ্রহণ করে এবং উচ্চ সুদের হারে গৃহীত ঋণের সঙ্গে উহা পরিবর্তন বা বিনিময় করে। ঋণের এইরূপ রূপান্তর দ্বারা সরকারী ঋণের উপর সুদের বোঝা হ্রাস করা হয়।

৪. ঋণ-অস্বীকার (Repudiation): পূর্বতন সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন ঋণ বর্তমান সরকার পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিতে পারে। এইরূপ অস্বীকার করা স্বাভাবিক অবস্থায় সম্ভব হয় না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বিপ্লবের পরে নূতন সরকার পূর্বেকার সরকারের ঋণ অস্বীকার করিয়া থাকে এবং ইহার ফলে ঋণ পরিশোধ হইয়া যায়।

৫. মূলধন-সম্পদের উপর বিশেষ কর (Capital Levy): যুদ্ধ বা অন্যান্য জরুরী পরিস্থিতির সময়ে গৃহীত ঋণের পরিমাণ অত্যধিক হইলে তাহা পরিশোধ করার জন্য মূলধন-সম্পদের উপর বিশেষ কর ধার্য করা হয়। যুদ্ধের সময় মূলধন-সম্পদের দাম বৃদ্ধি পায়; সুতরাং যুদ্ধের পরে মূলধন-সম্পদের উপর কর ধার্য করা হইলে তাহা অন্যায্য হয় না। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপের কতকগুলি দেশে এই প্রকার বিশেষ কর ধার্য করিয়া যুদ্ধকালীন সরকারী ঋণ শোধ করা হইয়াছিল।

ভারতেও কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকারগুলি বিভিন্ন প্রকার ব্যয় মিটাইবার জন্য ঋণ গ্রহণ করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে দেশের প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সরকারকে অধিক পরিমাণে ঋণ সংগ্রহ করিতে হইতেছে।

১২. **ঘাটতি ব্যয় (Deficit Financing)**: আধুনিক কালে সরকারের ক্রমবর্ধমান ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি বহু দেশেই গৃহীত হইয়াছে; ইহা হইতেছে ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতি। সরকারের বাজেটে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান হইবে—ইহাই রাজস্ব-নীতির মূল সূত্র ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে দেখা যায় সরকারের রাজস্বের স্বাভাবিক সূত্রসমূহ হইতে যে-পরিমাণ রাজস্ব সংগৃহীত হয়, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত হয় না। এই কারণেই সরকারের বাজেটে ঘাটতি দেখা দেয়। সুতরাং কর, শুল্ক প্রভৃতি রাজস্ব-পদ্ধতির দ্বারা সংগৃহীত অর্থ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের লাভ হইতে সরকারের যে-চলতি আয় হয়, তাহার অধিক

ব্যয় করাকেই (ব্যয়>আয়) ঘাটতি ব্যয় (deficit financing) বলা হয়। ঐ ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার উহার অতীত সঞ্চয় হইতে অর্থ তুলিয়া লয় বা অতিরিক্ত নোট (printing of additional paper-notes) ছাপায়। ইহার ফলে, দেশে টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পায়। কারণ, সরকারী সঞ্চয় হইতে অর্থ তুলিয়া ব্যয় করা হইলে ঐ টাকা ক্রিয়াশীল হয়। আবার, সরকারের বাজেটের ঘাটতি পূরণ করার জন্য অতিরিক্ত নোট ছাপাইলে টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং উভয় কারণের জন্য ঘাটতি-ব্যয়ের ফলে টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সময়ে ইউরোপের কতকগুলি দেশ যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ঘাটতি ব্যয়-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বাজেটের রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্ত, সরকারী ঋণ, সঞ্চয়, অতিরিক্ত কর, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির আয়, বৈদেশিক সাহায্য ইত্যাদি সূত্রগুলি হইতে পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনমতো অর্থসংগ্রহ করা যায় না। তাই আজকাল স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে দ্রুত আর্থিক উন্নয়নের জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হইতেছে। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহের নিমিত্ত এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হয়। ভারতের প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় ২৪২০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হইয়াছিল এবং চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় উহার জন্য বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ২০৬০ কোটি ও ১৩৫৪ কোটি টাকা। বিগত ষষ্ঠ পরিকল্পনায়। ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ৫০০০ কোটি টাকায় ও চলতি সপ্তম পরিকল্পনায় উহার পরিমাণ ১৪,০০০ কোটি টাকায় ধার্য করা হয়। আমাদের দেশে ঘাটতি ব্যয়ের জন্য সরকার রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে এবং রিজার্ভ ব্যাংক নূতন নোট ছাপাইয়া উহা পূরণ করিয়া লয়।

গুরুত্ব : আধুনিক কালের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কেইন্স (Lord Keynes) ঘাটতি ব্যয়ের সমর্থনে বলেন, স্বল্পান্নত দেশগুলিতে ঘাটতি ব্যয়-পদ্ধতি অবলম্বন করা হইলে সরকার দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যসূচী রূপায়ণ করিতে পারিবে। ইহার ফলে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে আয়ের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটিবে, লোকেদের পূর্ণ কর্মসংস্থানের (full-employment) ব্যবস্থা হইবে এবং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হইবে। আবার, ঘাটতি ব্যয়-পদ্ধতির জন্য বিশেষ অতিরিক্ত কর ধার্যের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু ঘাটতি ব্যয়ের ফলে দেশে টাকাকড়ির যোগান দ্রুত বৃদ্ধি পায় অথচ নানা কারণে দ্রব্যাদির যোগান দ্রুত বৃদ্ধি পায় না বলিয়া দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আশংকা থাকে। এই আশংকা নেহাৎ অমূলক নহে, তাহা ভারতের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে। ভারতের প্রথম দুইটি পরিকল্পনায় অতি মাত্রায় ঘাটতি ব্যয়ের ফলে দ্রব্যমূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পায়। একমাত্র দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে ভারতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় ৩০ শতাংশ। এই কারণেই ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণকে হ্রাস করিয়া ৫৫০ কোটি টাকায় ধার্য করা হইয়াছিল। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ আরও অধিক হইয়াছিল এবং উহার মোট পরিমাণ হয় ২৪২০ কোটি টাকা। আবার ঘাটতি ব্যয় সরকারকে

ব্যয়বাহুল্যের বা অপচয়মূলক ব্যয়ের প্রেরণা যোগায়। এই কারণে পরবর্তী পরিকল্পনা-গুলিতে ঘাটতি ব্যয়-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করিয়া ইহার অপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস করা হইয়াছে। সম্প্রতি চক্রবর্তী কমিটি (১৯৮৫) ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতির যে-প্রবণতা দেখা যায় তাহা প্রতিরোধ করার জন্য উহার পরিমাণকে নিরাপদ-সীমার মধ্যে রাখার জন্য সুপারিশ করিয়াছে।[১]

কিন্তু ঘাটতি ব্যয়-পদ্ধতি সকল পরিস্থিতিতেই মুদ্রাস্ফীতিজনক হয় না। এই পদ্ধতি সার্থক করিতে হইলে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণকে নিরাপদ সীমার মধ্যে রাখিতে হয়। টাকাকড়ির যোগান ও ব্যাংক-ঋণের পরিমাণ যাহাতে অত্যধিক না হয়, তাহার জন্য উপযুক্ত অর্থ-সংক্রান্ত নীতি অনুসরণ করিতে হয় এবং মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবিধানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইতে হয়। ইহা ছাড়া, দেশে উৎপাদন-বৃদ্ধি ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিলে ঘাটতি ব্যয়ের সুফলগুলি ভোগ করা যায়।

১৩. আধুনিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ (Economic Functions of a Modern State): দেশের অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারণা ও মতবাদ প্রচলিত ছিল। প্রাচীনপন্থী সওদাগরবাদের (mercantalism) সমর্থকরা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে দীর্ঘকাল ইংলন্ডে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে সমর্থন করিত।[২] কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ ধারণা পরিত্যক্ত হয়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর 'ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ' (individualism) ধারণা অনুযায়ী সরকার দেশের অর্থনৈতিক ব্যাপারে কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিবে না; অর্থাৎ, দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ব্যাপারে সরকার 'ছাড়িয়া দাও' (*laissez faire*) নীতি অনুসরণ করিবে। সরকার শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরে আইন ও শৃংখলা বজায় রাখিবে এবং বহিরাক্রমণের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবে অর্থাৎ সরকার কেবলমাত্র প্রাথমিক বা রক্ষণমূলক কার্যকলাপ (primary or protective functions) সম্পাদন করিবে। দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ব্যক্তির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং ব্যক্তির অর্থনৈতিক ব্যাপারে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা থাকিবে। অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith), রিকার্ডো (Ricardo), ম্যালথাস (Malthus) প্রভৃতি অর্থনীতিবিদগণ এই ধারণার সমর্থক ছিলেন।

কিন্তু কালক্রমে পূর্বেকার ধারণাটি লোপ পায় এবং তাহার পরিবর্তে উদ্ভব হয় সমাজতন্ত্রবাদ (socialism) ধারণা। এই ধারণা অনুযায়ী অর্থনৈতিক ব্যাপারে সরকার সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া লোকদের কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানে পূর্বেকার 'পুলিশী রাষ্ট্রের' (police state) পরিবর্তে দেখা যায় 'কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র' (welfare state)। এই কারণে আধুনিক রাষ্ট্রকে দেশের লোকদের কল্যাণবৃদ্ধি এবং দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নানাবিধ অর্থনৈতিক কার্য-

কলাপ সম্পাদন করিতে হয়। আধুনিক রাষ্ট্রের কয়েকটি প্রধান অর্থনৈতিক কার্য-কলাপ নিম্নে আলোচনা করা হইল ঃ

১. দেশের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঃ আধুনিক রাষ্ট্র বা সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক কাজ হইতেছে দেশের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। ইহার জন্য আধুনিক সরকার দেশের কৃষি ও শিল্পজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার দিকে দৃষ্টি দেয়, দেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায়, অধিক সংখ্যায় ঘরবাড়ি, স্কুল, কলেজ, চিকিৎসাকেন্দ্র, আমোদপ্রমোদ কেন্দ্র ইত্যাদি নির্মাণ করার ব্যবস্থা করে। আবার, দেশে দরিদ্রশ্রেণীর লোকদের জন্য 'ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ কার্যক্রম' (minimum needs programme) রূপায়ণের ব্যবস্থা করিতে হয়। কিন্তু জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সমস্যা সকল দেশেই একপ্রকারের নহে। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে লোকদের জীবনযাত্রার মান ইতিমধ্যেই অনেক উচ্চ হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল দেশের সরকার ঐ উচ্চ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিয়া উহা আরও উন্নত করার চেষ্টা করে। কিন্তু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে জীবনযাত্রার মান খুবই নীচু। সুতরাং ভারতে লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিতে হইলে দ্রুত আর্থিক উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা করিতে হইবে। ভারতে উন্নয়ন-পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকার সেই চেষ্টাই করিয়া আসিতেছে।

২. বেকার সমস্যার সমাধান ও পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ঃ আধুনিক রাষ্ট্রের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক কাজ হইতেছে, বেকার-সমস্যার সমাধান করিয়া দেশের লোকেদের জন্য পূর্ণ কর্ম-সংস্থানের (full-employment) ব্যবস্থা করা। ১৯২৯-৩২ সালে আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে যে বিরাট অর্থনৈতিক বিপর্যয় (Great Depression) দেখা দিয়াছিল, উহার ফলে পৃথিবীর বহু দেশে বেকার-সমস্যা প্রকট হইয়াছিল। উহার পর হইতেই অধিকাংশ দেশের লোকেদের জন্য পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে একরূপ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। দেশে বেকারের সংখ্যা হ্রাস করিয়া অধিকসংখ্যক নিয়োগের সৃষ্টির জন্য আধুনিক সরকার দেশের লোকেদের দ্রব্যাদি ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি ও দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য আধুনিক সরকার অর্থের যোগান বাড়ায় এবং করের ব্যাপারে সুবিধা দেয়। ইহা ছাড়া, সরকার নিয়মিতভাবে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী কলকারখানা, সেতু ইত্যাদি নির্মাণমূলক কাজ করিয়া থাকে এবং উহার ফলেও দেশে নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

ভারতের দৃষ্টান্ত ঃ ভারতে সরকার উন্নয়ন-পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে বেকার-সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করিতেছে। শিল্পের উন্নয়ন, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার, রাস্তাঘাট নির্মাণ, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, গ্রামীণ নির্মাণমূলক কার্য, জলসেচ প্রকল্প রূপায়ণ, কৃষির পুনর্গঠন ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার দেশের লোকের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াইতেছে। প্রকৃতপক্ষে কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসার করা ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

৩. **অর্থনৈতিক বৈষম্য-হ্রাস ও দারিদ্র দূরীকরণ :** সোভিয়েত ইউনিয়ন, নয়া চীন প্রভৃতি পুরাপুরি সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে সম্পদ ও আয় বণ্টনের অসমতার সমস্যা নাই বলিলেই চলে। কিন্তু যে-সকল দেশে পুরাপুরি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেইসকল দেশে ঐ সমস্যা খুবই জটিল। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে এই সমস্যা প্রকটরূপ ধারণ করিয়াছে। ঐ সকল দেশে এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য ধনী ও গরীবের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করা সরকারের একটি অন্যতম কর্তব্য। দেশের অধিকাংশ দরিদ্র লোকেরা যখন ন্যূনতম খাদ্য, বস্ত্রাদি ও বাসস্থান সংগ্রহ করিতে পারে না, তখন দেশের মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তিগণ অতি-বিলাসে সুদৃশ্য বৃহৎ প্রাসাদে প্রাচুর্যের মধ্যে জীবনযাপন করিবে, ইহা কোন কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের সরকার মানিয়া লইতে পারে না। এই কারণেই আধুনিক সরকার নানারূপ ব্যবস্থার দ্বারা একদিকে বিত্তবান ব্যক্তিদের আয় ও সম্পদের পরিমাণ হ্রাস করিবার চেষ্টা করে এবং অন্যদিকে দরিদ্র ব্যক্তিদের আয় ও সম্পদ বাড়াইবার প্রয়াস করে।

ভারতের দৃষ্টান্ত : ভারতেও সরকার ধনী-গরীবের ব্যবধান হ্রাস করিবার জন্য ধনী ব্যক্তিদের আয়ের উপর অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে কর ধার্য করিয়াছে এবং উহাদের সম্পদের উপর সম্পদ কর চাপাইয়াছে। অন্যদিকে, স্বল্প-আয়বিশিষ্ট লোকদিগকে অধিকতর অর্থনৈতিক সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি বিষয়গুলির জন্য সরকার অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতেছে। বর্তমানে বিশেষত সপ্তম পরিকল্পনায় 'গরীবী হঠাও' বা 'দারিদ্র্যের অপসারণ' (removal of poverty) সরকারের অর্থনৈতিক কাজকর্মের একটি মৌল লক্ষ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনায় দারিদ্র্য-সীমারেখার (poverty line) নীচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩৭ শতাংশ হইতে হ্রাস করিয়া ২৬ শতাংশে আনার এক বিরাট কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছে। প্রগতিশীল আয়কর, সম্পত্তি বা মৃত্যু কর (বর্তমানে লুপ্ত), সম্পদ কর, কৃষি ও শহুরে জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর প্রসারের পথে বাধানিষেধ আরোপ, রাজন্য ভাতার বিলোপ ইত্যাদি দ্বারা ভারতে আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য হ্রাসের চেষ্টা চলিতেছে। আবার, বেকার সমস্যার সমাধান এবং 'ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ প্রকল্প' (minimum needs programme) রূপায়ণের মাধ্যমে দারিদ্র্যের দ্রুত অপসারণের চেষ্টা চলিতেছে।

৪. **সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা :** সামাজিক নিরাপত্তা বলিতে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার (যেমন—দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, বার্ধক্য, বেকারত্ব ইত্যাদি) হাত হইতে লোকদের রক্ষা করার ব্যবস্থাকেই বুঝায় এবং ঐ ব্যবস্থা দেশের সরকারই করিয়া দেয়। আধুনিক সরকারকে ঐসকল অনিশ্চয়তার হাত হইতে লোকেদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করিতে হয়। আজকাল প্রত্যেক কল্যাণব্রতী দেশে সামাজিক বা জাতীয় বীমার দ্বারা দেশের সরকার সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতেছে। আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন,

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশে লোকেদের জন্য ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা চালু আছে।

ভারতের দৃষ্টান্ত ঃ ভারতে স্বাধীনতার পূর্বে শিল্প-শ্রমিকদের জন্য স্বল্পাকারে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে একটি ব্যাপক আইন গৃহীত হয়।[১] ঐ আইন অনুসারে শিল্প-শ্রমিকরা পীড়িতাবস্থায় সাহায্য, অকর্মণ্য অবস্থায় সাহায্য, চিকিৎসার সুবিধা ইত্যাদি ভোগ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, ১৯৫২ সালে আর একটি আইন দ্বারা কর্মচারীদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।[২] তদুপরি, সম্প্রতি শ্রমিকদের জন্য পরিবার-পেনসন্-ব্যবস্থা (family pension) ও গ্র্যাচুইটি প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে।[৩] কিন্তু ভারতের সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বিশেষ ব্যাপক নহে। কারণ শুধুমাত্র বিশেষ ধরনের শিল্পশ্রমিকরা এই নিরাপত্তা ভোগ করিতেছে।

৫. **কৃষির উন্নয়ন ঃ** কৃষিপ্রধান দেশগুলিতে কৃষির সর্বাংগীণ উন্নতির জন্য সরকারকে নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। কৃষকদিগকে স্বল্পসুদে ঋণপ্রদান, সমবায় পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা, কৃষির যন্ত্রীকরণ, জলসেচের প্রসার ইত্যাদি ব্যবস্থা-গুলির মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হয়।

ভারতের দৃষ্টান্ত ঃ ভারতেও সরকার কৃষির উন্নতির জন্য উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া, ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে কৃষির উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কৃষির উন্নয়নের জন্য সমবায় খামার প্রবর্তন, জলসেচের প্রসার, উচ্চ ফলনশীল বীজের (high-yielding variety seeds বা সংক্ষেপে HYV) প্রয়োগ, ভূমিব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, কৃষির যন্ত্রীকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, ভারতে কৃষির ক্ষেত্রে অভিনব এবং উন্নত কার্য-প্রণালী প্রয়োগের ফলে বর্তমানে জমির উৎপাদন-শক্তি ও হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। উচ্চফলনশীল বীজের উৎপাদন ও উহার ব্যাপক প্রয়োগের ফলে ভারতে বর্তমানে কৃষির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসিয়াছে। ইহাকে 'সবুজ বিপ্লব' (Green Revolution) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

৬. **শিল্পনিয়ন্ত্রণ ও শিল্পের প্রসার ঃ** অধিকাংশ কল্যাণব্রতী দেশে সরকার দেশের লোকেদের কল্যাণ বৃদ্ধি করার জন্য শিল্প-নিয়ন্ত্রণ ও শিল্প-প্রসারের ব্যবস্থা করিতেছে। বে-সরকারী ক্ষেত্রে যে-সকল শিল্প আছে, সেইগুলি যাহাতে জনস্বার্থে পরিচালিত হয় এবং উহারা যাহাতে ভোগকারীদের নিকট হইতে অন্যায্য দাম আদায় করিতে না পারে তাহার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ভারতের দৃষ্টান্ত ঃ এই সম্পর্কে ভারতের ১৯৫১ সালে শিল্প (উন্নয়ন ও

নিয়ন্ত্রণ) আইনটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই আইনের দ্বারা ভারত সরকার বে-সরকারী শিল্পগুলির উৎপাদিত দ্রব্যের গুণ ও দাম ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, কোন বে-সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে জনস্বার্থে পরিচালিত না হইলে সরকার উহার পরিচালনার ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইতে পারে। উপরন্তু, কোন কোন দেশে সরকার গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জাতীয়করণ করিয়া উহা রাষ্ট্রের মালিকানায় ও পরিচালনায় আনে। ১৯৪৮ ও ১৯৫৬ সালের ভারত সরকারের শিল্পনীতিতে শিল্পোন্নয়নের দায়িত্ব সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হয়। বর্তমানে বীমা-ব্যবসা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বড় বড় ব্যাংক, ডাক ও তার, রেল ও বিমান পরিবহণ, সামরিক অস্ত্র উৎপাদন ইত্যাদি সরকারের মালিকানায় ও পরিচালনায় গঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮০-এর (জুলাই) বর্তমান শিল্পনীতিতে শিল্পোন্নয়নের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ভূমিকা আরও প্রসারিত করা হয়। আবার কোন কোন দেশে শিল্পের ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রসার প্রতিরোধ করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় আইনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ভারতেও এই উদ্দেশ্যে 'একচেটিয়ামূলক ও অন্তরায়মূলক ব্যবসা-আচরণ প্রতিরোধ আইন' (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act) প্রণয়ন করা হইয়াছে।

শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সরকার দেশে শিল্পের প্রসারের চেষ্টা করে। প্রত্যেক দেশেই সরকার শিল্পের উন্নতির জন্য শিল্পগুলিকে নানারূপ সুযোগ-সুবিধা দেয়। বর্তমানে জাপানে যে শিল্পপ্রসার দেখা যাইতেছে তাহা বহুলাংশে সরকারের প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হইয়াছে। ভারতেও সরকার শিল্পের উন্নয়নের জন্য নানারূপ কাজ করিতেছে। যেমন, স্বাধীনতার পরে ভারতের শিল্পগুলি যাহাতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে তাহার জন্য ভারত সরকার শিল্প-অর্থ যোগান করপোরেশন, শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি গঠন করিয়াছে। ইহা ছাড়া, ভারত সরকার স্বীয় উদ্যোগে দুর্গাপুর, ভিলাই, রৌরকেল্লা ও বোকারোতে চারটি ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে যন্ত্রপাতির কারখানা, সার তৈয়ারীর কারখানা, ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা ইত্যাদি গঠন করিয়াছে। বৃহৎ শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নের ব্যবস্থাও করিতে হয়। ভারত সরকারের বর্তমান শিল্পনীতিতে (জুলাই, ১৯৮০) ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের প্রসারের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। আবার রুগ্ন শিল্পের পরিচালনা ও অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্পের উন্নয়ন সরকারকে করিতে হয়।

৭. **অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসমূহের যুক্তিযুক্ত বন্টন :** আধুনিককালে প্রায় প্রত্যেক দেশেই সরকার জনসাধারণের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী বন্টনের ব্যবস্থা করে। ইহার জন্য দেশের সকল স্থানেই ন্যায্য-মূল্যের দোকান (fair price shops) গঠন করা হয়। ভারতেও সরকার অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বন্টনের জন্য সরকারী কার্যক্রম (public distrbution of essential goods) চালু করা হইয়াছে। উহাদের দাম

নিয়ন্ত্রণের জন্য 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন' (Essential Commodities Act) গৃহীত হইয়াছে।

৮. টাকাকড়ির মূল্যের স্থায়িত্বরক্ষা : আধুনিক রাষ্ট্রের আর একটি অন্যতম অর্থনৈতিক কাজ হইতেছে, টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষা করা। এই কারণে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে সরকার দ্রব্যমূল্য হ্রাসের জন্য আয়, মুনাফা, ভোগব্যয় ইত্যাদির উপরে কর ধার্য করে বা উহাদের উপরে ধার্য করের হার বৃদ্ধি করে। আবার, দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধের জন্য দেশের সরকার ইহার ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করে। ইহা ছাড়া, সাধারণ লোক পরিশ্রম করিয়া যে-সঞ্চয় করে, টাকাকড়ির মূল্য হ্রাস পাইলে সঞ্চয়ের মূল্য হ্রাস পাইবে এবং সঞ্চয়কারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ইহার জন্যও টাকা-কড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে হয়।

ভারতেও সরকার টাকার (rupee) মূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য স্বীয় উদ্যোগে করের হারের পরিবর্তন, সরকারী ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি, রিজার্ভ ব্যাংকের ব্যাংক-ঋণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করার প্রচেষ্টা করিতেছে।

৯. ব্যাংক ও মুদ্রা-ব্যবস্থার সুষ্ঠু গঠন : দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও মুদ্রা-ব্যবস্থা সুসংগঠিত ও সুদৃঢ় করার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। সরকার এই কাজ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে করিয়া থাকে।

ভারতে সরকার রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে ১৯৪৯ সালের 'ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইনের' সাহায্যে ব্যাংক ও মুদ্রা-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতেছে। ইহা ছাড়া, ভারত সরকার ব্যাংকগুলির (বর্তমানে বেসরকারী ব্যাংকগুলির) কার্যাবলীর উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (social control of banks) প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। দেশে ব্যাংক-ক্রেডিট যাহাতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রের জন্য, যেমন—কৃষিকার্য, ক্ষুদ্রশিল্প ও রপ্তানি-বাণিজ্য—পাওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে এইরূপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। আবার, ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে ভারত সরকার ভারতের ১৪টি শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক জাতীয়করণ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে আরও ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়।

১০. বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ : দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের আর-একটি অর্থনৈতিক কাজ। প্রত্যেক দেশেই সরকার কম-বেশী আমদানির পরিমাণ হ্রাস ও রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা করে। বিদেশী দ্রব্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশীয় শিল্পসমূহকে সংরক্ষণের সুবিধা দেয়। আবার রপ্তানি প্রসারের জন্য রপ্তানি-পণ্য উৎপাদকগণকে পরিবহণ, ঋণ ইত্যাদি ব্যাপারে নানারূপ সুবিধা দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে শুধুমাত্র সরকারের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানির কাজ সম্পন্ন হয়।

ভারতের দৃষ্টান্ত : ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের জন্য ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন (State Trading Corporation বা সংক্ষেপে STC)

গঠন করা হইয়াছে এবং পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি অনুরূপ সংস্থা গঠিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ভারত সরকার রপ্তানি প্রসারের জন্য রপ্তানি প্রসার পরিষদ, রপ্তানি ঝুঁকি-বীমা করপোরেশন ইত্যাদি সংগঠনগুলি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

১১. **শিল্প-শ্রমিকদের কার্যের শর্তাবলীর উন্নয়ন ও শ্রমকল্যাণের প্রসার ঃ** কার্যের শর্তাবলী বলিতে কাজের সময়মেয়াদ, শ্রমিকের মজুরি, শ্রমিক নিয়োগ, ছুটির সুবিধা ইত্যাদি বিষয়গুলি বুঝায়। প্রত্যেক দেশেই সরকার কার্যের শর্তাবলীর উন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়া শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ করে এবং উহাদের কল্যাণ বৃদ্ধি করে। ইহা ছাড়া, শ্রমিক-মালিকদের মধ্যে সদ্ভাব রাখার জন্য সরকার ব্যবস্থা করে। শ্রমকল্যাণ প্রসারের উদ্দেশ্যে দেশের সরকার শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য মজুরি, উপযুক্ত বাসস্থান, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি দেয়। এই উদ্দেশ্যে প্রায় প্রত্যেক দেশেই কারখানা আইন, শ্রমবিরোধ নিষ্পত্তি আইন প্রভৃতি প্রণীত হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের ১৯৪৮ সালের কারখানা আইন, ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৪৭ সালের শিল্পবিরোধ আইন, ১৯৬৫ সালের বোনাস প্রদান আইন প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১২. **দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ** সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ সরকারকেও গ্রহণ করিতে হয়। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা সরকারের একটি অন্যতম কাজ। কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন, শিল্পের সুষম বণ্টন, জলসেচের সুযোগ বৃদ্ধি, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যবস্থা ইত্যাদি দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বারা দ্রুত উন্নয়নের ব্যবস্থা করে।

সুতরাং দেখা যায়, আধুনিক-কালে সরকারের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পরিধি বিশেষভাবে বিস্তীর্ণ হইয়াছে।

১৩. **সরকারী হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র** (**Spheres of State Intervention**) **ঃ** পূর্ববর্তী অংশে আধুনিক রাষ্ট্রে কল্যাণব্রতী সরকারের বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, আধুনিক সরকার অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনমতো হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। অবশ্য এইরূপ সরকারী হস্তক্ষেপ একমাত্র মিশ্র অর্থব্যবস্থায় প্রয়োজন পড়ে। কারণ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সরকার অর্থনৈতিক কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করে না। আবার সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সরকারী হস্তক্ষেপের প্রশ্নটি অবান্তর ; কারণ ঐ ধরনের অর্থব্যবস্থায় দেশের উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা পুরাপুরি সরকারের অধীনেই থাকে।

আধুনিক মিশ্র অর্থব্যবস্থায় জনস্বার্থ বা জনকল্যাণ (public benefit) হইতেছে সরকারী হস্তক্ষেপের সীমা। এই প্রসঙ্গে বেন্‌হাম (Benham) মন্তব্য করিয়াছেন, প্রত্যেক রাষ্ট্রই (ক) পূর্ণ কর্মসংস্থান, (খ) উন্নত জীবনযাত্রার মান

(গ) অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস এবং (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা—এই চারটি উদ্দেশ্যে দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিবে। সুতরাং সরকারী হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রগুলি হইতেছে :

ক. উৎপাদনকার্যে হস্তক্ষেপ : উৎপাদনকার্যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ জনকল্যাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। প্রথমত, রেলপথ, ডাক ও তার ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি (public utilit es) সরকার নিজের মালিকানায় রাখিয়া পরিচালনা করিবে। দ্বিতীয়ত, দেশের লোকদের পূর্ণ নিয়োগের জন্য সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, জলসেচ ও বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র, রাস্তাঘাট, মৃত্তিকা-সংরক্ষণ, সেতু ইত্যাদি নির্মাণের জন্য নিয়মিতভাবে নির্মাণমূলক কার্যকলাপ (public works) সম্পন্ন করিবে। তৃতীয়ত, যে-সকল দ্রব্যের উৎপাদন বিশেষ লাভজনক নয় অথচ দেশের উন্নতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন, সরকার সেই সকল দ্রব্য (যেমন—মূলধন দ্রব্য, ইস্পাত ও ভারী যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি) উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবে। চতুর্থত, যে-সকল দ্রব্যের উৎপাদন বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে রাখা সম্ভব নয় (যেমন—অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন ইত্যাদি) সেইগুলির উৎপাদন রাষ্ট্রের হাতে থাকিবে। পঞ্চমত, যে-সকল বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান শ্রমিক ও ভোগকারীর স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় সেই সকল প্রতিষ্ঠানের (যেমন—একচেটিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠান) কার্যকলাপ সরকার জনস্বার্থে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবে। ষষ্ঠত, অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রকল্প রূপায়ণের জন্য যে-সকল উৎপাদনকার্যের আবশ্যক হয়, সেই সকল ক্ষেত্র সরকারের তত্ত্বাবধানে গড়িয়া তুলিতে হইবে। পরিশেষে বলা যায়, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সরকারকে অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উৎপাদন-কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। আবার, রুগ্ন ও বন্ধ শিল্পের (sick and closed industries) পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থাও করিতে হয়।

খ. ভোগকর্মের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ : ভোগকর্মে সরকার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিলে তাহা জনকল্যাণ প্রসার করিতে পারে। প্রথমত, দেশের অধিবাসীরা যাহাতে অপ্রয়োজনীয় ও অনিষ্টকর ভোগ্যপণ্য ভোগ না করে, তাহার জন্য ঐ সকল পণ্যের ভোগের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ জারী করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, ভোগকারীরা যাহাতে ব্যবসায়ীদের প্রতারণামূলক আচরণের দ্বারা শোষিত না হয়, তাহার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হইতে পারে। পরিশেষে বলা যায়, অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের নিয়মিত যোগান বজায় রাখিতে হইবে। ইহা ছাড়া, দারিদ্র্যের অপসারণের জন্য সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের যাহাতে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহার জন্য সরকারকে চেষ্টা করিতে হয়।

গ. বিনিময় ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ : বিনিময় (exchange) ও বণ্টনের (distribution) কতকগুলি ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ দেশের লোকদের কল্যাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। প্রথমত, সরকার দেশের অর্থব্যবস্থায় নিয়মিতভাবে মুদ্রার যোগান দিবার ব্যবস্থা করিবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ-ব্যবস্থা

নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয়ত, দেশে যাহাতে মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন না ঘটে তাহার জন্য দাম-প্রক্রিয়ার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মুদ্রাস্ফীতির সময় প্রয়োজনবোধে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির মূল্য-নিয়ন্ত্রণের (price control) ব্যবস্থা করিতে পারে। তৃতীয়ত, অত্যাবশ্যকীয় ও স্বল্প যোগানের দ্রব্যগুলির যুক্তিযুক্ত বণ্টনের জন্য সরকার একদিকে যেমন বরাদ্দ-প্রথা চালু করিতে পারে, অন্যদিকে তেমনি খাদ্যশস্য, চিনি, সুতীবস্ত্র, সিমেণ্ট, কয়লা প্রভৃতি দ্রব্যের ন্যায্য বণ্টনের ব্যবস্থা করিবে। ইহার জন্য প্রয়োজন পড়িলে সরকার খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মজুদ-ভাণ্ডার গড়িয়া তুলিতে পারে। চতুর্থত, জনস্বার্থে সরকার অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ব্যবসা-বাণিজ্য নিজের অধীনে আনিবে। পরিশেষে উল্লেখ করা যায়, সরকার দেশে সঞ্চয়-বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ-প্রসারের ব্যবস্থা করিবে।

সুতরাং দেখা যায়, অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। তবে এই হস্তক্ষেপের ফলে যাহাতে জনকল্যাণ বৃদ্ধি পায়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১৪. ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ (State Intervention in Trade and Business) : অর্থব্যবস্থার অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ বিশেষে আবশ্যক হয়। অতীতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ সমর্থন করা হইত না। কিন্তু কালক্রমে দেখা যায়, দেশের জনসাধারণের স্বার্থ-সংরক্ষণ ও দ্রব্যমূল্যের স্থায়িত্ব আনয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ আবশ্যক হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যাহাতে কয়েকটি মুষ্টিমেয় ব্যবসা-গোষ্ঠীর একচেটিয়া কর্তৃত্ব ও আধিপত্য না দেখা দেয় বা উহার প্রসার না ঘটে তাহার জন্যও সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন পড়ে। আবার, দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা যেমন—ব্যাংক-ব্যবসা, বীমা-ব্যবসা, পরিবহণ-ব্যবসা, বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি সরকারের মালিকানায় ও পরিচালনায় আনিতে হয়। উপরন্তু, যেখানে ব্যবসা একচেটিয়া ধরনের হয় (যেমন, রেল-পরিবহণ, বিদ্যুৎ যোগান ইত্যাদি) এবং যেখানে বেসরকারী শিল্পের মালিকরা আকৃষ্ট হয় না, সেই সকল ক্ষেত্রে দেশের ব্যবসায়ে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

তদুপরি, ব্যবসা-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান, প্রচলিত নিয়মকানুন পালন করা ইত্যাদি গতানুগতিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে জনগণের মধ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য (খাদ্যশস্য, চিনি, সুতীবস্ত্র, সিমেণ্ট, কেরোসিন তেল প্রভৃতি) ন্যায্য দামে বণ্টনের জন্যও এই হস্তক্ষেপ আধুনিককালে একরূপ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। শিল্পের জাতীয়করণের ন্যায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবসা-বাণিজ্য জাতীয়করণের আবশ্যক হইয়া পড়ে। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের ব্যবসা সরকারের হাতে থাকিলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া উহাদের ন্যায্য বণ্টন সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া, দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যও সরকারের তত্ত্বাবধানে রাখিলে জনকল্যাণ বৃদ্ধি পায়।

[বীজগণিত, সম্ভাব্যতা ও স্থানাঙ্ক জ্যামিতি]

ব্যবসায় গণিত

১

॥ বীজগণিত ॥

(Algebra)

সমীকরণ : কোন প্রশ্নের সমাধানে সময় সময় বীজগণিতীয় অক্ষর-প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এই অক্ষর-প্রতীক গাণিতিক সংখ্যার অজ্ঞাত মান। অনুরূপে বীজগণিতীয় রাশিও প্রকাশ করা যায়। ইহাকে বলা হয় সাঙ্কেতিক বাক্য।

বীজগণিতীয় রাশির সমতাসূচক বাক্যকে **সমীকরণ** (Equation) বলে।

যেমন— কোন সংখ্যার চারগুণের সহিত ৬ যোগ করিলে যোগফল ঐ সংখ্যা অপেক্ষা 15 বেশী। এই বাক্যকে সাঙ্কেতিক বাক্য বলে।

অজ্ঞাত সংখ্যাকে x ধরিলে, সর্তানুসারে $4x+6=x+15$—এই সমীকরণ $x=3$, শুধু এই মানের জন্যই সিদ্ধ। সমীকরণে সমতা-চিহ্নের বাম পার্শ্বের রাশিকে বামপক্ষ এবং ডানদিকের রাশিকে ডানপক্ষ বলে। এই সমীকরণে অজ্ঞাতরাশি মাত্র একটি এবং ইহার ঘাত এক। এই ধরনের সমীকরণকে **সরল সমীকরণ** বলে।

এইরূপ সমীকরণ সমাধানে মনে রাখা প্রয়োজন :—

(1) উভয়পক্ষে যে-কোন সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করিলে বা উভয়পক্ষকে যে-কোন সংখ্যা দিয়া গুণ বা ভাগ করিলে সমীকরণের মূল সর্ত বজায় থাকে।

(2) সমীকরণের যে-কোন পদকে পক্ষান্তর করিলে পদের চিহ্ন পরিবর্তিত হয়।

এখন প্রশ্ন করা যায়,

$4x+8x=12x$, কি সমীকরণ ?

না, ইহা সমীকরণ নহে। কারণ, অজ্ঞাত সংখ্যা x-এর যে-কোন মানের জন্য উভয়-দিকের সমতা বজায় থাকে।

তোমরা আরও জান,

$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$—এখানেও উভয়দিকের সমতা a ও b-এর যে-কোন মানের জন্য বজায় থাকে। এই ধরনের সমতাকে **অভেদ** (Identity) বলে।

সুতরাং বলা যায়, সমীকরণ শুধু নির্দিষ্ট মানের জন্য সিদ্ধ, আর অভেদ যে-কোন মানের জন্য সিদ্ধ। অভেদে বামপক্ষকে ডানপক্ষের সমান বা ডানপক্ষকে বামপক্ষের সমান বা উভয়পক্ষকে সরল করিয়া একই রাশিতে পরিণত করিতে হইবে।

উদাহরণ 1. সমাধান কর : $\frac{3}{2x+3}=\frac{1}{5}$

উভয়পক্ষকে $5(2x+3)$ অর্থাৎ, 5 এবং $(2x+3)$ এর ল. সা. গু. দিয়া গুণ করিয়া $\quad 15=2x+3$

অথবা, $-2x=3-15$

অথবা, $-2x=-12$

সুতরাং $x=\frac{-12}{-2}=6.$

উদাহরণ 2. সমাধান কর :

$$\frac{x}{2}-2=\frac{x}{4}+\frac{x}{5}-1$$

উভয়পক্ষকে 2, 4, 5 এর ল. সা. গু. অর্থাৎ 20 দিয়া গুণ করিয়া,

$10x-40=5x+4x-20$

অথবা, $10x-9x=40-20$

সুতরাং $x=20.$

উদাহরণ 3.

একটি নির্দিষ্ট সংস্থায় সকল কর্মীর মাসিক গড় বেতন 60 টাকা এবং 16 জন পদস্থ কর্মীর গড় বেতন 300 টাকা। পদস্থ কর্মী ব্যতীত অন্যদের গড় বেতন 55 টাকা। ঐ সংস্থায় পদস্থ কর্মী ব্যতীত অন্যদের সংখ্যা নির্ণয় কর। (I. C. W. A. July, '61)

মনে করি, সাধারণ কর্মীর সংখ্যা $=x$ জন

$\therefore$ মোট কর্মীর সংখ্যা $=(x+16)$ জন

$\therefore$ সকল কর্মীর মোট বেতন $=60(x+16)$ টাকা।

16 জন পদস্থ কর্মীর মোট বেতন $=300\times16=4800$ টাকা

x জন সাধারণ কর্মীর মোট বেতন $=55x$ টাকা

প্রশ্নানুসারে, $60(x+16)=4800+55x$

অথবা, $60x+960=4800+55x$

অথবা, $60x-55x=4800-960$

অথবা, $5x=3840$

$\therefore$ $x=768.$

অভেদাবলী

উদাহরণ 1.

প্রমাণ কর : $(a^2+b^2)(x^2+y^2)=(ax+by)^2+(bx-ay)^2$

বামপক্ষ $=(a^2+b^2)(x^2+y^2)$

$=a^2x^2+b^2x^2+a^2y^2+b^2y^2$

$=\{(ax)^2+(by)^2+2ax.by\}+\{(bx)^2+(ay)^2-2bx.ay\}$

$=(ax+by)^2+(bx-ay)^2$

$=$ডানপক্ষ (প্রমাণিত)।

উদাহরণ 2.

$$(x-y)^3+(y-z)^3+(z-x)^3=3(x-y)(y-z)(z-x)$$

$[\because \quad a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-bc-ca-ab)]$

$x-y=a, \quad y-z=b, \quad z-x=c$ ধরিলে,

$$(x-y)^3+(y-z)^3+(z-x)^3-3(x-y)(y-z)(z-x)$$
$$=\{(x-y)+(y-z)+(z-x)\}\times\{(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2$$
$$-(y-z)(z-x)-(z-x)(x-y)-(x-y)(y-z)\}$$
$$=0$$

যেহেতু $\quad (x-y)+(y-z)+(z-x)=0$

সুতরাং, $\quad (x-y)^3+(y-z)^3+(z-x)^3=3(x-y)(y-z)(z-x).$

সাপেক্ষ অভেদ

উদাহরণ 3. $\quad a^3+b^3+c^3-3abc=0$

প্রমাণ কর যে, $a+b+c=0$ অথবা, $a=b=c$

$$a^3+b^3+c^3-3abc$$
$$=(a+b)^3-3ab(a+b)+c^3-3abc$$
$$=(a+b)^3+c^3-3ab(a+b+c)$$
$$=\{(a+b)+c\}^3-3(a+b)c.(a+b+c)-3ab(a+b+c)$$
$$=(a+b+c)\{(a+b+c)^2-3(ac+bc)-3ab\}$$
$$=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca-3ab-3bc-3ca)$$
$$=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-bc-ca-ab)$$
$$=\tfrac{1}{2}(a+b+c)\{(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)\}$$
$$=\tfrac{1}{2}(a+b+c)\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$$

অতএব, $(a+b+c)\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}=0$

সুতরাং $(a+b+c)=0$ অথবা, $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2=0$

অর্থাৎ, $\quad a=b=c.$

অভেদের বিশেষ ব্যবহার :

উদাহরণ 4. মান নির্ণয় কর : $(\cdot 995)^2$

যেহেতু, $(1-x)^2=1-2x+x^2$ এবং $\cdot 995=(1-\cdot 005)$

সুতরাং $(\cdot 995)^2=(1-\cdot 005)^2=1-2\times\cdot 005+(\cdot 005)^2$

$$=1-\cdot 010+\cdot 000025=\cdot 990025.$$

প্রশ্নমালা 1

সমাধান কর (solve) :

1. $3(x-2)=7(x+2)$.
2. $\dfrac{x+4}{2}+\dfrac{x+10}{9}=8$.
3. $4+(x+1)(x+2)(x+6)=x^3+9x^2+28x$.
4. $\dfrac{4x+11}{3}-\dfrac{6(x-7)}{7}=13$.
5. $\dfrac{x}{3}-\dfrac{x}{2}=\dfrac{x}{4}+2\frac{1}{2}$.
6. $\dfrac{2}{x-2}+\dfrac{3}{x-3}=\dfrac{5}{x-1}$.

অভেদাবলী

প্রশ্নমালা 2

প্রমাণ কর :

1. $(a+b+c)^2=(a+b-c)^2+(b+c-a)^2+(c+a-b)^2+2$
$\{(b+c-a)(c+a-b)+(c+a-b)(a+b-c)+(a+b-c)(b+c-a)\}$.
2. $(a^2-b^2)(c^2-d^2)=(ac+bd)^2-(ad+bc)^2$.
3. $(a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2)=(ax+by+cz)^2$
$+\{(bx-ay)^2+(cy-bz)^2+(az-cx)^2\}$.
4. $a+b+c=0$ হইলে,
প্রমাণ কর যে, $a^2-bc=b^2-ca=c^2-ab$.
5. $2s=a+b+c$ হইলে, দেখাও যে,
$s^2+(s-a)^2+(s-b)^2+(s-c)^2=a^2+b^2+c^2$.
6. $a^2+b^2+c^2-bc-ca-ab=0$ হইলে,
দেখাও যে, $a=b=c$.
7. $x+\dfrac{1}{x}=2$ হইলে, দেখাও যে, $x^4+\dfrac{1}{x^4}=2$.
8. $abc=1$ হইলে, প্রমাণ কর যে,
$(a+b+c)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)=1+(b+c)(c+a)(a+b)$.
9. $2s=a+b+c$ হইলে, দেখাও যে,
$\dfrac{1}{s-a}+\dfrac{1}{s-b}+\dfrac{1}{s-c}-\dfrac{1}{s}=\dfrac{abc}{s(s-a)(s-b)(s-c)}$.
10. $(3\cdot95)^3$-এর মান নির্ণয় কর (আসন্ন তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত) ।

দুইটি অজ্ঞাত রাশি বিশিষ্ট একঘাত বা সরল সহ-সমীকরণ (Simultaneous Equations of the first degree in two unknowns) :

$$\left.\begin{array}{l} x+y=3 \\ x-y=1 \end{array}\right\}$$

এই সমীকরণ দুইটি অজ্ঞাত রাশিদ্বয়ের অসংখ্য মানের জন্য সিদ্ধ, যদি অজ্ঞাত রাশিদ্বয়ের যোগফল 3 এবং অন্তর 1 হয়। যেমন—প্রথম সমীকরণ ($x=2$, $y=1$; $x=3$, $y=0$; $x=0$, $y=3$; ইত্যাদি দ্বারা সিদ্ধ এবং দ্বিতীয় সমীকরণ ($x=2$, $y=1$; $x=3$, $y=2$; $x=4$, $y=3$; ইত্যাদি) দ্বারা সিদ্ধ। কিন্তু সমীকরণদ্বয় যুগপৎ শুধু ($x=2$, $y=1$) দ্বারা সিদ্ধ। সমীকরণদ্বয় যুগপৎ অজ্ঞাত রাশির একই মানের জন্য সিদ্ধ হইলে **সহ-সমীকরণ** (Simultaneous equation) বলে।

প্রধানত দুইটি উপায়ে এই ধরনের সমীকরণ সমাধান করা যায়—অপনয়ন প্রণালী এবং বজ্রগুণন প্রণালী।

অপনয়ন প্রণালীতে সমীকরণদ্বয় হইতে যে-কোন একটি অজ্ঞাত রাশিকে অপনয়ন করিয়া অপর অজ্ঞাত রাশির মান নির্ণয় করা হয়। তারপর জ্ঞাত রাশির মান যে-কোন সমীকরণে বসাইয়া অপর অজ্ঞাত রাশির মান নির্ণয় করা হয়।

অপনয়ন প্রণালী :

সাধারণভাবে সহ-সমীকরণদ্বয়

$$a_1x+b_1y+c_1=0 \quad \cdots \quad \cdots \quad (1)$$

$$a_2x+b_2y+c_2=0 \quad \cdots \quad \cdots \quad (2)$$

উভয় সমীকরণ হইতে x-কে অপনয়ন করিতে হইলে (1)-সমীকরণকে (2)-সমীকরণের x-এর সহগ দিয়া গুণ করিয়া এবং (2)-সমীকরণকে (1)-সমীকরণের x-এর সহগ দিয়া গুণ করিয়া,

$$a_2a_1x+a_2b_1y+a_2c_1=0 \quad \cdots \quad (3)$$

$$a_1a_2x+a_1b_2y+a_1c_2=0 \quad \cdots \quad (4)$$

$$- \quad - \quad -$$

$$y(a_2b_1-a_1b_2)+a_2c_1-a_1c_2=0 \quad \text{[(3) হইতে (4) বিয়োগ করিয়া]}$$

$$\therefore \quad y=\frac{a_1c_2-a_2c_1}{a_2b_1-a_1b_2}=\frac{c_1a_2-c_2a_1}{a_1b_2-a_2b_1} \quad \cdots \quad (A)$$

y-এর মান (1)-সমীকরণে বসাইয়া সরলীকরণ করিয়া $x=\dfrac{b_1c_2-b_2c_1}{a_1b_2-a_2b_1}$.

বজ্রগুণন প্রণালী :

(1)-কে b_2 দ্বারা গুণ করিয়া এবং (2)-কে b_1 দ্বারা গুণ করিয়া,

$$b_2a_1x+b_2b_1y+b_2c_1=0 \quad \cdots \quad (5)$$

$$b_1a_2x+b_1b_2y+b_1c_2=0 \quad \cdots \quad (6)$$

$$- \quad - \quad -$$

$$x(a_1b_2-b_1a_2)+b_2c_1-b_1c_2=0 \quad \text{[(5) হইতে (6) বিয়োগ করিয়া]}$$

$$\therefore \quad x=\frac{b_1c_2-b_2c_1}{a_1b_2-a_2b_1} \quad \cdots \qquad \text{(B)}$$

অনুরূপে (A হইতে) $y=\dfrac{c_1a_2-c_2a_1}{a_1b_2-a_2b_1}$

(A) এবং (B) হইতে, $\dfrac{x}{b_1c_2-b_2c_1}=\dfrac{y}{c_1a_2-c_2a_1}=\dfrac{1}{a_1b_2-a_2b_1}$

সুতরাং $x=\dfrac{b_1c_2-b_2c_1}{a_1b_2-a_2b_1},\ y=\dfrac{c_1a_2-c_2a_1}{a_1b_2-a_2b_1}$.

(প্রণালী)
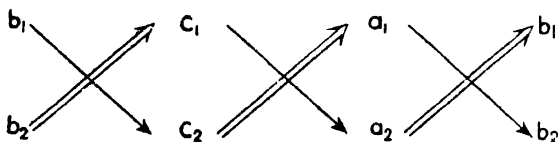
উপরের চিত্রে তিন জোড়া তীর আছে। প্রতি জোড়ায় উপর হইতে একটি লাইন-যুক্ত তীর এবং নিচের দিক হইতে দুইটি লাইন-যুক্ত তীর। প্রতিক্ষেত্রে একটি লাইন-যুক্ত গুণফল হইতে দুইটি লাইন-যুক্ত গুণফল বিয়োগ করিয়া রাশিত্রয়

$b_1c_2-b_2c_1,\ c_1a_2-c_2a_1$ এবং $a_1b_2-a_2b_1$ পাওয়া যায়।

এই রাশিত্রয় যথাক্রমে x, y এবং 1 লব-বিশিষ্ট ভগ্নাংশের হর হইবে।

উদাহরণ 1. $3x+4y=7 \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad (1)$

$4x-y=3 \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdot \quad (2)$

(1)-কে 4 দিয়া এবং (2)-কে 3 দিয়া গুণ করিয়া

$12x+16y=28 \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad (3)$

$12x-3y=9 \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad (4)$

$-\quad +\qquad -$

$19y=19$ [(3) হইতে (4) বিয়োগ করিয়া] $\therefore\ y=\frac{19}{19}=1.$

(1)-এ y-এর মান বসাইয়া $3x+4.1=7$

অথবা $3x=7-4=3$ সুতরাং $x=1.$

উদাহরণ 2. $\dfrac{2}{x}+\dfrac{3}{y}=2,\ \dfrac{5}{x}+\dfrac{8}{y}=5\frac{1}{6}$

$\dfrac{1}{x}=u$ এবং $\dfrac{1}{y}=v$ ধরিলে,

$2u+3v=2 \quad \cdots \quad \cdots \quad (1)$

$5u+8v=\frac{31}{6} \quad \cdots \quad \cdots \quad (2)$

(1)-কে 5 দিয়া এবং (2)-কে 2 দিয়া গুণ করিয়া,

$$10u+15v=10 \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad (3)$$

$$10u+16v=\frac{31}{3} \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad (4)$$

$$-v=-\frac{1}{3}$$ [(3) হইতে (4) বিয়োগ করিয়া] $\therefore \quad v=\frac{1}{3}.$

(1)-এ v-এর মান বসাইয়া, $2u+3\times\frac{1}{3}=2$ অথবা, $2u=1 \quad \therefore \quad u=\frac{1}{2}$

কিন্তু $\frac{1}{x}=u=\frac{1}{2}$ এবং $\frac{1}{y}=v=\frac{1}{3}$

সুতরাং $x=2$
এবং $y=3$

উদাহরণ 3. $7x-3y=31$

$9x-5y=41$

অথবা, $7x-3y-31=0$

$9x-5y-41=0$

বজ্রগুণন করিয়া,

$$\frac{x}{(-3).(-41)-(-5).(-31)}=\frac{y}{(-31).9-(-41).7}=\frac{1}{7.(-5)-9.(-3)}$$

অথবা, $\frac{x}{123-155}=\frac{y}{-279+287}=\frac{1}{-35+27}$

অথবা, $\frac{x}{-32}=\frac{y}{8}=\frac{1}{-8}$

$\therefore \quad x=\frac{-32}{-8}=4$ এবং $y=\frac{8}{-8}=-1.$

প্রশ্নমালা 3

সমাধান কর ঃ

1. $9x-5y=17$
   $2x-13y=-20.$

2. $x+2y=3=4x-y.$

3. $x-6y=-1$
   $\frac{x+y}{x-y}=\frac{3}{2}.$

4. $\frac{2}{x}+\frac{5}{y}=1$
   $\frac{3}{x}+\frac{2}{y}=\frac{19}{20}.$

5. $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{5}{6}$

$2x+3y=2xy.$

6. $\frac{xy}{x+y}=\frac{1}{5}$

$\frac{xy}{x-y}=\frac{1}{9}.$

7. $\frac{3}{x+y}+\frac{2}{x-y}=2$

$\frac{9}{x+y}-\frac{4}{x-y}=1.$

8. $\frac{x+y}{2}+\frac{3x-5y}{4}=2$

$\frac{x}{14}+\frac{y}{18}=1.$

সূচক (Indices)

তোমরা জান, $125=5\times5\times5=5^3$, অনুরূপে $64=8\times8=8^2$। অর্থাৎ, কোন সংখ্যাকে N (ধর), সাধারণভাবে $N=a^x$ প্রকাশ করা যায়, তবে x-কে বলে সূচক এবং a-কে বলে নিধান (base)।

সুতরাং $N=a.a.a\cdots\cdots x$-সংখ্যক গুণিতক।

অখণ্ড সূচকের নিয়মাবলী :

(i) $a^m\times a^n=a^{m+n}$ (ii) $\frac{a^m}{a^n}=a^{m-n},\quad a\neq0$

(iii) $(a^m)^n=a^{mn}$ (iv) $\sqrt[n]{a^m}=a^{\frac{m}{n}}$

(i) $a^m=a\times a\times a\times\cdots\cdots$ m-সংখ্যক গুণিতক

$a^n=a\times a\times a\times\cdots\cdots$ n-সংখ্যক গুণিতক

অতএব, $a^m\times a^n$

$(a\times a\times a\times\cdots\cdots m$-সংখ্যক গুণিতক$)$

$\times(a\times a\times a\times\cdots\cdots n$-সংখ্যক গুণিতক $)$

$=a\times a\times a\times\cdots\cdots(m+n)$-সংখ্যক গুণিতক

$=a^{m+n}.$

(ii) $\frac{a^m}{a^n}=\frac{a\times a\times a\times\cdots\cdots m\text{-সংখ্যক গুণিতক}}{a\times a\times a\times\cdots\cdots n\text{-সংখ্যক গুণিতক}}$

$=a\times a\times a\times\cdots\cdots(m-n)$-সংখ্যক গুণিতক

$=a^{m-n}$ (যদি $m>n$ হয়)

অনুসিদ্ধান্ত : যদি $m=n$

$\frac{a^m}{a^m}=a^{m-m}\quad\therefore\quad 1=a^0,\qquad a\neq0.$

(iii) $(a^m)^n = a^m \times a^m \times a^m \times \cdots\cdots n$-সংখ্যক গুণিতক

$= a^{m+m+m+\cdots\cdots}$ n-সংখ্যক পদ পর্যন্ত

$= a^{mn}$.

$\sqrt{3}$ বুঝায়. 3-এর বর্গমূল।

$\sqrt[n]{a}$ বুঝায় a-এর n-তম মূল।

আবার $\left(a^{\frac{m}{n}}\right)^n = a^{\frac{m}{n}\times n} = a^m$ অর্থাৎ,

$a^{\frac{m}{n}}$, a^m-এর n-তম মূল।

(iv) $\therefore\ a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$.

অনুসিদ্ধান্ত :

যেহেতু $1 = a^0 = a^{m-m} = a^{m+(-m)} = a^m \times a^{-m}$

সুতরাং $a^{-m} = \dfrac{1}{a^m}$ অথবা, $a^m = \dfrac{1}{a^{-m}}$.

(v) যদি $a^x = b^y$ এবং $a = b$ হয়, তবে $x = y$.

উপরে লিখিত সমতায় উভয়দিগের নিধান পরস্পর সমান হইলে, সূচকও সমান হইবে

উদাহরণ 1. সরল কর : $2a^2b \times 8a^{-4}b^{-\frac{1}{2}}$

$$2a^2b \times 8a^{-4}b^{-\frac{1}{2}} = 16a^{2-4}\ b^{1-\frac{1}{2}} = 16a^{-2}.\ b^{\frac{1}{2}} = 16\frac{b^{\frac{1}{2}}}{a^2}.$$

উদাহরণ 2. মান নির্ণয় কর :

$$\frac{125\sqrt{2}}{54} \times \left(\frac{81}{16}\right)^{\frac{3}{4}} \left(\frac{16}{81}\right)^{-\frac{1}{4}} \times \sqrt{\frac{16}{81}} \times \sqrt{\frac{4}{3}}.$$

প্রদত্ত রাশিমালা

$$= \frac{5^3 \times 2^{\frac{1}{2}}}{3^3 \times 2} \times \left(\frac{3^4}{2^4}\right)^{\frac{3}{4}} \times \left(\frac{2^4}{3^4}\right)^{-\frac{1}{4}} \times \left(\frac{4}{9^2}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{2^2}{3}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{5^3}{3^3} \cdot \frac{1}{2^{1-\frac{1}{2}}} \times \frac{3^3}{2^3} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{-1} \times \frac{4}{9} \times \frac{2}{3^{\frac{1}{2}}}$$

$$= \frac{5^3}{3^3} \times \frac{1}{2^{\frac{1}{2}}} \times \frac{3^3}{2^3} \times \frac{2^{-1}}{3^{-1}} \times \frac{2^2}{3^2} \times \frac{2}{3^{\frac{1}{2}}}$$

$$= \frac{5^3 \times 3^3 \times 2^{-1+2+1}}{3^{3-1+2+\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}+3}}$$

$$= \frac{5^3 \times 3^3 \times 2^2}{3^{\frac{9}{2}} \times 2^{\frac{7}{2}}} = \frac{5^3}{3^{\frac{9}{2}-3} \times 2^{\frac{7}{2}-2}}$$

$$= \frac{5^3}{3^{\frac{3}{2}} \times 2^{\frac{3}{2}}} = \frac{125\sqrt{3}.\sqrt{2}}{3^{\frac{3}{2}+\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{3}{2}+\frac{1}{2}}} = \frac{125\sqrt{6}}{9\times 4} = \frac{125\sqrt{6}}{36}.$$

উদাহরণ 3. দেখাও যে,

$$\frac{1}{1+x^{b-a}+x^{c-a}} + \frac{1}{1+x^{c-b}+x^{a-b}} + \frac{1}{1+x^{a-c}+x^{b-c}} = 1$$

$$\text{বামপক্ষ} = \frac{1}{1+\frac{x^b}{x^a}+\frac{x^c}{x^a}} + \frac{1}{1+\frac{x^c}{x^b}+\frac{x^a}{x^b}} + \frac{1}{1+\frac{x^a}{x^c}+\frac{x^b}{x^c}}$$

$$= \frac{1}{\frac{x^a+x^b+x^c}{x^a}} + \frac{1}{\frac{x^b+x^c+x^a}{x^b}} + \frac{1}{\frac{x^c+x^a+x^b}{x^c}}$$

$$= \frac{x^a}{x^a+x^b+x^c} + \frac{x^b}{x^a+x^b+x^c} + \frac{x^c}{x^a+x^b+x^c}$$

$$= \frac{x^a+x^b+x^c}{x^a+x^b+x^c} = 1 = \text{ডানপক্ষ}।$$

উদাহরণ 4.

যদি $a^y = M$, $a^x = N$ এবং $a^2 = (M^x N^y)^z$ হয়, দেখাও যে $xyz = 1$

যেহেতু, $M = a^y$ $\quad \therefore \quad M^x = (a^y)^x = a^{xy}$

আবার, $N = a^x$ $\quad \therefore \quad N^y = (a^x)^y = a^{xy}$

এখন, $a^2 = (M^x N^y)^z = (a^{xy}.a^{xy})^z = (a^{2xy})^z = a^{2xyz}$

অর্থাৎ, $a^2 = a^{2xyz}$ নিধান উভয়দিকে একই

সুতরাং $2xyz = 2$ $\quad \therefore \quad xyz = 1$ (প্রমাণিত)।

উদাহরণ 5. সমাধান কর :

$3^x = 9^{y-1}$, $16^{3-x} = 8^{y-2}$

এখন, $3^x = 9^{y-1}$

অথবা, $3^x = (3^2)^{y-1}$

অথবা, $3^x = 3^{2y-2}$

অতএব $x = 2y - 2$

অথবা, $x - 2y = -2 \quad \cdots \quad (1)$

আবার, $16^{3-x} = 8^{y-2}$

অথবা, $(2^4)^{3-x} = (2^3)^{y-2}$

অথবা, $2^{12-4x} = 2^{3y-6}$

অতএব, $12 - 4x = 3y - 6$

অথবা, $4x + 3y = 18 \quad \cdots \quad (2)$

(1)-কে 4 দিয়া গুণ করিয়া,

$$4x-8y=-8$$

এবং $4x+3y=18$

$- \quad - \quad -$

বিয়োগ করিয়া, $-11y=-26.$

$$y=\tfrac{26}{11}.$$

(1) হইতে $x=2y-2$

$$=2\times\frac{26}{11}-2$$

$$=\frac{52-22}{11}=\frac{30}{11}.$$

প্রশ্নমালা 4

ধনাত্মক সূচকে প্রকাশ কর (Express with positive indices) :

1. $\dfrac{4^{-2}a^{-9}b^{-1}}{6^{-3}a^{-10}b^{-3}}$

2. $16a^{-2}\times16^{-1}\sqrt{a^{-3}}\times a^{\frac{9}{2}}.$

3. $x^{a-b}\times x^{b-c}\times x^{c-a}\times x^{-a-b}.$

4. $2\sqrt[3]{x}\div4\sqrt[6]{x}\div\frac{1}{2}\sqrt{x^{\frac{1}{3}}}.$

ধনাত্মক করণী-চিহ্নসহ প্রকাশ কর (Express with positive radical signs) :

5. $\sqrt[3]{a^{-\frac{x}{2}}}\times\sqrt[4]{a^{-\frac{x}{3}}}\times\sqrt[6]{a^{-x}}.$

6. $\sqrt[4]{a^{n}}\times\sqrt[3]{a^{n}}\div\sqrt[12]{a^{n}}.$

মান নির্ণয় কর (Find the values) :

7. $\dfrac{1}{25^{-\frac{1}{2}}}\times\dfrac{5.(16)^{-\frac{1}{2}}}{4\times4^{-\frac{1}{2}}}.$

8. $\left\{\dfrac{(a+b)^{\frac{2}{3}}\times(a-b)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{(a+b)}\times\sqrt{(a-b)^{3}}}\right\}^{6}.$

সরল কর (Simplify) :

9. (a) $\left(\dfrac{a^{l}}{a^{m}}\right)^{l^{2}+lm+m^{2}}\times\left(\dfrac{a^{m}}{a^{n}}\right)^{m^{2}+mn+n^{2}}\times\left(\dfrac{a^{n}}{a^{l}}\right)^{n^{2}+nl+l^{2}}.$

(b) $\left(\dfrac{x^{a}}{x^{b}}\right)^{c}\times\left(\dfrac{x^{b}}{x^{c}}\right)^{a}\times\left(\dfrac{x^{c}}{x^{a}}\right)^{b}.$

10. যদি $x^{y}=y^{x}$, দেখাও যে, $\left(\dfrac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}=x^{\frac{x}{y}-1}$;

এবং $x=2y$ হইলে, দেখাও যে, $y=2.$

11. (a) $x=2+2^{\frac{2}{3}}+2^{\frac{1}{3}}$, প্রমাণ কর $x^{3}-6x^{2}+6x-2=0.$

(b) $x=2^{\frac{2}{3}}+2^{\frac{1}{3}}$ হইলে, দেখাও যে, $x^{3}-6x-5=0.$

সমাধান কর (Solve) :

12. (i) $(\sqrt{3})^{2x+4}=243$

(ii) $3^{3x-2}\times27^{x-1}=9^{2x}+3^{1-}$

(iii) $2\ .6^{y}=24,\ 2^{2x}.3^{y}=48.$

করণী (Surd)

যে রাশির কোন মূল সঠিক নির্ণয় করা যায় না, সেই মূলকে **করণী** বা **অমূলদ রাশি** বলে। যেমন— $\sqrt{5}$.

আবার যে সংখ্যাকে দুইটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতে প্রকাশ করা যায় না, সেই সংখ্যাকেও অমূলদ রাশি বলে।

কিন্তু $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ ইত্যাদিকে শুদ্ধ করণী বলে এবং $3\sqrt{5}$, $2\sqrt{3}$ ইত্যাদিকে বলে মিশ্র করণী। দুই বা ততোধিক পদ-বিশিষ্ট করণীকে বলে যৌগিক করণী।

যেমন— $2\sqrt{3}+\sqrt{5}$.

অনুবন্ধী করণী (Congugate surd) : দুইটি দুই-পদ-বিশিষ্ট করণী যদি বিপরীত চিহ্ন দ্বারা সংযোজিত হয়, অন্যথা একই রকমের হয়, তবে একটি অন্যটির পূরক করণী।

যেমন—$5+\sqrt{3}$ এবং $5-\sqrt{3}$ কিন্তু $\sqrt{5}+\sqrt{3}$-এর অনুবন্ধী $\sqrt{5}-\sqrt{3}$, $\sqrt{3}-\sqrt{5}$ এবং $-\sqrt{5}-\sqrt{3}$.

করণীক্রম : মূল সূচক সংখ্যা দ্বারা করণীক্রম স্থির হয়। $\sqrt{5}$ বা $5^{\frac{1}{2}}$, $\sqrt[3]{5}$, $\sqrt[4]{5}$ করণীসমূহের ক্রমমান যথাক্রমে 2, 3 ও 4.

সমমূলীয় করণী : একই ক্রমের করণীকে সমমূলীয় করণী বলে। যেমন— $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{11}$ ইত্যাদি সমমূলীয়। অমূলদ উৎপাদক ভিন্ন হইলে বলা হয় অসদৃশ। $3\sqrt{3}$, $3\sqrt{7}$, $6\sqrt{5}$, ইত্যাদি।

অমূলদ রাশির ধর্ম : যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়ায় অমূলদ রাশিতে নিম্নলিখিত নিয়ম প্রযোজ্য :

(i) যোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়া অমূলদ উৎপাদকে মূলদ সংখ্যার নিয়মে চলে।

যেমন— $3\sqrt{2}+5\sqrt{3}+6\sqrt{2}+3\sqrt{3}-6\sqrt{3}=9\sqrt{2}+2\sqrt{3}$.

(ii) গুণ-প্রক্রিয়ায় মূলদ উৎপাদকের মতো অমূলদ উৎপাদক গুণিত হয়, যদি করণীক্রম একই থাকে।

যেমন— $5\sqrt{2}\times 6\sqrt{3}=30\sqrt{6}$.

(iii) সাধারণ ভাগ প্রক্রিয়া প্রযোজ্য, যদি হর ও লবে মূলদ অংশ একই থাকে।

যেমন— $\frac{15\sqrt{3}}{3\sqrt{3}}=5$.

(iv) যদি $a\pm\sqrt{b}=c\pm\sqrt{d}$ হয়, $a=c$ এবং $b=d$ অর্থাৎ উভয়দিকের মূলদ ও অমূলদ অংশ পরস্পর সমান।

(v) অনুবন্ধী অমূলদ রাশির যোগফল ও গুণফল মূলদ। $a+\sqrt{b}$ এবং $a-\sqrt{b}$ পরস্পর অনুবন্ধী। সুতরাং $(a+\sqrt{b})+(a-\sqrt{b})=2a$

এবং $(a+\sqrt{b})(a-\sqrt{b})=a^2-b$.

করণী-নিরসন : অমূলদ রাশিকে মূলদ রাশিতে পরিণত করাকেই করণী-নিরসন বলে। আলোচিত গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়ায় ইহা সম্ভব।

(vi) দুইটি একজাতীয় দ্বিঘাত করণীর গুণফল ও ভাগফল মূলদ হইবে।
যেমন— $5\sqrt{3}$ এবং $3\sqrt{3}$ পরস্পর একজাতীয় করণী।

সুতরাং $5\sqrt{3}\times 3\sqrt{3}=45$ এবং $\frac{5}{3}\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=\frac{5}{3}$.

(vii) একটি দ্বিঘাত করণী একটি মূলদ রাশি ও একটি দ্বিঘাত অমূলদ রাশির যোগফল বা অন্তরফল হইতে পারে না।

অর্থাৎ $\sqrt{a}\neq b\pm\sqrt{c}$

যদি সম্ভব হয় $\sqrt{a}=b\pm\sqrt{c}$

বর্গ করিয়া $a=b^2+c\pm 2b\sqrt{c}$.

$\therefore\quad \sqrt{c}=\pm\frac{b^2+c-a}{2b}$, অর্থাৎ অমূলদ রাশি মূল রাশির সমান। ইহা অসম্ভব।

$\therefore\quad \sqrt{a}\neq b\pm\sqrt{c}$.

করণীর বর্গমূল নির্ণয় :

(i) যেহেতু $(\sqrt{a}+b)$-এর বর্গ মূলদ ও অমূলদ রাশির সমষ্টি,
সুতরাং $x+\sqrt{y}$ এর বর্গমূল $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ এইরূপ হইবে। যদি তাই হয়,

$$\sqrt{(x+\sqrt{y})}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$$

বর্গ করিয়া $x+\sqrt{y}=a+b+2\sqrt{ab}$

$$\therefore\quad a+b=x \quad \cdots \quad \cdots \quad (1)$$

$$2\sqrt{ab}=\sqrt{y}.$$

আবার, $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab=x^2-y$

$$\therefore\quad a-b=\sqrt{x^2-y} \quad \cdots \quad \cdots \quad (2)$$

(1) ও (2) যোগ করিয়া,

$$a=\tfrac{1}{2}[x+\sqrt{x^2-y}].$$

আবার (1) হইতে (2) বিয়োগ করিয়া,

$$b=\tfrac{1}{2}(x-\sqrt{x^2-y})$$

সুতরাং, $\sqrt{x+\sqrt{y}}=\pm[\sqrt{\{\tfrac{1}{2}(x+\sqrt{x^2-y})\}}+\sqrt{\{\tfrac{1}{2}(x-\sqrt{x^2-y})\}}]$

(ii) $\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}+\sqrt{d}$ এর বর্গমূল
$=\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}$ হইবে।

উদাহরণ 1. মান নির্ণয় কর :

$$2\sqrt{63}-\sqrt{294}-48\sqrt{\tfrac{1}{6}}.$$
$$=2\sqrt{3^2\times 7}-\sqrt{2\times 3\times 7^2}-8\sqrt{6}$$
$$=6\sqrt{7}-7\sqrt{6}-8\sqrt{6}$$
$$=6\sqrt{7}-15\sqrt{6}.$$

উদাহরণ 2. মূলদ লবে পরিবর্তিত কর :

$$\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}-3\sqrt{3}}$$

$$\text{প্রদত্ত রাশিমালা} = \frac{(\sqrt{2}+\sqrt{3})(2\sqrt{2}+3\sqrt{3})}{(2\sqrt{2}-3\sqrt{3})(2\sqrt{2}+3\sqrt{3})}$$

$$=\frac{\sqrt{2}.2\sqrt{2}+2\sqrt{2}.\sqrt{3}+3\sqrt{3}\sqrt{2}+3\sqrt{3}.\sqrt{3}}{(2\sqrt{2})^2-(3\sqrt{3})^2}$$

$$=\frac{4+2\sqrt{6}+3\sqrt{6}+9}{8-27}=-\frac{(13+5\sqrt{6})}{19}$$

(যৌগিক অমূলদ রাশিকে তার অনুবন্ধী দিয়া গুণ করিলে মূলদ রাশিতে পরিণত হয়।)

উদাহরণ 3. যদি $x=3+2\sqrt{2}$ হয়, $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=$ কত ?

$\therefore \quad \sqrt{x}=\sqrt{3+2\sqrt{2}}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$ (ধর)

বর্গ করিয়া, $a+b=3$ ... ... (1)

$\sqrt{ab}=\sqrt{2} \quad \therefore \quad ab=2.$

আবার $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab=9-8=1 \quad \therefore \; a-b=1$ ... (2)

(1) ও (2) যোগ করিয়া, $2a=4 \quad \therefore \; a=2.$

(1) হইতে $b=3-2=1$

অতএব $x^{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}+\sqrt{1}=\sqrt{2}+1$ ... (3)

$$x^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}=\frac{1}{\sqrt{2}+1}=\frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2})^2-1}=\frac{\sqrt{2}-1}{1} \quad \cdots \quad (4)$$

(3) ও (4) যোগ করিয়া $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=2\sqrt{2}.$

বিকল্প পদ্ধতি : $3+2\sqrt{2}$-এর বর্গমূল নির্ণয় করিতে হইলে মূলদ অংশ অর্থাৎ দুইটি অমূলদ রাশির বর্গের যোগফলের সমান হয় এবং মিশ্র অমূলদ

$=2\times$ অমূলদ অংশ $=2\times$ ঐ অমূলদ রাশির গুণফল হয়।

সুতরাং $3=(\sqrt{2})^2+(\sqrt{1})^2, \qquad \sqrt{2}=\sqrt{2}\times\sqrt{1}.$

অতএব $3+2\sqrt{2}=(\sqrt{2})^2+(\sqrt{1})^2+2.\sqrt{1}.\sqrt{2}$

$=(\sqrt{2}+\sqrt{1})^2$

বর্গমূল করিয়া $\sqrt{(3+2\sqrt{2})}=\sqrt{2}+1$

অর্থাৎ $x^{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}+1$ ... (1)

আবার $x^{-\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{x^{\frac{1}{2}}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}+1}$

$=\dfrac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)}=\dfrac{\sqrt{2}-1}{2-1}=\sqrt{2}-1$ .. (2)

(1) ও (2) যোগ করিয়া, $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=2\sqrt{2}.$

প্রশ্নমালা 5

মূলদ হরে পরিবর্তিত কর :

1. $\dfrac{3+2\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}$.

2. $\dfrac{\sqrt{x^2+2}+\sqrt{x^2-2}}{\sqrt{x^2+2}-\sqrt{x^2-2}}$.

3. $\dfrac{1}{1-\sqrt{2}+\sqrt{3}}$.

4. যদি $a=\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ এবং $b=\dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ হয়, $a^2+b^2=$ কত ?

5. যদি $x=\dfrac{2\sqrt{24}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ হয়,

$\dfrac{x+\sqrt{8}}{x-\sqrt{8}}+\dfrac{x+\sqrt{12}}{x-\sqrt{12}}$ এর মান নির্ণয় কর।

6. বর্গমূল নির্ণয় কর :

(i) $\sqrt{175}+\sqrt{147}$. (ii) $28-6\sqrt{3}$. (iii) $4+2\sqrt{3}$.

(iv) $1+x^2+\sqrt{1+x^2+x^4}$. (v) $8+2\sqrt{2}-2\sqrt{5}-2\sqrt{10}$.

7. সরল কর : (i) $\dfrac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}-\dfrac{\sqrt{3}+1}{2+\sqrt{3}}+\dfrac{1+\sqrt{2}}{3+2\sqrt{2}}$.

(ii) $\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}-\dfrac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{5}}+\dfrac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$.

8. যদি $x=\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ এবং $y=\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ হয়, দেখাও যে $x^2-xy+y^2=13$.

ভেদ
(Variation)

কোন রাশিমালায় কোন একটি রাশির মান অন্যান্য রাশির মান পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে ঐ রাশিকে ধ্রুবক (constant) বলা হয়। আর পরিবর্তনশীল রাশিকে বলে চল (variable)।

দুইটি চলরাশি যদি একই অনুপাতে পরিবর্তিত হয়, তবে একটি চলরাশি অন্যটির সহিত সরল ভেদে থাকে।

তোমরা জান, বৃত্তের ক্ষেত্রফল $=\pi r^2$, $r=$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ। অর্থাৎ, বৃত্তের ক্ষেত্রফল ও ব্যাসার্ধের বর্গের অনুপাত সব সময় একই থাকে। s যদি বৃত্তের ক্ষেত্রফল হয়, $\frac{s}{r^2}=$ ধ্রুবক, এই ধ্রুবককে বলে ভেদ-ধ্রুবক। ভেদের প্রতীক চিহ্ন $\propto$। গাণিতিক পরিভাষায় লেখা হয় $s \propto r^2$।

অন্যোন্যক
(Reciprocal)

যে-কোন সংখ্যা x এর অন্যোন্যক $\frac{1}{x}$; এখন 5, $\frac{1}{2}$ এর অন্যোন্যক যথাক্রমে $\frac{1}{5}$ এবং $\frac{1}{\frac{1}{2}}=2$.

দুইটি চলরাশি যদি এরূপভাবে পরিবর্তিত হয়, যাহাতে একটির সহিত অন্যটির অন্যোন্যকের অনুপাত সব সময় একই থাকে, তবে রাশিদ্বয় পরস্পর ব্যস্ত (Inverse)-ভেদে থাকে।

X এবং Y চলরাশিদ্বয় পরস্পর ব্যস্ত-ভেদে থাকে

যদি $X \propto \frac{1}{Y}$ অথবা, $Y \propto \frac{1}{X}$

সুতরাং $XY=$ ধ্রুবক $=K$ (ধর)।

অর্থাৎ, চলরাশিদ্বয় পরস্পর ব্যস্ত-ভেদে থাকিলে, তাহাদের গুণফল ধ্রুবক। সুতরাং দুইটি চলরাশি পরস্পর ব্যস্ত-ভেদে থাকিলে, একটি যে হারে বৃদ্ধি পায়, অপরটি সেই হারে কমিতে থাকে।

যৌগিক সরল ভেদ (Joint Direct Variation): যদি কোন চলরাশি একাধিক স্বনির্ভর চলরাশির গুণফলের সহিত সরল ভেদে থাকে, তবে সেই ভেদ-প্রক্রিয়াকে যৌগিক সরল ভেদ বলা হয়।

অর্থাৎ, চলরাশি X যদি স্বনির্ভর চলরাশি Y ও Z-এর গুণফলের সহিত সরল ভেদে থাকে,

$$X \propto YZ \quad \text{সুতরাং} \quad X = KYZ,$$

K = ভেদ-ধ্রুবক

তোমরা জান, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times$ ভূমি $\times$ উচ্চতা $= \frac{1}{2} \times a \times h$,

$a =$ ভূমি, $h =$ উচ্চতা

$\Delta \propto ah$, [$\Delta =$ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল]

যৌগিক ভেদের উপপাদ্য :

যখন Z ধ্রুবক, Y-এর সঙ্গে X সরল ভেদে থাকে এবং যখন Y ধ্রুবক, Z-এর সঙ্গে X সরল ভেদে থাকে। প্রমাণ কর যে, YZ অর্থাৎ Y ও Z এর গুণফল, X-এর সঙ্গে সরল ভেদে আছে।

প্রমাণ : মনে কর, (x_1, y_1, z_1) এবং (x_2, y_2, z_2), (X, Y, Z)—চলরাশিত্রয়ের দুইটি বিশেষ অবস্থায় যুগপৎ মান। $Z = z_1$ স্থির থাকিলে X এবং Y (x_1 এবং y_1) হইতে x_1' এবং y_2 তে পরিবর্তিত হয়।

সুতরাং $\dfrac{x_1}{x_1'} = \dfrac{y_1}{y_2}$ ... (1)

আবার $y = y_2$ স্থির থাকিলে X এবং Z, x_1' এবং z_1 হইতে x_2 এবং z_2তে পরিবর্তিত হয়।

সুতরাং $\dfrac{x_1'}{x_2} = \dfrac{z_1}{z_2}$ ... (2)

(1) এবং (2) পরস্পর উভয়দিকে গুণ করিয়া

$\dfrac{x_1}{x_1'} \times \dfrac{x_1'}{x_2} = \dfrac{y_1}{y_2} \cdot \dfrac{z_1}{z_2}$ অর্থাৎ $\dfrac{x_1}{x_2} = \dfrac{y_1 z_1}{y_2 z_2}$

অথবা, $\dfrac{x_1}{y_1 z_1} = \dfrac{x_2}{y_2 z_2}$ ... (3)

(3) হইতে স্পষ্টতঃ X, Y এবং Z এর সঙ্গে যুগপৎ সরল ভেদে আছে।

যৌগিক মিশ্র ভেদ :

মনে কর, A, B, C এবং D—এই চারিটি চল নিম্নলিখিত ভেদ-প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট :—

(i) $A \propto B$, (ii) $A \propto C$ এবং (iii) $A \propto \dfrac{1}{D}$

প্রমাণ কর যে, $A \propto \dfrac{BC}{D}$

প্রমাণ : মনে কর (a_1, b_1, c_1, d_1) এবং (a_2, b_2, c_2, d_2) A, B, C এবং D চলের বিশেষ অবস্থায় যুগপৎ মান।

পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে, C যখন ধ্রুবক থাকে, B-এর সহিত A সরল ভেদে থাকে। আবার যখন B ধ্রুবক থাকে, C-এর সহিত A সরল ভেদে থাকে।

সুতরাং, $A \propto BC$. এক্ষেত্রে, $A \propto \frac{1}{D}$.

A যখন a_1 হইতে a_1'-এ পরিবর্তিত হয়, BC যুগপৎ a_1b_1 হইতে a_2b_2 মানে পরিবর্তিত হয়, আর D ধ্রুবক থাকে।

তারপর A যখন a_1' হইতে a_2-তে পরিবর্তিত হয়; D, d_1 হইতে d_2-তে পরিবর্তিত হয়, BC যুগপৎ b_2c_2 মানে স্থির থাকে।

সুতরাং $\frac{a_1}{a_1'} = \frac{b_1c_1}{b_2c_2}$ (1)

এবং $\frac{a_1'}{a_2} = \frac{d_2}{d_1}$ ... (2) (যেহেতু A, D-এর সঙ্গে ব্যস্ত-ভেদে আছে)

(1) এবং (2) পরস্পর উভয়দিকে গুণ করিয়া

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1c_1d_2}{b_2c_2d_1} = \frac{b_1c_1/d_1}{b_2c_2/d_2}$$

সুতরাং, $A \propto \frac{BC}{D}$.

আংশিক ভেদ (Partial Variation) ঃ

কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের মোট খরচ আংশিকভাবে স্থির থাকে; অবশিষ্ট খরচ উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যার সঙ্গে সরল ভেদে থাকে।

মনে কর, কোন ফ্যান-কারখানায় মোট খরচ হয় c, আংশিক স্থির খরচ c_1 এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ে N-সংখ্যক ফ্যান উৎপন্ন হয়।

সুতরাং $c = c_1 + c_2$ ... (1)

এখানে c_2 পরিবর্তনশীল খরচ। কিন্তু $c_2 \propto N$

$\therefore\ c_2 = KN$, K ভেদ-ধ্রুবক। ... (2)

অতএব (1) ও (2) হইতে

$c = c_1 + KN$ ... (3)

এখন $c = y$, $N = x$ ধরিলে (3)-এর সমীকরণ নিম্নরূপ পরিগ্রহ করে

$y = Kx + c_1$ ... (4)

স্থানাঙ্ক জ্যামিতি আলোচনার পর দেখিবে (4) একটি সরলরেখার সমীকরণ।

উদাহরণ *i* যদি $A \propto B$ হয়, প্রমাণ কর যে, $A^2 + B^2 \propto A^2 - B^2$.

প্রমাণ ঃ যেহেতু $A \propto B$

সুতরাং $A = KB$, K = ভেদ-ধ্রুবক

অথবা, $\frac{A}{B} = K$ বর্গ করিয়া, $\frac{A^2}{B^2} = K^2$

যোগ, বিয়োগ ও ভাগ প্রক্রিয়ানুসারে

$$\frac{A^2+B^2}{A^2-B^2}=\frac{K^2+1}{K^2-1}=\text{ধ্রুবক}$$

সুতরাং $A^2+B^2 \propto A^2-B^2$.

উদাহরণ 2. কোন ট্রেনের যাত্রাকাল অতিক্রান্ত দূরত্বের সঙ্গে সরল ভেদে এবং গতিবেগের সঙ্গে ব্যস্ত-ভেদে থাকে। ঐ ট্রেনের গতিবেগের জন্য প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ কয়লা খরচ হয়, তার বর্গমূলের সঙ্গে সরল ভেদে এবং ট্রেনের বগির সংখ্যার সঙ্গে ব্যস্ত-ভেদে থাকে। 18টি বগিযুক্ত ট্রেনের আধ ঘণ্টা সময়ে 25 মাইল দূরত্ব অতিক্রম করিতে মোট 10 হন্দর (cwt.) কয়লা খরচ হয়। 16-বগি সংযুক্ত ট্রেনের 28 মিনিটে 21 মাইল পথ অতিক্রম করিতে কি পরিমাণ কয়লা খরচ হইবে ?

মনে কর, t = সময়, d = দূরত্ব, v = গতিবেগ, n = বগির সংখ্যা, c = কয়লার পরিমাণ।

প্রশ্নানুসারে $t \propto \frac{d}{v}$ ... (1)

আবার $v \propto \frac{\sqrt{c}}{n}$. (2)

সুতরাং $t \propto \frac{dn}{\sqrt{c}}$ অর্থাৎ $t=K\frac{d.n}{\sqrt{c}}$ (3)

এবং K = ভেদ-ধ্রুবক।

প্রদত্ত মান বসাইয়া

$$30=K\frac{25.18}{\sqrt{10}} \quad \therefore \quad K=\frac{\sqrt{10}}{15} \qquad (4)$$

(3)-এ (4) হইতে K-এর মান বসাইয়া

$$t=\frac{\sqrt{10}}{15}\frac{d.n}{\sqrt{c}}$$

প্রশ্নানুসারে $\sqrt{c}=\frac{\sqrt{10}}{15}\cdot\frac{d.n}{t}=\frac{\sqrt{10}}{15}\cdot\frac{21.16}{28}=\frac{\sqrt{10}}{5}.4$

বর্গ করিয়া $c=\frac{10\times16}{25}=6\frac{2}{5}$

$\therefore$ কয়লার পরিমাণ $=6\frac{2}{5}$ হন্দর (cwt.)।

উদাহরণ 3. কোন দেশে আয়কর 3000 টাকার বেশী আয়ের বর্গের সঙ্গে সরল ভেদে হিসাব করা হয় এবং মোট 6000 টাকা আয় হইলে কোন ব্যক্তির আয়কর হয় 100 টাকা। এই হিসাবে মোট আয় 9000 টাকা হইলে আয়কর কত হইবে ?

মনে কর, মোট আয় $(3000+x)$ টাকা

x = 3000 টাকার বেশী আয়

প্রশ্নানুসারে I = যদি আয়কর হয়, তবে $I \propto x^2$

$\therefore \; I=Kx^2$ ... (1) এবং K = ভেদ-ধ্রুবক।

মোট আয় 6000 টাকা হইলে আয়কর 100 টাকা।

সুতরাং $6000 = 3000 + x$ $\quad \therefore \quad x = 3000$ টাকা

(1) হইতে, x-এর মান বসাইয়া $100 = K.(3000)^2 \quad \therefore \quad K = \frac{1}{90000}$.

যদি মোট আয় 9000 টাকা হয়

$9000 = 3000 + x$ $\quad \therefore \quad x = 6000$ টাকা

(1) হইতে প্রশ্নানুসারে $I = \frac{1}{90000} \times 36000000 = 400$ টাকা।

প্রশ্নমালা 6

1. যদি $a \propto b^2$ এবং $1 + b \propto \sqrt{c}$, c-এর পরিপ্রেক্ষিতে a-এর মান নির্ণয় কর যদি $c = 9$ এবং $b = 5$ যখন $a = 1$.

2. 15 জন লোক প্রতিদিন 8 ঘণ্টা কাজ করিয়া 25 দিনে একটি কাজ সম্পন্ন করে। ভেদ-প্রক্রিয়ায় নির্ণয় কর, ঐ কাজ 12 জন লোক প্রতিদিন 10 ঘণ্টা কাজ করিয়া কতদিনে সম্পন্ন করিবে?

(ইঙ্গিত: যৌগিক মিশ্র ভেদ প্রক্রিয়ানুসারে $m = K\frac{w}{hd}$, m = লোকের সংখ্যা, w = কার্য, h = ঘণ্টা, d = দিন)

3. কোন একটি আবাসের মোট খরচ আংশিকভাবে স্থির [illegible] অবশিষ্টাংশ আবাসিকের সংখ্যার সঙ্গে সরল [illegible] প্রতিমাসে [illegible] খরচ ধার্য হয় 390 টাকা। আবাসিক-প্রতি লাভ হয় 54 টাকা এবং 64 টাকা, যখন আবাসিকের সংখ্যা যথাক্রমে 50 এবং 60 থাকে। যখন আবাসিকের সংখ্যা 80, প্রতিমাসে প্রত্যেক আবাসিকের জন্য কত লাভ হইবে নির্ণয় কর।

4. কোন এক সংস্থা A এবং B-কে অবসরকালীন ভাতা দেয় তাঁদের চাকুরির বৎসরকালীন মেয়াদের অনুপাতে। B-র চেয়ে A 8 বৎসর বেশী চাকুরিতে বহাল থাকিলে, প্রতি মাসে A অবসরকালীন ভাতা 400 টাকা বেশী পায়। যদি A, B-র চেয়ে 12 বৎসর বেশী কাজ করিত, তবে A-র প্রতি মাসের অবসরকালীন ভাতা B-র দ্বিগুণ হইত। A এবং B কত বৎসর কাজে নিযুক্ত ছিল এবং তাঁদের অবসরকালীন ভাতা কত?

5. কোন একটি গোলকের ওজন $= w_0$, ব্যাসার্ধ $= r$ এবং বস্তুর ঘনত্ব $= d$। যদি w_0, r^3 এবং d-এর সঙ্গে যৌগিক সরল ভেদে থাকে, দুইটি গোলকের ব্যাসার্ধের অনুপাত 8 : 7 এবং বস্তুর ঘনত্বের অনুপাত 2 : 3 ও একটি গোলকের ওজন 1024 পাউণ্ড হইলে অপর গোলকের ওজন কত?

6. প্রতি কেজি. চাউলের মূল্য 2 টাকা হইলে, একটি পরিবারের মাসিক খরচ হয় 610 টাকা। যদি অন্য সকল খরচ অপরিবর্তিত থাকে এবং চাউলের মূল্য প্রতি কেজি. 2·25 টাকা হয়, তবে মাসিক মোট খরচ হয় 626 টাকা। অন্যান্য খরচ একই

থাকিলে এবং চাউলের মূল্য প্রতি কেজি. 2·60 টাকা হইলে ঐ পরিবারের মাসিক মোট খরচ কত হইবে নির্ণয় কর। (C. U. B. Com. 1973)

7. কোন গ্রন্থকার নির্দিষ্ট থোক টাকা ছাড়া প্রত্যেকটি বিক্রীত বই-এর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ Royalty পান। 600 এবং 1,500 খানি বই বিক্রী হইলে তিনি যথাক্রমে 1,800 টাকা এবং 3,600 টাকা পান। 2,600 খানা বই বিক্রী হইলে তিনি মোট কত টাকা পাইবেন ?

প্রগতি

(Progression)

যদি কোন রাশিমালায় পদগুলি পর পর এমনভাবে সাজানো হয় যে, সন্নিহিত পদদ্বয়ের মধ্যে একটি সাধারণ সম্পর্ক সর্বত্র একই থাকে, তবে এইরূপ রাশিমালাকে বলা হয় **শ্রেণী** (Progression)।

যেমন—1, 3, 5,……, n-তম পদ পর্যন্ত রাশিমালায় সন্নিহিত পদদ্বয়ের মধ্যে সাধারণ অন্তর সর্বত্র 2 (অর্থাৎ, সন্নিহিত পদদ্বয়ের পরবর্তী পদ হইতে পূর্ববর্তী পদের অন্তর)।

আবার 1, 3, 9, 27,……. n-তম পদ পর্যন্ত রাশিমালায় সন্নিহিত পদদ্বয়ের সাধারণ অনুপাত 3 (অর্থাৎ. সন্নিহিত পদদ্বয়ের পরবর্তী পদ ও পূর্ববর্তী পদের অনুপাত)।

প্রসঙ্গক্রমে তিন প্রকার প্রগতি আলোচিত হইবে। যথা—সমান্তর শ্রেণী (Arithmetic Progression), গুণোত্তর শ্রেণী (Geometric Progression) এবং বিপরীত শ্রেণী (Harmonic Progression)।

প্রথম উদাহরণ, সমান্তর শ্রেণীর অন্তর্গত এবং দ্বিতীয় উদাহরণ, গুণোত্তর শ্রেণীভুক্ত।

সমান্তর শ্রেণী ঃ

শ্রেণীর সন্নিহিত পদদ্বয়ের সাধারণ অন্তর সর্বত্র এক থাকিলে সমান্তর শ্রেণী বলা হয়। এই শ্রেণীর প্রথম পদ এবং সাধারণ অন্তর জানা থাকিলে যে-কোন পদের মান এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক পদের সমষ্টি (sum) জানা যায়।

1, 3, 5, 7, … … … শ্রেণীতে

প্রথম পদ $=1$, সাধারণ অন্তর $=2$

সুতরাং, $t_2=$ দ্বিতীয় পদ $=1+(2-1).2$

$t_3=$ তৃতীয় পদ $=1+(3-1)2$

$t_4=$ চতুর্থ পদ $=1+(4-1).2$

অনুরূপে $t_n=n$-তম পদ $=1+(n-1).2$.

$=$ প্রথম পদ $+$ (পদ-সংখ্যা -1) $\times$ সাধারণ অন্তর।

মনে কর, সাধারণ সমান্তর শ্রেণীটি $a+(a+d)+(a+2d)+\cdots\cdots+$ n-তম পদ পর্যন্ত।

(i) $t_n=n$-তম পদের মান নির্ণয় কর।

(ii) n-সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

এখানে $t_1=$ প্রথম পদ $=a$

সাধারণ অন্তর $=d$

এবং $t_2=a+(2-1).d$

$t_3=a+(3-1).d$

... ...

... ...

$$\boxed{t_n=a+(n-1).d}$$

(ii) মনে কর, $t_n=a+(n-1)d=l$

সুতরাং $t_{n-1}=(n-1)$-তম পদ

$=a+(n-1-1)d$

$=a+(n-1)d-d=l-d$

অনুরূপে $t_{n-2}=l-2a.$

সুতরাং, $S=n$-সংখ্যক পদের সমষ্টি

$=a+(a+d)+(a+2d)+\cdots\cdots+(l-2d)+(l-d)+l$

আবার $S=l+(l-d)+(l-2d)+\cdots\cdots+(a+2d)+(a+d)+a$

উভয়পক্ষে যোগ করিয়া

$$2S=(a+l)+(a+l)+(a+l)+\cdots\cdots+(a+l)+(a+l)+(a+l)$$
$$=(a+l)\times n$$

সুতরাং $S=\frac{n}{2}(a+l)$ ... ... (1)

$=\frac{\text{পদ-সংখ্যা}}{2}$ (প্রথম পদ + শেষ পদ)।

যেহেতু $l=a+(n-1)d$

$\therefore\ S=\frac{n}{2}\{a+a+(n-1)d\}$

$=\frac{n}{2}\{2a+(n-1)d\}$

$=\frac{\text{পদ-সংখ্যা}}{2}\{2\times \text{প্রথম পদ}+(\text{পদ-সংখ্যা}-1)d\}.$

নিম্নলিখিত শ্রেণীসমূহের n-তম পদ পর্যন্ত সমষ্টি নির্ণয় কর।

(i) $1+2+3+4+\cdots \quad \cdots \quad \cdots$

(ii) $1^2+2^2+3^2+4^2+ \cdots \quad \cdots$

(iii) $1^3+2^3+3^3+4^3+ \cdots \quad \cdots$

(i) এই শ্রেণীতে $a=1$, $d=1$, পদ-সংখ্যা $=n$

$$\therefore \quad S=\frac{n}{2}\left\{2.a+(n-1)d\right\}$$

$$=\frac{n}{2}\left\{2.1+(n-1)1\right\}=\frac{n}{2}\left(2+n-1\right)=\frac{n}{2}\left(n+1\right).$$

(ii) তোমরা জান,

$$n^3-(n-1)^3=3n^2-3n+1$$

n-এর পরিবর্তে যথাক্রমে $(n-1)$, $(n-2)$, $(n-3)$, $\cdots \quad \cdots$, 3, 2, 1 বসাইয়া

$$(n-1)^3-(n-2)^3=3(n-1)^2-3(n-1)+1$$
$$(n-2)^3-(n-3)^3=3(n-2)^2-3(n-2)+1$$
$$\cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots$$
$$\cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots$$
$$3^3-2^3 \quad =3.3^2-3.3+1$$
$$2^3-1^3 \quad =3\,2^2-3.2+1$$
$$1^3-0 \quad =3.1^2-2.1+1$$

উভয়পক্ষে যোগ করিয়া

$$n^3=3.(1^2+2^2+\cdots \quad \cdots \quad +n^2)$$
$$-3.(1+2+3+ \cdots \quad \cdots \quad +n)+n$$

এখন, যদি $S=1^2+2^2+ \cdots \quad \cdots \quad +n^2$ ধরা হয়,

$$3S=n^3+3.\frac{n(n+1)}{2}-n$$

$$=\frac{n}{2}\left\{2n^2+3(n+1)-2\right\}=\frac{n}{2}\left(2n^2+3n+1\right)=\frac{n}{2}\left(n+1\right)\left(2n+1\right)$$

$$\therefore \quad S=\frac{n}{6}\left(n+1\right)\left(2n+1\right).$$

(iii) তোমরা জান,

$$n^4-(n-1)^4=4n^3-6n^2+4n-1$$

n-এর পরিবর্তে যথাক্রমে $(n-1)$, $(n-2)$, $\cdots \quad \cdots$ 3, 2, 1 বসাইয়া

$$(n-1)^4-(n-2)^4=4.(n-1)^3-6(n-1)^2+4(n-1)-1$$
$$(n-2)^4-(n-3)^4=4.(n-2)^3-6(n-2)^2+4(n-2)-1$$

$$3^4-2^4=4.3^3-6.3^2+4.3-1$$
$$2^4-1^4=4.2^3-6.2^2+4.2-1$$
$$1^4-\ 0=4.1^3-6.1^2+4.1-1$$

উভয়পক্ষে যোগ করিয়া,

$$n^4+4.(1^3+2^3+\cdots\quad\cdots+n^3)-6(1^2+2^2+\cdots\quad\cdots+n^2)$$
$$+4(1+2+\cdots\quad\cdots+n)-n$$

$S=1^3+2^3+\cdots\quad\cdots+n^3$ ধরিলে,

$$4S=n^4+6.\frac{n}{6}(n+1)(2n+1)-\frac{4n(n+1)}{2}+n$$

$$\therefore\quad S=\frac{n}{4}\left\{n^3+2n^2+3n+1-2n-2+1\right\}$$
$$=\frac{n^2}{4}(n^2+2n+1)=\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2.$$

গুণোত্তর শ্রেণী ঃ

শ্রেণীর সন্নিহিত পদদ্বয়ের সাধারণ অনুপাত সর্বত্র একই থাকিলে গুণোত্তর শ্রেণী বলা হয়।

$1, 3, 9, 27, \cdots\quad\cdots$ শ্রেণীতে,

প্রথম পদ $=1$, সাধারণ অনুপাত $=3$

দ্বিতীয় পদ $=1.3^{2-1}=3$

তৃতীয় পদ $=1.3^{3-1}=9$

চতুর্থ পদ $=1.3^{4-1}=27$

$\cdots\qquad\cdots\qquad\cdots$

অনুরূপে n-তম পদ $=1.3^{n-1}\quad\cdots$

$=$ প্রথম পদ $\times$ (সাধারণ অনুপাত)$^{\text{পদ-সংখ্যা}-1}$

মনে কর, n-তম পদ পর্যন্ত গুণোত্তর শ্রেণীটি

$$a+ar+ar^2+\cdots\quad+ar^{n-1}$$

এই শ্রেণীতে প্রথম পদ $=a$, সাধারণ অনুপাত $=r$

$t_2=$ দ্বিতীয় পদ $=a.r^{2-1}$

$t_3=$ তৃতীয় পদ $=a.r^{3-1}$

$t_4=$ চতুর্থ পদ $=a.r^{4-1}$

$\cdots\qquad\cdots\qquad\cdots$

অনুরূপে n-তম পদ $=t_n=a\,r^{n-1}$

অর্থাৎ $t_n=$ প্রথম পদ $\times$ (সাধারণ অনুপাত)$^{\text{পদ-সংখ্যা}-1}$

n-তম পদ পর্যন্ত সমষ্টি নির্ণয় কর।

মনে কর, $S = n$-তম পদ পর্যন্ত সমষ্টি,

$$\therefore \quad S = a + a.r + a.r^2 + \cdots + a.r^{n-3} + a.r^{n-2} + a.r^{n-1} \cdots \quad (1)$$

উভয়পক্ষকে r দ্বারা গুণ করিয়া

$$S.r = a.r + a.r^2 + a.r^3 + \cdots + a.r^{n-2} + a.r^{n-1} + a.r^n \quad \cdots \quad (2)$$

যদি $r < 1$ হয়, (1) হইতে (2) বিয়োগ করিয়া,

$$S - S.r = a - ar^n \qquad \therefore \quad S = \frac{a(1-r^n)}{(1-r)}$$

যদি $r > 1$ হয়, (2) হইতে (1) বিয়োগ করিয়া,

$$S.r - S = a.r^n - a \qquad \therefore \quad S = \frac{a(r^n - 1)}{(r-1)}$$

বিঃ দ্রঃ। $r = 1$ হইলে, উপরিউক্ত সূত্রদ্বয় প্রযোজ্য হইবে না।

মধ্যক
(Mean)

a, b, c সমান্তর শ্রেণী গঠন করে, যদি $b - a = c - b$ হয়, অর্থাৎ $b = \frac{a+c}{2}$

b-কে a এবং c-এর মধ্যক বলে।

আবার a, b, c গুণোত্তর শ্রেণী গঠন করে, যদি $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$

অর্থাৎ $b^2 = ac \quad \therefore \quad b = \sqrt{ac}$ এখানে b, a এবং c-এর মধ্যক।

তোমরা জান, সমান্তর শ্রেণীতে প্রথম পদ ও সাধারণ অন্তর জানা থাকিলে যে-কোন পদ নির্ণয় করা যায়। আবার গুণোত্তর শ্রেণীতে প্রথম পদ এবং সাধারণ অনুপাত জানা থাকিলে যে-কোন পদের মান জানা যায়।

(i) মনে কর, a এবং b দুইটি নির্দিষ্ট সংখ্যা। এই সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যে সমান্তর শ্রেণীভুক্ত n-সংখ্যক মধ্যক নির্ণয় কর।

n-মধ্যক, a এবং b একত্রে $(n+2)$ পদ-বিশিষ্ট একটি সমান্তর শ্রেণী গঠন করে।

যদি সাধারণ অন্তর d ধরা হয়, তাহা হইলে

প্রথম মধ্যক $= t_2 = a + (2-1)d = a + d$

দ্বিতীয় মধ্যক $= t_3 = a + 2d$

তৃতীয় মধ্যক $= t_4 = a + 3d$

$\cdots \qquad \cdots \qquad \cdots$

n-তম মধ্যক $= t_{n+1} = a + nd.$

কিন্তু $b=(n+2)$-তম পদ $=a+(n+2-1)d$

সুতরাং $d=\dfrac{b-a}{(n+1)}$.

d-এর মান বসাইয়া মধ্যকসমূহের মান নির্ণয় করা সম্ভব।

(ii) দুটি নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে গুণোত্তর শ্রেণীভুক্ত n-সংখ্যক মধ্যক নির্ণয় কর।

মনে কর, সংখ্যাদ্বয় a এবং b। a, b এবং n-সংখ্যক মধ্যকসহ মোট পদ-সংখ্যা $=n+2$.

যদি সাধারণ অনুপাত r হয়,

$(n+2)$-তম পদ $=a.r^{n+2-1}=ar^{n+1}=b$

এখানে প্রথম পদ $=a$

$(n+2)$-তম পদ $=b$

$$\therefore \quad r=\left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{n+1}}$$

প্রথম মধ্যক $=t_2=a.r^{2-1}=ar$

দ্বিতীয় মধ্যক $=t_3=a.r^2$

তৃতীয় মধ্যক $=t_4=a.r^3$

$\therefore$ n-তম মধ্যক $=t_{n+1}=a.r^n$

r-এর মান বসাইয়া n-সংখ্যক মধ্যক নির্ণয় সম্ভব।

অভিসারী (Convergent) গুণোত্তর শ্রেণী এবং অপসারী (Divergent) গুণোত্তর শ্রেণী ঃ

গুণোত্তর শ্রেণীতে সাধারণ অনুপাত একের চেয়ে বড় হইলে, যে-কোন পদ-মান সন্নিহিত পূর্ববর্তী পদ-মান হইতে বড়। অতএব, পদ-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমষ্টি ক্রমান্বয়ে অসীম পর্যন্ত বাড়িতে থাকিবে। অর্থাৎ, গুণোত্তর শ্রেণীভুক্ত যত বড় সম্ভব কোন সংখ্যা ধরা হউক না কেন যথেষ্ট সংখ্যক পদ-সংখ্যার সমষ্টি, ঐ সংখ্যা হইতে বড় হইবে। সুতরাং, গুণোত্তর শ্রেণীর সাধারণ অনুপাত 1-এর অধিক হইলে, পদসমূহ যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, ঐ শ্রেণীর পদসমূহের ক্রমিক সমষ্টির বৃদ্ধি তদপেক্ষা বেশী। এইরূপ গুণোত্তর শ্রেণীকে অপসারী (divergent) শ্রেণী বলে।

আবার, সাধারণ অনুপাত 1 হইতে ছোট হইলে, প্রতি পদ-মান সন্নিহিত পূর্ববর্তী পদ-মান হইতে ছোট হইবে। যদিও শ্রেণীর সমষ্টি পদ-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, কোন নির্দিষ্ট মান হইতে সমষ্টি পদ-সংখ্যা বাড়িলেও সব সময় ছোট হইবে। এইরূপ গুণোত্তর শ্রেণীকে অভিসারী (convergent) শ্রেণী বলা হয়।

যথা ঃ $1+2+4+8+\cdots$ অপসারী গুণোত্তর শ্রেণী।

$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots$ অভিসারী গুণোত্তর শ্রেণী।

অসীম পর্যন্ত গুণোত্তর শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয় কর (যদি $r < 1$)

তোমরা জান, $S_n = \frac{a(1-r^n)}{(1-r)}$, যখন, $r < 1$

যেহেতু $r < 1$, n-এর মান যত বড় হইতে থাকিবে, r^n-এর মান তত ছোট হইতে থাকিবে। সুতরাং, $r^n \to 0$ যদি n-এর মান ক্রমান্বয়ে অসীম পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

$$\text{সুতরাং, } S_\infty = \frac{a}{1-r^n}.$$

বিপরীত প্রগতি (Harmonic Progression) :

কোন শ্রেণীর পদসমূহ বিপরীত শ্রেণীভুক্ত হইলে পদসমূহের অন্যোন্যক (reciprocal) সমান্তর শ্রেণীভুক্ত থাকিবে।

অর্থাৎ $x_1, x_2, x_3, \cdots$ বিপরীত শ্রেণী গঠন করিলে $\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}, \frac{1}{x_3}, \cdots$ সমান্তর-শ্রেণী গঠন করিবে।

উদাহরণ 1. $9+5+1+\cdots\cdots$1000-তম পদ পর্যন্ত সমষ্টি নির্ণয় কর।

তোমরা জান, $a=9$

$t_n = a+(n-1)d$ এখানে, $d=-4$, $n=1000$

$\therefore \quad t_{1000} = 9+(10000-1).(-4)$

$= 9-3996 = -3987$

$S_n = \frac{n}{2}$ (প্রথম পদ + শেষ পদ) $= \frac{1000}{2}(9-3987)$

$= 500 \times (-3978) = -1989000.$

উদাহরণ 2. 2 এবং -18 এর মধ্যে 4টি সমান্তর মধ্যক নির্ণয় কর।

মোট পদ-সংখ্যা $= 4+2 = 6$

$t_6 = 2+(6-1)\times d = -18$, $d =$ সাধারণ অন্তর $\therefore \quad d = \frac{-20}{5} = -4$

প্রথম মধ্যক $= t_2 = a+(2-1)\times d = a+d = 2-4 = -2$

দ্বিতীয় মধ্যক $= t_3 = a+(3-1)d = a+2d = 2-8 = -6$

তৃতীয় মধ্যক $= t_4 = a+3d = 2-12 = -10$

চতুর্থ মধ্যক $= t_5 = a+4d = 2-16 = -14$

উদাহরণ 3 শুরুতে কোন ব্যক্তির 3 বৎসর পর্যন্ত মাসিক বেতন ছিল 320 টাকা। পরবর্তী 12 বৎসর প্রতি বছর 40 টাকা হারে বেতন বৃদ্ধি পায়। তারপর অবসর গ্রহণ করা অবধি প্রতি বৎসর একই বেতন থাকে। চাকুরির মোট সময়কাল নির্ণয় কর, যদি গড় বেতন 698 টাকা হয়।

মনে কর, চাকুরির মোট সময়কাল $= n$ বৎসর।

প্রথম 3 বৎসরে মোট বেতন পায় $= 320 \times 12 \times 3$ টাকা।

যেহেতু, পরবর্তী 12 বৎসর সমান্তর প্রগতিতে বেতন বৃদ্ধি পায় এবং প্রথম বৃদ্ধিসহ বেতন (320+40) টাকা ও বৃদ্ধির সাধারণ অন্তর 40 টাকা।

ঐ 12 বৎসরে মোট বেতন পায়

$$=12\{\tfrac{12}{2}\{2.360+(12-1).40\}=12\times6\{720+440\}$$

$$=12\times6\times1160=12+6960 \text{ টাকা।}$$

ঐ 12 বৎসর পর প্রতি মাসে বেতন

$$=360+(12-1).40=360+440=800 \text{ টাকা}$$

অবশিষ্ট $(n-15)$ বৎসরে মোট বেতন পায় $=(n-15)\times12\times800$ টাকা।

n-বৎসরে মোট বেতন পায় $=n\times12\times698$ টাকা।

সুতরাং $320\times3\times12+12\times6960+(n-15)\times12\times800=n\times12\times698$

অথবা $960+6960+800n-12000=698n$

অথবা, $102n=4080 \quad \therefore \quad n=40$ বৎসর।

উদাহরণ 4. $512+256+128+\cdots$ গুণোত্তর শ্রেণীতে দ্বাদশ পদ নির্ণয় কর এবং ঐ পদ পর্যন্ত সমষ্টি কত ?

তোমরা জান, $S_n=\dfrac{a(1-r^n)}{(1-r)}$, যেহেতু $r=\frac{1}{2}<1$

এখানে $a=512, \quad n=12, \quad r=\frac{1}{2}$

$$t_{12}=a.r^{12-1}$$

$$\therefore \quad t_{12}=512.(\tfrac{1}{2})^{12-1}$$

$$=512\times\frac{1}{2^{11}}=2^9\times\frac{1}{2^{11}}=\frac{1}{2^2}=\frac{1}{4}$$

$$S_{12}=\frac{512\left(1-\frac{1}{2^{12}}\right)}{1-\frac{1}{2}}=\frac{512(4096-1)\times2}{2^{12}}=2^{10}\times\frac{4095}{2^{12}}$$

$$=\tfrac{4095}{4}=1023\tfrac{3}{4}.$$

উদাহরণ 5. n-তম পদ পর্যন্ত সমষ্টি নির্ণয় কর :

$$3+33+333+\cdots$$

$S=3+33+333+\cdots\cdots n$-তম পদ পর্যন্ত

$=3[1+11+111+\cdots\cdots n$-তম পদ পর্যন্ত $]$

$=\frac{3}{9}[9+99+999+\cdots\cdots n$-তম পদ পর্যন্ত $]$

$=\frac{1}{3}[(10-1)+(10^2-1)+(10^3-1)+\cdots\cdots n$-তম পদ পর্যন্ত$]$

$=\frac{1}{3}[(10+10^2+10^3+\cdots\cdots n$-তম পদ পর্যন্ত $)-n]$

$$=\frac{1}{3}\left[\frac{10(10^n-1)}{10-1}-n\right]=\tfrac{10}{27}(10^n-1)-\tfrac{n}{3}.$$

উদাহরণ 6. এক ব্যক্তি 10টি মাসিক কিস্তিতে শোধ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে মোট 5115 টাকা ধার করিল। প্রতি কিস্তির টাকার পরিমাণ পূর্ববর্তী কিস্তির দ্বিগুণ হইলে প্রথম কিস্তি ও শেষ কিস্তি কত ?

তোমরা জান, $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{(r-1)}$, যেহেতু $r > 1$

কিস্তিসমূহ গুণোত্তর শ্রেণী গঠন করে এবং সাধারণ অনুপাত 2, কিস্তির সংখ্যা $n = 10$, মোট পরিশোধ্য টাকা 5115। প্রথম কিস্তি a টাকা ধরিলে

$$5115 = \frac{a(2^{10} - 1)}{2 - 1}$$

অথবা $5115 = a \times (1024 - 1)$

$\therefore \quad a = \frac{5115}{1023} = 5$ টাকা

শেষ কিস্তি $= t_{12} = a.r^{10-1} = 5 \times 2^9 = 5 \times 512 = 2560$ টাকা।

উদাহরণ 7. যদি a, b, c বিপরীত শ্রেণীতে এবং b, c, d গুণোত্তর প্রগতিতে থাকে ; দেখাও যে, $c(a+c) = 2ad$ $(b \neq 0, c \neq 0)$

যেহেতু a, b, c বিপরীত প্রগতিভুক্ত

$\therefore \quad \frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ সমান্তর প্রগতিভুক্ত

সুতরাং $\quad \frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{1}{c} - \frac{1}{b}$.

অথবা, $\quad \frac{a-b}{a} = \frac{b-c}{c} \qquad . \; b \neq 0$

অথবা, $\quad \frac{b}{a} + \frac{b}{c} = 2 \qquad (1)$

যেহেতু b, c, d গুণোত্তর শ্রেণীভুক্ত

$\frac{c}{b} = \frac{d}{c} \qquad \therefore \; b = \frac{c^2}{d} \quad \cdots \qquad (2)$

(1) ও (2) হইতে b অপসারণ করিয়া

$$\frac{c^2}{d}\left(\frac{a+c}{ac}\right) = 2$$

$\therefore \quad c(a+c) = 2ad \qquad \because \; c \neq 0$

উদাহরণ 8. $1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + \cdots$ n-তম পদ পর্যন্ত সমষ্টি নির্ণয় কর।

n-তম পদ $= n(n+1)(n+2) = n(n^2 + 3n + 2) = n^3 + 3n^2 + 2n$

$\therefore \quad t_n = n^3 + 3n^2 + 2n$

n-এর পরিবর্তে $(n-1), (n-2), \cdots\cdots, 3, 2, 1$ বসাইয়া

$$t_{n-1} = (n-1)^3 + 3(n-1)^2 + 2(n-1)$$
$$t_{n-2} = (n-2)^3 + 3(n-2)^2 + 2(n-1)$$
$$\cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots$$
$$t_3 = 3^3 + 3.3^2 + 2.3$$
$$t_2 = 2^3 + 3.2^2 + 2\,2$$
$$t_1 = 1^3 + 3.1^2 + 2\,1$$

উভয়পক্ষে যোগ করিয়া

$$S_n = \Sigma t_n$$
$$= (1^3 + 2^3 + \cdots\cdots + n^3) + 3(1^2 + 2^2 + \cdots\cdots + n^2) + 2(1 + 2 + 3 + \cdots\cdots + n)$$
$$= \left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2 + 3.\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 2.\frac{n(n+1)}{2}$$
$$= \frac{n^2(n+1)^2}{4} + \frac{n}{2}(n+1)(2n+1) + n(n+1)$$
$$= \frac{n(n+1)}{4}\{n(n+1) + 2(2n+1) + 4\}$$
$$= \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$$

উদাহরণ 9. $\frac{1}{1\cdot04} + \frac{1}{(1\cdot04)^2} + \frac{1}{(1\cdot04)^3} + \cdots +$ অসীম পর্যন্ত সমষ্টি নির্ণয় কর।

তোমরা জান, $S_\infty = \frac{a}{1-r}$

এখানে $a = \frac{1}{1\cdot04}$ $\qquad r = \frac{1}{1\cdot04}$

$$\therefore \quad S_\infty = \frac{\frac{1}{1\cdot04}}{1 - \frac{1}{1\cdot04}} = \frac{1}{1\cdot04 - 1} = \frac{1}{\cdot04} = \frac{100}{4} = 25.$$

উদাহরণ 10. কোন সমান্তর শ্রেণীর তৃতীয় ও 20-তম পদ যথাক্রমে 7 এবং 58, 20-তম পদ পর্যন্ত সমষ্টি নির্ণয় কর।

মনে কর, প্রথম পদ $= a$, সাধারণ অন্তর $= d$

প্রশ্নানুসারে, $t_3 = a + (3-1).d = a + 2d = 7$

$$t_{20} = a + (20-1).d = a + 19d = 58$$

অর্থাৎ, $a + 19d = 58 \cdots \quad \cdots \quad (1)$

$a + 2d = 7 \cdots \quad \cdots \quad (2)$

(1) হইতে (2) বিয়োগ করিয়া,

$d=3$, (2) হইতে $a=7-2d=7-6=1$.

যেহেতু, $S_n=\frac{n}{2}$ (প্রথম পদ + শেষ পদ)

সুতরাং, $S_{20}=\frac{20}{2}(1+58)=590$.

প্রশ্নমালা 7

(সমান্তর প্রগতি)

1. (i) 18-তম ও n-তম পদ নির্ণয় কর :

$10, 11\frac{1}{2}, 13, \cdots\cdots$

(ii) $5+7+9+\cdots\cdots 45$, পদ-সংখ্যা নির্ণয় কর।

(iii) সমান্তর শ্রেণীর প্রথম পদ ও দশম পদ যথাক্রমে $-3\cdot5$ এবং $12\cdot7$, সাধারণ অন্তর কত ?

2. সমষ্টি নির্ণয় কর :

(i) $4+7+10+\cdots\cdots+$ 112-তম পদ পর্যন্ত

(ii) $2+5+8+\cdots\cdots+$152-তম পদ পর্যন্ত

(iii) $\frac{1}{x}+\frac{3}{x}+\frac{5}{x}+\cdots\cdots+$ n-তম পদ পর্যন্ত

(iv) $\sqrt{7}+\sqrt{7}(1+\sqrt{7})+\sqrt{7}(1+2\sqrt{7})+\cdots\cdots+\sqrt{7}(1+30\sqrt{7})$

3. কোন সমান্তর শ্রেণীর 27-তম এবং 45-তম পদ যথাক্রমে 186 এবং 312, সমান্তর শ্রেণী নির্ণয় কর।

4. কোন সমান্তর শ্রেণীতে সপ্তম ও তৃতীয় পদের অনুপাত 12 : 5। 13-তম ও চতুর্থ পদের অনুপাত কত ?

5. কোন সমান্তর শ্রেণীর প্রথম পদ 15, যদি 10-তম ও 13-তম পদের অনুপাত 11 : 13 হয়, সাধারণ অন্তর কত ? 20-তম পদ পর্যন্ত সমষ্টি নির্ণয় কর।

6. কোন এক সংস্থায় লভ্যাংশ সমান্তর প্রগতিতে বৃদ্ধি পায় এবং সপ্তম ও তৃতীয় বৎসরের লভ্যাংশের অনুপাত 12 : 5। যদি পঞ্চম বৎসরের লভ্যাংশ 34000 হয়, প্রথম বৎরের লাভ এবং বৎসর-প্রতি লভ্যাংশের বৃদ্ধি কত ?

7. কোন এক ব্যক্তির বেতন বৎসর-প্রতি সমান্তর প্রগতিতে বৃদ্ধি পায়। একাদশ বৎসরে ঐ ব্যক্তির মাসিক বেতন ছিল 200 টাকা এবং 29-তম বৎসরে 380 টাকা। ঐ ব্যক্তির প্রাথমিক বেতন এবং বৎসর-প্রতি বেতন বৃদ্ধি কত ? 35 বৎসর পর অবসর গ্রহণ করিলে ঐ সময় বেতন কত ছিল ?

8. 5 ও 26-এর মধ্যে 6টি সমান্তর মধ্যক নির্ণয় কর।

9. 20-কে এমনভাবে চারিটি অংশে ভাগ কর, যেন ঐ অংশগুলি সমান্তর প্রগতিতে থাকে। প্রথম ও চতুর্থ পদের গুণফল এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের গুণফলের অনুপাত 2 : 3।

(গুণোত্তর প্রগতি)

10. $-243, 81, -27, \cdots\cdots$ শ্রেণীর 9-তম ও 12-তম পদ নির্ণয় কর।

11. নিম্নলিখিত শ্রেণীর শেষপদ এবং সমষ্টি নির্ণয় কর :

(i) $128, 64, 32, \cdots\cdots$ 11-তম পদ পর্যন্ত।

(ii) $24\cdot3, 8\cdot1, 2\cdot7, \cdots\cdots$ 8-তম পদ পর্যন্ত।

12. অসীম পর্যন্ত নিম্নলিখিত শ্রেণীসমূহের সমষ্টি নির্ণয় কর :

(i) $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots\cdots$

(ii) $1+\frac{2}{5}+\frac{3}{5^2}+\frac{2}{5^3}+\frac{3}{5^4}+\cdots\cdots$

(iii) $3\sqrt{3}+\sqrt{3}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots\cdots$

13. n-সংখ্যক পদ পর্যন্ত সমষ্টি নির্ণয় কর :

(i) $7+77+777+\cdots\cdots$

(ii) $\frac{1}{1\cdot05}+\frac{1}{(1\cdot05)^2}+\frac{1}{(1\cdot05)^3}+\cdots\cdots$

14 (i) $\frac{1}{8}$ এবং 128 এর মধ্যে 4টি গুণোত্তর মধ্যক নির্ণয় কর।

(ii) $\frac{32}{81}$ এবং $4\frac{1}{2}$ এর মধ্যে 5টি গুণোত্তর মধ্যক নির্ণয় কর।

15. গুণোত্তর শ্রেণীভুক্ত তিনটি সংখ্যার গুণফল 70 ; প্রান্ত সংখ্যাদ্বয়কে 4 দিয়া গুণ করিলে এবং মধ্যককে 5 দিয়া গুণ করিলে সংখ্যাত্রয় সমান্তর শ্রেণী গঠন করে। সংখ্যাগুলি নির্ণয় কর।

16. সমান্তর শ্রেণীভুক্ত প্রথম, দশম ও 28-তম পদ গুণোত্তর শ্রেণীভুক্ত তিনটি ক্রমিক পদ। গুণোত্তর শ্রেণীর সাধারণ অনুপাত নির্ণয় কর। সমান্তর শ্রেণীভুক্ত 28-তম পদ পর্যন্ত সমষ্টি 210 হইলে প্রথম পদ কত?

ব্যবসায়ে গুণোত্তর শ্রেণীর ব্যবহার এবং শতকরা হার :

মনে কর, কোন সার-কারখানায় 1960 সালে 5000 টন সার উৎপন্ন হয়। তারপর উৎপাদন প্রতি বৎসর 10% বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী 8 বৎসরের উৎপাদন (টন হিসাবে) নিম্নরূপ :

5,000 5,500 6,050 6,655 7,321 8,052 8,858 9,744 10,718

উপরিউক্ত উৎপাদন পরিমাণ হইতে দেখা যায়, 10% বৃদ্ধি ক্রমিক উৎপাদনের 1·1 অনুপাতের সমতুল্য। অর্থাৎ, উৎপাদনের পরিমাণসমূহ একটি গুণোত্তর শ্রেণী গঠন করে। এইভাবে কারখানার উৎপাদন বজায় থাকিলে 1970 সালে ঐ কারখানায় সার-উৎপাদন হইবে $5000(1\cdot1)^{11-1}=500(1\cdot1)^{10}$ টন, কারণ গুণোত্তর শ্রেণীর প্রথম পদ $=5000$, সাধারণ অনুপাত $=1\cdot1$, পদ-সংখ্যা $=11$.

দ্বিঘাত সমীকরণ (Quadratic Equation)

সমীকরণে অজ্ঞাত রাশির সর্বোচ্চ ঘাত 2 থাকিলে সমীকরণকে দ্বিঘাত সমীকরণ বলে।

সাধারণভাবে দ্বিঘাত সমীকরণ নিম্নরূপ পরিগ্রহ করে:

$$ax^2+bx+c=0$$

এই সমীকরণে অজ্ঞাত রাশি $= x$, আর a, b, c যথাক্রমে x^2, x এবং x^0-এর সহগ। কখনও কখনও মধ্যপদ বা ধ্রুবক-পদ অনুপস্থিত থাকে।

যেমন $\quad ax^2+c=0$

এবং $\quad ax^2+bx=0$

$2x^2+5x+3=0$—একটি দ্বিঘাত সমীকরণ।

উৎপাদকে বিশ্লেষণ করিয়া এই ধরনের সমীকরণ সমাধান করা যায়।

$$2x^2+5x+3=0$$

অথবা, $2x^2+3x+2x+3=0$

অথবা, $(2x+3)(x+1)=0$

সুতরাং, $x=-1$ অথবা, $x=-\frac{3}{2}$.

জটিল সমীকরণের উৎপাদকে বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না।

সাধারণ দ্বিঘাত সমীকরণের, অর্থাৎ $ax^2+bx+c=0$-এর সমাধান করিয়া যে-কোন দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান করা যায়:

(1)-কে $4\times x^2$-এর সহগ $=4a$ দ্বারা গুণ করিয়া,

$$4a^2x^2+4abx+4ac=0$$

অথবা, $(2ax)^2+2\,.\,2ax\,.\,b=-4ac$

উভয়দিকে b^2 যোগ করিয়া, $(2ax)^2+2.2ax.b+b^2=b^2-4ac$

অথবা, $(2ax+b)^2=b^2-4ac$

বর্গমূল করিয়া, $2ax+b=\pm\sqrt{b^2-4ac}$

অথবা, $2ax=-b\pm\sqrt{b^2-4ac}$

$$\therefore \quad x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}.$$

যেহেতু, দ্বিঘাত সমীকরণের দুইটি মাত্র বীজ থাকে, বীজদ্বয় যথাক্রমে

$$\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \text{ অথবা, } \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}.$$

দ্বিঘাত সমীকরণের বীজদ্বয় ও সহগের মধ্যে সম্বন্ধ (Relation between the roots of Quadratic equation and its co-efficients).

$$ax^2+bx+c=0\text{—দ্বিঘাত সমীকরণ।}$$

α এবং β—সমীকরণের বীজদ্বয়।

সুতরাং, সমীকরণটি α এবং β দ্বারা সিদ্ধ।

উপরিউক্ত সমাধান হইতে,

$$\alpha=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \text{ হইলে, } \beta=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

যোগ করিয়া, $\alpha+\beta=\frac{-2b}{2a}=\frac{-b}{a}$

গুণ করিয়া, $\alpha\beta=\frac{b^2-(b^2-4ac)}{4a^2}=\frac{4ac}{4a^2}=\frac{c}{a}$.

সুতরাং, বীজদ্বয়ের যোগফল $= -\frac{x\text{-এর সহগ}}{x^2\text{-এর সহগ}}$

বীজদ্বয়ের গুণফল $=\frac{\text{ধ্রুবক মান}}{x^2\text{-এর সহগ}}$ ।

α এবং β—সমীকরণের বীজদ্বয় হইলে, সমীকরণটি গঠন কর।

যেহেতু, α এবং β –সমীকরণের বীজদ্বয়, সমীকরণটি α এবং β দ্বারা সিদ্ধ। সুতরাং, নির্ণেয় দ্বিঘাত সমীকরণ $(x-\alpha)(x-\beta)=0$.

অথবা, $x^2-x(\alpha+\beta)+\alpha\beta=0$

অর্থাৎ, $x^2-x\times$ বীজদ্বয়ের যোগফল $+$ বীজদ্বয়ের গুণফল $=0$ ।

দ্বিঘাত সমীকরণে দুইটির বেশী বীজ থাকিতে পারে না।

যদি সম্ভব হয় $ax^2+bx+c=0$ ··· (1)

দ্বিঘাত সমীকরণ $x=\alpha$, $x=\beta$ এবং $x=\gamma$ দ্বারা সিদ্ধ। অর্থাৎ ধরা হইল, দ্বিঘাত সমীকরণের তিনটি বীজ আছে এবং $\alpha\neq\beta\neq\gamma$ ($\neq$ সমান নহে)

কল্পনানুসারে, $a\alpha^2+b\alpha+c=0$ ··· (2)

$a\beta^2+b\beta+c=0$ ··· (3)

$a\gamma^2+b\gamma+c=0$ ··· (4)

(2) হইতে (3) এবং (3) হইতে (4) বিয়োগ করিয়া,

$a(\alpha+\beta)+b=0$ ··· (5) $\because \alpha-\beta\neq0$

এবং $a(\beta+\gamma)+b=0$ ··· (6) $\because \beta-\gamma\neq0$.

আবার (5) হইতে (6) বিয়োগ করিয়া, $a(\alpha-\gamma)=0$ ··· (7)

অর্থাৎ, হয় $\alpha-\gamma=0$ অথবা $a=0$ ··· (8)

কিন্তু কল্পনানুসারে $\alpha-\gamma\neq0$, অর্থাৎ $\alpha\neq\gamma$ এবং a শূন্য হইতে পারে না, a শূন্য হইলে (5) এবং (6) হইতে দেখা যায় $b=0$.

এখন a, b উভয়ই শূন্য হইলে (2), (3) এবং (4) হইতে পাওয়া যায় $c=0$.

সুতরাং $0.x^2+0.x+0=0$

অর্থাৎ, x-এর যে-কোন মানের জন্য $ax^2+bx+c=0$

সুতরাং $ax^2+bx+c=0$ একটি অভেদ। ইহা অসম্ভব। দ্বিঘাত সমীকরণে দুইটির বেশী বীজ থাকিলে বিপরীত কল্পনার উপনীত হইতে হয়। সুতরাং, দ্বিঘাত সমীকরণে দুইটির বেশী বীজ থাকিতে পারে না।

দ্বিঘাত সমীকরণের বীজদ্বয়ের প্রকৃতি (Nature of the roots of Quadratic equation).

$ax^2+bx+c=0$ দ্বিঘাত সমীকরণের বিভিন্ন পদের সহগসমূহ, অর্থাৎ a, b এবং c বাস্তব। এই সমীকরণ সমাধান করিয়া,

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

বীজদ্বয়ের প্রকৃতি বিশেষভাবে b^2-4ac-এর মানের উপর নির্ভর করে।

যেমন—(i) $b^2-4ac=0$ হইলে, বীজদ্বয় বাস্তব এবং পরস্পর সমান।

সুতরাং, $$c=\frac{b^2}{4a}$$

c-এর মান $ax^2+bx+c=0$-তে বসাইয়া,

$$x^2+2\cdot\frac{b}{2a}x+\frac{b^2}{4a^2}=0 \quad \text{অথবা} \quad \left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=0.$$

উভয় বীজই পরস্পর সমান এবং প্রত্যেকটি $\frac{-b}{2a}$.

(ii) $b^2-4ac>0$ অর্থাৎ ধনাত্মক।

$\sqrt{b^2-4ac}$ যদি মূলদ হয়, বীজদ্বয় বাস্তব এবং অসমান।

এবং $\sqrt{b^2-4ac}$ যদি অমূলদ হয়, বীজদ্বয় বাস্তব, অমূলদ এবং পরস্পর অসমান।

(iii) $b^2-4ac<0$ অর্থাৎ ঋণাত্মক।

এবং $\sqrt{b^2-4ac}$ একটি কাল্পনিক সংখ্যা।

সুতরাং বীজদ্বয় কাল্পনিক এবং অসমান।

(iv) যদি $b=0$.বীজদ্বয় $\pm\sqrt{\frac{-c}{a}}$, অর্থাৎ বীজদ্বয় বিপরীত চিহ্নযুক্ত এবং অসমান। a এবং c এর চিহ্ন বিপরীত হইলে বীজদ্বয় বাস্তব, কিন্তু একই চিহ্নযুক্ত হইলে বীজদ্বয় কাল্পনিক।

যুগপৎ দ্বিঘাত সমীকরণ (Simultaneous Quadratic Equation)

দুই বা ততোধিক অজ্ঞাত রাশি, দুই বা ততোধিক সমীকরণ দ্বারা যুক্ত থাকিলে, সমীকরণে অন্তত একটি দ্বিতীয় মানের সমীকরণ থাকিলে যুগপৎ দ্বিঘাত সমীকরণ বলে। এই ধরনের সমীকরণ-সমাধানে নির্দিষ্ট কোন নিয়ম অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। সাধারণত অপনয়ন প্রণালী অনুসরণ করিয়া প্রদত্ত সমীকরণ হইতে একটি-মাত্র অজ্ঞাত-রাশি-বিশিষ্ট সমীকরণ সমাধান করা হয়। অতঃপর অন্যান্য অজ্ঞাত রাশির মান জানা যায়।

উদাহরণ : $\left.\begin{array}{l} ax^2+by^2=c \\ lx - my = n \end{array}\right\}.$

উদাহরণ 1. সমাধান কর : $3(x-2)^2+5=8(x+3)$

অথবা, $3x^2-12x+12+5-8x-24=0$

অথবা, $3x^2-20x-7=0$ অথবা, $3x^2-21x+x-7=0$.

অথবা, $3x(x-7)+1(x-7)=0$ অথবা, $(3x+1)(x-7)=0$

সুতরাং, হয় $x-7=0$ $\therefore$ $x=7$

না হয়, $3x+1=0$ $\therefore$ $x=-\frac{1}{3}$.

উদাহরণ 2. সমাধান কর : $1+x=\dfrac{3}{4-\dfrac{3}{4-x}}$

অথবা, $1+x=\dfrac{3\times(4-x)}{13-4x}$ অথবা, $(1+x)(13-4x)=3(4-x)$

অথবা, $-4x^2+13x-4x+13-12+3x=0$

অথবা, $4x^2-12x-1=0$.

তোমরা জান, $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

এখানে $\left.\begin{array}{l} a=4 \\ b=-12 \\ c=-1 \end{array}\right\}$, $x=\dfrac{-(-12)\pm\sqrt{(-12)^2-4.4(-1)}}{2.4}$

$$=\frac{12\pm\sqrt{160}}{8}=\frac{4(3\pm\sqrt{10})}{8}=\tfrac{1}{2}(3\pm\sqrt{10})$$

উদাহরণ 3. সমাধান কর : $\dfrac{2x+5}{x+2}+\dfrac{2x-5}{x-2}=\dfrac{4x-5}{x-1}$.

অথবা, $\dfrac{(2x+5)(x-2)+(2x-5)(x+2)}{(x+2)(x-2)}=\dfrac{4x-5}{x-1}$

অথবা, $\dfrac{2x^2+x-10+2x^2-x-10}{x^2-4}=\dfrac{4x-5}{x-1}$

অথবা, $\dfrac{4x^2-20}{x^2-4}=\dfrac{4x-5}{(x-1)}$

অথবা, $(4x^2-20)(x-1)=(4x-5)(x^2-4)$

অথবা, $4x^3-20x-4x^2+20=4x^3-16x-5x^2+20$

অথবা, $x^2-4x=0$ অথবা, $x(x-4)=0$

সুতরাং, হয় $x=0$ অথবা, $x-4=0$ $\therefore$ $x=4$.

উদাহরণ 4. সমাধান কর : $5^{x-4}+5^{3-x}=1\frac{1}{5}$

অথবা. $\dfrac{5^x}{5^4}+\dfrac{5^3}{5^x}=\dfrac{6}{5}$ অথবা, $\dfrac{1}{5}\cdot\dfrac{5^x}{5^3}+\dfrac{1}{\dfrac{5^x}{5^3}}=\dfrac{6}{5}$ ... (1)

মনে কর, $\dfrac{5^x}{5^3}=y$ (1) হইতে. $\dfrac{y}{5}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{6}{5}$

অথবা, $y^2-6y+5=0$ অথবা, $y^2-5y-y+5=0$

অথবা, $y(y-5)-1(y-5)=0$ অথবা, $(y-5)(y-1)=0$

$\therefore$ $y=5$ অথবা, $y=1$.

যখন $y=1$ $\dfrac{5^x}{5^3}=1$ অথবা, $5^x=5^3$ $\therefore$ $x=3$

আবার যখন $y=5$ $\dfrac{5^x}{5^3}=5$ অথবা, $5^x=5^4$ $\therefore$ $x=4$

উদাহরণ 5. সমাধান কর : $\sqrt{\dfrac{x}{y}}+\sqrt{\dfrac{y}{x}}=2\frac{1}{2}$, $x+y=5$

অথবা, $\dfrac{x+y}{\sqrt{xy}}=\dfrac{5}{2}$, $x+y=5$ অথবা, $\dfrac{5}{\sqrt{xy}}=\dfrac{5}{2}$, $x+y=5$

অথবা, $\sqrt{xy}=2$, ... (1) $x+y=5$ ... (2)

(1)-কে বর্গ করিয়া, $xy=4$ ... ... (3)

আবার $(x-y)^2=(x+y)^2-4xy=25-16=9$

বর্গমূল করিয়া, $x-y=\pm3$ ... ... (4)

অতএব $\left.\begin{array}{l}x+y=5\\x-y=3\end{array}\right\}$ ... ... (5)

এবং $\left.\begin{array}{l}x+y=5\\x-y=-3\end{array}\right\}$ ... ... (6)

(5) হইতে $\left.\begin{array}{l}x=4\\y=1\end{array}\right\}$ (6) হইতে $\left.\begin{array}{l}x=1\\y=4\end{array}\right\}$ (যোগ এবং বিয়োগ করিয়া)

প্রশ্নমালা 8

নিম্নলিখিত সমীকরণসমূহ সমাধান কর :

1. $x^2+5x-14=0$.
2. $\dfrac{6(x+1)}{x}+\dfrac{6x}{x+1}=13$.

3. $x^2+5x=0.$ 4. $x^2-10x+8=0.$

5. $x^2-2\sqrt{3x}-13=0.$ 6. $8x^2+28x-49=0.$

7. $4^{2(x+1)}-17.4^x+1=0.$ 8 $(1+x)^{\frac{2}{3}}+2(1-x)^{\frac{2}{3}}=3(1-x^2)^{\frac{1}{3}}.$

9. $4x^2+6x+\sqrt{2x^2+3x+4}=13.$

10. $x-y=-2,\ xy=3$ 11. $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{7}{12},\quad xy=12.$

12. $\frac{x+y}{xy}=\frac{5}{6},\ x-y=1.$ 13. $x^2+xy+y^2=2x+3y=7.$

14. $x+y+\sqrt{xy}=14$
$x^2+y^2+xy=84.$ 15. $\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{x}=18,\ x+y=12.$

16. একটি ভগ্নাংশের হর ও লব উভয়ের সহিত 2 যোগ করিলে ভগ্নাংশটি হয় $\frac{1}{2}$, আবার উভয়ের সহিতই 12 যোগ করিলে ভগ্নাংশটি হয় $\frac{3}{4}$, ভগ্নাংশটি নির্ণয় কর।

17. অমিয় একই ধরনের কয়েকটি ঊষা পাখা 7,200 টাকায় ক্রয় করিয়া প্রত্যেকটি 350 টাকায় বিক্রি করিল। বিক্রি করিয়া যত টাকা পাইল, তাহাতে সে পূর্বে যতগুলি পাখা কিনিয়াছিল, তাহার থেকে আরও 4টি পাখা বেশী কিনিতে পারিত। কতগুলি পাখা সে ক্রয় করিয়াছিল।

18. দ্বিঘাত সমীকরণ নির্ণয় কর :—

(i) বীজ-দুইটি যথাক্রমে 2 এবং 3,

(ii) একটি বীজ $2+\sqrt{5}$,

(iii) বীজ-দুইটি যথাক্রমে $\frac{p}{q}$ এবং $\frac{q}{p}$.

19. α এবং β যদি $px^2-qx+1=0$ এর বীজ হয় দ্বিঘাত সমীকরণ নির্ণয় কর, যাহার বীজদ্বয় যথাক্রমে $\frac{\alpha}{\beta}$ এবং $\frac{\beta}{\alpha}$.

20. $x^2-px+q=0$ সমীকরণের একটি বীজ অপরটির দ্বিগুণ হইলে, প্রমাণ কর $2p^2=9q.$

21. m-এর যে কোন মানের জন্য $x^2-2(5+2m)x+5(7+10m)=0$-এর বীজদ্বয় পরস্পর বাস্তব এবং সমান।

22. $x^2-px+q=0$ সমীকরণের বীজদ্বয় α এবং β.

(i) $\alpha^2+\beta^2$ এর মান কত ?

(ii) $\frac{\alpha}{\beta}+\frac{\beta}{\alpha}$ এর মান কত ?

বিন্যাস (Permutation)

ফুটবল খেলার মাঠে প্রতি দলে সাধারণত 11 জন খেলোয়াড় থাকে। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকে। ইচ্ছা করিলে খেলোয়াড়রা নিজেদের মধ্যে স্থান-পরিবর্তন করিতে পারে। খেলা সুরু হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক খেলোয়াড় নিজ নিজ স্থানে দাঁড়ায়, ইহাকে বলা হয় একটি বিন্যাস (Permutation or Arrangement)। খেলোয়াড়রা নিজেদের মধ্যে স্থান-পরিবর্তন করিলে প্রতিবারই খেলোয়াড়দের তারতম্যের জন্য দলগত চেহারার কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু প্রত্যেক পরিবর্তিত চেহারাই এক-একটি বিন্যাস।

কখনও কখনও 11টি স্থানে 11 হইতে কম সংখ্যক খেলোয়াড়ও নিজ নিজ ইচ্ছামতো স্থান দখল করিতে পারে।

বিন্যাসঃ বস্তুসমূহ যুগপৎ পরস্পরের মধ্যে যত রকমে সাজানো যায় (সবগুলি একসঙ্গে অথবা মোট সংখ্যার চেয়ে কম সংখ্যক ও একত্রে সাজানো যায়) তার প্রতিটি উপস্থাপনাই বিন্যাস।

মনে কর, দুইটি অক্ষর a ও b একত্রে ab অথবা ba এইরূপে সাজানো যায়, যদি দুইটির অধিক অক্ষর লও, যেমন—a, b, c নিম্নরূপে সাজানো যায়ঃ

abc
acb
bca
bac
cab
cba

মোট ছয় প্রকারে সাজানো যায়, কিন্তু প্রত্যেকটি বিন্যাস পরস্পর হইতে পৃথক।

উল্লিখিত দুইটি উদাহরণেই যতগুলি স্থান, ততগুলি অক্ষর একত্রে সাজানো হইয়াছে।

***n*-সংখ্যক পরস্পর ভিন্ন বস্তু হইতে *r*-সংখ্যক বস্তু কত প্রকারে সাজানো যায়** (Permutation of n different things taken r at a time).

$$(r \leqslant n)$$

মনে কর, মোট n-সংখ্যক বিভিন্ন রঙ্-এর একই আকারের মার্বেল এবং r-সংখ্যক গর্ত আছে। এখন n-সংখ্যক মার্বেল হইতে r-সংখ্যক মার্বেল তুলিয়া r-সংখ্যক গর্তে যত প্রকারে সাজানো যায়, ততই হইবে মোট বিন্যাস।

যে-কোন গর্তে n-সংখ্যক মার্বেলের যে-কোন একটি রাখা যায়। অতএব, একটি গর্ত মোট n-সংখ্যক উপায়ে পূর্ণ করা যায়। একটি গর্তে যে-কোন একটি মার্বেল রাখিয়া অপর আর একটি গর্তে $(n-1)$-সংখ্যক মার্বেলের যে-কোন একটি রাখা যায়। অর্থাৎ, এই গর্তটি মোট $(n-1)$ উপায়ে পূর্ণ করা যায়। একযোগে দুইটি গর্ত মোট $n(n-1)$ উপায়ে পূর্ণ করা যায়। কারণ, প্রথম গর্তটি প্রতিবার পূর্ণ করার সময় অপর গর্তটি মোট $(n-1)$ উপায়ে পূর্ণ করা যায়। সুতরাং, প্রথম গর্তটি n-সংখ্যক উপায়ে পূর্ণ হওয়ায় দুইটি গর্ত যুগপৎ $n(n-1)$ উপায়ে পূর্ণ করা যায়। দুইটি গর্ত যখন

দুইটি মার্বেলে পূর্ণ থাকে, অপর আর একটি গর্ত অবশিষ্ট $(n-2)$ মার্বেলের যে-কোন একটি দিয়া পূর্ণ করা যায় ; অর্থাৎ $(n-2)$ উপায়ে পূর্ণ করা যায়। কিন্তু প্রথম ও ও দ্বিতীয় গর্ত যুগপৎ পূর্ণ থাকে $n(n-1)$ উপায়ে। তিনটি গর্ত একত্রে পূর্ণ করা যায় $n(n-1)(n-2)$ উপায়ে।

উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যায়, তিনটি গর্ত মোট $n(n-1)(n-2)$ উপায়ে পূর্ণ হইলে মোট উৎপাদকের সংখ্যা 3. শুরুতে n থাকিলে দ্বিতীয় উৎপাদকের মান $(n-1)$, অর্থাৎ $\{n-(2-1)\}$ এবং তৃতীয় উৎপাদকের মান $n-2$, অর্থাৎ $\{n-(2-1)\}$।

অনুরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় : r-গর্ত n-সংখ্যক মার্বেল হইতে r-সংখ্যক মার্বেল দিয়া যুগপৎ পূর্ণ করা যায়

$$n(n-1)(n-2)\cdots\cdots\{n-(r-1)\} \text{ উপায়ে।}$$

এক্ষেত্রে মোট উৎপাদকের সংখ্যা r, এবং r-তম উৎপাদকের মান $\{n-(r-1)\}$ $(n-r+1)$। সুতরাং একই আকারের n-সংখ্যক ভিন্ন বস্তু হইতে r-সংখ্যক বস্তু মোট $n(n-1)(n-2)\cdots\cdots(n-r+1)$ উপায়ে বিন্যাস করা যায় এবং ^nP_r—এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়া নিরূপণ করা হয়।

সুতরাং $\quad {}^nP_r = n(n-1)(n-2)(n-3)\cdots\cdots(n-r+1) \quad \cdots \quad (1)$

[গৌণিক (Factorial) 5 অর্থাৎ $\lfloor 5$ বা $5! = 5.4.3.2.1$

অনুরূপে $\lfloor 4 = 4.3.2.1$; $\lfloor 3 = 3.2.1$

$\lfloor 2 = 2.1$; $\lfloor 1 = 1$ কিন্তু $\lfloor 0 = 1$

সুতরাং $\lfloor 5 = 5\lfloor 4 = 5.4.\lfloor 3 = 5.4.3.\lfloor 2 = 5.4.3.2\lfloor 1 = 5.4.3.2.1$

আবার $5.4 = \dfrac{5.4.\lfloor 3}{\lfloor 3} = \dfrac{\lfloor 5}{\lfloor 3}$].

সুতরাং, n-সংখ্যক ভিন্ন বস্তু হইতে r-সংখ্যক বস্তু লইয়া যুগপৎ সাজানো যায় ^nP_r উপায়ে।

$$\therefore \quad {}^nP_r = n(n-1)(n-2)\cdots\cdots(n-r+1) \text{ উপায়ে}$$

$$= \frac{n(n-1)(n-2)\cdots\cdots(n-r+1)\lfloor n-r}{\lfloor n-r}$$

$$= \frac{\lfloor n}{\lfloor n-r}.$$

অনুসিদ্ধান্ত :

(i) $\quad {}^nP_n = \dfrac{\lfloor n}{\lfloor n-n} = \dfrac{\lfloor n}{\lfloor 0} = \lfloor n$

(ii) $\quad {}^nP_0 = \dfrac{\lfloor n}{\lfloor n-0} = \dfrac{\lfloor n}{\lfloor n} = 1$

n-সংখ্যক বস্তু যদি পরস্পর ভিন্ন না হয় অর্থাৎ একই বস্তু যদি একাধিক সংখ্যায় থাকে, তবে তার বিন্যাস নিম্নরূপ হইবে :

উপপাদ্য (Theorem) : n-সংখ্যক বস্তুর মধ্যে মনে কর p-সংখ্যক একই প্রকারের এবং q-সংখ্যক অন্য আর এক প্রকারের, এবং r-সংখ্যক অন্য আর এক প্রকারের, অবশিষ্ট সবগুলিই পরস্পর ভিন্ন। এইরূপ n-সংখ্যক বস্তুর বিন্যাস নির্ণয় কর।

মনে কর, মোট বিন্যাসের সংখ্যা x। p-সংখ্যক এক প্রকারের বস্তু, q-সংখ্যক আর এক প্রকারের বস্তু এবং r-সংখ্যক অন্য আর এক প্রকারের বস্তুকে যদি ভিন্ন প্রকারের বস্তুতে রূপান্তরিত করা যায়, তবে n-সংখ্যক বস্তুই পরস্পর ভিন্ন প্রকারের। এইরূপ n-সংখ্যক বস্তুর বিন্যাসের সংখ্যা ${}^nP_n = \lfloor n$. কিন্তু p-সংখ্যক ভিন্ন প্রকারের বস্তুর একত্রে বিন্যাস হয় $\lfloor p$ উপায়ে। অনুরূপে q-সংখ্যক এবং r-সংখ্যক বস্তু বিন্যাস করা যায় যথাক্রমে $\lfloor q$ এবং $\lfloor r$ উপায়ে। এই বিন্যাসগুলির প্রতিটি বিন্যাস x প্রকারের বিন্যাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অতএব, মোট বিন্যাসের সংখ্যা $x. \lfloor p. \lfloor q. \lfloor r$, যদি সকল বস্তুই পরস্পর ভিন্ন প্রকারের হয়।

সুতরাং $\quad x\lfloor p \lfloor q \lfloor r = \lfloor n$

অর্থাৎ $$x = \frac{\lfloor n}{\lfloor p \lfloor q \lfloor r}.$$

উপপাদ্য : n-সংখ্যক বস্তু হইতে r-সংখ্যক বস্তুর বিন্যাসে যদি প্রতিটি বস্তুই r-বার পর্যন্ত আবৃত্ত হয়, তবে মোট বিন্যাস হয় n^r উপায়ে।

মনে কর, n-সংখ্যক ভিন্ন বস্তু হইতে r-সংখ্যক গ্রহণ করিয়া r-সংখ্যক শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে হইবে।

যে-কোন একটি শূন্যস্থান n উপায়ে পূর্ণ করা যায়। কারণ n-সংখ্যক বস্তুর যে-কোন একটি ঐ স্থানে রাখা যায়। দ্বিতীয় শূন্যস্থানটিও n উপায়ে পূর্ণ করা যায়, কারণ প্রতিটি বস্তু r-বার পর্যন্ত আবৃত্ত হইবে। সুতরাং, এই দুইটি স্থান যুগপৎ পূর্ণ করা যায় $n \times n = n^2$ উপায়ে। এইরূপে r-শূন্যস্থান একত্রে পূর্ণ করা যায়।

$n.n.n \cdots\cdots r$-সংখ্যক উৎপাদক পর্যন্ত $= n^r$ উপায়ে।

সর্তাধীন বিন্যাস (Conditional Permutation) :

(i) n-সংখ্যক ভিন্ন প্রকারের বস্তু হইতে r-সংখ্যক বস্তু লইয়া বিন্যাস কর, যেন k-সংখ্যক বিশেষ বস্তু সকল বিন্যাসেই থাকে।

যেহেতু সকল বিন্যাসেই r-সংখ্যক বস্তুর মধ্যে k-সংখ্যক বিশেষ বস্তু বর্তমান, r-সংখ্যক বস্তু হইতে k-সংখ্যক বিশেষ বস্তু বিন্যাস হয় ${}^rP_k$ উপায়ে। অবশিষ্ট $(n-k)$ সংখ্যক বস্তু হইতে আরও $(r-k)$ বস্তু বিন্যাস হয় ${}^{n-k}P_{r-k}$ উপায়ে। কিন্তু ${}^rP_k$ বিন্যাসের প্রতিটি ${}^{n-k}P_{r-k}$ বিন্যাসের প্রতিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং, মোট বিন্যাসের সংখ্যা ${}^rP_k \times {}^{n-k}P_{r-k}$.

(ii) n-সংখ্যক ভিন্ন প্রকারের বস্তু হইতে r-সংখ্যক বস্তু লইয়া বিন্যাস কর, যেন k-সংখ্যক বিশেষ বস্তু কোন বিন্যাসেই না থাকে।

n-সংখ্যক ভিন্ন প্রকারের বস্তু হইতে k-সংখ্যক বস্তু আলাদা রাখিয়া অবশিষ্ট $(n-k)$ সংখ্যক বস্তু হইতে r-সংখ্যক বস্তু বিন্যাস করিলে সকল বিন্যাসেই k-সংখ্যক বিশেষ বস্তু অনুপস্থিত থাকিবে।

সুতরাং, নির্ণেয় বিন্যাসের সংখ্যা ${}^{n-k}P_r$.

সমবায় (Combination or Grouping)

ফুটবল খেলার কথাই ধরা যাক। মাঠে নামার পর খেলোয়াড়রা যদি পরস্পরের মধ্যে স্থান-পরিবর্তন করিয়া একই দলে খেলে, তবে দলগতভাবে কোন তারতম্য হয় না। কিন্তু কোন খেলোয়াড় মাঠ হইতে উঠিয়া গেলে দল-বহির্ভূত অন্য কোন খেলোয়াড় মাঠে নামিলে পূর্বের দল আর থাকে না; দলগতভাবে রকমফের পরিলক্ষিত হয়। ইহাকেই বলা হয় সমবায়।

উপপাদ্য : n-সংখ্যক ভিন্ন প্রকারের বস্তু হইতে r-সংখ্যক বস্তু লইয়া সমবায় (Combination of n different things taken r at a time).

$$(r \leq n).$$

n-সংখ্যক খেলোয়াড় হইতে r-সংখ্যক খেলোয়াড় বাছাই করিয়া যতগুলি দল (ভিন্ন) গঠন করা যায়, ততই হইবে মোট সমবায়।

মনে কর, মোট সমবায় সংখ্যা x অর্থাৎ মোট ভিন্ন দলের সংখ্যা x। প্রতি দলেই r-সংখ্যক খেলোয়াড় বর্তমান। প্রতি দলের r সংখ্যক খেলোয়াড় নিজেদের মধ্যে স্থান-পরিবর্তন করিতে পারে ${}^rP_r = \lfloor r$ উপায়ে।

$\therefore$ x-দলের মোট বিন্যাস হয় $x\lfloor r$ উপায়ে। এই বিন্যাসের সংখ্যা ${}^nP_r$-এর সমতুল্য।

$$\text{সুতরাং}\quad x\lfloor r = {}^nP_r = \frac{\lfloor n}{\lfloor n-r}$$

$$\text{অর্থাৎ}\qquad x = \frac{\lfloor n}{\lfloor r \cdot \lfloor n-r}.$$

সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়া লেখা হয়

$${}^nC_r = \frac{\lfloor n}{\lfloor r \lfloor n-r}$$

অনুসিদ্ধান্ত ঃ

(i) $^nC_n = \dfrac{\lfloor n}{\lfloor n \lfloor 0} = 1.$

(ii) $^nC_0 = \dfrac{\lfloor n}{\lfloor 0 \lfloor n-0} = \dfrac{\lfloor n}{\lfloor n} = 1.$

সর্তাধীন সমবায় (Conditional Combination) ঃ

(i) n-সংখ্যক ভিন্ন বস্তু হইতে r-সংখ্যক বস্তু লইয়া সমবায় কর, যেন k-সংখ্যক বিশেষ বস্তু সকল সমবায়ে বর্তমান থাকে।

প্রথমেই n-সংখ্যক ভিন্ন বস্তু হইতে k-সংখ্যক বিশেষ বস্তু আলাদা রাখিয়া অবশিষ্ট $(n-k)$ সংখ্যক বস্তু হইতে $(r-k)$ সংখ্যক বস্তু লইয়া যত সমবায় হইবে, ততই নির্ণেয় সমবায়। কারণ, এইরূপে প্রতিটি সমবায়ে বিশেষ k-সংখ্যক বস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটিলে n-সংখ্যক বস্তু হইতে r-সংখ্যক বস্তুর সমবায় হইবে এবং বিশেষ k-সংখ্যক বস্তু সকল সমবায়ে থাকিবে।

সুতরাং, নির্ণেয় সমবায় হয় $^{n-k}C_{r-k}$ উপায়ে।

(ii) n-সংখ্যক ভিন্ন বস্তু হইতে r-সংখ্যক বস্তু লইয়া সমবায় কর, যেন k-সংখ্যক বিশেষ বস্তু সকল সমবায়ে অনুপস্থিত থাকে।

n-সংখ্যক ভিন্ন বস্তু হইতে k-সংখ্যক বিশেষ বস্তু আলাদা রাখিয়া অবশিষ্ট $(n-k)$ বস্তু হইতে r-সংখ্যক বস্তু গ্রহণ করিলে কোন সমবায়ের k-সংখ্যক বিশেষ বস্তুর আগমন ঘটিবে না।

সুতরাং নির্ণেয় সমবায় সংখ্যা $^{n-k}C_r$.

n-সংখ্যক ভিন্ন রকমের বস্তু হইতে যতগুলি ইচ্ছা একসঙ্গে লইয়া সমবায় নির্ণয় কর।

n-সংখ্যক ভিন্ন রকমের বস্তুর প্রত্যেকটি দুই ভাবে ব্যবহার করা যায়—

(i) ঐ বস্তুটি নির্বাচন করা, (ii) ঐ বস্তুটি নির্বাচন না করা। যেহেতু, প্রত্যেক বস্তুর জন্য এই প্রক্রিয়া প্রযোজ্য, n-সংখ্যক বস্তু মোট একযোগে ($2 \times 2 \times 2 \times \cdots\cdots$ n-সংখ্যক উৎপাদক পর্যন্ত) উপায়ে সমবায় সম্ভব। কিন্তু একটি বস্তুও গ্রহণ করা হয় নাই, এরূপ প্রক্রিয়া উপরিউক্ত সংখ্যা হইতে বাদ দিতে হইবে।

$\therefore$ সুতরাং মোট সমবায় সংখ্যা $= 2^n - 1$.

মোট $(p+q+r+\cdots)$ বস্তুর মধ্যে p-সংখ্যক অভিন্ন, q-সংখ্যক অভিন্ন এবং r-সংখ্যক অভিন্ন বস্তু, ইত্যাদি বর্তমান। উহাদের যতগুলি ইচ্ছা একসঙ্গে লইয়া মোট সমবায় নির্ণয় কর।

p-সংখ্যক অভিন্ন বস্তু $(p+1)$ উপায়ে সমবায় করা যায়, কারণ p-সংখ্যক অভিন্ন বস্তু হইতে $1, 2, \cdots, p$-সংখ্যক পর্যন্ত বস্তু গ্রহণ করা বা একটিও গ্রহণ না করা।

অনুরূপে q-সংখ্যক অভিন্ন বস্তু $(q+1)$ উপায়ে সমবায় করা যায়, r-সংখ্যক অভিন্ন বস্তু $(r+1)$ উপায়ে সমবায় করা যায় এবং অন্যান্য অভিন্ন বস্তুসমূহ অনুরূপ ভাবে সমবায় করা যায়। যুগপৎ বস্তুসমূহ সমবায় হয় $(p+1)(q+1)(r+1)\cdots$ উপায়ে। কিন্তু একটি নির্বাচন গ্রাহ্য হইবে না, যখন একটি বস্তুও গ্রহণ করা হয় নাই, অর্থাৎ যখন সবগুলি বস্তুই একসঙ্গে নির্বাচন-বহির্ভূত করিয়া রাখা হইয়াছে। সুতরাং, নির্ণেয় সমবায় সংখ্যা $\{(p+1)(q+1)(r+1)\cdots-1\}$।

উপপাদ্য : $(m+n)$ ভিন্ন প্রকারের বস্তুকে এমন দুই ভাগে বিভক্ত কর, যেন এক ভাগে m-বস্তু থাকে এবং অন্য ভাগে n-বস্তু থাকে।

সমবায় নিম্নরূপ হইবে :

$(m+n)$ ভিন্ন প্রকারের বস্তু হইতে m-সংখ্যক বস্তু নির্বাচন করিতে হইবে এবং এই নির্বাচন করা যায় ${}^{m+n}C_m$ উপায়ে। অবশিষ্ট $(m+n-m)$, অর্থাৎ n-বস্তু হইতে n-বস্তু নির্বাচন করিতে হইবে এবং ইহা সম্ভব হয় ${}^{n}C_n$ উপায়ে। যুগপৎ $(m+n)$ ভিন্ন প্রকারের বস্তু হইতে এক ভাগে m-বস্তু এবং অন্য ভাগে n-বস্তু নির্বাচন করা সম্ভব হয় মোট

$${}^{m+n}C_m \times {}^{n}C_n = \frac{\lfloor m+n}{\lfloor m \lfloor n}$$ উপায়ে এবং ইহাই নির্ণেয় সমবায়-সংখ্যা।

অনুসিদ্ধান্ত :

যদি $m=n$ হয়,

সমবায়-সংখ্যা $=\dfrac{\lfloor m+m}{\lfloor m \lfloor m}$ হইবে না, কারণ উভয় ভাগেই m-বস্তু থাকায় পরস্পরের মধ্যে অদল-বদল করিলে কোন নূতন সমবায় দৃষ্ট হইবে না। সুতরাং, নির্ণেয় সমবায়-সংখ্যা হইবে $$\frac{\lfloor 2m}{\lfloor 2 \lfloor m \lfloor m}.$$

(i) ${}^{n}C_r = {}^{n}C_{n-r}$

$$\text{ডানপক্ষ} = {}^{n}C_{n-r} = \frac{\lfloor n}{\lfloor n-r \lfloor n-n+r} = \frac{\lfloor n}{\lfloor n \lfloor n-r}$$
$$= {}^{n}C_r = \text{বামপক্ষ}$$

(ii) ${}^{n}C_r + {}^{n}C_{r-1} = {}^{n+1}C_r$

$$\text{বামপক্ষ} = \frac{\lfloor n}{\lfloor r \lfloor n-r} + \frac{\lfloor n}{\lfloor r-1 \lfloor n-r+1}$$
$$= \frac{\lfloor n}{\lfloor r-1 \lfloor n-r}\left[\frac{1}{r} + \frac{1}{n-r+1}\right]$$

$$=\frac{\underline{|n}}{\underline{|r-1}\;\underline{|n-r}}\left[\frac{n-r+1+r}{r(n+1-r)}\right]$$

$$=\frac{(n+1)\,\underline{|n}}{r\,\underline{|r-1}\,(n+1-r)\,\underline{|n-r}}$$

$$=\frac{\underline{|n+1}}{\underline{|r}\;\underline{|n+1-r}}={}^{n+1}C_r=\text{ডানপক্ষ}$$

উদাহরণ 1.

(i) ${}^8P_5$ কত ?

(ii) ${}^{11}C_6$ কত ?

(i) $${}^8P_5=\frac{\underline{|8}}{\underline{|8-5}}=\frac{\underline{|8}}{\underline{|3}}=\frac{8\,.\,7\,.\,6\,.\,5\,.\,4\,.\,\underline{|3}}{\underline{|3}}$$

$$=8\,.\,7\,.\,6\,.\,5\,.\,4=6720.$$

(ii) $${}^{11}C_6=\frac{\underline{|11}}{\underline{|6}\;\underline{|11-6}}=\frac{\underline{|11}}{\underline{|6}\;\underline{|5}}=\frac{11\,.\,10\,.\,9\,.\,8\,.\,7\,.\,\underline{|6}}{\underline{|6}\,.\,5\,.\,4\,.\,3\,.\,2\,.\,1}$$

$$=\frac{11\,.\,10\,.\,9\,.\,8\,.\,7}{5\,.\,4\,.\,3\,.\,2\,.\,1}=462.$$

উদাহরণ 2.

DAUGHTER শব্দটির অক্ষরগুলি লইয়া কতকগুলি বিভিন্ন শব্দ গঠন করা যায় এবং কতকগুলি শব্দে Vowel-গুলি একসঙ্গে থাকিবে ?

"DAUGHTER" শব্দে মোট চারটি বিভিন্ন অক্ষর আছে। এই অক্ষরগুলি বিভিন্নভাবে সাজাইয়া মোট শব্দ গঠন করা যায়

$${}^8P_8\text{টি}=\underline{|8}=8\,.\,7\,.\,6\,.\,5\,.\,4\,.\,3\,.\,2\,.\,1=40320.$$

DAUGHTER শব্দে Vowel—(A, U, E) অর্থাৎ 3টি Vowel. এই তিনটি অক্ষরকে একটি অক্ষর মনে করিলে মোট অক্ষরের সংখ্যা 6। বিভিন্ন শব্দ-গঠনে এই 6টি অক্ষর বিন্যাস করা যায় ${}^6P_6=\underline{|6}$ উপায়ে। কিন্তু Vowel-গুলি বিন্যাস করা যায় ${}^3P_3=\underline{|3}$ উপায়ে।

সুতরাং নির্ণেয় শব্দ-সংখ্যা $=\underline{|6}\times\underline{|3}$

$$=(6\,.\,5\,.\,4\,.\,3\,.\,2\,.\,1)\times(3\,.\,2\,.\,1)$$

$$=4320.$$

উদাহরণ 3.

8 জন বালকের মধ্যে বিভিন্ন আকারের 8টি মিষ্টি কত প্রকারে বিতরণ করা যায়, যদি বৃহত্তম মিষ্টি বয়োকনিষ্ঠ বালককে দেওয়া হয়।

যদি বৃহত্তম মিষ্টি বয়োকনিষ্ঠ বালককে দেওয়া হয়, অবশিষ্ট থাকে 7টি মিষ্টি। অন্যান্য 7 জন বালকের মধ্যে এই 7টি মিষ্টি বিতরণ করা যায় $^7P_7$ উপায়ে। অর্থাৎ, $\lfloor 7$ উপায়ে $= 7 . 6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1 = 5040.$

উদাহরণ 4.

EXAMINATION শব্দের অক্ষরগুলি বিভিন্ন ভাবে সাজাইয়া মোট কতগুলি নূতন শব্দ গঠন করা যাইবে ?

"EXAMINATION" শব্দটিতে মোট অক্ষর-সংখ্যা = 11.

এই শব্দটিতে—N আছে 2টি ; A আছে 2টি ; I আছে 2টি।

আর, বিভিন্ন রকমের একটি করিয়া অক্ষর আছে 5টি।

সুতরাং, মোট বিভিন্ন রকমের শব্দ-সংখ্যা

$$= \frac{\lfloor 11}{\lfloor 2 \lfloor 2 \lfloor 2} = \frac{11 . 10 . 9 . 8 . 7 . 6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1}{2 . 1 . 2 . 1 . 2 . 1}$$

$= 4989600.$

উদাহরণ 5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 অঙ্কগুলির প্রত্যেকটি একবার লইয়া মোট পাঁচ অঙ্কের কতগুলি অযুগ্ম সংখ্যা গঠন করা যায় ?

এখানে মোট অঙ্ক-সংখ্যা = 7 , (1, 3, 5, 7—এই চারটি অঙ্ক অযুগ্ম)।

এই অঙ্কগুলির যে-কোন একটি একক স্থানে (অর্থাৎ, শেষ) থাকিলে সংখ্যা অযুগ্ম হইবে।

1-কে একক স্থানে রাখিয়া অন্যান্য 6টি অঙ্ক হইতে আর 4টি অঙ্ক লইয়া 5-অঙ্কের সংখ্যা গঠন হয় মোট $^6P_4$টি।

অনুরূপে 3, 5, 7কেও একক স্থানে বসাইলে অযুগ্ম সংখ্যা গঠিত হইবে।

সুতরাং, নির্ণেয় 5-অঙ্কের অযুগ্ম সংখ্যা $= 4 \times {}^6P_4$

$$= 4 \times \frac{\lfloor 6}{\lfloor 2} = 24 \times 360 = 8640.$$

উদাহরণ 6.

12টি বস্তু হইতে যুগপৎ 5টি করিয়া লইয়া মোট কতকগুলি বিন্যাস সম্ভব নির্ণয় কর—যদি (i) 2টি বিশেষ বস্তু সব বিন্যাসেই থাকে, (ii) 2টি বিশেষ বস্তু কোন বিন্যাসেই না থাকে।

(i) 2টি বিশেষ বস্তু 5টি হইতে লইয়া আর (5 − 2) অর্থাৎ 3টি অবশিষ্ট (12 − 2) অর্থাৎ 10টি হইতে লইয়া বিন্যাস করিলে সকল বিন্যাসেই 2টি বিশেষ বস্তু বর্তমান থাকিবে।

$\therefore$ নির্ণেয় বিন্যাসের সংখ্যা $= {}^{5}P_2 \times {}^{10}P_3$

$$= \frac{\lfloor 5}{\lfloor 3} \times \frac{\lfloor 10}{\lfloor 7} = 14400.$$

(ii) 12টি বস্তু হইতে বিশেষ দুইটি বস্তু বাদ দিয়া অবশিষ্ট 10টি হইতে 5টি বিন্যাস করিলে সকল বিন্যাসেই এই দুইটি বস্তু অনুপস্থিত থাকিবে।

$\therefore$ নির্ণেয় বিন্যাসের সংখ্যা $= {}^{12-2}P_5 = {}^{10}P_5 = 252.$

উদাহরণ 7.

8 জন সদস্য হইতে 5 জনকে কত প্রকারে নির্বাচন করা যায় ?

8 জন সদস্য হইতে 5 জন সদস্য নির্বাচন করা যায়, মোট ${}^{8}C_5$ উপায়ে

$$= \frac{\lfloor 8}{\lfloor 5 \; \lfloor 8-5} = \frac{8 \,.\, 7 \,.\, 6 \,.\, \lfloor 5}{\lfloor 5 \,.\, \lfloor 3}$$

$$= \frac{8 \,.\, 7 \,.\, 6}{3 \,.\, 2} = 56.$$

উদাহরণ 8.

একটি মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনে 20 জন কাউন্সিলার ও 8 জন অল্ডারম্যান আছেন। 3 জন অল্ডারম্যান এবং 5 জন কাউন্সিলার লইয়া কতগুলি কমিটি গঠন করা যায় ?

20 জন কাউন্সিলার হইতে 5 জনকে নির্বাচন করা যায় ${}^{20}C_5$ উপায়ে এবং 8 জন অল্ডারম্যান হইতে 3 জনকে নির্বাচন করা যায় ${}^{8}C_3$ উপায়ে।

$\therefore$ নির্ণেয় কমিটির সংখ্যা $= {}^{20}C_5 \times {}^{8}C_3$

$$= \frac{\lfloor 20}{\lfloor 5 \; \lfloor 15} \times \frac{\lfloor 8}{\lfloor 3 \; \lfloor 5} = 868224.$$

উদাহরণ 9.

একটি দলে 6 জন এবং অপর এক দলে 8 জন খেলোয়াড় আছে। এই দুই দল হইতে 11 জন খেলোয়াড় নির্বাচন করিয়া একটি ক্রিকেট দল গঠন করিতে হইবে। প্রথম দল হইতে যদি অন্ততপক্ষে 4 জন খেলোয়াড় লইতে হয়, তবে কত প্রকারে ঐ নির্বাচন করা যাইবে ?

প্রথম দল হইতে কমপক্ষে 4 জন লইয়া মোট 11 জনের দল গঠন করা যায় নিম্নলিখিত উপায়ে :—

(i) 6 জন হইতে 4 জন এবং 8 জন হইতে অবশিষ্ট 7 জন

(ii) 6 " " 5 " " 8 " " " 6 "

(iii) 6 " " 6 " " 8 " " " 5 "

সুতরাং, নির্ণেয় নির্বাচন-সংখ্যা $= {}^6C_4 \times {}^8C_7 + {}^6C_5 \times {}^8C_6 + {}^6C_6 \times {}^8C_5$

$$= 120 + 168 + 56$$
$$= 344.$$

উদাহরণ 10.

এক ব্যক্তির 6 জন বন্ধু আছেন। এক বা একাধিক বন্ধুকে তিনি কত প্রকারে নিমন্ত্রণ করিতে পারেন ?

যেহেতু, এক বা একাধিক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিতে পারেন ; প্রত্যেক বন্ধুকেই নিমন্ত্রণ করিতে পারেন ; আবার, নিমন্ত্রণ নাও করিতে পারেন। অর্থাৎ, প্রত্যেক বন্ধুকেই দুই প্রকারে নির্বাচন করা যায়।

সুতরাং, 6 জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা যায় মোট $(2^6 - 1)$ উপায়ে

$= 63$ উপায়ে।

একজনকেও নিমন্ত্রণ করা হয় নাই—এইরকম নির্বাচন একটিমাত্র এবং মোট সংখ্যা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

উদাহরণ 11.

22 জন লোককে কত প্রকারে দুইটি ক্রিকেট দলে বিভক্ত করা যায় ?

প্রত্যেক দলে মোট 11 জন খেলোয়াড় থাকিবে। 22 জন হইতে 11 জন খেলোয়াড় নির্বাচন করিয়া অবশিষ্ট 11 হইতে 11 জন খেলোয়াড় নির্বাচন করিলে মোট সংখ্যা পাওয়া যাইবে, কিন্তু দল-দুইটির মধ্যে রদবদল করিলে কোন নূতন সমবায় হইবে না।

∴ নির্ণেয় সমবায় সংখ্যা

$$= \frac{{}^{22}C_{11} \times {}^{11}C_{11}}{2!} = \frac{\lfloor 22}{\lfloor 11 \lfloor 11 \lfloor 2}.$$

উদাহরণ 12.

আবৃত্তির জন্য একটি, খেলাধূলার জন্য একটি, তৎপরতার জন্য একটি এবং সাধারণ ব্যুৎপত্তির জন্য একটি —এই চারিটি পুরস্কার 8 জন বালকের মধ্যে কত প্রকারে বিতরণ করা যায় ?

আবৃত্তির জন্য পুরস্কার 8 জনের যে-কোন একজনকে দেওয়া যায়। অর্থাৎ 8টি উপায়ে বিন্যাস করা যায়। অনুরূপে অন্য পুরস্কারের প্রত্যেকটি 8 প্রকারে বিন্যাস করা যায়।

সুতরাং, 4টি পুরস্কার 8 জনের মধ্যে মোট $8 \times 8 \times 8 \times 8 = 8^4$ উপায়ে বিতরণ করা যায়।

∴ নির্ণেয় বিন্যাস-সংখ্যা $= 4096.$

উদাহরণ 13.

একটি বাস্কেটে 10টি লেবু, 6টি আপেল এবং 5টি বেদানা আছে। কত প্রকারে এই ফলগুলি রোগীদের মধ্যে বিতরণ করা যায় ?

10টি লেবু মোট (10+1) উপায়ে বিতরণ করা যায় (1টি, 2টি,……, 10টি এবং একটিও না)।

অনুরূপে 6টি আপেল (6+1) উপায়ে এবং 5টি বেদানা (5+1) উপায়ে বিতরণ করা যায়।

যুগপৎ এই ফলগুলি বিতরণ করা যায় (10+1) (6+1) (5+1) উপায়ে। কিন্তু এর মধ্যে কোন ফলই বিতরণ করা হয় নাই, এইরূপ একটি ঘটনা আছে এবং ইহা মোট সংখ্যা হইতে বাদ দিতে হইবে।

সুতরাং, নির্ণেয় সংখ্যা $=\{(10+1)(6+1)(5+1)-1\}=461.$

প্রশ্নমালা 9

1. (a) যদি ${}^nP_3=6$; ${}^nP_2$, n কত ?

   (b) যদি ${}^nC_{12}={}^nC_8$; ${}^nC_{17}=$ কত ?

2. কোন একটি আলোচনা-সভায় 10 জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। 10টি আসনের মধ্যে একটি সভাপতির জন্য নির্দিষ্ট। প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, অন্যান্য প্রতিনিধিরা কত উপায়ে আসন গ্রহণ করিতে পারেন ?

3. "MONDAY" শব্দের অক্ষরগুলি পুনর্বিন্যাস করিয়া মোট কত শব্দ গঠন করা যাইবে ? এই শব্দগুলির মধ্যে কতগুলি M দিয়া শুরু হইবে এবং কতগুলি M দিয়া শুরু হইবে, কিন্তু Y দিয়া শেষ হইবে না ?

4. নিম্নলিখিত শব্দগুলির অক্ষরসমূহ পুনর্বিন্যাস করিয়া কত শব্দ গঠন করা যাইবে :—(i) Economics, (ii) Statistics, (iii) Management.

5. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9—এই অংকগুলির প্রত্যেকটি শুধু একবার লইয়া চার অংকের কত সংখ্যা নির্ণয় করা যাইবে ? এই সংখ্যাগুলির মধ্যে কতগুলি যুগ্ম সংখ্যা ?

6. যাহাতে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বনিকৃষ্ট পরীক্ষা-পত্র দুইখানি একত্রে না থাকে, এমন কত প্রকারে 7টি পরীক্ষা-পত্রকে সাজানো যায় ?

7. কত রকমে 15 জন XII-ক্লাসের এবং 12 জন B. Sc. Part I পরীক্ষার্থীকে এক লাইনে সাজানো যায়, যাহাতে কোন দুইজন B. Sc. Part I পরীক্ষার্থী পাশাপাশি থাকিবে না ?

8. একটি পাঠাগারে কোন পুস্তকের 4 কপি করিয়া, অন্য দুই পুস্তকের 5 কপি করিয়া, অপর 3 পুস্তকের 7 কপি করিয়া এবং 6টি বিভিন্ন পুস্তকের এক কপি করিয়া আছে। সব পুস্তকগুলিকে কত রকমে সাজানো যায় ?

9. তিনটি চিঠির বাক্সে 4 খানা চিঠি কত প্রকারে ফেলা যায় ?

10. 12টি বস্তু হইতে একযোগে 3টি করিয়া লইযা বিন্যাসের কতগুলিতে একটি নির্দিষ্ট বস্তু (i) সতত থাকিবে, (ii) কখনও থাকিবে না।

11. একটি পরীক্ষা-পত্রে মোট 14টি প্রশ্ন আছে। একজন পরীক্ষার্থী কত প্রকারে 6টি প্রশ্নের উত্তর করিতে পারে? যদি একটি প্রশ্ন আবশ্যিক করা হয়, তাহা হইলে কত রকমে 6টি প্রশ্নের উত্তর করিতে পারে?

12. 6 জন পুরুষ এবং 4 জন মহিলার মধ্য হইতে 5 জনকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিতে হইবে। প্রত্যেক কমিটিতে অন্ততঃপক্ষে একজন মহিলা থাকিবেই, এমন কয়টি কমিটি গঠন করা যায়?

13. M.C.C.-র বিরুদ্ধে খেলার জন্য ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড মোট 16 জন খেলোয়াড় নির্বাচন করেন। নেতা এবং সহ-নেতা নির্বাচিত থাকিলে 11 জন খেলোয়াড় লইয়া মোট কতগুলি দল গঠন করা যাইবে? দুইজন সাধারণ খেলোয়াড় হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলে অবশিষ্ট খেলোয়াড়দের লইয়া কতগুলি দল গঠন করা যাইবে?

14. 5 জন নির্বাচন-প্রার্থীর মধ্য হইতে 3 জন সদস্য নির্বাচন করিতে হইবে। একজন ভোটদাতা, যতজন নির্বাচিত হইবে, তার বেশী ভোট দিতে পারিবে না। তিনি কত রকমে ভোট দিতে পারিবেন?

15. আটজন রোগীর মধ্যে এক বা একাধিক রোগীকে কত প্রকারে হাসপাতালে পাঠানো যায়?

16. দুইটি বিভাগের প্রত্যেকটিতে 7টি করিয়া প্রশ্ন আছে। একজন পরীক্ষার্থীকে 8টি প্রশ্নের উত্তর করিতে হইবে, কিন্তু কোন বিভাগ হইতে 5টির অধিক প্রশ্নের উত্তর করা যাইবে না। সে কত প্রকারে প্রশ্নগুলি নির্বাচন করিতে পারিবে?

17. Impression শব্দটির অক্ষরগুলি হইতে একযোগে 4টি করিয়া অক্ষর লইয়া কতগুলি (i) সমবায়, (ii) বিন্যাস হইবে?

18. 8টি প্রশ্ন ও প্রত্যেকটির একটি করিয়া বিকল্প প্রশ্ন আছে। প্রমাণ কর যে, এক বা ততোধিক প্রশ্ন মোট $(3^8 - 1)$ প্রকারে নির্বাচন করা যায়।

দ্বিপদ উপপাদ্য (Binomial theorem)

কোন রাশিতে এক, দুই বা ততোধিক পদ থাকিতে পারে। কিন্তু মাত্র দুইটি পদ থাকিলে ঐ রাশিকে বলে দ্বিপদ রাশি।

দ্বিপদ রাশির যে-কোন ঘাতের বিস্তৃতি দ্বিপদ উপপাদ্য (Binomial theorem) নামে অভিহিত।

তোমরা বীজগণিতের সূত্র হইতে জান:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = a^2 + {}^2C_1 a^{2-1} b + b^2 \quad \cdots (1)$$

এবং $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

$$= a^3 + {}^3C_1 a^{3-1} b + {}^3C_2 a^{3-2} b^2 + b^3 \quad \cdots (2)$$

দেখিবে, উপরিউক্ত ফলসমূহ দ্বিপদ উপপাদ্যের দুইটি বিশেষ ফলশ্রুতি।

দ্বিপদ উপপাদ্যের গাণিতিক রূপ :

$$(a+b)^n = a^n + {}^nC_1 a^{n-1}b + {}^nC_2 a^{n-2}b^2 + \cdots + {}^nC_r a^{n-r}b^r + \cdots\cdots + \cdots\cdots + b^n \quad \cdots (3)$$

(1) এবং (2) হইতে দেখা যায়, দ্বিপদ উপপাদ্য $n=2$ এবং $n=3$-এর জন্য সিদ্ধ।

মনে কর, দ্বিপদ উপপাদ্য $n=m$ (m—একটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা)-এর জন্য সিদ্ধ।

$$\therefore \quad (a+b)^m = a^m + {}^mC_1 a^{m-1}b + {}^mC_2 a^{m-2}b^2 + \cdots + {}^mC_{r-1} a^{m-r+1}b^{r-1} + {}^mC_r a^{m-r}b^r + \cdots + b^m \quad \cdots (4)$$

(4)-কে উভয়দিকে $(a+b)$ দিয়া গুণ করিয়া—

$$(a+b)^m(a+b) = (a+b)\{a^m + {}^mC_1 a^{m-1}b + {}^mC_2 a^{m-2}b^2 + \cdots + {}^mC_{r-1}a^{m-r+1}b^{r-1} + {}^mC_r a^{m-r}b^r + \cdots + b^m\}$$

$$(a+b)^{m+1} = a^{m+1} + ({}^mC_1 + 1)a^m b + ({}^mC_2 + {}^mC_1)a^{m-1}b^2 + \cdots + ({}^mC_r + {}^mC_{r-1})a^{m-r+1}b^r + \cdots + b^{m+1}$$

কিন্তু ${}^mC_r + {}^mC_{r-1} = {}^{m+1}C_r$

$$\therefore \quad {}^mC_1 + {}^mC_0 = {}^mC_1 + 1 = {}^{m+1}C_1$$

$${}^mC_2 + {}^mC_1 = {}^{m+1}C_2$$

$$\cdots \qquad \cdots$$

$$\cdots \qquad \cdots$$

$${}^mC_r + {}^mC_{r-1} = {}^{m+1}C_r$$

অতএব $(a+b)^{m+1} = a^{m+1} + {}^{m+1}C_1 a^m b + {}^{m+1}C_2 a^{m-1}b^2 + \cdots + {}^{m+1}C_r a^{m+1-r}b^r + \cdots + b^{m+1}$.

দেখা যায় যে, উপপাদ্য যদি $n=m$-এর জন্য সিদ্ধ ধরা হয়, তাহা হইলে $n=m+1$ এর জন্যও সিদ্ধ। পূর্বেই দেখা গিয়াছে দ্বিপদ উপপাদ্য $n=2$ এবং $n=3$ দ্বারা সিদ্ধ। সুতরাং, ইহা $n=3+1$-এর জন্য সিদ্ধ এবং ইত্যাদি। অতএব, দ্বিপদ উপপাদ্য n-এর ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার জন্য সিদ্ধ।

অনুসিদ্ধান্ত : $(1+x)^n = 1 + {}^nC_1 x + {}^nC_2 x^2 + \cdots + {}^nC_r x^r + \cdots + x^n$

অনুসিদ্ধান্ত : (i) দ্বিপদ উপপাদ্যে মোট পদ-সংখ্যা $= n+1$

(ii) সাধারণ পদ অর্থাৎ $(r+1)$-তম পদ $= {}^nC_r a^{n-r}b^r$.

মধ্যপদ (Middle term)

(i) মনে কর, n একটি অযুগ্ম সংখ্যা

$$\therefore \quad n = (2m+1), \; m = 0, 1, 2, \cdots$$

মোট পদ-সংখ্যা $= n+1$

$$= 2m+1+1$$

$$= 2m+2 \text{ (যুগ্ম)}$$

সুতরাং, এক্ষেত্রে দুইটি মধ্যপদ থাকিবে। $(m+1)$-তম পদ এবং $\{(m+1)+1\}$-তম পদ।

$(a+b)^n=(a+b)^{2m+1}$ দ্বিপদ রাশিমালায়

$(m+1)$-তম পদ $={}^nC_m a^{n-m} b^m$

$$={}^nC_{\frac{1}{2}(n-1)} . a^{n-\frac{1}{2}(n-1)} . b^{\frac{1}{2}(n-1)}$$

$(m+2)$-তম পদ $=\{(m+1)+1\}$-তম পদ

$$={}^nC_{m+1} . a^{n-(m+1)} . b^{m+1}$$

$$={}^nC_{\frac{1}{2}(n+1)} . a^{n-\frac{1}{2}(n+1)} . b^{\frac{1}{2}(n+1)}$$

$[\because \quad n=2m+1,\ m=\frac{1}{2}(n-1),\ m+1=\frac{1}{2}(n+1)]$

(ii) মনে কর, n একটি যুগ্ম সংখ্যা

$=2m,\ m=1, 2, \cdots$

$\therefore \quad m=\frac{n}{2}.$

মোট পদ-সংখ্যা $=n+1=m+1$

সুতরাং, মধ্যপদ একটি $=(m+1)$-তম পদ।

$$={}^nC_m a^{n-m} b^m={}^nC_{\frac{n}{2}} . a^{\frac{n}{2}} . b^{\frac{n}{2}}$$

সমদূরবর্তী পদ

সাধারণভাবে প্রথম দিক হইতে $(r+1)$-তম পদ এবং শেষদিক হইতে $(r+1)$-তম পদকে সমদূরবর্তী পদ বলে।

শেষদিক হইতে $(r+1)$-তম পদ

$=$ প্রারম্ভ হইতে $\{(n-r)+1\}$-তম পদ

$\therefore \quad {}^nC_r={}^nC_{n-r}$

অর্থাৎ $(1+x)^n$ রাশিমালায় শেষদিক হইতে $(r+1)$-তম পদের সহগ এবং প্রথম দিক হইতে $(n-r+1)$-তম পদের সহগ পরস্পর সমান।

দ্বিপদ রাশিমালার সহগসমূহের ধর্ম

(Properties of Binomial Coefficient)

তোমরা জান—

$(1+x)^n=1+{}^nC_1 x+{}^nC_2 x^2+\cdots+{}^nC_r x^{n-r}+\cdots+x^n$

$x=1$ বসাইয়া

$2^n=1+{}^nC_1+\cdots+{}^nC_r+\cdots+1$

$={}^nC_0+{}^nC_1+{}^nC_2+\cdots+{}^nC_r+\cdots+{}^nC_n.$

সাধারণভাবে ${}^nC_0=C_0,\ {}^nC_1=C_1 \cdots {}^nC_n=C_n$ ধরা হয়

সুতরাং, $C_0+C_1+C_2+\cdots+C_n=2^n$

অর্থাৎ, দ্বিপদ বিস্তৃতির সহগসমূহের যোগফল $= 2^n$

আবার $x = -1$ বসাইয়া

$$0 = C_0 - C_1 + C_2 - C_3 + C_4 - C_5 + \cdots$$

অর্থাৎ $C_0 + C_2 + C_4 + \cdots$

$$= C_1 + C_3 + C_5 + \cdots$$

$\therefore$ যুগ্ম সহগসমূহের যোগফল

= অযুগ্ম সহগসমূহের যোগফল

$$= \frac{2^n}{2} = 2^{n-1}.$$

উদাহরণ 1.

বিস্তার কর : $(2x+3y)^5$

$$(2x+3y)^5 = (2x)^5 + {}^5C_1(2x)^4 . 3y + {}^5C_2(2x)^3(3y)^2 + {}^5C_3(2x)^2(3y)^3 + {}^5C_4 2x.(3y)^4 + (3y)^5$$

$$= 32x^5 + 240x^4y^3 + 720x^3y^2 + 1080x^2y^3 + 810xy^4 + 243y^5$$

উদাহরণ 2. $\left(a+\frac{1}{a}\right)^{2n}$ দ্বিপদ রাশির n-তম পদ নির্ণয় কর।

n-তম পদ $= \{(n-1)+1\}$-তম পদ

$$= {}^{2n}C_{n-1}(a)^{2n-n+1} \cdot \frac{1}{a^{n-1}}$$

$$= {}^{2n}C_{n-1}\, a^2.$$

$$= \frac{\lfloor 2n}{\lfloor n-1 \quad \lfloor n+1} a^2.$$

উদাহরণ 3. $\left(x-\frac{1}{x}\right)^{10}$ দ্বিপদ রাশির মধ্যপদ নির্ণয় কর।

মোট পদ-সংখ্যা $= 10+1$

মধ্যপদ $= (5+1)$-তম পদ

$$= {}^{10}C_5 . (x)^5 . \left(-\frac{1}{x}\right)^5$$

$$= \frac{\lfloor 10}{\lfloor 5 \lfloor 5} . (-1)^5$$

$$= -252.$$

উদাহরণ 4. $(x-x^2)^{10}$ বিস্তৃতির x^{15}-এর সহগ নির্ণয় কর।

$$(x-x^2)^{10} = x^{10}(1-x)^{10}$$

$$= x^{10}(1 - {}^{10}C_1x + {}^{10}C_2x^2 - {}^{10}C_3x^3 + {}^{10}C_4x^4 - {}^{10}C_5x^5 + \cdots\cdots + x^{10})$$

সুতরাং প্রদত্ত দ্বিপদ রাশির x^{15}-এর সহগ

$$= -{}^{10}C_5 = -\frac{\lfloor 10}{\lfloor 5 \lfloor 5} = -252.$$

উদাহরণ 5. $\left(2x+\frac{1}{3x^2}\right)^9$ বিস্তৃতির x-বর্জিত পদ নির্ণয় কর।

মনে কর, প্রদত্ত বিস্তৃতির $(r+1)$-তম পদ x-বর্জিত

$\therefore$ $(r+1)$-তম পদ $= {}^9C_r(2x)^{9-r}.\left(\frac{1}{3x^2}\right)^r$

$$= {}^9C_r \frac{2^{9-r}}{3^r} x^{9-3r}$$

যেহেতু $(r+1)$-তম পদ x-বর্জিত

$\therefore$ $x^{9-3r} = x^0$

$\therefore$ $3r = 9$, $r = 3$.

$(r+1)$-তম পদ $= (3+1)$-তম পদ

$$= {}^9C_3 \frac{2^6}{3^3} = \frac{1792}{9} = 199\tfrac{1}{9}.$$

উদাহরণ 6. দ্বিপদ উপপাদ্যের সাহায্যে $(\cdot 99)^4$-এর দুই দশমিক অঙ্ক পর্যন্ত আসন্ন মান নির্ণয় কর।

$$(\cdot 99)^4 = (1-\cdot 01)^4$$
$$= 1 - {}^4C_1(\cdot 01) + {}^4C_2(\cdot 01)^2 - {}^4C_3(\cdot 01)^3 + (\cdot 01)^4$$
$$= 1 - \cdot 04 + \cdot 0006 - \cdot 000004 + \cdot 00000001$$
$= \cdot 96$ (আসন্ন দুই দশমিক পর্যন্ত).

উদাহরণ 7. যদি $(1+x)^n = C_0 + C_1x + C_2x^2 + \cdots\cdots + C_nx^n$ হয়, দেখাও যে,

(i) $C_0C_n + C_1C_{n-1} + C_2C_{n-2} + \cdots\cdots + C_nC_0$

$$= \frac{\lfloor 2n}{(\lfloor n)^2}$$

(ii) $C_0 + \frac{1}{2}C_1 + \frac{1}{3}C_2 + \cdots\cdots + \frac{C_n}{n+1} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)}$.

$$(1+x)^n = C_0 + C_1x + C_2x^2 + \cdots\cdots + C_nx^n \qquad (1)$$

আবার $(1+x)^n = C_0 + C_1x + C_2x^2 + \cdots\cdots + C_nx^n \quad \cdots \quad (2)$

(1) ও (2) উভয়পক্ষে গুণ করিয়া

$$(1+x)^{2n} = (C_0 + C_1x + C_2x^2 + \cdots\cdots + C_nx^n)$$
$$\times (C_0 + C_1 + C_2x^2 + \cdots\cdots + C_nx^n)$$

যেহেতু ইহা একটি অভেদ,

$\therefore$ উভয়দিক হইতে x^n-এর সহগ সমান হইবে।

বামপক্ষ হইতে x^n-এর সহগ $=(n+1)$-তম পদের সহগ $= {}^{2n}C_n$

ডান পক্ষ হইতে x^n-এর সহগ

$$=C_0C_n+C_1C_{n-1}+C_2C_{n-2}+\cdots\cdots+C_nC_0$$

$$\therefore\quad C_0C_n+C_1C_{n-1}+C_2C_{n-2}+\cdots\cdots+C_nC_0$$

$$=\frac{\lfloor 2n}{(\lfloor n)^2}$$

$$C_0+\tfrac{1}{2}C_1+\tfrac{1}{3}C_2+\cdots\cdots+\frac{C_n}{n+1}$$

$$=\frac{1}{n+1}\left[(n+1)C_0+\frac{(n+1)}{2}C_1+\frac{(n+1)}{3}C_2+\cdots\cdots+C_n\right]$$

$$=\frac{1}{n+1}\left[(n+1)+\frac{(n+1)}{2}C_1+\frac{(n+1)n(n-1)}{3\,.\,2\,!}+\cdots\cdots+1\right]$$

$$=\frac{1}{n+1}\left[1+(n+1)+\frac{(n+1)n}{2\,!}+\frac{(n+1)n(n-1)}{3\,!}+\cdots\cdots+1\right]$$

$$=\frac{1}{(n+1)}\left[(1+1)^{n+1}-1\right]$$

$$\frac{1}{(n+1)}\left[2^{n+1}-1\right]=\text{ডানপক্ষ।}$$

প্রশ্নমালা 10

1. $(\frac{2x}{3}-\frac{3}{2x})^6$ দ্বিপদ রাশির বিস্তার কর।
2. $(x-2y)^6$ দ্বিপদ রাশির বিস্তার কর।
3. $(x-5y)^8$ দ্বিপদ রাশির 5-ম তম পদ নির্ণয় কর।
4. $(3x-2y)^{18}$ দ্বিপদ রাশির মধ্যপদ নির্ণয় কর।
5. $(x-\frac{1}{x})^9$ দ্বিপদ রাশির মধ্যপদ দুইটি নির্ণয় কর।
6. দেখাও যে, $\dfrac{1.3.5\cdots\cdots(2n-1)}{\lfloor n}2^n$, $\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^{2n}$ দ্বিপদ রাশির মধ্যপদ।
7. $\left(2x^2-\dfrac{1}{3x}\right)^{12}$-এর বিস্তৃতিতে x-বর্জিত পদের সরলীকৃত মান নির্ণয় কর।
8. $\left(x^2-\dfrac{1}{x^3}\right)^{12}$-এর বিস্তৃতিতে x^{-11} এর সহগ নির্ণয় কর।
9. $\left(\dfrac{3}{2}x^2-\dfrac{1}{3x}\right)^9$-এর বিস্তৃতির x-বর্জিত পদ নির্ণয় কর।
10. দ্বিপদ উপপাদ্যের সাহায্যে $(1{\cdot}05)^4$ এবং $({\cdot}999)^3$ এর মান আসন্ন চার দশমিক পর্যন্ত নির্ণয় কর।

11. যদি $(1+x)^n = C_0+C_1x+C_2x^2+\cdots+C_nx^n$

দেখাও যে, (i) $C_1+2C_2+3C_3+\cdots+nC_n = n.2^{n-1}$

(ii) $C_0^2+C_1^2+C_2^2+\cdots+C_n^2 = \dfrac{\lfloor 2n}{(\lfloor n)^2}$

(iii) $C_1-2C_2+3C_3-\cdots+n(-1)^{n-1}C_n = 0$

লগারিদম্ (Logarithm)

পাটিগণিতে প্রাথমিকভাবে যোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়ায় গাণিতিক গণনা করা হয়। এই গণনা ত্বরান্বিত করার জন্য গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়ার ব্যবহার হয়। বীজগণিতে এই প্রক্রিয়াগুলির ব্যবহার হয় সূত্রের সাহায্যে। কিন্তু জটিল গণনা আরও তাড়াতাড়ি করা যায়, আর-একটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে ; ইহার নাম লগারিদম্ (Logarithm) গণনা। এর আবিষ্কারক John Napier (1550—1617)। এই গণনার প্রাথমিক নিয়ম-কানুনগুলি নিম্নে বিশ্লেষণ করা হইল :—

তোমরা জান, $2^3 = 8$

$10^4 = 10{,}000$

সাধারণভাবে সংখ্যার উল্লেখ না করিয়া লেখা যায়—$a^x = N$, $a > 0$, $a \neq 1$

লগারিদমের সংজ্ঞানুসারে,

$$x = \log_a N$$

অর্থাৎ x-কে বলা হয়, a-কে নিধান করিয়া N-এর লগারিদম্ মান।

সুতরাং $3 = \log_2 8$

$4 = \log_{10} 10{,}000.$

আবার $8^2 = 64$

$2^6 = 64$

সুতরাং $2 = \log_8 64$

এবং $6 = \log_2 64$

স্পষ্টতঃ বিভিন্ন ভূমিতে একই সংখ্যার লগারিদম্ মান বিভিন্ন।

যেহেতু $\left.\begin{array}{l} a^0 = 1 \\ a^1 = a \end{array}\right\}$

$\left.\begin{array}{l} 10^0 = 1 \\ 10^1 = 10 \end{array}\right\}$

সংজ্ঞানুসারে, $\left.\begin{array}{l} 0 = \log_a 1 \\ 1 = \log_a a \end{array}\right\}$ এবং $\left.\begin{array}{l} 0 = \log_{10} 1 \\ 1 = \log_{10} 10 \end{array}\right\}$

এখানে দেখা যায়, এককের যে-কোন নিধানে লগারিদম্ মান $= 0$। আবার, যে-কোন সংখ্যার লগারিদম্ মান সেই সংখ্যাকেই নিধান ধরিয়া একক অর্থাৎ 1।

নিধান যদি 10 হয়, তবে ইহা সাধারণ নিধানরূপে অভিহিত হয় এবং কোন সংখ্যার লগারিদম্ মানে সাধারণ নিধানের উল্লেখ থাকে না। 10 ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যা নিধান হইলে তার উল্লেখ থাকিবে।

যেমন, $10^2=100, \quad \therefore \quad 2=\log_{10}100=\log 100$
$10^4=10{,}000, \quad \therefore \quad 4=\log_{10}10{,}000=\log 10{,}000$
$2^3=8,$ কিন্তু $3=\log_2 8.$

লগারিদমের সূত্র (Laws of Logarithm) **:**

(i) $\log_a m\times n=\log_a m+\log_a n$

(ii) $\log a\,\frac{m}{n}=\log_a m-\log_a n$

(iii) $\log_a m^n=n\log_a m$

প্রমাণ : মনে কর,

(i) $x=\log_a m,\ y=\log_a n$ এবং $z=\log_a m\times n$

সুতরাং $a^x=m \quad \cdots(1),\quad a^y=n \quad \cdots(2),\quad a^z=m\times n \quad \cdots(3)$

উভয়দিকে (1) এবং (2) গুণ করিয়া, $a^{x+y}=m\times n \quad \cdots(4)$

(3) এবং (4) হইতে,

$$a^z=a^{x+y} \qquad \therefore \quad z=x+y$$

(ii) এক্ষেত্রে $z=\log_a \frac{m}{n}$ ধর

$$\therefore \quad a^z=\frac{m}{n} \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots(5)$$

(1) কে (2) দিয়া উভয়দিকে ভাগ করিয়া

$$\frac{a^x}{a^y}=\frac{m}{n}.$$

অথবা, $a^{x-y}=\frac{m}{n} \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots(6)$

(5) এবং (6) হইতে,

$$a^z=a^{x-y} \qquad \therefore \quad z=x-y.$$

(iii) যদি $x=\log_a m^n,\ y=\log_a m$ ধর

সুতরাং $a^x=m^n \quad \cdots(7)$ এবং $a^y=m \quad \cdots \quad \cdots(8)$

(8) হইতে, $m^n=(a^y)^n=a^{ny} \quad \cdots \quad \cdots(9)$

(7) এবং (9) হইতে

$$x=ny.$$

সূত্রের উদাহরণ :

$$\left.\begin{aligned}\log 7\times 5&=\log 7+\log 5\\ \log \tfrac{7}{5}&=\log 7-\log 5\\ \log 7^5&=5\log 7\end{aligned}\right\}$$

নিধান-বিবর্তন নিয়ম ঃ

$$\log_a b = \log_c b \times \log_a c \qquad \cdots \qquad \cdots \qquad (1)$$

প্রমাণ ঃ মনে কর,

$$\log_a b = z,\ \log_c b = x,\ \log_a c = y$$

$$\therefore\ a^z = b,\ c^x = b,\ a^y = c$$

অতঃপর $a^z = b = c^x = (a^y)^x = a^{xy} \quad \therefore\ z = xy.$

(1) এ $a = b$ ধরিলে,

$$\log_c a \times \log_a c = \log_a a = 1$$

অর্থাৎ $\boxed{\log_c a \times \log_a c = 1}$

লগারিদ্‌ম-সারণী ব্যবহারের নিয়মাবলী ঃ

তোমরা জান,

$10^0 = 1 \qquad \therefore\ 0 = \log_{10} 1 = \log 1$

$10^1 = 10 \qquad 1 = \log_{10} 10 = \log 10$

$10^2 = 100 \qquad 2 = \log_{10} 100 = \log 100$

$10^3 = 1000 \qquad 3 = \log_{10} 1000 = \log 1000$

$10^4 = 10{,}000 \qquad 4 = \log_{10} 10{,}000 = \log 10{,}000$

$15^5 = 1{,}00{,}000 \qquad 5 = \log_{10} 1{,}00{,}000 = \log 1{,}00{,}000.$

স্পষ্টতঃ $\log 7 > 0$ এবং < 1

$\log 75 > 1$ এবং < 2

$\log 758 > 2$ এবং < 3

$\log 7588 > 3$ এবং < 4

$\log 75886 > 4$ এবং < 5

স্পষ্টতঃ যে-কোন সংখ্যার ($\geqslant 1$) লগারিদ্‌ম মান আংশিক পূর্ণ সংখ্যা এবং আংশিক খণ্ড সংখ্যা। লগারিদম্‌ মানের পূর্ণ সংখ্যাকে Characteristic এবং খণ্ডাংশকে Mantissa বলে। Characteristic ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হইতে পারে, কিন্তু Mantissa ধনাত্মক হইতে হইবে।

ধরা যাক,

$\log 758 = 2\,.\,(\qquad\qquad)$

$\log 75.88 = 1\,.\,(\qquad\qquad)$

এই দুইটি উদাহরণ হইতে দেখা যায়, কোন সংখ্যায় যত সংখ্যক অঙ্ক থাকে, তাহা হইতে 1 বিয়োগ করিলে লগারিদ্‌ম-সংখ্যার Characteristic পাওয়া যায়। খণ্ড-সংখ্যা লগ-সারণী (log table) হইতে নির্ণয় করিতে হয়।

লগ-সারণী :

ইহা দুই ভাগে বিভক্ত—প্রধান সারণী ও উপ-সারণী। প্রধান সারণী হইতে 3 অঙ্ক পর্যন্ত Mantissa নির্ণয় করা যায় এবং চতুর্থ অঙ্কের জন্য উপ-সারণী হইতে প্রাপ্ত মান প্রধান সারণী হইতে প্রাপ্ত মানের ডান দিক হইতে যোগ করিতে হইবে। ততোধিক অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ ইত্যাদি অঙ্কের মান ঐরূপে যোগ করিতে হইবে, কিন্তু প্রতিবার এক ঘর ডানদিকে সরিয়া যোগ করিতে হইবে।

$\therefore$ $\log 758 = 2{\cdot}8797$

$\log 75{\cdot}885 = 1{\cdot}8802$

$= 1{\cdot}8802$

(আসন্ন চার দশমিক পর্যন্ত)

8797
5
03
88023

এখন পর্যন্ত যে-কোন সংখ্যার (>1) লগারিদ্‌ম মান নির্ণয় পদ্ধতি আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু সংখ্যা <1 এর জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে। যেমন—log. ·57, log. ·057, log. ·0057 ইত্যাদি।

$$\log {\cdot}57 = \log\frac{57}{100} = \log 57 - \log 100$$

$$= 1{\cdot}7559 - 2{\cdot}0000$$

$$= -1 + {\cdot}7559 = \bar{1}{\cdot}7559$$

$$\log {\cdot}057 = \log\frac{57}{1000} = \log 57 - \log 1000$$

$$= 1{\cdot}7559 - 3{\cdot}0000$$

$$= -2 + {\cdot}7559 = \bar{2}{\cdot}7559.$$

$$\log {\cdot}0057 = \log\frac{57}{10000} = \log 57 - \log 10000$$

$$= 1{\cdot}7559 - 4{\cdot}0000$$

$$= -3 + {\cdot}7559$$

$$= \bar{3}{\cdot}7559.$$

সাধারণভাবে বলা যায়, যদি দশমিক বিন্দুর পূর্বে কোন অঙ্ক না থাকে এবং তারপরই 1 হইতে 9 পর্যন্ত যে-কোন অঙ্কের characteristic $\bar{1}$ (অর্থাৎ -1), কিন্তু দশমিক বিন্দুর পর একটি 0 এবং তারপর যে-কোন অঙ্ক, দুইটি 0 এবং তারপর যে-কোন অঙ্ক ইত্যাদি থাকিলে characteristic যথাক্রমে $\bar{2}$, $\bar{3}$, ইত্যাদি হয়। Mantissa দশমিক বিন্দু নাই মনে করিয়া লগ-সারণী হইতে নির্ণয় করিতে হয়।

উদাহরণ 1. প্রমাণ কর $7\log\frac{10}{9} - 2\log\frac{25}{24} + 3\log\frac{81}{80} = \log 2$

বামপক্ষ (L.H.S.)

$$= 7(\log 10 - \log 9) - 2(\log 25 - \log 24) + 3(\log 81 - \log 80)$$

$$=7\{\log(5\times2)-\log 3^2\}-2(\log 5^2-\log 3\times2^3)$$
$$+3(\log 3^2-\log 5\times2^4)$$
$$=7\{\log 5+\log 2-2\log 3\}-2(2\log 5-\log 3-3\log 2)$$
$$+3(4\log 3-\log 5-4\log 2)$$
$$=7\log 5+7\log 2-14\log 3-4\log 5+2\log 3+6\log 2$$
$$+12\log 3-3\log 5-12\log 2$$
$$(7+6-12)\log 2+(-14+2+12)+(7-4-3)\log 5=\log 2.$$

উদাহরণ 2. লগ-সারণী ব্যবহার করিয়া log 75, log 862, log 75·627 log ·00862 এর মান নির্ণয় কর।

$$\log 75=1{\cdot}8751$$

এখানে অংকের সংখ্যা = 2 ∴ characteristic = 2 − 1 = 1

লগ-সারণী (প্রধান) হইতে 75 যে-সারি (row)-তে এবং 0 যে-পাটি (column)-তে দশমিকাংশ (Mantissa) দশমিকের পর বসাও।

$$\log 852=2{\cdot}9355.$$

এখানে অংকের সংখ্যা = 3, characteristic = 3 − 1 = 2

লগ-সারণী (প্রধান) হইতে (86 যে-সারিতে এবং 2 যে-পাটিতে) দশমিকাংশ দশমিকের পর বসাও।

log 75·627 = 1 (দশমিকাংশ), এখানে অংকের সংখ্যা = 2 (দশমিকের পূর্বের যে অঙ্কগুলি আছে, সেইগুলি কেবল গণনা করিবে)।

লগ-সারণী (প্রধান) হইতে মান নির্ণয় করার সময় দশমিক বিন্দু নাই, মনে করিতে হইবে।

লগ-সারণী (প্রধান) হইতে 75 যে-সারিতে এবং 6 যে-পাটিতে মান 8791, তারপর উপ-সারণী হইতে 75 যে-সারিতে এবং 2 যে-পাটিতে প্রাপ্ত মান 1, প্রধান সারণী হইতে প্রাপ্ত মানের সংগে যোগ করিবে। অনুরূপে 7-এর মান 4. ইহাও পূর্বোক্ত যোগফলের সংগে যোগ করিবে কিন্তু এক ঘর ডানদিকে।

$$\begin{array}{r} 8785\\ 1\\ 04\\ \hline 87864 \end{array}$$

সুতরাং log 75·627 = 1·87864

= 1·8786 (আসন্ন চার দশমিক পর্যন্ত),

$\log {\cdot}000862=\bar{3}{\cdot}9355=-3+{\cdot}9355$

(∵ ·000862 < 1, দশমিকের পূর্বে কোন অঙ্ক নাই এবং দশমিক বিন্দুর পর 3টি 0 বর্তমান, সুতরাং characteristic = $\bar{4}$ এবং দশমিকাংশ গণনার সময় দশমিক বিন্দু নাই মনে করিয়া দ্বিতীয় উদাহরণের মতো গণনা করিলে পাইবে 9355)।

অ্যান্টি-লগারিদম্ (Anti-logarithm)

লগ-সারণীর মতো অ্যান্টি-লগ-সারণীও দুই ভাগে বিভক্ত। প্রধান সারণী ও উপ-সারণী। কিন্তু অ্যান্টি-লগ গণনার সময় শুধু Mantissa-এর জন্য মান নির্ণয় করিবে, লগ-সারণী যে-ভাবে দেখা হয় সেই ভাবে। Characteristic দিয়া দশমিক বিন্দুর স্থান নির্ণয় করিবে। Characteristic যদি 2 হয়, ইহার সঙ্গে সর্বদা 1 যোগ করিয়া অর্থাৎ এখানে 3 ঘর পর দশমিক বিন্দু বসাইবে। কিন্তু characteristic যদি $\bar{1}$, $\bar{2}$, $\bar{3}$ হয়, তবে দশমিক বিন্দু অ্যান্টি-লগ গণনার পর যথাক্রমে প্রাপ্ত মানের ঠিক পূর্বে, প্রাপ্ত মানের পূর্বে একটি 0, 2টি 0 বসাইয়া দশমিক বিন্দু বসাইবে।

মনে কর $\log x = 2{\cdot}7521$ এবং $\log y = \bar{2}{\cdot}7521$, x এবং y নির্ণয় কর।

$x =$ অ্যান্টি-লগ ($2{\cdot}7521$)
$\quad = 565{\cdot}0$
$y =$ অ্যান্টি-লগ $\bar{2}{\cdot}7521$
$\quad = {\cdot}05650$

5649
1
5650

উদাহরণ 1. $\log 2 = {\cdot}3010300$ হইলে,

$\log ({\cdot}0125)^{\frac{1}{5}}$-এর মান নির্ণয় কর।

$$\log ({\cdot}0125)^{\frac{1}{5}} = \tfrac{1}{5} \log {\cdot}0125$$
$$= \tfrac{1}{5} [\log \tfrac{125}{10000}] = \tfrac{1}{5} [\tfrac{1}{5}\log 125 - \log 10000]$$
$$= \tfrac{1}{5} [\log 5^3 - 4] = \tfrac{3}{5} \log 5 - \tfrac{4}{5} = \tfrac{3}{5} \log \tfrac{10}{2} - {\cdot}8$$
$$= \tfrac{3}{5} [\log 10 - \log 2] - {\cdot}8 = \tfrac{3}{5} [1 - {\cdot}3010300] - {\cdot}8$$
$$= {\cdot}6 - {\cdot}1806180 - {\cdot}8 = -{\cdot}3806180$$
$$= -1 + {\cdot}6193820 = \bar{1}{\cdot}6193820.$$

উদাহরণ 2. মান নির্ণয় কর ঃ

$$\sqrt[5]{\frac{({\cdot}32)^8 \times (625)^4}{({\cdot}00432)^2 \times ({\cdot}3125)^3 \times 25}}$$

ধর $$x = \sqrt[5]{\frac{({\cdot}32)^8 \times (625)^4}{({\cdot}00432)^2 \times ({\cdot}3125)^3 \times 25}}$$
$$= \left\{\frac{({\cdot}32)^8 \times (625)^4}{({\cdot}00432)^2 \times ({\cdot}3125)^3 \times 25}\right\}^{\frac{1}{5}}$$

উভয়পক্ষে লগ লইয়া

$$\log x = \tfrac{1}{5}[8 \log {\cdot}32 + 4 \log 625 - 2 \log {\cdot}00432 - 3 \log {\cdot}3125 - \log 25]$$
$$= \tfrac{1}{5}[8 \times \bar{1}{\cdot}5051 + 4 \times 2{\cdot}7959 - 2 \times \bar{3}{\cdot}6355 - 3 \times \bar{1}{\cdot}4949 - 1{\cdot}3979]$$
$$= \tfrac{1}{5}[8(-1 + {\cdot}5051) + 11{\cdot}1836 - 2(-3 + {\cdot}6355)$$
$$- 3(-1 + {\cdot}4949) - 1{\cdot}3979]$$
$$= \tfrac{1}{5}[-8 + 4{\cdot}0408 + 11{\cdot}1836 + 6 - 1{\cdot}2710 + 3 - 1{\cdot}4847 - 1{\cdot}3979]$$

$=\frac{1}{5}\{(-8-1\cdot2710-1\cdot4847-1\cdot3979)+(4\cdot0408+11\cdot1836+6+3)\}$

$=\frac{1}{5}[-12\cdot1536+24\cdot2244]$

$=\frac{12\cdot0708}{5}=2\cdot4142$

$\therefore\quad x=\text{Antilog }(2\cdot4142)=259\cdot5.$

উদাহরণ 3. $\log_8 7$-এর মান নির্ণয় কর।

$\log_8 7=\log_{10} 7\times\log_8 10$

$=\log_{10} 7\times\frac{1}{\log_{10} 8}$

$=\frac{\log 7}{\log 8}=\frac{\cdot8451}{\cdot9031}=9\cdot058$

প্রশ্নমালা 11

1. **প্রমাণ কর :** $\log 2+16\log\frac{16}{15}+12\log\frac{25}{24}+7\log\frac{81}{80}=1.$
2. $\log 2=\cdot3010300$, $\log 3=\cdot4771213$ হইলে,
   মান নির্ণয় কর :
   (i) $\log\cdot45$, (ii) $\log(\cdot0625)^{\frac{1}{7}}$, (iii) $(\cdot405)^{\frac{1}{6}}$.
3. নিম্নলিখিত সংখ্যাসমূহের অ্যাণ্টি-লগ নির্ণয় কর :
   (i) $\cdot758$, (ii) $2\cdot561$, (iii) $\bar{1}\cdot625$, (iv) $\bar{2}\cdot8691$.
4. লগ-সারণীর সাহায্যে মান নির্ণয় কর :
   $\log\{(2\cdot7)^3\times(\cdot81)^{\frac{4}{5}}\div(90)^{\frac{5}{4}}\}$
5. মান নির্ণয় কর :
   (i) $(789\cdot45)^{\frac{1}{8}}$ (ii) $\sqrt[3]{45\cdot37}\times(\cdot7692)^4$
   (iii) $\left(\frac{5\cdot52\times2610}{7\cdot36\times3\cdot142}\right)^{\frac{1}{3}}$
6. $\log 659\cdot31=2\cdot8190897$
   $\log 6\cdot5932=\cdot81910962$
   $\log 6593\cdot11$-এর মান নির্ণয় কর, Interpolation-পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া।
7. **সমাধান কর :**
   (i) $4^{2x+1}=5^{x+2}$,
   (ii) $(1-x)^{12}=\cdot5187$,
   (iii) $2^x.7^y=80000$, $3^y=500$.
8. দেখাও যে, $(\frac{21}{20})^{100}>100$
   প্রদত্ত $\log 2=\cdot30103$, $\log 3=\cdot47712$ $\log 7=\cdot84509$,

সুদ (Interest)

অর্থনৈতিক লেনদেন ব্যবস্থায় ব্যাংক-এর অগ্রণী ভূমিকা আছে। যেমন—ব্যাংক-এ টাকা জমা রাখিলে আয় হয় ; আবার, ব্যাংক কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে টাকা ধার দিলে, ব্যক্তি বা সংস্থার যেমন উপকার হয়, ব্যাংকও প্রদত্ত টাকার উপর বাড়তি টাকা চায়। জমার উপর আয়, নিয়োজিত টাকার উপর বাড়তি টাকাকেই **সুদ** বলে। সুদ দুই প্রকার : সরল সুদ (Simple Interest) ও চক্র-বৃদ্ধি সুদ (Compound Interest)।

কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োজিত টাকার উপর দেয় টাকাকে বলে সুদ। যে টাকা নিয়োগ করা হয়, সেই টাকাকে বলে আসল। আসল ও সুদ একত্রে বলা হয় সবৃদ্ধিমূল (সুদ-আসল)।

মনে কর 100 টাকার 1 বৎসরের সরল সুদ $= r$ টাকা

1 ,, 1 ,, ,, ,, $= \frac{r}{100} = i$ (ধর)

P ,, 1 ,, ,, ,, $= Pi$

P ,, n ,, ,, ,, $= nPi$

$\therefore$ মোট সরল সুদ $= nPi = \frac{nPr}{100} = 1$

এখানে P = আসল

r = সুদের হার

n = বৎসরের সংখ্যা

সুদ-আসল

$$= nPi + P$$
$$= P(1 + ni)$$
$$= P\left(1 + \frac{nr}{100}\right)$$

চক্র-বৃদ্ধি সুদ (Compound Interest)

মনে কর, কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিছু অর্থ নিয়োগ করা হইল। তারপর সেই সময়কাল সমপর্যায়ে বিভক্ত করা হইল। প্রতি পর্যায়কে বলা হয় সুদ-নির্ণয় কাল। প্রতি একক অর্থের (বা টাকার) উপর ঐ সময়ে সুদ নির্ণয় কর। পর্যায়কাল সাধারণত 1 বৎসর ধরা হয়। প্রয়োজনবোধে ষাণ্মাসিক, ত্রৈমাসিক বা মাসিকও হইতে পারে।

প্রথম পর্যায়কালের প্রারম্ভে যে-পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করা হয়, তাকে বলা হয় প্রাথমিক নিয়োজিত অর্থ।

মনে কর, P-পরিমাণ অর্থ r-হার চক্রবৃদ্ধি সুদে n-বৎসরের জন্য নিয়োজিত হইল।

অতএব 100 টাকার 1 বৎসরের সুদ $= r$ টাকা

1 „ 1 „ „ $= \frac{r}{100} = i$ (ধর)

P „ 1 „ „ $= Pi$.

1 বৎসর পর সবৃদ্ধিমূল $= P + Pi = P(1+i)$

দ্বিতীয় বৎসরের প্রারম্ভে আসল $= P(1+i)$

$P(1+i)$ টাকার 1 বৎরের সুদ $= P(1+i)i$

∴ দ্বিতীয় বৎসরের শেষে

সুদ-আসল $= P(1+i) + P(1+i)i$

$= P(1+i)(1+i)$

$= P(1+i)^2$.

অনুরূপে n-বৎসর পর সুদ-আসল হইবে $= P(1+i)^n = A$ (ধর)

মোট সুদ $= A - P$

$= P(1+i)^n - P$

$= P\{(1+i)^n - 1\}$.

যদি 1 বৎসরে একাধিকবার সুদ গণনা করা হয়, তবে একক অর্থের উপর 1 বৎসরের সুদ, ঐ সংখ্যা দিয়া ভাগ এবং বর্ষসংখ্যা, ঐ সংখ্যা দিয়া গুণ করিতে হইবে।

সুতরাং, $A = P(1 + \frac{i}{q})^{nq}$

উদাহরণ 1.

1706 টাকা সরল সুদে যে-হারে 20 বৎসরে 3412 টাকা হয়, সেই হারে কত টাকা 6 বৎসরে 5200 টাকা হইবে?

তোমরা জান,

সুদ-আসল $= P(1+ni)$

এখানে সুদ-আসল $= 3412$ টাকা

$P = 1706$ টাকা

$n = 20$

∴ $3412 = 1706\ (1 + 20i)$

অথবা, $2 = 1 + 20i$

∴ $i = \frac{1}{20}$.

আবার, সুদ-আসল $= P_1(1 + n_1 i)$

এখানে সুদ-আসল $= 5200$ টাকা

$n_1 = 6$

$i = \frac{1}{20}$

অতএব, $5200 = P_1(1 + \frac{6}{20})$

∴ $P_1 = \frac{5200 \times 20}{26} = 4000$ টাকা।

উদাহরণ 2.

এক ব্যক্তি তাঁর পুত্র ও কন্যার মধ্যে 20,000 টাকা এমনভাবে ভাগ করিয়া দেন, যেন কন্যা 5 বৎসর পর সুদে-আসলে যে-টাকা পাইবে, পুত্র 7 বৎসর পর সুদে-আসলে সেই টাকাই পাইবে। চক্র-বৃদ্ধি সুদের হার 4% হইলে প্রত্যেকে কত টাকা করিয়া পাইল নির্ণয় কর।

মনে কর, বর্তমানে 20,000 টাকার মধ্যে কন্যা পায় P টাকা। সুতরাং, পুত্র পায় (20,000 – P) টাকা। 5 বৎসর পর কন্যা সুদে-আসলে যা পাইবে, 7 বৎসর পরে পুত্র সেই টাকাই পাইবে।

সুতরাং, কন্যা পাইবে, $A = P(1+\frac{4}{100})^5$ ... ... (1)

আবার, $A = (20,000 - P)(1+\frac{4}{100})^7$ ... (2)

(1) ও (2) হইতে,

$$P(1+{\cdot}04)^5 = (20,000-P)(1+{\cdot}04)^7$$

অথবা, $P = (20,000 - P)(1{\cdot}04)^2$

অথবা, $P\{1+(1{\cdot}04)^2\} = (20,000)(1{\cdot}04)^2$

$\therefore$ $P = \dfrac{20,000 \times (1{\cdot}04)^2}{1+(1{\cdot}04)^2}$

$= \dfrac{21632}{2{\cdot}0816}$ ... ... (3)

(1) হইতে ও (3) হইতে,

$$A = \frac{21632}{2{\cdot}0816}(1{\cdot}04)^5$$

উভয়পক্ষে log লইয়া,

$$\log A = \log 21632 + 5\log 1{\cdot}04 - \log 2{\cdot}0816$$
$$= 4{\cdot}3351 + 5 \times {\cdot}0170 - {\cdot}3184$$
$$= 4{\cdot}3351 + {\cdot}0850 - {\cdot}3184 = 4{\cdot}1016$$

$\therefore$ A = antilog 4·1016 = 12640 টাকা (প্রায়)।

উদাহরণ 3.

এস. রায় 1950 সালের 1লা জুলাই 6000 টাকা ঋণ করিলেন। বর্ষশেষে ধার্য সুদ দিতে না পারায়, প্রাপ্য সুদ চক্র-বৃদ্ধি হারে ধরা হইল। 1954 সালে 1লা জুলাই তিনি মহাজনের নিকট হিসাবের নিষ্পত্তি করিতে চাহিলেন, ইহাতে মহাজন তাহার নিকট 7293 টাকা দাবী করেন। সুদের বার্ষিক হার নির্ণয় কর।

মনে কর, সুদের হার $= r$

সুতরাং, $i = \frac{r}{100}$

এবং $A = P(1+i)^n$

প্রশ্নানুসারে, $P = 6000$ টাকা

$A = 7293$ টাকা

$n = 4$ বৎসর

অতএব, $7293 = 6000\ (1+i)^4$

উভয়পক্ষে log লইয়া,

$$\log 7293 = \log 6000 + 4 \log (1+i)$$

বা, $3{\cdot}8629 = 3{\cdot}7782 + 4 \log (1+i)$

বা, $3{\cdot}8629 - 3{\cdot}7782 = 4 \log (1+i)$

বা, $\frac{{\cdot}0847}{4} = \log (1+i)$

বা, ${\cdot}0212 = \log (1+i)$

$\therefore\ 1+i = \text{antilog } {\cdot}0212$

$= 1{\cdot}050$

অর্থাৎ, $i = {\cdot}050.$

সুতরাং, $r =$ সুদের হার $= i \times 100$

$= {\cdot}050 \times 100$

$= 5.$

বার্ষিকী (Annuity)

সমপর্যায়ে প্রদেয় ক্রমিক প্রদান (Payment)-কে বলা হয় বার্ষিকী (Annuity)। বার্ষিকী যদি নির্দিষ্ট বর্ষকাল পর্যন্ত চলিতে থাকে, তবে নির্দিষ্ট বার্ষিকী (Annuity certain) বলে।

অপরপক্ষে অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিলে Perpetual বার্ষিকী বলে। প্রদানের প্রকারভেদে বার্ষিকীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রদান বর্ষ-আরম্ভে শুরু হইলে বলে বার্ষিকী-পূর্ববর্তী (Annuity Due); অপরপক্ষে, প্রদান বর্ষশেষে শুরু হইলে বলে বার্ষিকী-পরবর্তী (Annuity Immediate)। যদি প্রদানের সময় সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ না থাকে, তবে বার্ষিকী-পরবর্তী ধরা হয়।

বিলম্বিত বার্ষিকী (Deferred Annuity) :

যদি বার্ষিকী নির্দিষ্ট সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার পর শুরু হয়, তবে বলা হয় বিলম্বিত বার্ষিকী।

মনে কর, বর্ষ-সংখ্যা $= n$

একক আসলের উপর সুদ $= \frac{r}{100} = i$ (ধর), $r =$ সুদের হার

নির্দিষ্ট সময়ের পর মোট সুদ-আসল $=$ M (Amount)

সমস্ত বার্ষিকীর বর্তমান মান (Total Present Value) $=$ V

প্রতি কিস্তির বার্ষিকী মান (Annuity) $=$ A.

মনে কর, প্রতি কিস্তি জমা দেওয়া হয় বর্ষশেষে ; প্রথম বার্ষিকীর সুদ গণনা করা হয় $(n-1)$ বৎসর যাবৎ।

$\therefore$ প্রথম কিস্তির সুদ-আসল $= A(1+i)^{n-1}$

অনুরূপে, দ্বিতীয় কিস্তির সুদ-আসল $= A(1+i)^{n-2}$

তৃতীয় কিস্তির সুদ-আসল $= A(1+i)^{n-3}$

... ...

n-তম কিস্তির সুদ-আসল $= A(1+i)^{n-n} = A.$

সুতরাং, M $=$ সর্বমোট সুদ-আসল

$$= A(1+i)^{n-1} + A(1+i)^{n-2} + \cdots\cdots + A(1+i) + A$$

$$= A + A(1+i) + \cdots\cdots + A(1+i)^{n-2} + A(1+i)^{n-1}$$

অর্থাৎ, $$M = \frac{A}{i}\{(1+i)^n - 1\}. \quad \cdots \quad (1)$$

V $=$ মোট আসল

মোট সুদ-আসল $= V(1+i)^{n-1}$

$$= M = \frac{A}{i}\{(1+i)^n - 1\}$$

$$\therefore \quad V=\frac{A}{i}\left\{\frac{(1+i)^n-1}{(1+i)^n}\right\}$$

$$=\frac{A}{i}\{1-(1+i)^{-n}\},$$

বার্ষিকী-পূর্ববর্তীর (Annuity Due) ক্ষেত্রে চলতি বৎসরের সুদ পাওয়া যায় ঃ

সুতরাং, $M_d=(1+i)\frac{A}{i}\{(1+i)^n-1\}$

$$V_d=(1+i)\frac{A}{i}\{1-(1+i)^{-n}\}.$$

বার্ষিকী (Perpetual) ঃ

এক্ষেত্রে n tends to infinity

$\therefore \quad V=\frac{A}{i}$, যদি বার্ষিকী বর্ষশেষে প্রদত্ত হয়।

$V_d=\frac{A}{i}(1+i)$, যদি বার্ষিকী বর্ষ-আরম্ভে শুরু হয়।

উদাহরণ 1.

5000 টাকা লগ্নীতে 8 বৎসর ধরিয়া 1000 টাকা বার্ষিকী পাওয়া যায়। লগ্নীকৃত অর্থ 7% চক্র-বৃদ্ধি সুদে পাওয়া গেলে উক্ত লগ্নী লাভজনক হইবে কি ?

তোমরা জান,

$$V=\frac{A}{i}\{1-(1+i)^{-n}\}$$

এখানে A = 1000 টাকা

$i=\frac{7}{100}=\cdot07$

$n=8$

$$\therefore \quad V=\frac{1000}{\cdot07}\{1-(1\cdot07)^{-8}\}$$

$$=\frac{1000}{\cdot07}(1-\cdot5819)$$

$$=\frac{1000}{\cdot07}\times\cdot4181$$

মনে কর

$x=(1\cdot07)^{-8}$

$\log x=-8\log 1\cdot07$

$=-8\times\cdot0294$

$=-\cdot2352$

$=\bar{1}\cdot7648$

$\therefore \quad x=\text{antilog}\ \bar{1}\cdot7648$

$=\cdot5819.$

$$=\frac{1000\times4181}{700}=\frac{41810}{7}=5972\cdot86.$$

যেহেতু লগ্নীকৃত অর্থের বর্তমান মূলধন = 5000 টাকা এবং 1000 টাকা করিয়া 8 বৎসরের বার্ষিকীর মোট মূলধন = 5972·86 টাকা,

সুতরাং, এই লগ্নী লাভজনক।

উদাহরণ 2.

কোন এক কারখানার মালিক অনুমান করেন, যে মেশিনটি চালু আছে, 20 বৎসর পরে সেটির পরিবর্তন প্রয়োজন হইবে। বর্তমানে মেশিনটির মূল্য 60,000 টাকা। 20 বৎসর পরে বর্তমান মূল্য 25% বৃদ্ধি পাইলে, ঐ সময়ে মেশিনটির পরিবর্তনের জন্য 6% চক্র-বৃদ্ধি সুদে প্রতি বৎসর কি পরিমাণ অর্থ লগ্নী করিতে হইবে ?

20 বৎসর পরে মেশিনের জন্য মোট প্রয়োজন

$= 60{,}000$ টাকা $+$ বর্তমান মূল্যের 25%

$= 60{,}000 + 15{,}000 = 75{,}000$ টাকা

মনে কর, প্রতি বৎসর A পরিমাণ টাকা লগ্নী করিতে হইবে।

তোমরা জান,

$$M = \frac{A}{i}\{(1+i)^n - 1\}$$

এখানে $M = 75{,}000$ টাকা

$i = \cdot 06$

$n = 20 \qquad \therefore \quad 75{,}000 = \frac{A}{\cdot 06}\{(1+\cdot 06)^{20} - 1\}.$

মনে কর,

$x = (1\cdot 06)^{20}$

$\log x = 20 \log 1\cdot 06$

$= 20 \times \cdot 0253$

$= \cdot 5060$

$\therefore \quad x = \text{antilog } \cdot 5060$

$= 3\cdot 206$

অথবা $75{,}000 = \frac{A}{\cdot 06}(3\cdot 206 - 1)$

$= \frac{A}{\cdot 060} \times 2\,206$

$\therefore \quad A = \frac{75{,}000 \times 60}{2206}$

$= 2039\cdot 89$ টাকা।

প্রশ্নমালা 13

1. এক ব্যক্তি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর 150 টাকা করিয়া একটি প্রকল্পে জমা রাখে। লগ্নীকৃত অর্থের উপর সুদের হার 5%। 5 বৎসর পর মোট কত টাকা পাওয়া যাইবে ?

2. মিঃ রায় 10টি বার্ষিক কিস্তিতে সুদ-আসল ফেরৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে 4% চক্র-বৃদ্ধি সুদে 20,000 টাকা ঋণ করেন। প্রতি কিস্তির টাকার পরিমাণ কত ?

3. নগদ 5000 টাকা দিয়া প্রতি কিস্তিতে 5000 টাকা করিয়া 4টি কিস্তিতে অবশিষ্ট টাকা সুদ-সহ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে একটি wagon ক্রয় করা হয়। সুদের হার 5% হইলে নগদ মূল্য কত ?

4. এক ব্যক্তি 6% চক্র-বৃদ্ধি সুদে 20,000 টাকা ধার করেন এবং প্রতি বৎসর 5000 টাকা করিয়া পর পর 4 বৎসর ঐ টাকা সুদ-আসল-সহ ফেরৎ দিতে থাকেন। শেষ কিস্তিতে মোট কত টাকা দিতে হয় নির্ণয় কর।

5. এক ব্যক্তি 60 বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন এবং 6 মাস অন্তর প্রতি বৎসর 120 টাকা পেনসন পান। যদি অনুমান করা যায়, ঐ ব্যক্তির অবসরপ্রাপ্ত জীবন 13 বৎসর মাত্র, পেনসনের সমতুল্য বর্তমানে কত টাকা হইবে ?

6. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক মৃত্যুকালে তাঁর ছাত্র-জীবনে প্রাপ্ত স্বর্ণপদকসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়া যান। বিশ্ববিদ্যালয় পদক-সমূহের বিক্রয়লব্ধ অর্থ 10,000 টাকার সুদ হইতে প্রতি বৎসর ফলিত গণিতের একজন ছাত্রকে বৃত্তি দিতে স্থির করেন। চক্র-বৃদ্ধি সুদের হার 10% হইলে বার্ষিক বৃত্তি কত হইবে ?

7. 12 বৎসর পরে কোন একটি কোম্পানী বর্তমানে চালু একটি মেশিন পরিবর্তনের কথা ভাবিতেছে। ঐ সময় মেশিনের ক্রয়মূল্য 97,000 টাকা হইতে পারে এবং পুরাতন মেশিন বিক্রি করিয়া 2000 টাকা পাওয়া যাইবে। প্রতি বৎসর কোন প্রকল্পে 5% চক্র-বৃদ্ধি সুদে কি পরিমাণ টাকা জমা রাখিলে ঐ মেশিন ক্রয় করা যাইবে ?

সূচক-শ্রেণী (Exponential Series)

দ্বিপদ রাশিমালার বিস্তৃতি হইতে তোমরা জান,

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n=1+n\frac{x}{n}+\frac{n(n-1)}{2\,!}\left(\frac{x}{n}\right)^2+\frac{n(n-1)(n-2)}{3\,!}\left(\frac{x}{n}\right)^3+\cdots+\left(\frac{x}{n}\right)^n$$

$$=1+x+\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdot\frac{x^2}{2\,!}+\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdot\frac{x^3}{3\,!}+\cdots\quad+\left(\frac{x}{n}\right)^n$$

এখন, n যদি অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে থাকে

$\left(1-\frac{1}{n}\right)$, $\left(1-\frac{2}{n}\right)$, $\left(1-\frac{3}{n}\right)$, ... ইত্যাদি।

প্রত্যেকের মান 1 হইয়া যায়, যদি n অসীমের দিকে অগ্রসর হয়, $\frac{x}{n}$, 0-এর দিকে অগ্রসর হয়।

আবার $\frac{x}{n}=y$ ধরিলে,

এবং n অসীম পর্যন্ত চলিতে থাকিলে, $y \to 0$

$$\therefore \quad \text{বামপক্ষ}=\left(1+\frac{x}{n}\right)^n=\left\{\left(1+y\right)^{\frac{1}{y}}\right\}^x$$

কিন্তু $\underset{y\to 0}{\mathrm{Lt}}\,(1+y)^{\frac{1}{y}}=e$, একটি অমেয় সংখ্যা

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2\,!}+\frac{x^3}{3\,!}+\cdots \qquad \cdots \qquad (1)$$

$x=1$ বসাইলে,

$$e=1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots \qquad \cdots \qquad \cdots \qquad (2)$$

$x=-1$ বসাইলে,

$$e^{-1}=1-1+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots \qquad \cdots \qquad \cdots \qquad (3)$$

(2) ও (3) যোগ করিয়া,

$$\frac{1}{2}\left(e+\frac{1}{e}\right)=1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{4!}+\cdots \qquad \cdots \qquad \cdots \qquad (4)$$

আবার, (2) হইতে (3) বিয়োগ করিয়া,

$$\frac{1}{2}\left(e-\frac{1}{e}\right)=1+\frac{1}{3!}+\frac{1}{5!}+\cdots \qquad \cdots \qquad \cdots \qquad (5)$$

উদাহরণ 1.

প্রমাণ কর—

$$1+\frac{1+2}{2!}+\frac{1+2+3}{3!}+\cdots\cdots=\frac{3e}{2}.$$

প্রদত্ত শ্রেণীর (বামপক্ষের) n-তম পদ, অর্থাৎ

$$t_n=\frac{1+2+3+\cdots\cdots+n}{n!}$$

$$=\frac{n(n+1)}{2.n!}=\frac{1}{2}\cdot\frac{n+1}{(n-1)!}=\frac{1}{2}\cdot\frac{n-1+2}{(n-1)!}$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{(n-2)!}+\frac{1}{(n-1)!}$$

এখন, n-এর পরিবর্তে যথাক্রমে 1, 2, 3, ··· বসাইয়া

$$t_1=\frac{1}{1!}=1$$

$$t_2=\frac{1}{2}.1+\frac{1}{1!}$$

$$t_3=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}$$

$$t_4=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}$$

··· ··· ···

··· ···

উভয়দিকে যোগ করিয়া,

প্রদত্ত অসীম শ্রেণীর সমষ্টি $=t_1+t_2+t_3+\cdots\infty$

$$=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots\right)+\left(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots\right)$$

$$=\frac{e}{2}+e=\frac{3e}{2}=\text{ডানপক্ষ।}$$

উদাহরণ 2.

মান নির্ণয় কর—

$$1+\frac{1}{2!}+\frac{1.3}{4!}+\frac{1.3.5}{6!}+\cdots\cdots\infty$$

প্রদত্ত শ্রেণী

$$=1+\frac{1}{2!}+\frac{1.3}{4!}+\frac{1.3.5}{6!}+\cdots\cdots\cdots$$

$$=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2.4}+\frac{1}{2.4.6}+\cdots\cdots\cdots$$

$$=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2.2!}+\frac{1}{2^2.3^3!}+\cdots\cdots\cdots$$

$$=1+\frac{\frac{1}{2}}{1!}+\frac{(\frac{1}{2})^2}{2!}+\frac{(\frac{1}{2})^3}{3!}+\cdots\cdots\cdots$$

$$=e^{\frac{1}{2}}=\sqrt{e}.$$

উদাহরণ 3.

$\frac{(1-3x+x^2)}{e^x}$ বিস্তৃতিতে x^4-এর সহগ নির্ণয় কর।

$$\frac{1-3x+x^2}{e^x}=(1-3x+x^2)e^{-x}$$

$$=(1-3x+x^2)\left(1-\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots\cdots\right)$$

$$=1-4x+(1+3+\tfrac{1}{2})x^2+$$

$$+\left(-\frac{3}{2!}-\frac{1}{3!}-1\right)x^3+\left(\frac{1}{4!}+\frac{3}{3!}+\frac{1}{2!}\right)x^4+\cdot$$

সুতরাং, প্রদত্ত বিস্তৃতিতে x^4-এর সহগ

$$=\left(\frac{1}{4!}+\frac{3}{3!}+\frac{1}{2!}\right)$$

$$=\left(\frac{1}{24}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)$$

$$=\frac{25}{24}.$$

প্রশ্নমালা 14

1. মান নির্ণয় কর :

$$1+\frac{3}{\underline{|1}}+\frac{5}{\underline{|2}}+\frac{7}{\underline{|3}}+\cdots\cdots\cdots$$

2. সমষ্টি নির্ণয় কর :

$$\frac{3^2}{\underline{|1}}+\frac{4^2}{\underline{|2}}+\frac{5^2}{\underline{|3}}+\cdots\cdots\cdots$$

3. দেখাও যে,

$$\frac{2}{\underline{|1}}+\frac{4}{\underline{|3}}+\frac{6}{\underline{|5}}+\cdots\cdots\cdots=e$$

4. দেখাও যে,

$$\frac{1.2}{\underline{|1}}+\frac{2.3}{\underline{|2}}+\frac{3.4}{\underline{|3}}+\cdots\cdots\cdots=3e$$

5. দেখাও যে,

$$1+\frac{1+2}{2!}+\frac{1+2+2^2}{3!}+\frac{1+2+2^2+2^3}{4!}+\cdots\cdots\cdots=e(e-1)$$

6. $\frac{(1+x+x^2)}{e^x}$ বিস্তৃতিতে x^n-এর সহগ নির্ণয় কর।

২

॥ সম্ভাব্যতা ॥

(Probability or Chance)

ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ-লোকসান হওয়া, দ্রব্যমূল্য কমতি, বাড়তি বা স্থিতি থাকা আগাম চিন্তা করা যায়। অর্থাৎ, কোন ঘটনা ঘটার পূর্বেই কি কি হওয়া সম্ভব অনুমান করা যায়, কিন্তু সাধারণভাবে সঠিক বলা যায় না।

দ্রব্যমূল্যের কথাই ধরা যাক, বৃদ্ধিই যদি কাম্য হয়, তবে তা ঘটনার সপক্ষে আর কমতি বা স্থিতি ঘটনার বিপক্ষে ধরা হয়। দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির সম্ভাব্যতার (Probability)

$$\text{গাণিতিক সূত্র} = \frac{\text{সপক্ষের গাণিতিক সংখ্যা}}{\text{সপক্ষের ও বিপক্ষের মোট গাণিতিক সংখ্যা}}$$

$$= \frac{1}{1+2} = \frac{1}{3}.$$

কেননা, ঘটনার প্রতিটি ফলশ্রুতির সপক্ষেই হউক আর বিপক্ষেই হউক, সংখ্যামান 1.

এখন, সম্ভাব্যতার গাণিতিক সংজ্ঞা বিশ্লেষণের পূর্বে নিম্নলিখিত শব্দগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

ঘটনা (Event) **:** পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের ফলাফল।

ঘটনা দুই প্রকার—সরল এবং যৌগিক।

মনে কর, একটি মুদ্রাকে উৎক্ষেপণ করায় মস্তকপৃষ্ঠ পাতিত হইল।

আবার, দুইটি পাশাকে যুগপৎ এমনভাবে ক্ষেপণ করা হইল, যেন দুটি পাশার পৃষ্ঠদেশের সাংখ্যমানের যোগফল 9 হয়।

উপরিউক্ত ঘটনা-দুইটির প্রথমটি **সরল ঘটনা** আর দ্বিতীয় ঘটনা **যৌগিক**। কারণ, অন্য কোন বিকল্প পদ্ধতিতে মস্তকপৃষ্ঠ পাতিত করা সম্ভব নহে। কিন্তু যোগফল 9 বিভিন্ন উপায়ে ক্ষেপণ করা সম্ভব।

যেমন **:**

$$\begin{aligned} 9 &= 6+3 \\ &= 5+4 \\ &= 4+5 \\ &= 3+6 \end{aligned}$$

সম-সম্ভাব্য (Equally likely) **:** কোন ঘটনার একাধিক ফলশ্রুতি থাকিলে, যদি সবগুলির ঘটার সম্ভাবনা একই থাকে, তবে বলা হয় সম-সম্ভাব্য।

যেমন—ছয়-তল-বিশিষ্ট একটি নিখুঁত পাশাকে যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে ক্ষেপণ করা হইলে, 1 হইতে 6 পর্যন্ত চিহ্নিত যে-কোন তলই প্রদর্শিত হওয়ার সম্ভাবনা সমান।

অনিয়মিত পর্যবেক্ষণ (Random experiment)ঃ যে পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের ফলাফল সবই পূর্ব জ্ঞাত থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন্‌টি ঘটিবে বলা যায় না, এইরূপ পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণকে বলা হয় অনিয়মিত পর্যবেক্ষণ।

একটি পাশাকে স্বাভাবিকভাবে ক্ষেপণ করা হইলে 1 হইতে 6 পর্যন্ত চিহ্নিত যে-কোন তলই প্রদর্শিত হইতে পারে।

পরস্পর বহির্ভুক্তি (Mutually exclusive) **ঘটনা**ঃ একটি অন্যটির প্রতিবন্ধক নহে, এইরূপ ঘটনাসমূহকেই বলা হয় পরস্পর বহির্ভুক্তি।

ছয়-তল-বিশিষ্ট পাশাকে ক্ষেপণ করিলে, ক্ষেপণের ফলশ্রুতিসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—জোড় সংখ্যা চিহ্নিত তল এবং বিজোড় সংখ্যা চিহ্নিত তল ; ইহারা পরস্পর বহির্ভুক্তি। (1, 3, 5) অর্থাৎ বিজোড় সংখ্যা চিহ্নিত তল যখন প্রদর্শিত হইবে, তখন (2, 4, 6) অর্থাৎ জোড় সংখ্যা চিহ্নিত তল প্রদর্শিত হইবে না।

সামগ্রিক (Exhaustive) **ঘটনা**ঃ ঘটনাসমূহের ফলশ্রুতি সবই অন্তর্ভুক্ত হইলে সামগ্রিক ঘটনা বলা হয়।

অবাস্তব ঘটনা (Null event)ঃ যে ঘটনা কল্পনা করা যায়, কিন্তু বাস্তবে ঘটে না।

একটি পাশাকে ক্ষেপণ করা হইলে 9-চিহ্নিত তল প্রদর্শিত হইতে পারে—ইহা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

অবশ্যম্ভাবী ঘটনা (Certain event)ঃ যে ঘটনা অবশ্যই ঘটিবে।

দুই দলের মধ্যে ফুটবল খেলা হইলে, খেলায় ফলাফল কোন এক দলের জয় বা পরাজয় অথবা অমীমাংসিত থাকিতে পারে।

মনে কর, কোন E-ঘটনা m-সংখ্যক উপায়ে সম্পন্ন হয় এবং n-সংখ্যক উপায়ে অসম্পন্ন থাকে, কিন্তু উপায়সমূহ পরস্পর সামগ্রিক, সমসম্ভাব্য ও বহির্ভুক্তি।

E-ঘটনা সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাব্যতা (Probability) সাধারণত P(E) দ্বারা নির্দেশিত হয়।

সুতরাং, $P(E)=\frac{m}{m+n}=p$ (ধর)।

আবার, E-ঘটনা অসম্পন্ন থাকার সম্ভাব্যতা $P(\bar{E})$ দ্বারা নির্দেশিত হইলে

$$P(\bar{E})=\frac{n}{m+n}=q \text{ (ধর)।}$$

অতএব, $p+q=\frac{m}{m+n}+\frac{n}{m+n}=\frac{m+n}{m+n}=1$

অর্থাৎ, $q=1-p.$

সম্ভাব্যতার যোজ্য সূত্র (Addition Law of Probability)ঃ n-সংখ্যক পরস্পর বহির্ভুক্তি ঘটনার ($E_1, E_2, \cdots, E_n$) যে-কোন একটি ঘটনার সম্ভাব্যতা ঘটনা-সমূহের সম্ভাব্যতার যোগফলের সমান। (The probability that one of n

mutually exclusive events $[E_1, E_2, \cdots, E_n]$ will happen is the sum of the probabilities of separate events).

অর্থাৎ, $P(E_1+E_2+\cdots+E_n)$
$$=P(E_1)+P(E_2)+\cdots+P(E_n)$$

প্রমাণ ঃ মনে কর $(E_1, E_2, \cdots, E_n)$ n-সংখ্যক সামগ্রিক, পরস্পর বহির্ভূক্ত, সম-সম্ভাব্য ঘটনা মোট N-উপায়ে সংগঠিত হয়। N-সংখ্যক উপায়ের মধ্যে $m_1, m_2, \cdots, m_n$ সংখ্যক উপায় $E_1, E_2, \cdots, E_n$ ঘটনার সপক্ষে সংশ্লিষ্ট। যেহেতু ঘটনাসমূহ পরস্পর বহির্ভূক্ত, সম্পূর্ণ আলাদা, পরস্পর যুগপৎ সংগঠিত হইতে পারে না। এখন, $E_1, E_2, \cdots, E_n$ ঘটনার পক্ষে সংশ্লিষ্ট মোট সংখ্যা $(m_1+m_2+\cdots+m_n)$

সুতরাং, $P(E_1+E_2+\cdots+E_n)$
$$=\frac{m_1+m_2+\cdots+m_n}{N}$$
$$=\frac{m_1}{N}+\frac{m_2}{N}+\cdots+\frac{m_n}{N}$$
$$=P(E_1)+P(E_2)+\cdots+P(E_n)$$

যৌগিক ঘটনা ঃ দুই বা ততোধিক ঘটনা পরস্পর সংশ্লিষ্টভাবে সংগঠিত হইলে ঘটনাসমূহ যৌগিক ঘটনারূপে অভিহিত হয়।

স্বনির্ভর ঘটনা ঃ ঘটনাসমূহ সংগঠিত হওয়ার পথে একটি অন্যটির প্রতিবন্ধক না হইলে, স্বনির্ভর ঘটনারূপে অভিহিত হয়।

সম্ভাব্যতার যৌগিক সূত্র (Compound Law of Probability) ঃ

দুই বা ততোধিক ঘটনা যুগপৎ সংগঠিত হওয়ার সূত্র ঃ

$$P(E_1, E_2, \cdots, E_n)$$
$$=P(E_1)P(E_2/E_1)P\left(\frac{E_3}{E_1E_2}\right)\cdots P(E_n/E_1, E_2, \cdots, E_{n-1})$$

এখানে $P(E_1)$, E_1 ঘটনার পরম সম্ভাব্যতা ; $P(E_2/E_1)$, E_2 ঘটনার সম্ভাব্যতা E_1 ঘটনা সংগঠিত হওয়ার সর্তে। $P(E_3/E_1E_2)$, E_3 ঘটনার সম্ভাব্যতা, E_1 এবং E_2 ঘটনা যুগপৎ সংগঠিত হওয়ার সর্তে এবং অনুরূপে অবশিষ্ট ঘটনাসমূহ সংগঠিত হয়।

কিন্তু ঘটনাসমূহ পরস্পর স্বনির্ভর হইলে,

$$P(E_2/E_1)=P(E_2)$$
$$P(E_3/E_1E_2)=P(E_3)$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$P(E_n/E_2, \cdots, E_{n-1})=P(E_n)$$

অতএব $P(E_1, E_2, \cdots, E_n)$
$$=P(E_1)P(E_2)P(E_3)\cdots P(E_n).$$

অনুসিদ্ধান্ত : মনে কর, E_1 এবং E_2 ঘটনাদ্বয় যথাক্রমে m_1 এবং m_2 উপায়ে সম্পন্ন হয় এবং n_1 এবং n_2 উপায়ে অসম্পন্ন থাকে।

সম্ভাব্যতার গাণিতিক সূত্র অনুসারে,

(i) $P(E_1)=\dfrac{m_1}{m_1+n_1}=p_1$ (ধর)

(ii) $P(E_2)=\dfrac{m_2}{m_2+n_2}=p_2$ (ধর)

সুতরাং (iii) $P(\overline{E_1})=\dfrac{n_1}{m_1+n_1}=q_1$ (ধর)

$=1-p_1.$

(iv) $P(\overline{E_2})=\dfrac{n_2}{m_2+n_2}=q_2$ (ধর)

$=1-p_2.$

E_1 এবং E_2 পরস্পর স্বনির্ভর হইলে

(v) $P(E_1E_2)=P(E_1)P(E_2)=p_1p_2$

(vi) $P(E_1\overline{E_2})=P(E_1)P(\overline{E_2})=p_1(1-p_2)$

(vii) $P(\overline{E_1}\ E_2)=P(\overline{E_1})P(E_2)=(1-p_1)p_2$

(viii) $P(\overline{E_1}\ \overline{E_2})=P(\overline{E_1})P_2(\overline{E_2})$

$=(1-p_1)(1-p_2).$

যদি $E_1, E_2, \cdots \cdots, E_n$ সংখ্যক ঘটনা অন্তত একবার সংগঠিত হয়, অর্থাৎ সব ঘটনা যুগপৎ অসম্পন্ন থাকিবে না।

তোমরা জান, $E_1, E_2, \cdots\cdots, E_n$ ঘটনার যুগপৎ অসম্পন্ন থাকার সম্ভাব্যতা

$P(\overline{E_1}, \overline{E_2}, \cdots, \overline{E_n})=P(\overline{E_1})\ P(\overline{E_2})\cdots\cdots P(\overline{E_n})$

$=(1-p_1)(1-p_2)\ \cdots \quad \cdots \quad (1-p_n).$

সুতরাং, ঘটনাসমূহের অন্তত একবার সম্পন্ন হওয়ায় সম্ভাব্যতা

$=1-P(\overline{E_1}, \overline{E_2}, \cdots\cdots, \overline{E_n}).$

উদাহরণ 1.

একটি থলিতে 7টি সাদা এবং 5টি লাল বল আছে। 1টি বল থলি হইতে বাহির করা হইল। বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাব্যতা কত ?

মনে কর, W সাদা বল হওয়ার ঘটনা। W সংগঠিত হইতে পারে মোট 7 উপায়ে। সাদা লাল ভেদাভেদ না করিয়া যে-কোন একটি বল টানিয়া বাহির করা যায়, মোট (7+5) উপায়ে।

সুতরাং $P(W) = \dfrac{\text{ঘটনার পক্ষে মোট সংখ্যা}}{\text{মোট সম্ভাব্য সংখ্যা}}$

$$= \frac{7}{7+5} = \frac{7}{12}.$$

উদাহরণ 2.

একটি বাক্সে 7টি লাল, 6টি সাদা এবং 4টি সবুজ বল আছে। বাক্স হইতে যুগপৎ 2টি বল লওয়া হইল। 2টি বলই লাল হওয়ার সম্ভাব্যতা কত ? 1টি সাদা এবং একটি লাল হওয়ার সম্ভাব্যতাই বা কত ?

মোট বলের সংখ্যা $= 7+6+4 = 17$

যে-কোন দুইটি বল যুগপৎ লওয়া যায়, মোট ${}^{17}C_2$ উপায়ে।

(i) মোট সাদা বলের সংখ্যা $= 6$

2টি সাদা বল, 6টি হইতে একত্রে লওয়া যায় মোট ${}^{6}C_2$ উপায়ে।

মনে কর, W_2—দুইটি সাদা বল একত্রে লওয়ার ঘটনা।

$\therefore \quad P(W_2) = \dfrac{\text{ঘটনার পক্ষে মোট উপায়}}{\text{যে-কোন দুইটি বল লওয়ার মোট সম্ভাব্য সংখ্যা}}$

$$= \frac{{}^{5}C_2}{{}^{17}C_2} = \frac{15}{136}.$$

(ii) 7টি লাল বল হইতে 1টি বল লওয়া যায়, মোট ${}^{7}C_1$ উপায়ে

এবং 6টি সাদা বল হইতে 1টি বল লওয়া যায়, মোট ${}^{6}C_1$ উপায়ে।

এখন, 7টি লাল বল হইতে 1টি এবং 6টি সাদা বল হইতে 1টি একত্রে লওয়া যায়, মোট ${}^{7}C_1 \times {}^{6}C_1$ উপায়ে।

মনে কর, C—দুইটির মধ্যে একটি লাল এবং একটি সাদা বল লওয়ার ঘটনা।

$\therefore \quad P(C) = \dfrac{\text{ঘটনার পক্ষে মোট সম্ভাব্য সংখ্যা}}{\text{যে-কোন দুইটি বল লওয়ার মোট সম্ভাব্য সংখ্যা}}$

$$= \frac{{}^{7}C_1 \times {}^{6}C_1}{{}^{17}C_2} = \frac{7 \times 6}{17 \times 8} = \frac{21}{68}.$$

উদাহরণ 3.

52টি তাস হইতে 2টি কার্ড লওয়া হইল। 2টি তাসই টেক্কা (aces) হওয়ার সম্ভাব্যতা কত নির্ণয় কর।

52টি তাস হইতে যে-কোন দুইটি একত্রে লওয়া যায়, মোট ${}^{52}C_2$ উপায়ে; কিন্তু 4 রকমের 52টি তাসের মধ্যে মোট টেক্কা আছে 4টি।

4টি টেক্কা হইতে দুইটি লওয়া যায়, মোট ${}^{4}C_2$ উপায়ে।

মনে কর, T—দুইটি তাস একযোগে টেক্কা হওয়ার ঘটনা।

$\therefore \quad P(T) = \dfrac{\text{দুইটি তাসই টেক্কা হওয়ার মোট সম্ভাব্য সংখ্যা}}{\text{যে-কোন দুইটি লওয়ার মোট সম্ভাব্য সংখ্যা}}$

$$=\frac{^4C_2}{^{52}C_2}=\frac{6}{26\times51}=\frac{1}{13\times17}=\frac{1}{221}.$$

উদাহরণ 4.

একটি পাশাকে ক্ষেপণ করা হইলে 5 বা 6 প্রদর্শিত হওয়ার সম্ভাব্যতা নির্ণয় কর।

মনে কর, A এবং B যথাক্রমে 5 ও 6 প্রদর্শিত হওয়ার ঘটনা।

একটি পাশা মোট $^6C_1$ উপায়ে প্রদর্শিত হইতে পারে।

5 এবং 6—উভয়ই ঘটে মাত্র একবার।

$\therefore\quad P(A)=\frac{1}{6}$ এবং $P(B)=\frac{1}{6}.$

কিন্তু A এবং B পরস্পর বহির্ভুক্ত ঘটনা।

$$\therefore\quad P(A+B)=P(A)+P(B)$$
$$=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{1}{3}.$$

উদাহরণ 5.

একটি থলিতে মোট 3টি সাদা এবং 5টি লাল বল আছে। থলি হইতে 1টি বল লইয়া বলটি থলিতে না রাখিয়া আর-একটি বল লওয়া হইল। 2টি সাদা হওয়ার সম্ভাব্যতা কত ?

প্রথম বলটি লওয়ার পূর্বে থলিতে মোট বল ছিল (3+5) বা 8টি। যে-কোন একটি বল মোট 8টি বল হইতে লওয়া যায় $^8C_1$ উপায়ে, কিন্তু 8টি বলের মধ্যে 3টি মাত্র সাদা বল এবং 3টি সাদা বল হইতে 1টি লওয়া যায় $^3C_1$ উপায়ে।

প্রথম বলটি লওয়ার পর থলিতে মোট বল ছিল 7টি, কিন্তু প্রথম বলটি সাদা হইলে থলিতে মোট সাদা বলের সংখ্যা 2 ; মোট 7টি বল হইতে 1টি বলা লওয়া যায় $^7C_1$ উপায়ে এবং 2টি সাদা বল হইতে 1টি লওয়া যায় $^2C_1$ উপায়ে।

মনে কর, A এবং B যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বলটি সাদা হওয়ার ঘটনা।

সুতরাং, $P(A)=\frac{^3C_1}{^8C_1}=\frac{3}{8}$

এবং $P=\left(\frac{B}{A}\right)=\frac{^2C_1}{^7C_1}=\frac{2}{7}$

$\frac{B}{A}$, প্রথম বলটি সাদা হওয়া সাপেক্ষে দ্বিতীয় বলটি সাদা হওয়ার ঘটনা।

$$\therefore\quad P(AB)=P(B\,.\;P\left(\frac{B}{A}\right)$$
$$=\frac{3}{8}\times\frac{2}{7}=\frac{3}{28}.$$

উদাহরণ 6.

একটি থলিতে 3টি সাদা বল এবং 5টি লাল বল আছে। 1টি বল থলি হইতে

লইয়া বলটি আবার থলিতে রাখা হইল। তারপর আর-একটি বল থলি হইতে লওয়া হইল। প্রতিবারই সাদা বল হওয়ার সম্ভাব্যতা নির্ণয় কর।

প্রথমবার 1টি বল লইয়া বলটি থলিতে আবার রাখায়, দ্বিতীয় বলটি সাদা বল হওয়ার সম্ভাব্যতা এবং প্রথম বলটি সাদা বল হওয়ার সম্ভাব্যতা একই থাকিবে।

মনে কর, A এবং B যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বল—উভয়ই সাদা হওয়ার ঘটনা এবং A ও B পরস্পর স্বনির্ভর।

সুতরাং, $P(A)=\frac{^3C_1}{^5C_1}=\frac{3}{5}$, $P(B)=\frac{^3C_1}{^5C_1}=\frac{3}{5}$

এবং $P(AB)=P(A).P(B) \quad =\frac{3}{5}\times\frac{3}{5}=\frac{9}{25}$.

প্রদর্শন (Trial) : কোন পর্যবেক্ষণে ঘটনা উৎপন্নের প্রচেষ্টা।

পুনঃ প্রদর্শন (Repeated Trial) : বার বার কোন পর্যবেক্ষণ ঘটানো হইলে পুনঃ প্রদর্শন বলা হয়।

Expectation : পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণে কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আশাপ্রদ মান ; অর্থাৎ গড় মান।

মনে কর, কোন চল X যথাক্রমে $x_1, x_2, \ldots, x_n$ মান পরিগ্রহ করিল এবং ঐ চলের উক্ত মানসমূহ পরিগ্রহ করার সম্ভাব্যতা যথাক্রমে $p_1, p_2, \cdots, p_n$. X-চলের আশাপ্রদ বা গড় মান E(X) দ্বারা নির্দেশিত হইলে,

$$E(X)=x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_np_n=\sum_{i=1}^{n} x_ip_i$$

অর্থাৎ, চলমান ও অনুরূপ সম্ভাব্যতা $i=1$ সমূহের গুণফলের যোগফল।

উদাহরণ 7.

মনে কর, একটি পাশাকে স্বাভাবিকভাবে ক্ষেপণ করা হইল। এক্ষেত্রে যে-কোন পৃষ্ঠতলের সম্ভাব্যতা (সম-সম্ভাব্য বলিয়া) $=\frac{1}{6}=p_2=p_2\cdots \;=p_n$

এবং $x_1=1, x_2=2, x_3=3, x_4=4, x_5=5, x_6=6.$

সুতরাং, $E(X)=1.\frac{1}{6}+2.\frac{1}{6}+\cdots+6.\frac{1}{6}=\frac{1}{6}\cdot\frac{6(6+1)}{2}=\frac{7}{2}.$

প্রশ্নমালা 15

1. একটি মুদ্রা উৎক্ষেপণ করা হইলে Tail হওয়ার সম্ভাব্যতা কত ? Head বা Tail কোন পৃষ্ঠদেশ পাতিত না হওয়ার সম্ভাব্যতা কত ?

2. একটি থলিতে 5টি সাদা, 8টি কালো এবং 5টি লাল বল আছে। একটি বল তোলা হইল। বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাব্যতা কত ? বলটি লাল হওয়ার সম্ভাব্যতা কত ?

3. একটি থলিতে 9টি সাদা এবং 10টি কালো বল আছে। থলি হইতে 3টি বল একত্রে লওয়া হইল। তিনটি বলই কালো হওয়ার সম্ভাব্যতা কত ? অন্ততঃ একটি বল কালো হওয়ার সম্ভাব্যতা কত ?

4. 20টি টিকিট 1 হইতে 20 পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা দিয়া চিহ্নিত করিয়া অনিয়মিতভাবে রাখা হইল। তারপর 2টি টিকিট একসঙ্গে তোলা হইল। 2টি টিকিটই বিজোড়-সংখ্যার হওয়ার সম্ভাব্যতা কত ? 1টি টিকিট জোড় সংখ্যার এবং 1টি টিকিট বিজোড় সংখ্যার হওয়ার সম্ভাব্যতা কত ?

5. 3টি পাশা (dice) একত্রে ক্ষেপণ করা হইল। তিনটি পাশার একই রকম তল পাতিত হওয়ার সম্ভাব্যতা কত ? তিনটি তলই বিভিন্ন রকমের হওয়ার সম্ভাব্যতা কত ?

6. দুইটি পাশা একত্রে ক্ষেপণ করা হইলে সংখ্যা-তলের ক্রমিক সংখ্যার যোগফল 8 অথবা 9 হওয়ার সম্ভাব্যতা কত ?

7. 2, 4, 5, 7, 8, 9 সংখ্যাগুলি হইতে 3 অঙ্কের সংখ্যা গঠন করা হইলে, 700-এর অধিক সংখ্যা গঠন করার সম্ভাব্যতা কত ?

8. গণিতের প্রশ্নপত্রে A-পরীক্ষার্থী 70% প্রশ্ন সমাধান করিতে পারে এবং B-পরীক্ষার্থী 75% প্রশ্ন সমাধান করিতে পারে। A অথবা B পরীক্ষার্থীর একটি প্রশ্নের সমাধান করার সম্ভাব্যতা কত ?

9. দুইটি মুদ্রা একযোগে পর পর 5 বার ক্ষেপণ করা হইল। 5টি Tails এবং 5টি Head পাতিত হওয়ার সম্ভাব্যতা কত ?

10. ব্যবসাতে লাভ, লোকসান বা কিছুই না হওয়ার সম্ভাবনা আছে। একজন ব্যবসায়ী 5000 টাকা মূলধন নিয়োগ করিল। ব্যবসায়ীর অনুমান, যদি লাভ হয় 1000 টাকা মূলধন বাড়িবে, আর লোকসান হইলে 500 টাকা মূলধন কমিবে। ব্যবসাতে আশাপ্রদ (Expected) মূলধন কত হইবে ?

॥ স্থানাঙ্ক জ্যামিতি ॥

(Elements of Co-ordinate Geometry)

সমতলে নির্দিষ্ট দিকে চলমান বিন্দুর গতিপথকে বলে সরলরেখা। যদি ঐ সরলরেখাকে অসংখ্য সমান অংশে ভাগ করা যায়, তবে প্রত্যেকটি অংশই এক-একটি বিন্দুর সমতুল্য। অর্থাৎ, এইরূপ বিন্দু-সমষ্টি হইতেই সরলরেখার উৎপত্তি। তলের উপর বিন্দুর অবস্থান নির্দিষ্ট হয় দুইটি অসমান্তরাল রেখা ও পরস্পরের ছেদবিন্দুর পরিপ্রেক্ষিতে। ছেদবিন্দুকে বলে মূল বিন্দু আর রেখাদ্বয়কে বলে X-অক্ষরেখা এবং Y-অক্ষরেখা। অক্ষরেখাদ্বয় পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করিলে কর্তিত অক্ষরেখা রূপে অভিহিত হয়।

মনে কর, XOX′ ও YOY′ সরলরেখাদ্বয় পরস্পর O বিন্দুতে লম্বভাবে ছেদ করিয়া কোন সমতলকে চারিটি চতুর্থাংশ (quadrant)—XOY, YOX′, X′OY′ Y′OX-এ বিভক্ত করিল।
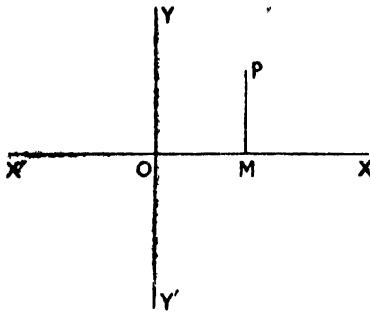
(P) ঐ তলের উপর যে-কোন একটি বিন্দু P হইতে X-অক্ষরেখার উপর PM লম্ব অঙ্কিত হইল। OM এবং MP যথাক্রমে x এবং y দ্বারা নির্দেশিত হওয়ায় (x, y)-কে বলে বিন্দুর স্থানাঙ্ক। প্রথম চতুর্থাংশে x এবং y—উভয়ই ধনাত্মক, দ্বিতীয় চতুর্থাংশে x—ঋণাত্মক ও y—ধনাত্মক, তৃতীয় চতুর্থাংশে x ও y—উভয়ই ঋণাত্মক এবং চতুর্থ চতুর্থাংশে x—ধনাত্মক এবং y—ঋণাত্মক। মূল বিন্দুতে x এবং y—উভয়ই O হওয়ায় মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক (0, 0)। উপরিউক্ত আলোচনা হইতে x এবং y-এর চিহ্ন ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আলাদাভাবে জানা থাকিলে, তলের উপর বিন্দুর অবস্থাপন কোন্ চতুর্থাংশে সঠিক জানা যায়।

প্রদত্ত সরলরেখার সমীকরণ হইতে সরলরেখা গঠন কর।

মনে কর, সরলরেখার সমীকরণ $Ax+By+C=0$

সুতরাং, $y=-\frac{A}{B}x-\frac{C}{B}$ ... (1)

(1)-হইতে স্পষ্টতঃ x স্বনির্ভর চল।

মনে কর, $x_1, x_2, x_3, \cdots$ x-চলের মান। এই মানগুলি x-এর পরিবর্তে বসাইয়া (1)-হইতে প্রাপ্ত y-এর মানগুলি যথাক্রমে $y_1, y_2, y_3, \cdots$ ছক-কাগজে নির্দিষ্ট একক

ধরিয়া (x_1, y_1) ; (x_2, y_2) ; (x_3, y_3) ···বিন্দুগুলি সংস্থাপন করিয়া সংযোজক বিন্দুগুলি সংযুক্ত কর। বিন্দুগুলির সংযোজক রেখাই নির্ণেয় সরলরেখা।

রেখাংশের দৈর্ঘ্য (Length of Segments) :

মনে কর, $P(x_1, y_1)$ এবং $Q(x_2, y_2)$ AB-সরলরেখার উপর দুইটি প্রদত্ত বিন্দু। PQ রেখাংশের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করিতে হইবে।

P ও Q হইতে OX-অক্ষরেখার উপর যথাক্রমে PL ও QM এবং P হইতে QM রেখার উপর PN লম্ব অঙ্কিত হইল। যেহেতু QNP একটি সমকোণী ত্রিভুজ

$$PQ^2 = PN^2 + QN^2$$

চিত্র হইতে স্পষ্টতঃ $PN = LM = OM - OL = x_2 - x_1$

এবং $QN = MQ - MN = MQ - LP = y_2 - y_1$

$$\therefore \quad PQ = \sqrt{PN^2 + NQ^2}$$
$$= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

অনুসিদ্ধান্ত :

মূল বিন্দু হইতে P-বিন্দুর দূরত্ব নির্ণয় করিতে হইলে Q-বিন্দুকে মূল বিন্দু মনে করিতে হইবে, অর্থাৎ $x_2 = 0$, $y_2 = 0$, যদি Q_2 বিন্দু O-বিন্দুতে স্থানান্তরিত হয়।

সুতরাং $OP = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$

নির্দিষ্ট অনুপাতে সসীম রেখাংশের ছেদ :

মনে কর, P এবং Q সসীম রেখাংশের প্রান্তবিন্দু এবং ঐ রেখাদ্বয়ের স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (x_1, y_1) এবং (x_2, y_2)। $R(x, y)$, PQ-রেখার উপর একটি বিন্দু। নিম্নে প্রথম চিত্রে R, PQ-রেখার অন্তর্দ্বিখণ্ডক এবং দ্বিতীয় চিত্রে বহির্দ্বিখণ্ডক।
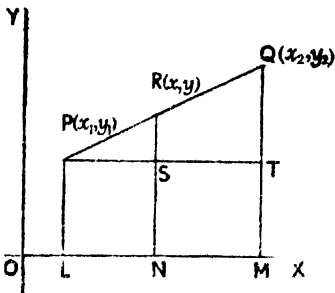
প্রথম চিত্র　　　　দ্বিতীয় চিত্র

অর্থাৎ $\frac{PR}{RQ} = \frac{m}{n}$.

$$\frac{m}{n}=\frac{PR}{RQ}=\frac{PS}{ST} \quad (\because \quad RS \parallel QT)$$

$$=\frac{LN}{NM}=\frac{ON-OL}{OM-ON}$$

$$=\frac{x-x_1}{x_2-x}$$

$$x=\frac{mx_2+nx_1}{m+n}.$$

আবার,

$$\frac{m+n}{m}=\frac{QT}{RS}=\frac{QM-TM}{RN-SN}$$

$$=\frac{QM-PL}{RN-PL}$$

$$=\frac{y_2-y_1}{y-y_1}$$

$$\therefore \quad y=\frac{my_2+ny_1}{m+n}$$

$$\frac{m}{n}=\frac{PR}{RQ}=\frac{PS}{TS}$$

$$=\frac{LN}{MN}=\frac{ON-OL}{ON-OM}$$

$$=\frac{x-x_1}{x-x_2}$$

$$\therefore \quad x=\frac{mx_2-nx_1}{m-n}$$

আবার,

$$\frac{m-n}{m}=\frac{QT}{RS}$$

$$=\frac{QM-TM}{RN-SN}$$

$$=\frac{QM-PL}{RN-PL}$$

$$=\frac{y_2-y_1}{y-y_1}$$

$$\therefore \quad y=\frac{my_2-ny_1}{m-n}$$

অনুসিদ্ধান্ত :

উপরের প্রথম চিত্রে যদি $\frac{m}{n}=1$

অর্থাৎ R, PQ-এর মধ্যবিন্দু

$$x=\tfrac{1}{2}(x_1+x_2)$$
$$y=\tfrac{1}{2}(y_1+y_2).$$

উদাহরণ 1.

(3, −7) এবং (−3, 5) বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় কর।

মনে কর, (3, −7) এবং (−3, 5) যথাক্রমে P এবং Q বিন্দুর স্থানাঙ্ক।

$\therefore$ PQ দৈর্ঘ্য $=\sqrt{(-3-3)^2+(5+7)^2}=\sqrt{36+144}=6\sqrt{5}.$

উদাহরণ 2.

(5, −3) এবং (3, −5) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখা অন্তঃস্থ কোন বিন্দুতে 3 : 5 অনুপাতে বিভক্ত। ঐ বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

মনে কর, (x, y)-বিন্দুতে প্রদত্ত বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখা 3 : 5 অনুপাতে বিভক্ত।

$$\left.\begin{array}{l} x_1=5 \\ y_1=-3 \end{array}\right\}, \quad \left.\begin{array}{l} x_2=3 \\ y_2=-5 \end{array}\right\}$$ এবং $m : n=3 : 5$ ধরিলে,

$$x=\frac{mx_2+nx_1}{m+n}=\frac{3.3+5.5}{3+5}=4\tfrac{1}{4}$$

$$y=\frac{my_2+ny_1}{m+n}=\frac{3.(-5)+5.(-3)}{3+5}=-3\tfrac{3}{4}.$$

উদাহরণ 3.

কোন ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (x_1, y_1), (x_2, y_2) এবং (x_3, y_3) ; ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

মনে কর, (x_1, y_1), (x_2, y_2) এবং (x_3, y_3) ABC ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু A, B এবং C এর স্থানাঙ্ক।

D, E এবং F যথাক্রমে BC, CA এবং AB-এর মধ্যবিন্দু। সুতরাং, D-বিন্দুর স্থানাঙ্ক $\left(\frac{x_2+x_3}{2}, \frac{y_2+y_3}{2}\right)$
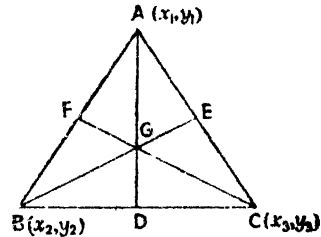
AD রেখা যদি G বিন্দুতে 2 : 1 অনুপাতে বিভক্ত হয়, G বিন্দুর স্থানাঙ্ক

$$\frac{2\times\frac{x_2+x_3}{2}+1\times x_1}{2+1}=\frac{x_1+x_2+x_3}{3}$$

এবং $$\frac{2\times\frac{y_2+y_3}{2}+1\times y_1}{2+1}=\frac{y_1+y_2+y_3}{3}.$$

অনুরূপে BE অন্তঃস্থ কোন বিন্দুতে 2 : 1 অনুপাতে বিভক্ত হইলে, ঐ বিন্দুর স্থানাঙ্ক একই হইবে। অর্থাৎ G বিন্দুতেই BE রেখা 2 : 1 অনুপাতে বিভক্ত হইবে। CF ও G বিন্দুতে 2 : 1 অনুপাতে বিভক্ত হইবে।

সুতরাং G, ABC ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র এবং ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক

$$\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \quad \frac{y_1+y_2+y_3}{3}$$

I. **নতি অন্তর্খণ্ড আকার বিশিষ্ট সরলরেখার সমীকরণ** (Straight line ; slope intercept form)।

মনে কর, AB-সরলরেখা X-অক্ষরেখার সহিত θ নতিকোণে Y-অক্ষরেখা হইতে OL$=c$ (ধর) অন্তর্খণ্ড ছেদ করিল।

AB-সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করিতে হইবে।

AB-রেখার উপর যে-কোন P-বিন্দুর স্থানাঙ্ক (x', y') ধরা হইল। P হইতে X-অক্ষরেখার উপর PM লম্ব অঙ্কিত হইল। LN ∥ X-অক্ষরেখা PM-কে N বিন্দুতে ছেদ করিল। ∴ $\angle PLN = \theta$
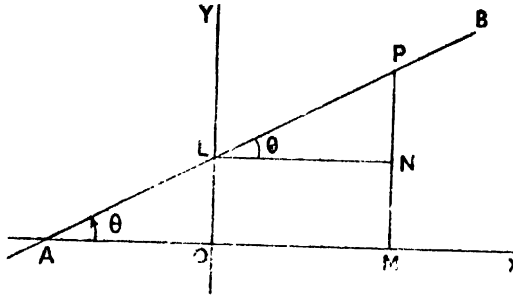
PLN ত্রিভুজে $\tan\theta = \frac{PN}{LN} = \frac{PM - NM}{OM} = \frac{y' - c}{x'}$

অর্থাৎ $y' = x' \tan\theta + c$

যদি $\tan\theta = m$ ধরা হয়, P-বিন্দুর সঞ্চারপথ $y = mx + c$.

অনুসিদ্ধান্ত :

সরলরেখা যদি মূল বিন্দুগামী হয় $LO = c = 0$

∴ মূল বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ $y = mx$.

II. X-অক্ষরেখার সহিত θ নতিকোণে কোন নির্দিষ্ট বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ (Equation of a straight line inclined at an angle θ with positive direction of X-axis and passing through a given point)।

মনে কর, প্রদত্ত বিন্দু $P(x_1, y_1)$-গামী AB-সরলরেখা X-অক্ষরেখার সহিত θ নতিকোণে অবস্থিত।
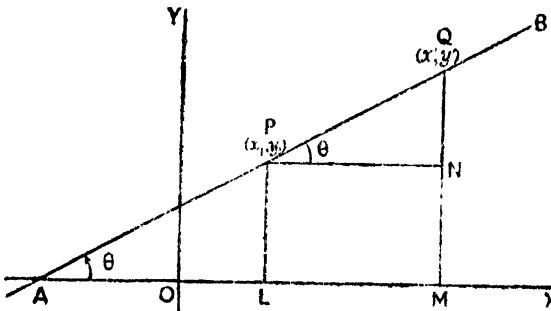
AB-রেখার উপর যে-কোন Q-বিন্দুর স্থানাঙ্ক (x', y') P এবং Q হইতে OX-রেখার উপর PL এবং QM লম্ব অঙ্কিত হইল। PN ∥ OX, QM-কে N-বিন্দুতে ছেদ করিল।

অঙ্কনানুসারে $\angle QPN=\theta$

QPN ত্রিভুজে $\tan\theta=\dfrac{QN}{PN}=\dfrac{QM-NM}{LM}=\dfrac{QM-PL}{OM-OL}=\dfrac{y'-y_1}{x-x_1}$.

এখন $\tan\theta=m$ ধরিলে Q বিন্দুর সঞ্চারপথ $y-y_1=m(x-x_1)$ অথবা $\dfrac{y-y_1}{\sin\theta}=\dfrac{x-x_1}{\cos\theta}$.

III. **দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ** (Straight line passing through two given points)।

মনে কর, প্রদত্ত বিন্দু P (x_1, y_1) এবং Q (x_2, y_2)-গামী AB-সরলরেখার উপর যে-কোন R-বিন্দুর স্থানাঙ্ক (x', y')।

মনে কর, AB-রেখা X-অক্ষরেখার সহিত θ নতিকোণ আছে।

P, Q এবং R হইতে X-অক্ষরেখার উপর PL, QM এবং RN লম্ব অঙ্কিত হইল। PT এবং RV ∥ X-অক্ষরেখা RN এবং QM-কে S, T এবং V বিন্দুতে (পরপৃষ্ঠার প্রথম চিত্র দেখ) ছেদ করিল।

সুতরাং $\angle QPT=\angle QRV$

$$\text{QPT ত্রিভুজে } \tan\theta=\frac{QT}{PT}=\frac{QM-TM}{LM}=\frac{QM-PL}{OM-OL}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1} \quad (1)$$
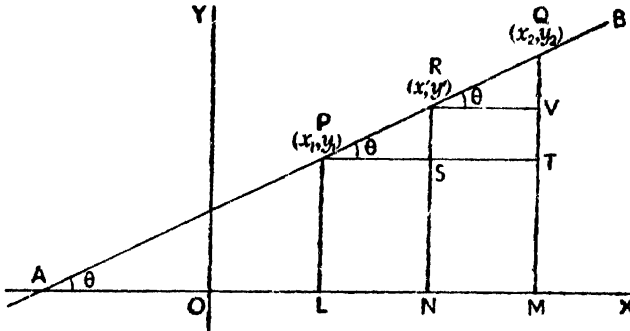
আবার RPS ত্রিভুজে

$$\tan\theta=\frac{RS}{PS}=\frac{RN-NS}{LN}=\frac{RN-PL}{ON-OL}=\frac{y'-y_1}{x'-x_1} \quad \cdots \quad (2)$$

(1) এবং (2) হইতে, $\dfrac{y'-y_1}{x'-x_1}=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$

$$\text{সুতরাং, R-বিন্দুর সঞ্চারপথ } y-y_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}\left(x-x_1\right) \quad \cdots \quad (3)$$

IV. **অন্তর্খণ্ড বিশিষ্ট সরলরেখার সমীকরণ** (Equation to a straight line in the intercept form)।

মনে কর, AB-সরলরেখা X-অক্ষরেখা ও Y-অক্ষরেখা হইতে যথাক্রমে $OP=a$ এবং $OQ=b$ ধনাত্মক অন্তর্খণ্ড ছেদ করিল। AB-সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করিতে হইবে।

AB-সরলরেখার উপর যে-কোন R-বিন্দুর স্থানাংক (x', y')। R-বিন্দু হইতে X-অক্ষরেখা এবং Y-অক্ষরেখার উপর যথাক্রমে RL এবং RM লম্ব অংকিত হইল। OR-রেখা POQ ত্রিভুজকে দুই ভাগে বিভক্ত করিল। চিত্রানুযায়ী,
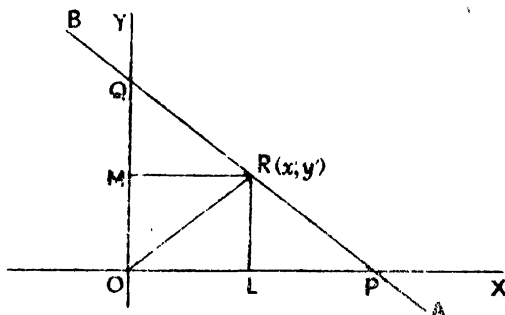
$$\Delta POQ = \Delta POR + \Delta ROQ$$
$$\tfrac{1}{2}OP \times OQ = \tfrac{1}{2}OP.RL + \tfrac{1}{2}OQ.MR$$

অর্থাৎ, $\tfrac{1}{2}a.b = \tfrac{1}{2}ay' + \tfrac{1}{2}bx'$

অথবা, $\dfrac{x'}{a} + \dfrac{y'}{b} = 1$

$\therefore$ R-বিন্দুর সঞ্চারপথ $\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} = 1.$

আলোচিত বিভিন্ন আকার বিশিষ্ট সরলরেখার সমীকরণগুলির প্রত্যেকটিই x ও y এর একঘাত সমীকরণ। এই সমীকরণগুলি সাধারণভাবে লেখা যায় $Ax + By + C = 0.$ উপরিউক্ত সমীকরণগুলি এই সমীকরণ হইতে পাওয়া যাইবে। যেমন—

(i) $y = -\dfrac{A}{B}x - \dfrac{C}{B}$ (ii) $y - 0 = \dfrac{-A}{B}\left(x + \dfrac{C}{A}\right)$

(iii) $\dfrac{y-0}{-C/B} = \dfrac{x + C/A}{C/A}$ (iv) $\dfrac{x}{-C/A} + \dfrac{y}{-C/B} = 1$

যেহেতু A, B এবং C ধনাত্মক ধ্রুবক, সমীকরণগুলির লেখচিত্র নিম্নরূপ হইবে ঃ
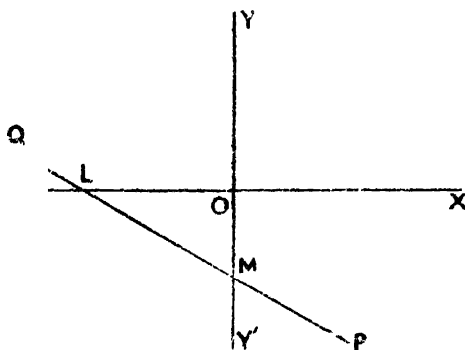
দুইটি সরলরেখার ছেদবিন্দু (Point of intersection of two straight lines) :
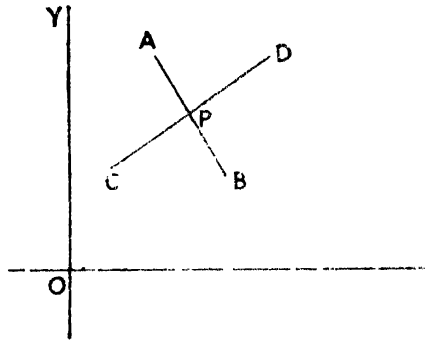
মনে কর, $a_1x+b_1y+c_1=0 \cdots (1)$ এবং $a_2x+b_2y+c_2=0 \cdots (2)$ AB এবং CD সরলরেখার সমীকরণ। P, AB এবং CD সরলরেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু। উভয় সমীকরণই P-বিন্দুর স্থানাঙ্ক (x, y) দ্বারা সিদ্ধ।

বজ্রগুণন-প্রক্রিয়ায় সহ-সমীকরণদ্বয় সমাধান করিয়া,

$$\frac{x}{b_1c_2-b_2c_1}=\frac{y}{c_1a_2-c_2a_1}=\frac{1}{a_1b_2-a_2b_1}$$

$$\therefore\ x=\frac{b_1c_2-b_2c_1}{a_1b_2-a_2b_1} \qquad y=\frac{c_1a_2-c_2a_1}{a_1b_2-a_2b_1}$$

উদাহরণ 4.

x-অক্ষরেখার সহিত 60° নতিকোণে (3, −2) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

x-অক্ষরেখার সহিত θ° নতিকোণ (x_1, y_1) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ—

$$y-y_1=m(x-x_1) \text{ এবং } m=\tan\theta$$

কিন্তু $x_1=3,\ y_1=-2$ এবং $m=\tan\theta=\tan 60°=\sqrt{3}$

সুতরাং নির্ণেয় সমীকরণ—

$$y+2=\sqrt{3}(x-3).$$

উদাহরণ 5.

x-অক্ষরেখার সহিত 30° নতিকোণ কোন সরলরেখা y-অক্ষরেখা হইতে 7 অংশ ছেদ করিল। সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

মনে কর, সরলরেখার সমীকরণ

$y=mx+c$, কিন্তু $m=\tan 30°=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ এবং $c=-7$

সুতরাং, নির্ণেয় সমীকরণ—

$$y=\frac{x}{\sqrt{3}}-7.$$

উদাহরণ 6.

(1, 2) এবং (2, 1) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখা X-অক্ষরেখা এবং Y-অক্ষরেখাকে যথাক্রমে A এবং B বিন্দুতে ছেদ করিল। দেখাও যে, $AB = 3\sqrt{2}$

তোমরা জান, (x_1, y_1) এবং (x_2, y_2) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ—

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

সুতরাং, নির্ণেয় সরলরেখার সমীকরণ—

$$\frac{y-2}{1-2} = \frac{x-1}{2-1}$$

অর্থাৎ, $x + y = 3$

A বিন্দুতে $y = 0$

সুতরাং, $x = 3.$

এবং B বিন্দুতে $x = 0$

সুতরাং, $y = 3.$

অতএব, AB-দৈর্ঘ্য $= \sqrt{(0-3)^2 + (3-0)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$

উদাহরণ 7.

(4, 3) বিন্দুগামী সরলরেখা হইতে অক্ষরেখাদ্বয়কে যে-অংশ ছেদ করে, সেই ছেদাংশ ঐ বিন্দুতে দ্বিখণ্ডিত হইলে সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

অন্তর্খণ্ড বিশিষ্ট সরলরেখার সমীকরণ $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ ... (1)

এই সরলরেখা X-অক্ষরেখা এবং Y-অক্ষরেখাকে যথাক্রমে $(a, 0)$ এবং $(0, b)$ বিন্দুতে ছেদ করে।

প্রশ্নানুসারে P (4, 3) AB-সরলরেখার মধ্যবিন্দু,
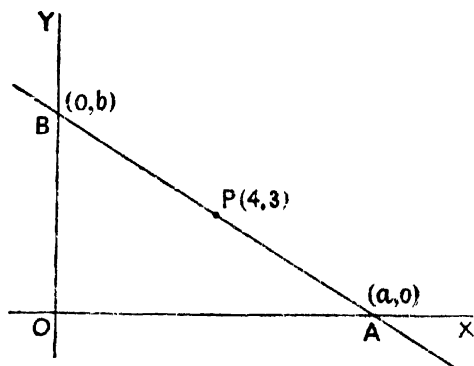
সুতরাং $4 = \frac{a+0}{2}$, $3 = \frac{b+0}{2}$ অর্থাৎ, $a = 8, b = 6.$

a এবং b-এর মান (1)-এ বসাইয়া সরলরেখার সমীকরণ $\frac{x}{8} + \frac{y}{6} = 1.$

উদাহরণ ৪.

$2x+3y+1=0$ এবং $x-y=2$ সরলরেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু এবং মূল বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক (0, 0)।

বজ্রগুণন-প্রক্রিয়ায় $2x+3y+1=0$; $x-y-2=0$ সমীকরণদ্বয় সমাধান করিয়া,

$$\frac{x}{-6+1}=\frac{y}{1+4}=\frac{1}{-2-3}$$

$\therefore \quad x=1, y=-1.$

ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক (1, −1), (0, 0) এবং (1, −1) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ—

$$\frac{y-0}{-1-0}=\frac{x-0}{1}$$

$\therefore$ নির্ণেয় সমীকরণ $y+x=0$.

প্রশ্নমালা 16

1. মূল বিন্দু হইতে নিম্নলিখিত বিন্দুসমূহের দূরত্ব নির্ণয় কর ঃ
 (i) (3, 4) (ii) (−5, 12) (iii) (8, 6)

2. নিম্নলিখিত বিন্দুসমূহের মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় কর ঃ
 (i) (6, 5), (4, 1) (ii) (12, −5) (6, 3)
 (iii) (5, 0) (0, −3) (iv) (8, 12) (−4, 7)

3. দেখাও যে, (7, 10) বিন্দু (−10, −9), (32, 5) এবং (18, 33) বিন্দুগুলি হইতে সমদূরবর্তী।

4. যদি (x, y) বিন্দু (3, 4) এবং (1, −2) বিন্দুদ্বয় হইতে সমদূরবর্তী হয়, দেখাও যে, $x+3y=5$.

5. দেখাও যে, (2, 3) বিন্দু, (3, 8) এবং (−1, −12) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাকে 1 : 3 অনুপাতে বিভক্ত করে।

6. (i) (3, 5) এবং (−2, −7) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখা কোন অন্তঃস্থ বিন্দুতে 3 : 2 অনুপাতে বিভক্ত হইলে ঐ বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

 (ii) (−1, 2) এবং (4, −5) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখা বহিঃস্থ কোন বিন্দুতে 2 : 3 অনুপাতে বিভক্ত হইলে ঐ বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

7. কোন ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক (2, 3) (3, 5) এবং (4, 1) ; ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

8. ত্রিভুজে শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক (1, 4), (5, 8) এবং (x, y) ; ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (4, 3), (x, y) নির্ণয় কর।

9. X-অক্ষরেখার সঙ্গে 45° নতিকোণে Y-অক্ষরেখা হইতে 5 অন্তর্খণ্ড ছেদ করিলে, সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

10. X-অক্ষরেখার সঙ্গে 60° নতিকোণে $(3, -2)$ বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

11. নিম্নলিখিত বিন্দুগুলির সংযোজক রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর :

(a) $(1, 3), (6, -5)$ (b) $(0, 11), (2, 3)$

(c) $(-5, 6), (13, 4)$ (d) $(15, 4), (-6, -4)$

12. $4x+5y+20=0$ সমীকরণকে নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ কর :

(i) $y=mx+c$ (ii) $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$

13. নিম্নলিখিত সমীকরণ হইতে সরলরেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর :

(i) $5x+3y=8, 3x-2y=1$

(ii) $2x+3y+7=0, 3x+2y+3=0$

14. দেখাও যে, $2x-y-3=0$ সরলরেখা, $3x+y-2=0$ এবং $5x+2y-3=0$ সরলরেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু দিয়া যায়।

15. দেখাও যে, $y-x+2=0$ সরলরেখা, $(3, -1)$ এবং $(8, 0)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখাকে $2:3$ অনুপাতে অন্তঃস্থভাবে ছেদ করে।

16. কোন ত্রিভুজে শীর্ষবিন্দুত্রয়ের স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $(1, 2), (3, 4), (-4, -6)$; ত্রিভুজের (i) বাহুগুলির সমীকরণ নির্ণয় কর ; (ii) মধ্যমাত্রয়ের সমীকরণ নির্ণয় কর।

অধিবৃত্ত (Parabola)

সমতলের উপর একটি স্থির বিন্দু হইতে কোন চলমান বিন্দুর দূরত্ব যদি একটি নির্দিষ্ট সরলরেখা হইতে ঐ চলমান বিন্দুর লম্ব-দূরত্বের সমান হয়, চলমান বিন্দুর গতিপথকে অধিবৃত্ত বলে। স্থির বিন্দুকে অধিবৃত্তের নাভিকেন্দ্র এবং নির্দিষ্ট সরলরেখাকে নিয়ামক বলে। অধিবৃত্তের সধারণ সমীকরণ :—
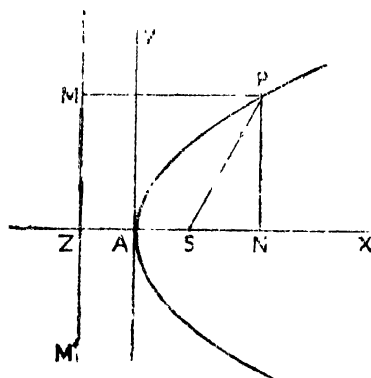
মনে কর, S অধিবৃত্তের নাভিকেন্দ্র এবং MM' ইহার নিয়ামক। ZS নাভিকেন্দ্র S হইতে নিয়ামক MM'-এর উপর অঙ্কিত লম্ব এবং A, ZS-এর মধ্যবিন্দু।

$\therefore$ $ZA = AS$, A অধিবৃত্তের উপর একটি বিন্দু এবং অধিবৃত্তের শীর্ষবিন্দু। যদি $AS = a$, $AZ = a$ হয়, সুতরাং $ZS = 2a$.

S হইতে নিয়ামকের উপর অঙ্কিত লম্বকে X-অক্ষরেখা এবং A-বিন্দু দিয়া নিয়ামকের সমান্তরাল রেখা AY-কে Y-অক্ষরেখা ধরা হইলে শীর্ষবিন্দু A-ই মূল বিন্দু। সুতরাং, নাভিকেন্দ্র S-এর স্থানাঙ্ক $(a, 0)$ এবং Z-বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(-a, 0)$, Z-বিন্দু দিয়া গমনকারী Y-অক্ষরেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ $x = -a$.

$\therefore$ $x + a = 0$ অর্থাৎ নিয়ামকের সমীকরণ।

মনে কর, অধিবৃত্তস্থিত যে-কোন P-বিন্দুর স্থানাঙ্ক (x', y')। P হইতে X-অক্ষরেখা ও নিয়ামকের উপর যথাক্রমে PN এবং PM লম্ব অঙ্কিত হইল।

$\therefore$ $PM = ZN = ZA + AN = (a + x')$; $PN = y$.

$SP = MP$, বর্গ করিয়া $SP^2 = MP^2$, কিন্তু $SN = AN - AS = (x' - a)$

কিন্তু $SN^2 + PN^2 = MP^2$

অর্থাৎ, $(x' - a)^2 + y'^2 = (x' + a)^2$

অথবা, $y'^2 = 4ax'$

সুতরাং, P (x', y') বিন্দুর সঞ্চারপথ

$\therefore$ $y^2 = 4ax$, ইহাই অধিবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ। ... (1)

এই চিত্রে X-অক্ষরেখাই অধিবৃত্তের অক্ষরেখা।
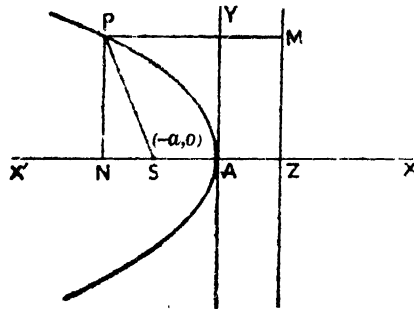
চিত্র-অনুযায়ী অধিবৃত্তের কেন্দ্র $S(-a, 0)$ এবং ZM নিয়ামকের সমীকরণ $x - a = 0$, অনুরূপে অধিবৃত্তের সমীকরণ $y^2 = -4ax$. ... (2)

আবার, Y-অক্ষরেখা অধিবৃত্তের অক্ষরেখা ধরা হইলে এবং অনুরূপে নাভিকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(0, a)$ হইলে নিয়ামকের সমীকরণ $y + a = 0$.

$\therefore$ অধিবৃত্তের সমীকরণ $x^2 = 4ay$. ... (3)

যদি Y-অক্ষরেখার ঋণাত্মক দিক অর্থাৎ AY′ অধিবৃত্তের অক্ষরেখা ধরা হয় এবং নাভিকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(0, -a)$ হইলে নিয়ামকের সমীকরণ $y - a = 0$
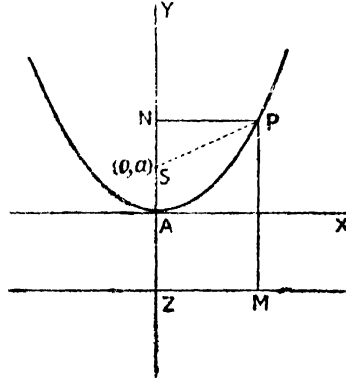
সুতরাং, অধিবৃত্তের সমীকরণ $x^2 = -4ay$.
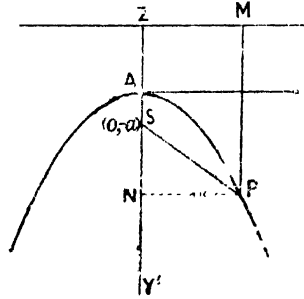
অধিবৃত্তের লেখচিত্র (Plotting a Parabola) **:**

তোমরা জান, অধিবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ $y^2 = 4ax$

$$\therefore \quad y = \pm\sqrt{4ax} = \pm 2\sqrt{ax}.$$

অর্থাৎ x-এর প্রতিটি মানের জন্য y-এর দুইটি মান পাওয়া যাইবে। কিন্তু y-এর দুইটি মান পরস্পর সমান এবং বিপরীত চিহ্নযুক্ত। অধিবৃত্তের সমীকরণ $y^2 = 4ax$ হইতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, x-অক্ষরেখার পরিপ্রেক্ষিতে অধিবৃত্ত প্রতিসম (symmetric)। যদি x-চলের মান $x_1, x_2, \cdots, x_n$ দেওয়া থাকে, অধিবৃত্তের সমীকরণ হইতে y-এর অনুরূপ মান $\pm 2\sqrt{ax_1}, \pm 2\sqrt{ax_2}, \pm \cdots \pm 2\sqrt{ax_n}$,

তারপর কোন সঠিক একক অনুসারে

x	x_1	x_2	x_3	......	x_n
y	$\pm 2\sqrt{ax_1}$	$\pm 2\sqrt{ax_2}$	$\pm 2\sqrt{ax_3}$	......	$\pm 2\sqrt{ax_n}$

$(x_1, \pm 2\sqrt{ax_1}), (x_2, \pm 2\sqrt{ax_2}), \cdots\cdots, (x_n, \pm 2\sqrt{ax_n})$

বিন্দুগুলি ছক-কাগজের উপর উপস্থাপন করিয়া অধিবৃত্তের লেখচিত্র পাওয়া যাইবে।

অক্ষরেখাদ্বয়ের সমান্তরাল স্থানান্তরে অধিবৃত্তের সমীকরণ (Equation of a parabola w. r. t. parallel translation of co-ordinate axes) :

তোমরা জান, A মূল বিন্দু (অধিবৃত্তের শীর্ষবিন্দু) এবং AX ও AY অক্ষরেখাদ্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অধিবৃত্তের সমীকরণ $y^2 = 4ax$.

মনে কর, A′X′ এবং A′Y′ যথাক্রমে AX এবং AY-এর সমান্তরাল স্থানান্তরে নূতন অবস্থান। মনে কর, (α, β), A′ বিন্দুর স্থানাঙ্ক A মূল বিন্দুর পরিপ্রেক্ষিতে।
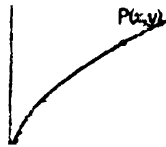
অতএব, P′ বিন্দু, P বিন্দুর স্থানান্তরিত অবস্থান। (x, y), P′-বিন্দুর স্থানাঙ্ক A বিন্দুর পরিপ্রেক্ষিতে, কিন্তু (x', y') ও P′ বিন্দুর স্থানাঙ্ক A′ (স্থানান্তরিত মূল বিন্দু) বিন্দুর পরিপ্রেক্ষিতে।

সুতরাং $\left.\begin{array}{l} x = x' + \alpha \\ y = y' + \beta \end{array}\right\}$

পরিবর্তিত অবস্থায় অধিবৃত্তের সমীকরণ $(y+\beta)^2 = 4a\ (x'+\alpha)$.

উদাহরণ 1.

অধিবৃত্তের শীর্ষবিন্দু মূল বিন্দু, অক্ষরেখা y-অক্ষরেখা এবং (6, 9) বিন্দুগামী অধিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

প্রশ্নানুসারে, অধিবৃত্তের সমীকরণ $x^2 = 4ay$.

যেহেতু, অধিবৃত্ত (6, 9)-বিন্দু দিয়া গমন করে, $36 = 4.\ a.\ 9 \quad \therefore \quad a = 1$

সুতরাং, অধিবৃত্তের সমীকরণ $x^2 = 4y$.

অনুসিদ্ধান্ত ঃ

অধিবৃত্তের সমীকরণ $y^2=4ax$

(i) নাভিলম্বের দৈর্ঘ্য $=4a$

(ii) শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(0, 0)$

(iii) নিয়ামকের (directrix) সমীকরণ $x+a=0$

(iv) নাভিকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(a, 0)$

(v) অধিবৃত্তের অক্ষরেখার সমীকরণ $y=0$

উদাহরণ ২.

দেখাও যে, $x=ay^2+by+c$ একটি বৃত্তের সমীকরণ। শীর্ষবিন্দু, নাভিকেন্দ্র, নাভিলম্বের দৈর্ঘ্য, অধিবৃত্তের অক্ষরেখার সমীকরণ এবং নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

$x=ay^2+by+c$ নিম্নরূপে লেখা যায়।

উভয়পক্ষকে a দিয়া ভাগ করিয়া,

$$\frac{x}{a}=y^2+\frac{b}{a}y+\frac{c}{a}$$

অথবা, $\frac{x}{a}=y^2+2.\frac{b}{2a}y+\frac{c}{a}$

অথবা, $y^2+2.\frac{b}{2a}y+\left(\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{x}{a}+\left(\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{c}{a}$

$\therefore \quad \left(y+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{1}{a}\left(x+\frac{b^2-4ac}{4a}\right)$

এখন, $y+\frac{b}{2a}=Y$ এবং $x+\frac{b^2-4ac}{4a}=X$ ধরিলে, $Y^2=4.\frac{1}{4a}X.$

সুতরাং, প্রদত্ত সমীকরণ একটি অধিবৃত্তের সমীকরণ এবং ইহার অক্ষরেখা x-অক্ষরেখার সমান্তরাল।

শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $=-\frac{b^2-4ac}{4a}, \; -\frac{b}{2a}$

নাভিকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $=\frac{1}{4a}-\frac{b^2-4ac}{4a}, \; -\frac{b}{2a}$

অর্থাৎ, $\frac{1+4ac-b^2}{4a}, \; \frac{-b}{2a}$

নাভিলম্বের দৈর্ঘ্য $=4.\frac{1}{4a}=\frac{1}{a}$

অধিবৃত্তের অক্ষরেখার সমীকরণ $=y+\frac{b}{2a}=0$

নিয়ামকের সমীকরণ $=x+\frac{1+4ac-b^2}{4a}=0.$

উদাহরণ 3.

$y^2=4(x+y)$ সমীকরণ হইতে অধিবৃত্তের শীর্ষবিন্দু, নাভিকেন্দ্র, নাভিলম্বের দৈর্ঘ্য, অক্ষরেখার সমীকরণ এবং নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

প্রদত্ত সমীকরণ $y^2-4y=4x$

অথবা, $y^2-4y+4=4x+4$

অথবা, $(y-2)^2=4(x+1)$

এখন $y-2=Y$, $x+1=X$ ধরিলে $Y^2=4X$.

অর্থাৎ মূলবিন্দু, $(-1, 2)$ বিন্দুতে স্থানান্তরিত হইল।

সুতরাং, শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $=(-1, 2)$,

নাভিলম্বের দৈর্ঘ্য $=4$,

নাভিকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(-1+1, 2)$ অর্থাৎ $(0, 2)$, যেহেতু $a=1$

অক্ষরেখার সমীকরণ $Y=0$, অর্থাৎ $y-2=0$, নিয়ামকের সমীকরণ $X+a=0$

অর্থাৎ $x+1+1=0$ $\therefore\ x+2=0$.

প্রশ্নমালা 17

1. নিম্নলিখিত সমীকরণ হইতে অধিবৃত্তের শীর্ষবিন্দু, নাভিকেন্দ্র, নাভিলম্ব, অক্ষরেখার সমীকরণ এবং নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর :—

(i) $2y^2=5x$, (ii) $y^2=3x+6$, (iii) $x^2-4x+2y=0$.

2. যদি $y^2=4ax$ অধিবৃত্ত, $2x+5y=7$ এবং $x-5y=-1$ সরল রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু দিয়া গমন করে, নাভিকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

3. $(3, -2)$ বিন্দুগামী অধিবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ নির্ণয় কর।

4. $y^2=36x$ অধিবৃত্তের উপর কোন্ বিন্দুতে কোটি (ordinate) ভুজের (abscissa) তিন গুণ, স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

5. $(0, 4)$, $(1, 9)$, এবং $(-2, 6)$ বিন্দুগামী y-অক্ষরেখার সমান্তরাল অক্ষবিশিষ্ট অধিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

6. $y^2=x$ সমীকরণ-বিশিষ্ট অধিবৃত্ত এবং $x-5y+6=0$ রেখাটির ছেদবিন্দু নির্ণয় কর।

উদাহরণ 4.

$y^2=4x$ সমীকরণ-বিশিষ্ট অধিবৃত্ত এবং $3y=x+8$ রেখাটির ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

যেহেতু, ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক, অধিবৃত্ত ও সরলরেখা—উভয় সমীকরণকে সিদ্ধ করে,

$\therefore\ y^2=4(3y-8)$

অথবা, $y^2-12y+32=0$

অথবা, $y^2-8y-4y+32=0$

অথবা, $(y-8)(y-4)=0$ $\therefore\ y=8$ বা $y=4$.

অর্থাৎ, সরলরেখা অধিবৃত্তকে দুইটি বিন্দুতে ছেদ করে।

ঐ ছেদবিন্দুর একটি $y=8$ হইলে,

$3.8=x+8$ $\therefore$ $x=16$.

আবার, অপরটিতে $y=4$ হইলে,

$3.4=x+8$ $\therefore$ $x=4$.

সুতরাং, ছেদবিন্দুদ্বয়ের স্থানাঙ্ক (16, 8) এবং (4, 4).

লেখচিত্র (Graphs)

অধিবৃত্তের লেখচিত্র অঙ্কন :—

উদাহরণ 1. মনে কর, $y^2=9x$ সমীকরণটির লেখচিত্র অঙ্কন করিতে হইবে।

বর্গমূল করিয়া, $y=\pm 3\sqrt{x}$ ... ... (1)

(1)-সমীকরণে x-এর বিভিন্ন মান লইয়া তৎসংযুক্ত y-এর মানসমূহ নিম্নলিখিত তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হইল :

$x=$	1	4	9	16	25	36
$y=$	± 3	± 6	± 9	± 12	± 15	± 18

অতঃপর ছক-কাগজের ক্ষুদ্রতম বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্যকে ভুজ ও কোটির একক ধরিয়া উপরিউক্ত বিন্দুগুলি যথাস্থানে সংস্থাপিত হইল। বিন্দুগুলির সংযোজক বক্ররেখাই নির্ণেয় লেখচিত্র। চিত্রে প্রদর্শিত বক্ররেখাটি অঙ্কিত লেখচিত্র।
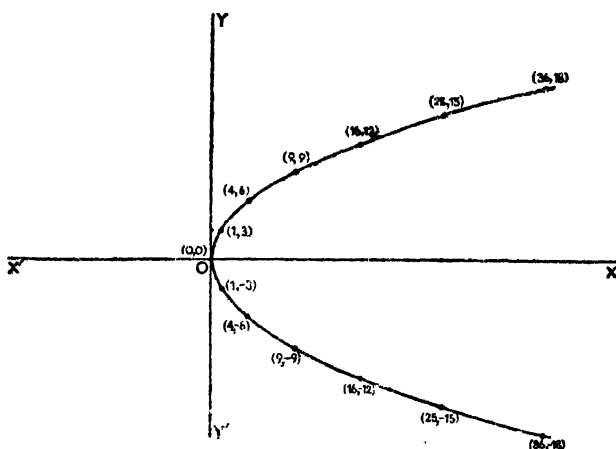
বক্ররেখাটি একটি অধিবৃত্ত। ইহার শীর্ষবিন্দুই মূলবিন্দু এবং x-অক্ষরেখাই অক্ষরেখা।

উদাহরণ 2. মনে কর, $y = x^2 - 2x + 3$ সমীকরণটির লেখচিত্র অঙ্কন করিতে হইবে।

প্রদত্ত সমীকরণে x-এর বিভিন্ন মান বসাইয়া তৎসংযুক্ত y-এর মানসমূহ নিম্নের তালিকায় লিপিবন্ধ করা হইল :—

$x =$	0	1	-1	2	-2	3	-3	4	5
$y =$	3	2	6	5	11	6	18	11	18

অতঃপর ছক-কাগজের ক্ষুদ্রতম বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্যকে ভুজ ও কোটির একক ধরিয়া তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলি যথাস্থানে সংস্থাপিত হইল। বিন্দুগুলির সংযোজক বক্ররেখাই নির্ণেয় লেখচিত্র। চিত্রে প্রদর্শিত বক্ররেখাটি অঙ্কিত লেখচিত্র।
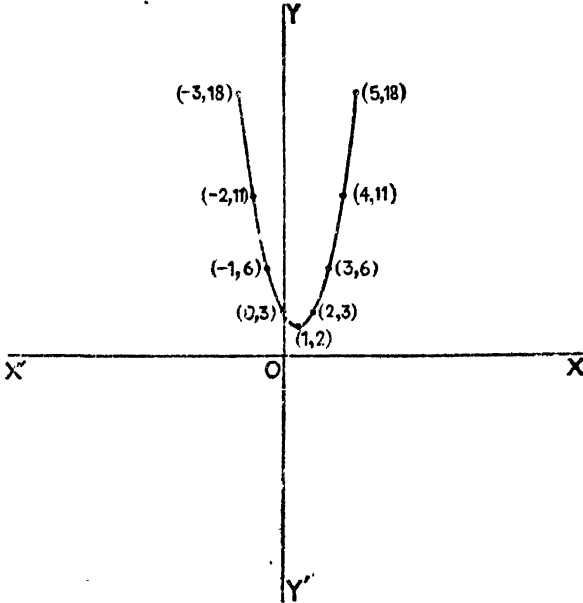
স্পষ্টতঃ অঙ্কিত লেখচিত্রটি একটি অধিবৃত্ত। এই অধিবৃত্তের শীর্ষবিন্দু, মূলবিন্দু নহে এবং অক্ষরেখা y-অক্ষরেখার সমান্তরাল।

প্রশ্নমালা 18

নিম্নলিখিত সমীকরণসমূহের লেখচিত্র অঙ্কন কর :

1. (a) $x^2 = 4y$ (b) $4y^2 = 25x$
   (c) $y = 2x^2 - 5x + 2$ (d) $x = 4y^2 + 8y + 5$

2. প্রদত্ত অধিবৃত্ত ও সরলরেখার স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর (লেখচিত্র অঙ্কন করিয়া) :

$$9y^2 = 16x \quad \text{এবং} \quad y = x - 5$$

উত্তরমালা

প্রশ্নমালা 1

1. $x=-5$ 2. $x=8$ 3. $x=2$

4. $x=7$ 5. $x=-6$ 6. $x=2\frac{1}{4}$

প্রশ্নমালা 2

10. 61·630

প্রশ্নমালা 3

1. $x=3$, $y=2$ 2. $x=1$, $y=1$ 3. $x=5$, $y=1$

4. $x=4$, $y=10$ 5. $x=3$, $y=2$ 6. $x=-\frac{1}{2}$, $y=\frac{1}{7}$

7. $x=\frac{5}{2}$, $y=\frac{1}{2}$ 8. $x=7$, $y=9$

প্রশ্নমালা 4

1. $\frac{27}{2}ab^2$ 2. a 3. $\frac{1}{x^{a+b}}$ 4. 1

5. $\frac{1}{\sqrt[12]{a^{5x}}}$ 6. $\sqrt{a^n}$ 7. $\frac{25}{8}$ 8. $(a+b)$

9 (a). 1 (b). 1 12. (i) $x=3$ (ii) $x=4$ (iii) $\left.\begin{matrix}x=2\\y=1\end{matrix}\right\}$

প্রশ্নমালা 5

1. $\frac{1}{4}(3\sqrt{5}-1)$ 2. $\frac{x^2+\sqrt{x^4-4}}{2}$

3. $\frac{1}{4}(2+\sqrt{6}-\sqrt{2})$ 4. 98 5. $-\sqrt{6}$

6. (i) $\pm\sqrt[4]{7}(\sqrt{\frac{7}{2}}+\sqrt{\frac{3}{2}})$ (ii) $\pm(3\sqrt{3}-1)$ (iii) $\pm(\sqrt{3}+1)$

(iv) $\pm\frac{1}{\sqrt{2}}(\sqrt{1+x+x^2}+\sqrt{1-x+x^2})$ (v) $\pm(1+\sqrt{2}-\sqrt{6})$

7. (i) 0 (ii) 0

প্রশ্নমালা 6

1. $a=\frac{4c-\sqrt{c}+1}{25}$ 2. 75 দিন 3. টা 76·50

4. A—20 বৎসর, B—12 বৎসর ; A—টা. 12,000 প্রতি বৎসর, B—টা. 7,200 প্রতি বৎসর 5. 1029 পাউণ্ড. 6. 648·40 টা. 7. 5,800 টা.

প্রশ্নমালা 7

1. (i) $35\frac{1}{2}$, $t_a=\frac{1}{2}(3x+17)$ (ii) 21 (iii) 1·8

2. (i) 19096 (ii) 3927 (iii) $\frac{n^2}{x}$ (iv) $31\sqrt{7}+3\sqrt{55}$

3. $4+11+18+\cdots\cdots$ 4. 10 : 3 5. 2, 680

6. টা. 6000, টা. 7000 7. টা. 100, টা. 10, টা. 440

8. 8, 11, 14, 17, 20, 23 9. 2, 4, 6, 8 অথবা 8, 6, 4, 2

10. $\frac{1}{27}$, $\frac{1}{729}$ 11. (i) $\frac{1}{8}$; $255\frac{7}{8}$ (ii) $\frac{1}{50}$; $36\frac{2}{5}$

12. (i) 2 (ii) $1\frac{13}{14}$ (iii) $\frac{9\sqrt{3}}{2}$

13. (i) $\frac{70}{81}(10^n-1)-\frac{7n}{9}$ (ii) $20[1-(1\cdot05)^{-n}]$ 14. (i) $\frac{1}{2}$, 2, 8, 32

(ii) $\frac{16}{27}$, $\frac{8}{9}$, $\frac{4}{3}$, 1, 3 15. 10, 20, 40 অথবা 40, 20, 10 16. 2, 3.

প্রশ্নমালা 8

1. −7, 2 2. 2, −3 3. 0, −5

4. $5\pm\sqrt{17}$ 5. $\sqrt{3}\pm 8$ 6. $\frac{7}{4}(-1\pm\sqrt{3})$

7. 0, −2 8. 0, $-\frac{7}{9}$ 9. 1, $-\frac{5}{2}$

10. 1, 3 অথবা −3, −1 11. 3, 4 অথবা 4, 3

12. 3, 2 অথবা $\frac{2}{3}$, $-\frac{3}{5}$ 13. 2, 1 অথবা −1, 3

14. 8, 2 অথবা 2, 8 15. 8, 4 অথবা 4, 8

16. $\frac{3}{8}$ 17. 24টি

18. (i) $x^2-5x+6=0$ (ii) $x^2-4x-1=0$

(iii) $x^2-\left(\frac{p^2+q^2}{pq}\right)x+1=0$

19. $x^2-\frac{(q^2-2p)}{p}x+1=0$ 21. 2, $\frac{1}{2}$

22. (i) p^2-2q (ii) $\frac{p^2}{q}-2$

প্রশ্নমালা 9

1. (a) 8 (b) 1140 2. 362800 3. 720, 120, 96

4. (i) 90720, (ii) 504000, (iii) 226800

5. 210, 360 6. 3600

7. $\frac{|\underline{16}\,.\,|\underline{15}}{|\underline{4}}$ 8. $\frac{|\underline{47}}{|\underline{4}\,|\underline{5}\,|\underline{5}\,|\underline{7}\,|\underline{7}\,|\underline{7}}$

9. 81 10. (i) 330, (ii) 990 11. 3003, 1287

12. 246 13. 2002, 220 14. 25. 15. 255

16. 2695 17. (i) 113, (ii) 2190

প্রশ্নমালা 10

1. $\frac{64x^6}{729}-\frac{32x^4}{77}+\frac{20x^2}{3}-24+\frac{135}{4x^2}-\frac{243}{8x^4}+\frac{729}{64x^6}$

2. $x^8-16x^7y+112x^6y^2-448x^5y^3+1120x^4y^4-1792x^3y^5$
$+1792x^2y^6-1024xy^7+256y^8$

3. 43750 4. $-\frac{\lfloor 18}{\lfloor 9 \lfloor 9}(6xy)^9$ 5. $126x, \frac{-126}{x}$ 7. 495

8. ·792 9. $\frac{7}{18}$ 10. 1·2155, ·9970

প্রশ্নমালা 11

2. (i) $\bar{1}$·6532126 (ii) $\bar{1}$·8279829 (iii) $\bar{1}$·9345759

3. (i) 5·728 (ii) 180·3 (iii) ·4217 (iv) ·07398

4. $\bar{2}$·7782 5. (i) 2·302 (ii) 1·248 (iii) 8·541

6. 3·8190943 7. (i) 3·958 (ii) ·875 (iii) $x=$·40703
$y=$5·6568

প্রশ্নমালা 12

1. টা. 4926·20 2. 5·7% 3. 1,82,80000 (প্রায়)

4. 14·1 বৎসর (প্রায়) 5. 8054

প্রশ্নমালা 13

1. টা. 828·84 2. টা. 2470·14 3. টা. 15,644

4. টা. 3580 5. টা. 12,075 6. টা. 1000 7. টা. 5960

প্রশ্নমালা 14

1. $1+\frac{3}{\lfloor 1}+\frac{5}{\lfloor 2}+\frac{7}{\lfloor 3}+\cdots=3e$ 2. $\frac{3^2}{\lfloor 1}+\frac{4^2}{\lfloor 2}+\frac{5^2}{\lfloor 3}+\cdots=10e-4$

6. $\frac{(-1)^n(n-1)^2}{n!}$

প্রশ্নমালা 15

1. $\frac{1}{2}$, 1 2. $\frac{5}{18}$, $\frac{5}{18}$ 3. $\frac{40}{323}$, $\frac{295}{323}$ 4. $\frac{9}{38}$, $\frac{10}{19}$

5. $\frac{1}{36}$, $\frac{5}{9}$ 6. $\frac{1}{4}$ 7. $\frac{1}{2}$ 8. $\frac{37}{40}$

9. $\frac{63}{256}$ 10. টাঃ 5166 : 67

প্রশ্নমালা 16

1. (i) 5 (ii) 13 (iii) 10

2. (i) $2\sqrt{5}$ (ii) 10 (iii) $\sqrt{34}$ (iv) 13

6. (i) $0, -\frac{11}{5}$ (ii) $-11, 16$

7. 3, 3 **8.** 6, 2 **9.** $y=\frac{x}{\sqrt{2}}+5$

10. $y+2=\sqrt{3}(x-3)$

11. (*a*) $8x+5y-23=0$ (*b*) $4x+y-11=0$

(*c*) $x+9y-49=0$ (*d*) $8x-21y-26=0$

12. (i) $y=-\frac{4}{3}x-4$ (ii) $\frac{x}{-3}+\frac{y}{-4}=1$

13. (i) 1, 1 (ii) 1, -3

16. (i) $x-y+1=0$, $2x+7y-34=0$, $4x+5y-14=0$

(ii) $2x+y-4=0$, $y-4=0$, $x+2y-8=0$

প্রশ্নমালা 17

1. (i) $(0, 0)$; $(\frac{5}{8}, 0)$; $\frac{5}{2}$, $y=0$; $8x+5=0$

(ii) $(-2, 0)$; $(-\frac{5}{4}, 0)$; $\frac{3}{4}$, $y=0$; $4x+11=0$

(iii) $(2, 2)$; $(2, \frac{3}{2})$; $\frac{1}{2}$; $x-2=0$; $2y-5=0$

2. $(\frac{9}{200}, 0)$ **3.** $y^2=\frac{4}{3}x$ **4.** $(4, 12)$

5. $y=2x^2+3x+4$. **6.** $(4,2)$, $(9, 3)$

লগারিদ্‌ম-তালিকা

LOGARITHMS

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 2 3	4 5 6	7 8 9
10	0000	0043	0086	0128	0170						5 9 13	17 21 26	30 34 38
						0212	0253	0294	0334	0374	4 8 12	16 20 24	28 32 36
11	0414	0453	0492	0531	0569						4 8 12	16 20 23	27 31 35
						0607	0645	0682	0719	0755	4 7 11	15 18 22	26 29 33
12	0792	0828	0864	0899	0934						3 7 11	14 18 21	25 28 32
						0969	1004	1038	1072	1106	3 7 10	14 17 20	24 27 31
13	1139	1173	1206	1239	1271						3 6 10	13 16 19	23 26 29
						1303	1335	1367	1399	1430	3 7 10	13 16 19	22 25 29
14	1461	1492	1523	1553	1584						3 6 9	12 15 19	22 25 28
						1614	1644	1673	1703	1732	3 6 9	12 14 17	20 23 26
15	1761	1790	1818	1847	1875						3 6 9	11 14 17	20 23 26
						1903	1931	1959	1987	2014	3 6 8	11 14 17	19 22 25
16	2041	2068	2095	2122	2148						3 6 8	11 14 16	19 22 24
						2175	2201	2227	2253	2279	3 5 8	10 13 16	18 21 23
17	2304	2330	2355	2380	2405						3 5 8	10 13 15	18 20 23
						2430	2455	2480	2504	2529	3 5 8	10 12 15	17 20 22
18	2553	2577	2601	2625	2648						2 5 7	9 12 14	17 19 21
						2672	2695	2718	2742	2765	2 4 7	9 11 14	16 18 21
19	2788	2810	2833	2856	2878						2 4 7	9 11 13	16 18 20
						2900	2923	2945	2967	2989	2 4 6	8 11 13	15 17 19
20	3010	3032	3054	3075	3096	3118	3139	3160	3181	3201	2 4 6	8 11 13	15 17 19
21	3222	3243	3263	3284	3304	3324	3345	3365	3385	3404	2 4 6	8 10 12	14 16 18
22	3424	3444	3464	3483	3502	3522	3541	3560	3579	3598	2 4 6	8 10 12	14 15 17
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784	2 4 6	7 9 11	13 15 17
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962	2 4 5	7 9 11	12 14 16
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133	2 3 5	7 9 10	12 14 15
26	4150	4166	4183	4200	4216	4232	4249	4265	4281	4298	2 3 5	7 8 10	11 13 15
27	4314	4330	4346	4362	4378	4393	4409	4425	4440	4456	2 3 5	6 8 9	11 13 14
28	4472	4487	4502	4518	4533	4548	4564	4579	4594	4609	2 3 5	6 8 9	11 12 14
29	4624	4639	4654	4669	4683	4698	4713	4728	4742	4757	1 3 4	6 7 9	10 12 13
30	4771	4786	4800	4814	4829	4843	4857	4871	4886	4900	1 3 4	6 7 9	10 11 13
31	4914	4928	4942	4955	4969	4983	4997	5011	5024	5038	1 3 4	6 7 8	10 11 12
32	5051	5065	5079	5092	5105	5119	5132	5145	5159	5172	1 3 4	5 7 8	9 11 12
33	5185	5198	5211	5224	5237	5250	5263	5276	5289	5302	1 3 4	5 6 8	9 10 12
34	5315	5328	5340	5353	5366	5378	5391	5403	5416	5428	1 3 4	5 6 8	9 10 11
35	5441	5453	5465	5478	5490	5502	5514	5527	5539	5551	1 2 4	5 6 7	9 10 11
36	5563	5575	5587	5599	5611	5623	5635	5647	5658	5670	1 2 4	5 6 7	8 10 11
37	5682	5694	5705	5717	5729	5740	5752	5763	5775	5786	1 2 3	5 6 7	8 9 10
38	5798	5809	5821	5832	5843	5855	5866	5877	5888	5899	1 2 3	5 6 7	8 9 10
39	5911	5922	5933	5944	5955	5966	5977	5988	5999	6010	1 2 3	4 5 7	8 9 10
40	6021	6031	6042	6053	6064	6075	6085	6096	6107	6117	1 2 3	4 5 6	8 9 10
41	6128	6138	6149	6160	6170	6180	6191	6201	6212	6222	1 2 3	4 5 6	7 8 9
42	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	6314	6325	1 2 3	4 5 6	7 8 9
43	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	6415	6425	1 2 3	4 5 6	7 8 9
44	6435	6444	6454	6464	6474	6484	6493	6503	6513	6522	1 2 3	4 5 6	7 8 9
45	6532	6542	6551	6561	6571	6580	6590	6599	6609	6618	1 2 3	4 5 6	7 8 9
46	6628	6637	6646	6656	6665	6675	6684	6693	6702	6712	1 2 3	4 5 6	7 7 8
47	6721	6730	6739	6749	6758	6767	6776	6785	6794	6803	1 2 3	4 5 5	6 7 8
48	6812	6821	6830	6839	6848	6857	6866	6875	6884	6893	1 2 3	4 4 5	6 7 8
49	6902	6911	6920	6928	6937	6946	6955	6964	6972	6981	1 2 3	4 4 5	6 7 8

LOGARITHMS

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	123	456	789
50	6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067	1 2 3	3 4 5	6 7 8
51	7076	7084	7093	7101	7110	7118	7126	7135	7143	7152	1 2 3	3 4 5	6 7 8
52	7160	7168	7177	7185	7193	7202	7210	7218	7226	7235	1 2 2	3 4 5	6 7 7
53	7243	7251	7259	7267	7275	7284	7292	7300	7308	7316	1 2 2	3 4 5	6 6 7
54	7324	7332	7340	7348	7356	7364	7372	7380	7388	7396	1 2 2	3 4 5	6 6 7
55	7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474	1 2 2	3 4 5	5 6 7
56	7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551	1 2 2	3 4 5	5 6 7
57	7559	7566	7574	7582	7589	7597	7604	7612	7619	7627	1 2 2	3 4 5	5 6 7
58	7634	7642	7649	7657	7664	7672	7679	7686	7694	7701	1 1 2	3 4 4	5 6 7
59	7709	7716	7723	7731	7738	7745	7752	7760	7767	7774	1 1 2	3 4 4	5 6 7
60	7782	7789	7796	7803	7810	7818	7825	7832	7839	7846	1 1 2	3 4 4	5 6 6
61	7853	7860	7868	7875	7882	7889	7896	7903	7910	7917	1 1 2	3 4 4	5 6 6
62	7924	7931	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987	1 1 2	3 3 4	5 6 6
63	7993	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055	1 1 2	3 3 4	5 5 6
64	8062	8069	8075	8082	8089	8096	8102	8109	8116	8122	1 1 2	3 3 4	5 5 6
65	8129	8136	8142	8149	8156	8162	8169	8176	8182	8189	1 1 2	3 3 4	5 5 6
66	8195	8202	8209	8215	8222	8228	8235	8241	8248	8254	1 1 2	3 3 4	5 5 6
67	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8306	8312	8319	1 1 2	3 3 4	5 5 6
68	8325	8331	8338	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382	1 1 2	3 3 4	4 5 6
69	8388	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8439	8445	1 1 2	2 3 4	4 5 6
70	8451	8457	8463	8470	8476	8482	8488	8494	8500	8506	1 1 2	2 3 4	4 5 6
71	8513	8519	8525	8531	8537	8543	8549	8555	8561	8567	1 1 2	2 3 4	4 5 5
72	8573	8579	8585	8591	8597	8603	8609	8615	8621	8627	1 1 2	2 3 4	4 5 5
73	8633	8639	8645	8651	8657	8663	8669	8675	8681	8686	1 1 2	2 3 4	4 5 5
74	8692	8698	8704	8710	8716	8722	8727	8733	8739	8745	1 1 2	2 3 4	4 5 5
75	8751	8756	8762	8768	8774	8779	8785	8791	8797	8802	1 1 2	2 3 3	4 5 5
76	8808	8814	8820	8825	8831	8837	8842	8848	8854	8859	1 1 2	2 3 3	4 5 5
77	8865	8871	8876	8882	8887	8893	8899	8904	8910	8915	1 1 2	2 3 3	4 4 5
78	8921	8927	8932	8938	8943	8949	8954	8960	8965	8971	1 1 2	2 3 3	4 4 5
79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	9015	9020	9025	1 1 2	2 3 3	4 4 5
80	9031	9036	9042	9047	9053	9058	9063	9069	9074	9079	1 1 2	2 3 3	4 4 5
81	9085	9090	9096	9101	9106	9112	9117	9122	9128	9133	1 1 2	2 3 3	4 4 5
82	9138	9143	9149	9154	9159	9165	9170	9175	9180	9186	1 1 2	2 3 3	4 4 5
83	9191	9196	9201	9206	9212	9217	9222	9227	9232	9238	1 1 2	2 3 3	4 4 5
84	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	9284	9289	1 1 2	2 3 3	4 4 5
85	9294	9299	9304	9309	9315	9320	9325	9330	9335	9340	1 1 2	2 3 3	4 4 5
86	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390	1 1 2	2 3 3	4 4 5
87	9395	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440	0 1 1	2 2 3	3 4 4
88	9445	9450	9455	9460	9465	9469	9474	9479	9484	9489	0 1 1	2 2 3	3 4 4
89	9494	9499	9504	9509	9513	9518	9523	9528	9533	9538	0 1 1	2 2 3	3 4 4
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	9571	9576	9581	9586	0 1 1	2 2 3	3 4 4
91	9590	9595	9600	9605	9609	9614	9619	9624	9628	9633	0 1 1	2 2 3	3 4 4
92	9638	9643	9647	9652	9657	9661	9666	9671	9675	9680	0 1 1	2 2 3	3 4 4
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	9713	9717	9722	9727	0 1 1	2 2 3	3 4 4
94	9731	9736	9741	9745	9750	9754	9759	9763	9768	9773	0 1 1	2 2 3	3 4 4
95	9777	9782	9786	9791	9795	9800	9805	9809	9814	9818	0 1 1	2 2 3	3 4 4
96	9823	9827	9832	9836	9841	9845	9850	9854	9859	9863	0 1 1	2 2 3	3 4 4
97	9868	9872	9877	9881	9886	9890	9894	9899	9903	9908	0 1 1	2 2 3	3 4 4
98	9912	9917	9921	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952	0 1 1	2 2 3	3 4 4
99	9956	9961	9965	9969	9974	9978	9983	9987	9991	9996	0 1 1	2 2 3	3 3 4

ANTILOGARITHMS

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	123	456	789
·00	1000	1002	1005	1007	1009	1012	1014	1016	1019	1021	0 0 1	1 1 1	2 2 2
·01	1023	1026	1028	1030	1033	1035	1038	1040	1042	1045	0 0 1	1 1 1	2 2 2
·02	1047	1050	1052	1054	1057	1059	1062	1064	1067	1069	0 0 1	1 1 1	2 2 2
·03	1072	1074	1076	1079	1081	1084	1086	1089	1091	1094	0 0 1	1 1 1	2 2 2
·04	1096	1099	1102	1104	1107	1109	1112	1114	1117	1119	0 1 1	1 1 2	2 2 2
·05	1122	1125	1127	1130	1132	1135	1138	1140	1143	1146	0 1 1	1 1 2	2 2 2
·06	1148	1151	1153	1156	1159	1161	1164	1167	1169	1172	0 1 1	1 1 2	2 2 2
·07	1175	1178	1180	1183	1186	1189	1191	1194	1197	1199	0 1 1	1 1 2	2 2 2
·08	1202	1205	1208	1211	1213	1216	1219	1222	1225	1227	0 1 1	1 1 2	2 2 3
·09	1230	1233	1236	1239	1242	1245	1247	1250	1253	1256	0 1 1	1 1 2	2 2 3
·10	1259	1262	1265	1268	1271	1274	1276	1279	1282	1285	0 1 1	1 1 2	2 2 3
·11	1288	1291	1294	1297	1300	1303	1306	1309	1312	1315	0 1 1	1 2 2	2 2 3
·12	1318	1321	1324	1327	1330	1334	1337	1340	1343	1346	0 1 1	1 2 2	2 2 3
·13	1349	1352	1355	1358	1361	1365	1368	1371	1374	1377	0 1 1	1 2 2	2 3 3
·14	1380	1384	1387	1390	1393	1396	1400	1403	1406	1409	0 1 1	1 2 2	2 3 3
·15	1413	1416	1419	1422	1426	1429	1432	1435	1439	1442	0 1 1	1 2 2	2 3 3
·16	1445	1449	1452	1455	1459	1462	1466	1469	1472	1476	0 1 1	1 2 2	2 3 3
·17	1479	1483	1486	1489	1493	1496	1500	1503	1507	1510	0 1 1	1 2 2	2 3 3
·18	1514	1517	1521	1524	1528	1531	1535	1538	1542	1545	0 1 1	1 2 2	2 3 3
·19	1549	1552	1556	1560	1563	1567	1570	1574	1578	1581	0 1 1	1 2 2	3 3 3
·20	1585	1589	1592	1596	1600	1603	1607	1611	1614	1618	0 1 1	1 2 2	3 3 3
·21	1622	1626	1629	1633	1637	1641	1644	1648	1652	1656	0 1 1	2 2 2	3 3 3
·22	1660	1663	1667	1671	1675	1679	1683	1687	1690	1694	0 1 1	2 2 2	3 3 3
·23	1698	1702	1706	1710	1714	1718	1722	1726	1730	1734	0 1 1	2 2 2	3 3 4
·24	1738	1742	1746	1750	1754	1758	1762	1766	1770	1774	0 1 1	2 2 2	3 3 4
·25	1778	1782	1786	1791	1795	1799	1803	1807	1811	1816	0 1 1	2 2 2	3 3 4
·26	1820	1824	1828	1832	1837	1841	1845	1849	1854	1858	0 1 1	2 2 3	3 3 4
·27	1862	1866	1871	1875	1879	1884	1888	1892	1897	1901	0 1 1	2 2 3	3 3 4
·28	1905	1910	1914	1919	1923	1928	1932	1936	1941	1945	0 1 1	2 2 3	3 4 4
·29	1950	1954	1959	1963	1968	1972	1977	1982	1986	1991	0 1 1	2 2 3	3 4 4
·30	1995	2000	2004	2009	2014	2018	2023	2028	2032	2037	0 1 1	2 2 3	3 4 4
·31	2042	2046	2051	2056	2061	2065	2070	2075	2080	2084	0 1 1	2 2 3	3 4 4
·32	2080	2094	2099	2104	2109	2113	2118	2123	2128	2133	0 1 1	2 2 3	3 4 4
·33	2138	2143	2148	2153	2158	2163	2168	2173	2178	2183	0 1 1	2 2 3	3 4 4
·34	2188	2193	2198	2203	2208	2213	2218	2223	2228	2234	1 1 2	2 3 3	4 4 5
·35	2239	2244	2249	2254	2259	2265	2270	2275	2280	2286	1 1 2	2 3 3	4 4 5
·36	2291	2296	2301	2307	2312	2317	2323	2328	2333	2339	1 1 2	2 3 3	4 4 5
·37	2344	2350	2355	2360	2366	2371	2377	2382	2388	2393	1 1 2	2 3 3	4 4 5
·38	2399	2404	2410	2415	2421	2427	2432	2438	2443	2449	1 1 2	2 3 3	4 4 5
·39	2455	2460	2466	2472	2477	2483	2489	2495	2500	2506	1 1 2	2 3 3	4 5 5
·40	2512	2518	2523	2529	2535	2541	2547	2553	2559	2564	1 1 2	2 3 4	4 5 5
·41	2570	2576	2582	2588	2594	2600	2606	2612	2618	2624	1 1 2	2 3 4	4 5 5
·42	2630	2636	2642	2649	2655	2661	2667	2673	2679	2685	1 1 2	2 3 4	4 5 6
·43	2692	2698	2704	2710	2716	2723	2729	2735	2742	2748	1 1 2	3 3 4	4 5 6
·44	2754	2761	2767	2773	2780	2786	2793	2799	2805	2812	1 1 2	3 3 4	4 5 6
·45	2818	2825	2831	2838	2844	2851	2858	2864	2871	2877	1 1 2	3 3 4	5 5 6
·46	2884	2891	2897	2904	2911	2917	2924	2931	2938	2944	1 1 2	3 3 4	5 5 6
·47	2951	2958	2965	2972	2979	2985	2992	2999	3006	3013	1 1 2	3 3 4	5 5 6
·48	3020	3027	3034	3041	3048	3055	3062	3069	3076	3083	1 1 2	3 4 4	5 6 6
·49	3090	3097	3105	3112	3119	3126	3133	3141	3148	3155	1 1 2	3 4 4	5 6 6

ANTILOGARITHMS

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 2 3	4 5 6	7 8 9
·50	3162	3170	3177	3184	3192	3199	3206	3214	3221	3228	1 1 2	3 4 4	5 6 7
·51	3236	3243	3251	3258	3266	3273	3281	3289	3296	3304	1 2 2	3 4 5	5 6 7
·52	3311	3319	3327	3334	3342	3350	3357	3365	3373	3381	1 2 2	3 4 5	5 6 7
·53	3388	3396	3404	3412	3420	3428	3436	3443	3451	3459	1 2 2	3 4 5	6 6 7
·54	3467	3475	3483	3491	3499	3508	3516	3524	3532	3540	1 2 2	3 4 5	6 6 7
·55	3548	3556	3565	3573	3581	3589	3597	3606	3614	3622	1 2 2	3 4 5	6 7 7
·56	3631	3639	3648	3656	3664	3673	3681	3690	3698	3707	1 2 3	3 4 5	6 7 8
·57	3715	3724	3733	3741	3750	3758	3767	3776	3784	3793	1 2 3	3 4 5	6 7 8
·58	3802	3811	3819	3828	3837	3846	3855	3864	3873	3882	1 2 3	4 4 5	6 7 8
·59	3890	3899	3908	3917	3926	3936	3945	3954	3963	3972	1 2 3	4 5 5	6 7 8
·60	3981	3990	3999	4009	4018	4027	4036	4046	4055	4064	1 2 3	4 5 6	6 7 8
·61	4074	4083	4093	4102	4111	4121	4130	4140	4150	4159	1 2 3	4 5 6	7 8 9
·62	4169	4178	4188	4198	4207	4217	4227	4236	4246	4256	1 2 3	4 5 6	7 8 9
·63	4266	4276	4285	4295	4305	4315	4325	4335	4345	4355	1 2 3	4 5 6	7 8 9
·64	4365	4375	4385	4395	4406	4416	4426	4436	4446	4457	1 2 3	4 5 6	7 8 9
·65	4467	4477	4487	4498	4508	4519	4529	4539	4550	4560	1 2 3	4 5 6	7 8 9
·66	4571	4581	4592	4603	4613	4624	4634	4645	4656	4667	1 2 3	4 5 6	7 9 10
·67	4677	4688	4699	4710	4721	4732	4742	4753	4764	4775	1 2 3	4 5 7	8 9 10
·68	4786	4797	4808	4819	4831	4842	4853	4864	4875	4887	1 2 3	4 6 7	8 9 10
·69	4898	4909	4920	4932	4943	4955	4966	4977	4989	5000	1 2 3	5 6 7	8 9 10
·70	5012	5023	5035	5047	5058	5070	5082	5093	5105	5117	1 2 4	5 6 7	8 9 11
·71	5129	5140	5152	5164	5176	5188	5200	5212	5224	5236	1 2 4	5 6 7	8 10 11
·72	5248	5260	5272	5284	5297	5309	5321	5333	5346	5358	1 2 4	5 6 7	9 10 11
·73	5370	5383	5395	5408	5420	5433	5445	5458	5470	5483	1 3 4	5 6 8	9 10 11
·74	5495	5508	5521	5534	5546	5559	5572	5585	5598	5610	1 3 4	5 6 8	9 10 12
·75	5623	5636	5649	5662	5675	5689	5702	5715	5728	5741	1 3 4	5 7 8	9 10 12
·76	5754	5768	5781	5794	5808	5821	5834	5848	5861	5875	1 3 4	5 7 8	9 11 12
·77	5888	5902	5916	5929	5943	5957	5970	5984	5998	6012	1 3 4	5 7 8	10 11 12
·78	6026	6039	6053	6067	6081	6095	6109	6124	6138	6152	1 3 4	6 7 8	10 11 13
·79	6166	6180	6194	6209	6223	6237	6252	6266	6281	6295	1 3 4	6 7 9	10 11 13
·80	6310	6324	6339	6353	6368	6383	6397	6412	6427	6442	1 3 4	6 7 9	10 12 13
·81	6457	6471	6486	6501	6516	6531	6546	6561	6577	6592	2 3 5	6 8 9	11 12 14
·82	6607	6622	6637	6653	6668	6683	6699	6714	6730	6745	2 3 5	6 8 9	11 12 14
·83	6761	6776	6792	6808	6823	6839	6855	6871	6887	6902	2 3 5	6 8 9	11 13 14
·84	6918	6934	6950	6966	6982	6998	7015	7031	7047	7063	2 3 5	6 8 10	11 13 15
·85	7079	7096	7112	7129	7145	7161	7178	7194	7211	7228	2 3 5	7 8 10	12 13 15
·86	7244	7261	7278	7295	7311	7328	7345	7362	7379	7396	2 3 5	7 8 10	12 13 15
·87	7413	7430	7447	7464	7482	7499	7516	7534	7551	7568	2 3 5	7 9 10	12 14 16
·88	7586	7603	7621	7638	7656	7674	7691	7709	7727	7745	2 4 5	7 9 11	12 14 16
·89	7762	7780	7798	7816	7834	7852	7870	7889	7907	7925	2 4 5	7 9 11	13 14 16
·90	7943	7962	7980	7998	8017	8035	8054	8072	8091	8110	2 4 6	7 9 11	13 15 17
·91	8128	8147	8166	8185	8204	8222	8241	8260	8279	8299	2 4 6	8 9 11	13 15 17
·92	8318	8337	8356	8375	8395	8414	8433	8453	8472	8492	2 4 6	8 10 12	14 15 17
·93	8511	8531	8551	8570	8590	8610	8630	8650	8670	8690	2 4 6	8 10 12	14 16 18
·94	8710	8730	8750	8770	8790	8810	8831	8851	8872	8892	2 4 6	8 10 12	14 16 18
·95	8913	8933	8954	8974	8995	9016	9036	9057	9078	9099	2 4 6	8 10 12	15 17 19
·96	9120	9141	9162	9183	9204	9226	9247	9268	9290	9311	2 4 6	8 11 13	15 17 19
·97	9333	9354	9376	9397	9419	9441	9462	9484	9506	9528	2 4 7	9 11 13	15 17 20
·98	9550	9572	9594	9616	9638	9661	9683	9705	9727	9750	2 4 7	9 11 13	16 18 20
·99	9772	9795	9817	9840	9863	9886	9908	9931	9954	9977	2 5 7	9 11 14	16 18 20